পত্রগুচ্ছ

অধিকাংশ চিঠি জওহরলাল নেহরুকে লেখা
এবং কিছু চিঠি নেহরু কর্তৃক লিখিত

জওহরলাল নেহরু

এম সি সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ
কলিকাতা ১২

পত্রগুচ্ছ

সূচনা

এই চিঠিগুলিকে একটি পাঁচমিশালী সংগ্রহ বলা যায়। এগুলিকে একত্রিত ক'রে একটি প্রকাশযোগ্য সঙ্কলনে পরিণত করা কাজটি সহজসাধ্য হয়নি। কাজটি কতখানি সার্থক হয়েছে তা আমার পক্ষে বিচার করা কঠিন। এর প্রায় সবগুলিই বহু পূর্বকালের বলে এখন মনে হয়। মাত্র কয়েকটিকে বাদ দিলে, চিঠিগুলি ভারতের স্বাধীনতালাভের পূর্বে লিখিত, এবং এগুলি দেশের আভ্যন্তরীণ সমস্যা এবং সেই সমস্যাগুলি আমাদের কী ভাবে প্রভাবিত করেছিল, তাই নিয়েই। পুনরায় পাঠ করে দেখতে পাই, এগুলি পুরনো মত-পার্থক্যগুলিকে জাগিয়ে দেয় এবং প্রায়-বিস্মৃত ঘটনাবলী মনে করিয়ে দেয়। সঙ্কলিত চিঠির প্রায় সবগুলিই বিংশতি শতাব্দীর তৃতীয় চতুর্থ ও পঞ্চম দশকের মধ্যে লিখিত, যখন স্বাধীনতার জন্য আমাদের সংগ্রাম চলেছে, এবং সেই সব অবসর সুযোগে, যখন আমি কারাপ্রাচীরের বাইরে।

আমার চিঠি-কাগজ-পত্রগুলিকে যথাযথ ভাবে সাজিয়ে রাখবার অবকাশ বা সুবিধা তখন আমি পাইনি এবং ফলে, সেগুলি এলোমেলোভাবে তাড়া-বাঁধাই ছিল। কিছুদিন পরে পরেই, পুলিসের হানা চলত আমাদের ওপর, আর তারা যা-কিছু সামনে পেত তা নিয়ে যেত। দীর্ঘকাল কারাবাসের পর ঘরে ফিরলে, প্রায়ই দেখতাম, উই এবং অন্যান্য কীট কাগজপত্রগুলিকে ভূরি-ভোজের সামগ্রীতে পরিণত করেছে। এ-সত্ত্বেও বেশ কিছু রক্ষা পেয়েছে। বহু বৎসর পর, বন্ধুরা এই চিঠি-পত্রগুলিকে মোটামুটি একটা শৃঙ্খলায় সাজাতে সাহায্য করেছেন, এবং সম্প্রতি, যখন হিমালয়ে অবস্থিত কুলু-উপত্যকায় স্বল্পদিনের ছুটিতে গিয়েছিলাম তখন, আমি এই চিঠির তাড়া থেকে একটি সঞ্চয় (সঙ্কলন) প্রস্তুত করেছি।

প্রথমে অভিলাষ ছিল কেবল আমাকে লেখা মহাত্মা গান্ধীর পত্রগুলিই প্রকাশ করব। ক্রমে অন্যান্য পত্রও জুড়ে দেওয়া হল; এমনকি, আমার লেখা কিছু পত্রও সন্নিবিষ্ট করা হ'ল, কারণ তা না-হ'লে অনেক ইঙ্গিত ও উল্লেখের অর্থ বোঝা মুস্কিল হয়ে পড়ে। সঙ্কলনটি সাজানো হয়েছে কালানুক্রমিক হিসাবে, যদিচ কোনও কোনও স্থলে, সহজবোধ্য করবার অভিপ্রায়ে, এ-নিয়মের ব্যতিক্রমও ঘটেছে। কিছু পাদটীকা এবং বিশদার্থ যোগ করে দিয়েছি, কিন্তু আমার সন্দেহ হয় যাঁরা সে-সময়কার ভারতের ঘটনাবলীর পারম্পর্যের সঙ্গে পরিচিত নন, তাঁরাও কোনও কোনও পত্রে লিখিত কিছু উল্লেখ ও ইঙ্গিত হয়তো বুঝতে পারবেন না।

এই পত্রগুচ্ছের মধ্যে কতকগুলি লিখেছেন বন্ধু ও সহকর্মিগণ যাঁরা, সৌভাগ্যবশতঃ এখনও জীবিত। তাঁরা অনুগ্রহ করে তাঁদের পত্রগুলি প্রকাশিত করবার জন্য অনুমতি দিয়েছেন। অতি অল্পসংখ্যক এমন পত্রও

আছে যেগুলির প্রকাশের জন্য পূর্বানুমতি সংগ্রহ করা আমার পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠেনি। আশা করি বিনানুমতিতে প্রকাশ করেছি বলে তাঁরা আমাকে ক্ষমা করবেন।

এই পুস্তক প্রকাশ করা ব্যাপারে নানা সময়ে যেসব সহকর্মী আমাকে সাহায্য করেছেন তাদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা জানাতে চাই। বাস্তবিক পক্ষে এ-সাহায্য না পেলে এ কাজটির ভার নেওয়া কিংবা সম্পূর্ণ করা কিছুতেই সম্ভব হতো না।

Jawaharlal Nehru

নূতন দিল্লী
অক্টোবর ৫ ১৯৫৮

পত্রগুচ্ছের সূচী

১	সরোজিনী নাইডু কর্তৃক লিখিত, ১৭ ডিসেম্বর ১৯১৭	১
২	বি. জি. হর্নিম্যান কর্তৃক লিখিত, ১ জুলাই ১৯১৭	১
৩	মোতিলাল নেহরু কর্তৃক লিখিত, ২৫ ফেব্রুয়ারি ১৯২০	২
৪	মোতিলাল নেহরু কর্তৃক লিখিত. ২৭ ফেব্রুয়ারি ১৯২০	৪
৫	মোতিলাল নেহরু কর্তৃক লিখিত, ২৯ ফেব্রুয়ারি ১৯২০	৪
৬	এম. এল. ওক্‌সকে লিখিত, ১৪ মে ১৯২০	৫
৭	জি. এফ. অ্যাডাম্‌সকে লিখিত, ১৫ মে ১৯২০	৬
৮	আদেশপত্র, ১৬ মে ১৯২০	৬
৯	মোতিলাল নেহরু কর্তৃক সার হারকর্ট বাটলারকে লিখিত ১৯ মে ১৯২০	৭
১০	সার হারকর্ট বাটলার কর্তৃক মোতিলাল নেহরুকে লিখিত, ২৬ মে ১৯২০	৯
১১	মোতিলাল নেহরু কর্তৃক লিখিত, ৩ জুন ১৯২০	৯
১২	মোতিলাল নেহরু কর্তৃক সার হারকর্ট বাটলারকে লিখিত, ৮ জুন ১৯২০	১০
১৩	সার হারকর্ট বাটলার কর্তৃক মোতিলাল নেহরুকে লিখিত, ১৫ জুন ১৯২০	১১
১৪	মোতিলাল নেহরু কর্তৃক সার হারকর্ট বাটলারকে লিখিত, জুন ১৯২০	১১
১৫	মোতিলাল নেহরু কর্তৃক লিখিত, ২৭ মে ১৯২০	১২
১৬	মোতিলাল নেহরু কর্তৃক লিখিত, ১৬ জুন ১৯২০	১৩
১৭	মোতিলাল নেহরু কর্তৃক লিখিত, ৫ জুলাই ১৯২০	১৪
১৮	মোতিলাল নেহরু কর্তৃক লিখিত, ৩ জুন ১৯২১	১৪
১৯	মোতিলাল নেহরু কর্তৃক মহাত্মা গান্ধীকে লিখিত, ৩ জুন ১৯২১	১৫
২০	মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক লিখিত, ১৯ ফেব্রুয়ারি ১৯২২	১৮
২১	সরোজিনী নাইডু কর্তৃক লিখিত, ১৩ জুন (? ১৯২৩)	২০
২২	মহাদেব দেশাই কর্তৃক লিখিত, ৫ জুলাই ১৯২৩	২১
২৩	মহাদেব দেশাইকে লিখিত, আগস্ট ১৯২৩	২২
২৪	মোতিলাল নেহরু কর্তৃক লিখিত ২৮ সেপ্টেম্বর ১৯২৩	২৩
২৫	লালা লাজপত রায় কর্তৃক লিখিত, ১৯ নভেম্বর ১৯২৩	২৪
২৬	ম মহম্মদ আলী কর্তৃক লিখিত (তারিখ নেই—? ১৯২৩)	২৪
২৭	ম মহম্মদ আলী কর্তৃক লিখিত, ৭ নভেম্বর ১৯২৩	২৬
২৮	ম শওকত আলী কর্তৃক লিখিত, ২৯ নভেম্বর ১৯২৩	২৭
২৯	ম মহম্মদ আলী কর্তৃক লিখিত, ১৫ জানুয়ারী ১৯২৪	২৭
৩০	ম মহম্মদ আলী কর্তৃক লিখিত, ২১ জানুয়ারী ১৯২৪	২৯
৩১	ম মহম্মদ আলী কর্তৃক লিখিত, ১৫ জুন ১৯২৪	৩১
৩২	মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক লিখিত, ১৫ সেপ্টেম্বর ১৯২৪	৩৫
৩৩	মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক লিখিত, ১৯ সেপ্টেম্বর ১৯২৪	৩৫
৩৪	মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক লিখিত, ১৬ নভেম্বর ১৯২৪	৩৬
৩৫	মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক লিখিত, ২৮ নভেম্বর ১৯২৪	৩৬
৩৬	মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক লিখিত, ২৫ এপ্রিল ১৯২৫	৩৬
৩৭	সরোজিনী নাইডু কর্তৃক লিখিত, ১১ মে ১৯২৫	৩৭
৩৮	মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক লিখিত, ৩০ সেপ্টেম্বর ১৯২৫	৩৮
৩৯	এম. এ. আনসারী কর্তৃক লিখিত, ১১ অক্টোবর ১৯২৫	৩৯

৪০	মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক প্রেরিত টেলিগ্রাম, ১ ডিসেম্বর ১৯২৫	৪০
৪১	মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক লিখিত, ২১ জানুয়ারি ১৯২৬	৪০
৪২	মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক লিখিত, ৫ মার্চ ১৯২৬	৪০
৪৩	মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক লিখিত, ২৩ এপ্রিল ১৯২৬	৪০
৪৪	রোমাঁ রোলাঁ কর্তৃক লিখিত, ১১ মে ১৯২৬	৪১
৪৫	সরোজিনী নাইডু কর্তৃক লিখিত ১৫ অক্টোবর ১৯২৬	৪১
৪৬	মোতিলাল নেহরু কর্তৃক লিখিত, ২ ডিসেম্বর ১৯২৬	৪৩
৪৭	মোতিলাল নেহরু কর্তৃক লিখিত, ১৫ ডিসেম্বর ১৯২৬	৪৫
৪৮	মোতিলাল নেহরু, কর্তৃক লিখিত, ৩০ ডিসেম্বর ১৯২৬	৪৬
৪৯	মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক লিখিত, ২৫ মে ১৯২৭	৪৭
৫০	মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক লিখিত, ৪ জানুয়ারি ১৯২৮	৪৮
৫১	মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক লিখিত, ১৭ জানুয়ারি ১৯২৮	৪৯
৫২	মোতিলাল নেহরু কর্তৃক মহাত্মা গান্ধীকে লিখিত ১১ জুলাই ১৯২৮	৫১
৫৩	জে এম সেনগুপ্ত কর্তৃক মোতিলাল নেহরুকে লিখিত, ১৭ জুলাই ১৯২৮	৫২
৫৪	সুভাষচন্দ্র বসু কর্তৃক মোতিলাল নেহরুকে লিখিত, ১৮ জুলাই ১৯২৮	৫২
৫৫	মোতিলাল নেহরু কর্তৃক জে এম. সেনগুপ্ত ও সুভাষচন্দ্র বসুকে লিখিত ১৯ জুলাই ১৯২৮	৫৩
৫৬	মোতিলাল নেহরু কর্তৃক মহাত্মা গান্ধীকে লিখিত, ১৯ জুলাই ১৯২৮	৫৫
৫৭	মোতিলাল নেহরু কর্তৃক অ্যানি বেসান্টকে লিখিত ৩০ সেপ্টেম্বর ১৯২৮	৫৫
৫৮	মোতিলাল নেহরু কর্তৃক এম এ জিন্নাকে লিখিত ২২ নভেম্বর ১৯২৮	৫৯
৫৯	মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক লিখিত ৩ ডিসেম্বর ১৯২৮	৬০
৬০	নরেন্দ্র দেব কর্তৃক লিখিত ১ ফেব্রুয়ারি ১৯২৯	৬০
৬১	মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক লিখিত, ২৯ জুলাই ১৯২৯	৬২
৬২	সরোজিনী নাইডু কর্তৃক লিখিত ২৯ সেপ্টেম্বর ১৯২৯	৬৩
৬৩	মহাত্মা গান্ধীকে লিখিত ৫ নভেম্বর ১৯২৯	৬৪
৬৪	মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক লিখিত ৫ নভেম্বর ১৯২৯	৬৬
৬৫	এম এ আনসারী কর্তৃক লিখিত, ৭ নভেম্বর ১৯২৯	৬৭
৬৬	মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক লিখিত ৮ নভেম্বর ১৯২৯	৬৮
৬৭	সরোজিনী নাইডু কর্তৃক লিখিত ২০ নভেম্বর ১৯২৯	৬৮
৬৮	অ্যানি বেসান্ট কর্তৃক লিখিত ২৯ নভেম্বর ১৯২৯	৬৯
৬৯	বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক লিখিত ৫ ডিসেম্বর ১৯২৯	৬৯
৭০	মোতিলাল নেহরু কর্তৃক এম এ আনসারীকে লিখিত ১৭ জানুয়ারি ১৯৩০	৭১
৭১	মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক লিখিত ১১ মার্চ ১৯৩০	৭৩
৭২	মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক লিখিত, ১৩ মার্চ ১৯৩০	৭৪
৭৩	মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক লিখিত, ৩১ মার্চ ১৯৩০	৭৪
৭৪	মোতিলাল নেহরু কর্তৃক এম এ আনসারীকে লিখিত, ২০ মার্চ ১৯৩০	৭৫
৭৫	এম এ আনসারী কর্তৃক লিখিত ৩০ মার্চ ১৯৩০	৭৬
৭৬	এম এ আনসারী কর্তৃক মহাত্মা গান্ধীকে লিখিত ৩০ মার্চ ১৯০	৭৬
৭৭	মহাদেব দেশাই কর্তৃক লিখিত ৭ এপ্রিল ১৯৩০	৭৭
৭৮	মোতিলাল নেহরু কর্তৃক শিবপ্রসাদ গুপ্তকে লিখিত, ১ জুন ১৯৩০	৭৮
৭৯	মোতিলাল নেহরু কর্তৃক কৃষ্ণা নেহরুকে লিখিত, ৩০ জুলাই ১৯৩০	৭৯

৮০ মোতিলাল নেহর্ কর্তৃক লিখিত, ১১ নভেম্বর ১৯৩০ ৮০
৮১ মোতিলাল নেহর্ কর্তৃক স্ভাষচন্দ্র বস্কে লিখিত, ১৪ নভেম্বর ১৯৩০ ৮২
৮২ মোতিলাল নেহর্ কর্তৃক লিখিত, ২০ জান্য়ারি ১৯৩১ ৮৩
৮৩ রবার্ট ও. মেনেল কর্তৃক লিখিত, ৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৩১ ৮৩
৮৪ রজার বলডুইন কর্তৃক লিখিত, ১৩ ফেব্র্য়ারি ১৯৩১ ৮৪
৮৫ রজার বলডুইন কর্তৃক লিখিত, ২৯ এপ্রিল ১৯৩১ ৮৫
৮৬ ই. স্টগডন কর্তৃক লিখিত, ৩১শে মে ১৯৩১ ৮৬
৮৭ মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক লিখিত, ২৮ জ্ন ১৯৩১ ৮৭
৮৮ মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক লিখিত, ১ জ্লাই ১৯৩১ ৮৭
৮৯ সরোজিনী নাইডু কর্তৃক লিখিত, ৭ সেপ্টেম্বর ১৯৩১ ৮৮
৯০ রজার বলডুইন কর্তৃক লিখিত, ২৪ সেপ্টেম্বর ১৯৩১ ৮৯
৯১ মীর খান সাহেব কর্তৃক লিখিত, ১ অক্টোবর ১৯৩১ ৯০
৯২ মহাদেব দেশাই কর্তৃক লিখিত, ২৩ অক্টোবর ১৯৩১ ৯১
৯৩ মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক লিখিত, ২৮ ডিসেম্বর ১৯৩১ ৯৩
৯৪ মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক লিখিত, ২৯ জান্য়ারি ১৯৩২ ৯৩
৯৫ দেরাদ্ন ডিস্ট্রিক্ট জেলের স্পারিন্টেন্ডেন্টকে লিখিত, ২২ জ্ন ১৯৩২ ৯৩
৯৬ দেরাদ্ন ডিস্ট্রিক্ট জেলের স্পারিন্টেন্ডেন্টকে লিখিত, ১১ জ্লাই ১৯৩২ ৯৫
৯৭ মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক লিখিত ৩১ ডিসেম্বর ১৯৩২ ৯৭
৯৮ মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক লিখিত, ১৫ ফেব্র্য়ারি ১৯৩৩ ৯৭
৯৯ মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক লিখিত, ২ মে ১৯৩৩ ৯৯
১০০ মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক লিখিত, ২২ জ্লাই ১৯৩৩ ৯৯
১০১ মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক লিখিত, ১৮ অক্টোবর ১৯৩৩ ১০০
১০২ মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক লিখিত ১০ আগস্ট ১৯৩৭ ১০০
১০৩ মহাত্মা গান্ধীকে লিখিত, ১৩ আগস্ট ১৯৩৪ ১০১
১০৪ মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক লিখিত, ১৭ আগস্ট ১৯৩৪ ১০৫
১০৫ মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক লিখিত, ২২ নভেম্বর ১৯৩৪ ১০৭
১০৬ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক লিখিত, ২০ এপ্রিল ১৯৩৫ ১০৭
১০৭ মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক লিখিত, ৩ অক্টোবর ১৯৩৫ ১০৮
১০৮ স্ভাষচন্দ্র বস্ কর্তৃক লিখিত, ৪ অক্টোবর ১৯৩৫ ১০৯
১০৯ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক লিখিত, ৯ অক্টোবর ১৯৩৫ ১০৯
১১০ ই স্টগডন কর্তৃক লিখিত, ৫ নভেম্বর ১৯৩৫ ১১০
১১১ এইচ জে. ল্যাস্কি কর্তৃক লিখিত ৬ নভেম্বর ১৯৩৫ ১১১
১১২ সি. এফ এন্ড্র্জ কর্তৃক লিখিত, ৬ নভেম্বর ১৯৩৫ ১১১
১১৩ সি. এফ. এন্ড্র্জ কর্তৃক লিখিত, ৭ নভেম্বর ১৯৩৫ ১১২
১১৪ লর্ড লোথিয়ান কর্তৃক লিখিত, ৮ নভেম্বর ১৯৩৫ ১১৩
১১৫ লর্ড লোথিয়ান কর্তৃক লিখিত, ৬ ডিসেম্বর ১৯৩৫ ১১৪
১১৬ লর্ড লোথিয়ানকে লিখিত, ৯ ডিসেম্বর ১৯৩৫ ১১৫
১১৭ লর্ড লোথিয়ান কর্তৃক লিখিত, ৩১ ডিসেম্বর ১৯৩৫ ১১৭
১১৮ লর্ড লোথিয়ানকে লিখিত, ১৭ জান্য়ারি ১৯৩৬ ১২৫
১১৯ এডওয়ার্ড টমসন কর্তৃক লিখিত, ২৬ নভেম্বর ১৯৩৫ ১৩৮
১২০ রিচার্ড বি. গ্রেগ কর্তৃক লিখিত, ৩ ডিসেম্বর ১৯৩৫ ১৩৯
১২১ রফি আহ্মদ কিদোয়াই কর্তৃক লিখিত, ৯ ডিসেম্বর ১৯৩৫ ১৪১

১২২	রাজেন্দ্র প্রসাদ কর্তৃক লিখিত, ১৯ ডিসেম্বর ১৯৩৫	১৪২
১২৩	এফ. লেজনি কর্তৃক লিখিত, ১৯ নভেম্বর ১৯৩৫	১৪৫
১২৪	মাদলিন রলাঁ কর্তৃক লিখিত, ১২ জানুয়ারি ১৯৩৬	১৪৬
১২৫	মাদলিন রলাঁ কর্তৃক লিখিত, ১৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৬	১৪৭
১২৬	রমাঁ রলাঁ কর্তৃক লিখিত, ২৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৬	১৪৭
১২৭	বার্ট্রান্ড রাসেল কর্তৃক লিখিত, ৩০ জানুয়ারি ১৯৩৬	১৪৯
১২৮	এম. এ. আনসারী কর্তৃক লিখিত, ১১ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৬	১৪৯
১২৯	এলেন উইলকিনসন কর্তৃক লিখিত, ১৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৬	১৫০
১৩০	সুভাষচন্দ্র বসু কর্তৃক লিখিত, ৪ মার্চ ১৯৩৬	১৫১
১৩১	এইচ. এন. ব্রেলসফোর্ড কর্তৃক লিখিত, ৮ মার্চ ১৯৩৬	১৫২
১৩২	মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক লিখিত, ৯ মার্চ ১৯৩৬	১৫৩
১৩৩	সুভাষচন্দ্র বসু কর্তৃক লিখিত, ১৩ মার্চ ১৯৩৬	১৫৪
১৩৪	এলেন উইলকিনসন কর্তৃক লিখিত, ২২ মার্চ ১৯৩৬	১৫৫
১৩৫	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লিখিত, ১ এপ্রিল ১৯৩৬	১৫৭
১৩৬	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক লিখিত, ৫ এপ্রিল ১৯৩৬	১৫৯
১৩৭	রফি আহমদ কিদোয়াই কর্তৃক লিখিত, ২০ এপ্রিল ১৯৩৬	১৬০
১৩৮	মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক লিখিত, ২১ এপ্রিল ১৯৩৬	১৬০
১৩৯	মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক আগাথা হ্যারিসনকে লিখিত, ৩০ এপ্রিল ১৯৩৬	১৬১
১৪০	মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক লিখিত, ১২ মে ১৯৩৬	১৬১
১৪১	মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক লিখিত, ২১ মে ১৯৩৬	১৬২
১৪২	মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক লিখিত, ২৯ মে ১৯৩৬	১৬২
১৪৩	মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক লিখিত, ১৯ জুন ১৯৩৬	১৬৪
১৪৪	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক লিখিত, ৩১ মে ১৯৩৬	১৬৬
১৪৫	চার্লস ট্রেভেলিয়ান কর্তৃক লিখিত, ১২ জুন ১৯৩৬	১৬৭
১৪৬	সার মহম্মদ ইকবাল কর্তৃক লিখিত, ২১ জুন ১৯৩৬	১৬৮
১৪৭	রাজেন্দ্র প্রসাদ ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ কর্তৃক লিখিত, ২৯ জুন ১৯৩৬	১৬৮
১৪৮	রাজেন্দ্র প্রসাদ কর্তৃক লিখিত, ১ জুলাই ১৯৩৬	১৭০
১৪৯	মহাত্মা গান্ধীকে লিখিত, ৫ জুলাই ১৯৩৬	১৭২
১৫০	মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক লিখিত, ৮ জুলাই ১৯৩৬	১৭৬
১৫১	জে. বি. কৃপালনী কর্তৃক লিখিত, ১১ জুলাই ১৯৩৬	১৭৬
১৫২	সুভাষচন্দ্র বসু কর্তৃক লিখিত, ৩০ জুন, ১৯৩৬	১৮০
১৫৩	মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক লিখিত, ১৫ জুলাই ১৯৩৬	১৮১
১৫৪	আর্নস্ট টলার কর্তৃক লিখিত, ২১ জুলাই ১৯৩৬	১৮২
১৫৫	ক্রিস্টিয়ান টলার কর্তৃক লিখিত, ২৭ জুলাই ১৯৩৬	১৮৪
১৫৬	মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক লিখিত, ৩০ জুলাই ১৯৩৬	১৮৪
১৫৬	মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক লিখিত, ৩০ জুলাই ১৯৩৬	১৮৪
১৫৭	মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক লিখিত, ২৮ আগস্ট ১৯৩৬	১৮৫
১৫৮	এডওয়ার্ড টমসন কর্তৃক লিখিত, ২৬ অক্টোবর ১৯৩৬	১৮৫
১৫৯	এডওয়ার্ড টমসন কর্তৃক লিখিত, ৩০ অক্টোবর ১৯৩৬	১৮৬
১৬০	এডওয়ার্ড টমসন কর্তৃক লিখিত, ১ নভেম্বর ১৯৩৬	১৮৭
১৬১	এডওয়ার্ড টমসন কর্তৃক লিখিত, ২৪ নভেম্বর ১৯৩৬	১৮৭
১৬২	এডওয়ার্ড টমসন কর্তৃক লিখিত, ৬ ডিসেম্বর ১৯৩৬	১৮৯

১৬৩ এডওয়ার্ড টমসন কর্তৃক লিখিত, ৩ জানুয়ারি ১৯৩৭ ১৯৫
১৬৪ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক লিখিত, ২১ ডিসেম্বর ১৯৩৬ ১৯৬
১৬৫ মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক লিখিত, ২৮ ডিসেম্বর ১৯৩৬ ১৯৭
১৬৬ ভি গোল্লাঞ্জ কর্তৃক লিখিত, ৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৭ ১৯৭
১৬৭ স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রীপস্ কর্তৃক লিখিত, ৩ মার্চ ১৯৩৭ ১৯৮
১৬৮ লর্ড লোথিয়ান কর্তৃক লিখিত, ৪ মার্চ ১৯৩৭ ১৯৯
১৬৯ বল্লভভাই প্যাটেল কর্তৃক লিখিত, ৯ মার্চ ১৯৩৭ ২০০
১৭০ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক লিখিত ২৮ মার্চ ১৯৩৭ ২০২
১৭১ আর্নেস্ট টলার কর্তৃক লিখিত, ৩০ মার্চ ১৯৩৭ ২০২
১৭২ মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক লিখিত, ৫ এপ্রিল ১৯৩৭ ২০৪
১৭৩ লর্ড লোথিয়ান কর্তৃক লিখিত, ৯ এপ্রিল ১৯৩৭ ২০৫
১৭৪ এডওয়ার্ড টমসন কর্তৃক লিখিত, ৩ মে ১৯৩৭ ২০৭
১৭৫ মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক লিখিত, ২৫ জুন ১৯৩৭ ২১৪
১৭৬ মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক লিখিত, (তারিখ নেই) ২১৫
১৭৭ মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক লিখিত, ১০ জুলাই ১৯৩৭ ২১৫
১৭৮ মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক লিখিত, ১৫ জুলাই ১৯৩৭ ২১৫
১৭৯ মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক লিখিত, ২২ জুলাই ১৯৩৭ ২১৬
১৮০ বল্লভভাই প্যাটেল কর্তৃক লিখিত, ৩০ জুলাই ১৯৩৭ ২১৬
১৮১ মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক লিখিত ৩০ জুলাই ১৯৩৭ ২১৭
১৮২ মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক লিখিত ৩ আগস্ট ১৯৩৭ ২১৮
১৮৩ মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক লিখিত, ৩ আগস্ট ১৯৩৭ ২১৯
১৮৪ মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক লিখিত, ৬ আগস্ট ১৯৩৭ ২১৯
১৮৫ মহাদেব দেশাই কর্তৃক লিখিত ৪ আগস্ট ১৯৩৭ ২২০
১৮৬ মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক লিখিত, ৮ আগস্ট ১৯৩৭ ২২২
১৮৭ আর্নেস্ট টলার কর্তৃক লিখিত ২৩ আগস্ট ১৯৩৭ ২২২
১৮৮ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক লিখিত ২০ সেপ্টেম্বর ১৯৩৭ ২২৩
১৮৯ মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক লিখিত, ১ অক্টোবর ১৯৩৭ ২২৪
১৯০ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক লিখিত, ১০ অক্টোবর ১৯৩৭ ২২৫
১৯১ মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক লিখিত ১২ অক্টোবর ১৯৩৭ ২২৪
১৯২ অমৃত শের গিল কর্তৃক লিখিত ৬ নভেম্বর ১৯৩৭ ২২৫
১৯৩ সরোজিনী নাইডু কর্তৃক লিখিত ১৩ নভেম্বর ১৯৩৭ ২২৬
১৯৪ মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক লিখিত, ১৮ নভেম্বর ১৯৩৭ ২২৬
১৯৫ মহাদেব দেশাই কর্তৃক লিখিত ১৯ নভেম্বর ১৯৩৭ ২২৭
১৯৬ এ্যাগনেস স্মেডলী কর্তৃক লিখিত, ২৩ নভেম্বর ১৯৩৭ ২২৮
১৯৭ চু তে কর্তৃক লিখিত, ২৬ নভেম্বর ১৯৩৭ ২২৯
১৯৮ হাজী মির্জা আলী (ইপির ফকির সাহেব) কর্তৃক লিখিত, ১৬ সেপ্টেম্বর ১৯৩০ ২৩১
১৯৯ মহাত্মা গান্ধীকে লিখিত, ১৪ নভেম্বর ১৯৩৭ ২৩২
২০০ গোবিন্দবল্লভ পন্থকে লিখিত, ২৫ নভেম্বর ১৯৩৭ ২৩৪
২০১ খালিক-উজ-জমানকে লিখিত ২৭ জুন ১৯৩৭ ২৩৫
২০২ খালিক-উজ-জমান কর্তৃক লিখিত, ২৮ নভেম্বর ১৯৩৭ ২৩৬
২০৩ মহাদেব দেশাই কর্তৃক লিখিত, ২ ডিসেম্বর ১৯৩৭ ২৩৮

১২২	রাজেন্দ্র প্রসাদ কর্তৃক লিখিত, ১৯ ডিসেম্বর ১৯৩৫	১৪২
১২৩	এফ. লেজার্নি কর্তৃক লিখিত, ১৯ নভেম্বর ১৯৩৫	১৪৫
১২৪	মাদলিন রলাঁ কর্তৃক লিখিত, ১২ জানুয়ারি ১৯৩৬	১৪৬
১২৫	মাদলিন রলাঁ কর্তৃক লিখিত, ১৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৬	১৪৭
১২৬	রমাঁ রলাঁ কর্তৃক লিখিত, ২৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৬	১৪৭
১২৭	বার্ট্রাণ্ড রাসেল কর্তৃক লিখিত, ৩০ জানুয়ারি ১৯৩৬	১৪৯
১২৮	এম. এ আনসারী কর্তৃক লিখিত, ১১ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৬	১৪৯
১২৯	এলেন উইলকিনসন কর্তৃক লিখিত, ১৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৬	১৫০
১৩০	সুভাষচন্দ্র বসু কর্তৃক লিখিত, ৪ মার্চ ১৯৩৬	১৫১
১৩১	এইচ এন. ব্রেলসফোর্ড কর্তৃক লিখিত, ৮ মার্চ ১৯৩৬	১৫২
১৩২	মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক লিখিত, ৯ মার্চ ১৯৩৬	১৫৩
১৩৩	সুভাষচন্দ্র বসু কর্তৃক লিখিত, ১৩ মার্চ ১৯৩৬	১৫৪
১৩৪	এলেন উইলকিনসন কর্তৃক লিখিত, ২২ মার্চ ১৯৩৬	১৫৫
১৩৫	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লিখিত, ১ এপ্রিল ১৯৩৬	১৫৭
১৩৬	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক লিখিত ৫ এপ্রিল ১৯৩৬	১৫৯
১৩৭	রফি আহমদ কিদোয়াই কর্তৃক লিখিত, ২০ এপ্রিল ১৯৩৬	১৬০
১৩৮	মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক লিখিত, ২১ এপ্রিল ১৯৩৬	১৬০
১৩৯	মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক আগাথা হ্যারিসনকে লিখিত, ৩০ এপ্রিল ১৯৩৬	১৬১
১৪০	মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক লিখিত ১২ মে ১৯৩৬	১৬১
১৪১	মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক লিখিত, ২১ মে ১৯৩৬	১৬২
১৪২	মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক লিখিত ২৯ মে ১৯৩৬	১৬২
১৪৩	মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক লিখিত, ১৯ জুন ১৯৩৬	১৬৪
১৪৪	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক লিখিত, ৩১ মে ১৯৩৬	১৬৬
১৪৫	চার্লস ট্রেভেলিয়ান কর্তৃক লিখিত ১২ জুন ১৯৩৬	১৬৭
১৪৬	সার মহম্মদ ইকবাল কর্তৃক লিখিত, ২১ জুন ১৯৩৬	১৬৮
১৪৭	রাজেন্দ্র প্রসাদ ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ কর্তৃক লিখিত ২৯ জুন ১৯৩৬	১৬৮
১৪৮	রাজেন্দ্র প্রসাদ কর্তৃক লিখিত, ১ জুলাই ১৯৩৬	১৭০
১৪৯	মহাত্মা গান্ধীকে লিখিত, ৫ জুলাই ১৯৩৬	১৭২
১৫০	মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক লিখিত, ৮ জুলাই ১৯৩৬	১৭৬
১৫১	জে. বি কৃপালনী কর্তৃক লিখিত ১১ জুলাই ১৯৩৬	১৭৬
১৫২	সুভাষচন্দ্র বসু কর্তৃক লিখিত, ৩০ জুন, ১৯৩৬	১৮০
১৫৩	মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক লিখিত, ১৮ জুলাই ১৯৩৬	১৮১
১৫৪	আর্নস্ট টলার কর্তৃক লিখিত, ২১ জুলাই ১৯৩৬	১৮২
১৫৫	ক্রিস্টিয়ান টলার কর্তৃক লিখিত, ১৭ জুলাই ১৯৩৬	১৮৪
১৫৬	মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক লিখিত, ৩০ জুলাই ১৯৩৬	১৮৪
১৫৬	মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক লিখিত, ৩০ জুলাই ১৯৩৬	১৮৪
১৫৭	মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক লিখিত, ২৮ আগস্ট ১৯৩৬	১৮৫
১৫৮	এডওয়ার্ড টমসন কর্তৃক লিখিত, ২৬ অক্টোবর ১৯৩৬	১৮৫
১৫৯	এডওয়ার্ড টমসন কর্তৃক লিখিত ৩০ অক্টোবর ১৯৩৬	১৮৬
১৬০	এডওয়ার্ড টমসন কর্তৃক লিখিত, ১ নভেম্বর ১৯৩৬	১৮৭
১৬১	এডওয়ার্ড টমসন কর্তৃক লিখিত, ২৪ নভেম্বর ১৯৩৬	১৮৭
১৬২	এডওয়ার্ড টমসন কর্তৃক লিখিত, ৬ ডিসেম্বর ১৯৩৬	১৮৯

১৬৩ এডওয়ার্ড টমসন কর্তৃক লিখিত, ৩ জানুয়ারি ১৯৩৭ ১৯৩
১৬৪ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক লিখিত, ২১ ডিসেম্বর ১৯৩৬ ১৯৬
১৬৫ মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক লিখিত, ২৮ ডিসেম্বর ১৯৩৬ ১৯৭
১৬৬ ভি গোলাঞ্জ কর্তৃক লিখিত, ৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৭ ১৯৭
১৬৭ স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রীপ্‌স্‌ কর্তৃক লিখিত, ৩ মার্চ ১৯৩৭ ১৯৮
১৬৮ লর্ড লোথিয়ান কর্তৃক লিখিত, ৪ মার্চ ১৯৩৭ ১৯৯
১৬৯ বল্লভভাই প্যাটেল কর্তৃক লিখিত, ৯ মার্চ ১৯৩৭ ২০০
১৭০ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক লিখিত, ২৮ মার্চ ১৯৩৭ ২০২
১৭১ আর্নস্ট টলার কর্তৃক লিখিত, ৩০ মার্চ ১৯৩৭ ২০২
১৭২ মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক লিখিত, ৫ এপ্রিল ১৯৩৭ ২০৪
১৭৩ লর্ড লোথিয়ান কর্তৃক লিখিত, ৯ এপ্রিল ১৯৩৭ ২০৫
১৭৪ এডওয়ার্ড টমসন কর্তৃক লিখিত, ৩ মে ১৯৩৭ ২০৭
১৭৫ মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক লিখিত, ২৫ জুন ১৯৩৭ ২১৪
১৭৬ মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক লিখিত (তারিখ নেই) ২১৫
১৭৭ মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক লিখিত, ১০ জুলাই ১৯৩৭ ২১৫
১৭৮ মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক লিখিত, ১৫ জুলাই ১৯৩৭ ২১৫
১৭৯ মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক লিখিত, ২২ জুলাই ১৯৩৭ ২১৬
১৮০ বল্লভভাই প্যাটেল কর্তৃক লিখিত, ৩০ জুলাই ১৯৩৭ ২১৬
১৮১ মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক লিখিত, ৩০ জুলাই ১৯৩৭ ২১৭
১৮২ মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক লিখিত, ৩ আগস্ট ১৯৩৭ ২১৮
১৮৩ মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক লিখিত, ৩ আগস্ট ১৯৩৭ ২১৯
১৮৪ মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক লিখিত, ৪ আগস্ট ১৯৩৭ ২১৯
১৮৫ মহাদেব দেশাই কর্তৃক লিখিত ৪ আগস্ট ১৯৩৭ ২২০
১৮৬ মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক লিখিত, ৮ আগস্ট ১৯৩৭ ২২২
১৮৭ আর্নস্ট টলার কর্তৃক লিখিত ২৩ আগস্ট ১৯৩৭ ২২২
১৮৮ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক লিখিত ২০ সেপ্টেম্বর ১৯৩৭ ২২৩
১৮৯ মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক লিখিত, ১ অক্টোবর ১৯৩৭ ২২৪
১৯০ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক লিখিত, ১০ অক্টোবর ১৯৩৭ ২২৪
১৯১ মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক লিখিত ১২ অক্টোবর ১৯৩৭ ২২৪
১৯২ অমৃত শের গিল কর্তৃক লিখিত ৬ নভেম্বর ১৯৩৭ ২২৫
১৯৩ সরোজিনী নাইডু কর্তৃক লিখিত ১৩ নভেম্বর ১৯৩৭ ২২৬
১৯৪ মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক লিখিত, ১৪ নভেম্বর ১৯৩৭ ২২৬
১৯৫ মহাদেব দেশাই কর্তৃক লিখিত ১৯ নভেম্বর ১৯৩৭ ২২৭
১৯৬ এ্যাগনেস স্মেডলী কর্তৃক লিখিত, ২৩ নভেম্বর ১৯৩৭ ২২৮
১৯৭ চু তে কর্তৃক লিখিত, ২৬ নভেম্বর ১৯৩৭ ২২৯
১৯৮ হাজী মির্জা আলী (ইপির ফকির সাহেব) কর্তৃক লিখিত, ১৬ সেপ্টেম্বর ১৯৩৭ ২৩১
১৯৯ মহাত্মা গান্ধীকে লিখিত, ১৪ নভেম্বর ১৯৩৭ ২৩২
২০০ গোবিন্দবল্লভ পন্থকে লিখিত, ২৫ নভেম্বর ১৯৩৭ ২৩৪
২০১ খালিক-উজ-জমানকে লিখিত ২৭ জুন ১৯৩৭ ২৩৫
২০২ খালিক-উজ-জমান কর্তৃক লিখিত, ২৮ নভেম্বর ১৯৩৭ ২৩৬
২০৩ মহাদেব দেশাই কর্তৃক লিখিত, ২ ডিসেম্বর ১৯৩৭ ২৩৮

২৮৮ মহাদেব দেশাইকে লিখিত, ৯ ডিসেম্বর ১৯৩৯ ৩৬২
২৮৯ এম. এ. জিন্নাকে লিখিত, ৯ ডিসেম্বর ১৯৩৯ ৩৬৩
২৯০ এম. এ. জিন্না কর্তৃক লিখিত, ১৩ ডিসেম্বর ১৯৩৯ ৩৬৪
২৯১ এম. এ. জিন্নাকে লিখিত, ১৪ ডিসেম্বর ১৯৩৯ ৩৬৫
২৯২ এম এ জিন্না কর্তৃক লিখিত, ১৫ ডিসেম্বর ১৯৩৯ ৩৬৭
২৯৩ এম. এ. জিন্নাকে লিখিত, ১৬ ডিসেম্বর ১৯৩৯ ৩৬৭
২৯৪ মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক লিখিত, ২৮ ডিসেম্বর ১৯৩৯ ৩৬৯
২৯৫ জওহরলাল নেহরু কর্তৃক এডওয়ার্ড টমসনকে লিখিত,
৫ জানুয়ারি ১৯৪০ ৩৬৯
২৯৬ জওহরলাল নেহরু কর্তৃক জে. হোমস স্মিথকে লিখিত,
১০ জানুয়ারি ১৯৪০ ৩৭০
২৯৭ জওহরলাল নেহরু কর্তৃক মহাত্মা গান্ধীকে লিখিত
২৪ জানুয়ারী ১৯৪০ ৩৭২
২৯৮ জওহরলাল নেহরু কর্তৃক মহাত্মা গান্ধীকে লিখিত, ৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৪০ ৩৭৪
২৯৯ জওহরলাল নেহরু কর্তৃক আবুল কালাম আজাদকে লিখিত,
২২ ফেব্রুয়ারি ১৯৪০ ৩৭৬
৩০০ আবুল কালাম আজাদ কর্তৃক লিখিত, ২৭ মার্চ ১৯৪০ ৩৮১
৩০১ আবুল কালাম আজাদ কর্তৃক লিখিত, ২৪ এপ্রিল ১৯৪০ ৩৮২
৩০২ জওহরলাল নেহরু কর্তৃক কৃষ্ণ কৃপালনিকে লিখিত, ২৬ ফেব্রুয়ারী ১৯৪০ ৩৮৩
৩০৩ এডওয়ার্ড টমসন কর্তৃক লিখিত, ৭ মার্চ ১৯৪০ ৩৮৩
৩০৪ জওহরলাল নেহরু কর্তৃক এডওয়ার্ড টমসনকে লিখিত, ৭ এপ্রিল ১৯৪০ ৩৮৪
৩০৫ এডওয়ার্ড টমসন কর্তৃক লিখিত, ২৮ এপ্রিল ১৯৪০ ৩৮৬
৩০৬ আবুল কালাম আজাদ কর্তৃক লিখিত, ৯ মে ১৯৪০ ৩৮৮
৩০৭ আবুল কালাম আজাদ কর্তৃক লিখিত ২৫ মে ১৯৪০ ৩৮৮
৩০৮ খান আবদুল গফফর খান কর্তৃক লিখিত, ১৩ জুলাই ১৯৪০ ৩৯০
৩০৯ আবুল কালাম আজাদ কর্তৃক লিখিত ১৯ জুলাই ১৯৪০ ৩৯১
৩১০ জয়প্রকাশ নারায়ণ কর্তৃক লিখিত, ২০ জুলাই ১৯৪০ ৩৯১
৩১১ চেং ইন ফান কর্তৃক লিখিত, ২১ আগস্ট ১৯৪০ ৩৯২
৩১২ মাদাম চিয়াং কাই সেক কর্তৃক লিখিত, ১০ সেপ্টেম্বর ১৯৪০ ৩৯৪
৩১৩ জি গেস্ট লেভো কর্তৃক লিখিত, ২৯ সেপ্টেম্বর ১৯৪০ ৩৯৫
৩১৪ খান আবদুল গফফর খান কর্তৃক লিখিত, ১৮ অক্টোবর ১৯৪০ ৩৯৬
৩১৫ জেনারিলিসিমো চিয়াং কাই-সেক কর্তৃক লিখিত, ১৮ অক্টোবর ১৯৪০ ৩৯৭
৩১৬ মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক লিখিত, ২১ অক্টোবর ১৯৪০ ৩৯৭
৩১৭ মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক লিখিত ২৪ অক্টোবর ১৯৪০ ৩৯৮
৩১৮ মাদাম চিয়াং কাই সেক কর্তৃক লিখিত, ১৬ জানুয়ারি ১৯৪১ ৩৯৮
৩১৯ জাঁ ফ্রন্ট কর্তৃক লিখিত, ১৫ এপ্রিল ১৯৪১ ৩৯৯
৩২০ রফি আহমদ কিদোয়াই কর্তৃক লিখিত, ২৬ এপ্রিল ১৯৪১ ৪০১
৩২১ পূর্ণিমা ব্যানার্জি কর্তৃক লিখিত, ৭ মে ১৯৪১ ৪০১
৩২২ রিচার্ড রিৎসনার কর্তৃক লিখিত, ১৩ আগস্ট ১৯৪১ ৪০৩
৩২৩ এলিনর এফ্ রাথবোন্ কর্তৃক লিখিত,, ২৮ আগস্ট ১৯৪১ ৪০৫
৩২৪ স্যার জর্জ সুস্টার কর্তৃক লিখিত, ২৩ সেপ্টেম্বর ১৯৪১ ৪০৯
৩২৫ পূর্ণিমা ব্যানার্জি কর্তৃক লিখিত ৮ নভেম্বর ১৯৪১ ৪১১

৩৪৪ ক্লেয়ার বুথ লুস কর্তৃক লিখিত, ৪ জুন ১৯৪২ ৪৩১
৩২৬ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী কর্তৃক লিখিত, ২৩ নভেম্বর ১৯৪১ ৪১২
৩২৭ জয়প্রকাশ নারায়ণ কর্তৃক লিখিত, ৭ ডিসেম্বর ১৯৪১ ৪১৩
৩২৮ আর. অচ্যুথন কর্তৃক লিখিত, ৮ ডিসেম্বর ১৯৪১ ৪১৪
৩২৯ সরোজিনী নাইডু কর্তৃক লিখিত, ৯ ডিসেম্বর ১৯৪১ ৪১৪
৩৩০ ফিল্ড মার্শাল এ. পি ওয়াভেল কর্তৃক লিখিত, ২৮ ডিসেম্বর ১৯৪১ ৪১৫
৩৩১ জেড্. এ. আমেদ কর্তৃক লিখিত, ১০ জানুয়ারি ১৯৪২ ৪১৫
৩৩২ জওহরলাল নেহরু কর্তৃক সৈয়দ মামুদকে লিখিত, ২ ফেব্রুয়ারি ১৯৪২ ৪১৬
৩৩৩ মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক লিখিত, ৪ মার্চ ১৯৪২ ৪১৮
৩৩৪ আবুল কালাম আজাদ কর্তৃক লিখিত, ৮ মার্চ ১৯৪২ ৪১৯
৩৩৫ মাদাম চিয়াং কাই-সেক কর্তৃক লিখিত, ১৩ মার্চ ১৯৪২ ৪১৯
৩৩৬ স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রীপস কর্তৃক লিখিত, এপ্রিল ১৯৪২ ৪২১
৩৩৭ জওহরলাল নেহরু কর্তৃক ফ্রাঙ্কলিন ডি রুজভেল্টকে লিখিত,
১২ এপ্রিল ১৯৪২ ৪২২
৩৩৮ মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক লিখিত, ১৫ এপ্রিল ১৯৪২ ৪২৩
৩৩৯ তুয়ান-শেঙ চেন কর্তৃক লিখিত ১৮ এপ্রিল ১৯৪২ ৪২৪
৩৪০ মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক লিখিত, ২৪ এপ্রিল ১৯৪২ ৪২৬
৩৪১ লুই জনসন কর্তৃক লিখিত, ১২ মে ১৯৪২ ৪২৬
৩৪২ জি অধিকারী কর্তৃক লিখিত ৩ মে ১৯৪২ ৪২৭
৩৪৩ আবুল কালাম আজাদ কর্তৃক লিখিত, ১৩ মে ১৯৪২ ৪৩০
৩৪৪ ক্লেয়ার বুথ লুস কর্তৃক লিখিত, ৪ জুন ১৯৪২ ৪৩১
৩৪৫ এস. এইচ শেন কর্তৃক লিখিত, ১৬ জুন ১৯৪২ ৪৩২
৩৪৬ জওহরলাল নেহরু কর্তৃক ল্যাম্পটন বেরীকে লিখিত, ২৩ জুন ১৯৪২ ৪৩৩
৩৪৭ এস এইচ শেন কর্তৃক লিখিত, ২৫ জুন ১৯৪২ ৪৩৫
৩৪৮ মাদাম চিয়াং কাই-সেক কর্তৃক লিখিত ২৬ জুন ১৯৪২ ৪৩৫
৩৪৯ এস এইচ শেন কর্তৃক লিখিত ? জুলাই ১৯৪২ ৪৩৭
৩৫০ ল্যাম্পটন বেরী কর্তৃক লিখিত, ৯ আগস্ট ১৯৪২ ৪৩৭
৩৫১ ক্লেয়ার বুথ লুস কর্তৃক লিখিত, ২৫ আগস্ট ১৯৪২ ৪৩৮
৩৫২ আসফ আলী কর্তৃক লিখিত, ৩০ এপ্রিল ১৯৪৫ ৪৩৯
৩৫৩ তেজ বাহাদুর সাপ্রু কর্তৃক লিখিত, ১৫ জুন ১৯৪৫ ৪৪১
৩৫৪ এম এন সাহা কর্তৃক লিখিত, ১২ আগস্ট ১৯৪৫ ৪৪২
৩৫৫ এস এইচ শেন কর্তৃক লিখিত, ১৫ আগস্ট ১৯৪৫ ৪৪২
৩৫৬ গোবিন্দবল্লভ পন্থ কর্তৃক লিখিত, ১৫ আগস্ট ১৯৪৫ ৪৪৩
৩৫৭ সি শিন হেনফ কর্তৃক লিখিত, ২২ আগস্ট ১৯৪৫ ৪৪৪
৩৫৮ অরুণা আসফ আলী কর্তৃক লিখিত, ৯ই নভেম্বর ১৯৪৫ ৪৪৫
৩৫৯ মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক লিখিত, ১৩ নভেম্বর ১৯৪৫ ৪৪৫
৩৬০ স্যার ফ্রান্সিস ওয়াইলী কর্তৃক লিখিত, ২২ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৬ ৪৪৬
৩৬১ মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক লিখিত, ১৮ জানুয়ারি ১৯৪৮ ৪৪৭
৩৬২ জর্জ বার্ণার্ড শ'কে লিখিত, ৪ সেপ্টেম্বর ১৯৪৮ ৪৪৯
৩৬৩ জর্জ বার্ণার্ড শ কর্তৃক লিখিত ১৮ সেপ্টেম্বর ১৯৪৮ ৪৫০
৩৬৪ জর্জ বার্ণার্ড শ'কে লিখিত, ২৮ অক্টোবর ১৯৪৮ ৪৫১
৩৬৫ জর্জ বার্ণার্ড শ কর্তৃক লিখিত, ১২ নভেম্বর ১৯৪৮ ৪৫২
৩৬৬ তেজ বাহাদুর সাপ্রু কর্তৃক লিখিত, ২ ডিসেম্বর ১৯৪৮ ৪৫২

জওহরলাল নেহরুর পত্রগুচ্ছ

১ সরোজিনী নাইডু কর্তৃক লিখিত

[আমার কন্যা ইন্দিরার (এখন ইন্দিরা গান্ধী) জন্মগ্রহণের খবর পেয়ে এই চিঠিখানি লেখা হয়েছিল।]

মাদ্রাজ, ১৭ ডিসেম্বর, ১৯১৭

প্রিয় জওহর,

তোমাদের শুভসংবাদ পাবার পর এমন এক মুহূর্ত সময় পাইনি যে তোমাকে আর কমলাকে অভিনন্দন অথবা আমার নতুন ভাগনীটিকে আশীর্বাদ জানিয়ে একটা চিঠি লিখতে বসব। প্রতিটি দিনই এখন কাজেকর্মে ঠাসা, তারই মধ্য থেকে কোনক্রমে আধমুহূর্ত সময় ছিনিয়ে নিয়ে দুটোই এবারে জানালাম। মাদ্রাজ পাগল হয়ে গিয়েছে, একেবারে পাগল! ভাব দেখে মনে হয়, আমাকেও পাগল বানিয়ে ছাড়বে।

তুমি যদি কলকাতা যাও, তাহলে ৭ হাঙ্গারফোর্ড স্ট্রীটে গেলেই আমার সঙ্গে দেখা হবে। দেখা করতে ভুল না। তোমাকে এক কপি সোল অব ইণ্ডিয়া পাঠাচ্ছি। এ-বইয়ে আমি মণ্টেগু-বোমার জবাব দিলাম।

সবাইকে ভালবাসা এবং নবজাত সোল অব ইণ্ডিয়াকে চুম্বন জানাই।

প্রীত্যার্থী
সরোজিনী নাইডু

২ বি. জি. হর্নিম্যান কর্তৃক লিখিত

দি বম্বে ক্রনিক্‌ল (সম্পাদকীয় বিভাগ)
১ জুলাই, ১৯১৭

প্রিয় জওহরলাল,

তোমার ২৯শে তারিখের চিঠির জন্য ধন্যবাদ। গান্ধী এখান থেকে খানিকটা ভ্রান্ত ধারণা নিয়েই ফিরেছেন। আগামী শনিবার আমরা আমাদের প্রতিবাদ-সভা ডাকছি। না ডাকবার ইচ্ছে আমাদের কখনও ছিল না। কিন্তু গান্ধী এসে প্রস্তাব করলেন যে প্রথমে একটা দিন স্থির করে তারপর নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ চালিয়ে যাওয়া হোক। আমরা—অর্থাৎ আলোচনা-সভায় যাঁরা উপস্থিত ছিলেন, তাঁদের অধিকাংশই—এতে সম্মত হয়েছিলাম, কিন্তু গান্ধী বললেন যে আমরা কোন-কিছু করবার আগে তিনি মালব্যের সঙ্গে দেখা করবেন, দেখা না হওয়া অবধি আমরা যেন অপেক্ষা করি। অতঃপর তিনি এলাহাবাদ থেকে এক টেলিগ্রাম পাঠিয়ে জানালেন যে মালব্য সিমলা থেকে ফেরেননি। সুতরাং আমরা আমাদের উদ্যোগ-আয়োজন চালিয়ে যেতে লাগলাম। কিন্তু এখনও আমি নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ আন্দোলনের সমর্থক। বাস্তব কিছু করবার প্রয়োজন খুব জরুরী হয়ে দেখা দিয়েছে। স্বাক্ষর সংগ্রহের উদ্দেশ্যে আমরা এখানে একটা নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ ইস্তাহার প্রচার করছি। আমিই সর্বপ্রথম তাতে সই করেছি। অবশ্য বুঝতেই পার যে প্রবীণ কংগ্রেসীদের নিয়ে আমাদেরও মুশকিলে পড়তে হয়। তবে আমরা তাঁদের বেশ একটা ঝাঁকুনি দিয়ে দিয়েছি, এবং যতটা আশা করেছিলাম, তার চাইতেও তারা অনেক বেশী এগিয়ে এসেছেন।

মাদ্রাজে গিয়ে খুবই সফল হয়েছে। তুমি জান যে আবার মাত্র দু দিনে আমরা নিউ ইণ্ডিয়া প্রকাশ করেছিলাম। এ এক বিরাট জয়, শত্রুর বুকে এতে মস্ত বড় আঘাত পড়েছে। আবার যে পত্রিকাটির প্রকাশ হবে, মিসেস বেসাণ্ট তার সমস্ত আশাই ছেড়ে দিয়েছিলেন। মাদ্রাজের সভাটিও বেশ ভাল হয়েছিল।

জে. ডি. আর. প্রসঙ্গে দুঃখের সঙ্গে জানাই, এখানে যাঁরা আমাদের বন্ধুবান্ধব আছেন তাঁরা অথবা তাঁদের অধিকাংশই তোমার কাজের সমর্থক নন। অবশ্য ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি যে তুমি ঠিকই করেছ। রিক্রুটিং-আন্দোলন সমর্থনের ব্যাপারে জিন্নাকে প্রথমে অনেক কষ্টে রাজী করান গিয়েছিল। কিন্তু প্রতিবাদ হিসেবে এই সমর্থন প্রত্যাহারে তিনি এখন সম্মত নন। তাঁর মনোভাব অত্যন্তই কঠোর। নিজেকে এখন আমার নিঃসঙ্গ মনে হচ্ছে।

আজ শুনলাম, ৮ই তারিখে যাতে নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতি (অল ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটি) আর মুসলিম লীগ পরিষদের যুক্ত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, মালব্য তার জন্য প্রস্তাব জানিয়ে জিন্নাকে টেলিগ্রাম করেছেন। এ ত ভাল কথাই। আমরা যদি এই বুড়োদের শরীরে খানিকটা উদ্যম সঞ্চার করতে পারি, তাতে ভালই হবে। যুক্ত সম্মেলন যদি অনুষ্ঠিত হয়, তাহলে এলাহাবাদ থেকে তোমরা সবাই আশা করি আসবে। মালব্যের সঙ্গে দেখা করতে এবং তাঁর সঙ্গে জরুরী কিছু কথা বলতে আমার খুবই আগ্রহ। তিনি নিজেই এখানে আসছেন। নয়ত আমি এলাহাবাদে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করতাম। সুরেন্দ্রনাথের বিষয়ে এইটুকু বলতে পারি যে, তাঁকে একবার ধরতে পারলে আমি নিশ্চয়ই কিছু করতে পারতাম। ১১ বছর আগে যেদিন আমি ভারতবর্ষে আসি, সেইদিন থেকেই তাঁকে আমি চিনি, এবং কীভাবে যে তাঁকে নাড়াচাড়া করতে হয়, তাও আমি জানি। তবে তিনি এখন কুপ্রভাবে পড়েছেন।

দাগ যদি কাটতে হয়, তবে দুটি ব্যবস্থা অবশ্যই অবলম্বন করতে হবে।

১। কাউন্সিলের সদস্যদের পদত্যাগ। (এ-প্রস্তাব এলাহাবাদের, ঈশ্বর এলাহাবাদকে আশীর্বাদ করুন!)

২। সরকার যদি তাঁর নীতি না পালটান এবং নির্দিষ্ট একটা সময়ের মধ্যে অন্তরিত বন্দীদের মুক্তি না দেন, তাহলে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ।

বোম্বাইয়ের কথা বলতে পারি, এর জন্য আমি যথাসাধ্য কাজ করে যাব। কিন্তু সর্বভারতীয় একটা সম্মেলনও অত্যাবশ্যক হয়ে উঠেছে।

তোমার কাছে যাতে কাগজ পাঠান হয়, তার নির্দেশ দিয়েছি। আমার ধারণা, আগেই নির্দেশ দিয়েছিলাম।

প্রত্যেককে আমার প্রীতি জানাই
প্রীতিমুগ্ধ
বি. জি. হর্নিম্যান

[বি. জি. হর্নিম্যান ছিলেন বম্বে ক্রনিক্‌ল পত্রিকার একজন জনপ্রিয় ও প্রভাবশালী সম্পাদক। প্রথম মহাযুদ্ধের শেষ ক বছরে এবং তার পরবর্তীকালে ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনে তিনি এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অবতীর্ণ হন।]

৩ মোতিলাল নেহরু কর্তৃক লিখিত

[সামরিক আইন জারী হবার পর পাঞ্জাবে যে অবস্থার উদ্ভব হয়, আমার বাবার মনে তা একটা গভীর এবং ব্যক্তিগত বেদনা সৃষ্টি করেছিল। সামরিক আদালতের কয়েকটি সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তাঁরই উদ্যোগে এই সময় ইংল্যাণ্ডের প্রিভি কাউন্সিলে আপিল পেশ করা হয়। অমৃতসরের বুগা ও রতনচাঁদের আপীল তার অন্যতম। এই আপিলটির প্রতি তখন অনেকেরই দৃষ্টি আকৃষ্ট

Madras

Dec 17. 1917

Dear Jawahar. I have not one single moment since hearing your good news to sit down and send a word of congratulation to you & Kamala & a blessing for my new niece. I do both now in a half second snatched from a day filled — as usual — with engagements. Madras has gone mad — O quite mad! — and I wish it would send me mad also.

If you are going to Calcutta you will find me at 7 Hungerford Street: so don't fail to look me up. I am sending you a copy of The Sons of India where is my contribution

to Mr. Montagu bomb and mine..

[illegible] book. 1 taken to the new State of India

Yours a/ff

Sarojini Naidu

হয়। বাবা এই সময়ে ছিলেন বিহারের আরা সহরে। সেখানে তিনি বড় একটা জমিদারী মামলায় ব্যাপৃত ছিলেন। এই চিঠিখানি এবং পরবর্তী আরও কয়েকটি চিঠি তিনি সেইখান থেকেই লেখেন।]

আরা
২৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯২০

প্রিয় জওহর,

বুগা আপিলের ব্যাপারে প্রিভি কাউন্সিল যে সিদ্ধান্ত করেছেন, তার জন্য যে আমি আদৌ প্রস্তুত ছিলাম না তা নয়। আমার আগের চিঠি থেকেই তুমি তা বুঝে থাকবে। তবে আপিল খারিজ হয়ে যাওয়ায় আমি খুবই আঘাত পেয়েছি। অন্যান্য আপিলকারীরা হাঙ্গামায় যে অংশই নিয়ে থাকুক না কেন, এ-ব্যাপারে বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকতে পারে না যে বুগা ও রতনচাঁদ ইন্দুর মতই নির্দোষ। পাঞ্জাবের সরকারী বেসরকারী প্রতিটি লোকই এ-কথা জানে। তবু তাদের ফাঁসি হবে! যাই হোক, এ-দেশে প্রতিনিয়ত যে অসংখ্য অবিচার ঘটছে, এটি তার একটি দৃষ্টান্ত মাত্র। আমরা শুধু আমাদের কর্তব্য করে যেতে এবং সম্ভবপর সর্ব উপায়ে প্রতিকারের প্রয়াস পেতে পারি। কী কী ব্যবস্থা আমি অবলম্বন করেছি, ইতি-পূর্বেই তা জানিয়ে আমি তোমাকে তার করেছি। তবে তাও যথেষ্ট নয়। আর যা যা করতে হবে, তা হল এই :

১। যে যে মামলা পাঠান হয়েছে, জগমোহন নাথ যেন তার আপিল-কারীদের একটা সম্পূর্ণ তালিকা তৈরী করে দেয়। আপিলকারীদের মধ্যে কে কে ছাড়া পেয়েছে এবং কে কে এখনও জেলে আছে, তালিকাটি টেকচাঁদের কাছে পাঠিয়ে তা জেনে নিতে হবে। যারা এখনও জেলে আছে, তাদের সকলের নাম জানিয়ে টেকচাঁদকে অবিলম্বে নেভিলের কাছে তার পাঠিয়ে তাদের সকলের জন্য ক্ষমার আবেদন করতে হবে।

২। এই মামলাগুলি যাতে রাজকীয় ঘোষণার আওতায় আসে, তার জন্য ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান সমস্ত জায়গায়, পাঞ্জাবের প্রতিটি শহরে এবং অমৃতসরের প্রতিটি মহল্লায় জনসভার অনুষ্ঠান করতে হবে। সেই সঙ্গে অমৃতসরের সভাগুলিতে এই মর্মে প্রস্তাব গ্রহণ করতে হবে যে বুগা ও রতনচাঁদ নির্দোষ।

এটা বলা সহজ, করা কঠিন। কিন্তু একটা চেষ্টা করতেই হবে। গান্ধীজীর সঙ্গে পরামর্শ করে নেওয়া উচিত, কিন্তু নষ্ট করবার মত সময় আমাদের হাতে নেই। আইনের পথে শেষ অবলম্বন ঘুচে যাবার পর অতি দ্রুত মৃত্যুদণ্ড আসে। কাতারপুরের ফাঁসির ঘটনা থেকেই তা বুঝতে পারা গিয়েছে।

৩। ১ আর ২ নং উপায় যদি ব্যর্থ হয়, তাহলে? এ-ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট কয়েকটা কথা আমি ভেবে রেখেছি, কিন্তু ১ আর ২ নং উপায়ের ফলাফল না জানা পর্যন্ত সে-কথা খুলে বলতে আমি ইচ্ছুক নই।

আমার মনে হয়, তোমাদের জেলা-সম্মেলনে আমার যোগ দেওয়া উচিত। তার জন্য যদি হরিজীকে ছেঁটে দিতে হয়, তবু। সে ত সত্যিই আমাকে চায় না এবং আমিও ত সত্যিই তার টাকা চাইনে। সুতরাং এর মধ্যে আর কোনও অসুবিধে নেই। আর দু দিন সময় আছে। তার মধ্যেই ভেবেচিন্তে আমাকে মনঃস্থির করতে হবে। ভালবাসা জানাই।

বাবা

৪ মোতিলাল নেহরু কর্তৃক লিখিত

১৯২০ সনের ২৭ ফেব্রুয়ারি তারিখে মোতিলাল নেহরু আরা থেকে জওহরলালকে এক চিঠি লেখেন। তারই একাংশ এখানে উধৃত হল।

গান্ধীজীর রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী সম্পর্কে আমার বক্তব্য এই যে গান্ধীজীকে আমি যতই শ্রদ্ধা করি না কেন, তিনি বলেছেন বলেই যে তা গ্রহণ করতে হবে, এ-কথা মানতে আমি প্রস্তুত নই। ইতিমধ্যেই আমি দাশকে সতর্ক করে দিয়েছি যে বড় রকমের একটা বিরোধের জন্য আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে। শাস্ত্রীর সঙ্গে আলোচনার জন্য গান্ধীজী যে দিল্লি গিয়েছিলেন, তিনি যে মালব্যের সঙ্গে এত মিশছেন এবং মালব্যের সঙ্গে যে তাঁর একটা মোটামুটি মতৈক্য হয়ে গেয়েছে, আমাদের পার্টির পক্ষে এটা মোটেই শুভ লক্ষণ নয়। শুভ লক্ষণ গান্ধীজীর পক্ষেও নয়। জনপ্রিয়তার উপরে কেউ-কেউ বড্ড বেশী নির্ভর করে থাকেন। মিসেস বেসাণ্টকে এখন তার মূল্য দিতে হচ্ছে। আরও অনেককে দিতে হয়েছে। গান্ধীজীও যদি এই একই পথের পথিক হন, আমার পক্ষে সেটা অত্যন্তই দুঃখের হবে। অবস্থা এখন যে-রকম, তাতে রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে কারও সঙ্গে কলহ করবার অধিকার আমার নেই। গান্ধীজী এবং মালব্যের মত প্রখ্যাত ব্যক্তির সঙ্গে ত নেই-ই। কিন্তু দেশ এখন যে-পথে আত্মগঠন করতে চলেছে, সে-বিষয়ে আমি চোখ বুজে থাকতে পারি না। কর্তৃপক্ষ অথবা মডারেটদের সঙ্গে যদি আপোষ করবার কোনও চেষ্টা করা হয়, তাহলে সে-চেষ্টা যিনিই করুন না কেন, তার পরিনামে বিপর্যয় ঘটবে। অবস্থা সম্পর্কে এই হল আমার অভিমত।

৫ মোতিলাল নেহরু কর্তৃক লিখিত

আরা, ২৯, ফেব্রুয়ারি, ১৯২০

প্রিয় জওহর,

হরকিষেণলাল আজ সকালে এসে পৌঁছেছেন। আজ রাত ৮টায় প্যাসেঞ্জার-গাড়িতে তিনি এলাহাবাদ রওনা হবেন। ইন্দিরা ভাল আছে, এবং কাল সকালে তুমি বোম্বাই রওনা হচ্ছ, এই খবর জানিয়ে তুমি যে তার করেছ, তা এইমাত্র পেলাম। আমিও তারযোগে তোমাকে জানিয়েছি যে, হরকিষেণলাল আগামীকাল ভোরে পৌঁছবেন এবং কয়েক ঘণ্টা ওখানে থাকবেন। এক্সপ্রেস-গাড়িতে তিনি দিল্লি যাচ্ছেন। তাঁরই হাতে এই চিঠি দিলাম।

আজ সকালে প্রাতঃরাশ খেতে দেরি হয়ে গিয়েছিল। প্রাতঃরাশ খেতে খেতে এবং তারও পরে হরকিষেণলাল, দাশ আর আমার মধ্যে পাঞ্জাবের বিভিন্ন ঘটনা এবং সাধারণভাবে রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে অনেক কথা হল। আমরা কী কী সিদ্ধান্ত করেছি, হরকিষেণলাল তা তোমাকে জানাবেন। তাঁকে একবার ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট অফিসে নিয়ে যেও। সেখানে যে কীরকম বিশৃঙ্খলা চলছে, তা তিনি নিজে দেখে বুঝে যান। তিনি আমাকে কথা দিয়েছেন, লাহোরে পৌঁছেই তিনি জনকয়েক লোক পাঠিয়ে দেবেন।

বোম্বাইতে তুমি কতদিন থাকবে, তা আমি জানি না। আমার ইচ্ছে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তুমি ফিরে এস। বোম্বাইএর মামলায় বাদী-পক্ষকে যে-সব বিবরণ পাঠাবার কথা ছিল, সে-বিষয়ে তুমি কিছু করেছ কি? যদি না করে থাক, তাহলে তুমি নিজেই তার ব্যবস্থা করে দিও।

রাজনীতিক্ষেত্রে গান্ধীজী তাঁর নিজের ভূমিকা সম্পর্কে একটা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত ঘোষণা করতে চলেছেন। এ-বিষয়ে আমি আগেই তোমাকে লিখেছি।

আমি যা বলেছি, দাশ তাতে আমার সঙ্গে একমত। আজ সকালে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে এই বিষয়েও আমাদের আলোচনা হল। এটা এখন মোটামুটি বুঝতে পারা যাচ্ছে যে, গান্ধীজী যে-মনোভাব অবলম্বন করতে চলেছেন, কংগ্রেসের সঙ্গে তার পুরো মিল হবে না। আমাদের একমাত্র অনুযোগ এই যে, শাস্ত্রী আর মালব্যকে যে-ক্ষেত্রে স্পষ্টতই তিনি তাঁর মনের কথা জানিয়েছেন, সে-ক্ষেত্রে আমাদের তিনি কিছু জানালেন না। যাই হক, নতুন আলোকের প্রতীক্ষাতেই আমরা থাকব। তারপর সেই আলোতেই পথ চিনে চলব কিনা, সেটা আমাদের ভেবে দেখতে হবে। এর আগে এ-বিষয়ে যখন তোমাকে লিখি, তখন এই ছিল আমার সিদ্ধান্ত। আজ সকাল দাশকে এ-কথা বলতে তিনি আমার সঙ্গে একমত হলেন। কিন্তু সেইসঙ্গে বিশেষভাবে তোমাকে জানাতে বললেন যে, এ নিয়ে প্রথমে তাঁর মনে অসন্তোষ দানা বাঁধেনি, এখন আমার অসন্তোষ তাঁর মনে সঞ্চারিত হয়েছে মাত্র। তাঁর ধারণা, গান্ধীজীর কাছে গিয়ে তাঁর নামে লাগান হচ্ছে, এবং এই কারণেই তিনি বিশেষভাবে কথাটা তোমাকে জানাতে বললেন।

ভালবাসা জানাই। বাবা

৬ এম. এল. ওক্‌সকে লিখিত

[৬নং থেকে ১৪নং চিঠি—মুসৌরিতে আমার উপর যে বহিষ্কার-আদেশ জারী করা হয়, এই চিঠিগুলি সেই সম্পর্কে লিখিত। এই সর্বপ্রথম আমার উপর অনুরূপ আদেশ জারী করা হল।]

স্যাভয় হোটেল, মুসৌরি,
১৪ মে, ১৯২০

প্রিয় মিঃ ওক্‌স,

আজ সকালে আমাদের মধ্যে যে কথাবার্তা হয়েছে, সে-বিষয়ে আমি ভালভাবে চিন্তা করে দেখলাম। মুসৌরিতে এখন যে আফগান প্রতিনিধিদল রয়েছেন, তাঁদের সঙ্গে আমি দেখা করব না বা কোনও যোগাযোগ রাখব না বলে সরকার আমার কাছে যে "নির্দিষ্ট প্রতিশ্রুতি" চাইছেন, সে-বিষয়েও আমি ভেবে দেখেছি। দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, এ সম্পর্কে আমার মনোভাব পালটান আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

আপনি জানেন, আমার স্ত্রীর অসুস্থতার দরুনই আমি আমার মা, স্ত্রী ও বোনদের নিয়ে মুসৌরিতে এসেছিলাম। আমার বাবা যতদিন না মুসৌরিতে আসার অবসর পাচ্ছেন, ততদিন পর্যন্ত এখানে আমার পরিবারের সঙ্গে থাকাই ছিল আমার উদ্দেশ্য। আফগান প্রতিনিধিদলের সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্ক নেই; আমরা যে একই হোটেলে এসে উঠেছি, সেটা একটা আকস্মিক ব্যাপার মাত্র। বস্তুত তাঁরা এখানে থাকায় আমি একটু অসুবিধাতেই পড়েছি। তার কারণ, যে ঘরগুলি আমি পাব বলে আশা করছিলাম, তাঁরা এখানে সেই ঘরগুলিই নিয়েছেন। প্রতিনিধি-দলের কার্যকলাপ সম্পর্কে অবশ্যই আমার আগ্রহ আছে, বুদ্ধিমান ব্যক্তিমাত্রেরই এ-আগ্রহ থাকবে; তবে গায়ে পড়ে তাঁদের সঙ্গে দেখা করবার বিন্দুমাত্র উদ্দেশ্য আমার ছিল না। এখনও নেই। আপনিও আজ সকালে আমাকে বলেছেন যে তা আপনি জানেন।

কিন্তু আফগানদের সঙ্গে দেখা করবার বা তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখবার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে না থাকলেও, সরকারের নির্দেশে আমাকে আমার কার্যকলাপ সম্পর্কে একটা প্রতিশ্রুতিতে বাঁধা পড়তে হবে, এ-প্রস্তাব আমার অত্যন্তই খারাপ লাগছে। প্রতিশ্রুতি দিলে হয়ত আমার কোনও অসুবিধেই হবে না, তবুও খারাপ লাগছে।

আসলে এটা নীতি বা বিবেকের প্রশ্ন। আমি জানি যে আমার অবস্থাটা আপনি বুঝতে পারবেন। দুঃখের সঙ্গে তাই আপনাকে জানাচ্ছি, আপনি আমাকে যে সৌজন্যপূর্ণ পরামর্শ দিয়েছেন তদনুযায়ী সরকারকে কোনও প্রতিশ্রুতি দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

সরকার যদি আমার উপরে আদেশ জারী করতে চান, তাহলে, আপাততঃ, সে-আদেশ মান্য করতে আমি প্রস্তুত আছি। আমার পরিবারবর্গকে এখানে একা ফেলে রেখে যদি হঠাৎ আমাকে মুসৌরি ত্যাগ করতে হয়, তাতে আমার খুবই অসুবিধে হবে। আমার স্ত্রীর স্বাস্থ্য এখন যেরকম, তাতে তাঁর উপরে অত্যন্তই সতর্ক দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন, আর আমার মাও পঙ্গু। এইরকম অসহায় অবস্থায় তাঁদের ফেলে রেখে যাওয়াটা খুবই শক্ত হবে। আমি যদি হঠাৎ চলে যাই, তাহলে আমার বাবার ও আমার কার্যসূচী সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হবে, এবং আমাদের অসুবিধে ও উদ্বেগের সীমা থাকবে না। তবে গুরুতর রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে ব্যক্তিবিশেষের সুবিধের কথা ভেবে কাজ করা সম্ভব নয় বলেই বিবেচনা করি।

ভবদীয়,
জওহরলাল নেহরু

এম. এল. ওক্‌স, এস্কোয়ার,
সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অব পুলিস; হার্মিটেজ লজ, মুসৌরি

৭ জি. এফ. অ্যাডাম্‌সকে লিখিত

স্যাভয় হোটেল, মুসৌরি,
১৫ মে, ১৯২০

প্রিয় মিঃ অ্যাডাম্‌স,

বিষয়টি আমি আবার ভালভাবে বিবেচনা করে দেখেছি, এবং দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে সরকার আমার কাছে যে প্রতিশ্রুতি চান, তা দিতে আমি অক্ষম। এমতাবস্থায় সরকার যদি আমাকে মুসৌরি ত্যাগের আদেশ দেন, তাহলে মুসৌরি ছাড়তেও আমি প্রস্তুত আছি। প্রথমে ভেবেছিলাম আপনার পরামর্শ অনুযায়ী সরকারের লিখিত আদেশ ব্যতিরেকেই আপন ইচ্ছায় আমি চলে যাব, কিন্তু বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করে এখন মনে হচ্ছে সেটা ঠিক হবে না। সুতরাং আনুষ্ঠানিক আদেশের প্রতীক্ষাই আমি করব।

ভবদীয়
জওহরলাল নেহরু

জি. এফ. অ্যাডাম্‌স, এস্কোয়ার, আই. সি. এস.,
ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট, দি মনাস্টারি, মুসৌরি

৮ আদেশপত্র

স্থানীয় সরকারের বিবেচনায় যেহেতু ইহা বিশ্বাস করিবার যুক্তিসঙ্গত কারণ রহিয়াছে যে এলাহাবাদের জওহরলাল নেহরু জনসাধারণের নিরাপত্তা ক্ষুণ্ণ হইতে পারে এইরূপভাবে কাজ করিতেছেন অথবা কাজ করিতে উদ্যত হইয়াছেন, সুতরাং যুক্তপ্রদেশের লেফটেন্যাণ্ট-গবর্নর তাঁহার উপরে ১৯১৫ সনের ভারতরক্ষা (সংহতি) বিধির ৩নং বিধি অনুসারে অর্পিত ক্ষমতাবলে এইরূপ নির্দেশ দিতেছেন যে, এলাহাবাদের উক্ত জওহরলাল নেহরু যুক্তপ্রদেশের অন্তর্গত দেরাদুন জিলার সীমানার মধ্যে কোনও অঞ্চলে প্রবেশ বা বসবাস বা অবস্থান করিবেন না, এবং

উক্ত জওহরলাল নেহরুকে এই বলিয়া সতর্ক করিয়া দেওয়া যাইতেছে যে তিনি যদি জ্ঞাতসারে এই আদেশপত্রের অন্তর্ভুক্ত নির্দেশ অমান্য করেন তাহা হইলে তিনি ১৯১৫ সনের ভারতরক্ষা (সংহতি) বিধির ৫নং বিধির (১) উপধারা অনুসারে দণ্ডনীয় সাব্যস্ত হইবেন। উক্ত উপধারার একটি অনুলিপি এই আদেশপত্রের সহিত প্রেরণ করা হইল।

এম. কীন
যুক্ত প্রদেশ সরকারের প্রধান সচিব

তাং নৈনিতাল, মে, ১৯২০

শ্রীজে. এল. নেহরু অদ্যই দেরাদন জিলা পরিত্যাগ করিবেন। দুনের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের আদেশ।

এম. এল. ওক্‌স
এস. পি. দেরাদুন; ১৬-৫-২০

৯ মোতিলাল নেহরু কর্তৃক সার হারকর্ট বাটলারকে লিখিত

বারাণসী, ১৯ মে, ১৯২০

প্রিয় সার হারকর্ট,

গতকাল আমার ছেলের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে। স্থানীয় সরকারের আদেশ-ক্রমে কী অবস্থায় তাকে দেরাদুন থেকে বহিষ্কৃত করা হয়েছে, তার কাছে তা শুনলাম। তার কাছে যে প্রতিশ্রুতি চাওয়া হয়েছিল, তা দিতে অস্বীকার করে মিঃ এল. এম. ওক্‌সকে সে যে চিঠি (চিঠির অনুলিপি এইসঙ্গে দেওয়া হল) লেখে, তাতেই সে তার অবস্থা পুরোপুরি বুঝিয়ে বলেছিল। তার বেশী আর কোনও সংবাদ সে আমাকে দিতে পারেনি।

তার উপরে যে আদেশ জারী করা হয়, তার ফলে অকস্মাৎ তাকে মুসৌরি ছেড়ে চলে আসতে হয়েছে। পরিবারের মহিলাদের জন্য কোনও সন্তোষজনক ব্যবস্থা সে করে আসতে পারেনি। মহিলাদের মধ্যে দুজনের (আমার স্ত্রী ও আমার পুত্রবধূ) স্বাস্থ্য খারাপ যাচ্ছে। অবিলম্বে চেঞ্জের জন্য তাঁদের পাহাড়ে পাঠাবার দরকার হওয়ায় উপযুক্ত কয়েকটি ঘরের জন্য শার্লভিল ও স্যাভয় হোটেলে তার করা হয়। প্রথমোক্ত হোটেলটি আমাদের পছন্দমত ঘর দিতে পারেনি। দ্বিতীয় হোটেলটি যে-জায়গা দিতে পারবে বলে জানায়, তা আমাদের প্রয়োজনানুরূপ না হলেও তার প্রায় কাছাকাছি। সেইসঙ্গে আমাদের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় যে ভারত সরকার উক্ত হোটেলে যে-কটি ব্লক দখল করে আছেন, পরে সেগুলি ছেড়ে দেওয়া হলেই আমাদের আরও ভাল জায়গা দেওয়া হবে। পূর্ব-অভিজ্ঞতায় আমরা বুঝেছি, ঘরকন্নার চিন্তা থেকে মুক্তি দিয়ে বাড়ির মহিলাদের যদি হোটেলে রাখা যায়, তাহলে চেঞ্জে গিয়ে তাঁদের আরও বেশী সুফল পাবার সম্ভাবনা। এই কারণেই প্রভূত অর্থব্যয় করে হোটেলের ঘর কখানা আমরা নিয়ে নিয়েছিলাম।

বছরের প্রথম থেকেই আমি আরার ডুমরাঁও মামলায় নিযুক্ত আছি। হাইকোর্টে গিয়ে জওহরলালকে তার নিজের কাজের উপরে আমার কাজেরও দেখাশোনা করতে হচ্ছিল। এই দুই কাজই ছেড়ে দিয়ে বাড়ির মহিলাদের সঙ্গে যে তাকে পাহাড়ে যেতে হয়, তাতে কম ত্যাগ স্বীকার করতে হয়নি। নানারকম বন্দোবস্ত করতে সে যখন ব্যস্ত, তখনই কিনা "রাষ্ট্রীয় কারণে" আমাদের পারিবারিক শান্তি সহসা বিঘ্নিত হল। পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট যেদিন সকালে প্রথম তার সঙ্গে দেখা করতে যান, সেইদিনই সকালে সে তার ছোট্ট বোনকে ইস্কুলে দিয়ে এসেছে। জওহরলালের

ব্যবহারের জন্য এলাহাবাদ থেকে তাকে কয়েকটি ছোট ঘোড়া পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। আদেশ জারী হবার পর সে যখন সমতলে নেমে আসছে, তখন পথিমধ্যে সেই ঘোড়াগুলি সে দেখতে পায়। ঘোড়াগুলি তখন মুসৌরির দিকে উঠছে।

এই অবস্থাতেই "স্থানীয় সরকারের বিবেচনায় ইহা বিশ্বাস করিবার যুক্তিসঙ্গত কারণ রহিয়াছে যে এলাহাবাদের জওহরলাল নেহরু জনসাধারণের নিরাপত্তা ক্ষুণ্ণ হইতে পারে এইরূপভাবে কাজ করিতেছেন অথবা কাজ করিতে উদ্যত হইয়াছেন।" পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্টের সঙ্গে জওহরলালের যে কথাবার্তা হয়, তাতে মনে করা যেতে পারে যে যে-কাজ করবার কথা জওহরলাল কখনও স্বপ্নেও ভাবেনি সেই কাজই করবে না বলে মাথা হেঁট করে সে যদি একটা "নির্দিষ্ট প্রতিশ্রুতি" দান করত, "যুক্তিসঙ্গত কারণ"ও তাহলে বিলীন হয়ে যেত। বলা বাহুল্য, জওহরলাল যা করেছে, তা আমি সম্পূর্ণ অনুমোদন করি। আসলে তার সামনে এই একটাই পথ খোলা ছিল। তার এবং আমার রাজনীতির কথা সকলেই জানেন। এ-ব্যাপারে আমরা কখনও কিছু গোপন করিনি। যে ধরনের রাজনীতিকে সরকার প্রীতির চোখে দেখে থাকেন, আমাদের রাজনীতি সে-ধরনের নয়। তার ফলে যে-কোনও অসুবিধেরই সৃষ্টি হক না কেন, তা আমরা সহ্য করতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু যে-সব নীতিকে আমরা আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেছি, এবং যার জন্য আমরা দুঃখবরণে প্রস্তুত, জওহরলালের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। বয়সে তরুণ হলেও সারা ভারতবর্ষে জওহরলাল আজ পরিচিত, এবং নিশ্চিতভাবেই এ-কথা আমি বলতে পারি, জওহরলালের ক্ষেত্রে যে-ধরনের গুপ্ত চক্রান্ত আশঙ্কা করা হয়েছে, সে-রকমের কোনও কাজে লিপ্ত থাকা যে তার পক্ষে সম্ভব, একমাত্র সি. আই. ডি.র লোক ছাড়া আর কেউই এ-কথা বিশ্বাস করবে না। আপনার সঙ্গেও তার দীর্ঘ আলোচনা হয়েছে। লোকচরিত্র সম্বন্ধে আপনার জ্ঞান যে কত ব্যাপক ও বিচিত্র তা আমি জানি। জানি বলেই বলছি, জওহরলাল যে-ধাতুতে তৈরী, তাতে আপনার মনে কোনও সন্দেহের উদ্রেক হতে পারে বলে আমি বিশ্বাস করতে পারছি না। এই কারণেই আমার ধারণা, দুটি ব্যাপারের একটি হয়ত ঘটে থাকবে : হয় ভ্রমক্রমে অথবা অনবধানবশত, আর না হয়ত উপর থেকে চাপ আসবার ফলে এই আদেশ জারী করা হয়েছে। এ দুয়ের কোনওটিই যদি সত্য না হয়, তাহলে এই দুঃখদায়ক সিদ্ধান্তই আমাকে করতে হবে যে অবস্থাকে উত্যক্ত না করবার যে-নীতি আপনার সরকার এতদিন অনুসরণ করে এসেছেন, সেই নীতির এখন পরিবর্তন ঘটছে।

ত্রিশ বছরেরও অধিক কাল যাবৎ পরস্পরকে আমরা চিনি। কোনও কিছু গোপন না রেখে খোলাখুলি ভাবে নিজের মনোভাব ব্যক্ত করাই আমি সঙ্গত বলে বিবেচনা করেছি। স্থানীয় সরকার ভালভাবে ভেবেচিন্তে এই আদেশ জারী করেছেন কিনা, এবং তা যদি করে থাকেন তাহলে কী কারণে করেছেন, শুধু এইটুকু আমি জানতে চাই। আপনি যদি দয়া করে এই খবরটা আমাকে জানাবার নির্দেশ দেন, তাহলে কৃতজ্ঞ থাকব।

দু-এক দিনের মধ্যেই আমি বারাণসী ত্যাগ করব। অতঃপর আমার ঠিকানা হবে : আরা (বিহার)।

ভবদীয়
মোতিলাল নেহরু

হিজ অনার সার হারকর্ট বাটলার,
লেফটেন্যান্ট গবর্নর, ইউনাইটেড প্রভিন্সেস, নৈনিতাল

১০ স্যার হারকর্ট বাটলার কর্তৃক মোতিলাল নেহরুকে লিখিত

লেফটেন্যাণ্ট গবর্নর্স ক্যাম্প,
ইউনাইটেড প্রভিন্সেস, এলাহাবাদ,
২৬ মে, ১৯২০

প্রিয় মিঃ মোতিলাল নেহরু,

আপনার ১৯ মে তারিখের চিঠি সবেমাত্র আজই এলাহাবাদে পেলাম। আপনি যেরকম খোলাখুলিভাবে লিখেছেন, আমিও সেই রকম খোলাখুলিভাবেই দ্রুত আপনার চিঠির জবাব দিতে বসেছি।

নীতির কোনও পরিবর্তন ঘটেছে বলে আমি জানি না। আপনার ছেলের কাছে যে-প্রতিশ্রুতি চাওয়া হয়েছিল, তা দিলে যে কী করে তাঁর মাথা হেঁট হত, তাও আমি বুঝতে পারছি না। আসলে এ-ব্যাপারে আমাদের মধ্যে মতের অনৈক্য রয়েছে। তবে দয়া করে বিশ্বাস করুন যে সরকারী ব্যবস্থার ফলে আপনার ও আপনার ছেলের, বিশেষ করে আপনার পরিবারের মহিলাদের অসুবিধা ঘটেছে বলে আমি সত্যিই খুব দুঃখিত। বিবেকের কারণে আপনার ছেলে এই সরকারী ব্যবস্থা মেনে নেননি, তবে আমার বিবেচনায় এই ব্যবস্থাকে অন্যভাবেও গ্রহণ করা চলত, এবং ভাবা যেত যে এ-ব্যবস্থায় আসলে তাঁর প্রতি আস্থাই জ্ঞাপন করা হয়েছে। আশঙ্কা করি এ-চিঠি আপনার প্রকৃত সন্তুষ্টিবিধান করতে পারবে না, তবে আশা করি আপনি বিশ্বাস করবেন যে বহিজীবনে আমাদের মতামত যা-ই হোক না কেন, ব্যক্তিগত জীবনে গত তিরিশ বছর যাবৎ আমাদের মধ্যে যে বন্ধুত্বের সম্পর্ক রয়েছে, কোন মতে তা ক্ষুণ্ণ হবে না বলেই আমি মনে করি।

ভবদীয়
হারকর্ট বাটলার

দি অনারেব্‌ল পণ্ডিত মোতিলাল নেহরু,
আরা, বিহার

১১ মোতিলাল নেহরু কর্তৃক লিখিত

[১৯২০ সনের ৩ জুন তারিখে মোতিলাল নেহরু আরা থেকে জওহরলালকে একটি চিঠি লিখেছিলেন তার একাংশ এখানে উধৃত হল।]

তোমার বহিষ্কার-আদেশ-লঙ্ঘন-পরিকল্পনার আমি সম্পূর্ণ বিরোধী। অবশ্য এর প্রয়োজনীয়তা যদি আত্যন্তিক হত, তাহলে এর পরিণামের কথা আমি চিন্তা করতাম না। তবে এ-পর্যন্ত তুমি যা করেছ তা এতই ত্রুটিহীন যে এর আর জের টানবার দরকার নেই। এ-কথা আমি কালও তোমাকে বলেছি। লাজপত রায় এ-ব্যাপারে আমার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত। গত ছ মাসে আমরা অনেক অত্যাচার সহ্য করেছি, এখন একটা উত্তেজনাকর কাজ করে আবার নতুন কোনও বিপত্তি ডেকে আনতে চাই না। জনজীবন এবং ব্যক্তিজীবন, যে দিক থেকেই দেখা হোক না কেন, এর পরিণাম এতই অবিসংবাদী যে তা নিয়ে আলোচনার কোনও প্রয়োজন আমাদের নেই। এর ফলে আমাদের পারিবারিক জীবন চূড়ান্তভাবে ভেঙে পড়বে এবং জনজীবন, ব্যক্তিগত জীবন এবং কর্মজীবনের কাজকর্মও বিপর্যস্ত হবে। একটা থেকে আর-একটা বিপত্তির সৃষ্টি হবে, এবং শেষ পর্যন্ত নিশ্চয়ই এমন একটা অবস্থার উদ্ভব হবে যে আমিও তোমার সঙ্গে কারাগারে গিয়ে প্রবেশ করতে বাধ্য হব। অথবা এই রকমেরই কিছু একটা ঘটবে। অবস্থাকে আমি এখন ঘাঁটাতে চাই না। এ-পর্যন্ত নিশ্চয়ই আমরা অনেকখানি সফল হয়েছি, এবং নূতনতর ঘটনা-পরিবেশের জন্য এখন অপেক্ষা করাই আমাদের পক্ষে সঙ্গত হবে।

১২ মোতিলাল নেহরু কর্তৃক সার হারকর্ট বাটলারকে লিখিত

কলিকাতা, ৮ জুন, ১৯২০

প্রিয় সার হারকর্ট

আপনার ২৬ মে তারিখের পত্রের প্রাপ্তি-স্বীকার করতে যে বিলম্ব ঘটল, তার জন্য ক্ষমা করবেন। আপনার পত্র যখন পাই, বারাণসী ও এলাহাবাদের সভায় যোগদানের জন্য তখন আমি আরা থেকে রওনা হচ্ছি। সেখান থেকে আরায় ফিরে আবার প্রায় তৎক্ষণাৎ আমাকে কলিকাতা যাত্রা করতে হয়।

আমার ও আমার পরিবারবর্গের প্রতি আপনার সহানুভূতির যে সদয় প্রকাশ ঘটেছে, এবং বহির্জীবনে আমাদের মতের পার্থক্য ঘটলেও আমাদের ব্যক্তিগত সম্পর্ক তাতে ক্ষুণ্ণ হবে না বলে আপনি যে আশ্বাস দিয়েছেন, তাতে বাধিত হলাম। তবে একজন সম্মানীয় ভদ্রলোকের কাছে যদি এই প্রতিশ্রুতি দাবি করা হয় যে একটি ভিন্ন রাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের সঙ্গে তিনি কোনও গুপ্ত চক্রান্তে লিপ্ত হবেন না, তাতে সেই ভদ্রলোকের প্রতি তাঁর আপন সরকারের আস্থা যে কী করে ব্যক্ত হয়, তা আমি বুঝে উঠতে পারলাম না; দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে এ-ব্যাপারে আপনার কথা আমি মেনে নিতে পারিনি।

আমার ছেলের বিরুদ্ধে যে ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে, তার আদৌ কোনও হেতু ছিল কিনা, থাকলে সেটা কী, শুধুমাত্র এইটুকু জানবার জন্যই আপনাকে আমি চিঠি লিখেছিলাম। সেই সঙ্গে জানিয়েছিলাম যে, আপনার সরকার এ-যাবৎ যে-নীতি অনুসরণ করে এসেছেন, এই ব্যবস্থার ফলে তার একটা পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। আমি যা জানতে চেয়েছিলাম, আপনার চিঠিতে তার কোনও উল্লেখ নেই। আর নীতির ব্যাপারে দেখছি, নীতিগত কোনও পরিবর্তনের কথা আপনি অবগত নন। সুতরাং আদেশের ঔচিত্য-অনৌচিত্য নিয়ে আর-কিছু আমার বলার নেই। তবে এই আদেশের ফলে আমরা এখন কী অবস্থায় পড়েছি, সেটা আপনাকে জানান উচিত বলে মনে করি।

বাড়ির মেয়েরা এখন মুসৌরিতে রয়েছেন, অথচ বাড়ির পুরুষ কেউ তাঁদের কাছে নেই। মহিলাদের মধ্যে দুজনের স্বাস্থ্য খুবই খারাপ, এবং এখানে এখন যে দারুণ গরম পড়েছে, তাতে তাঁদের সমতলে নিয়ে আসার কোনও প্রশ্নই উঠতে পারে না। সিভিল সার্জন এখন তাঁদের দেখাশোনা করছেন। বর্ষা নামা পর্যন্ত তাঁদের স্বাস্থ্য যদি ভাল থাকে, তাহলে তাঁরা এলাহাবাদে ফিরে আসবেন। কিন্তু রোগিণী দুজনের কারও অবস্থার যদি অবনতি ঘটে, এবং তার ফলে জওহরলালের যদি মুসৌরি যাবার প্রয়োজন দেখা দেয়, তাহলে তার উপরে যে-আদেশ জারী করা হয়েছে, সেই আদেশও জওহরলালকে তার কর্তব্য পালনে নিবৃত্ত করতে পারবে না; রুগ্ণা মা অথবা স্ত্রীর পাশে গিয়ে দাঁড়াবার জন্য সে তার যথাসাধ্য চেষ্টা করবেই। তার কাছে যে প্রতিশ্রুতি চাওয়া হয়েছে, তা দিয়ে সে তার সম্মান খোয়াতে পারবে না, সুতরাং অনন্যোপায় হয়ে স্থানীয় সরকারের আদেশ লঙ্ঘন করে সে মুসৌরি যাত্রা করবে। আদেশ লঙ্ঘন না করে তার মা অথবা স্ত্রীর কাছে যাবার উপায় নেই; লঙ্ঘন করা সত্ত্বেও সে হয়ত তাঁদের কাছে গিয়ে পৌঁছতে পারবে না: কিন্তু সেক্ষেত্রে এইটুকু সান্ত্বনা তার থাকবে যে তার কর্তব্য সে করেছে, এবং এইটুকুই সে চায়। তেমন অবস্থা যদি দেখা দেয়, তাহলে কর্তৃপক্ষ যাতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারেন, তার জন্য আগে থাকতেই সে নিষিদ্ধ অঞ্চলে তার প্রবেশের ইচ্ছার কথা আপনাকে এবং দেরাদুনের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে জানিয়ে দেবে।

ব্যাপারটির সমস্ত সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে আমার সঙ্গে আলোচনা করবার পর

তবেই জওহরলাল এই পথ গ্রহণে সম্মত হয়েছে। এ-অবস্থায় অন্য কোনও পথ গ্রহণ সম্ভব নয় বলেই আমি মনে করি। এ-যাবৎ যে সে সব কিছু মেনে নিয়েছে, তার কারণ, মেনে না নিলে নানাভাবে ঝঞ্ঝাট আর অর্থব্যয় হতে পারত। কিন্তু এ আমি চাই না যে নীতির প্রশ্নে সে নতিস্বীকার করুক। করবে বলে আমি মনেও করি না। সরকারী ব্যবস্থার ফলে মুসৌরির দল ভেঙে যাওয়ায় মহিলারা খুবই অসুবিধায় পড়বেন। তাঁদের স্বাস্থ্যও এর ফলে সংকটাপন্ন হতে পারে। আবার ইতিমধ্যেই যে বিরাট ব্যয়ভার আমাদের বহন করতে হয়েছে তারও কোনও ফল আমরা পাব না। এ-সবই আমরা সহ্য করতে পারি। কিন্তু আপনার প্রতি উপযুক্ত সম্মান সত্ত্বেও যে-আদেশকে আমরা অন্যায় এবং অসমর্থনীয় বলে মনে করি, তাকে অমান্য করা ছাড়া আর-কোনও সম্মানজনক পথ যখন আমাদের সামনে খোলা নেই, সে-আদেশকে তখন আমরা মান্য করতে পারি না।

সময়াভাবে আমি এলাহাবাদে চিঠি লিখতে পারিনি। কিন্তু উপরে যে-সব কথা বলেছি, তাতে আমার মনোভাব ত বটেই, জওহরলালের মনোভাবও যথাযথভাবে ব্যক্ত হয়েছে বলেই আমি বিশ্বাস করি। তবে নিশ্চিত হবার জন্য এ-চিঠি আমি তার কাছে পাঠালাম। তাকে অনুরোধ জানালাম, তার যদি সম্মতি থাকে, তবেই এ-চিঠি সে এলাহাবাদে পোস্ট করবে।

আরা মামলায় কমিশনক্রমে কয়েকজনের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হচ্ছে। মনে হয়, এই নিয়ে আরও সপ্তাহখানেক আমাকে ব্যস্ত থাকতে হবে।

ভবদীয়
মোতিলাল নেহরু

হিজ অনার সার হারকর্ট বাটলার, কে. সি. এস. আই.,
লেফটেন্যাণ্ট গভর্ণর, ইউনাইটেড প্রভিন্সেস

১৩ সার হারকর্ট বাটলার কর্তৃক মোতিলাল নেহরুকে লিখিত

নৈনিতাল, ১৫ জুন, ১৯২০

প্রিয় মিঃ মোতিলাল নেহরু,

আপনার ৮ তারিখের পত্র আমি পেয়েছি। মহিলাদের স্বাস্থ্যের বিষয়ে আপনি যা লিখেছেন, সে কথা বিবেচনা করে দুনের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে আমি আদেশ পাঠিয়েছি যে মহিলাদের দেখা শুনো করবার জন্যে জওহরলাল যদি মুসৌরিতে প্রত্যাবর্তন করেন, তাঁর তাতে আপত্তি করবার প্রয়োজন নেই।

ভবদীয়
হারকর্ট বাটলার

দি অনারেব্‌ল পণ্ডিত মোতিলাল নেহরু,
এলাহাবাদ

১৪ মোতিলাল নেহরু কর্তৃক সার হারকর্ট বাটলারকে লিখিত

জুন, ১৯২০

প্রিয় সার হারকর্ট,

জওহরলালের মুসৌরি প্রবেশ নিষিদ্ধ করে যে আদেশ জারী করা হয়েছিল, অনুগ্রহপূর্বক তা আপনি প্রত্যাহার করেছেন, এ-কথা জানিয়ে ১৫ জুন তারিখে আপনি যে চিঠি দিয়েছেন, তার জন্য ধন্যবাদ। অতঃপর যে-সব ঘটনা ঘটেছে, তাতে বলতে পারি, আদেশ প্রত্যাহারে আর দেরি হলে হয়ত খুবই দেরি হয়ে যেত। ১৪

তারিখে আমার স্ত্রী গুরুতররূপে অসুস্থ হয়ে পড়েন, এবং ১৮ তারিখে ডাঃ ডাউলারের সঙ্গে পরামর্শ করবার পর সিভিল সার্জন সিদ্ধান্ত করেন যে আমাকে এখানে উপস্থিত থাকতে বলা দরকার। কর্নেল বেয়ার্ডের টেলিগ্রাম যখন আমি পাই, সৌভাগ্যক্রমে জওহরলালও তখন আরাতে আমার কাছে উপস্থিত ছিল। আমরা দুজনেই ১৯ তারিখে রওনা হয়ে কাল এখানে এসে পৌঁছেছি।

হোটেলে এক পার্শী ভদ্রলোক ছিলেন। তাঁর ঘরগুলি আমাদের চাইতে ভাল। সেগুলি তিনি আমাদের ছেড়ে দিয়ে রোগিণীর জন্য দুজন ট্রেণ্ড নার্সের ব্যবস্থা করে দেন। সহানুভূতি ও সৌজন্যবশত তিনি এ-সব করেছেন। আমরা এসে দেখি, রোগিণী খুব দুর্বল হয়ে পড়লেও তাঁর সেবাযত্নের কোনও ত্রুটি হয়নি। চিকিৎসকদের মধ্যে আজ একবার পরামর্শ হবে। মেজর স্ট্রথি স্মীথও আমাদের সঙ্গে একই ট্রেনে এখানে এসেছেন। পরামর্শকালে তিনিও উপস্থিত থাকবেন। আরায় আমার মামলাকে আমি এক সংকটময় অবস্থায় ফেলে এসেছি। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, আবার আমাকে সেখানে ফিরে যেতে হবে। এখানকার ভার জওহরলালের হাতে দিয়ে কালই আমি ফিরতে পারব বলে আশা করছি।

ভবদীয়
মোতিলাল নেহরু

১৫ মোতিলাল নেহরু কর্তৃক লিখিত

[সামরিক আইনের আমলে পাঞ্জাবে যে-সব ঘটনা ঘটে, সে-বিষয়ে তদন্ত করবার জন্য একটি কমিটি নিয়োগ করা হয়। কমিটির নাম হাণ্টার কমিটি।]

আরা, ২৭ মে, ১৯২০

প্রিয় জওহর,

হাণ্টার কমিটির রিপোর্ট এবং সরকারী প্রস্তাবসমূহের এ. পি. কৃত সংক্ষিপ্তসার আমি সযত্নে পড়ে দেখেছি। দলিলগুলি অত্যন্তই বিস্ময়জনক। এখন আর সময় নষ্ট করা আমাদের উচিত হবে না। তোমাদের বার লাইব্রেরিতে অকস্মাৎ যে ন্যায়-বুদ্ধির বান ডেকেছে, তা নিয়ে তোমার মাথা ঘামাবার দরকার নেই। যে-ব্যক্তি অন্তত এখনকার মত তার সদস্যপদ ছেড়ে দিয়েছে, তাকে স্পর্শ করা আর এখন তাদের সাধ্য নয়। মনে হয়, তার সাম্প্রতিক সৌভাগ্য যে-মনোভাবের সৃষ্টি করেছে, ন্যায়বুদ্ধির সঙ্গে তার কোনও সম্পর্ক নেই। সে যা-ই হক, ২৯ তারিখে সকালে গান্ধীজী এসে পৌঁছবেন। মালব্যজী ইতিমধ্যেই বারাণসীতে এসে পৌঁছেছেন। বি. চক্রবর্তী এবং হাসান ইমামকে আমি তার করে দিয়েছি, তাঁরা যেন পাঞ্জাব মেলে রওনা হন। পাঞ্জাব মেল ২৯ তারিখ সকালে আরা দিয়ে যাবে। তখন আমি তাঁদের সঙ্গে যোগদান করব। তুমি যদি তোমার টু-সীটারে করে একটু তাড়াতাড়ি রওনা হও, তাহলে তুমি সময়মত বারাণসীতে পৌঁছে স্টেশন এসে আমাদের জন্য অপেক্ষা করতে পারবে। গুরুত্বপূর্ণ যা-কিছু কাজ, তা ২৯ তারিখে এবং ৩০ তারিখ সকালে সমাধা হবে।

প্রেস-টেলিগ্রামের আকারে আমার নির্দেশ আমি প্রধান-প্রধান কাগজগুলিতে পাঠিয়ে দিয়েছি। সমস্ত সদস্যকেই তাতে উপস্থিত থাকতে বলা হয়েছে। দাশ আমার সঙ্গে যেতে চেষ্টা করছেন। তাঁর পক্ষে সময়টা খুব অস্বস্তিকর বটে. তবু তিনি সভায় উপস্থিত থাকবেন। মামলায় আমাদের বক্তব্য কাল আমরা শেষ করছি। তিনি তাঁর বক্তব্য শুরু করবার আগে অল্প কয়েকদিনের বিরতি প্রার্থনা করবেন। গোপনে আমরা ঠিক করে নিয়েছি যে তাতে আমরা সম্মতি দান করব।

তুমি আমার সঙ্গে চক্রবর্তীর বাড়িতে এসে একটু অপেক্ষা করলে ভাল হয়,

তার কারণ অধিকাংশ সময় আমাদের একত্র থাকতে হবে। আমরা যেখানে থাকব, দাশ, চক্রবর্তী আর হাসান ইমাম, এ'দের সকলের সেখানে স্থান-সংকুলান হবে না। মিসেস জ্ঞানেন্দ্রকে আমি লিখে দিয়েছি যে তুমি আর আমি তাঁর বাড়িতেই থাকব। সেইসঙ্গে এও জানিয়েছি যে আমাদের বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে কেউ যদি অন্যত্র জায়গা না পান, তাহলে আমাদের ঘরে তাঁকে জায়গা দিলে তিনি আশা করি কিছু মনে করবেন না। আগে থাকতে সতর্ক করে রাখার জন্যই এটা জানালাম।

অমৃতসর চক্রান্ত মামলার গোটা ফাইলটা তুমি তোমার সঙ্গে করে নিয়ে এলে ভাল হয়। তবে আশঙ্কা করছি, ১৩ এপ্রিল তারিখে জালিয়ানওয়ালা বাগ সভায় যে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল সেটা ওখানে নেই। ব্যাপারটা সকলের নজর এড়িয়ে যাবার কথা নয়। লাহোরে লীগ্যাল রিমেমব্রান্সারের কাছ থেকে প্রিভি কাউন্সিলের জন্যে তৈরী যে ফাইলটা আমি নিয়েছিলাম, সেটা খুঁজে দেখবে। ফাইলে যে-সব নথিপত্র থাকবার কথা, তার অন্তত একটা পুরো তালিকা সেখানে আছে। ফাইলটা শান্তনমের কাছেও থাকতে পারে, এই বিবেচনায় তাকেও তার করে দিচ্ছি। প্রস্তাবটা যদি না পাই, সেক্ষেত্রে জগৎনারায়ণকে বলতে হবে, তিনি যেন একটা প্রকাশ্য বিবৃতি দেন। ব্যাপারটাকে একটা ব্যক্তিগত ব্যাপার বলে গণ্য করা যায় না। তুমি যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাঠিয়েছ তা পড়া অবধি আমার রক্ত টগবগ করে ফুটছে। এখন আমাদের একটা বিশেষ কংগ্রেসের অনুষ্ঠান করে হতভাগ্যদের উদ্ধ্বস্ত করে তুলতে হবে।

রিপোর্ট এবং ডেসপ্যাচগুলির পূর্ণ বিবরণ সঙ্গে করে এনো। ভালবাসা জানাই।

বাবা

১৬ মোতিলাল নেহরু কর্তৃক লিখিত

[মোতিলাল নেহরু আরা থেকে ১৯২০ সনের ১৬ জুন তারিখে জওহরলালকে যে চিঠি লিখেছিলেন তার একাংশে এখানে উদ্ধৃত হল।]

সাধারণ পরিস্থিতি সম্পর্কে মালব্যজীর সঙ্গে তোমার আলোচনা হয়েছে আশা করি। তুমি ঠিকই ভেবেছ; তোমার পাঞ্জাবে যাবার কিছুমাত্র আবশ্যকতা নেই। গোটাকয়েক ঘটনা তাঁরা বেছে নিন; তারপর তার প্রমাণ সংগ্রহ করে আইনজ্ঞদের পরামর্শ নেবার জন্য এবং অভিযোগপত্র রচনার জন্য যথাবিহিতভাবে সেগুলিকে বিবৃত করুন। দাশ, সরকার এবং আমি তখন একত্র আলোচনা করে তাদের পরামর্শ দিতে পারব।

আমার মনে হয়, পরিষদের নির্বাচন-ব্যাপারে মালব্যজী আর আমার এখন মনঃস্থির করা উচিত। আমি মনে করি, তাঁর পক্ষে আইন-সভায় যাওয়া উচিত, আমার পক্ষে স্থানীয় পরিষদে। তার জন্য সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী এলাকায় আমাদের নোটিশ দেওয়া দরকার। আমি যে কোন এলাকা থেকে দাঁড়াব, কিছুই বুঝতে পারছি না। তুমি বরং গোটা ব্যাপারটা নিয়ে মালব্যজীর সঙ্গে একবার আলোচনা করে দেখ। তোমার নিজের জন্যও একটা নির্বাচনী-এলাকা ঠিক করে নেওয়ার একান্ত প্রয়োজন। তুমি অবশ্য বলে থাক, বীর যোদ্ধা তাঁর আপন দুর্গেই ভারী দুর্বল; কিন্তু সত্যিই খুব দুর্বল বলে আমি বিশ্বাস করি না। বিশেষ কংগ্রেসের অধিবেশন না হওয়া পর্যন্ত যদি আমরা হাত গুটিয়ে বসে থাকি, তাহলে খুবই দেরি হয়ে যাবে, এবং তখন আর কিছু করার থাকবে না। আমার যতদূর মনে হয়, সমগ্রভাবে কংগ্রেস নিজেকে অসহযোগ-নীতির সঙ্গে আবদ্ধ করবে, এমন সম্ভাবনা নেই। বড় জোর এইটুকু হতে পারে যে নীতিটাকে সে অনুমোদন করবে, অতঃপর

কে কোন নীতি অনুসরণ করবেন, সেটা ঠিক করবার ভার সদস্যদের হাতেই ছেড়ে দেওয়া হবে। আর পরিষদে সহযোগ না করবার সিদ্ধান্তই যদি আমরা করি, যে-কোন মুহূর্তেই আমরা সরে আসতে পারব।

১৭ মোতিলাল নেহরু কর্তৃক লিখিত

[মোতিলাল নেহরু এলাহাবাদ থেকে ১৯২০ সনের ৫ জুলাই তারিখে জওহরলালকে যে চিঠি লেখেন, তার একাংশ এখানে উদ্ধৃত হল।]

যে দু দিন এখানে ছিলাম, সেই দুদিনে কয়েকখানি চিঠি পেয়েছি। চিঠিগুলি এই সঙ্গে তোমার কাছে পাঠালাম। সবগুলি চিঠিই আমি পড়েছি। যে-চিঠিখানি ফতেপুর থেকে এসেছে, অত্যন্তই মনোযোগ সহকারে সেটিকে বিবেচনা করে দেখা প্রয়োজন। গতকাল রাত্রে পুরুষোত্তম এবং কপিল দেওয়ের সঙ্গে আমার দীর্ঘ আলোচনা হল। পুরুষোত্তম সেই সময় এ-বিষয়ে তাঁর কাছে লেখা তোমার একখানি চিঠির একাংশ আমাকে পড়ে শোনালেন। গান্ধীজীর অনুরোধ রক্ষা সম্পর্কে তুমি যা লিখেছ, সে-বিষয়ে আমার কিছু বলবার নেই। এটা এমন এক ধরণের ভাবপ্রবণতার ব্যাপার, যা আমার বুদ্ধির অগম্য। তবে প্রশ্নটার গুণাগুণ যদি বিচার করে দেখতে হয়, তাহলে বলতেই হবে যে স্বয়ং গান্ধীজীও শেষ পর্যন্ত তাঁর সংকল্পে অটুট থাকবেন কিনা, সে-বিষয়ে আমি নিশ্চিত নই। এ যদি তাঁর একার ব্যাপার হত, তাহলে তিনি অবশ্যই অটুট থাকতে পারতেন। কিন্তু এ এমন একটা ব্যাপার যেখানে অন্যান্যদের উপর তাঁকে নির্ভর করতে হবে, এবং আজ হক আর কাল হক, সেই অন্যান্যেরা সরে পড়বে। এতে সংশয়ের কোনও অবকাশ নেই। প্রশ্নটা অত্যন্ত জটিল, এবং স্বীকার করতে আমার বাধা নেই যে এ-ব্যাপারে আমি কোনও [illegible]ষ্ট সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারিনি। অসহযোগ-নীতির প্রতি আমার পূর্ণ [illegible] বর্তমান। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে এই নীতির কী রূপ পরিগ্রহ করা উচিত, সে-বিষয়ে আমি নিশ্চিত নই। বর্তমান অবস্থায়, বিশেষ করে পাঞ্জাবের ব্যাপারে, লাজপত রায়ের সঙ্গে আমি একমত। কিন্তু গান্ধীজী যে সারা ভারতে পরিষদ বর্জনের কথা বলছেন, তার সঙ্গে আমি একমত নই। আমার মনে হয়, আগে আমাদের দেশবাসীর দ্বারা নির্বাচিত হয়ে তারপর যদি আমরা পরিষদে যোগদান করতে অসম্মত হই অথবা তার কাজে বাধাপ্রদান করি, আমাদের উদ্দেশ্য তাতে প্রভূত শক্তিলাভ করবে; পক্ষান্তরে আবার অসহযোগ-নীতিকেও তাতে ত্যাগ করা হবে না। সে যা-ই হক, আপাতত এইটুকুই শুধু আমি বলতে চাই যে ঘটনাস্রোতের পরিণতি আরও স্পষ্ট না হওয়া পর্যন্ত আমাদের কারও পক্ষেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা উচিত হবে না।

১৮ মোতিলাল নেহরু কর্তৃক লিখিত

চেস্টনাট লজ,
আলমোরা,
৩ জুন, ১৯২১

প্রিয় জওহর,

নাগিনা থেকে তুমি যে চিঠি লিখেছ, তা আজ সকালে পেলাম। আশা করি তোমার সফর সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে।

অত্যন্তই ধীরে ধীরে আমার স্বাস্থ্যের উন্নতি হচ্ছে। এখানকার আবহাওয়ার কোনও স্থিরতা নেই। কখনও কখনও দিনে-রাত্রে খুব গরম পড়ে, আবার কখনও

Chestnut Lodge
Almora
3. 6. 21

My dear Jawahar,

Your letter from [illegible] arrived this morning. I hope your tour was successful.

I am improving very slowly. The weather here is very unsettled. Some days & nights are very hot while others are quite cold. This is the 5th day of my stay here and I have no reason to complain. I should allow at least another 5 days for very marked improvement. As it is the asthma is very much better but I am still unable to go out for a walk. The short ascent from the house to the road is too much for me.

I don't at all like the step the Ali Bros have taken. Enclosed is a copy of the letter I have written to Lordship on the subject. The copy has been typed for me by Raj. I have not been able to express half of what I feel & my letter is a disjointed one but it will show how my mind is working.

Your loving
Father

কখনও বেশ ঠাণ্ডা। স্বাস্থ্যের একটা উল্লেখযোগ্য উন্নতি হতে আরও অন্তত দিন পাঁচেক লাগবে মনে হয়। হাঁপানির অবস্থা এখন অনেক ভাল, তবে এখনও হেঁটে বেড়াবার মত শক্তি পাইনি। বাড়ি থেকে রাস্তা পর্যন্ত যেতে যেটুকু উঁচুতে উঠতে হয়, তাও পারি না।

আলী-ভাইরা যে কাজ করেছেন, তা আমি আদৌ পছন্দ করি না। এ-বিষয়ে গান্ধীজীকে আমি একখানি চিঠি লিখেছি, তার অনুলিপি এইসঙ্গে পাঠালাম। অনুলিপিটা রাজ আমার হয়ে টাইপ করে দিয়েছে। আমার মনোভাবের অর্ধেকও আমি প্রকাশ করতে পারিনি; চিঠিটা একটু ছাড়া-ছাড়াও হয়েছে বটে, কিন্তু কোন্ পথে আমি এখন চিন্তা করছি, চিঠিখানি পড়ে সেটা অন্তত বোঝা যাবে।

ভালবাসা জানাই।

বাবা

১৯ মোতিলাল নেহরু কর্তৃক মহাত্মা গান্ধীকে লিখিত

চেস্টনাট লজ, আলমোরা,
৩ জুন, ১৯২১

প্রিয় মহাত্মাজী,

আলী-ভাইরা সংবাদপত্রে যে-বিবৃতি দিয়েছেন, ৩১ মের ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টে তার একটি অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণ পড়ে এ-বিষয়ে পরশু আপনাকে একটি চিঠি লিখেছি। বিবৃতির পূর্ণ বিবরণ, এবং তার উপর ভিত্তি করে ভারত সরকার যে ইস্তাহার প্রচার করেছেন, তা আমি এইমাত্র পড়লাম। চেম্‌সফোর্ড ক্লাবে ভাইসরয় যে বক্তৃতা দিয়েছেন, তাও আমি পড়েছি। দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে এইসব বক্তৃতা-বিবৃতি পড়ে আমি সন্তুষ্ট হতে পারিনি।

আলী-ভাইদের বিবৃতির পূর্বে এবং পরে যা ঘটেছে, তার থেকে আলাদা করে এই বিবৃতিটিকে যদি বিচার করা যায়, তাহলে বলতেই হবে যে এটি একটি পৌরুষব্যঞ্জক বিবৃতি। আকস্মিক আবেগে তাঁরা যদি এমন কিছু বলে থাকেন, যার মধ্যে হিংসাকে প্ররোচনা দানের ইঙ্গিত বর্তমান—ন্যায়সঙ্গত ভাবে এ-কথা ধরে নেওয়া যেতে পারে বলে তাঁরা এখন মনে করছেন, সেক্ষেত্রে তাঁদের দুঃখ-জ্ঞাপক বিবৃতি প্রকাশ করে তাঁরা ঠিকই করেছেন। তাঁরা যেমন প্রতিষ্ঠাবান জননেতা, তাতে তাঁদের সামনে সম্মানজনক এই একটি পথই খোলা ছিল। ভবিষ্যতের জন্য যে প্রতিশ্রুতি তাঁরা দিয়েছেন, তাও আমি সঙ্গত বলে মেনে নিতে পারতাম, যদি দেখতাম যে তাঁদের যে-সব সহকর্মী কোনও অবস্থাতেই হিংসা-নীতিতে বিশ্বাসী নন, সেইসব সহকর্মীর উদ্দেশে এই প্রতিশ্রুতি প্রদত্ত হয়েছে। কিন্তু "যাঁদের প্রয়োজন হতে পারে, তাঁদের সকলের প্রতি প্রকাশ্য আশ্বাস ও প্রতিশ্রুতি", সাধারণভাবে এই যে কথাগুলি ব্যবহৃত হয়েছে, তাতে কোন্ বিশেষ পক্ষের এই "আশ্বাস ও প্রতিশ্রুতি" লাভের প্রয়োজন ছিল, এবং কার নির্দেশে এই প্রতিশ্রুতি প্রদত্ত হয়েছে, বর্তমান অবস্থায় সে-বিষয়ে কারও মনে কোনও সন্দেহ থাকতে পারে না। ভাইস্‌রয়ের বক্তৃতায় বিষয়টি এখন সম্পূর্ণ পরিস্ফুট হয়েছে, এবং সেইসঙ্গে এই তর্কাতীত তথ্যও আমরা জেনেছি যে অসহযোগ আন্দোলনের নেতা ভারত সরকারের সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় নিরত আছেন, এবং আলী-ভাইদের প্রকাশ্যে ক্ষমাপ্রার্থনা ও প্রতিশ্রুতিদানে উৎসাহ দিয়ে তিনি তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রত্যাহার করিয়ে নিয়েছেন।

ঘটনাটিকে যদি এই দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বিচার করা যায়—অন্য আর কোন্ দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বিচার করা সম্ভব, তা আমি জানি না—সমগ্র আন্দোলন সম্পর্কে

তাহলে অত্যন্তই গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি প্রশ্ন দেখা দেবে। সেগুলিকে বিচার করে দেখা প্রয়োজন। বস্তুত আমার মনে হয়, সমগ্র অসহযোগ নীতিকেই এতে বর্জন করা হয়েছে।

সরকারের নাম শুনেই যাঁরা ভয় পান, অথবা যাঁরা মনে করেন যে একমাত্র সরকারের সঙ্গে আপোষ-ব্যবস্থার মাধ্যমে আমাদের প্রতি সমস্ত অন্যায়ের প্রতিকার ও স্বরাজ প্রতিষ্ঠা সম্ভব, আমি তাঁদের একজন নই। বরাবর আপনি এই শিক্ষাই দিয়ে এসেছেন যে একমাত্র আমাদের নিজেদের চেষ্টায় স্বরাজ লাভ সম্ভব। আপনার এই শিক্ষায় আমি বিশ্বাসী। কিন্তু তাই বলে উপযুক্ত অবস্থা-পরিবেশে সরকারের সঙ্গে আপোষ-ব্যবস্থা অসম্ভব বলেও আমি মনে করি না। যতদূর জানি, আপনিও করেন বলে আমার মনে হয় না। অবশ্য সে-রকম কোনও আপোষ-ব্যবস্থা হতে পারে নীতির কারণে। ব্যক্তিবিশেষের সুবিধা অথবা নিরাপত্তার কারণে তা হতে পারে না। একদল সহকর্মী নিয়ে যেখানে কাজ হচ্ছে, মানুষে মানুষে সেখানে প্রভেদ বিবেচনা সঙ্গত নয়। দলের বড় কর্মীটিকে নেতারা সেখানে যে-রক্ষাব্যবস্থায় আগলে রাখেন, দলের ছোট কর্মীটিরও সেখানে তাতে সমান অধিকার বর্তমান। আলী-ভাইরা যে-রকম ভাষা ব্যবহার করেছেন, তার চাইতে অনেক কম তীব্র ভাষা ব্যবহার করেও আমাদের শত-শত কর্মী স্বেচ্ছায় কারাবরণ করেছেন। এদের মধ্যে অন্তত কেউ-কেউ অনুরূপভাবে ক্ষমাপ্রার্থনা করে ও প্রতিশ্রুতি দিয়ে আত্মরক্ষা করতে পারতেন। কিন্তু তাঁদের ক্ষেত্রে সে-উপদেশ দেবার কথা কারও মনে হয়নি। পক্ষান্তরে, অসহযোগ-নেতৃবৃন্দ এবং অসহযোগ-সমর্থক সংবাদপত্রগুলি তাঁদের কাজে সাধুবাদ জানিয়েছেন। এই মুহূর্তে যাঁর কথা আমাদের সব চাইতে বেশী করে মনে পড়ছে, তিনি হামিদ আমেদ। সম্প্রতি এলাহাবাদে তাঁর প্রতি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের আদেশ প্রদত্ত হয়েছে; সেইসঙ্গে তাঁর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার জন্যও আদেশ দেওয়া হয়। ব্যক্তিগতভাবে মানুষটিকে আমি চিনি। অত্যন্তই শান্ত প্রকৃতির মানুষ তিনি, বুদ্ধি একটু ভোঁতা, তেমন বক্তাও নন। সে যা-ই হক, অন্যান্যদের কিছু বক্তৃতা তিনি শুনেছিলেন এবং পড়েছিলেন। অতঃপর আপন পথে তিনি তার অনুকরণ করবার চেষ্টা করেন। এ-ব্যাপারে তাঁর একটু হয়ত বাড়াবাড়ি হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু এ-বিষয়ে আমি নিশ্চিত যে, প্রকৃতই যাকে হিংসা বলে, তা প্রচার করবার উদ্দেশ্য তাঁর ছিল না। এখন এ-লোকটিকে কেন রক্ষা করা হবে না? রক্ষা না করবার কোনও কারণ আছে কি? মিঃ মহম্মদ আলী ৩০ মে তারিখে বোম্বাইয়ে যে বক্তৃতা দিয়েছেন, তাতে তিনি হামিদ আমেদের খুব প্রশংসা করেছেন দেখলাম। হামিদ আমেদের মত একই অবস্থায় পড়ে যে-ব্যক্তি ক্ষমা প্রার্থনা করে ও প্রতিশ্রুতি দিয়ে আত্মরক্ষা করেছেন, তাঁর এই প্রশংসাবাক্যে হামিদ আমেদ কতটুকু সান্ত্বনা লাভ করবেন, তা আমি জানি না। এ ছাড়া এমন অনেকে আজ জেলে পচছেন, যাঁরা কোনও অপরাধই করেন নি। ইতিমধ্যে যাঁরা ধৃত হয়েছেন, তাঁদেরও এই একই অবস্থা ঘটবে। যে নিরাপদ জায়গায় আমরা নিজেরা রয়েছি, সেখান থেকে এদের শুভেচ্ছা-বাণী পাঠানই কি যথেষ্ট?

ভাইসরয়ের বক্তৃতা থেকে এই কথাই স্পষ্ট বোঝা গেল যে তাঁর সঙ্গে যে আপনি বারকয়েক সাক্ষাৎ করলেন, আলী-ভাইদের ক্ষমাপ্রার্থনা ও প্রতিশ্রুতিদানই তার একমাত্র ফল। এদিকে আপনার পরবর্তী বক্তৃতাবলীতে আপনি স্পষ্টভাবে জানিয়েছেন যে সমানভাবেই আমাদের আন্দোলন চালিয়ে যেতে হবে। অহিংসাকে যে প্ররোচনা দেওয়া হবে না, এ নিয়ে দু তরফের কোনও তরফ থেকেই আলোচনার কোনও প্রয়োজন ছিল না। অথচ মনে হচ্ছে, নীতিবিষয়ক এ ছাড়া আর কোনও প্রশ্নেরই মীমাংসা

হয়নি। অবস্থা এখন যেমন দাঁড়িয়েছে তাতে সরকারের সঙ্গে আলোচনা করা উচিত ছিল না, এমন কথা আমি বলতে চাই না। যদিও এই মতের সপক্ষেও অনেক কথাই বলা যেতে পারে। যখন দেখা গেল যে শেষ পর্যন্ত খেলা চালিয়ে যেতে হবে, তখন দুই পক্ষের কোনও পক্ষই যাতে অন্যায়ের আশ্রয় না নেয়, তার জন্য আপনার ও লর্ড রীডিংয়ের মত দুই সম্মানীয় প্রতিদ্বন্দ্বী ত খেলার নিয়মকানুন মেনে চলার ব্যাপারে একমত হতে পারতেন। সেটা খুবই ন্যায়সঙ্গত কাজ হত। বলা বাহুল্য, খেলায় যারা অংশগ্রহণ করবে, এ-সব নিয়মকানুন তাদের প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই সমভাবে প্রযোজ্য হবে, শুধুমাত্র মুষ্টিমেয় কয়েকজন অনুগ্রহভাজনের ক্ষেত্রে নয়। কী কী অস্ত্র ব্যবহার করা যাবে, সে-বিষয়ে একমত হবার প্রয়োজনই ছিল সর্বাধিক। স্থানীয় কয়েকটি সরকার অবশ্য মুখে বলছেন, প্রচারকার্যের সাহায্যেই তাঁরা প্রচারকার্যের জবাব দেবেন, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তাঁরা হীনতম নিপীড়ন-ব্যবস্থার আশ্রয় নিয়েছেন। মূল বিষয় সম্পর্কে কোনও মতৈক্য সম্ভব না হলেও আমার মতে অনুরূপ আরও কয়েকটি সঙ্গত বিষয় নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে।

আশা করি আপনি আমাকে ভুল বুঝবেন না। আলী-ভাইরা যে-সব ত্যাগ স্বীকার করেছেন, তার প্রতি আমি কারও তুলনাতেই কম শ্রদ্ধাশীল নই। তাঁদের ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব আমি পেয়েছি, এও আমার মস্ত বড় সৌভাগ্য। কিন্তু সেইসঙ্গে বিগত কিছু কাল ধরে এই চিন্তাটাই আমার পক্ষে পীড়াদায়ক হয়ে উঠেছে যে যেক্ষেত্রে আমাদের কর্মীদের মধ্যে অনেকের কারাগমন ও যন্ত্রণাবরণের জন্য আমরাই প্রত্যক্ষভাবে দায়ী, সেক্ষেত্রে আমরা নিজেরা কিন্তু কার্যত নিরাপদ রয়েছি। আমার লেখা ইস্তাহার বিলি করার জন্য নিরপরাধ বালকদের কারারুদ্ধ করা হয়েছে। এতে আমি যতখানি বেদনা ও মনস্তাপ ভোগ করেছি, অন্য আর কোনও উপায়েই সরকার আমাকে তার চাইতে বেশী বেদনা ও মানসিক যন্ত্রণা দিতে পারতেন না। নেতৃবৃন্দের পক্ষে আজ কারাবরণের সুযোগকে স্বাগত জানাবার এবং পরিত্রাণ লাভের সমস্ত প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করবার সময় এসেছে। ব্যাপারটাকে এই দিক থেকে বিচার করে দেখেছি বলেই আলী-ভাইদের কাজে আমি ক্ষুণ্ণ হয়েছি। ব্যক্তিগতভাবে আমি তাঁদের ভালবাসি।

আমি এখন অত্যন্তই পরিশ্রান্ত। আপনার সঙ্গে অনেক কথা বলার ছিল। শিগগির একবার আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎকার সম্ভব হলে সুখী হতাম। চারদিন হল এখানে এসেছি, এবং আমার স্বাস্থ্যের অল্প-কিছু উন্নতিও হয়েছে। তবে আমার হাঁপানি আমাকে পুরোপুরি ছাড়েনি। আর-কখনও এত দুর্বল বোধ করেছি বলে মনে হয় না। ১৪ তারিখে বোম্বাইয়ে যে সভা হবে, তাতে যোগ দেবার জন্য বোম্বাই যেতে পারব কিনা, সে-বিষয়ে যথেষ্টই সন্দেহ বর্তমান।

ভবদীয়
মোতিলাল নেহরু

২০ মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক লিখিত

[ভারতবর্ষের অসহযোগ-আন্দোলনে ১৯২১ সনের ডিসেম্বর মাসে ব্যাপক কারাবরণের প্রথম অধ্যায়ের সূত্রপাত হয়। হাজার হাজার মানুষকে এই সময় এমন কারণে কারাগারে প্রেরণ করা হয়েছে, নিতান্ত সূক্ষ্ম কানুনগত বিচারে যাকে আইন লঙ্ঘনের অপরাধ বলা যায়। আমরা প্রায় সকলেই তখন কারাগারে। আমার বাবাও তখন কারারুদ্ধ হয়েছেন। সেই সময় একদিন আমরা শুনলাম, গান্ধীজী অকস্মাৎ আন্দোলন প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। প্রত্যাহারের কারণ এই যে যুক্তপ্রদেশের গোরক্ষপুর জেলার অন্তর্গত চৌরি-

চৌরা নামক স্থানে উত্তেজিত একদল কৃষক একটি পুলিশ-ফাঁড়ি আক্রমণ করে ফাঁড়িতে আগুন জ্বালিয়ে দেয় এবং জনকয়েক পুলিশ-কর্মচারীকে হত্যা করে। কোনও এক গ্রামের একদল লোকের অন্যায় আচরণের জন্য অকস্মাৎ এতবড় মহান এক আন্দোলন প্রত্যাহার করায় কারাগারে আমরা সবাই নিরতিশয় বেদনা বোধ করছিলাম। মহাত্মা গান্ধী তখনও স্বাধীন, অর্থাৎ তখনও তিনি কারারুদ্ধ হননি। আন্দোলন প্রত্যাহৃত হওয়ায় আমরা যে গভীর বেদনা পেয়েছিলাম, কারাগার থেকেই সে-কথা তাঁকে জানাবার ব্যবস্থা করা গেল। সেই সময়ে গান্ধীজী এই চিঠিখানি লেখেন। আমার বোনের (এখন বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত) হাতে তিনি এই চিঠিখানি দেন, যাতে সাক্ষাৎকারের জন্য কারাগারে এসে চিঠিখানি সে আমাদের পড়ে শোনাতে পারে।]

বার্দোলি,
১৯ ফেব্রুয়ারি, ১৯২২

প্রিয় জওহরলাল,

ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাবে তোমরা সকলেই খুব আহত হয়েছ দেখছি। তোমাদের আমি সহানুভূতি জানাই। বাবার জন্য আমি খুবই ব্যাকুলতা বোধ করছি। তিনি যে কতখানি মনোযন্ত্রণা ভোগ করেছেন তা আমি বুঝতে পারি, কিন্তু সেইসঙ্গে এও আমার মনে হচ্ছে যে এ-চিঠি লিখবার কোনও প্রয়োজন ছিল না। তার কারণ আমি জানি, প্রথম আঘাতটা সামলে উঠবার পর তোমরা এখন অবস্থাটাকে সঠিক বুঝতে পেরেছ। দেবীদাসের যৌবনসুলভ হঠকারিতায় যেন আমরা আচ্ছন্ন না হই। এটা খুবই সম্ভব যে এই হতভাগ্য ছেলেটি টাল সামলাতে না পেরে ভারসাম্য হারিয়েছে। কিন্তু অসহযোগের প্রতি সহানুভূতিশীল ক্রুদ্ধ এক জনতার হাতে যে কন্স্টেবল্‌দের মৃত্যু ঘটেছে তা ত অস্বীকার করা যায় না। এ এক পাশবিক হত্যাকাণ্ড। জনতার উদ্দেশ্য যে ছিল রাজনৈতিক, তাও অস্বীকার করা সম্ভব নয়। এই স্পষ্ট বিপদ-সঙ্কেত দেখেও যদি হুঁশিয়ার না হতাম, তাতে মস্ত বড় অপরাধ ঘটত।

তোমাকে বলা দরকার, বোঝার উপরে এই শাকের আঁটির ভার বহন করা সম্ভব ছিল না। ভাইসরয়ের কাছে যে-চিঠি আমি পাঠিয়েছি, তা অসন্দিগ্ধ চিত্তে পাঠাইনি। চিঠির ভাষা থেকেই যে-কেউ সেটা বুঝতে পারবে। মাদ্রাজের ঘটনাবলীতে আমি খুবই বিচলিত হয়েছিলাম বটে, কিন্তু সেই বিপদ-সংকেতকে আমি গ্রাহ্য করিনি। গোরক্ষপুরের ঘটনার আগে কলকাতা, এলাহাবাদ ও পাঞ্জাব থেকেও আমি চিঠি পেয়েছিলাম। পত্রলেখকদের মধ্যে হিন্দু ও মুসলমান, উভয় সম্প্রদায়ের লোকই ছিলেন। তাঁরা জানালেন যে আমাদের পক্ষের লোকরা উগ্র, বেপরোয়া ও মারমুখো হয়ে উঠেছে। জানালেন যে তারা আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছে, এবং তাদের আচরণও অহিংস নয়। ফিরোজপুরের ঘটনা সরকারের পক্ষে অসম্মানজনক বটে, কিন্তু আমরাও সম্পূর্ণ নির্দোষ নই। হাকিমজী বেরিলি সম্পর্কে অভিযোগ জানালেন। জাজর সম্পর্কেও আমার তীব্র অভিযোগ বর্তমান। শাহজানপুরেও টাউন-হলটিকে জবরদখল করবার চেষ্টা করা হয়েছে। কনৌজ থেকেও স্বয়ং কংগ্রেস-সেক্রেটারি এক তারবার্তায় জানিয়েছেন যে সেখানকার স্বেচ্ছাসেবকরা উচ্ছৃংখল হয়ে উঠেছে, হাইস্কুলের সামনে তারা পিকেটিং করছে, এবং ১৬ বছরের থেকে অল্পবয়সী ছেলেদের তারা স্কুলে যেতে দিচ্ছে না। গোরক্ষপুরে ৩৬,০০০ স্বেচ্ছাসেবক সংগৃহীত হয়েছিল; তাদের মধ্যে ১০০ জনও কংগ্রেসের সংকল্প অনুসারে চলেনি। কলকাতার সম্পর্কে যমুনালালজী বললেন, সেখানে চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলা বিরাজ করছে।

স্বেচ্ছাসেবকদের পরনে বিদেশী কাপড়, এবং অহিংসার সংকল্পেও তারা আবদ্ধ নয়। এ-সব খবর আমি আগেই পেয়েছিলাম। মাদ্রাজ থেকেও আমি আরও অনেক খবর পাই। এরপর যখন চৌরিচৌরার খবর পেলাম, সেটা যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গের কাজ করল, বারুদের স্তূপের উপর ছিটকে পড়ে একটা অগ্নিকাণ্ড ঘটিয়ে দিল। নিশ্চিত জেন, ব্যাপারটাকে এইখানেই থামিয়ে দেওয়া না হলে শেষ পর্যন্ত দেখা যেত যে আমরা এক, অহিংস নয়, সম্পূর্ণই সহিংস সংগ্রাম পরিচালনা করছি। এ-সত্য সংশয়াতীত যে অহিংসার আদর্শ এখন আতরের সৌরভের মতই দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ছে; কিন্তু হিংসাও এখনও হীনবল হয়নি। তাকে উপেক্ষা করা বা তার শক্তিকে ছোট করে দেখাটা বুদ্ধির কাজ হবে না। আমরা যে পিছিয়ে এলাম, আমাদের আদর্শের তাতে সমৃদ্ধিই ঘটবে। নিজেরই অজ্ঞাতসারে আমাদের আন্দোলন তার সত্যপথ থেকে সরে এসেছিল। আবার আমরা বন্দরে ফিরে এসেছি। নতুন করে আবার আমরা সম্মুখে যাত্রা করতে পারব। যে অবস্থায় আমরা দুজনে আছি, তাকে ঘটনাবলীকে ঠিকমত বিচার করে দেখবার ব্যাপারে তোমার যতখানি অসুবিধা, আমার ঠিক ততখানিই সুবিধা বর্তমান।

দক্ষিণ আফ্রিকায় আমার কী অভিজ্ঞতা হয়েছিল, শুনবে? আমরা তখন দক্ষিণ আফ্রিকায় কারারুদ্ধ। সেই সময় বাইরের নানান খবর আমাদের কাছে এসে পৌঁছত। প্রথম-প্রথম দু-তিন দিন এইসব খুচরো খবর পেতে আমার বেশ ভালই লেগেছে। কিন্তু এই অবৈধ আনন্দে নিজেকে মগ্ন রাখা যে সম্পূর্ণ অর্থহীন, শিগগিরই তা আমি বুঝতে পারলাম। কোন কিছুই আমার করবার উপায় তখন নেই, একটা খবর পর্যন্ত বাইরে পাঠাতে পারি না। শুধু অকারণে আমার আত্মাকে তখন আমি বিক্ষুব্ধ করে তুলেছি। বুঝতে পারলাম, কারাগার থেকে ত আমার পক্ষে আন্দোলন পরিচালনা সম্ভব নয়। সুতরাং, যাঁরা বাইরে রয়েছেন, যতদিন পর্যন্ত না তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্ভব হয়, যতদিন পর্যন্ত না তাঁদের সঙ্গে অবাধে কথা বলতে পারি, ততদিন পর্যন্ত আমি ধৈর্যধারণ করে রইলাম। বিশ্বাস কর, এ-ব্যাপারে তখন আমার যেটুকু আগ্রহ রইল, তা একান্তই নিরুত্তেজ। তার কারণ আমার মনে হয়েছিল যে কোনও-কিছুকে বিচার করবার অধিকার আমার নেই। পরে দেখা গেল, আমার ধারণা সম্পূর্ণই সত্য। কারাগার থেকে মুক্তি পাবার আগে পর্যন্ত যে-সব ধারণা আমি করেছি, মুক্তি পাবার পর নিজের চোখে সব দেখে প্রতিবারই যে সেই-সব ধারণা আমাকে পালটাতে হয়েছে, তা আমার স্পষ্ট মনে পড়ে। কারাগারের আবহাওয়া এমনই যে সমস্ত প্রেক্ষিতটাকে সেখান থেকে খতিয়ে দেখা যায় না। বাইরের জগৎটাকে তুমি যদি সম্পূর্ণ ভুলে গিয়ে তার অস্তিত্বকে উপেক্ষা করতে পার, তাহলে আমি সুখী হব। কাজটা যে অত্যন্তই কঠিন, তা আমি জানি, কিন্তু তুমি যদি গভীর কোনও পড়াশুনোর কাজ এবং কঠিন কোনও কায়িক পরিশ্রমে নিজেকে ব্যাপৃত রাখতে পার, তাহলে এ-কাজ তোমার অসাধ্য হবে না। সর্বোপরি, যে-কাজই কর না কেন, চরকার উপরে বীতশ্রদ্ধ হয়ো না। এমন অনেক কাজ হয়ত আমরা করেছি, এমন অনেক-কিছুতে হয়ত আমরা বিশ্বাস করেছি, যার জন্য তোমার অথবা আমার পক্ষে নিজের উপরে বীতশ্রদ্ধ হবার কারণ থাকতে পারে, কিন্তু আমরা যে চরকার উপরে আমাদের বিশ্বাস স্থাপন করেছি, এবং মাতৃভূমির নামে প্রতিদিন কিছু সুতো কেটেছি, এ নিয়ে আমাদের কখনও আক্ষেপ করবার কারণ ঘটবে না। "Song Celestial" বইখানি ত তোমার কাছেই রয়েছে। এডুইন আর্নল্ড যে অননুকরণীয় অনুবাদ করেছেন, তা তোমাকে দিতে পারলাম না, তবে মূল সংস্কৃতের অনুবাদ এই রকম। শক্তির অপচয় হয় না, এর বিনাশ নেই। এই ধর্মের একটুখানিও যদি

কারও থাকে, বহু পতন থেকে এ তাকে রক্ষা করবে। মূলে "এই ধর্ম" বলতে কর্মযোগকে বোঝান হয়েছে, আর চরকাই এ-যুগের কর্মযোগ। প্যারে লালের মারফত যে মুষড়ে-পড়ার-মত চিঠি তুমি পাঠিয়েছ, তার পরে এবারে তোমার কাছ থেকে বেশ উৎফুল্ল একখানি চিঠি চাই।

তোমাদের
এম. কে. গান্ধী

প্রিয় স্বরূপ,

তুমি যদি মনে কর যে উপরের চিঠিখানি পড়ে লখনউএর বন্দীরা কোনপ্রকার সান্ত্বনা পেতে পারে, তাহলে এরপর আবার যখন জওহরলালের সঙ্গে তোমার দেখা হবে, তখন এই চিঠিখানি তাকে পড়ে শুনিয়ো। ওখানকার অন্যান্য খবর কী, অবশ্য জানিয়ো। তোমাদের মধ্যে কেউ দিল্লি আসবে বলে আশা করছি। বাবা তোমাকে যে-সব চিঠি দিয়েছেন, তার একখানি রঞ্জিত আমাকে পড়তে পাঠিয়েছে।

তোমাদের
বাপু

বর্দোলি, ২০-২-১৯২২

প্যারে লালের কাছে শুনলাম, তোমার ঠিকানায় চিঠি লিখলে সে-চিঠি তোমার কাছে পেঁছিতে বিলম্ব ঘটতে পারে। এ-কারণে দুর্গার মারফত এই চিঠি পাঠালাম।

২১ সরোজিনী নাইডু কর্তৃক লিখিত

তাজমহল হোটেল,
বোম্বাই, ১৩ জুন, [? ১৯২৩]

প্রিয় জওহর,

সাবাশ! বীরের মতন ঝড়কে আমরা অতিক্রম করব, এবং কাজকে সংগ্রাম আর শান্তিকে বিজয়ে পরিণত করার উপদেশকেও আমরা সফল করে তুলব। বক্‌র ঈদ উপলক্ষে একটা পুরো (full*) সম্মেলন আহ্বানের প্রস্তাবটি উত্তম। একাধিক কারণে নাগপুরের পরিবর্তে এলাহাবাদে এই সম্মেলন আহ্বান করা উচিত। খিলাফত আর কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির একটা যুক্ত বৈঠক অনুষ্ঠানেরও উদ্দেশ্য আছে।

নাগপুর সত্যাগ্রহের সংগঠন বেশ ভাল। একমাত্র ত্রুটি এই যে স্থানীয় লোকরা এতে যোগ দেন না। সেদিক থেকে বিচার করলে জব্বলপুরের সত্যাগ্রহকে সত্যিই আরও খাঁটি বলতে হয়। বিশেষভাবে তদন্ত করে দেখলাম, জব্বলপুরকে যাঁরা উশকে দিয়েছিলেন এবং এর জন্য ১৫,০০০৲ সাহায্য মঞ্জুর করে আনুষ্ঠানিক ভাবে যাঁরা একে সমর্থন দিয়েছিলেন, তাঁরাই পরে একে পরিত্যাগ করেন!! যা-ই হক, টাউন হল সম্পর্কিত ব্যাপারে আগামী ২০ তারিখের মধ্যে যাতে সমস্ত সত্যাগ্রহ বন্ধ করা হয়, তার নির্দেশ আমি দিয়েছি। এঁদের কাজের পিছনে পুরনো ওয়ার্কিং কমিটির সমর্থন রয়েছে, এই বিবেচনায় এঁরা যেসব প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ রয়েছেন, তাতে অকস্মাৎ এঁদের সবকিছু বন্ধ করে দেবার নির্দেশ দিলে সেটা সঙ্গত হয় না।

*শ্রীমতী সরোজিনী নাইডুর পত্রের পাঠোদ্ধার করা বড় দুরূহ কাজ। আমর নিজের চেষ্টা ব্যর্থ হবার পর কয়েকখানি পত্রের পাঠোদ্ধার করবার জন্য তাঁর দুই কন্যা শ্রীমতী পদ্মজা নাইডু ও শ্রীমতী লীলামণি নাইডুর সহায়তা আমাদের নিতে হয়েছিল। "Full" শব্দটার এখানে বিশেষ সঙ্গতি নেই, কিন্তু এর চাইতে ভাল কোনও শব্দও আমরা কেউ পেলাম না।

বুড়ো রাজাগোপালাচারী অতি বিস্ময়কর সব কাজ করছেন, এবং বুকে-হাত-রাখা সত্য থেকে মাঝে-মাঝে বিচ্যুতিও ঘটছে!!

এখানে স্বরাজ পার্টি প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। স্বরাজ পার্টির প্রার্থীদের বিরুদ্ধে প্যাটেল কয়েকজন প্রার্থী দাঁড় করাচ্ছেন বলে শুনলাম! দক্ষিণ ভারতে সি. আর. দাশ যে-সব বক্তৃতা দিচ্ছেন, তাতে অবস্থা অতি সঙ্গিন হয়ে উঠছে।

যা-ই হক, যতক্ষণ না সমন্বয়ের সম্পদটি আমরা খুঁজে পাই, ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের সমুদ্রমন্থন করে যেতে হবে। কিন্তু তার আগে বকর ঈদ পর্ব পার হওয়া দরকার। ইনসাল্লা, পার নিশ্চয়ই হতে পারব!

ভালবাসা জানাই।

ভগিনী সরোজিনী

২২ মহাদেব দেশাই কর্তৃক লিখিত

দেহেন, ভায়া সুরাট
৫ জুলাই, ১৯২৩

প্রিয় জওহরলাল,

তোমার সঙ্গে দেখা করতে উৎসুক ছিলাম। তুমি আমাকে যে দীর্ঘ ও সস্নেহ পত্র দিয়েছ, ইচ্ছে ছিল তার উত্তরে প্রাণ খুলে অনেকক্ষণ তোমার সঙ্গে গল্প করব। হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে ২ তারিখে বাবা অকস্মাৎ পরলোক গমন করেন। আমি তখন আশ্রমে। পৃথিবীতে তাঁর অন্তিম মুহূর্তে তাঁর কাছে থাকতে পারলে একটু সান্ত্বনা পেতাম। আমার দুর্ভাগ্য সেই সান্ত্বনা থেকে আমাকে বঞ্চিত করেছে। তোমার বাবার মত এত স্নেহশীল মানুষ আমি খুব কম দেখেছি। তুমি হয়ত আমার দুঃখ বুঝতে পারবে। বাবা ছিলেন বলেই গত ছ-সাত বছর আমি আমার ইচ্ছে মতন কাজ করতে পেরেছি। বাড়ির ব্যাপার সম্পর্কে যা-কিছু দুশ্চিন্তা, তা থেকে তিনি আমাকে মুক্ত রেখেছিলেন, এবং সস্নেহে আমাকে আমার খুশি মতন চলতে দিয়েছিলেন। আমি ছিলাম তাঁর তুচ্ছ অপদার্থ সন্তান। কিন্তু তবুও আমাকে তিনি ভারী ভালবাসতেন। পণ্ডিতজী যেমন তোমাকে ভালবাসেন। এই চিন্তাই আমাকে এখন দারুণ পীড়া দিচ্ছে যে আমি তাঁর জন্য এমন কিছুই করিনি, যাকে সেবা বলা যায়। আমার জন্য তিনি খাটতেন, পরিশ্রম করতেন। আর, কখনও কোনও মূল্য না দিয়ে আমি তাঁর সেই পরিশ্রমের ফল ভোগ করেছি। কী করে ঈশ্বর আমাকে ক্ষমা করবেন? এইসব চিন্তায় আমি যখন পীড়িত হচ্ছি, তখন পণ্ডিতজীর কথা মনে পড়ল। তাঁকে আমি একটি চিঠি লিখেছি। তোমার যদি মনে হয় যে তাঁর এই অসুস্থতার মধ্যে আমার চিঠি পড়ে তিনি কষ্ট পাবেন না, তাহলে যেখানেই তিনি থাকুন, দয়া করে চিঠিখানা তাঁকে তুমি পৌঁছে দিও'।

আমার মনের অবস্থা এখন এমন নয় যে রাজনীতির কথা ভাবব। তবে আমার ধারণা, প্রদেশগুলিকে স্বাধীনভাবে কাজ করবার অধিকার দিয়ে তোমরা যদি একটি প্রস্তাব গ্রহণ কর, অধিকাংশ গণ্ডগোলই তাহলে মিটে যাবে। নাগপুর সম্পর্কে তোমরা কী করবে তা আমি জানি না, তবে আমি বিশ্বাস করি যে এ-ব্যাপারে তুমি দৃঢ় মনোভাব অবলম্বন করবে।

ভালবাসা জানাই।

স্নেহানুরক্ত মহাদেব

২৩ মহাদেব দেশাইকে লিখিত

আগস্ট, ১৯২৩

প্রিয় মহাদেব,

যে-সব চিঠি লিখতে আমাদের সব চাইতে বেশী আগ্রহ, এ বড় অদ্ভুত ব্যাপার যে সেইসব চিঠি লিখতেই প্রায়শ আমাদের দেরি হয়ে যায়। খুচরো চিঠিপত্র কি রুটিন মাফিক যে-সব চিঠি আমাদের লিখতে হয়, সেগুলি ঠিকই লেখা হয়ে যায়, অথচ যে-চিঠির কথা সব চাইতে বেশী ভাবছি, সেইটিই লেখা হয়ে ওঠে না। নাগপুরে থাকতে গত ৬ কি ৭ আগস্ট তারিখে তোমার চিঠি আমি পাই। সেইদিন থেকে প্রত্যহই তোমার কথা এবং তোমার আন্তরিকতাপূর্ণ চিঠিখানির কথা আমি ভেবেছি। ট্রেন থেকে নাগপুর স্টেশনে নেমেই আমি খবরটা পেয়েছিলাম। খবর দিয়েছিল রামদাস। তুমি যে কতখানি দুঃখ পাচ্ছ, তা জানি বলেই তোমার জন্য আমার হৃদয় ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল। আমাদের মধ্যে যারা অনেক ভুল করেছি, অনেক অন্যায় করেছি, তাদের অনেকেরই হৃদয় এখন কঠিন হয়ে গিয়েছে। পৃথিবীর দুঃখশোক তাদের হৃদয়ে তাই আর তেমন করে বাজে না। কিন্তু তোমার স্বভাব কোমল, তাই সেইসব আঘাত সহ্য করা তোমার পক্ষে অনেক কঠিন হবে। তুমি যে কতখানি মনোযন্ত্রণা পাচ্ছ, এবং কেন যে নিজেকে ক্ষমা করতে পারছ না, তা আমি বেশ বুঝতে পারি।

পিতৃস্নেহ যে কত গভীর হতে পারে, তা জানবার সৌভাগ্য আমারও হয়েছে। জন্মগ্রহণের দিন থেকেই যে ভালবাসা ও সযত্ন স্নেহ আমার উপরে বর্ষিত হয়েছে, কোনও ভাবেই আমি তার প্রতিদান দিচ্ছি কিনা, অনেক সময়েই তা আমি ভেবেছি। প্রায়শই এই প্রশ্ন আমার মনে উদিত হয়েছে, এবং নিজের আচরণের কথা ভেবে আমি লজ্জাবোধ করেছি। কখনও কখনও বৃহত্তর প্রশ্ন এসে দেখা দিয়েছে, মনোযন্ত্রণায় আমার হৃদয় তখন ক্ষতবিক্ষত হয়েছে, এবং কী যে আমি করব, তা আমি স্থির করতে পারিনি। অন্তর্দ্বন্দ্বের ভার যখন দুঃসহ হয়ে উঠল, আজ থেকে অনেক দিন আগে সেই সত্যাগ্রহ সভার সময়ে বাপু আমাকে যে উপদেশ দিয়েছিলেন, তা আমি কখনও ভুলব না। তাঁর কথায় আমার যন্ত্রণার অনেক উপশম হল, এবং কিছুটা শান্তিও আমি পেলাম। দিল্লিতে অধ্যক্ষ রুদ্রের বাড়িতে যখন তোমার সঙ্গে আমার প্রথম দেখা হয়, ১৯১৯ সনের মার্চ মাসের সেই দিনগুলির কথা তোমার মনে পড়ে কি? বাপু, তুমি, আমি আর সেই ছোট ডাক্তারটি একত্র এলাহাবাদে এলাম, তার (দু-) একদিন বাদে তোমরা হয় লখনউ অথবা বারাণসীতে গেলে। বাপুর পরামর্শমত আমি তখন তোমাদের সঙ্গে প্রতাপগড় পর্যন্ত যাই। পথে আমাদের কথা হল। তাঁর সঙ্গে এই আমার প্রথম গুরুত্বপূর্ণ এবং মোটামুটি দীর্ঘ আলোচনা। মাত্র চার বছর, অথচ মনে হয়, তারপর কতদিন কেটে গিয়েছে!

তোমার বাবাকে দেখবার সৌভাগ্য আমার হয়নি। তবে সিভিল ওয়ার্ডে আমাদের সেই ছোট্ট বাগানে বসে তাঁর সম্পর্কে কিছু কথা তুমি আমাকে বলেছ। বুঝতে পারি, ছেলের জন্য তাঁর কতখানি গর্ব ছিল। তাঁর সমস্ত যন্ত্রণা এবং পরিশ্রম যে সার্থক হয়েছে, এর জন্য তিনি নিশ্চয়ই পূর্ণ সন্তোষ পেয়েছেন। অকারণে নিজেকে তুমি দুঃখ দিচ্ছ। বাবার কাছ থেকে তুমি যে সেবার শিক্ষা পেয়েছিলে, সেই শিক্ষাকে তুমি বাইরের জগতে ছড়িয়ে দিয়েছ, এবং তোমার আপন দৃষ্টান্তে অনেককেই যে অনুপ্রাণিত করতে পেরেছ তাতেও সন্দেহ নেই। তোমার বাবার মনে নিশ্চয়ই এ নিয়ে কোনও অসন্তোষ ছিল না; দেশসেবার যে বৃহত্তর ক্ষেত্র তুমি

বেছে নিয়েছ, তার পরিবর্তে সংসারের সংকীর্ণ সীমানায় বসে থাকলে তিনি নিশ্চয়ই খুশী হতেন না।

আমি বড় ক্লান্ত ও বিষণ্ণ বোধ করছি। নাগপুরে আমার যে অভিজ্ঞতা হল, তা বড়ই বেদনাদায়ক। মানুষজনের সংস্পর্শ থেকে দূরে, একেবারে গ্রামাঞ্চলের মধ্যে গিয়ে ঘুরে বেড়াব, এই উদ্দেশ্য নিয়েই এখানে এসেছিলাম। কিন্তু বাবা আমার অসুস্থ হয়ে পড়ায় তা আমার পক্ষে সম্ভব হল না। সচরাচর যা হয় না, আমি নিজই ইতিমধ্যে জ্বরে পড়েছিলাম। এখন সেরে উঠেছি।

জওহরলাল

২৪ মোতিলাল নেহরু কর্তৃক লিখিত

[১৯২৩ সনে নাভা রাজ্যের কর্তৃপক্ষ অকস্মাৎ আমাকে গ্রেপ্তার করেন। পরে আমার বিরুদ্ধে নানাবিধ অপরাধের অভিযোগ উত্থাপন করা হয়। ষড়যন্ত্র তার অন্যতম। খবর পেয়ে আমার বাবা খুব বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন। বিশেষ করে এই কারণে যে তখনকার দিনে বহু দেশীয় রাজ্যেই যে-আইন অনুযায়ী কাজ চলত, তা সুপরিজ্ঞাত অথবা সর্বজনস্বীকৃত আইন নয়। কারাগারে এসে তিনি আমার সঙ্গে দেখা করেছিলেন। আমাকে মুক্ত করবার জন্য তিনি ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। তাতে আমি দুঃখ পেয়েছিলাম। তার কারণ, সরকারের কাছে তিনি কোনও অনুগ্রহ চান, এ আমি চাইনি।]

২৮ সেপ্টেম্বর, ১৯২৩

প্রিয় জ,

কাল যে তোমার সঙ্গে দেখা করেছিলাম, তাতে তোমার কষ্টলাঘব হবার পরিবর্তে তোমার সুখী কারা জীবনের নিরুদ্বিগ্ন শান্তিই যে বিঘ্নিত হল, এতে আমি বেদনাবোধ করেছি। সযত্নে সব বিবেচনা করে দেখে আমি এই সিদ্ধান্ত করেছি যে আবার যদি তোমার সঙ্গে দেখা করতে যাই, তাতে তোমার কিংবা আমার, কারও সুখবিধানই আমি করতে পারব না। তোমাকে গ্রেপ্তার করবার পর থেকে এ-যাবৎ আমি যা-কিছু করেছি, তাতে ঈশ্বর এবং মানবসমাজের কাছে পরিষ্কার বিবেকেই আমি উপস্থিত হতে পারব। কিন্তু তুমি যখন অন্যরূপ বিবেচনা কর, তখন দুই বিরুদ্ধ চিন্তার মধ্যে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা বৃথা।

কয়েকটি বিষয় আমি লিপিবদ্ধ করেছি। কপিলের সঙ্গে সেগুলি পাঠালাম। এর মধ্যে নতুন-কিছু নেই। বর্তমানে আমার মনের অবস্থা যে-রকম, তাতে বিশেষ কিছু আমার দ্বারা সম্ভব নয়। তবু যেটুকু আমার সাধ্য, সেটুকু করা উচিত বলে আমি বিবেচনা করেছি। এখন কপিল আমাকে যেটুকু খবর এনে দেয়, তাতেই আমি সন্তুষ্ট থাকব। বর্তমানে আমার যে কী কর্তব্য, তা আমি জানি না। আরও দিন দুয়েক এখানে অপেক্ষা করব। আমার জন্য চিন্তা কর না। কারাগারের মধ্যে তুমি যতখানি সুখী, কারাগারের বাইরে আমিও ঠিক ততখানিই সুখী।

ভালবাসা জানাই।

বাবা

রাগে অথবা দুঃখে তোমাকে এই চিঠি লিখেছি, এমন কথা মনে কর না। প্রায় সারারাত চিন্তা করে এখন বাস্তব ও শান্ত চিত্তে ব্যাপারটাকে গ্রহণ করবার জন্যই আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। এমন চিন্তা যেন তোমার মনে স্থান না পায় যে তোমার ব্যবহারে আমি আহত হয়েছি। যে ঘটনাবলীর জন্য আজ এই অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, তার উপরে তোমার অথবা আমার—কারও হাত ছিল না।

মো. নে.

২৫ লালা লাজপত রায় কর্তৃক লিখিত

দি টিলক স্কুল অব পলিটিক্‌স,
লাহোর,
১৯ নভেম্বর, ১৯২৩

প্রিয় জওহরলাল,

তোমার চিঠি পেলাম। তারকনাথ দাসের চিঠিখানি পড়ে তোমাকে ফেরত পাঠাচ্ছি। তাঁর কয়েকটি প্রস্তাব ভাল, এবং কংগ্রেস-নেতাদের এই প্রস্তাবগুলি বিবেচনা করে দেখা উচিত। আশা করি, কোকনদে অথবা তার আগেই এগুলি বিবেচনা করে দেখার সুযোগ পাওয়া যাবে। অকালী রক্ষা কমিটি সম্পর্কে তোমার বাবা অকালী নেতাদের সঙ্গে যে ব্যবস্থা করেছেন, এখনও তাঁদের কাছ থেকে সে-বিষয়ে আমি কোনও খবর পাইনি। তাঁদের কাছ থেকে খবর না পাওয়া পর্যন্ত এ-ব্যাপারে আমি কোনও ব্যবস্থা অবলম্বন করতে চাই না। এখনও আমি যথেষ্ট সবল বোধ করছি না, এবং দিন কয়েকের জন্য হয়ত নিখোঁজ হয়ে যেতে পারি। তোমার প্রস্তাবিত কর্মসূচী আমি দেখেছি। এতে আমার কোনও আপত্তি নেই। আশা করি তোমার শরীরের তুমি যত্ন নেবে। যে-মানুষ নিজের স্বাস্থ্যের যত্ন নেয় না, তার মুখে অবশ্য এমন উপদেশ শোভা পায় না।

তোমাদের
লাজপত রায়

২৬ ম. মহম্মদ আলী কর্তৃক লিখিত

[ভারতে খিলাফত আন্দোলনের নেতা বিখ্যাত আলী ভ্রাতৃদ্বয়ের অন্যতম ছিলেন মওলানা মহম্মদ আলী। বিশের দশকে জাতীয় আন্দোলন ও অসহযোগে তিনি এক অত্যন্তই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। দু ভাইয়ের মধ্যে বয়সে বড় ছিলেন ম. শওকত আলী। তাঁর একখানি চিঠি কয়েক পৃষ্ঠা পরে প্রকাশিত হল। ম. শওকত আলী ছিলেন এক সুবিশাল পুরুষ। যেমন লম্বা, তেমনি চওড়া, তেমনি ভারী। তাঁকে বলা হত "বড় ভাই।"]

ফেয়ারি ভিলা,
ভাওয়ালি, ইউ. পি.
[তারিখ নেই—? ১৯২৩]

প্রিয় জওহর,

আমার মুক্তির পর এই প্রথম আমার আপন প্রদেশে যে রাজনৈতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল, তাতে উপস্থিত থাকতে না পেরে যে কতদূর দুঃখিত হয়েছি, তা তোমাকে বলে বোঝাতে পারব না। আমার টেলিগ্রামে সব খুলে বলেছি। তার থেকে নিশ্চয়ই তোমরা বুঝতে পেরেছ যে আদৌ সম্ভব হলে আমি নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে উপস্থিত থাকতাম। দিল্লি থেকে প্রত্যাবর্তনের পর আমার স্বাস্থ্য মোটেই ভাল যাচ্ছিল না। দিন কয়েক খুব জ্বরে ভুগলাম। কথা ছিল ১ অক্টোবর তারিখে আলমোরা যাব, কিন্তু জ্বরে পড়ায় সে-পরিকল্পনা বিসর্জন দিতে হল। সেরে উঠতে না উঠতেই শক্তিশালী এক আলমোরা-বাহিনী আমাকে অসহযোগের এই ঘাটিতে নিয়ে আসে এবং আমাকে তখন আমার পুরনো বন্ধু সার উইলিয়ম "ম্যালিস" [মরিস]-এর অনুসরণ করতে হয়। এ প্রায় পাপের শাস্তি।

আমি দিল্লিতে থাকতে এখানে বেশ শুকনো এবং উজ্জ্বল আবহাওয়া গিয়েছে; আমার মেয়ের টেম্পারেচার তখন অনেক নেমে গিয়েছিল। বিকেলের দিকে মোটামুটি ১০০° এবং সন্ধ্যার দিকে ১০১° থাকত। কিন্তু আমি ফিরে আসবার দিন দুয়েক আগে থেকে আবহাওয়া আবার আর্দ্র হতে শুরু করে; ফলে তার পরের দিন দশেকের মধ্যে টেম্পারেচার আবার ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেয়ে ১০৩°তে গিয়ে দাঁড়ায়। ৫ তারিখ থেকে আমিনা অবশ্য আবার একটু ভাল আছে। এখন তার টেম্পারেচার বিকেলের দিকে ১০০° এবং সন্ধ্যার দিকে ১০১·৪° থাকছে। আশা করি, অক্টোবর মাসে ওর অবস্থার অনেক উন্নতি হবে। সযত্ন সেবার মধ্য দিয়ে এই আবহাওয়াটাকে যাতে কাজে লাগান যায়, তার জন্য সারা মাসটা ওর কাছে থাকব, এই আমার ইচ্ছে। আসলে "রোদ থাকতে থাকতে খড় শুকিয়ে নেওয়া দরকার।" কিন্তু শওকত এখন যে-কোনদিন মুক্তিলাভ করতে পারে; এখন আমাকে কাজে ব্যস্ত থাকতে হবে, এবং আমি বোম্বাই প্রেসিডেন্সি রওনা হচ্ছি। শওকত যদি শেষ তারিখ অর্থাৎ ৩১ অক্টোবরের আগে ছাড়া না পায় তাহলে যেহেতু আমার ৭ নভেম্বরের আগে ফিরবার আশা নেই, আমিনা তাই স্বভাবতই আমাকে যেতে দিতে চাইছে না। অনেক কষ্টে সে ১৭ এবং ১৮ তারিখের জন্য আমাকে জলন্ধর যেতে দিতে রাজী হয়েছিল। তার জন্য ১৫ তারিখে এখান থেকে যাত্রা করব ভেবেছিলাম। এদিকে আমার লখনউ যেতে না পারার ত্রুটি ক্ষমা করে মওলানা আবদুল বারি নিজেই এখানে আসছিলেন, কিন্তু আসবার ব্যাপারে দুবার তিনি বাধাগ্রস্ত হয়েছেন। এ-কারণে আমি ১৪ তারিখেই ভাওয়ালি ত্যাগ করে লখনউ যাত্রার ব্যবস্থা করেছি। ১৬ তারিখে আমি লখনউ থেকে জলন্ধর রওনা হব। ঐ তারিখে তুমি অবশ্যই পাঞ্জাব মেলে আমার সঙ্গে যোগ দেবে। তোমার সঙ্গে অনেক বিষয় আলোচনা করবার আছে। নানা ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে।

তোমাদের সম্মেলনে কোন মতেই উপস্থিত থাকা সম্ভব হল না। তার জন্য যে আমি নিরতিশয় দুঃখিত, সম্মেলনে এ-কথা জানিও। তোমাদের মধ্যে উপস্থিত থাকা সম্ভব হলে কোনমতেই আমি অনুপস্থিত থাকতাম না। ইউ. পি.কে যে "ডিসইউনাইটেড প্রভিন্সেস" বলে তিরস্কার করা হয়, তোমাদের সম্মেলন সেই তিরস্কারের কারণ দূর করতে পারবে বলে আশা করি। নিষ্পেষিত এবং নিপীড়িত যে মানবতা আজ ইউরোপের পায়ের তলায় অবর্ণনীয় যন্ত্রণা ও অপমান সহ্য করছে, তাকে ঐক্যবদ্ধ করাই জাতীয় কংগ্রেস সংগঠনের লক্ষ্য হওয়া উচিত; পুণ্যভূমি কাশী থেকে প্রাদেশিক কংগ্রেস সম্মেলন আজ সেই মহত্তর ও দৃঢ়তর সংগঠনের বাণী পাঠাক। যে দাসত্ব শুধুই শরীরের নয়, আত্মারও, সেই সর্বনাশা দাসত্বের শৃংখল থেকে আমাদের মাতৃভূমিকে মুক্ত করবার জন্য সমস্ত সংকীর্ণতা, গোঁড়ামি ও অসহিষ্ণুতাকে বিসর্জন দিয়ে এই সম্মেলন থেকে আমরা সবাই যেন সত্য অর্থে শুদ্ধ হয়ে উঠতে পারি। ঈশ্বর তোমার প্রয়াসকে সাফল্যমণ্ডিত করুন, তিনি আমাদের নূতন সাহস, দৃঢ় সংকল্প এবং জয়েচ্ছা দান করুন। প্রাচীন কালের আধ্যাত্মিকতার কিছু অংশও যদি কাশীতে থেকে থাকে, তাহলে যেন ইহনিরপেক্ষ ধর্মনিষ্ঠা নিয়ে আমরা আমাদের মহান নেতা গান্ধীজীর কাজ শুরু করে দিতে পারি। ভারতের তথা প্রাচ্যভূমির তথা সমগ্র মানবতার মুক্তি একমাত্র এই পথেই সম্ভব।

তোমাদের সবাইকে ভালবাসা ও তোমাকে স্নেহচুম্বন জানাই।

স্নেহানুরক্ত
মহম্মদ আলী

২৭ ম. মহম্মদ আলী কর্তৃক লিখিত

ভাওয়ালি, ইউ. পি.,
৭ নভেম্বর, ১৯২৩

প্রিয় জওহর,

তোমার ১ তারিখের পত্রের জন্য অনেক ধন্যবাদ। জলন্ধরে, অমৃতসরে, এবং বিশেষ করে লাহোরে, তোমার অভাব আমরা বিশেষভাবে বোধ করেছি। লাহোরের "নেতারা" দেখলাম বড়ই সংকীর্ণমনা। যে-সমস্ত "অসহযোগী" একদিন দাবি জানিয়েছিলেন যে ব্যবহারজীবীদের আদালত বর্জন করতে হবে, জনৈক সহযোগী মন্ত্রী (যিনি কিনা মুসলমান) কর্তৃক হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে বণ্টিত চাকরির ভাগ-বাঁটোয়ারার হার নিয়ে সেই তাঁরাই এখন কোঁদল করছেন, এ কি ভাবতে পারা যায়! একমাত্র শান্তনম ও অন্যান্য জনকয়েকের মধ্যে খানিকটা ছাড়া লাহোরের এই নেতৃবৃন্দের আর কারও মধ্যেই গান্ধীবাদের নামগন্ধও আমি দেখতে পাইনি। অথচ এই পাঞ্জাবের অপমানেই সারা ভারত জাগ্রত হয়ে উঠেছিল। পাঞ্জাব সত্যিই আমার কাছে একটা অনন্ত ধাঁধার মত। মাঝে-মাঝে যারা এত সাহসের পরিচয় দেয়, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান বাহিনীর অধিকাংশ সৈন্যই যাদের মধ্য থেকে সংগৃহীত হয়েছে, এত অল্পে যারা ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে, কী করে যে তারা এত তাড়াতাড়ি তাদের অপমানের কথা বিস্মৃত হতে পারে, নিজেদের তুচ্ছ কলহগুলিকে মিটিয়ে না নিয়ে কী করে যে তারা বিদেশী অত্যাচারীর পায়ের তলায় পড়ে থাকতে পারে, এ আমি কিছুতেই বুঝে উঠতে পারি না। শিখদের সমস্যাটিকে বিবেচনা করে দেখবার জন্য অমৃতসরে যাতে ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক আহ্বান করা হয়, তার জন্য আমরা বেংকটাপ্পাকে বিশেষভাবে অনুরোধ করেছি। পাঞ্জাব ও যুক্তপ্রদেশে যে সাম্প্রদায়িক বিরোধ বর্তমান, তা নিয়েও অবশ্য বৈঠকে আমরা আলোচনা করব। বৈঠকে তোমার উপস্থিত না থাকলে চলবে না। আবার যদি তুমি অসুখ বাধাও, তাহলে তোমাকে কিছুতেই আমি ক্ষমা করব না। লখনউ মেলযোগে ১২ তারিখে সেখানে আমি উপস্থিত হব। এলাহাবাদে রীডিংয়ের অভ্যর্থনা সম্পর্কে লীডার পত্রিকায় ফলাও করে যে বিবরণ প্রকাশ করা হয়েছে, তাতে এ-বিষয়ে প্রকৃত খবর তুমি যদি আমাকে না জানাতে তাহলে তোমার এবং তোমার বাবার প্রতি এলাহাবাদের অনুরক্তি, এবং এলাহাবাদের সামনে যে-সমস্ত আদর্শ তোমরা তুলে ধরেছ, সে সম্পর্কে আমার মনে সন্দেহের সৃষ্টি হতে পারত। অবশ্য লীডারকেও আমরা চিনি। এদের বোম্বাইয়ের সংবাদদাতার কত বড় ধৃষ্টতা ভেবে দেখ, সে জানিয়েছে, মাত্র ৫০ জন লোক বোম্বাই স্টেশনে উপস্থিত হয়ে আমাকে অভ্যর্থনা জানিয়েছিল। প্রকৃত প্রস্তাবে, সর্বত্র যাঁদের দেখা যায়, সেই ফোটোগ্রাফার এবং সিনেমার লোকটি সেখানে উপস্থিত ছিলেন। রবিবারের বম্বে ক্রনিক্‌ল পত্রিকায় অভ্যর্থনার একটি ছবি ছাপা হল। একমাত্র সেই ছবির মধ্যেই বোধহয় দু-তিন হাজার লোক গোনা যাবে। আমি শুধু এইটুকু জানি যে মা আর আমার জন্য যে গাড়ি অপেক্ষা করছিল, অনেক কষ্টে ভিড় ঠেলে সেই গাড়ির কাছে গিয়ে আমরা পৌঁছতে পেরেছি। সে যাক, লীডার আর তার "পুষ্যি"দের ত আমরা বিলক্ষণ চিনি।

ইন্দু, শ্রীমতী জ, "স্বরূপ আপা" আর বাবাকে আমার সপ্রীতি শ্রদ্ধা জানাই

স্নেহানুরক্ত
মহম্মদ আলী

২৮ ম. শওকত আলী কর্তৃক লিখিত

সুলতান ম্যানশন, ডোংরি, বোম্বাই
২৯ নভেম্বর, ১৯২৩

প্রিয় জওহর-ভাই,

নিজের হাতে তোমাকে এই চিঠি লিখছি। তোমার "বড় ভাই" চোর আর কসাইদের খপ্পরে পড়েছিল। তার মাংসের জন্য তাদের লোভের সীমা ছিল না। আমার ক্ষতস্থান নিয়ে বেশ কষ্ট পেয়েছি। আপাতত বিশ্রাম নেওয়া বা শান্তিতে থাকা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। প্রথমত, ভালবেসে যাঁরা দেখা করতে এসেছিলেন, তাঁদের আমি ফিরিয়ে দিতে পারিনি। তারপর কাজকর্মও অনেক ছিল। সর্বোপরি আমার নিজের মস্তিষ্ককেও সারাক্ষণ ব্যস্ত রাখতে হয়েছে। যা-ই হক, আগের চাইতে এখন একটু ভাল বোধ করছি, এবং আশা করি ৪ তারিখে এলাহাবাদে তোমাদের কাছে গিয়ে পৌঁছতে পারব। মানপত্র, সংবর্ধনা, এ-সবেরই মূল্য আমি বুঝি। কিন্তু তার জন্য আমি যাচ্ছি না। এমন কি, কর্মীদের সঙ্গে দেখা করতে বা খোলাখুলিভাবে তাঁদের সঙ্গে আলোচনা করতেও না। যাচ্ছি আসলে শান্ত চিত্তে তোমার সঙ্গে আর একবার কথা বলতে। এ-বিষয়ে এখন আমি দৃঢ়নিশ্চিত যে দেশের পক্ষে এখন একটা পরিষ্কার, ঋজু ও সাহসী নীতি অবলম্বন করা দরকার। ঈশ্বর সহায় হলে নিশ্চয়ই আমরা স্বরাজ লাভ করব, আবার আমাদের "প্রিয় নেতা" আমাদের পরিচালনা করবেন। আর তা যদি না হয়, হাজারে হাজারে আমরা কারাবরণ করে তাঁর সঙ্গে যোগ দেব। কারাগারের ভিতরেই তখন আমাদের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। সস্তা-শহীদ হওয়াতে আমার আস্থা নেই। কারারুদ্ধ হবার চাইতে মুক্ত থাকতেই আমি ভালবাসি। কিন্তু উদ্দেশ্যহীন ভাবে ঘুরে বেড়াবার জন্য কিংবা বৃথা কালক্ষেপ করবার জন্য ত আমি মুক্ত থাকতে চাই না, আমি মুক্ত থাকতে চাই কাজ করবার জন্য। সাক্ষাৎমত আরও কথা হবে। মা, কমলা বেন, স্বরূপ বেন আর ছোট্ট ইন্দু এবং ভগিনী উমাসহ সমগ্র নেহরু-গোষ্ঠীকে আমার সালাম জানাই।

স্নেহানুরক্ত
শওকত আলী

২৯ ম. মহম্মদ আলী কর্তৃক লিখিত

[ম. মহম্মদ আলী এই সময় ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন। আমি ছিলাম অন্যতম সাধারণ সম্পাদক।]

ন্যাশনাল মুসলিম ইউনিভার্সিটি,
আলীগড়,
১৫ জানুয়ারি, ১৯২৪

ব্যক্তিগত

প্রিয় জওহর,

এইমাত্র তোমার চিঠি পেলাম। যে অযৌক্তিক বিনয় তুমি জানিয়েছ, তার বিরুদ্ধে পুনর্বার "অত্যন্তই তীব্রভাবে প্রতিবাদ" জানাই! প্রিয় জওহর, সম্পাদক হিসেবে তোমার উপস্থিতিকে ওয়ার্কিং কমিটির কয়েকজন সদস্য সন্দেহের চোখে দেখেন এবং অপছন্দ করেন বলেই ত তোমার উপস্থিতিকে আমি এত পছন্দ করি। তোমার কি ধারণা যে সভাপতি হিসেবে আমার উপস্থিতিতেই তাঁদের আস্থা আছে, অথবা এটা তাঁরা পছন্দ করেন? আমার বন্ধুরা যে আমার কাছে কী চান, দিল্লিতে

সেটা আমি বুঝতে পেরেছি, বুঝে বেদনা পেয়েছি। আমার নেতৃত্ব মেনে নিয়ে যেভাবে তাঁরা আমার গুণকীর্তন করেছেন, তার তুলনা হয় না। কিন্তু আসলে তাঁরা চান যে তাঁরাই আমাকে পরিচালিত করবেন। যখনই তাঁদের নতুন কোনও পথের নির্দেশ দিতে যাই, তখনই তাঁরা পিছিয়ে যান। সভাপতি হিসেবে যে দায়িত্বভার আমার উপরে অর্পণ করা হয়েছে, তাকে ঝেড়ে ফেলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। দলীয় সংকীর্ণতা পরিহার করে আমি যে তোমাকে, কিচলুকে, দেশপাণ্ডেকে এবং ওয়ার্কিং কমিটির অন্য কয়েকজন সদস্যকে আশ্রয় করতে বাধ্য হয়েছিলাম, তার কারণ আর অন্য-কিছুই নয়, জীবে দয়া। আমাদের ওয়ার্কিং কমিটিকে নিশ্চয়ই খুব একতাভাবাপন্ন বলা চলে না, এবং কোনও কিছুকেই যে এই কমিটি নম্রভাবে মেনে নেবে না, তাও ঠিক। তবে আমার ধারণা এই দিয়েও "কাজ চলবে"। কাজ চলবে তোমার মতন জনকয়েক মানুষের জন্য, যাঁদের নির্দলীয় মনোভাবের উপর আমি আস্থা স্থাপন করতে পেরেছি। ফারসী প্রবাদে যেমন বলা হয়েছে, আমাদের অর্কেস্ট্রাও সেইভাবেই বাজবে:

> মন চি মে' সরায়ম ওয়া তম্বুরা মান চে মি সরায়ত্ [আমি কী সুরে গাইছি, আর আমার তম্বুরাতেই বা কী সুর ধ্বনিত হচ্ছে]

কিন্তু উপায়ই বা কী। "অতীতের মূর্খতার জন্য অশ্রুমোচন" তোমার স্বভাব নয়, এ-কথা তোমার বলবার দরকার ছিল না; এ আমি জানি। সুতরাং আবার উৎফুল্ল হও। এস, কাজ শুরু করে দেওয়া যাক। "আমরা কি ভগ্নোদ্যম হয়ে পড়েছি?" না!

নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির দপ্তর এখনও এসে পেঁছয়নি জেনে দুঃখিত হলাম। গোছগাছ করে রওনা হবার জন্য ওদের তার করে দাও। আমার ছুটির পর্বও ত শেষ হল। বিভিন্ন প্রদেশ এবং ব্যক্তিগতভাবে কমিটির জনকয়েক সদস্যের কাছে এবারে চিঠি লেখার পালা শুরু করতে হবে। আমার ব্যক্তিগত সহকারীর কাজ করতে পারে, শর্টহ্যাণ্ড-জানা এমন একজন ভাল টাইপিস্ট এখনও আমি পাইনি। এমতাবস্থায় তোমাকে দপ্তরের একজন কেরানীকেই আমার কাছে পাঠিয়ে দিতে হবে। সব চাইতে ভাল যাকে পাবে, তাকেই পাঠিও। লোকটি যদি অপদার্থ হয়, এবং যদি বুঝি যে অকারণে তাকে টাকা দেওয়া হচ্ছে, তাহলে এই সুযোগে তাকে তাড়াতে পারব। আমার জন্য প্রকৃতই দক্ষ একজন স্টেনোগ্রাফার সংগ্রহ করবার চেষ্টা কর।

দরখাস্তের প্রসঙ্গে জানাই, অজস্র দরখাস্তের মধ্যে থেকে যে-কটি তুমি বাছাই করেছ, সেগুলিকে আমি একবার দেখে দেব। আমাদের যোগ্যতার মান অবশ্যই খুব উঁচু হওয়া চাই। এক গাদা অকর্মণ্য লোকের চাইতে অল্প কয়েকজন দক্ষ লোকও ভাল। আণ্ডার-সেক্রেটারির যে পদগুলি রয়েছে, তার একটি নেবার জন্য আমি শেরওয়ানীকে রাজী করাবার চেষ্টা করছি। অবশ্য যে-পদটিতে লোক নেবার তোমার এখন সব চাইতে বেশী দরকার, এটি সে-পদ নয়। তোমার চাই সেই লোক, কংগ্রেসের বাঁধা-ধরা কাজগুলির পুরো দায়িত্ব যিনি নেবেন। শেরওয়ানীকে যদি আমাদের সদস্য-সংগ্রহ বিভাগের ভার দেওয়া হয়, তাহলে খুবই ভাল। ও-কাজের পক্ষে শেরওয়ানী অতি যোগ্য ব্যক্তি। সদস্য-সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য চিঠি-পত্রের মারফত প্রদেশগুলিকে তাড়া দেওয়া ছাড়াও মাঝে-মাঝে প্রাদেশিক কেন্দ্র-গুলিতে গিয়ে ও দেখে আসতে পারবে ঠিকমত সেখানে কাজ হচ্ছে কি না।

অবশ্য তুমি চাও যে বড্ড বেশী না ঘুরে এক জায়গায় বসে কাজ করা হক। তা আমি জানি। কিন্তু এমন কয়েকটা বিভাগ আছে, যেখানে আণ্ডার-সেক্রেটারিকে

কেন্দ্রীয় দপ্তরের হয়ে খানিকটা ইনস্পেক্টর জেনারেল বা কমিশনারের ধরনে কাজ করতে হবে। প্রদেশগুলির মধ্যে যেগুলি পিছিয়ে পড়ছে, তাদের তাড়া দিয়ে তাঁকে আবার কাজে লাগাতে হবে।

তোমার প্রাদেশিক কমিটির দেউলিয়া হয়ে যাবার বিষয়ে তুমি যা লিখেছ, অন্য প্রতিটি প্রদেশের সম্পর্কেও সে-কথা সমান প্রযোজ্য। সদস্যপদের চাঁদা থেকে—যতই সামান্য হক—কিছু ত আসে। দ্রুত যাতে আরও সদস্য সংগ্রহ করা হয়, তার জন্য আমাদের চাপ দিতে হবে। কিন্তু টিলক স্বরাজ্য তহবিলের কাজ আবার নতুন করে শুরু করা দরকার। আমার ইচ্ছে যুক্তপ্রদেশকে দিয়ে কাজ শুরু করব। আমার "দয়ালু" বন্ধুরা যার জন্য আমাকে সভাপতির আসনে বসিয়েছেন, যুক্ত-প্রদেশের সেই খিলাফত কমিটিগুলিকে আমি চিঠি লিখে দিচ্ছি। কংগ্রেস কমিটি-গুলির সঙ্গে ব্যবস্থা করে খিলাফত ও কংগ্রেস কমিটি নজরানা হিসেবে আমাকে যে টাকা দেবে, আমন্ত্রণের সঙ্গে সেই নজরানা পাঠিয়ে দেবার কথাও আমি তাদের জানাচ্ছি। তুমি কি অল্প কয়েকদিনের জন্য যুক্তপ্রদেশে আমার সঙ্গে সফর করতে পারবে, নাকি তোমার অফিস সংগঠনের জন্য এলাহাবাদেই তোমাকে থাকতে হবে? আমার সঙ্গী হিসেবে ভাল একজন হিন্দুকে পাওয়াই দরকার। নিজে যদি না-ই আসতে পার, আর কাকে সঙ্গে নিলে ভাল হবে বলে তোমার মনে হয়?

ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকের প্রসঙ্গে জানাই, জানুয়ারির শেষের দিকে যে-দিন সুবিধা হয়, বৈঠক আহ্বান করতে পার। তার আগে সম্ভব হবে না। অবশ্য মহাত্মাজীর অসুস্থতার জন্য তার আগেই যদি আমাদের পুনা যেতে হয়, ত সে স্বতন্ত্র কথা। পুনাতেই বৈঠকের ব্যবস্থা করছ না কেন?

লাজপত রায়ের উক্তি উদ্ধৃত করে যে তার পাঠিয়েছে, তা আমি পেয়েছি। তিনি চান যে মহাত্মার মুক্তির জন্য আমরা একটা জাতীয় দাবি উত্থাপনের ব্যবস্থা করি। কী ভেবেছেন তিনি আমাদের? অসহযোগ-আদর্শের যেটুকু আমাদের এই বন্ধু গ্রহণ করেছিলেন, তা তিনি সর্বাংশেই মুছে ফেলেছেন মনে হয়। যে সরকার অসুস্থতার কারণে মহাত্মাকে একদিন মুক্তি দিয়েছিল, এত বড় অসুখের পর মহাত্মাকে তারা বোধ হয় আর কারারুদ্ধ করে রাখবে না। তবে তাঁর মুক্তির জন্য দাবিদাওয়া তুলবার ভার মালব্য আর গোঁরদের হাতেই ছেড়ে দিতে হবে। আর লালাজীও ত বলা বাহুল্য সেই একই দলের লোক। লালাজী এবারে যদি প্রকাশ্যে তাঁদের সঙ্গে যোগ দেন, তাহলেই ভাল হয়। আত্মিকভাবে মহাত্মার যাঁরা সব চাইতে বড় বিরোধী, তাঁরাই যে এখন সব চাইতে সরবে সরকারের কাছে তাঁর মুক্তির দাবি জানাচ্ছেন, এ বড় বিচিত্র ব্যাপার। আমাদেব কথা বলতে পারি, তাঁর মুক্তির জন্য মাত্র একটি দাবিই আমাদের জানাবার আছে, সে-দাবি জাতির উদ্দেশে জানাতে হবে!

ইন্দু ও তোমার বোনকে আমার ভালবাসা, এবং তোমার মা ও স্ত্রীকে আমার শ্রদ্ধা জানাই।

স্নেহানুরক্ত
মহম্মদ আলী

৩০ ম. মহম্মদ আলী কর্তৃক লিখিত

জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া,
আলীগড়, ২১ জানুয়ারি, ১৯২৪

প্রিয় জওহর,

সরাসরি তার করে কেউ আমাকে জানাতে নাও পারে, এই ভেবে তোমার ও মালব্যজীর গ্রেপ্তারের সংবাদের জন্য ইদানীং রোজ সকালে লীডার পত্রিকাটি আমি

তন্ন-তন্ন করে পড়েছি। আজকের লীডার পড়ে উদ্বেগের অবসান হল। খবর পড়ে মনে হল, পণ্ডিতজী অবশেষে গভর্ণরকে "বাগ মানাতে" পেরেছেন। গভর্ণর যে শুধু প্রয়াগে এসেছেন, তা-ই নয়; গঙ্গা ও যমুনা নদী, এবং সঙ্গমস্থলে এদের তল দিয়ে তৃতীয় যে অদৃশ্য পবিত্র নদীটি প্রবাহিত হয়ে ত্রিবেণীর সৃষ্টি করেছে, তার ভার গ্রহণের জন্য তোমাদের মিউনিসিপ্যালিটি যে প্রস্তাব নিয়েছে, তা নিয়ে আলোচনা করবার উদ্দেশ্যে তোমাকে তিনি লাট-প্রাসাদেও নিয়ে গিয়েছিলেন দেখছি। ব্যাপারটা ঠিকই বুঝতে পেরেছি ত? না কি আর-কিছু না হক, এই "দুর্ভাগ্য"এর মধ্যে পণ্ডিতজীকে তোমার "অপ্রত্যাশিত সঙ্গী" হিসেবে পাবার জন্য এখনও তুমি কারাগারে যেতেই কৃতসংকল্প? কালকের লীডারেও যদি তোমার গ্রেপ্তারের সংবাদ না পাই, তাহলে তুমি আমাকে যে তিনটি চিঠি দিয়েছ, তার একটা দীর্ঘ জবাব লিখব। আপাতত জানাই, ২৪ তারিখ রাত্রে আমি দিল্লি রওনা হব। সেখান থেকে ২৫ তারিখ রাত্রে এক্সপ্রেসযোগে যাব কল্যাণ। সেখান থেকে পরবর্তী ট্রেনে ২৭ তারিখে আমার বাপুকে দেখবার জন্য পুনা যাব। ১৬ তারিখে বাপুকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, তাঁর কাছে যেতে পারি কি না। তাতে আমাকে বলা হয়েছিল, যেতে পারি বটে, কিন্তু আমাদের কেউ আপন কাজ ফেলে কোথাও যাক, এ তিনি চান না। সেইজন্যেই এই ব্যবস্থা করতে হল। পরে আনসারী আর হাকিমজীকেও বলা হয়েছে যে তাঁরা আমার সঙ্গে আসতে পারেন বটে, কিন্তু কোনরকমের বিক্ষোভ যেন দেখান না হয়। হৈচৈ এড়াবার জন্য আমরা স্থির করেছিলাম যে কাউকে না জানিয়ে আমরা যাব। কিন্তু আনসারী ডাক্তার-মানুষ। তক্ষুনি সে আমাদের যেতে দিল না। তার ভয় হয়েছিল যে আমরা হয়ত আমাদের আবেগ গোপন করতে পারব না। বাপুজীর উপরে তার প্রতিক্রিয়া ঘটতে পারে, এবং তিনি বড্ড বেশী ক্লান্ত হয়ে পড়তে পারেন। সুতরাং পরে যাওয়াই আমরা সাব্যস্ত করলাম। ২৭ তারিখে আমরা পুনা পেঁছিব। এতে করে আমার কাজের গাফিলতিও হল না। তার কারণ ২৯ ও ৩০ তারিখে আমার বোম্বাইতে উপস্থিত থাকবার কথা। তা ছাড়া বাপুও ততদিনে একটু সবল হয়ে উঠবেন। এখন তুমি কি পথিমধ্যে কোথাও অথবা কল্যাণ স্টেশনে এসে এই "থ্রী মাস্কেটিয়ার্স"এর সঙ্গে যোগ দিয়ে ২৭ তারিখে বাপুর সঙ্গে দেখা করতে চাও? তুমি আমাদের সঙ্গে যোগ দিতে পারবে কি না, এবং যোগ দিলে কোন্ স্টেশন থেকে দেবে, শুধু একটা তার করে সেটা জানিয়ো। কথাটা কাউকে জানিয়ো না। মানে বন্ধুবান্ধবদের জানাতে পার, কিন্তু তাঁরা যেন অন্য কাউকে না জানান। কাল সবিস্তার চিঠি লিখব।

চিরস্নেহানুরক্ত
মহম্মদ আলী

পুনশ্চ: আমি "স্যাস্ট্রাইটিস" (Sastritis) রোগে ভুগছি! "লেবার" দলের জয়লাভে "লিবারলরা" অভিনন্দন জানিয়েছে বটে, কিন্তু লিবারলরা নিপাত যাক। শাস্ত্রীর বোকামির জন্য আমার পুরা দুটি দিন সময় নষ্ট হয়েছে। তাঁকে তার করে তার উত্তরের জন্য ঝাড়া চার দিন অপেক্ষা করবার পর তাঁর বিবৃতির উত্তরে যখন আমি একটা বিবৃতি পাঠিয়েছি, তখন কিনা তিনি পত্রযোগে ক্ষমাপ্রার্থনা করলেন!!! অগত্যা আমার বিবৃতিটা প্রকাশ করা গেল না।

৩১ ম. মহম্মদ আলী কর্তৃক লিখিত

মাথেরান, ১৫ জন্ন, ১৯২৪

ব্যক্তিগত

প্রিয় জওহর,

এতদিন তোমাকে চিঠি লিখিনি, তার জন্য ক্ষমা কর। আমার মেয়ের মৃত্যুর পর আমার যে কিছুকালের জন্য অবসর নেবার কতখানি দরকার হয়েছিল, তা তুমি জান। এপ্রিলের গোড়ায় শওকত আবার অসুখে পড়ল, তারপর এল জহুহুর আলোচনা-পর্ব, সর্বশেষে এই উত্তর ভারত সফর। ম্যাথেরান থেকে ২০ মে তারিখে রওনা হয়ে ৩ জন্ন তারিখে আবার এখানে ফিরেছি। এই সব কারণে অবসর নেওয়া যে সম্ভব হয়নি, তাও আশা করি তুমি বুঝতে পারছ। "টুকরো" কিছু ছুটি পেয়েছি, কিন্তু এইভাবে ছুটি নিতে আমার ভাল লাগে না। তোমার ৬৫০।৩০, ৭৫০।২৫, ৭৫২।৭২ এবং ৭৮৬ নং চিঠি যখন আসে, আমি তখন দিল্লি, লাহোর, আলীগড়, রামপুর (শুধুই রেল-স্টেশন—ব্রিটিশ এলাকা!), নৈনিতাল আর লখনউয়ে। আর ৮২৪।৫৩ নং চিঠি যখন আসে, আমি তখন সবেমাত্র পথের ক্লান্তি কাটিয়ে উঠছি। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, এ-সব চিঠির বিষয়বস্তুতে এমন কিছু ছিল না, যার সম্পর্কে আমি তোমাকে কোনও পরামর্শ দিতে পারি; সুতরাং কংগ্রেসের কাজ নিশ্চয়ই ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। (সভাপতিরা বিজ্ঞ ব্যক্তি, তাই তাঁরা সম্পাদকের পদে পরিশ্রমী সক্রিয় কোনও ব্যক্তিকে নির্বাচন করে থাকেন; সভাপতিরা অলস হলেও তাই কাজ কখনও ক্ষতিগ্রস্ত হয় না!) মহারাষ্ট্রে কোণ্ড বেংকটাপ্পাজীর নির্বাচনী রায় সম্পর্কে সর্বশেষে তুমি যে ৮৬২।৪০ নং চিঠি লিখেছ, তাতে আমার নিজের এ-বিষয়ে কিছু করণীয় আছে, এমন কোনও কথা না থাকলেও, ব্যাপারটা আমার খুব শুভ বলে মনে হয়নি। অনিবার্য নিয়তির মতই এখন শ্রীমণ্ডালিকের কাছ থেকে একটি পোস্টকার্ড এসে পেঁৗছেছে, এবং তারই ফলে আমাকে আবার দারুণভাবে সক্রিয় হয়ে উঠতে হল। নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির সভায় রুলিং দেওয়াটাই যথেষ্ট খারাপ ব্যাপার, আগে থাকতে রুলিং দেওয়াটা আরও খারাপ। এ-বিষয়ে পৃথকভাবে তোমার কাছে লিখেছি, এবং শ্রীপরাঞ্জপে ও শ্রীমণ্ডালিককে আমি যে চিঠি দিয়েছি, তার অনুলিপিও সেই সঙ্গে পাঠান হয়েছে। আশা করি এ-বিষয়ে তুমি আমার সঙ্গে একমত যে ১৯ নং ধারার শেষ অনুচ্ছেদে বিশেষ কোনও প্রদেশের প্রতিনিধিদলের সম্পর্কে বলা হয়নি, সমগ্র নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির সম্পর্কেই বলা হয়েছে। আমার রুলিংয়ে শ্রীমণ্ডালিক যে খুশী হবেন, এমন মনে হয় না। আর কিছু না হক, "শান্তি" অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য আমি তাঁর দলকে আমেদাবাদে এসে আমাদের সঙ্গে যোগ দিতে দিতাম। কিন্তু "শান্তি" আমার ভাগ্যে নেই; সুতরাং আইনকে তার আপন পথে চলতে দেবার সিদ্ধান্তই আমি করেছি। যে-প্রদেশ সময়মত অথবা উপযুক্তভাবে তার প্রতিনিধিদল নির্বাচন করতে পারেনি, তার পক্ষে থেকে কোনও প্রতিনিধি প্রেরণ যদি সম্ভব না হয়, তাহলে বিশ্বজগতের বিরুদ্ধে তার অভিযোগের কোনও কারণ থাকতে পারে না। আমরা যদি তার পুরনো প্রতিনিধিদেরই আমন্ত্রণ জানাই, তাহলে সতর্ক হবার অথবা নতুন প্রতিনিধি নির্বাচনের উৎসাহও তার কখনও হবে না। এদের যা অভিযোগ তা নিশ্চয়ই প্রাদেশিক কর্ম-পরিষদের বিরুদ্ধে। আমার নিজেরই এখন এত দুশ্চিন্তা রয়েছে যে অন্যের দুশ্চিন্তা নিয়ে মাথা ঘামান আমার পক্ষে সম্ভব নয়। যা-ই হক, শ্রীমণ্ডালিক আমাকে ছেড়ে দেবেন না বলেই আশঙ্কা করি।

কিন্তু যে দুশ্চিন্তাটি এর চাইতেও অনিবার্য, মহাত্মাজীই তার জন্য দায়ী। এ-বিষয়ে তুমি বড়ই নীরব আছ, এবং একমাত্র শওকত ছাড়া এমন আর কেউ নেই, এই দুশ্চিন্তার ভাগ যাকে দিতে পারি। এখন এ-বিষয়ে তোমার মত কী, বল। জুহুতে বাপুর সঙ্গে আমার যে আলোচনা হয়েছিল, হিন্দু-মুসলিম বিরোধের ব্যাপারে তাতে আদৌ কোন সুফল হয়েছে কি না, তা আমি জানি না। অতি অল্প মুসলমানই বাপুকে পত্র দিয়েছে বলে আমার ধারণা। আমি যা শুনেছি, তা যদি বাপুকে না বলতাম, তাহলে এ-ব্যাপারে মুসলমানদের বক্তব্য প্রায় কিছুই বোধ হয় তাঁর কানে গিয়ে পেঁাছত না। নিজে জেনে, সেই জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে আমি কিছু বলতে পারিনি। আমার আলোচনায় শুধু এইটুকুর ইঙ্গিত দিতে পেরেছি যে, মুসলমানদেরও এ-ব্যাপারে একটা বক্তব্য আছে। অবশ্য একটা বিষয় যে আদৌ তাঁকে বোঝাতে পারিনি, তা আমি নিশ্চয় করে জানি। বিষয়টি হল তাঁর "ভক্ত ভাই" পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের চরিত্র। এ-যাত্রায় আমাদের মধ্যে তিনিই সব চাইতে বেশী জিতলেন! অথচ শওকত আর আমি, দুজনেই ভেবেছিলাম যে মাননীয় পণ্ডিতটির সম্পর্কে বাপু সম্পূর্ণই ভিন্ন ধারণা পোষণ করেন। তাঁর সম্পর্কে বাপু যা-কিছু বলেন, তা যদি সত্যিই বাপু বিশ্বাস করেন, তাহলে আশু ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আমার নিরাশ না হয়ে উপায় নেই। তোমার বাবার সঙ্গে এ-বিষয়ে আমার খোলাখুলি আলোচনা হয়েছে। তিনি আমাকে বললেন, এ-বিষয়ে তিনি আমার সঙ্গে অনেকখানিই একমত যে, গান্ধীবাদকে পরাভূত করা এবং কেবলমাত্র হিন্দুদের নেতা হওয়াই মালব্যজীর উদ্দেশ্য। তার কারণ একই সঙ্গে মুসলিম ও হিন্দুদের নেতা হওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। হিন্দু-মুসলিম ঐক্যও তাঁর আদর্শ নয়। প্রিয় জওহর, ঈশ্বর সাক্ষী, মুসলমানদের মধ্যেও মালব্যের মত কিছু-কিছু লোক আছে, এবং আমাকে তারা মোটেই পছন্দ করে না। তবে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আপন সম্প্রদায়ের উপরে পণ্ডিতজীর যে প্রভাব বর্তমান, মুসলমান সম্প্রদায়ের উপরে তাদের ততটা প্রভাব নেই। তার কারণ যোগ্যতার অভাব। সেই সঙ্গে এমন খ্যাতিও তাদের নেই যে তারা নিঃস্বার্থ, অথবা আপন সম্প্রদায়ের জন্য তারা বিশেষ কিছু করেছে। পণ্ডিতজীর সম্পর্কে বাপু যা বলেন, সত্যিই পণ্ডিতজী যদি তা-ই হন, তাহলে তোমাকে আর তোমার বাবাকে যে কোন্ কোঠায় ফেলব, তা আমি জানি না। তোমাদের দুজনের সঙ্গে তাঁর আকাশ-পাতাল তফাত। অন্তত তা-ই ত আমার মনে হয়েছে। কিন্তু হিন্দু-মুসলিম বিরোধও আমার আশু সমস্যা নয়। যত শীঘ্র এই বিরোধ দূরীভূত হবে বলে প্রথমটায় আমি আশা করেছিলাম, এখন বুঝতে পারছি যে তত শীঘ্র এটা দূরীভূত হবে না। স্বরাজীদের সম্পর্কে বাপু যে বজ্র হেনেছেন, তাই নিয়েই আমি সব চাইতে বেশী দুশ্চিন্তায় পড়েছি। আমি জানতাম এ-বজ্র নেমে আসবে, তবু আশা করছিলাম, শেষ পর্যন্ত হয়ত নেমে নাও আসতে পারে। আমাদের মত লোকরা যে স্বরাজদের কাজের সত্যিই কিছু সুবিধা করে দিয়েছে, তোমার বাবা অবশ্য তা স্বীকার করেন। তবে আমাদের পরিশ্রম সম্পর্কে যে প্রশংসা তিনি করেন, তার মধ্যে ঈষৎ অনিচ্ছার ভাবও বর্তমান। তাঁর প্রশংসা খানিকটা দ্বিধাগ্রস্ত। তার কারণ, সেই পরিশ্রমের আপন মূল্যে নয়, তার ফলাফলের মূল্যেই তিনি তাকে বিচার করে থাকেন। তাঁর মতন লোকের পক্ষে অবশ্য এইটেই স্বাভাবিক। আমরা যে পুরোপুরিভাবে "বজ্রাঘাত"টিকে নিবারণ করতে পারিনি, তার কারণ এটি "বিনা মেঘে" ঘটেছে। জুহুতে অনেকবারই আমরা বাপুর কাছে গিয়েছিলাম। বাপু যে কী করতে যাচ্ছেন, একবারে শেষবারের বৈঠকের শেষ সময়ে শওকত আর আমাকে তা তিনি জানালেন। আমি ত এসেই কথাটা তোমাকে বললাম, কিন্তু

তখনও আমার শেষ আশা ছিল যে বাপুর এটা হঠাৎই মনে হয়েছে, পরে আবার তাঁর মনোভাবের পরিবর্তন হবে। আমরা তাঁকে জানিয়েছিলাম যে ব্রিটিশ মন্ত্রিসভার তুলনাটা এখানে খাটে না; নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির সঙ্গে মন্ত্রিসভার চাইতে বরং কমন্স-সভার সাদৃশ্য অনেক বেশী। প্রকৃত প্রস্তাবে সমস্ত তুলনাই ভুল। তার কারণ নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতি হচ্ছে একটা ফেডারেল সংগঠন, এবং কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান ও নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির মধ্যে পরিবর্তনবিরোধীদের সংখ্যাই যদিও বেশী, প্রাদেশিক কমিটিগুলির সবকটিতে তাঁদের সংখ্যাধিক্য নেই। এক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলকে সংখ্যালঘু দলের অনুকূলে পদত্যাগ করতে বললে সে বড় অদ্ভুত ব্যাপার হবে।

আমার ধারণা, এ-বিষয়ে তুমিও বাপুর সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত নও। ঠিক কি না? তোমার পক্ষে তাঁর সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত হওয়া যদি সম্ভব হয়ে থাকে, অবশ্য আমাকে জানিও।

কিন্তু, বাপুর পরামর্শ ভাল কি মন্দ, সে-প্রশ্ন ছাড়া এর মধ্যে একটা "আইনগত" প্রশ্নও আছে। স্বরাজীদের সরে দাঁড়াতে বাধ্য করতে পারে, এমন কোনও আইন আছে কি? নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতিতে প্রস্তাব গ্রহণ করেই কি সুতা না কাটার অথবা তুলো না ধোনার অপরাধে কোনও সদস্যকে পদত্যাগে বাধ্য করা যাবে? আমার মনে হয়, বাপুর পরামর্শ সম্পর্কে আমার মতামত যা-ই হক না কেন, সভাপতি হিসেবে এর আইনগত পরিণাম বিবেচনাই আমার প্রথম কর্তব্য হবে। তুমি কী বল? তোমার বিবেচনায় আইনটাই বা কী?

এ-বিষয়ে অবশ্য বাপুর সঙ্গে আমি একমত যে, বর্তমান "মিথ্যাচার" শেষ হওয়া উচিত। গঠনাত্মক কার্যক্রমের প্রতি যে মৌখিক আনুগত্য বর্তমান, তা আমরা দীর্ঘকাল সহ্য করেছি। আমার মনে হয়, এমন অনেক কংগ্রেসকর্মী রয়েছেন, প্রকৃত প্রস্তাবে এই কার্যক্রমের প্রতি যাঁদের মনে বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা নেই। তবে অপ্রকাশ্যে এবং বন্ধুবান্ধবদের মধ্যেই সে-কথা তাঁরা স্বীকার করে থাকেন। আমরা নিজেরাই যদি গঠনাত্মক কার্যক্রমকে প্রায় ধর্মবিশ্বাসের মত আঁকড়ে না ধরি, তাহলে এই কার্যক্রম অনুসারে কাজ শুরু করার জন্য দেশকে যে কীভাবে আহ্বান জানাব, তা আমি বুঝতে পারি না। (ধর্মবিশ্বাস নিয়ে আমার এই বাড়াবাড়িতে পাছে তুমি মর্মাহত হও, তাই প্রায় কথাটা ব্যবহার করলাম!) অথচ বাপু যে যুক্তি দেখাচ্ছেন, তার মধ্যেও কোথাও একটা ফাঁক আছে বলে আমি মনে করি। যা-ই হক, পরিবর্তন-বিরোধীদের মধ্যে যারা স্বরাজীদের রক্তপানের জন্য উৎসুক হয়েছিল, তাদের মুখে যেন কুৎসিত একটা আনন্দ ফুটে উঠেছে। অন্তত আমার তা-ই মনে হয়। স্বরাজীদের সম্পর্কে বাপুর ধিক্কারকে ঈষৎ নরম করে এনে যেটুকু বা সুফল আমরা পেয়েছিলাম, বাপুর সর্বশেষ ঘোষণায় তিনি তাঁদের সমাজচ্যুত করায় সেইটুকু সুফলও নষ্ট হল। সরকারের সঙ্গে তাঁরা সহযোগিতার পক্ষপাতী; এইভাবে তাঁদের সমাজচ্যুত করায় তাঁদের সহযোগী মনোভাবকে আরও উসকে দেওয়া হল কি না, তা আমি জানি না। তোমার বাবা তাঁর ঠাণ্ডা মেজাজকে যতখানি বজায় রাখতে পেরেছেন, ততটা আমি আশা করিনি। তবে এটা তিনি করেছেন বোধ হয় জনসাধারণ আর সরকারের কথা ভেবে। এবং আমি আশঙ্কা করি, তোমার ভবিষ্যদ্‌বাণীই শেষ পর্যন্ত সত্য হবে। আমাদের কাছ থেকে তাঁরা আরও দূরে সরে যাবেন, এবং আমাদের সম্পর্কে তাঁদের মনোভাব আরও তিক্ত হয়ে উঠবে। স্বরাজীরা যে-কাজ করতে পারছেন না, তার চাইতে গঠনাত্মক কার্যক্রম অনুসারে পরিবর্তনবিরোধীরা যে-কাজ করছেন তার প্রতিই আমার বেশী আগ্রহ। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকার-প্রসঙ্গে (সাক্ষাৎকারে আমার মোটেই

আগ্রহ ছিল না) এ-কথা আমি বলেছি। আমি জানি যে এই ধরনের কাজের জন্য যে পরিবেশ দরকার, স্বরাজীরা তার মারাত্মক ক্ষতি করে থাকেন। প্রায়ই দেখা যায়, পরিষদে স্বরাজীরা কী করছেন না-করছেন, এবং ইংলণ্ডের উপর এবং সেখানকার ও এখানকার সরকারের উপর তার কী প্রতিক্রিয়া ঘটছে, শিক্ষিত শ্রেণীর মানুষেরা তাই নিয়েই মত্ত হয়ে আছে। অথচ এই শ্রেণীর মানুষেরাই ত জনসাধারণকে পরিচালনা করতে পারে। এদিকে, স্বরাজীদের ক্রিয়াকলাপের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখার ফল যে কত খারাপ, সে-কথা অন্তত আমাদের মধ্যে ত অনেকে জানেন; সেই তাঁদেরই কি এই নিয়ে ভাবনাচিন্তা করে সময় নষ্ট করা উচিত? স্বরাজীদের বিদ্রূপ না করে অন্তত আমাদের ত কাজ করা উচিত।

বর্তমান মুহূর্তে এই সব নিয়েই আমি দুশ্চিন্তায় আছি। আমি মুসলমান, এবং গোঁড়া মুসলমান নই। কিন্তু তাতেও আমার সুবিধে হচ্ছে না। কংগ্রেসের সভাপতি হিসেবে বৃহৎ ব্যাপারে আমি চুপ করে থাকতে পারিনে। ভোট না দিতে হলেই আমি সুখী হতাম। কিন্তু বৃহৎ ব্যাপারে তাও ত আমার পক্ষে সম্ভব নয়। ছোটখাট ব্যাপারে সভাপতিরা অবশ্য অনেক সময়েই ভোট দেন না। এলাহাবাদে তুমি পদত্যাগ করেছিলে। মুসলমান বলেই পদত্যাগ করাও আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তার কারণ, আমি যদি পদত্যাগ করি, তাহলে "হিন্দু-মুসলিম ঐক্য" তার দ্বারা গুরুতরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে বলেই আমার আশঙ্কা। আমার পদত্যাগের জন্য দাবি জানিয়ে যারা প্রস্তাব এনেছে, তাদের মত মানুষের দ্বারা যখন আমি অপমানিত হই, অথবা অন্য অনেকে যখন আমার ব্যাজস্তুতি করে অথবা সরাসরি আমার নিন্দা করে এমন কি তখনও যে মানুষ হিসেবে আমার মর্যাদারক্ষায় আমি তৎপর হব, তাও আমি পারিনে, তাও আমার কাছে বিলাসের সমতুল! এতদিন পর্যন্ত আমার এই মনোভাবের কথা আমি গোপন রেখেছি; আর কাউকে এ-কথা জানাতে চাইনে বলেই এই চিঠি লিখতে এত দেরি হল। এখন এত স্থূল ও অগোছালোভাবে আমার মনের কথা ব্যক্ত করবার পর ইচ্ছে হচ্ছে যে—জিন্নার ভাষায়—চিঠিখানি ছিঁড়ে ফেলে বাজে-কাগজের ঝুড়িতে নিক্ষেপ করি। সে-ইচ্ছে দমন করলাম!

ভাল কথা, কোন পথে তুমি আমেদাবাদ যাবে? দিল্লি হয়ে ২৪ তারিখ রাত্রে অথবা ২৫ তারিখ সকালে আমার সঙ্গে চল না কেন?

ইন্দুকে ভালবাসা এবং তোমার স্ত্রী ও বোনকে সস্নেহ শুভেচ্ছা জানাই।

স্নেহানুসক্ত

মহম্মদ আলী

পুনশ্চ: একেই ত কংগ্রেস ও খিলাফত (এ-ব্যাপারে আমার নামোল্লেখ না করে মওলানা আবুল কালাম আজাদ সংবাদপত্রে আমার উপরে আক্রমণ চালিয়েছেন) নিয়ে নানান দুশ্চিন্তায় আছি। তার উপরে আমার বুড়ো মাও আবার অসুখে পড়েছেন!

৩২ মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক লিখিত

[গান্ধীজীকে এক চিঠিতে আমি জানিয়েছিলাম যে আর্থিক ব্যাপারে বাবার বোঝা হয়ে থাকতে আমার খারাপ লাগছে, আমি স্বাবলম্বী হতে চাই। কিন্তু তার বাধা এই যে আমি সারাক্ষণের কংগ্রেস-কর্মী। কথাটা শুনে আমার বাবা অত্যন্তই ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। এ-চিঠিতে "হজরত" বলে যাঁর উল্লেখ করা হয়েছে তাঁর পুরো নাম হজরত মোহনী। উর্দু ভাষায় তিনি কবিতা লিখতেন। বৈপ্লবিক ও জাতীয়তাবাদী রাজনীতিতে তাঁর ভূমিকা ছিল অত্যন্তই সাহসিক।]

প্রিয় জওহরলাল,

১৫ সেপ্টেম্বর, ১৯২৪

তোমার মর্মস্পর্শী ব্যক্তিগত চিঠিখানি আমি পেয়েছি। আমি জানি যে সব কিছুকেই তুমি বীরের মত গ্রহণ করবে। আপাতত বাবা খুব বিরক্ত হয়ে আছেন। তোমার অথবা আমার, কারও পক্ষেই তাঁকে আর বিরক্ত করা উচিত হবে না। আদৌ সম্ভব হলে এ-বিষয়ে খোলাখুলিভাবে তাঁর সঙ্গে কথা বলে দেখতে পার, এবং এমন-কিছু কর না যাতে তিনি আহত হতে পারেন। তাঁকে অসুখী দেখলে আমি নিজেও অসুখী বোধ করি। তিনি যে অল্পে বিরক্ত হচ্ছেন, এতেই বোঝা যায় যে তাঁর মনে সুখ নেই। হজরত আজ এখানে এসেছিল। প্রতিটি কংগ্রেস-কর্মীকে সুতো কাটতে হবে, এমন কি আমার এই প্রস্তাবেও সে বিচলিত হয়েছে। ইচ্ছে করছে কংগ্রেস থেকে অবসর নিয়ে নীরবে এই তিনটি কাজ করে যাই। খাঁটি যে-কয়জন নরনারী আমরা পাব, এই তিনটি কাজ করেই তারা কুলিয়ে উঠতে পারবে না। কিন্তু এ-কথা শুনেও সবাই বিচলিত বোধ করে। পুনার স্বরাজীদের সঙ্গে আমার দীর্ঘ আলোচনা হয়েছে। সুতো কাটতে তারা রাজী নয়, আবার আমি যে কংগ্রেস ছাড়ব এতেও তারা রাজী নয়। এরা বুঝতে পারে না যে আমি যদি আমিই না থাকি, তাহলে আমার প্রয়োজনও ফুরিয়ে যাবে। এ এক শোচনীয় অবস্থা। তবে আমি নিরাশ হইনি। ঈশ্বরে আমি বিশ্বাস রাখি। আপাতত কী আমার কর্তব্য, শুধু সেইটুকু জেনেই আমি সন্তুষ্ট। তার বেশী জানা আমার সাধ্য নয়। তা-ই যদি হয় ত আমি দুশ্চিন্তা করব কেন?

তোমার জন্য কি কিছু অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা করব? যাতে কিছু টাকা পাওয়া যায়, এমন-কিছু কাজই বা তুমি করবে না কেন? বাবার সংসারে থাকলেও ত তোমাকে আপন পরিশ্রমেই জীবিকার্জন করতে হবে। তুমি কি কোনও সংবাদপত্রের সংবাদদাতা হতে চাও? নাকি অধ্যাপনার কাজ নেবে?

তোমাদের
মো. ক. গান্ধী

৩৩ মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক লিখিত

[গান্ধীজী একবার যখন তিন-সপ্তাহের জন্য অনশন করবেন বলে ঘোষণা করেন, আমার মনে হয়, এই চিঠিখানি সেই সময়ে লিখিত।]

১৯ সেপ্টেম্বর, ১৯২৪

প্রিয় জওহরলাল,

স্তম্ভিত হয়ো না। বরং, আমি যাতে আমার কর্তব্য করতে পারি, তার জন্য ঈশ্বর যে আমাকে শক্তি ও নির্দেশ দিয়েছেন, তার জন্য আনন্দ কর। এ ছাড়া আর-কিছু করা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। অসহযোগের প্রবক্তা বলে আমার উপরে গুরুভার এক দায়িত্ব ন্যস্ত রয়েছে। লখনউ ও কানপুর সম্পর্কে তোমার ধারণা কী হল, আমাকে লিখে জানিও। আমার দুঃখের পাত্র পূর্ণ হক। আমার মনে কোনও অন্তর্দ্বন্দ্ব নেই।

তোমাদের
মো. ক. গান্ধী

৩৪ মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক লিখিত

১৬ নভেম্বর, ১৯২৪

প্রিয় জওহরলাল,

মাতৃভূমির সেবা ও আত্মোপলব্ধির জন্য এ-দিনটি তোমার জীবনে আরও বহুবার ফিরে আসুক, এই কামনা করি।

সম্ভব হলে বাবার সঙ্গে অবশ্য এস।

তোমাদের
মো. ক. গান্ধী

৩৫ মহাত্মাজী কর্তৃক লিখিত

[আমার স্ত্রী একটি পুত্রসন্তানের জন্ম দিয়েছিলেন। সপ্তাহখানেকের মধ্যেই শিশুটি মারা যায়। এই টেলিগ্রামটি সেই উপলক্ষে প্রেরিত হয়েছিল।]

টেলিগ্রাম

সবরমতী ২৮ নভেম্বর, ১৯২৪

প্রাপক নেহরু এলাহাবাদ

শিশুর মৃত্যু-সংবাদে দুঃখিত। ঈশ্বরের ইচ্ছাই পূর্ণ হক। গান্ধী

৩৬ মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক লিখিত

২৫ এপ্রিল, ১৯২৫

প্রিয় জওহরলাল,

আমি এখন টিথলে আছি। জায়গাটা অনেকটা জুহুর মত। বাংলাদেশের অগ্নিপরীক্ষার জন্য যাতে তৈরি হতে পারি, তার জন্য চার দিন এখানে বিশ্রাম নেব। এখানে এসে আমার বকেয়া চিঠিপত্রগুলির উত্তর দেবার চেষ্টা করছি। চিঠিগুলির মধ্যে তোমার একখানি চিঠি পেলাম। চিঠিখানির মধ্যে তুমি “গড অ্যান্ড কংগ্রেস” প্রবন্ধটির উল্লেখ করেছ। তোমার দুঃখে আমি সহানুভূতি জানাই। জীবনে ও জগতে প্রকৃত ধর্ম যেহেতু সব চাইতে মহান বস্তু, তাই তাকে অপব্যবহারও করা হয়েছে সব চাইতে বেশী। যারা শুধু অপব্যবহারকারীদের আর তাদের অপব্যবহারকেই প্রত্যক্ষ করেছে, প্রকৃত বস্তুটির সন্ধান পায়নি, স্বভাবতই এই ধর্ম জিনিসটির সম্পর্কেই তারা বীতশ্রদ্ধ হয়ে ওঠে। কিন্তু যে-নামই তাকে দাও না কেন, ধর্ম ত প্রতিটি মানুষের আপন বস্তু; তার হৃদয়ের বস্তুও বটে। আর তীব্রতম দুঃখের মধ্যেও যা আমাদের পরমতম সান্ত্বনা এনে দেয়, তাকেই বলি ঈশ্বর। যা-ই হত, তুমি ঠিক পথেই চলেছ। যুক্তিবুদ্ধি মানুষকে অনেক সময় বিভ্রান্ত করে বটে, এবং কখনও-কখনও অন্ধ সংস্কারের সীমান্তবর্তী ভ্রান্তির মধ্যেও তাকে টেনে নিয়ে যায়, তবু যুক্তিকেই যদি একমাত্র কষ্টিপাথর করে তোলা হয়, তাতেও আমি আপত্তি করব না। গোরক্ষা আমার কাছে নিছক গোরুকে রক্ষা করার চাইতে অনেক বেশী তাৎপর্যময় একটি আদর্শ। যা-কিছুর মধ্যে প্রাণের স্পন্দন রয়েছে, গোরু তার একটি প্রতীক মাত্র। গোরক্ষার অর্থ দুর্বল, অসহায়, মূক ও বধিরমাত্রকেই রক্ষা করা। কথাটাতে মেনে নিলে দেখা যাবে, মানুষ এই সৃষ্টির অধীশ্বর ও প্রভু নয়, সে তার ভৃত্য। গোরুকে আমি করুণা-মন্ত্রের প্রতীক বলে মনে করি। গোরক্ষার ব্যাপারে এ-যাবৎ আমরা যা-কিছু করেছি, তা ছেলেখেলা মাত্র। কিন্তু শিগগিরই আমাদের বাস্তব অবস্থার সঙ্গে সংগ্রাম করতে হবে।

আমার আগেকার সব চিঠিই আশা করি তুমি পেয়েছ। ডাঃ সত্যপালের কাছ থেকে নৈরাশ্যময় একখানি চিঠি পেলাম। মাত্র দিন কয়েকের জন্যও যদি তোমার

পক্ষে পাঞ্জাবে যাওয়া সম্ভব হয়, তাহলে আমি সুখী হব। তুমি গেলে তারা বুকে বল পাবে। আশা করি কোনও শান্তিপূর্ণ ঠাণ্ডা জায়গায় গিয়ে বাবা মাস দুয়েক বিশ্রাম নিতে পারবেন। তুমিই বা সপ্তাহখানেকের জন্য আলমোরায় যাও না কেন। সেখানে গেলে কাজও হবে, সেই সঙ্গে ঠাণ্ডা হাওয়ায় সুস্থও বোধ করতে পারবে।

তোমাদের
বাপু

[গান্ধীজীকে আমরা অনেকেই 'বাপু' বলে সম্বোধন করতাম। শুধু আমরা কেন, ভারতবর্ষের বহু লোকই এই নামে তাঁকে সম্বোধন করতেন। 'বাপু' শব্দটির অর্থ পিতা।]

৩৭ সরোজিনী নাইডু কর্তৃক লিখিত

দি গোল্ডেন থ্রেশোল্ড,
হায়দরাবাদ, ডেকান,
১১ মে, ১৯২৫

প্রিয় জওহর,

দি গোল্ডেন থ্রেশোল্ডে আমার কারুকার্যময় মেহগনি কাঠের কৌচে বসে এই চিঠি লিখছি। আর আমার চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে রাস তাফারি, পাভো নুর্মি, নিকালো পিজানো আর ডিক ডিক মাজোং। চারপেয়ে এই প্রাণীরাই আসলে এ-বাড়ির মালিক। বাগানে অগ্নিবর্ণ গুল্মোর আর রক্ত-গোলাপ ফুটে আছে, আর তার মাঝখানে নানান পাখি গান গাইছে। আজ বিকেলে আমরা ওসমান সাগরে বেড়াতে যাব। মিনা তাই তার বইপত্তর, জুতো আর ক্রসওয়ার্ড পাজ্‌ল-এর জন্য ডিকশনারি গোছাতে ব্যস্ত। আর বোম্বাই থেকে সদ্য যে নতুন ফিয়াট গাড়িখানা এসে পৌঁছেছে, পদ্মজার তাই নিয়ে আনন্দের সীমা নেই। গোবিন্দ আজ দেরি করে তার প্রাতঃরাশ খাচ্ছে। প্রাতঃরাশ মানে ভাইগারা বাইঙ্গন আর ফলসার শরবত। খাচ্ছে, আর মনে মনে প্রার্থনা জানাচ্ছে, কর্তা নিশ্চয়ই পাহাড়ে আর জলায় বেরিয়ে তাঁর ছুটিটাকে মাটি করবেন না।

এক কথায়, আমি শান্তিতে আছি। ১৯২১ সনের পর এই আমি প্রথম ছুটি পেলাম। সত্যিই ছুটি। দুশ্চিন্তা, দায়িত্বভার আর কর্তব্যের ছদ্মবেশধারী সর্প-কুলের এই স্বর্গভূমিতে প্রবেশাধিকার নেই। হয়ত অন্যায় হয়েছে, তবু বীরের মতন সপ্তাহ কয়েকের জন্য আমি আমার কর্মভার পরিত্যাগ করে এসেছি। এসেছি যে, তার কারণ গঠনাত্মক কার্যক্রম আর তথাকথিত রাজনীতির আত্মক্ষয়কারী কর্মসূচী থেকে দিনকয়েকের জন্য অবসর নিয়ে আমার আত্মা একটা সৌন্দর্যের পরিবেশ, সবুজ গাছপালা, নীড় বাঁধতে ব্যস্ত পাখি, লিরিক কবি, শিশু আর কুকুর আর পুরোনো বন্ধুবান্ধবদের সান্নিধ্যলাভের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল। যে-সব কর্তব্যকর্ম আর দায়িত্বকে আমি অবহেলা করছি, যথাসময়ে আবার তারই মধ্যে আমি ফিরে যাব, কিন্তু ইতিমধ্যে তোমাকে এই আনন্দের ভাগ দিতে পারলে আমি সুখী হতাম। হায়দরাবাদে এসে মীর আলমের বুকে নৌবিহার, উদ্দেশ্যহীনভাবে ইতস্তত ঘুরে বেড়ানো, আর তারপর ভারতবর্ষের সব চাইতে বিমিশ্র সমাজের সঙ্গে আলাপ-পরিচয়, প্রকৃত আনন্দ বলে একেই। বলা বাহুল্য, চার পুরুষ ধরে এই আনন্দ গোল্ডেন থ্রেশোল্ডকে নাড়া দিয়ে আসছে। শুরু হয়েছিল আমার বাপ-মায়ের আমলে। সে প্রায় প্রাগৈতিহাসিক যুগের কথা! আর শেষ হয়েছে ছোট্ট ওই শিশুটির মধ্যে এসে, মেঝের উপরে বসে বেরালটার সঙ্গে ভাগাভাগি করে যে তার

কেক খাচ্ছে, শরবতের গেলাস উল্টে পড়ে যার জামা ভিজে গিয়েছে। তুমিও কেন কাজকর্ম ফেলে রেখে এইখানে এসে আত্মগোপন করে থাক না? শুয়াইবকেও আমি কাজে ইস্তফা দিয়ে চলে আসবার পরামর্শ দিতে পারি, কিন্তু তোমার অপর সহকর্মীটির কাছে এসেই আমাকে দাঁড়ি টানতে হবে। ঈশ্বর রক্ষা করুন!

কলকাতায় ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে আমি উপস্থিত থাকছি না। অনেক দিন যাবৎ আমি অসুস্থ বোধ করছি। এবারে আমার পরিবেশ আর কাজের ধরনটার একটা পরিবর্তন হওয়ার দরকার ছিল। শারীরিক প্রয়োজনের চাইতে মানসিক প্রয়োজনেই এটা হওয়া দরকার। তা ছাড়া, ওয়ার্কিং কমিটির কর্মসূচীর মধ্যে এমন কিছু নেই, যাতে আমার উপস্থিত না থাকলেই চলবে না। এক আছে "বর্তমান পরিস্থিতি", দেশবন্ধু যার সৃষ্টিকর্তা!

পাপাজী আর ছোট্ট মামাজীর খবর আশা করি ভাল। কমলা নিশ্চয়ই আবার সুস্থ হয়ে উঠেছে, আর ইন্দুও আশা করি এখনও সেই গতিচঞ্চলা নবারুণাক্ষী আটালাণ্টার মতনই আছে।

পদ্মজা সবাইকে তার ভালবাসা জানাচ্ছে। বিশেষ করে সুনয়না বেটীকে। লীলামণি আবার তার বইয়ের সমুদ্রে ডুব দিয়েছে; মনে হচ্ছে সুখেই আছে।

আবার দেখা হবে। তোমাদের সবাইকে আমার নবজীবনের আনন্দের ভাগ পাঠালাম।

স্নেহানুরক্তা ভগিনী
সরোজিনী

৩৮ মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক লিখিত

[ডান হাতকে বিশ্রাম দেবার জন্য গান্ধীজী বাঁ হাতে লিখবার অভ্যাস করেছিলেন। এ-চিঠিখানি তিনি বাঁ হাতে লেখেন। ইয়াং ইণ্ডিয়া নামে যে ইংরেজী সাপ্তাহিক পত্রিকা তিনি সম্পাদনা করতেন, "ওয়াই. আই." বলতে তিনি তাকেই বুঝিয়েছেন।]

৩০ সেপ্টেম্বর, ১৯২৫

প্রিয় জওহর,

এ বড় বিচিত্র যুগে আমরা বাস করছি। শীতলা সহায় হয়ত আত্মপক্ষ সমর্থন করতে পারেন। পরবর্তী ঘটনাবলী সম্পর্কে আমাকে ওয়াকিবহাল রেখ। কী করেন তিনি? তিনি কি আইনজীবী? বৈপ্লবিক কার্যকলাপের সঙ্গে কি তাঁর কখনও কোনও যোগ ছিল?

কংগ্রেসের প্রসঙ্গে জানাই, যে-কজন কর্মী অবশিষ্ট আছেন, তাঁরা যাতে কোনও অসুবিধা বোধ না করেন, তার জন্য এই প্রতিষ্ঠানের বিষয়াবলীকে যতদূর সম্ভব সহজ-সরল রাখাই সঙ্গত হবে। তোমার দায়িত্বভার যে এবারে বেড়ে যাবে, তা জানি। কিন্তু লক্ষ্য রেখ; কোনমতেই যেন তোমার স্বাস্থ্যহানি না হয়। তোমার স্বাস্থ্য সম্পর্কে আমি উদ্বিগ্ন আছি। মাঝে মাঝেই যে তুমি জ্বরে পড়ছ, এ আমার মোটেই ভাল বলে মনে হচ্ছে না। তুমি আর কমলা যদি দিন কয়েকের জন্য ছুটি নিতে পারতে, তাহলে ভাল হত।

বাবা আমাকে চিঠি লিখেছেন। অবশ্য তিনি যা ভাবছেন, ততটা যাবার ইচ্ছা আমার কখনও ছিল না। বাবাকে সাহায্য করবার জন্য কাউকে অনুরোধ জানাব, এমন কথা আমি ভাবতেই পারি না। তবে এমন কোনও বন্ধু অথবা বন্ধুবর্গকে অনুরোধ জানাতে আমার বিন্দুমাত্র দ্বিধা হবে না, তোমার জনসেবামূলক কাজকর্মের

জন্য যিনি অথবা যাঁরা তোমাকে কিছু অর্থ দিতে পারাটাকে একটা সৌভাগ্য বলে বিবেচনা করবেন। যে-অবস্থায় তুমি আছ, এবং যে-অবস্থায় তোমাকে থাকতে হবে, তার ফলে তোমার প্রয়োজন যদি একটু ভিন্ন ধরনের না হত, তাহলে জনসাধারণের তহবিল থেকেই কিছু অর্থ নেবার জন্য তোমাকে আমি অনুরোধ জানাতাম। এ-বিষয়ে আমি নিশ্চিত যে সাধারণ তহবিলে তোমার যা দেবার, কিছু কাজকর্ম করেই তা তোমার দেওয়া উচিত, অথবা এমনও হতে পারে যে তোমার কাজের বিনিময়ে তোমার ব্যক্তিগত বন্ধুরা কিছু অর্থ দিলেন। হঠাৎ করে কিছু করবার দরকার নেই, তবে অনর্থক দুশ্চিন্তা না করে এ-বিষয়ে চূড়ান্ত কোনও সিদ্ধান্ত করবার চেষ্টা কর। তুমি যদি কোনও ব্যবসা করবে বলেই ঠিক কর, তাতেও আমি কিছু মনে করব না। আমি চাই তুমি শান্তি পাও। কোনও ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজার হয়েও যে তুমি দেশসেবা করতে পারবে, তা আমি জানি। যে-সিদ্ধান্তই তুমি কর না কেন, তাতে যদি তুমি সম্পূর্ণ শান্তি পাও, তাহলে বাবা কিছু মনে করবেন না বলেই আমার নিশ্চিত ধারণা।

তোমাদের
বাপু

ওয়াই. আইয়ের জন্য আমার দক্ষিণ হাতটাকে ছেড়ে দিতে হবে দেখছি।

৩৯ এম. এ. আনসারী কর্তৃক লিখিত

ফতেপুরী, দিল্লি,
১১ অক্টোবর, ১৯২৫

প্রিয় জওহরলাল,

তোমার চিঠি পেয়ে বাধিত হলাম। দীর্ঘ ছুটি এবং আবহাওয়া-বদলের পরে আমি এখন খুবই সুস্থ বোধ করছি। তবে শুনে দুঃখিত হবে যে বেশ কিছুদিন ধরে আমি হার্টের অসুখে ভুগেছি, তাই এখন আমাকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে, কোনও রকম উত্তেজনার মধ্যে আমার থাকা চলবে না, এখন থেকে আমাকে শান্ত নিয়মিত জীবন যাপন করতে হবে। তাই বাধ্য হয়েই আমাকে এখন অন্য কাজকর্ম কমিয়ে শুধু শিক্ষামূলক কাজের মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ রাখতে হবে। তুমি জান, ইউরোপ যাত্রার আগে মহাত্মাজী ও হাকিমজীর অনুরোধে আমি ন্যাশনাল মুসলিম ইউনিভার্সিটির সম্পাদক-পদ গ্রহণ করতে সম্মত হই। এর ফলে আমার উপরে প্রভূত দায়িত্ব এসে পড়বে। আমার অবসর-সময়ের সবটুকুই যদি নিয়োগ করি, একমাত্র তাহলেই এই দায়িত্ব আমি পালন করতে পারব। আমি তাই স্থির করেছি যে, একমাত্র ন্যাশনাল মুসলিম ইউনিভার্সিটির কাজ ছাড়া ভবিষ্যতে আর জনকল্যাণ-মূলক অন্য কোনও কাজে আমি থাকব না।

তা ছাড়া, পাটনায় যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে তাতে স্বভাবতই কংগ্রেসের সমস্ত কর্মভারই এখন স্বরাজীদের হাতে ন্যস্ত হবে। সুতরাং কার্যনির্বাহক সমিতির সাধারণ সদস্যপদে অধিষ্ঠিত থেকে আমি যদি জাতীয় শিক্ষার কাজে আমার উদ্যম নিয়োগ করি, তাতে অসুবিধা হবার কথা নয়।

সালিশির প্রসঙ্গে জানাই, এ-ব্যাপারে তোমার নির্দেশ অনুযায়ী আমি কাজ করব। শ্রীভার্গব এবং সেই সঙ্গে আজমির-মারওয়াড় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সম্পাদককে আমি চিঠি লিখে দিচ্ছি যে তাঁদের বক্তব্যের পূর্ণ বিবরণ যেন তাঁরা আমার কাছে পাঠিয়ে দেন। এই বিবরণ পড়ে অন্য পক্ষকে এর অনুলিপি পাঠিয়ে

দেবার পর তোমার পরামর্শমত আমি তাঁদের কয়েকটি প্রশ্ন করব। অতঃপর আমার সিদ্ধান্ত জানাবার আগে তাঁদের দু পক্ষকেই আমার সঙ্গে দেখা করতে বলব।

শুভেচ্ছা জানাই।

তোমাদের
এম. এ. আনসারী

৪০ মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক প্রেরিত

টেলিগ্রাম

আমেদাবাদ ১ ডিসেম্বর, ১৯২৫

প্রাপক জওহরলাল নেহরু আনন্দ ভবন এলাহাবাদ

অনশন ভেঙেছি স্বাস্থ্য ভাল আছে কমলা সুস্থ হয়ে উঠছে আশা করি স্বরূপ এখানে গান্ধী

৪১ মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক লিখিত

[আমার স্ত্রীব চিকিৎসার জন্য ১৯২৬ সনের গোড়ার দিকে তাঁকে সঙ্গে নিয়ে আমি ইউরোপে গিয়েছিলাম।]

২১ জানুয়ারি, ১৯২৬

প্রিয় জওহর,

তুমি যে কমলাকে তোমার সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছ, এতে আমি সুখী হয়েছি। যাত্রা করবার আগে তোমাদের দুজনের পক্ষে যদি সম্ভব না হয়, অন্তত তুমি একবার এখানে এস। দেশবন্ধুর স্মৃতিরক্ষা সম্পর্কে যমুনালালজীকে তুমি যে চিঠি দিয়েছ, তাতেই যথেষ্ট হবে। এ. আই. এস এ. প্রসঙ্গে জানাই, তুমিই তার সম্পাদক থাকবে। তবে একজন সহকারী লাগলে শঙ্করলালের প্রয়োজন হবে। চার্ট তৈরি করনি বলে তোমাকে দোষ দিতে পারি না। তুমি ত আর বৃথা কালক্ষেপ করনি। ইউরোপে যাতে অসুবিধা না হয়, তার জন্য উপযুক্ত জামাকাপড় নিয়ে যেও।

তোমাদের
বাপু

৪২ মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক লিখিত

আশ্রম, সবরমতী,
৫ মার্চ, ১৯২৬

প্রিয় জওহরলাল,

তোমার ১ তারিখের চিঠি আমি পেয়েছি। ডাঃ মেহ্তাকে পাঠাবার জন্য তুমি একখানি চিঠি লিখে রেখে গিয়েছিলে বটে, তবু আরও নিশ্চিত হবার জন্য আমিও তাঁকে চিঠি লিখেছি। আশা করি জাহাজে কমলার স্বাস্থ্য সম্পূর্ণ ভাল ছিল। সমুদ্রযাত্রায় তোমাদের স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়েছে কি? আর কিছু লিখবার সময় নেই।

তোমাদের
মো. ক. গান্ধী

৪৩ মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক লিখিত

আশ্রম, সবরমতী,
২৩ এপ্রিল, ১৯২৬

প্রিয় জওহরলাল,

প্রতি সপ্তাহেই ভাবি তোমার কাছে চিঠি লিখব, কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর লেখা

হয়নি। তবে এ-সপ্তাহটাকে আর ফশকে যেতে দেব না। বাবা যখন রেসপন-সিভিস্টদের সঙ্গে এখানে এসেছিলেন, তখন তাঁর কাছে তোমাদের সর্বশেষ খবর পেয়েছি। যে মতৈক্য সাধিত হয়েছে, তা তুমি দেখে থাকবে।

হিন্দু আর মুসলমানরা ক্রমেই পরস্পরের কাছ থেকে আরও দূরে সরে যাচ্ছে। তবে এ নিয়ে আমার কোনও দুশ্চিন্তা নেই। কী জানি কেন, আমার মনে হয়, পরে এদের আরও ঘনিষ্ঠ করে তুলবার জন্যই এখন এই ব্যবধানের সৃষ্টি হচ্ছে।

কমলার স্বাস্থ্যের উন্নতি হচ্ছে আশা করি।

তোমাদের
বাপু

৪৪ রোমাঁ রোলাঁ কর্তৃক লিখিত

ভিল্‌নোভ (ভো) ভিলা অল্‌গা,
১১ মে, ১৯২৬

প্রিয় মঁশিয়ে জওহরলাল নেহরু,

আপনার, ও আমাদের সন্ত বন্ধু গান্ধীর চিঠি পেয়ে খুশী হয়েছি। আপনার নাম আমরা জানতাম। মাত্রই দিন কয়েক আগে, হিন্দুস্থান টাইম্‌স-এ প্রকাশিত একটি বক্তৃতার সূত্রে, আবার আপনার নাম আমাদের চোখে পড়েছে।

আপনার সঙ্গে দেখা হলে আমার বোন ও আমি, দুজনেই খুব খুশী হব। আপনি ও শ্রীমতী নেহরু কি পরিষ্কার আবহাওয়া দেখে আগামী সপ্তাহের এক বিকেলে ভিলা অল্‌গায় এসে চা-পান করতে ও ঘণ্টা কয়েক কাটিয়ে যেতে পারবেন? আগামী ১৯ মে বুধবার থেকে ২২ মে শনিবারের মধ্যে কবে এলে আপনাদের সব চাইতে সুবিধে হয়, দয়া করে জানাবেন। নির্ধারিত দিনে আবহাওয়া যদি ভাল না থাকে, সেক্ষেত্রে শুধু তারিখটা পিছিয়ে দিয়ে সকালবেলায় একটা তার করে দিলেই হবে।

শ্রীমতী নেহরু শিগগিরই সুইজারল্যাণ্ডের আবহাওয়ার সুফল পাবেন আশা করি।

আপনার ছোট্ট মেয়েটি জেনেভার আন্তর্জাতিক স্কুলে পড়ছে না? তার শিক্ষয়িত্রী মিস হার্টকে আমাদের অতি ঘনিষ্ঠ বন্ধু। আপনার মেয়ে যে অত্যন্তই স্নেহশীলা এবং সুদক্ষা একজন শিক্ষয়িত্রীর হাতে পড়েছে, এ-বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।

প্রিয় মঁশিয়ে নেহরু, আমাদের সৌহার্দ্যপূর্ণ সহানুভূতি গ্রহণ করুন।

ভিলা অল্‌গা বাগানবাড়িটি হচ্ছে হোটেল বায়রনের খুব কাছে (আর-একটু উঁচুতে)। নৌকাযোগে যদি আসেন, তবে ভিল্‌নাভের ঘাট থেকে মিনিট দশেকের পথ। আর রেলগাড়িতে যদি আসেন তাহলে তেরিতে স্টেশনে নেমে স্টেশনের সামনে ভিভে-ভিল্‌নাভ লাইনের বিদ্যুৎচালিত ট্রাম পাবেন; ট্রামে (ভিল্‌নাভের দিকের) উঠে বলবেন, যেন হোটেল বায়রন স্টপে আপনাদের নামিয়ে দেয়।

৪৫ সরোজিনী নাইডু কর্তৃক লিখিত

বোম্বাই,
১৫ অক্টোবর, ১৯২৬

প্রিয় জওহর,

আজ সকালে পাপাজীর এক তার পেলাম। তাতে তিনি জানাচ্ছেন যে তোমাদের কারও কাছে চিঠি লিখতে তিনি ভুলে গিয়েছিলেন, এবং এখন আর চিঠি লিখে

কাগজের ডাক ধরাবার উপায় নেই। সুতরাং আমি যেন চিঠি লিখে তোমাদের জানিয়ে দিই যে তাঁর "অসুখ সেরে গিয়েছে, এবং তিনি দ্রুত সবল হয়ে উঠছেন। অন্য সবাই ভাল আছেন।" মুসৌরিতে দীর্ঘকাল বিশ্রাম নেবার পর পাপাজী খুবই ভাল ছিলেন। তারপর তিনি সিমলা যান। তখন থেকেই তিনি আবার শুকিয়ে যেতে লাগলেন। এইটেই বোধ হয় ঠিক কথা। শুকিয়ে যাবার কারণ শারীরিক ততটা নয়, যতটা মানসিক। এই বিশ্রী রাজনৈতিক অবস্থা, এই ভিতরকার দলাদলি; এককালে যাদের তিনি বিশ্বাস করতেন, যাদের সঙ্গে তিনি কাজ করেছেন, তাদের এই দুঃখদায়ক আত্মবিনাশী চক্রান্ত......তার উপরে তাঁর সফরের ক্লান্তি ত ছিলই। তবে সম্প্রতি তিনি যে প্রবল জ্বরে ভুগে উঠলেন, তারপর এখন তিনি সত্যিই আবার বেশ সুস্থ হয়ে উঠছেন বলে মনে হয়। নির্বাচনের ব্যাপারে তিনি অকারণে উদ্বিগ্ন হচ্ছেন। মোটামুটিভাবে দেখতে গেলে তাঁর পার্টির অবস্থা যতখানি খারাপ হবে বলে আশঙ্কা করা গিয়েছিল, এখনকার অবস্থা মোটেই ততখানি আশঙ্কাজনক নয়। সাম্প্রদায়িক, উভয় পক্ষের ক্ষতিকারক, ব্যক্তিগত এবং অন্যান্য যে-সব উত্তেজনাকে কৃত্রিমভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং ইচ্ছাকৃতভাবে জিইয়ে রাখা হয়েছে, সপ্তাহ কয়েক পরে এগুলি আবার ঝিমিয়ে পড়লে আমি স্বস্তি পাব।

তোমার সম্পর্কে নানা রকমের গুজব শুনছি। অতি চমৎকার সব গুজব। তুমি তোমার জীবনের আনন্দ আবার ফিরে পেয়েছ, জেনে সুখী হলাম। ভারতীয় জীবনের একঘেঁয়ে বিভীষিকা থেকে দীর্ঘকালের জন্য তুমি মুক্তি পেয়েছ, তাতে আমি খুবই সুখী। ইউরোপে গিয়ে তোমার ত আবার নতুন করে নিজেকে চিনবার কথা। মানসিক কতকগুলিকেও নিশ্চয়ই সারিয়ে তুলতে পেরেছ। আশা করি কমলার স্বাস্থ্যের উন্নতি হচ্ছে। সুইজারল্যাণ্ডের হাওয়া আর মানুষকে তার ভাল লাগছে ত? আমি নিজে সুইজারল্যাণ্ডকে তেমন ভালবাসিনে। তবে শরৎকালে সেখানে পাহাড়ের সবুজ ঢালু জমিতে যে সাদা ফুলের সমারোহ লেগে যায়, তার আমি বিশেষ ভক্ত। ইন্দু এতদিনে নিশ্চয়ই ছোট্ট একটি মাদমোয়াজেলে পরিণত হয়েছে, এবং সুইস উচ্চারণে ফরাসীর তুবড়ি ছোটাচ্ছে। বেটীও আশা করি ছুটিটাকে খুব উপভোগ করছে। শুনলাম স্বরূপ আর রঞ্জিত খুব আনন্দে ছিল। আঃ, আমার পক্ষে যদি সমুদ্র পাড়ি দিয়ে চলে যাওয়া সম্ভব হত! সফর করে করে আর ঝগড়া মিটিয়ে দিন কয়েক বড় কষ্টে কাটল। এখন একটু অসুস্থ আছি। পদ্মজা খুবই ভাল আছে। কিন্তু লীলামণির ত একটা বড় রকমের অপারেশন হয়ে গেল। এখনও সুস্থ হয়ে ওঠেনি। হেদাজী হাজীরা একটু বিরক্ত ভাব নিয়েই ফিরে এসেছেন। মওলানা এখন সরবে সৌদের নিন্দা করছেন। শুয়াইবও খুব খুশী নয়। সত্যিই ও এখন ভাবছে যে বোম্বাইয়ে একটা ব্যবসা খুলে বসবে। আনসারীও গত কয়েক মাস যাবৎ রাজা-উজিরদের সঙ্গে উপর-উপর ভদ্রতা করে এসেছেন। দেখে মনে হয়, তিনি বিরক্ত হয়ে আছেন। বলতে গেলে থার্মোমিটার আর কুলকুচি আর ব্যাণ্ডেজই ত তাঁর এই বন্দী-জীবনের একমাত্র সঙ্গী।......

ওমরের মৃত্যুর পর বোম্বাই এখন আমার কাছে এক দুঃস্বপ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে...... বেচারা ওমর, তার হৃদয় ছিল সম্রাটের মত! জানি না তার অশান্ত আত্মা শান্তিলাভ করেছে কি না। তোমাকে সে কী ভালই না বাসত!

আমার হাতের লেখা তুমি পড়তে পারছ কি না জানি না। ব্যথায় আমার কবজিটা অসাড় হয়ে এসেছে। ইকবালের ভাষায় আক্ষরিক অর্থে "মৈঁ সার-আ-পা দর্দ্ হুয়েঁ।"

শুভরাত্রি, জহর। তুমি যে ভারতবর্ষের বাইরে গিয়েছ, তোমার আত্মা যে আবার

তার যৌবন, মহিমা আর শাশ্বত সৌন্দর্য-কল্পনাতে পুনর্ণবীভূত করবার সুযোগ পেয়েছে, তাতে আমি সত্যিই খুব সুখী হয়েছি। মা ও মেয়ে, দুই বালিকাকে আমার ভালবাসা জানাই।

স্নেহানুরক্তা ভগিনী
সরোজিনী

৪৬ মোতিলাল নেহরু কর্তৃক লিখিত

আনন্দ ভবন, এলাহাবাদ,
২ ডিসেম্বর, ১৯২৬

প্রিয় জওহর,

কতগুলি ডাকে যে তোমাকে চিঠি দিতে পারিনি, জানিনে। নিশ্চয়ই তিনটের বেশী হবে। নির্বাচনী সফর শেষ করে সবে গতকাল আমি এলাহাবাদে ফিরেছি। এ-চিঠি পাবার অনেক আগেই তুমি নির্বাচনের নীট ফলাফল জেনে যাবে। মাদ্রাজ আর বাংলায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে না পারলেও আমরা বেশ-কিছু আসন অধিকার করতে পেরেছি। বিহারে এখনও ভোট-গণনা শেষ হয়নি, তবে বিহারও যে মাদ্রাজ আর বাংলার থেকে পিছিয়ে থাকবে, এমন মনে হয় না। বোম্বাই আর মধ্যপ্রদেশের অবস্থা খারাপ। তবে যুক্তপ্রদেশে যা ঘটেছে, তা বিপর্যয়েরই সামিল। পাঞ্জাবের ক্ষেত্রে বিশেষ-কিছু আশা করা হয়নি, আইন-সভার সব কটি আসনই বোধ হয় সেখানে আমরা হারাব। লাজপত রায়ের মিথ্যা রটনাই এর জন্য দায়ী। ছোট্ট প্রদেশ আসামের ফলাফল খুবই ভাল। ব্রহ্মদেশেও আইন-সভার দুটি আসন পাওয়া গিয়েছে। গত তিন বছর আইন-সভায় আমাদের যে শক্তি ছিল, এবারে তা বোধ হয় খানিকটা বৃদ্ধি পাবে। তবে যুক্তপ্রদেশের পরিষদ-নির্বাচনে বিপর্যয় ঘটে গিয়েছে। গত বারেও অবস্থা খুব ভাল ছিল না, এবারে আরও অনেক খারাপ হবে। আমার নিজের প্রদেশে আমাকে সাহায্য করবার মত কর্মী খুব কম পেয়েছি, অন্যান্য প্রদেশের পিছনেও আমাকে অনেকখানি সময় দিতে হয়েছে। তবে যুক্ত-প্রদেশের পিছনে পুরো সময় ব্যয় করলেও বোধ হয় ফলাফল এর চাইতে ভাল হত না। মালব্য-লালা দলের উদ্যোগে আমার বিরুদ্ধে যে-ধরনের প্রচারকার্য শুরু করা হয়, এমন সাধ্য ছিল না যে তার সঙ্গে এঁটে উঠতে পারি। প্রকাশ্যে এই বলে আমার নিন্দা করা হয়েছে যে আমি হিন্দুবিরোধী, মুসলমানের বন্ধু। কিন্তু গোপনে প্রায় প্রতিটি ভোটদাতাকেই বলা হয়েছিল যে আমি গোমাংসভোজী, তাই সর্বসময়ে প্রকাশ্য স্থানে গোবধ করাকে আইনসিদ্ধ করবার জন্য মুসলমানদের সঙ্গে আমি চক্রান্তে লিপ্ত আছি। শ্যামজীও এই প্রচারের আগুনে কম ইন্ধন জোগাননি। তিনি বলে বেড়িয়েছেন যে আইনসভায় তাঁর "গোরক্ষা বিল"টিকে আমিই আলোচিত হতে দিইনি। আইন-সভার নির্বাচনে ফৈজাবাদ বিভাগ থেকে তিনি প্রার্থী হিসেবে দাঁড়িয়েছিলেন। অন্য দুজন প্রার্থীর মধ্যে একজন ছিলেন স্বরাজী, আর অন্যজন আমেঠির দাদন সাহেব। স্বরাজী প্রার্থীটি বারের একজন সুপরিচিত ও প্রভাবশালী সদস্য, কিন্তু দাদন সাহেব স্রেফ টাকার জোরে জিতে গেল। শ্যামজীর টাকা যুগিয়েছিলেন মালব্য, কিন্তু দাদন তাঁর দলের প্রার্থী ঘোষিত হয়। শ্যামজীর জামানতের টাকা বাজেয়াপ্ত হয়েছে। ওদিকে স্বরাজী প্রার্থী আর দাদনের মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতা হয়। ভাব একবার, দাদনের মত অপদার্থ, সে কিনা এমন একজন প্রার্থীকে পরাজিত করল, যিনি শুধু যোগ্যই নন, জনপ্রিয়ও। নিশ্চয়ই শুনে থাকবে, বেচারা বৌয়াজী সম্প্রতি মারা গিয়েছেন। অতঃপর শ্যামজী এই জঘন্য স্লোগানটিকে অবলম্বন করেছিলেন: "মাই মেরি মর গই, গাই মেরি মাই হৈ।"

ব্যাপকভাবে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ প্রচার করা হয়েছে এবং ভোটদাতাদের উৎকোচ দেওয়া হয়েছে। ব্যাপার দেখে আমি একেবারে বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছি, এবং সত্যিই

ভাবছি যে জন-জীবন থেকে এবারে অবসর গ্রহণ করব। শুধু, কী নিয়ে আমার সময় কাটবে, সেইটে নিয়েই আমার দুশ্চিন্তা। কংগ্রেসের গৌহাটি-অধিবেশনের জন্য অপেক্ষা করছি। ইতিমধ্যে আমি চুপ করে থাকব। বিড়লার অর্থসাহায্যপুষ্ট মালব্য-লালা দল কংগ্রেসকে দখল করার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছে। কংগ্রেস অধিবেশনের পর আমি বোধ হয় প্রকাশ্যভাবে আমার বক্তব্য ঘোষণা করব, এবং এখনও দেশের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী দলের নেতা বলে স্বীকৃত হওয়া সত্ত্বেও বোধ হয় আইন-সভার সদস্যপদে আমি ইস্তফা দেব। এখন আমাদের যেটুকু শক্তি, এবং যে-ধরনের লোক নিয়ে আমাদের কাজ করতে হয়, তাতে আইন-সভা অথবা পরিষদে থেকে বিশেষ-কিছু করা সম্ভব হবে না। আশংকা করি, শিগগিরই আমাদের দলে ভাঙন ধরবে। কিন্তু সে-কথা ছেড়ে দিলেও কিছু করা অসম্ভব। দেশের জন্য যে কী কাজ করব, জানি না; কোনও কাজেই আমার সাফল্যের সম্ভাবনা নেই। হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের জন্য আমার ন্যাশনাল ইউনিয়নের কাজ করতে পারি বটে; কিন্তু সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা এখন যে-অবস্থায় এসে পৌঁছেছে, তাতে আমার সমস্ত কথাই অরণ্যে রোদনের সামিল হবে। গান্ধীজীর সঙ্গে আমি পরামর্শ করে দেখব, কিন্তু, তুমি ত জানই, তাঁর শখের কাজ খানিকটা পর্যন্ত আমার ভাল লাগে, তারপরে আর লাগে না। ন মাসের উপর ভারতবর্ষের চলতি রাজনীতির সঙ্গে বস্তুত তোমার কোনও যোগই নেই, সুতরাং এ-বিষয়ে তোমার মতামত জানতে চাওয়াটা ঠিক হয় না; তবু কী নিয়ে আমি থাকব, সে সম্পর্কে তোমার পরামর্শ যদি জানাও, তাতে আমার উপকার হবে।

নির্বাচনের কাজে অত্যন্তই ক্লান্ত হয়ে পড়েছি, কিন্তু এখনও আমার শান্তি নেই। সামনেই আসছে কাশীপুর প্রাদেশিক সম্মেলন, তারপর ৫ তারিখ থেকে ৯ তারিখ পর্যন্ত প্রাদেশিক কমিটির উত্তেজনাময় সভা, সর্বশেষে আছে কংগ্রেস। এ-সব অনুষ্ঠানে অন্য-কিছুর চাইতে অশান্তি সৃষ্টির সম্ভাবনাই বেশী, কিন্তু আর-কিছু না হক, কতখানি পর্যন্ত যে ঘুণে ধরেছে, সেটা বুঝবার জন্যেও শেষ পর্যন্ত আমি সব দেখে যাব। কলকাতা থেকে নদীপথে সুন্দরবন হয়ে গৌহাটি যাব ভাবছি। কিছুদিন যে পরিশ্রম গেল, তাতে নদীর উপরে দিন সাতেক থাকলে একটু সুস্থ হয়ে উঠব বলে মনে হয়। বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছি; সেই সঙ্গে রক্তদৌর্বল্য এবং হয়ত বা দূষিত জল আর ধুলোময়লার জন্য আমার একজিমাটা আবার দেখা দিয়েছে; কয়েক জায়গায় পুঁজও জমেছে। তা ছাড়া আমি ভালই আছি।

গত ডাকে বাড়ির কেউই তোমার চিঠি পায়নি। নান বলছে, হয়ত তুমি জার্মানি গিয়েছিলে। তোমরা যে মন্তানায় গিয়েছ, এবং সেখানে গিয়ে কমলার যে একটু উন্নতি হয়েছে, তোমার আগেকার চিঠিতেই তা জেনেছিলাম। আসল কথা হল টেম্পারেচার। অন্তত মাস খানেক টেম্পারেচার যদি স্বাভাবিক না থাকে, তাহলে অন্যান্য উন্নতিতে খুব ফল হবে বলে আমার মনে হয় না। আরও সপ্তাহ কয়েক যদি মন্তানায় থাক, তাহলে ঈপ্সিত ফল পাবে বলে আশা করি। ভালবাসা জানাই।

বাবা

৪৭ মোতিলাল নেহরু কর্তৃক লিখিত

পি. এস. খারোটি, সুন্দরবন,
১৫ ডিসেম্বর, ১৯২৬

প্রিয় জওহর,

সুন্দরবনের ভিতর থেকে তোমাকে এই চিঠি লিখছি। আমার সঙ্গে যাঁদের আসবার কথা ছিল, তাঁরা সবাই সরে পড়েছেন। আমার সঙ্গী বলতে এখন কেবল

উপাধ্যায় আর হরি। স্বামী সত্যদেব তাঁর দুই শিষ্য নিয়ে দ্বিতীয় শ্রেণীতে আছেন। কলকাতায় প্রায় শেষ মুহূর্তে এসে তিনি আমার সঙ্গে যোগ দেন। তবে তিনি বিবেচক মানুষ। আলাপ-আলোচনার জন্য বিশেষভাবে তাঁকে আমন্ত্রণ না জানালে তিনি সম্ভ্রমসূচক দূরত্ব বজায় রেখেই চলেন। আর কোনও যাত্রী নেই বলে তাঁকে প্রথম শ্রেণীর ডেকে আসতে দেওয়া হয়।

সুন্দরবন নামটি যে কে রেখেছিলেন তা জানি না, তবে নামটি সার্থক। ভারতবর্ষে জলপথে এর চাইতে সুন্দর ভ্রমণ আর হতে পারে না। আমার যে এখানে আসবার কথা মনে হয়েছিল, তার জন্য আমার ভারী আনন্দ হচ্ছে। জলপথের এক গোলকধাঁধার মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে (ঘণ্টায় প্রায় আট মাইল, কিংবা আরও কম) আমরা এগোচ্ছি। ঘন গাছপালায় আকীর্ণ অরণ্য; এই জলপথগুলি তাকে ছোট বড় নানান খণ্ডে ভাগ করে রেখেছে। মাইলের পর মাইল কোনও জনবসতি দেখা যায় না। তবে অরণ্যের আপন অধিবাসীর সংখ্যা নাকি অগণ্য। বাঘ থেকে হরিণ—অনেক রকমের প্রাণী আছে। আমার একমাত্র দুঃখ এই যে একটা রাইফেল আনার কথা মনে হয়নি। সারেঙ্গ (স্টীমারের পরিচালনা-ভার তারই উপরে; মাসিক বেতন ৭০৲ টাকা) আমাকে বলল, আমি যদি একটা বন্দুক সঙ্গে আনতাম ত সামান্য একটু ঘুর পথে গিয়ে সে আমাকে বিস্তর শিকার জুটিয়ে দিতে পারত। এমন কি, পথের কোনও অদলবদল না করেও স্টীমার থেকেই অনেক সময় শিকার করা যায়। মাঝে-মাঝেই খাল খুব সংকীর্ণ; স্টীমারটা কোনক্রমে যেতে পারে, এইমাত্র। তারপরেই হঠাৎ দেখা যায়, সামনেই সুবিস্তীর্ণ জলরাশি। মাইলের পর মাইল চতুর্দিকে শুধু জল আর জল। সেই জলরাশিকে সম্পূর্ণ অথবা আংশিক অতিক্রম করে স্টীমার আবার হঠাৎ গিয়ে অসংখ্য সংকীর্ণ খালের একটিতে ঢুকে পড়ে। খালের পরে আবার সেই সমুদ্রের মত জলবিস্তার। দুই তীরে ছোট বড় নানান রকমের অসংখ্য আরণ্যক বৃক্ষ। মাঝে-মাঝেই তালগাছের সারি। বড় আর ছোট, দু রকমের তালগাছই দেখতে পাওয়া যায়। সমগ্র দৃশ্যটি অতি মনোরম। স্টীমারের ডেকে দাঁড়িয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা, খালি চোখে অথবা দূরবীনের সাহায্যে অরণ্যের এই আঁকাবাঁকা খালগুলিকে যতদূর পর্যন্ত দেখতে পাওয়া যায়, আমি তাকিয়ে দেখি।

রিভার লাইন অব স্টীমার্স কোম্পানির আর যে-দোষই থাক, অতিরিক্ত রকমের সময়-জ্ঞান নেই। তাই ২২ তারিখের থেকে ২৪ তারিখের মধ্যে যে-কোনও দিন আমরা গোহাটি পোঁছতে পারি। আশা করি তার বেশী দেরি হবে না। তার কারণ ২৪ তারিখ থেকে সাবজেক্টস কমিটির বৈঠক শুরু হবে। এই ভ্রমণপথের যেটুকু অংশ সব চাইতে মনোগ্রাহী, তা অবশ্য আজ রাত্রে খুলনা পোঁছবার সঙ্গে-সঙ্গেই শেষ হয়ে যাবে। সুন্দরবনের এলাকা তার আগেই শেষ হয়ে যাচ্ছে, এবং যাকে বলা হয় সভ্যতা, আবার আমরা তার এলাকায় গিয়ে প্রবেশ করছি। গাইড-বুকে নানা ধরনের যে-সব দৃশ্যাবলীর খুব প্রশংসা করা হয়েছে, তার মধ্য দিয়ে দিন দুই তিন বাদে আমাদের গোয়ালন্দে পোঁছবার কথা। গোয়ালন্দ থেকে মাইল কয়েক এগিয়ে আমরা গঙ্গামাতার আশ্রয় ত্যাগ করে পিতা ব্রহ্মপুত্রের মধ্যে প্রবেশ করব। গোহাটির উত্তরে একবার সামান্যকালের জন্য ভ্রমণ করেছিলাম। তাতে যে অভিজ্ঞতা হয়েছিল, তাতে বলতে পারি, পিতা ব্রহ্মপুত্রও তাঁর আপন কিছু সৌন্দর্যসম্ভার আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরবেন।

আমার বল যে আবার ফিরে আসছে, ইতিমধ্যেই তার লক্ষণ আমি বুঝতে পারছি। অপ্রত্যাশিত কিছু না ঘটলে ভ্রমণের শেষে বেশ সুস্থ হয়ে উঠব বলে আশা করি।

এই চিঠি খুলনায় গিয়ে পোস্ট করব। আজ কলকাতার ডাক যাবে। বাংলা-দেশে যে অসংখ্য রেলপথ আছে, তার একটি শাখাপথ পুনরায় গিয়ে শেষ হয়েছে। এই চিঠি সপ্তাহখানেক আটকা পড়ে থাকবে বলে মনে হয়। তবে চিঠিখানিকে পোস্ট করে দেওয়াই ভাল, নয়ত পরবর্তী ডাকের দিনে যে আমার কী ঘটবে তা কে জানে।

২৩শে নভেম্বর তারিখে তুমি যে চিঠি লিখেছিলে, আমি চলে আসবার কিছুকাল পরেই তা এলাহাবাদে এসে পেঁছয়। চিঠিখানি রঞ্জিত আমাকে পাঠিয়ে দিয়েছিল। আমি যখন কলকাতা থেকে রওনা হচ্ছি, তখনই সেটি আমার হাতে এসে পেঁছল। তুমি যখন চিঠিখানি লেখ, তার আগেই তুমি মন্তানায় পেঁছেছ। কিন্তু জার্মানি থেকে ফিরে এসে কমলার অবস্থা কেমন দেখলে ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে কিছু জানাওনি। আশা করি পরের ডাকে ভাল খবর পাব।

নির্বাচন নিয়ে আমি ভারী ব্যস্ত ছিলাম, এদিকে আর-কারও খেয়াল নেই; ছোট্ট ইন্দু তাই তার জন্মদিনে আমাদের কাছ থেকে কোনও উপহারই পেল না। এজন্যে আমি ভারী দুঃখিত।

আগের চিঠিতে তোমাকে লিখেছিলাম, বেশ কিছুদিনের জন্য নান ইউরোপ থেকে বেড়িয়ে এল, অথচ কোথায় তার স্বাস্থ্য আরও ভাল দেখাবে, তা নয়, কেমন অসুস্থ দেখাচ্ছিল। তখন জানতাম না যে তাদের সংসারের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেতে চলেছে। বলা বাহুল্য, সে ভালই আছে।

২৩ নভেম্বর তারিখের চিঠিতে তুমি লিখেছ, তোমার কাছে যা টাকাপয়সা আছে, তাতে ১৫ তারিখ পর্যন্ত তুমি চালিয়ে নিতে পারবে। যমুনালালজী আমার কাছে এক চিঠি দিয়েছেন। চিঠিখানা আমার কাছেই আছে। তাতে তিনি জানাচ্ছেন যে ১১ নভেম্বর তারিখে তোমাকে ৩০০ পাউন্ড পাঠান হয়েছে। সে-টাকা এতদিনে তুমি নিশ্চয়ই পেয়েছ। সুতরাং এ নিয়ে আমি আর কোন চিন্তা করছি না।

এখনও আমার ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা সম্পর্কে আমি মনঃস্থির করে উঠতে পারিনি। শেষ যে তোমার কাছে চিঠি লিখেছি, তার পর আর এ-নিয়ে কিছু ভাববার মত সময়ও আমার ছিল না। গোহাটি অধিবেশনের পর একটা স্থির সিদ্ধান্ত নিতে পারব বলে আশা করছি। ইতিমধ্যে এই নদীপথে যেতে যেতে কোনও ব্যবস্থার কথা যদি মনে আসে, তোমাকে জানাব। নদীপথ ফুরতে এখনও সাত দিন বাকী।

সবাইকে ভালবাসা জানাই।

বাবা

৪৮ মোতিলাল নেহরু কর্তৃক লিখিত

দি আসাম মেল
৩০ ডিসেম্বর, ১৯২৬

প্রিয় জওহর,

গোহাটি থেকে ফিরতি পথে ট্রেনে বসে তোমাকে এই চিঠি লিখছি। সভাপতি, প্রাক্তন সভাপতি, এবং বহুসংখ্যক ডেলিগেট এই একই ট্রেনে আছেন। ট্রেনখানি অতিশয় নড়বড়ে, এবং আক্ষরিক অর্থে এতে আর তিলধারণের জায়গা নেই। এটি করিডর ট্রেন, তাই সারা ভারতবর্ষে এটিকে সব চাইতে আরামদায়ক ট্রেন বলে মনে করা হয়ে থাকে। তবে খবরের কাগজের রিপোর্টাররা সেই করিডরের নানা স্থানে ঘাঁটি করে বসে আছেন। আপন জায়গায় বসে থেকেও তাঁদের হাত থেকে পরিত্রাণ-লাভের উপায় নেই. আগামী ডাকে তোমাকে বড় চিঠি লিখব, এ কদিন তোমাকে অপেক্ষা করতে হবে। ইতিমধ্যে এইটুকু বললেই যথেষ্ঠ হবে যে যতখানি আশা করা

গিয়েছিল, গোহাটি কংগ্রেস তার চাইতে অনেক বেশী সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে। প্রতিক্রিয়াশীল সমস্ত লোকের বিরুদ্ধে আমরা অত্যন্তই শক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছিলাম, এবং যা-কিছু প্রস্তাব আমরা করেছি, তার সবই বিপুল ভোটাধিক্যে গৃহীত হয়েছে।

শ্রদ্ধানন্দ নিহত হবার ফলে সাম্প্রদায়িক তিক্ততা বৃদ্ধি পেয়েছে, এবং বিভিন্ন মহল থেকে প্রকাশ্যভাবে এই হুমকি দেওয়া হচ্ছে যে এর প্রতিশোধ গ্রহণ করা হবে। একমাত্র যে-মহল থেকে প্রকৃত বিপদের আশংকা করা হচ্ছে, সে হল বাংলার বিপ্লবী দল। দুর্ভাগ্যের বিষয়, সাম্প্রদায়িকতার মালিন্যে এদের অনেকখানিই মলিন হয়েছে।

তোমার গত দুটি চিঠিতে কমলার ক্রমোন্নতির খবর পেয়ে খুশী হয়েছি।

নিপীড়িত জাতি-সঙ্ঘে কংগ্রেসের একমাত্র প্রতিনিধি হিসেবে তোমাকে নিয়োগ করা হয়েছে। এখন আর কাউকে অনুরোধ করা সম্ভব ছিল না, এত অল্প সময়ের মধ্যে যিনি সম্মেলনে যোগ দিতে পারেন। রঙ্গস্বামী ইতিমধ্যেই তোমাকে তার করেছেন। এই ডাকেই তিনি সঙ্ঘের সম্পাদক এবং তোমার কাছে আনুষ্ঠানিক পত্র পাঠিয়ে দেবেন।

পরের চিঠি সবিস্তারে লিখব।

ভালবাসা জানাই। বাবা

৪৯ মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক লিখিত

নন্দী হিল, মহীশূর,
২৫ মে, ১৯২৭

প্রিয় জওহরলাল,

তোমার চিঠি যখন পাই, আমি তখন অসুস্থ। বেশী চিঠিপত্র লিখবার ক্ষমতা তখন আমার ছিল না। এখনও আমি সম্পূর্ণ সুস্থ হইনি, অল্প কিছু কাজ করতে পারি মাত্র। তবে আমি দ্রুত সেরে উঠছি।

অনেক দিন হল তুমি ওখানে আছ। তবে আমি জানি যে এই সময়টা তুমি নষ্ট করনি। আশা করি, তোমরা যখন ফিরবে, কমলা ততদিনে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠবে। তার স্বাস্থ্যের কারণে যদি আরও কিছু দিন ওখানে থাকবার দরকার হয়, তাহলে সে-কটা দিন ওখানে থেকে আসবে বলেই অনুমান করছি।

নিপীড়িত জাতি-সম্মেলনের কাজ সম্পর্কে তুমি যে প্রকাশ্য বিবরণ ও সেই সঙ্গে যে ব্যক্তিগত গোপনীয় বিবরণ পাঠিয়েছ, তা আমি অতি যত্নসহকারে পড়ে দেখেছি। এই সঙ্ঘের কাছ থেকে আমি বিশেষ কিছু আশা করি না। আর-কিছু না হক, এইজন্য যে যে-সব শক্তি এই নিপীড়িত জাতিগুলিকে শোষণ করছে, এদের কার্যকলাপের স্বাধীনতা তাদেরই সদিচ্ছার উপরে নির্ভরশীল। ইউরোপের যে-সব দেশ এই সঙ্ঘে যোগ দিয়েছে, শেষ পরীক্ষায় তারা উত্তীর্ণ হতে পারবে না বলেই আমার মনে হয়। তার কারণ তাদের আপন স্বার্থ যাতে ক্ষুন্ন হবে বলে তাদের মনে হবে, তা তারা মেনে নিতে পারবে না। আমাদের দিকেও এই বিপদ রয়েছে যে আপন শক্তিতে মুক্তি অর্জনের প্রয়াস না পেয়ে আমাদের জনসাধারণ তখন আবার বাইরের শক্তি এবং বাইরের সাহায্যের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়বে। তবে এ-সবই অনুমান মাত্র। ইউরোপের ঘটনাবলীকে আমি মোটেই যত্নসহকারে অনুধাবন করে দেখছি না। তুমি নিজে ঘটনাস্থলে রয়েছ, এবং ওখানকার আবহাওয়ায় এমন কোনও সর্বাঙ্গীণ উন্নতি তুমি হয়ত দেখতে পাচ্ছ, যা আমার দৃষ্টিকে সম্পূর্ণ এড়িয়ে গিয়েছে।

এখানে এই রকমের কিছু কথা হচ্ছে যে আগামী কংগ্রেসে তোমাকে সভাপতি নির্বাচন করা হতে পারে। বাবার সঙ্গে এ-বিষয়ে আমার পত্রালাপ হচ্ছে। হিন্দু-

মুসলিম প্রশ্নে নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতিতে সর্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাব গৃহীত হওয়া সত্ত্বেও এখানকার অবস্থা মোটেই আশাপ্রদ নয়। মাথা-ভাঙাভাঙি কোনও ভাবেই বন্ধ হবে কিনা, আমি জানি না। জনসাধারণের উপরে আমাদের প্রভাব আমরা হারিয়েছি। এখন তুমি যদি সভাপতি হও, তাহলে অন্তত বছর খানেকের জন্য জনসাধারণের সঙ্গে তুমি যোগ রাখতে পারবে না বলেই আমার মনে হয়। তার অর্থ অবশ্য এই নয় যে কংগ্রেসের কাজকে অবহেলা করতে হবে। সে-কাজ কাউকে-না-কাউকে করতেই হবে। তবে সে-কাজ করতে অনেকেই ত ইচ্ছুক ও উদ্‌গ্রীব। তার অবশ্য নানা উদ্দেশ্য থাকতে পারে; উদ্দেশ্যটা স্বার্থপ্রণোদিত হওয়াও বিচিত্র নয়। তবে কথা এই যে কংগ্রেসের কাজকে তাঁরা, যে-ভাবেই হক, চালিয়ে নেবেন। প্রতিষ্ঠানটা তাঁদের হাতেই থাকবে, জনসাধারণের জন্য কাজ করবার যোগ্যতা অর্জনে এবং জনসাধারণের উপরে প্রভাব বিস্তারে যাঁরা সক্ষম হবেন। এখন প্রশ্ন হচ্ছে কী ভাবে তোমাকে কাজে লাগালে সব চাইতে ভাল হয়। তোমার যা ভাল মনে হয়, তা-ই তুমি করবে। আমি জানি যে ব্যাপারটাকে নিরাসক্তভাবে বিচার করে দাদাভাই অথবা ম্যাকসুইনির মতই নিঃস্বার্থভাবে তুমি বলতে পার 'ও-মুকুট আমাকেই পরিয়ে দাও', এবং সেক্ষেত্রে ও-মুকুট যে তোমাকেই পরিয়ে দেওয়া হবে, তাতে আমার কিছুমাত্র সন্দেহ নেই। ইতিমধ্যেই যদি না লিখে থাকেন, তাহলে বাবাও এই ডাকেই তোমাকে চিঠি লিখবেন। আমি এই চিঠির একটি অনুলিপি তাঁকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

তোমার মতামত তার করে জানালেই বোধ হয় ভাল হয়। আমি বোধ হয় জুলাই মাসের শেষ পর্যন্ত বাঙ্গালোরে থাকব। সুতরাং সরাসরি বাঙ্গালোরে তুমি তার পাঠাতে পার। অথবা, নিশ্চিত হবার জন্য, আশ্রমেই না হয় পাঠিও। যেখানেই থাকি না কেন, আশ্রম থেকে তারের বক্তব্য আমাকে জানিয়ে দেওয়া হবে।

সকলকে ভালবাসা জানাই।

তোমাদের
মো. ক. গান্ধী

৫০ মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক লিখিত

[১৯২৭ সনের ডিসেম্বর মাসে ইউরোপ থেকে আমি ফিরে আসি, এবং সরাসরি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের মাদ্রাজ অধিবেশনে যোগ দিতে যাই। সেখানে আমার নির্দেশে অনেকগুলি প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল। এই অধিবেশনে যে-সব কাজ আমি করেছিলাম, তার কিছু-কিছু গান্ধীজীর মনঃপূত হয়নি। তাই তিনি আমাকে এই চিঠি লেখেন।]

সত্যাগ্রহাশ্রম, সবরমতী,
৪ জানুয়ারি, ১৯২৮

অসংশোধিত

প্রিয় জওহরলাল,

আমি জানি তুমি আমাকে এতই ভালবাস যে তোমাকে যা লিখতে বসেছি তাতে তুমি ক্ষুণ্ণ হবে না। অন্তত আমি তোমাকে এতই ভালবাসি যে এ-চিঠি লেখা যখন আমার অবশ্যকর্তব্য বলে মনে হয়েছে, তখন না-লেখা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

তোমার গতি বড় ঊর্ধ্বশ্বাস হয়ে উঠেছে। একটু ভাববার জন্য এবং আবহাওয়াটাকে ধাতস্থ করে নেবার জন্য তোমার আর-একটু সবুর করা উচিত ছিল। যে-সব প্রস্তাব রচনা করে তুমি পাশ করিয়ে নিয়েছ, তার অধিকাংশই আর-এক বছর পরে উত্থাপন করা চলত। তোমার 'রিপাবলিকান আর্মি'তে যোগ দেওয়াটা অবিমৃশ্যকারিতার কাজ হয়েছে। তবে এ-সব কাজেও আমি ততটা ক্ষুণ্ণ হই না, যতটা হই দুষ্কৃতকারী ও গুণ্ডাদের তুমি উৎসাহ দেওয়াতে। নিরঙ্কুশ অহিংসায় এখনও তোমার আস্থা

আছে কি না, তা আমি জানি না। কিন্তু তোমার মত যদি তুমি পালটেও থাক, তবু এ-কথা তুমি মনে করতে পার না যে বে-আইনী ও বন্ধাহীন হিংসাই দেশের মুক্তি এনে দেবে। ইউরোপে গিয়ে তোমার যে অভিজ্ঞতা হয়েছে, তাতে দেশের অবস্থা সযত্নে পর্যবেক্ষণ করে এই দৃঢ় বিশ্বাস যদি তোমার হয়ে থাকে যে বর্তমান পন্থা ও উপায় ভ্রান্তিপূর্ণ, সেক্ষেত্রে সর্বতোভাবে তোমার মতকে তুমি প্রতিষ্ঠিত করবে, কিন্তু তার আগে দয়া করে সুশৃঙ্খল একটি দল গঠন করে নাও। কানপুরে কী হয়েছিল তুমি জান। প্রতিটি সংগ্রামেই এমন কিছু লোকের দরকার হয়, যাঁরা শৃঙ্খলাপরায়ণ। উপায় সম্পর্কে তোমার অসতর্কতা দেখে মনে হয়, এই সত্যটা তোমার নজর এড়িয়ে গিয়েছে।

তুমি যদি আমার উপদেশ গ্রহণ কর ত বলব, এখন যেহেতু তুমি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ওয়ার্কিং সেক্রেটারি, সুতরাং মূল প্রস্তাব অর্থাৎ ঐক্য, এবং প্রাধান্যের দিক থেকে পরবর্তী হলেও যে-প্রস্তাবটি গুরুত্বপূর্ণ সেই সাইমন কমিশন বর্জনের ব্যাপারেই তোমার সমস্ত উদ্যম নিয়োগ করা উচিত। সংগঠনের ও অন্যদের দিয়ে কাজ করিয়ে নেবার যে মহান শক্তি তোমার রয়েছে, ঐক্য-প্রস্তাবের ব্যাপারে তার সবটুকুই তোমার প্রয়োগ করবার প্রয়োজন হবে।

এ-বিষয়ে সবিস্তারে বলবার সময় আমার নেই। বলা বাহুল্যও বটে।

কমলা ইউরোপে যেমন সুস্থ ছিল, আশা করি এখানেও তেমন আছে।

তোমাদের
বাপু

৫৯ মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক লিখিত

আশ্রম, সবরমতী,
১৭ জানুয়ারি, ১৯২৮

প্রিয় জওহরলাল,

সময় বাঁচাবার জন্য অন্যকে ডিক্টেশন দিয়ে এই চিঠি লেখাচ্ছি। তা ছাড়া আমার কাঁধে ব্যথা হয়েছে, কাঁধটা এতে বিশ্রাম পাবে। ফেনার ব্রকওয়ে সম্পর্কে রবিবার তোমাকে লিখেছিলাম। আশা করি সে-চিঠি তুমি যথাসময়ে পেয়েছ।

যে-সব নিবন্ধের তুমি সমালোচনা করেছ, তুমি কি জান যে উল্লিখিত বিষয়সমূহে তোমার ভূমিকাই প্রধান ছিল বলে সেগুলি আমি লিখেছিলাম? অবশ্য তথাকথিত 'নিখিল ভারত প্রদর্শনী' নিবন্ধটি ছাড়া। এই ভেবে আমি খানিকটা আশ্বস্ত ছিলাম যে তোমার ও আমার মধ্যে যে-সম্পর্ক বর্তমান, তাতে যে-মনোভাব নিয়ে প্রবন্ধগুলি আমি লিখেছিলাম, সেই মনোভাব নিয়েই সেগুলিকে তুমি গ্রহণ করবে। দেখা যাচ্ছে, আমার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়েছে। তবে তাতে আমি কিছু মনে করিনি। কারণ, এ ত পরিষ্কার যে বহু বছর যাবৎ স্পষ্টতই যে-আত্মনিরোধের আশ্রয় তুমি নিয়েছ, একমাত্র এই নিবন্ধগুলিই তার থেকে তোমাকে মুক্তি দিতে সমর্থ। তোমার এবং আমার মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গীর কিছু-কিছু পার্থক্য আমি বুঝতে শুরু করেছিলাম, কিন্তু সেই পার্থক্য যে এত বিরাট, তা আমি ধারণাই করতে পারিনি। জাতির স্বার্থে, এবং আমার সঙ্গে ও আমার অধীনে অনিচ্ছাসত্ত্বে কাজ করলেও জাতির সেবা তোমার দ্বারা সম্ভব হবে ও তুমি সম্পূর্ণ অক্ষত থাকবে, এই বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে বীরের মত যখন তুমি আত্মনিরোধের আশ্রয় নিয়েছিলে, আসলে এই আত্মনিরোধের ফলে তখন নিজেকেই তুমি ক্ষতবিক্ষত করেছ। যখন তোমার মনের এই অবস্থা, তখন আমার মধ্যকার সেইসব জিনিসই তোমার নজর এড়িয়ে গিয়েছিলে, আজ যেগুলি তোমার চোখের সামনে আমার গুরুতর ত্রুটি হয়ে দেখা দিচ্ছে। সক্রিয়ভাবে

কংগ্রেসকে পরিচালনাকালে, নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির কার্যাবলী সম্পর্কে সমান কড়া নিবন্ধ আমি লিখেছি, ইয়াং ইণ্ডিয়ার পাতা খুলে তা তোমাকে দেখাতে পারি। যখনই কেউ দায়িত্বজ্ঞানশূন্য এবং হঠকারী কোনও উক্তি বা কাজ করেছেন, নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির বিভিন্ন সভায় সে সম্পর্কে একইভাবে আমি বলেছি। কিন্তু তুমি তখন মোহগ্রস্ত ছিলে; তাই এ-সব ব্যাপার তখন তোমার এতটা খারাপ লাগত না। সুতরাং, তোমার চিঠির মধ্যে যে-সব অসঙ্গতি রয়েছে, সেগুলি তোমাকে দেখাতে যাওয়া নিরর্থক হবে বলে মনে করি। ভবিষ্যতে কী করব, এখন সেইটেই আমার চিন্তনীয় বিষয়।

আমার কাছ থেকে মুক্তি পাবার প্রয়োজন যদি তোমার হয়ে থাকে, তাহলে এতকাল তুমি আমাকে যে নম্র প্রশ্নহীন আনুগত্য দিয়ে এসেছ, এবং তোমার মনের অবস্থা বুঝতে পেরেছি বলে যে-আনুগত্যের মূল্য আমার কাছে আরও বেড়ে গিয়েছে, তার থেকে তোমাকে আমি মুক্তি দিলাম। আমি স্পষ্টই বুঝতে পারছি, আমার এবং আমার দৃষ্টিভঙ্গীর বিরুদ্ধে তোমাকে প্রকাশ্য সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে। কেন না, আমি যদি ভ্রান্ত হই, সেক্ষেত্রে অবশ্যই আমি দেশের অপূরণীয় ক্ষতিসাধন করছি; এবং এ-কথা জানবার পর এখন আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করাই তোমার কর্তব্য। আর, আপন সিদ্ধান্ত সম্পর্কে তোমার যদি কোনও সংশয় থাকে, ব্যক্তিগতভাবে সানন্দে তা নিয়ে তোমার সঙ্গে আমি আলোচনা করব। তোমার সঙ্গে আমার পার্থক্য এতই বিরাট ও মৌলিক হয়ে দাঁড়িয়েছে দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের মধ্যে কোনও আপস-মীমাংসা সম্ভব নয় বলেই মনে হয়। তোমার মত এত সাহসী, এত বিশ্বস্ত, এত দক্ষ এবং এত সৎ একজন বন্ধু হারাতে হবে বলে আমি অতিশয় দুঃখিত, এ-কথা তোমার কাছে গোপন রাখা সম্ভব নয়। কিন্তু আদর্শ পালন করতে গেলে বন্ধুতাকেও অনেক সময় বিসর্জন দিতে হয়। এ সমস্ত-কিছুর ঊর্ধ্বে স্থান দিতে হবে আদর্শকে। কিন্তু এ-বন্ধুতার অবসানও যদি ঘটাতে হয়, আমাদের ব্যক্তিগত অন্তরঙ্গতা তাতে ক্ষুণ্ণ হবে না। অনেক কাল যাবৎ আমরা একই পরিবারের মানুষ হয়ে রয়েছি; গুরুতর রাজনৈতিক মতবিরোধ সত্ত্বেও আমরা তা-ই থাকব। আমার সৌভাগ্য এই যে কয়েকজনের সঙ্গেই আমার এমন সম্পর্ক বর্তমান। দৃষ্টান্ত হিসেবে শাস্ত্রীর কথা বলা যায়। রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর বিচারে আমাদের মধ্যে দুস্তর পার্থক্য। কিন্তু সে-পার্থক্য সম্পর্কে অবহিত হবার আগে আমাদের মধ্যে যে ঘনিষ্ঠতার সৃষ্টি হয়েছিল, বহু অগ্নিপরীক্ষার পরেও তা অম্লান অক্ষুণ্ণ রয়েছে।

মর্যাদাসূচক ভঙ্গীতে তুমি তোমার মতবিরোধের কথা ঘোষণা কর। এ-নিয়ে আমার পরামর্শ এই: তোমার মতবিরোধের কারণগুলি জানিয়ে তুমি আমার কাছে একটি চিঠি লেখ। চিঠিখানি আমি ইয়াং ইণ্ডিয়ায় প্রকাশ করব, এবং সংক্ষেপে তার একটি উত্তরও লিখে দেব। তুমি আমার কাছে প্রথম যে চিঠিখানি লিখেছিলে, সেটি পড়ে তার উত্তর লিখবার পর চিঠিখানি আমি নষ্ট করে ফেলেছি। তোমার দ্বিতীয় চিঠিখানি আমি রেখে ছিলাম। আর একখানা চিঠি লিখবার ইচ্ছে যদি তোমার না-ই হয়, তাহলে এই দ্বিতীয় চিঠিখানিই প্রকাশ করতে আমি প্রস্তুত। এ-চিঠির মধ্যে আপত্তিকর কিছু আছে বলে আমার মনে হয় না। তবে যদি দেখি যে তেমন-কিছু আছে, তাহলে তা যে আমি বাদ দিয়ে দেব, এ-বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার। আমার বিশ্বাস, এটি একটি সৎ দলিল; তোমার মনোভাব এখানে খোলাখুলিভাবে ব্যক্ত হয়েছে।

ভালবাসা জানাই।

বাপু

৫২ মোতিলাল নেহরু কর্তৃক মহাত্মা গান্ধীকে লিখিত

১১ জুলাই, ১৯২৮

প্রিয় মহাত্মাজী,

অবশেষে এ-কথা বলতে পারছি যে কমিটির রিপোর্ট সম্পর্কে মোটামুটিভাবে সর্বসম্মত একটা সিদ্ধান্ত সম্ভব হয়েছে। একে পুরো মতৈক্য বলা যায় না, এবং এটা খাঁটিও নয়, তবে এমন কিছু যা নিয়ে সর্বদলীয় সম্মেলনে ও দেশে আমরা দাঁড়াতে পারব। চূড়ান্ত পর্যায়ের কার্যবিবরণীর একটি অনুলিপি এই সঙ্গে পাঠালাম। বিরোধসূচক বিষয়গুলি সম্পর্কে কী ব্যবস্থা আমরা অবলম্বন করেছি, এর থেকে সে সম্পর্কে আপনি একটা ধারণা করতে পারবেন। জওহর ও আমার উপরে রিপোর্ট রচনার ভার দিয়ে সদস্যরা সবাই যে-যার বাড়ি চলে গিয়েছেন। বর্তমানে এই নিয়ে আমরা খুব ব্যস্ত আছি।

সংবাদপত্রে আপনি হয়ত দেখে থাকবেন যে কানাডীয় প্রতিনিধিদলের সদস্যপদে আমি ইস্তফা দিয়েছি। এর কারণ, আমার মনে হয়েছিল যে সর্বদলীয় সম্মেলনে আমাদের রিপোর্টটি গৃহীত হবার যেটুকু সম্ভাবনা আছে, আমি দেশে উপস্থিত না থাকলে তা হ্রাস পাবে।

এবারে মুকুটের প্রশ্ন। এ-বিষয়ে আমার কোনও সংশয় নেই যে বর্তমান মুহূর্তে বল্লভভাইয়ের কাজ সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছে, তাঁকে এই মুকুট পরিয়ে দিয়ে তাঁর জনসেবামূলক কাজের যৎসামান্য স্বীকৃতি আমরা দিতে পারি। আর এ-মুকুট তাঁকে যদি না দেওয়া হয়, ত সমস্ত অবস্থা বিচার করে বলতে পারি যে তার পরবর্তী ব্যক্তি হিসেবে জওহরই যোগ্যতম। আমাদের মধ্যে যাঁরা একটু ভালমানুষগোছের লোক, তাঁদের অনেকেই অবশ্য জওহরের স্পষ্টভাষণে বেশ ভয় পেয়ে গিয়েছেন। তবে এমন একটা সময় এসেছে যখন অধিকতর উদ্যমশীল ও দৃঢ়সংকল্প কর্মীদের হাতেই তাঁদের আপন পন্থা অনুযায়ী দেশের রাজনৈতিক কার্যকলাপ পরিচালনার ভার ছেড়ে দেওয়া উচিত। আপনি আমি যে-শ্রেণীর মানুষ, তার সঙ্গে এই শ্রেণীর যে মতপার্থক্য রয়েছে তা আমি স্বীকার করি, কিন্তু তাই বলে আমাদের মতামতকে জোর করে এদের উপরে চাপিয়ে দেওয়ার পক্ষে কোনও যুক্তি নেই। আমাদের যুগ ত দ্রুত শেষ হয়ে আসছে; আজ হক কাল হক, জওহরের মত মানুষদেরই এই সংগ্রাম চালিয়ে যাবার দায়িত্ব নিতে হবে। যত তাড়াতাড়ি তারা এখন কাজ শুরু করে দেয়, ততই ভাল।

আমার প্রসঙ্গে জানাই, আগে আমার যতখানি আত্মবিশ্বাস ছিল, তার অনেকখানিই আমি হারিয়েছি বলে মনে হয়। বলতে গেলে আমি এখন ক্ষয়িতশক্তি মানুষ। সিংহাসনের ত আপন কোনও মূল্য নেই, তার পিছনে যে শক্তি থাকে, মূল্য তারই। আপনাকে ছাড়া আর তেমন কোনও শক্তি আমি দেখতে পাচ্ছি না, যার উপরে আমি নির্ভর করতে পারি। আপনার অনুরোধেই এ-বিষয়ে আমার মতামত আমি জানালাম। সিদ্ধান্ত আপনাকেই করতে হবে।

ভবদীয়
মোতিলাল নেহরু

৫৩ জে. এম. সেনগুপ্ত কর্তৃক মোতিলাল নেহরুকে লিখিত

[বাংলা দেশে যাঁরা ছিলেন কংগ্রেসের প্রধান নেতৃবৃন্দ, জে. এম. সেনগুপ্ত ছিলেন তাঁদেরই একজন। কংগ্রেসের পরবর্তী অধিবেশন তখন কলকাতায় অনুষ্ঠিত হতে চলেছে।]

১০|৪ এলগিন রোড
কলিকাতা, ১৭ জ‌ুলাই, ১৯২৮

প্রিয় পণ্ডিতজী,

গতকল্য মহাত্মাজীর কাছ থেকে এই মর্মে এক তারবার্তা পেলাম যে পরবর্তী কংগ্রেসে সভাপতির পদ গ্রহণে আপনি অনিচ্ছ‌ুক। এ-সংবাদে আমি অত্যন্ত আঘাত পেয়েছি। অবিলম্বে আমার সমস্ত বন্ধ‌ুর সঙ্গে আমি পরামর্শ করি, এবং আপনার সম্মতিলাভের জন্য মহাত্মাজী যাতে বিশেষভাবে আপনাকে অন‌ুরোধ করেন. তার জন্য মহাত্মাজীর কাছে দাবি জানিয়ে আমরা তাঁকে এক তার পাঠাবার সিদ্ধান্ত করি। এ-সিদ্ধান্ত সর্বসম্মত।

এখন আমাদের সংকোচ অথবা দ্বিধার সময় নয়। আপনাকে আমাদের **পেতেই হবে**। ঘরে বাইরে এই যে রাজনৈতিক সংকট চলছে, এই সংকটে আপনাকে এসে আমাদের পরিচালিত করতেই হবে। অধিকাংশ প্রদেশই আমাদের কাছে সংবাদ পাঠিয়েছে যে তারা আপনাকেই চায়। চার-পাঁচটি প্রদেশ মাত্র একটি নামই পাঠিয়েছে। সে-নাম আপনার। যদিও প্রাথমিক নির্বাচন বলে আপনার নামের সঙ্গে অন্যান্য নামও তারা যোগ করতে পারত।

বাংলা দেশ সর্বসর্শতিক্রমে আপনাকেই চায়। তার কারণ আপনাকে ছাড়া আমাদের চলবে না। প‌ুত্রেরও যেখানে নির্বাচিত হবার সম্ভাবনা বর্তমান, সেক্ষেত্রে পিতার মনোভাব আমি ব‌ুঝতে পারি। কিন্তু আমরাও ত অনেকে আপনার প‌ুত্র-তুল্যই। স‌ুতরাং এইভাবে আপনার কাছে দাবি জানাবার জন্য আপনি আমাদের ক্ষমা করবেন। আপনার অনিচ্ছার কারণ যা-ই হক না কেন, কোনক্রমেই যেন আমাদের নিরাশ করবেন না। এর চাইতে আর কত জোরের সঙ্গে আপনার কাছে আমাদের দাবি জানাব।

আজ মহাত্মাজীকে আমি দীর্ঘ এক পত্র লিখেছি। তার অন‌ুলিপি আপনাকে পাঠালাম। দয়া করে শ‌ুধ‌ু একটামাত্র লাইন লিখে আমাকে জানান যে সব ঠিক আছে।

ভবদীয়
জে. এম. সেনগ‌ুপ্ত

৫৪ স‌ুভাষচন্দ্র বস‌ু কর্তৃক মোতিলাল নেহর‌ুকে লিখিত

১ উডবার্ন পার্ক, কলিকাতা
১৮ জ‌ুলাই, ১৯২৮

প্রিয় পণ্ডিতজী,

কংগ্রেস সভাপতির পদ সম্পর্কে গতকল্য সকালে আমি আপনাকে তার করেছিলাম। কাল রাত্রে তার উত্তর পেয়েছি।

কোনও কারণে আপনি যদি কংগ্রেস-সভাপতির পদ গ্রহণে অসম্মত হন, সমগ্র বাংলা দেশ যে তাহলে কতখানি নিরাশ হবে, তা আপনাকে ব‌ুঝিয়ে বলতে পারব না। যে-সমস্ত কারণে এই প্রদেশের সকলেই আপনাকে চায়, তার একটি হল এই যে, স্বরাজ্য দলের কাজ এবং নীতির সঙ্গে আপনি ঘনিষ্ঠভাবে য‌ুক্ত। অন্যান্য প্রদেশের আমি উল্লেখ করব না. তবে এ-বিষয়ে আমি একরকম নিশ্চিত যে, চ‌ূড়ান্ত মনোনয়নের সময় সমগ্র ভারতবর্ষ সর্বসম্মতিক্রমে আপনাকে সমর্থন জানাবে।

দেশের অবস্থা আজ যে-রকম, এবং আমাদের দেশের ইতিহাসে ১৯২৯ সন যে-রকম গ‌ুর‌ুত্বপ‌ূর্ণ একটি বৎসর হবে, তাতে এমন আর কারও কথাই আমরা ভাবতে

পারছি না, অবস্থা বুঝে যিনি ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারবেন। বিকল্প কয়েকটি নাম আমরা শুনেছি; অন্য অবস্থায় সে-সব নাম বিবেচনারও যোগ্য হত। কিন্তু বিভিন্ন দলের মধ্যে একটা ঐক্যসাধন এবং সর্বসম্মতিক্রমে একটি গঠনতন্ত্র প্রণয়নের জন্য যখন সযত্ন চেষ্টা চলছে, বিকল্প নামগুলির কোনওটিকেই তখন গ্রহণ করা যেতে পারে না। আমি কিছুমাত্র বাড়িয়ে বলছি না; কোনও কারণে আপনি যদি সভাপতির পদ গ্রহণে সম্মত না হন, তবে এই প্রদেশের পক্ষে তার পরিণাম এতই মারাত্মক হবে যে, কংগ্রেস-অধিবেশনের সাফল্য তাতে যথেষ্টই বিঘ্নিত হবে। আমরা যখন এক গুরুতর সঙ্কটের মধ্য দিয়ে চলছি, তখন কি আমরা আশা করতে পারি না যে, জাতির আহ্বানে আপনি সাড়া দেবেন?

স্নেহানুরক্ত

সুভাষচন্দ্র বসু

পুনশ্চ: জেলা-বোর্ডগুলির ভোট সম্পর্কে যে তার আপনি পাঠিয়েছেন, তা আমি পেয়েছি। সেগুলি সংগ্রহ করবার চেষ্টা করছি, তবে চেষ্টা সফল হবে কিনা, সে-বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। বিভিন্ন জেলার কাছ থেকে ভোটার-তালিকা পাবার পর সংখ্যাগুলিকে মিলিয়ে তুলতে যথেষ্টই সময় লাগবে।

সুভাষ

৫৫ মোতিলাল নেহরু কর্তৃক জে. এম সেনগুপ্ত ও সুভাষচন্দ্র বসুকে লিখিত

আনন্দ ভবন,

এলাহাবাদ, ১৯ জুলাই, ১৯২৮

এইমাত্র তোমাদের চিঠি পেয়েছি, এবং এই মর্মে তোমাদের কাছে তার করে দিয়েছি যে চিঠির জবাব শিগগিরই দেব। আমার মনে হয়, অবস্থাটাকে তোমরা ভুল বুঝেছ। পিতাপুত্রের সেন্টিমেন্টের প্রশ্ন এটা নয়। এমনও নয় যে পিতার অনুকূলে সরে দাঁড়াবার জন্য পুত্রকে বুঝিয়ে বলবার দরকার হয়েছে। পিতা ও পুত্র, উভয়ের সামনে এখন একটিই প্রশ্ন: কী করলে দেশের সব চাইতে মঙ্গল হবে। মহাত্মাজী যাকে "মুকুট" বলেন, মুহূর্তের জন্যও জওহরের মনে তা পরবার ইচ্ছে দেখা হয়নি। অনেক দিন থেকেই তাকে সভাপতির আসনে বসাবার কথা আমি ভাবছি। জওহর যে আমার পুত্র বলে এ-কথা আমি ভাবছি, তা নয়। গত বছর ডাঃ আনসারী নির্বাচিত হবার আগে আমার ভাবনার কথা আমি মহাত্মাজীকে জানাই। ডাঃ আনসারী নিজেও চেয়েছিলেন যে মাদ্রাজ কংগ্রেসে জওহর সভাপতিত্ব করুক। কিন্তু অত্যন্তই দৃঢ়তার সঙ্গে জওহর এই সম্মান প্রত্যাখ্যান করে।

আমার কমিটির অধিবেশন যখন স্থগিত ছিল, সেই সময় কংগ্রেসের আসন্ন কলকাতা-অধিবেশনের সভাপতিত্ব সম্পর্কে মহাত্মাজীর কাছ থেকে আমি এক চিঠি পাই। তাতে তিনি আমাকে জানান যে সেনগুপ্তের কাছ থেকে তিনি এক চিঠি পেয়েছেন, তাতে সভাপতি হিসেবে আমার নাম প্রস্তাব করা হয়েছে। মহাত্মাজী আমাকে আরও জানান যে আমি তখন যে-কমিটির সভাপতিত্ব করছি তা যদি সারবান কিছু কাজ করতে পারে, তাহলে আমি যদি মুকুট পরি ত ভালই হয়। উত্তরে আমি তাঁকে জানাই, আমার কমিটি যে সর্বসম্মতিক্রমে কোনও সিদ্ধান্ত করবে এমন সম্ভাবনা বড় কম, এবং সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ যদি না-ই সম্ভব হয় ত সেক্ষেত্রে আমার বিবেচনায় দেশের জন্য আর আমার কোনও কাজ করবার নেই। ৮ জুলাই পর্যন্ত এ-বিষয়ে আর নতুন কোনও কথা হয়নি। ঐ তারিখে কমিটি একটা মোটামুটি সমঝোতায় উপনীত হয়, এবং আবার আমি মহাত্মাজীকে চিঠি লিখি। সে-চিঠির একটা

অনুলিপি নেই যে তোমাদের পাঠাব। তবে তার বিষয়বস্তু সম্পর্কে আমার যা মনে আছে, জানাচ্ছি। তাতে আমি বলেছিলাম যে বর্তমান মুহূর্তে বল্লভভাই প্যাটেল সকলের সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, সুতরাং সর্বাগ্রে তাঁকেই সভাপতি করবার চেষ্টা করা উচিত। তাঁকে যদি না পাওয়া যায় ত পরবর্তী যোগ্য ব্যক্তি হচ্ছে জওহরলাল। এর কারণ হিসেবে আমি বলেছিলাম যে আমাদের শ্রেণীর মানুষদের যুগ শেষ হয়ে এসেছে, এবারে দেশের পরিচালন-ভার তরুণদের হাতে তুলে দেওয়া উচিত। আমরা ত চিরকাল বাঁচব না; আজ হক কাল হক, এ-ভার তরুণদেরই নিতে হবে। আমাদের মৃত্যুকাল পর্যন্ত অপেক্ষা না করে আমাদের জীবদ্দশাতেই যদি তারা কাজ শুরু করে দেয় ত অনেক ভাল হয়। নিজের সম্পর্কে আমি বলেছিলাম যে বস্তুত আমার শক্তি ফুরিয়ে এসেছে, আমার দ্বারা আর কাজ চলবে বলে মনে হয় না। জওহরের নাম আমি এই কারণে সুপারিশ করেছিলাম যে আমার বিশ্বাস, তরুণদের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের আস্থা অর্জনের সম্ভাবনা তারই সব চাইতে বেশী। পরে দেখা গিয়েছে যে আমার ধারণা সত্য। তার আর আমার নাম যে একই সঙ্গে উচ্চারিত হচ্ছে, এতেই সে-কথা বুঝতে পারা যায়। মহাত্মাজী তার করে আমাকে জানান যে আমার সঙ্গে তিনি একমত, এবং ইয়াং ইণ্ডিয়ায় তিনি জওহরের নাম সুপারিশ করবেন। এ-বিষয়ে আমি নিশ্চিত ছিলাম যে এ-কথা জানামাত্রই জওহর সরে দাঁড়াবে। সুতরাং সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে মুসৌরিতে তার কাছে আমি কড়া নির্দেশ পাঠাই যে আমার অনুমতি না নিয়ে কোন-কিছু ছাপতে দেবার বোকামি যেন তার না হয়। এই হল ব্যাপার। তোমাদের চিঠির অনুলিপি মহাত্মাজীকে আমি পাঠিয়েছি, এই চিঠির অনুলিপিও তাঁকে পাঠালাম। ব্যাপারটা আমি তাঁর হাতে ছেড়ে দিয়েছি।

প্রশ্নটা জওহর আর আমার নয়। প্রশ্ন হল, এই পরিস্থিতিতে কী করা উচিত। তোমাদের কথার মধ্যেও যুক্তি আছে, তা আমি স্বীকার করছি। কিন্তু আমার অভিমত এই যে দেশের বর্তমান অবস্থায় এমন একটা গতিশীল দলের প্রয়োজন, আপন লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্য যে-দল সর্বরকম মূল্য দানে প্রস্তুত। , আন্দোলনের পরিচালনা-ভারও এই দলের হাতেই থাকবে। স্বাধীনতার দাবি থেকে নিঃশব্দে নেমে এসে এখন যদি ডোমিনিয়ন স্টাটাস দাবি করা হয়, কংগ্রেস তাহলে হাস্যাস্পদ হবে। জগৎকে আমি দেখাতে চাই, এবং সেই সঙ্গে এ আমি অতিশয় সত্য বলে জানি যে দেশ আর এইসব ধাপ্পাবাজি সহ্য করতে প্রস্তুত নয়, এবং সর্বদলের ন্যূনতম সাধারণ দাবিকে যদি অবিলম্বে মেনে নেওয়া হয়, তাহলে এই ন্যূনতম দাবির যাঁরা সমর্থক, তাঁরাও সেক্ষেত্রে অধিকতর শক্তিশালী দলের পক্ষেই এসে দাঁড়াবেন। আমার বিশ্বাস, দেশের মনোভাব এখন যে-রকম, তাতে তথাকথিত সর্বসম্মত গঠনতন্ত্রটিকে কংগ্রেসের পরবর্তী অধিবেশনে পাশ করিয়ে নেওয়া সহজ হবে না। যদি পাশ করিয়ে নেওয়া হয়—সেটা সম্ভব—তাহলে এর সমর্থক ব্যক্তিদের জন্যই তা সম্ভব হবে, তরুণ দলের সুবিবেচিত সিদ্ধান্তের কারণে নয়।

সে যা-ই হক দেশের সেবার জন্য পিতা আর পুত্র দুজনেই প্রস্তুত। সভাপতির আসনে যিনিই বসুন, তাতে তাঁদের কিছু আসে যায় না।

এ-বিষয়ে আমি নিশ্চিত যে এইসব চিঠিপত্র পাঠ করে মহাত্মাজী ন্যায়সঙ্গত সিদ্ধান্তই গ্রহণ করবেন। তাঁর সিদ্ধান্ত মেনে নিতে আমি সম্পূর্ণ প্রস্তুত আছি।

মোতিলাল নেহরু

৫৬ মোতিলাল নেহরু কর্তৃক মহাত্মা গান্ধীকে লিখিত

আনন্দ ভবন,
এলাহাবাদ, ১৯ জুলাই, ১৯২৮

প্রিয় মহাত্মাজী,

এই সঙ্গে যে-সব চিঠিপত্র পাঠালাম, তার থেকেই সব বুঝতে পারবেন। কমলা ও ইন্দুর জন্য ব্যবস্থা করতে জওহর মুসৌরি গিয়েছে। তবে সেনগুপ্তের কাছে লিখিত আমার পত্রের অনুলিপি পড়ে বুঝতে পারবেন, জওহরকে আমি কড়া নির্দেশ দিয়েছি যে সে যেন কোনও কথা না বলে। জওহরকে সরে দাঁড়াতে বলবার জন্য সেনগুপ্ত আপনাকে যে অনুরোধ জানিয়েছে, তা আমার ভাল লাগল। জওহর যাতে সরে না দাঁড়ায়, তার জন্যই বরং তাকে ভাল ভাবে বুঝিয়ে বলবার দরকার হবে।

কমিটির রিপোর্ট রচনার কাজে আমি খুবই ব্যস্ত আছি। জওহর আমার জন্য প্রভূত তথ্য রেখে গিয়েছে। কিন্তু রিপোর্ট ডিক্টেট করবার কালে প্রতিপদেই এমন সব বিষয়ের সম্মুখীন হতে হচ্ছে, যার কথা জওহর অথবা আমি কেউই আগে ভাবিনি। এর কারণ এই যে কমিটির সিদ্ধান্তগুলি সে-ভাষায় লিপিবদ্ধ হয়েছে, তা আত্মশিথিল। লম্বা লম্বা বৈঠকের একেবারে শেষের দিকে এই সিদ্ধান্তগুলিকে লিপিবদ্ধ করা হত; সদস্যদের সকলেই তখন এত ক্লান্ত থাকতেন যে শব্দ-নির্বাচনে যত্ন নেবার মত উৎসাহ কারও থাকত না। কোন্ শব্দ কী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে সেটা ঠিকমত জেনে নেবার জন্য আপনাকে এখন সারাক্ষণই সদস্যদের (তাঁরা সকলেই যে-যার বাড়িতে চলে গিয়েছেন) কাছে প্রশ্ন করে পাঠাতে হচ্ছে। আসলে আমি চেষ্টা করছি যাতে আমার ব্যাখ্যাটাকেই তাঁরা মেনে নেন। এ-যাবৎ বিনা প্রতিবাদে তাঁরা আমার অর্থকেই মেনে নিয়েছেন। শেষ যে প্রশ্ন করে পাঠিয়েছি, আমি এখন তারই উত্তরের জন্য অপেক্ষা করছি। উত্তর পেলেই সদস্যদের কাছে খসড়া রিপোর্টটি পাঠিয়ে দেব।

বর্দোলির এবং তৎসংক্রান্ত ঘটনাবলীর ক্রম-পরিণতি আমি সাগ্রহে লক্ষ্য করে যাচ্ছি। কিন্তু নিজেকে যে কীভাবে কাজে লাগাব, সেইটেই এখন আমি বুঝে উঠতে পারছি না।

সংলগ্ন পত্রগুচ্ছ এবং এ-সম্পর্কে অন্যান্য যে-সব পত্র হয়ত আপনি পেয়েছেন, সেগুলি বিবেচনা করে "মুকুট" সম্পর্কে আপনার সিদ্ধান্ত দয়া করে তারযোগে আমাকে জানিয়ে দেবেন।

ভবদীয়
মোতিলাল নেহরু

৫৭ মোতিলাল নেহরু কর্তৃক অ্যানি বেসান্টকে লিখিত

এলাহাবাদ, ৩০ সেপ্টেম্বর, ১৯২৮

প্রিয় ডাঃ বেসান্ট,

আইন-সভার স্বল্পকালব্যাপী ও অতিশয় উত্তেজনাপূর্ণ অধিবেশন শেষ হয়েছে। অতঃপর সর্বদলীয় সম্মেলন কর্তৃক আমাদের উপরে যে কাজের দায়িত্বভার দেওয়া হয়েছে, শুধু সেই বিষয়ে মনঃসংযোগ করবার জন্য আমি এলাহাবাদে ফিরে এসেছি।

সিমলায় থাকতে আপনার যে-সব টেলিগ্রাম পেয়েছিলাম, তা খুবই আশাপ্রদ। ইতিমধ্যেই আপনি চমৎকার কাজ করেছেন। ইতিপূর্বে আপনার বিভিন্ন প্রয়াস যে-রকম সাফল্য অর্জন করেছে, সেইরকম সাফল্যের সঙ্গেই যে আপনি আপনার কাজ চালিয়ে যাবেন, তাতে আমার সন্দেহ নেই। প্রাদেশিক সর্বদলীয় সম্মেলনের প্রস্তাবটি অতি সুন্দর। অন্যান্য প্রদেশেও যাতে এ-রকম সম্মেলন হয়, তার জন্য

আমি ব্যবস্থা অবলম্বন করছি। সার তেজবাহাদুর সপ্রু এই সম্মেলনে উপস্থিত থাকবেন; তার পরে আমি একবার মাদ্রাজ-সফরে যাব। আমার কার্যসূচী এখনও স্থির করিনি। তার কারণ, তার আগে আমাকে নানারকম প্রাথমিক কাজকর্ম সমাধা করে নিতে হবে। সমস্ত প্রদেশে যাতে কাজ শুরু করে দেওয়া যায়, তার জন্য পর্যাপ্ত অর্থ সংগ্রহের কাজটাও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

আপনার মনে থাকতে পারে, আমাদের আশু ব্যয়ভার নির্বাহের জন্য লখনউয়ে আমরা একটা চাঁদার তালিকা তৈরি করেছিলাম। এটাকে আপৎকালীন তালিকা বলা যেতে পারে। তখন হিসাব ধরা হয়েছিল যে আশু ব্যয় ২৫,০০০৲ টাকা লাগবে। এর মধ্যে অতি সামান্য অংশই পাওয়া গিয়েছে। পরে সিমলায় কমিটির সর্বশেষ সভায় ব্যয়বরাদ্দের এক সংশোধিত তালিকা প্রস্তুত করে দেখা যায় যে আগামী তিন মাস সমস্ত প্রদেশে জোর প্রচারকার্য চালাতে হলে অন্যূন এক লক্ষ টাকার প্রয়োজন হবে। এই টাকার বেশির ভাগই বোম্বাই ও কলকাতা থেকে আসবে বলে আশা করা যাচ্ছে' অদূর ভবিষ্যতে এই দুটি জায়গায় আমাকে যেতে হবে। তারপর মাদ্রাজ যাব বলে আশা করি। বোম্বাই ও কলকাতার মধ্যে যে-কোনও জায়গা থেকেই সহজে সেখানে যাওয়া যাবে।

অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় পাঞ্জাব ও বাংলায় অধিকতর চেষ্টার প্রয়োজন হবে; তার কারণ এই দুটি প্রদেশেই হিন্দু-মুসলিম সমস্যার তীব্রতা সব চাইতে বেশী। মাদ্রাজের আদর্শে পাঞ্জাবে যে প্রাদেশিক কমিটি গঠন করা হয়েছে, সানন্দে জানাই যে সেই কমিটি অতিশয় দক্ষতার সঙ্গে পাঞ্জাবকে পরিচালনা করছে। শফি-দলভুক্ত জনকয়েক গোঁড়া ব্যক্তি ছাড়া পাঞ্জাবে অধিকাংশ মুসলমানই ইতিমধ্যে ঘোষণা করেছেন যে তাঁরা লখনউ-প্রস্তাবের সপক্ষে। মওলানা আবুল কালাম আজাদ সিমলার সভায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি আমাদের আশ্বাস দিয়েছেন যে বাংলায় আরও বেশী সুফল পাওয়া যাবে। পর্যাপ্ত অর্থ পাওয়া গেলে তিনি যে সাফল্যমণ্ডিত হবেন, এ-বিষয়ে আমার কোনও সন্দেহ নেই।

অন্যান্য প্রদেশে মুসলমানরা নিতান্তই সংখ্যালঘু। তারা যে এতদিন ধরে সংগ্রাম করে আসছে, সে হল পাঞ্জাব আর বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান সম্প্রদায়ের তথাকথিত অধিকার নিয়ে। তারা যদি দেখে যে পাঞ্জাব আর বাংলার মুসলমানরা লখনউ-প্রস্তাব মেনে নিয়েছে এবং অন্যান্য প্রদেশের সমর্থন লাভের প্রয়োজন তাদের নেই, অন্যান্য প্রদেশের মুসলমানরা তাহলে উপযুক্ত জবাব পেয়ে যাবে। আগামী পক্ষকালের মধ্যেই এ-উত্তর তাদের দেওয়া হবে বলে আমি আশা করছি। ভারতবর্ষের অবশিষ্টাঞ্চলে হিন্দু-মুসলিম সমস্যার যেটুকু তখনও বাকী থাকবে, এখানে-ওখানে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সামনে সামান্য-কিছু সুযোগ-সুবিধে ছুঁড়ে দিয়েই সেটুকুর সমাধান করা যাবে বলে আমার মনে হয়। মাদ্রাজের মুসলমানরা খুবই ভাল প্রস্তাব করেছেন, এবং পাঞ্জাব ও বাংলা ছাড়া অন্যান্য সমস্ত প্রদেশের ক্ষেত্রে এই প্রস্তাব অনুযায়ী কাজ করলে আমাদের কমিটি সুবিবেচনার পরিচয় দেবে। প্রস্তাবে বলা হয়েছে, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব সম্পর্কে আমাদের রিপোর্টে যে অবশ্য পালনীয় কতকগুলি নিয়ম বেঁধে দেওয়া হয়েছে, তা না করে সংখ্যাগুরু ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্যে অনুরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হবার দায়িত্ব প্রদেশগুলির হাতে অর্পণ করতে হবে, প্রতিটি প্রদেশ যাতে তার আপন অবস্থানুযায়ী সিদ্ধান্ত করতে পারে। মাদ্রাজের মুসলমানরা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু সম্প্রদায়ের হাত থেকে যা তাঁরা পান, তা-ই তাঁরা গ্রহণ করবেন। স্বীকার করছি যে অন্যান্য প্রদেশে হিন্দু-মুসলিম সমস্যার সমাধান এত সহজে হবে না, কিন্তু আমার মনে হয়, সমস্ত

প্রদেশের উপর একই নিয়ম চাপিয়ে দেবার চেষ্টা না করে যদি মাদ্রাজ-প্রস্তাব অনুযায়ী কাজ করা হয়, তাহলে আপস-মীমাংসায় উপনীত হওয়া হয়ত আরও সহজসাধ্য হবে।

আমাদের কাজের যে-অংশ হিন্দু-মুসলমান সমস্যাসংক্রান্ত, তা নিয়ে আমার আর-কিছু বলবার নেই। এ-ব্যাপারে আমার বন্ধু সার তেজবাহাদুর সপ্রু আমার কাছে তাঁর গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।

এর পর যাদের সঙ্গে আমাদের বোঝাপড়া করতে হবে, তারা হল "পূর্ণ স্বাধীনতা"কামী দল। জওহরের চেষ্টায় এদের সংখ্যা ক্রমশই বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই দলের সম্পর্কে আমার আশঙ্কার কিছু নেই। খাঁটি একজন দেশপ্রেমিককে এরা নেতা হিসেবে পেয়েছে। জওহর একদেশদর্শী মানুষ নয়। পূর্ণ স্বাধীনতার সপক্ষে উদগ্র ক্ষমাহীন প্রচারকার্য চালিয়ে যাবার পরেও সে যে-রকম অক্লান্তভাবে সর্বদলীয় সম্মেলনের সিদ্ধান্তগুলিকে সাফল্যমণ্ডিত করবার চেষ্টা করছে, তাতেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়। আর, আপনাদের শহরের শ্রীশ্রীনিবাস আয়েঙ্গার মহোদয়ের নেতৃত্বে যে ঝুটা স্বাধীনতা-ওয়ালারা রয়েছেন, তাঁদের সম্পর্কে আশঙ্কার কারণ ত আরও কম। সত্যিই যাঁরা স্বাধীনতা চান, তাঁদের সঙ্গে একবার যদি আমরা একটা সমঝোতা করে নিতে পারি, ঝুটা স্বাধীনতা-ওয়ালাদের সম্পর্কে ব্যবস্থাবলম্বন তাহলে খুবই সহজ হবে। আপন পাপের ভারেই তাঁদের ভরাডুবি হবে। খাঁটি স্বাধীনতা-কামীদের সঙ্গে শিগগিরই একটা সন্তোষজনক মীমাংসায় উপনীত হতে পারব বলে আশা করছি। মনে হয়, দু-একদিনের মধ্যেই আপনাকে সুখবর দিতে পারব।

বাকী রইল প্রতিক্রিয়াশীল দল। এদের আমরা আমল দেব না। সরকারের পক্ষে এদের সঙ্গে বোঝাপড়া করা অতি কঠিন হবে। সাইমন-কমিশনও বুঝতে পারবে যে এদের অবাস্তব দাবিগুলিকে মেনে নিয়ে তাদের কার্যে পরিণত করা সম্ভব নয়। বিপদ এই যে আমাদের দাবি যে গ্রহণযোগ্য নয় এ-কথা প্রতিপন্ন করবার জন্য আমলাতন্ত্র এই প্রতিক্রিয়াশীল দলকে কাজে লাগাবে। তার কারণ এই নয় যে এই প্রতিক্রিয়াশীল দল অভ্রান্ত আর আমরা ভ্রান্ত। কারণটা এই যে এদের অস্তিত্বকে কাজে লাগিয়ে দেখাবার চেষ্টা করা হবে, আমাদের পিছনে দেশের যথেষ্ট সমর্থন নেই। প্রতিটি জেলায় অসংখ্য সভার অনুষ্ঠানই এর একমাত্র উত্তর। এইভাবে দেখিয়ে দিতে হবে যে দেশে এই প্রতিক্রিয়াশীলদের সংখ্যা নিতান্তই মুষ্টিমেয়; দেশবাসীর কোনও উল্লেখযোগ্য অংশের প্রতিনিধিত্ব করবার অধিকার এদের নেই। তার জন্য লোকজন, অর্থবল ও রসদ দরকার। আপনার প্রদেশের বিভিন্ন ভাষায় ইস্তাহার ও প্রচারপত্র ছাপাবার ব্যবস্থা করে আপনি ত ইতিমধ্যেই রসদ জোগাবার কারখানা খুলে দিয়েছেন। দ্বিতীয় কারখানা খুলছেন লালা লাজপত রায়, পাঞ্জাবে। তৃতীয়টি বাংলাদেশে মওলানা আবুল কালাম আজাদ খুলছেন। টাকা যখন আসতে শুরু করেছে, তখন এ-রকম আরও কিছু কারখানা নিশ্চয় প্রতিষ্ঠিত হবে।

আমার বিবেচনায় সাধারণ অবস্থা এখন কী রকম, এবং কী ভাবে এ সম্পর্কে আমি ব্যবস্থা অবলম্বন করতে ইচ্ছুক, তার একটা মোটামুটি ধারণা আপনাকে দিলাম। মাদ্রাজ সম্পর্কে আমার কয়েকটি প্রস্তাব আছে। আমার মনে হয়, মাদ্রাজ-প্রেসিডেন্সিতে যাদের সম্পর্কে ব্যবস্থা করা দরকার, এমন পাঁচ শ্রেণীর লোক আছে। জনসাধারণের বড় একটা অংশ আদিয়ারের প্রভাব সম্পর্কে অনুকূল মনোভাবসম্পন্ন। ঠিক এই রকমেরই বড় আর-একটা অংশ কংগ্রেসের প্রভাবাধীন। তৃতীয় শ্রেণীটি হল অব্রাহ্মণ সম্প্রদায়। সম্প্রদায়টি অত্যন্তই বিরাট। চতুর্থ শ্রেণীতে রয়েছে অনুন্নত

সম্প্রদায়ের মানুষরা', আর পঞ্চম শ্রেণীতে আছে মুসলমান সম্প্রদায়। প্রতিটি শ্রেণীর সঙ্গে যাতে যোগ স্থাপিত হতে পারে তার জন্য প্রতিটি শ্রেণী থেকে প্রতিনিধি-স্থানীয় দু-একজন ব্যক্তিকে সদস্য হিসেবে গ্রহণ করবার, এবং নিজ নিজ শ্রেণীর মানুষদের যে-কাজ করতে হবে তার দায়িত্বভার তাঁদের হাতে ছেড়ে দেবার প্রয়োজন হবে। অব্রাহ্মণ ও অনুন্নত শ্রেণীর ব্যক্তিরা আপনার অনুবর্তীদের সঙ্গে অথবা কংগ্রেস-কর্মীদের সঙ্গে একযোগে কাজ করতে অসম্মত হবে না বলেই আমার মনে হয়, তবে মুসলমানদের মধ্যে কাজ চালিয়ে যাবার ভার কিছু প্রভাবশালী মুসলমানের হাতে ছেড়ে দেওয়াই বিবেচনার কাজ হবে। কংগ্রেস ও মুসলমান-কর্মীদের জন্য পৃথক সংস্থার প্রয়োজন হবে। সিমলায় শ্রী এ. রঙ্গস্বামী আয়েঙ্গার ও সৈয়দ মর্তুজা সাহেব বাহাদুরের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনার পর আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে তাঁরা আপনার সাধারণ কমিটিতে থাকলেও কংগ্রেস ও মুসলমান-কর্মীদের বাবদে ব্যয় করবার জন্য তাঁদের পৃথক তহবিল বরাদ্দ করা উচিত। আপাতত শ্রীরঙ্গস্বামী আয়েঙ্গারকে ১,০০০ টাকা ও সৈয়দ মর্তুজা সাহেবকে ৫০০ টাকা দিলেই যথেষ্ট হবে। এঁরা দুজনেই অতি সম্মানার্হ ব্যক্তি, এবং বিশ্বাস করা যেতে পারে যে টাকাটা এঁরা যথাযথভাবেই ব্যয় করবেন। এ-ব্যাপারে মিঃ ইয়াকুব হাসানের কথাও আমার মনে হয়েছিল, কিন্তু শুনেছি তিনি নাকি অতি অলস ব্যক্তি। তবে মুসলিম সাব-কমিটির সভাপতি অথবা সদস্য হিসেবে তাঁর নাম ব্যবহার করতে দিতে তিনি যাতে সম্মত হন, সৈয়দ মর্তুজা-সাহেব তার জন্য তাঁকে অনুরোধ জানাতে রাজী হয়েছেন। আশা করি এতেই যথেষ্ট হবে।

এ-প্রস্তাব আপনি অনুমোদন করলেন কিনা, এবং যদি করেন, তাহলে যে-অঙ্কের টাকার আমি উল্লেখ করেছি তা দেওয়া আপনার পক্ষে সুবিধাজনক হবে কিনা, দয়া করে আমাকে জানাবেন। লখনউতে আপনি কথা দিয়েছিলেন যে দু কিস্তিতে আপনি ৫,০০০ টাকা দেবেন; কিন্তু যে-কাজ আপনি হাতে নিয়েছেন, ও-টাকা তার করেন, চাইবেন। মাদ্রাজের পক্ষে ত তার আপন ব্যয়ভার বহন করতে পারা উচিত। জনসাধারণ অথবা নির্বাচিত বিশেষ কয়েকজন ব্যক্তি, যার কাছেই চাওয়া উচিত মনে করেন, চাইবেন। মাদ্রাজের পক্ষে ত তার আপন ব্যয়ভার বহন করতে পারা উচিত। অবশ্য আপনি যদি মনে করেন যে বাইরে থেকে কিছু টাকা পাবার দরকার হবে, ত সে-টাকা আমি বোম্বাইয়ের কাছ থেকে সংগ্রহ করে দেবার চেষ্টা করব। ইতিমধ্যে দয়া করে শ্রীরঙ্গস্বামী আয়েঙ্গারকে ১,০০০ টাকা ও সৈয়দ মর্তুজা সাহেবকে ৫০০ টাকা দিয়ে দেবেন। প্রথমে স্থির করা হয়েছিল যে সমস্ত টাকা কেন্দ্রীয় তহবিলে জমা দিতে হবে। অতঃপর বিভিন্ন প্রদেশকে তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী সেখান থেকে টাকা পাঠান হবে। আমি এই সাধারণ নিয়মই পালন করে আসছি। তবে মাদ্রাজের ক্ষেত্রে এই অকারণ আনুষ্ঠানিকতার আশ্রয় নিতে গেলে প্রভূত বিলম্ব ঘটবে। জওহরলাল যাতে গোটা হিসাবটা প্রস্তুত করে দিতে পারে, তার জন্য আপনার কার্যালয় থেকে যদি মাঝে-মাঝে তাকে মোট আয়-ব্যয়ের হিসাবটা জানিয়ে দেওয়া হয়, তাহলেই যথেষ্ট।

আপনার মনে থাকতে পারে, লখনউ সম্মেলন থেকে আমাদের কমিটিকে কয়েকটি প্রশ্ন করে পাঠান হয়েছে। এ-ছাড়া, সর্বদলীয় সম্মেলনে পেশ করবার উদ্দেশ্যে আমাদের সুপারিশগুলি নিয়ে একটি আনুষ্ঠানিক বিল রচনা করবার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করতেও আমাদের বলা হয়েছে। লখনউ সম্মেলন থেকে যে-সব প্রশ্ন করা হয়েছে, সে-বিষয়ে কমিটির রিপোর্টের একটি খসড়া রচনা, এবং মূল রিপোর্টের সুপারিশ, লখনউতে গৃহীত প্রস্তাবাবলী ও সম্মেলনের জন্য আরও যে-

একটি রিপোর্টের খসড়া আমাদের তৈরি করতে বলা হয়েছে, তা নিয়ে একটি বিলের খসড়া রচনার জন্য সার তেজবাহাদুর সপ্রু, পণ্ডিত হৃদয়নাথ কুঞ্জরু, শ্রী সি. রাঘবাচারিয়ার (এ-নামের উল্লেখমাত্র যে সপ্রুর চোখে নৈরাশ্য ফুটে উঠবে, তা আমি জানি, কিন্তু এ ছাড়া উপায়ান্তর ছিল না), সার আলী ইমাম ও আমাকে নিয়ে সিমলায় কমিটির গত বৈঠকে একটি সাব-কমিটি গঠন করা হয়। নভেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে দিল্লি অথবা এলাহাবাদে কমিটির যে পরবর্তী বৈঠক হচ্ছে, এর ফলে তার কাজের সুবিধে হবে। পার্লামেণ্টারী ড্রাফ্‌ট্‌সম্যানের যাতে ন্যূনতম পরিশ্রম হয়, এবং আমাদের যাতে ন্যূনতম ফী দিতে হয়, তারই জন্য এই সব প্রাথমিক কাজ চুকিয়ে রাখা হচ্ছে। আপনাদের কমনওয়েল্‌থ অব ইণ্ডিয়া বিলটির খসড়া কে করে দিয়েছিলেন, এবং তার জন্য কত টাকা তিনি ফী নিয়েছিলেন, দয়া করে আমাকে জানাবেন কি?

আপাতত স্থির হয়েছে, ১৭ ডিসেম্বর এবং পরবর্তী কয়েকটি দিনে কলকাতায় সর্বভারতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। এ-সভা অত্যন্তই গুরুত্বপূর্ণ; আশা করি আপনি এতে উপস্থিত থাকবেন।

সিমলায় যে সভা হয়েছিল, দু-এক দিনের মধ্যেই তার কার্যবিবরণীর একটি অনুলিপি আপনাকে পাঠিয়ে দেওয়া হবে।

আমাদের হাতে এখন যে কাজ রয়েছে, সে সম্পর্কে আপনি যদি কোনও পরামর্শ দেন, কৃতজ্ঞ থাকব।

আপনি যখন এই চিঠি পাবেন, সার তেজবাহাদুর সপ্রু তখন মাদ্রাজে থাকবেন বলে আশা করছি। দয়া করে এই চিঠিখানি তাঁকে দেখাবেন। পৃথকভাবে তাঁকে আমি ছোট একটি চিঠি লিখছি, এবং জানিয়ে দিচ্ছি যে বিস্তারিত বিবরণ এই চিঠিতে পাওয়া যাবে।

ভবদীয়

মোতিলাল নেহরু

ডাঃ অ্যানি বেসাণ্ট,
আদিয়ার, মাদ্রাজ

৫৮ মোতিলাল নেহরু কর্তৃক এম. এ. জিন্নাকে লিখিত

২২ নভেম্বর, ১৯২৮

প্রিয় জিন্না,

আগামী সম্মেলন কোন তারিখে অনুষ্ঠিত হবে, এত দিন ধরে প্রশ্নটি বিবেচনা করে দেখলাম। এ-বিষয়ে আমার কমিটির অন্যান্য সদস্য, এবং কংগ্রেসের অভ্যর্থনা-সমিতির সদস্যদের সঙ্গেও আলোচনা করেছি। এঁরা দু পক্ষই কংগ্রেস-অধিবেশন শেষ হয়ে যাবার পর সম্মেলন আহ্বানের বিরোধী। যে-সব গুরুতর কারণ তাঁরা দেখিয়েছেন, তাতে আমিও তাঁদের সঙ্গে একমত। এ-কারণে আমি এমন একটি পরিকল্পনা করেছি, কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ উভয় পক্ষেরই আপত্তির কারণ যাতে দূরীভূত হবে। লীগের অধিবেশনের চার দিন আগে সম্মেলনের অধিবেশন শুরু হবে, এবং লীগের অধিবেশনের সঙ্গে সঙ্গে সম্মেলনের অধিবেশনও ২৭ ও ২৮ তারিখ পর্যন্ত চলবে। প্রয়োজন হলে ২৯ তারিখ সকালেও সম্মেলনের অধিবেশন হতে পারে। লীগ এর ফলে আপন প্রতিনিধিদলকে সম্পূর্ণ ক্ষমতা দিয়ে সম্মেলনের চূড়ান্ত অধিবেশনে পাঠাতে পারবে; এবং ২৯, ৩০ ও ৩১ তারিখে কংগ্রেসের যে অধিবেশন হবে, তার আগেই সম্মেলনের অধিবেশন আহ্বান করতে হবে বলে অভ্যর্থনা সমিতি যে দাবি জানিয়েছেন, লীগ এতে করে সে-দাবিও মেটাতে পারবে।

যা নিয়ে বিরোধের কোন সম্ভাবনা নেই, সম্মেলনের ২২, ২৩ ও ২৪ তারিখের অধিবেশনে এমন অনেক বিষয়ের নিষ্পত্তি হয়ে যেতে পারে, কিন্তু চূড়ান্ত অধিবেশনে যে-কোনও প্রশ্ন আবার নতুন করে উত্থাপন করবার অধিকার মুসলিম লীগের থাকবে। ইতিমধ্যে আমি আশা করছি, সম্মেলনে প্রতিনিধি প্রেরণের জন্য লীগ-পরিষদের হাতে ক্ষমতা দিয়ে লীগের গত বার্ষিক অধিবেশনে যে প্রস্তাব গ্রহণ হয়েছিল, তদনুযায়ী কাজ করা হবে, এবং প্রথম থেকেই লীগের প্রতিনিধিরা উপস্থিত থাকবেন। অবশ্য তাঁরা যদি না চান তাহলে সম্মেলনের প্রথম অধিবেশনের (২২ তারিখ থেকে ২৪ তারিখ) কোনও কিছু সম্পর্কে প্রতিশ্রুতি দেবার দরকার তাঁদের নেই। আশা করি এ-ব্যবস্থা আপনার এবং সংশ্লিষ্ট অন্য সকলের সন্তুষ্টি বিধানে সমর্থ হবে।

সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য এই অনুযায়ী আমি প্রয়োজনীয় বিজ্ঞপ্তি প্রচার করছি।

ভবদীয়
মোতিলাল নেহরু

৫৯ মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক লিখিত

[সাইমন-কমিশন যখন লখনউতে আসে, আমরা অনেকেই তখন তার বিরুদ্ধে সেখানে শান্তিপূর্ণভাবে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছিলাম। সেই ঘটনার ঠিক পরেই এই চিঠিখানি লেখা হয়েছিল বলে আমার মনে হয়। লখনউতে ব্যাটন ও লাঠি দিয়ে পুলিশ আমাদের প্রচণ্ডভাবে প্রহার করেছিল।]

ওয়ার্ধা,
৩ ডিসেম্বর, ১৯২৮

প্রিয় জওহর,

আমার ভালবাসা জানাই। এ তুমি বীরোচিত কাজ করেছ। আরও বীরত্বপূর্ণ কাজ তোমাকে করতে হবে। ঈশ্বর তোমাকে আরও অনেক বছর বাঁচিয়ে রাখুন, এবং ভারতবর্ষের দাসত্বমোচনে তোমাকেই তাঁর প্রতিনিধি করুন।

তোমাদের
বাপু

৬০ নরেন্দ্র দেব কর্তৃক লিখিত

[এ-চিঠিতে 'লীগ' বলে যে-প্রতিষ্ঠানের উল্লেখ করা হয়েছে, তার পুরো নাম ইণ্ডিপেণ্ডেন্স অব ইণ্ডিয়া লীগ। জাতীয় কংগ্রেস যাতে স্বাধীনতাকে তার লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করে, তার জন্য কংগ্রেসকে চাপ দেবার উদ্দেশ্যে এই প্রতিষ্ঠানটি গঠিত হয়েছিল। নরেন্দ্র দেব ছিলেন কংগ্রেসের একজন নেতৃস্থানীয় সদস্য। পরে যাঁরা ভারতে সোস্যালিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠা করেন, তিনি তাঁদের অন্যতম।]

বারানসী,
৯ ফেব্রুয়ারি, ১৯২৯

প্রিয় জওহরলালজী,

পাণ্ডুলিপিটি আমি পেয়েছি। আমি এখন এটি পড়ে দেখছি, এবং শিগগিরই এ-বিষয়ে আমার মতামত আপনাকে জানাব। আপনার প্রশ্নগুলির উত্তর দেবারও চেষ্টা করব।

লীগ সম্পর্কে দ্বিধাহীনভাবে আপনার কাছে স্বীকার করতে পারি, আমার এখন মনে হচ্ছে যে এর ভবিষ্যৎ বোধ হয় উজ্জ্বল নয়। আমাদের মধ্যে দৃঢ় বিশ্বাসসম্পন্ন এবং উদ্যোগী এমন একদল লোক নেই, কোনও অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় যাঁরা

सत्याग्रहाश्रम

साबरमती

मिति ______ १९२ .

Satyagrahashram,

Sabarmati

B. B. C. I. Ry.

Date ______ 192

My dear Jawahar,

My love to you. It was all done bravely. You have braver things to do. May God spare you for many a long year to come and make you His chosen instrument for freeing India from the yoke.

Wardha
3.12.28

Yours,
Bapu

জ্বলন্ত বিশ্বাস রাখেন। মোটামুটিভাবে আমরা বিশ্বাস করতে পারি যে নতুন ভিত্তিতে আমাদের সমাজকে আবার গড়ে তোলা প্রয়োজন, কিন্তু যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক মতবাদের ভিত্তিতে এই সমাজকে আবার নতুন করে গড়ে তুলতে হবে, সে সম্পর্কে আমাদের মনে যতক্ষণ পর্যন্ত না একটা স্পষ্ট ধারণা জন্মাচ্ছে, এবং দেশের বর্তমান অবস্থায় ঠিক কতখানি সাফল্য লাভ করা যেতে পারে, যতক্ষণ পর্যন্ত না তা আমরা স্পষ্ট বুঝতে পারছি, ততক্ষণ পর্যন্ত কোনও ফল লাভের আশা আমরা করতে পারি না। আমাদের মধ্যে বেশির ভাগ লোকেরই ধারণা এ-ব্যাপারে অস্পষ্ট ও ধোঁয়াটে, এবং কীভাবে যে কাজ করতে হবে, বেশির ভাগ লোকই তা জানে না। তার ফল হয়েছে এই যে আমাদের বিশ্বাস কখনও গভীর হবার সুযোগ পায় না; ফলত আমাদের কাজেও উদ্যমের অভাব ঘটে। চারদিকে তাকিয়ে যে উদ্যমহীনতা আমরা দেখতে পাই, আমার মনে হয়, মননের ক্ষেত্রে প্রত্যয়ের অভাবই তার জন্য দায়ী। এ-কারণে আমি মনে করি যে দেশবাসীকে বুদ্ধির খোরাক যুগিয়ে তাদের চিন্তাকে উদ্দীপিত করে তোলাই এখন আমাদের প্রধান কর্তব্য। তার জন্য, প্রয়োজনীয় অর্থ যদি পাওয়া যায় তাহলে লীগের উচিত হবে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করা, এবং এমন একটি বইয়ের দোকান খোলা, যেখানে এই ধরনের বইপত্র পাওয়া যাবে। পাঠচক্রের প্রতিষ্ঠা করা এবং বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় সস্তা কিছু বইপত্র প্রকাশ করাও লীগের কর্তব্য। আমার বিবেচনায় এইটিই এখন সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ কাজ, এ-বছরে এই কাজেই আমাদের মনঃসংযোগ করা উচিত। এ ছাড়া আমাদের বনিয়াদকে পাকা করে তোলা যাবে না। লীগের মধ্যে এখন এমন লোকের সংখ্যা অতি সামান্য, এ-বিষয়ে যাঁদের কোনও সুনির্দিষ্ট ও স্পষ্ট ধারণা আছে, এবং সন্তোষজনক একটি অর্থনৈতিক পরিকল্পনা রচনা করবার যোগ্যতা আছে বলে যাঁদের উপর আস্থা রাখা যেতে পারে। লীগ এখন যাতে এই ব্যাপারে মনঃসংযোগ করে, তার জন্যই আমি আপনাকে অনুরোধ জানাব।

এ-যাবৎ এমন কিছুই আমরা করিনি, আমাদের অস্তিত্ব যাতে অর্থবহ হয়ে উঠতে পারে। লীগের প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে নূতন ভিত্তিতে সমাজের পুনর্গঠনকে সে তার অন্যতম লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করেছে। নিছক রাজনৈতিক স্বাধীনতায় লীগ তুষ্ট নয়। কোন্ নূতন ভিত্তিতে সমাজকে পুনর্গঠিত করা হবে, এবং লক্ষ্য অর্জনের জন্য কী উপায় আমরা অবলম্বন করব, জনসাধারণ স্বভাবতই তা জানতে চায়। কলকাতায় চতুর্দিক থেকে আমার উপরে প্রশ্নবাণ নিক্ষেপ করা হয়েছিল। মোটামুটিভাবে এই রকমের একটা ধারণার বোধ হয় সৃষ্টি হয়েছে যে লীগ প্রথমটায় যে-সব আশা জাগিয়েছিল, তা এখন পূরণ করছে না। কেউ কেউ মনে করেন, কংগ্রেসের মধ্যে স্বাধীনতার প্রশ্ন নিয়ে লড়াই করাই ছিল লীগ প্রতিষ্ঠার একমাত্র উদ্দেশ্য; সে লড়াই শেষ হয়েছে, সুতরাং আর একটা দিনের জন্যও আমাদের অস্তিত্বকে টিঁকিয়ে রাখার কোনও অর্থ হয় না। লোকে এখন এই ধরনের কথা বলছে। আবার এমন কিছু লোকও আছেন, যাঁরা স্বাধীনতার সংকল্পে বিশ্বাসী বটে, কিন্তু আদর্শ-উদ্দেশ্যের ধার ধারেন না। তাঁরা চান আশু কাজের একটা জীবন্ত কর্মসূচী। কংগ্রেসের গঠনাত্মক কর্মসূচীকে তাঁরা নেহাতই ভোঁতা ও নিরীহ বলে মনে করেন। এদিকে দেশের সামনে তার চাইতে ভাল কোনও কর্মসূচীও আমরা তুলে ধরতে পারিনি; তাই স্বভাবতই লীগে যোগদান করতেও তাঁরা উৎসাহ পান না। আমাদের প্রতিনিধিরাও উদ্যমহীন। বার বার মনে করিয়ে দেওয়া সত্ত্বেও তাঁদের কাছ থেকে সাড়া পাওয়া যায় না। কোন কোন বন্ধু ত চিঠির একটি প্রাপ্তিস্বীকার পর্যন্ত করেন না।

আপনি জানেন, আমি যখন সেক্রেটারির পদ গ্রহণ করি, তখন স্পষ্ট জানিয়েছিলাম যে বিদ্যাপীঠে আমার যে-সব কাজকর্ম রয়েছে, তাতে দেশের বিভিন্ন স্থানে যাবার মত সময় আমার হবে না। আমি শুধু এখান থেকে চিঠিপত্র লিখতে পারি। কিন্তু সাড়াই যদি না পাওয়া যায় ত এর চাইতে বেশী কিছু করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

এমতাবস্থায় ত্রুটিগুলি সংশোধন না করলে সমৃদ্ধিলাভের আশা আমরা করতে পারি না।

সম্ভব হলে লীগের একটা অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা উচিত। পৃথক পৃথকভাবে আপনাপন পরিকল্পনা প্রণয়নের স্বাধীনতা প্রাদেশিক লীগগুলির থাকা উচিত বলে আমার মনে হয় না। সে-স্বাধীনতার পরিণাম মারাত্মক হয়ে দাঁড়াবে। সে-রকমের স্বাধীনতা দেওয়া হলে পরিকল্পনাগুলি হয়ত পরস্পরবিরোধী হয়ে দাঁড়াবে। বিশৃঙ্খলার মাত্রা তাতে বেড়ে যাবে মাত্র। একটিই মাত্র পরিকল্পনা লীগের থাকা উচিত, মাত্র একটিই কণ্ঠে তার কথা বলা উচিত।

তবে প্রতিটি প্রদেশ থেকে তার আপন সুপারিশগুলি কেন্দ্রীয় পরিষদের কাছে পেশ করবার যে প্রস্তাব আপনি করেছেন, তা গ্রহণ করা উচিত বলে আমার মনে হয়। সেক্ষেত্রে আমাদের কমিটি আপনার খসড়া-কর্মসূচীটিকে আলোচনার ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করতে পারেন।

কেন্দ্রীয় পরিষদকে বুঝিয়ে যদি একটি অর্থনৈতিক কর্মসূচী প্রণয়ন ও দেশের সামনে একটি পরিকল্পনা পেশ করান যায় ত খুবই ভাল। তবে, সে যা-ই হক, উপরে আমি যে কাজের কথা বলেছি, প্রাদেশিক লীগগুলি কেন্দ্রীয় পরিষদের অনুমতি ব্যতিরেকেই তার ভার নিতে পারে।

প্রাদেশিক কমিটির পরবর্তী সভা আগামী ২৪ তারিখে লখনউতে অনুষ্ঠিত হবে। শিগগিরই আপনার কাছে আনুষ্ঠানিক বিজ্ঞপ্তি পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

ভবদীয়
নরেন্দ্র দেব

৬১ মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক লিখিত

ট্রেনে, ২৯ জুলাই, ১৯২৯

প্রিয় জওহরলাল,

ইন্দুকে তুমি যে চিঠিগুলি লিখেছ, তা খুবই সুন্দর। এগুলিকে প্রকাশ করা উচিত। তোমার পক্ষে হিন্দীতে এই চিঠি লেখা সম্ভব হলে বড়ই সুখী হতাম। তবে একযোগে হিন্দীতে এগুলিকে প্রকাশ করা উচিত।

তোমার আলোচনা-পদ্ধতি বেশ নৈষ্ঠিক। মানুষের উৎপত্তি কীভাবে হল, তা এখন বিতর্কমূলক বিষয়। ধর্মের উৎপত্তি কী ভাবে হল, সে-বিষয়টি আরও বিতর্কমূলক। কিন্তু এইসব মতানৈক্য তোমার পত্রগুচ্ছের মূল্য হ্রাস করেনি। সে-মূল্য তোমার সিদ্ধান্তের সত্যতার উপরে নির্ভরশীল নয়; চিঠিগুলি মূল্যবান হয়েছে তোমার আলোচনা-ভঙ্গির কারণে। তা ছাড়া এইজন্যও যে তোমার কথা-গুলিকে তুমি ইন্দুর হৃদয়ে পৌঁছে দিতে চেয়েছ, এবং বহির্জীবনের কাজকর্মের মধ্যেও তার জ্ঞানের নেত্রকে তুমি উন্মীলিত করবার প্রয়াস পেয়েছ।

যে-ঘড়িটি আমি নিয়ে এসেছি, তা নিয়ে কমলার সঙ্গে আমি মতবিরোধ ঘটাতে চাইনি। এই উপহারের পিছনে যে ভালবাসা রয়েছে, তাকে অগ্রাহ্য করবার সাধ্য আমার ছিল না। তবে ঘড়িটি আমি ইন্দুর জন্য রেখে দেব। যে-সব খুদে গুণ্ডা আমাকে ঘিরে থাকে, তাতে এ-রকম একটি জিনিস ব্যবহার করা আমার পক্ষে সম্ভব

নয়। ইন্দুকে তার প্রিয় ঘড়িটি আমি ফিরিয়ে দেব। কমলা তাতে কিছু মনে করবে না, এইটুকু জানলে আমি সুখী হই।

কংগ্রেসের মুকুট সম্পর্কে ইতিমধ্যেই আমার নিবন্ধ রচনা শেষ হয়েছে। ওয়াই. আই.য়ের আগামী সংখ্যায় এটি প্রকাশিত হবে।

তোমাদের
বাপু

৬২ সরোজিনী নাইডু কর্তৃক লিখিত

[ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি পদে আমার নির্বাচন উপলক্ষে এই চিঠিটি লিখিত হয়।]

লখনউ, ২৯ সেপ্টেম্বর, ১৯২৯

প্রিয় জওহরলাল,

সারা ভারতবর্ষে গতকাল বোধ হয় কেউ তোমার বাবার চাইতে বেশী গর্বিত অথবা তোমার চাইতে বেশী ভারাক্রান্ত বোধ করেনি। আমার অবস্থা বড় বিচিত্র। প্রায় সমপরিমাণেই তাঁর গর্ব এবং তোমার যন্ত্রণার অংশ আমি নিয়েছি। তোমার সম্পর্কে অনেক সময় আমি বলেছি যে বড় চমৎকার এক শহীদত্ব তোমাকে বরণ করতে হবে, এ তোমার ভাগ্যলিপি। কাল অনেক রাত জেগে এই কথাটারই তাৎপর্য আমি চিন্তা করেছি। নির্বাচনের পর তোমাকে যখন বিপুলভাবে সংবর্ধনা করা হচ্ছিল, তখন তোমার মুখের ভাব আমি দেখেছি। মনে হচ্ছিল একই সঙ্গে যেন তোমাকে সিংহাসনে অভিষেক ও ক্রুশে বিদ্ধ করা হচ্ছে। বস্তুত এ-দুটি অবিচ্ছেদ্য ব্যাপার। এমন কি কোনও কোনও অবস্থা ও পরিবেশে অভিষিক্ত হওয়া আর ক্রুশবিদ্ধ হওয়া প্রায় সমার্থবাচক শব্দ। বিশেষ করে তোমার ক্ষেত্রে ত বটেই। তার কারণ আত্মিক প্রতিক্রিয়ার ব্যাপারে তুমি অত্যন্তই স্পর্শাতুর। কোনও কাজ নিখুঁত না হওয়া পর্যন্ত তোমার শান্তি নেই। তোমার চাইতে কম সূক্ষ্ম ধাতের মানুষ, তোমার চাইতে যাদের অনুভূতির তীক্ষ্ণতা অনেক কম, দুর্বলতা, মিথ্যাচার, দুষ্কৃতি আর বিশ্বাসঘাতকতার কুশ্রী প্রকৃতির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে তারা যতখানি যন্ত্রণা পায়, তার চাইতে শতগুণ যন্ত্রণা তুমি পাবে। এই মিথ্যাচার আর দুষ্কৃতি আর বিশ্বাসঘাতকতা, এরা হল সেই দুর্বলতারই অনিবার্য পার্শ্বচর, বড় বড় বুলির আড়ালে যে তার আপন দারিদ্র্যকে গোপন করতে চায়।......সে যা-ই হক, তোমার অপরাজেয় আন্তরিকতা আর মুক্তি-কামনায় আমার গভীর বিশ্বাস বর্তমান। তুমি আমাকে বলেছিলে, যে বিপুল দায়িত্বের বোঝা তোমার উপরে চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে, তার ঝঞ্ঝাটের মধ্যে তোমার আপন চিন্তা ও আদর্শকে যে তুমি বাস্তবে রূপায়িত করতে পারবে এমন শক্তি অথবা সমর্থন তোমার নেই। কিন্তু তবুও আমার মনে হয়, এ একটা চ্যালেঞ্জ, সেই সঙ্গে একটা শ্রদ্ধার্ঘ্যও বটে। তোমার মধ্যে মহৎ যে-সমস্ত গুণ রয়েছে, এই চ্যালেঞ্জই তাদের এক প্রবল শক্তি, সাহস, দূরদৃষ্টি ও জ্ঞানে রূপায়িত করে তুলবে। আমার বিশ্বাস যে ব্যর্থ হবে, এমন আশঙ্কা আমি করি না।

যে-ভাবেই আমার পক্ষে তোমাকে সাহায্য করা অথবা তোমার এই দারুণ, প্রায় ভয়াবহ, কাজের মধ্যে যেভাবেই তোমার অধীনে কাজ করা আমার পক্ষে সম্ভব হক, বলামাত্র তা আমি করব। তা তুমি জান।......বাস্তব সাহায্য দিতে যদি না-ও পারি, অন্তত আমার সবটুকু সহানুভূতি আর স্নেহ ত দিতে পারব।...... খলিল জিব্রান অবশ্য বলেছেন, "একের চিন্তা অন্যের কাজে লাগে না।" কিন্তু তবু আমি বিশ্বাস

করি যে একের অন্তরের অমোঘ বিশ্বাস অন্যের অন্তরেও বিশ্বাসের সেই অগ্নিশিখা জ্বালিয়ে তোলে, সারা পৃথিবী যার প্রভায় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।......

তোমার স্নেহানুরক্তা বন্ধু ও ভগিনী
সরোজিনী নাইডু

৬৩ মহাত্মা গান্ধীকে লিখিত

[দিল্লিতে নেতৃ-সম্মেলন নামে এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। তার ঠিক পরেই এই চিঠিখানি লিখিত হয়। সম্মেলন থেকে একটি বিবৃতি প্রচার করে হয়, উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ তাতে স্বাক্ষর দান করেন। প্রবল অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমাকে এই বিবৃতিতে স্বাক্ষর করতে হয়েছিল। সুভাষ বসু এতে সই করেননি। যা-ই হক, সই করবার পর আমার খারাপ লাগতে থাকে, এবং এই চিঠিখানি আমি লিখি। আমি তখন কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক, এবং পরবর্তী সভাপতি হিসেবে আমাকে তখন নির্বাচিত করা হয়েছে।]

নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতি,
৫২ হিউয়েট রোড, এলাহাবাদ,
৪ নভেম্বর, ১৯২৯

প্রিয় বাপুজী,

দু দিন ধরে আমি ভালভাবে ভেবে দেখলাম। দু দিন আগে আমার পক্ষে যেভাবে দেখা সম্ভব ছিল, তার চাইতে শান্তভাবে অবস্থাটাকে আমি এখন দেখতে পারি বলে আমার মনে হয়। কিন্তু আমার অস্বস্তি তবু যায়নি।

শৃংখলার কারণে আপনি আমার কাছে যে আবেদন জানিয়েছিলেন, তা উপেক্ষা করা আমার সম্ভব ছিল না। আমি নিজে শৃংখলারক্ষায় বিশ্বাসী। কিন্তু তবু আমার মনে হয় যে শৃংখলার বাড়াবাড়ি ভাল নয়। পরশু সন্ধ্যায় আমার মধ্যে কিছু-একটার জোড় খুলে গিয়েছে, আর আমি তাকে মিলিয়ে তুলতে পারছি না। কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে এই প্রতিষ্ঠানের প্রতি আমার আনুগত্য রয়েছে, এর শৃংখলা আমাকে মেনে নিতে হবে। কিন্তু আমার অন্য-কিছু পদ এবং অন্য-কিছু আনুগত্য বর্তমান। ভারতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের আমি সভাপতি, ইন্ডিপেন্ডেন্স অব ইন্ডিয়া লীগের আমি সম্পাদক; যুব-আন্দোলনের সঙ্গেও আমি ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত। এইসব এবং অন্যান্য যে-সব আন্দোলনের সঙ্গে আমি যুক্ত, তাদের প্রতিও আমার আনুগত্য রয়েছে। সে-আনুগত্যের কী হবে? একই সঙ্গে যে একাধিক নৌকোয় পা রাখা সম্ভব নয়, সে-কথা আমি এখন যত স্পষ্ট বুঝতে পারছি, এর আগে তা বুঝিনি। বস্তুত. এক নৌকোয় পা রাখাই যথেষ্ট শক্ত ব্যাপার। দায়িত্ব আর আনুগত্যের এই সংঘর্ষে আপন বিবেক আর যুক্তিবুদ্ধির উপরে নির্ভর করা ছাড়া আর কী করা যেতে পারে?

বাইরের সমস্ত সম্পর্ক আর আনুগত্য থেকে আলাদা করে অবস্থাটা আমি ভেবে দেখেছি, এবং তাতে এই বিশ্বাসই আমার দৃঢ়তর হয়েছে যে পরশু দিন আমি অন্যায় কাজ করেছি। বিবৃতিটির গুণাগুণ অথবা তার অন্তর্নিহিত নীতি নিয়ে আমি কিছু বলতে চাইনে। আশংকা করি, এ-ব্যাপারে আমাদের মতপার্থক্য সম্পূর্ণ মৌলিক, এবং আপনাকে যে আমি স্বমতে আনতে পারব, এমন সম্ভাবনা নেই। আমি শুধু এইটুকু বলব যে শ্রমিক সরকার যে-ঘোষণা করেছেন, এই বিবৃতি তার পর্যাপ্ত উত্তর নয়, এ-বিবৃতি ক্ষতিকর হবে। আমি বিশ্বাস করি যে জনকয়েক মান্যগণ্য ভদ্রলোকের তুষ্টিসাধন করে তাঁদের ধরে রাখবার চেষ্টা করতে গিয়ে বহু

লোককে আমাদের শিবির থেকে বস্তুত আমরা বিতাড়িত করেছি। এবং এ'দেরই আসলে ধরে রাখা উচিত ছিল। আমার বিশ্বাস, বিপজ্জনক একটা ফাঁদে আমরা পা দিয়েছি, এবং এই ফাঁদের থেকে মুক্তি পাওয়া খুব সহজ হবে না। আমার আরও মনে হয়, জগতের কাছে এইটেই আমরা প্রমাণ করলাম যে মুখে আমরা বড় বড় কথা বলি বটে, কিন্তু আসলে আমরা তুচ্ছ সব ব্যাপার নিয়ে দর-কষাকষি করছি।

ব্রিটিশ সরকার যে এখন কী করবেন, তা আমি জানি না। সম্ভবত আপনার সর্তগুলিকে তাঁরা মেনে নেবেন না। মেনে না নিলেই আমি সুখী হব। কিন্তু ব্রিটিশ সরকার এই সর্তগুলির যে-পরিবর্তন ঘটাবারই প্রস্তাব করুন না কেন, আপনি ছাড়া বিবৃতিতে স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে অধিকাংশই যে তা মেনে নিতে প্রস্তুত থাকবেন, তাতে আমার সন্দেহ নেই। সে যা-ই হক, আমি স্পষ্টই বুঝতে পারছি, কংগ্রেসের মধ্যে আমার থাকাটা ক্রমেই কণ্টসাধ্য হয়ে উঠবে। আগামী বছর একটা স্পষ্ট দাবি নিয়ে আমরা সংগ্রাম করব, এই আশা ছিল বলেই অনিচ্ছাসত্ত্বেও কংগ্রেস-সভাপতির পদ আমি গ্রহণ করি। সে-দাবি ইতিমধ্যেই ধোঁয়াটে হয়ে উঠেছে, এবং যে একটিমাত্র কারণে সভাপতির পদ গ্রহণে আমি সম্মত হই, তাও আর রইল না। এইসব "নেতৃ-সম্মেলন" দিয়ে আমার কী হবে? নিজেকে এখন এক অনাহূত ব্যক্তি বলে আমার মনে হচ্ছে, এবং এ-কারণে আমি বড়ই অস্বস্তিতে আছি। সম্মেলন পণ্ড হবে, এই ভয়ে আপন বক্তব্য আমি বলতে পারি না। নিজেকে আমি দমন করে রাখি। মাঝে-মাঝে সেই আত্মনিরোধের যন্ত্রণা বড় দুঃসহ হয়ে ওঠে। তখনই আমি বিদ্রোহ করে বসি, এবং এমন সব কথা বলতে থাকি, যা আসলে সর্বাংশে আমার মনের কথা নয়।

মনে হয়, নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির সম্পাদক-পদে আমাকে ইস্তফা দিতেই হবে। বাবাকে এ-বিষয়ে আমি আনুষ্ঠানিকভাবে একখানা চিঠি লিখেছি। তার অনুলিপি এই সঙ্গে পাঠালাম।

সভাপতিত্বের প্রশ্নটি আরও অনেক বেশী জটিল। বড্ডই দেরি হয়ে গিয়েছে, এখন এ-বিষয়ে কী যে আমি করব, জানি না। তবে এ-বিষয়ে আমি দৃঢ়নিশ্চিত যে এ-কাজের উপযুক্ত লোক আমি নই। এ-অবস্থায় এবং এই বছরে একমাত্র আপনার পক্ষেই সভাপতি হওয়া সম্ভব ছিল। মালব্যজীর নীতি বলে যাকে বর্ণনা করা যেতে পারে, কংগ্রেসের নীতি যদি তা-ই হয়, তাহলে আমার পক্ষে সভাপতি হওয়া সম্ভব হবে না। যদি আপনি সম্মত হন, তাহলে এখনও এমন একটি পথ খোলা আছে, যাতে নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির সভা আহ্বানের প্রয়োজন হবে না। আপনি যে সভাপতির পদ গ্রহণে সম্মত, এ-কথা জানিয়ে নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির সদস্যদের কাছে একটি বিজ্ঞপ্তি প্রেরণ করা যেতে পারে। আমি তাঁদের কাছে প্রার্থনা জানাব, আমাকে যেন অব্যাহতি দেওয়া হয়। এটা একটা আনুষ্ঠানিক ব্যাপার মাত্র। তার কারণ সমস্ত সদস্য না হলেও প্রায় সমস্ত সদস্যই আপনার সিদ্ধান্তকে সানন্দ চিত্তে গ্রহণ করবেন।

আর-একটা বিকল্প আছে। আমি ঘোষণা করব যে বর্তমান অবস্থায়, এবং অন্য-একজন সভাপতি নির্বাচনের ব্যাপারে যে অসুবিধা রয়েছে সে-কথা বিবেচনা করে, এখন আমি পদত্যাগ করব না বটে, কিন্তু কংগ্রেসের অধিবেশন সমাপ্ত হবার পরমুহূর্তেই পদত্যাগ করব। আমি শুধু চেয়ারম্যানের কাজ করে যাব, এবং আমার মতামতের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করে কংগ্রেস তার আপন ইচ্ছানুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে।

আমার দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্য যদি আমাকে বজায় রাখতে হয়, তাহলে এই দুটি পথের একটি পথ গ্রহণ করা আমার পক্ষে প্রয়োজন বলে মনে করি।

আমি কোনও প্রকাশ্য বিবৃতি দিচ্ছি না। তা যে দেব না, দিল্লি থেকেই সে-কথা আপনাকে জানিয়েছিলাম। অন্যে কে কী বলছে না-বলছে তা নিয়ে আমার তেমন দুশ্চিন্তা নেই। কিন্তু আপন অন্তর্দ্বন্দ্বের অবসান আমাকে ঘটাতেই হবে।

স্নেহার্থী

জওহরলাল

এই চিঠির একটি অনুলিপি আমি বাবার কাছে পাঠাচ্ছি। চিঠিখানি লেখার পর এখন নিজেকে একটু হাল্কা মনে হচ্ছে। আপনাকে দুঃখ দিতে আমি চাই না। আশঙ্কা করি, এ-চিঠি পড়ে আপনি দুঃখিত হবেন। এমনও আমার মনে হচ্ছে যে আপনি এখানে না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করি, তার আগে আপনাকে এ-চিঠি পাঠাবার দরকার নেই। দশ দিনে আমার উত্তেজনা নিশ্চয়ই প্রশমিত হয়ে আসবে, এবং ব্যাপারটাকে আরও ভালভাবে তখন আমি বিবেচনা করে দেখতে পারব। কিন্তু আমার মনের অবস্থা এখন কী রকম, সেটা আপনার জন্যই বোধ হয় ভাল।

৬৪ মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক লিখিত

আলীগড়

৪ নভেম্বর, ১৯২৯

প্রিয় জওহরলাল,

এইমাত্র তোমার চিঠি পেলাম। কী ভাবে তোমাকে আমি সান্ত্বনা দেব? অন্যের কাছে তোমার অবস্থার কথা শুনে নিজেকে আমি প্রশ্ন করেছি, 'আমি কি অন্যায়ভাবে তোমার উপরে চাপ দিয়েছি?' কিন্তু বরাবরই আমার বিশ্বাস, অন্যায় চাপের সামনে তুমি নতিস্বীকার কর না। তোমার প্রতিরোধকে আমি সর্বদাই সম্মান করে এসেছি। সব সময়েই তা ছিল মর্যাদাময়। এই বিশ্বাস ছিল বলেই আমার কথার উপরে আমি জোর দিয়েছিলাম। ঘটনাটা শিক্ষাদায়ক হক। তোমার বুদ্ধি অথবা অনুভূতি যদি আমার প্রস্তাবে সায় না দেয়, আমাকে বাধা দিও। তার জন্য তোমার প্রতি আমার ভালবাসা একটুও কমে যাবে না।

কিন্তু তুমি নিরাশ হয়ে পড়লে কেন? আশা করি জনমতকে তুমি ভয় পাও না। তুমি যদি অন্যায় কিছু না করে থাক, তবে এই নৈরাশ্য কেন? স্বাধীনতার আদর্শের সঙ্গে ত মহত্তর মুক্তির আদর্শের কোনও বিরোধ নেই। বর্তমানে তোমার উপর পরিচালনাগত কর্মভার রয়েছে, তা ছাড়া আগামী বছরের জন্য তুমি সভাপতি নির্বাচিত হয়েছ; এমতাবস্থায় তোমার অধিকাংশ সহযোগীর সম্মিলিত কাজ থেকে নিজেকে বিযুক্ত রাখা তোমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। আমার মতে স্বাক্ষর করে তুমি যুক্তিসঙ্গত ও বুদ্ধির কাজই করেছ। অন্য দিক থেকেও এ-কাজ ঠিকই হয়েছে। সুতরাং আশা করি, নৈরাশ্য বিসর্জন দিয়ে আবার তুমি সদাপ্রফুল্ল হয়ে উঠবে।

বিবৃতি তুমি অবশ্যই দিতে পার। কিন্তু এ নিয়ে কিছুমাত্র তাড়াহুড়ো করবার দরকার নেই।

এইমাত্র দুটি টেলিগ্রাম পেয়েছি। তার অনুলিপি পাঠালাম। বাবাকেও এগুলি দেখিও।

তুমি যদি আমার সঙ্গে আলোচনা করে ব্যাপারটার একটা নিষ্পত্তি করতে চাও, যেখানে খুশি আমার সঙ্গে দেখা কর। এতে দ্বিধা কর না।

এলাহাবাদে পেঁছে আশা করি দেখতে পাব যে কমলা বেশ ভাল আছে। যদি সম্ভব হয়, তার কয়ে আমাকে জানিও যে তোমার নৈরাশ্য কেটে গিয়েছে।

তোমাদের
বাপু

৬৫ এম. এ. আনসারী কর্তৃক লিখিত

লখনউ
৭ নভেম্বর, ১৯২৯

প্রিয় জওহর,

দিল্লি ত্যাগের আগে তুমি যখন আমার বাড়িতে এসেছিলে, তোমার সঙ্গে তখন আমি কিছু কথা বলতে চেয়েছিলাম। তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে, সেনগুপ্তের ঘরে তোমাকে দেখতে পেয়ে আমি জানাই যে পাশের ঘরে একটা বিবৃতি রচনা করা হচ্ছে। কিন্তু দেখলাম তুমি আলোচনায় ব্যস্ত আছ, তাই আর তোমাকে বিরক্ত করিনি।

সুয়াইব, খালেক, মাসুদ, তাসাদ্দুক এবং অন্যান্য যে-সব বন্ধু সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন, এবং ঘটনাবলীর ক্রমোন্মোচিত চেহারা দেখে যাচ্ছিলেন, তোমার মর্যাদাময় এবং সাহসিক আচরণ দেখে তাঁরা অত্যন্তই শ্রদ্ধান্বিত হয়েছেন। তখনই অবশ্য আমরা বুঝতে পেরেছিলাম (বস্তুত জনকয়েক ব্যক্তিকে এ নিয়ে আলোচনাও করতে দেখলাম) যে ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য তোমার কাজের সুবিধে কেউ-কেউ নেবে। তবে আমি জানি, তোমার উপরে অথবা তোমার কাজের উপরে এ-সব তুচ্ছ ব্যাপারের কোনও প্রভাব পড়ে না। যা-ই হক, সুভাষ ছাড়া আরও কেউ-কেউ পদত্যাগ করবে বলে অনুমান করছি। অবশ্য, সমস্যাটার এটা নিতান্তই ব্যক্তিগত দিক।

পণ্ডিতজী ও মহাত্মাজীকে তুমি যে চিঠি লিখেছ, তা আমি দেখেছি। আমাকে বলতেই হবে যে তার বিষয়বস্তু আমাকে বড়ই বিচলিত করে তুলেছে। ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যপদ ও সম্পাদক-পদে তুমি যে ইস্তফা দিলে, এখনই এর প্রয়োজন ছিল না। কাজটা বড় তাড়াহুড়ো করে করা হল। কংগ্রেসের সভাপতি-পদ সম্পর্কে তুমি যে প্রস্তাব করেছ, তাও খুব তাড়াহুড়ো করে করেছ বলে আমার মনে হয়। কংগ্রেসে এখন যে-ধরনের মতবাদের প্রাধান্য, তোমার মতবাদ তার দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হবার সম্ভাবনায় তুমি পদত্যাগ করছ; কিন্তু কংগ্রেস শেষ পর্যন্ত তোমার মতবাদ মেনে নেবে, এই সম্ভাবনাই বেশী বলে আমি বিশ্বাস করি।

আমাদের দিল্লি-বিবৃতি এবং কমন্স-সভায় বিতর্কের পর আমরা সুনির্দিষ্টভাবে জানতে পারব, আমাদের প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে না প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। গৃহীত হবার চাইতে প্রত্যাখ্যাত হবার সম্ভাবনাই বেশী। সেক্ষেত্রে আমরা আরও শক্তিলাভ করব, এবং যে-ব্যবস্থাই লাহোরে গ্রহণ করা হক না কেন, তার পিছনে সমগ্র কংগ্রেসের পূর্ণ সমর্থন থাকবে। এই কারণে আমার মনে হয়, ধৈর্য ধরে অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে যাওয়াই এখন সর্বোত্তম নীতি। পণ্ডিতজীও তোমাকে সেই উপদেশই দিয়েছেন। ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকের আগে কোনও-কিছু সিদ্ধান্ত করে বস না।

পণ্ডিতজীর সঙ্গে এলাহাবাদে যেতে খুবই লোভ হচ্ছে। কিন্তু, আমার রোগীরা পাছে হৈ-চৈ বাধিয়ে দেয়, এই ভয়ে চোরের মত নিঃশব্দে আমি দিল্লি থেকে পালিয়ে এসেছি। এলাহাবাদে ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে যোগদানের আগে দিল্লিতে ফিরে গিয়ে অন্তত সপ্তাহখানেক আমাকে কাজ করতেই হবে।

মাজীকে আদাব, এবং কমলা, স্বরূপ, বেটী ও ইন্দুকে আমার ভালবাসা জানাই।

স্নেহানুসক্ত
এম. এ. আনসারী

৬৬ মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক লিখিত

বৃন্দাবন
৮ নভেম্বর, ১৯২৯

প্রিয় জওহর,

তোমার চিঠি পেলাম। তোমাকে যে তার করেছি,, তা নিশ্চয়ই পেয়েছ। এক্ষুণি পদত্যাগ করা তোমার চলবে না। এ নিয়ে যুক্তিতর্ক করার মত সময় এখন আমার নেই। এইটুকু শুধু জানি যে জাতীয় স্বার্থের এতে ক্ষতি হবে। তাড়াহুড়ো করবার কিছু নেই, নীতির প্রশ্নও এর সঙ্গে জড়িত নয়। মুকুট সম্পর্কে জানাই, আর কেউ এ-মুকুট পরতে পারবে না। এ-মুকুট যে ফুলের মুকুট হবে না, এ ত জানাই ছিল। এবারে তাহলে এ-মুকুট শুধু কাঁটারই মুকুট হক। এ-মুকুট আমার পরা উচিত বলে নিজেকে যদি বোঝাতে পারতাম, তহেল লখনউতেই এ-মুকুট আমি পরতাম। যে জরুরী অবস্থাকে বাধ্য হয়ে এ-মুকুট আমাকে পরতে হবে বলে ভেবে রেখেছিলাম, বর্তমান অবস্থা সে-ধরনের নয়। যে-সমস্ত কারণ ঘটলে এ-মুকুট পরব ভেবেছিলাম, তার একটি হল তোমার গ্রেফ্‌তার ও নিপীড়নের মাত্রাবৃদ্ধি। কিন্তু আপাতত এ-প্রসঙ্গ মুলতুবি থাক। পরে আমাদের যখন দেখা হবে, তখন শান্ত ও নিরাসক্ত চিত্তে এ নিয়ে আলোচনা করা যাবে।

ইতিমধ্যে ঈশ্বর তোমাকে শান্তি দিন।

বাপু

৬৭ সরোজিনী নাইডু কর্তৃক লিখিত

তাজমহল হোটেল, বোম্বাই
২০ নভেম্বর, ১৯২৯

প্রিয় জওহরলাল,

একেই বলে বিপদকালের বন্ধুত্ব। পদ্মজা আর আমার যাত্রার দিন সমাগত। দুজনেই আমরা বিশ্রীভাবে জনপ্রিয়, তাই প্রতিটি মুহূর্তেই "হরেকরকমের নরনারী" এসে আমাদের উপরে হানা দিচ্ছে। পদ্মজার এই প্রথম সমুদ্রযাত্রা, তা ছাড়া গৃহের বন্ধন থেকেও এই প্রথম ও মুক্তি পেল। তাই ওর উত্তেজনার আর সীমা নেই। আশা করি এই সফরের ফলে ওর স্বাস্থ্য আর উদ্যম আবার নতুন পথে মোড় ফিরবে। আফ্রিকায় যাব কি যাব না, এ-ব্যাপারে একেবারে অকস্মাৎ—প্রায় চোখের পলকে—আমার মনঃস্থির করতে হয়েছে। তবে ওরা খুবই অসুবিধায় পড়েছে; তাই আমাকে জরুরী বার্তা পাঠিয়েছিল।... পদ্মজার খুব ইচ্ছে ছিল, আফ্রিকায় যাবে। অবচেতন মনের যে-সমস্ত প্রভাব আমাকে স্থির সিদ্ধান্ত করতে সাহায্য করেছে, এটাও তার অন্যতম।

বিদায়, প্রিয় জওহরলাল। ২১ ডিসেম্বর তারিখে তোমাদের কংগ্রেসের অধিবেশন হবে। তার আগেই আমি ফিরব। দয়া করে দেখ, পাপা-প্রেসিডেণ্ট যেন ৬ ডিসেম্বরের মধ্যে কন্যা-প্রেসিডেণ্টের কাছে নাইরোবির ঠিকানায় একটা তারবার্তা পাঠান। কংগ্রেসের উদ্বোধন-অনুষ্ঠানে তাঁর বার্তাটি পাঠ করে শোনান হবে।

পুনর্মিলনায় পদ্মজা আর আমি আনন্দ ভবনের সবাইকে ভালবাসা জানাচ্ছি।

স্নেহানুরক্তা
সরোজিনী

৬৮ অ্যানি বেসাণ্ট কর্তৃক লিখিত

দি থিয়োসফিক্যাল সোসাইটি,
আদিয়ার, মাদ্রাজ
২৯ নভেম্বর, ১৯২৯

প্রিয় পণ্ডিতজী,

আমার বক্তৃতানুষ্ঠানে যে প্রচারপত্র বিলি করা হয়েছিল, তা নিয়ে দুঃখপ্রকাশ করায় আপনার মধুর স্বভাবেরই পরিচয় পাওয়া গেল। কিন্তু বিশ্বাস করুন, এতে আমি কিছুমাত্র দুঃখিত হইনি। আমাদের যুবকরা যখন জনসাধারণের কাজে সক্রিয়ভাবে যোগ দেন, তখন আমি সত্যিই খুব খুশী হই—তা তাঁরা আমার সঙ্গে একমত হন আর না-ই হন। আর তা ছাড়া আমি এতই বুড়ো রাজনীতিক যে কে কী বলল তা নিয়ে আর মাথা ঘামাই না।

শুভেচ্ছা জানাই।

অ্যানি বেসাণ্ট

৬৯ বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক লিখিত

[সরোজিনী নাইডুর অন্যতম ভ্রাতা বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে ইনি অক্সফোর্ড যান। পরে আর ইনি ভারতবর্ষে ফিরে আসেননি। ইউরোপে বিভিন্ন বামপন্থী আন্দোলনের সঙ্গে ইনি যুক্ত ছিলেন।]

লীগ এগেন্স্ট ইম্পীরিয়ালজ্ম
অ্যাণ্ড ফর ন্যাশনাল ইণ্ডিপেণ্ডেন্স
ইণ্টারন্যাশনাল সেক্রেটারিয়েট
২৪ ফ্রিডরিখস্ট্রস,
বার্লিন, এস ডব্লু ৪৮
৪ ডিসেম্বর, ১৯২৯

প্রিয় জওহর,

তোমার ৭ তারিখের (রুশ বিপ্লবের বার্ষিক) ব্যক্তিগত চিঠিখানি পড়ে অত্যন্তই বেদনা পেয়েছি। আমাদের সমস্যাবলীকে যে বৈপ্লবিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে আমি দেখে থাকি (আশা করি এর কখনও ব্যতিক্রম ঘটেনি), তাতে খোলাখুলিভাবে আমার মতামত ব্যক্ত করা উচিত, আমাদের বন্ধুত্ব হবার পর এই কথাই আমি মনে করে এসেছি। বিস্ময় প্রকাশ করে ইতিমধ্যে তোমার কাছে যে একটি তার পাঠিয়েছিলাম, তাতেই আমার অভিমত আমি মৃদুভাবে প্রকাশ করেছি। টাইম্স পত্রিকায় যে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে, তা বিশ্বাস করিনি বলেই তোমাকে তার করেছিলাম। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে জানাই, তোমার চিঠি এবং ভারতবর্ষের বিভিন্ন সংবাদপত্র পড়ে বুঝতে পারলাম, দিল্লিতে তুমি শোচনীয়ভাবে ভেঙে পড়েছিলে বলে যে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে, তা ঠিকই। আপন শ্রেণী-স্বার্থ বজায় রাখবার জন্য যে-সব বিশ্বাসঘাতক আলোচনা চালাচ্ছে, তাদের কাছে তোমার আত্মসমর্পণের ব্যাখ্যা হিসেবে এখন যে-কারণেই দেখাও না কেন, তুমি যে তন্মুহূর্তে পদত্যাগের পথ কেন বেছে নাওনি, আমি নিজে সেটা বুঝে উঠতে পারছি না। পদত্যাগ করলে দেশে তোমার প্রভাব আরও দৃঢ় হত, যুবক শ্রমিক আর কৃষক সম্প্রদায় এসে তোমার সঙ্গে যোগ দিত, এবং কংগ্রেসের মধ্যে যে-সব আপস-পন্থী রয়েছে, অনায়াসেই তুমি তাদের পরাস্ত করতে পারতে। ব্রিটিশ কূটনীতির সাফল্য সম্পর্কে পীপ্ল পত্রিকায় যে কথা বলা হয়েছে, তার সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ একমত। জনসাধারণের গুরুতর স্বার্থের চাইতে কংগ্রেসের ঐক্যরক্ষার প্রশ্নটি আরও বেশী গুরুত্বপূর্ণ, এ-কথা ভাবলে

মৌলিক একটা রাজনৈতিক প্রমাদই করা হবে। দেশের যুবসমাজের অবিসংবাদী নেতার আসনে অধিষ্ঠিত হয়ে এবং এমন কি মেহনতী জনতার আস্থা অর্জন করেও এমন একটা দুর্বলতা ও মানসিক বিশৃঙ্খলার মুহূর্তে তোমার অনুগামীদের তুমি পথে বসিয়েছ বলে মনে করি, যার আর কোনও ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া যায় না।

অথচ বিচিত্র ব্যাপার এই যে ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের অধিবেশনে সভাপতি হিসেবে যে-কাজ তুমি করেছ, তা খুবই সন্তোষজনক। দিল্লি-ইস্তাহারে তোমার স্বাক্ষরদানের ব্যাপারটা এই কারণেই আরও দুর্বোধ লাগছে। ভারতীয় শ্রমিক-সমাজের অধিকাংশই যে সাম্রাজ্যবাদের উচ্ছেদ ঘটাতে এবং পূর্ণ জাতীয় স্বাধীনতা অর্জন করতে চায়, এতেই প্রমাণিত হয় যে দিল্লিতে তুমি যে-কাজ করেছ, তা ভ্রমাত্মক। একদিকে ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাসকে মেনে নেবার ব্যাপারে ওয়ার্কিং কমিটির অধিকাংশ সদস্যকে তুমি সমর্থন করছ, আবার অন্যদিকে স্বাধীনতা দাবি করবার ব্যাপারে শ্রমিক-সমাজেও অধিকাংশকে তুমি সমর্থন করছ। এমন-কিছু করা দরকার, এই অসঙ্গতি যাতে দূরীভূত হয়। মহান নেতারা মাঝে-মাঝেই প্রকাশ্যে নিজেদের ভুল স্বীকার করে অতঃপর সঠিক পন্থা অবলম্বন করেছেন। তুমিও যদি তা না কর, তাহলে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আপন মর্যাদা রক্ষা তোমার পক্ষে সম্ভব হবে না। আর আজই যদি তুমি তা কর, তোমার স্বাক্ষর যদি তুমি প্রত্যাহার করে নাও, কংগ্রেসের সভাপতি হিসেবে তোমার যে সুবিধা বর্তমান তাকে কাজে লাগিয়ে যদি এই বিপজ্জনক ঝুটা ঐক্য তুমি ভেঙে দাও, এবং নরমপন্থী আর ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাসের সমর্থক ব্যক্তিদের তাড়িয়ে দিয়ে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আপসহীন সংগ্রামের জন্য কংগ্রেসকে যদি তুমি দখল কর, তাহলে যে-মর্যাদা তোমার নষ্ট হয়েছে, তার চেয়ে বেশী মর্যাদা তুমি ফিরে পাবে। এই যে সমালোচনা আমি করছি, দয়া করে একে শত্রুতার অভিব্যক্তি বলে মনে কর না; ভারতীয় শ্রমিক ও কৃষক-শ্রেণীর স্বার্থের প্রতি আমার গভীর অনুরক্তির কারণেই এ-সব কথা আমি বললাম। একমাত্র এরই কষ্টিপাথরে আমাদের কার্যাবলীর সঠিক বিচার সম্ভব। এবং এইভাবে যদি বিচার করা হয়, তাহলে এ-কথা বলতে আমি বাধ্য যে দিল্লি-ইস্তাহারে স্বাক্ষর প্রদান করে স্বাধীনতা-সংগ্রামে ভারতীয় জনসাধারণের প্রতি তুমি বিশ্বাসঘাতকতা করেছ।

লীগের কাগজে এই চিঠি লিখছি বটে, কিন্তু এ-চিঠি একান্তই ব্যক্তিগত।

দু বছর আগে যে-পন্থায় আমি তোমাকে একটি সর্বভারতীয় সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ফেডারেশন গঠনের কথা বলেছিলাম, আশা করি সেই পন্থায় অনুরূপ সংস্থা গঠনের আশু প্রয়োজনীয়তা তুমি এখন উপলব্ধি করতে পারছ। জাতীয় কংগ্রেস ভারতীয় জনসাধারণের প্রতিনিধিত্বমূলক সংস্থা নয়; মোটামুটিভাবে যে-সব সংস্থা সাম্রাজ্য-বাদবিরোধী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে, জাতীয় কংগ্রেস তার অন্যতম একটি সংস্থা মাত্র। এমন একটি সর্বভারতীয় সংস্থা গঠনের আজ জরুরী প্রয়োজন দেখা দিয়েছে, যে-সংস্থা এই সমস্ত সংস্থাকে ঐক্যবদ্ধ করবে, তাদের প্রচেষ্টার মধ্যে সংহতিসাধন করবে, সাম্রাজ্যবাদবিরোধী কাজের একটি ন্যূনতম কার্যসূচী অনুসারে তাদের নীতি নির্ধারণ করবে, এবং চূড়ান্ত সংগ্রামের জন্য সমগ্র দেশকে সংগঠিত করবে। ভারতবর্ষে আমাদের যে-সব সংস্থা রয়েছে, ভারতবর্ষের জন্য অনুরূপ একটি সাম্রাজ্যবাদবিরোধী লীগ প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তার প্রতি তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে ইতিমধ্যেই আমরা আমন্ত্রণ-লিপি পাঠিয়েছি। যে-চিঠি আমরা পাঠিয়েছি, আশা করি তার একটি অনুলিপি তোমার হস্তগত হয়েছে। তবু তোমার জন্য এই সঙ্গে আর-একটি অনুলিপি পাঠালাম। আমরা পরিকল্পনা করছি যে ডিসেম্বর

মাসের শেষে লাহোরে একটি সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সম্মেলন আহ্বান করা হবে। তার জন্য কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে কিনা, তা আমি জানি না। দু-এক সপ্তাহের মধ্যেই এ-বিষয়ে আরও খবর পাবে।

ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস সম্পর্কে টাইম্‌স পত্রিকায় যে-খবর বেরিয়েছিল তা খুবই উৎসাহজনক; এ-বছরের শেষে ভারতবর্ষ থেকে আমরা যে খবর পাব, তাও সমান উৎসাহজনক হবে, এই আমার আন্তরিক বিশ্বাস।

তোমাকে, কমলাকে ও কৃষ্ণাকে আমার শুভেচ্ছা জানাই। স্নেহানুরক্ত

ভি. চট্টোপাধ্যায়

৭০ মোতিলাল নেহরু কর্তৃক এম. এ. আনসারীকে লিখিত

১৭ জানুয়ারি, ১৯৩০

প্রিয় আনসারী,

আজ সকালে আমেদাবাদ ত্যাগ করেছি। ট্রেন থেকে তোমাকে এই চিঠি লিখছি। এখন আমি দিল্লি যাব; সেখানে শিগগিরই হক আর দেরিতেই হক, তোমার সঙ্গে দেখা হবে বলে আশা করি। সুতরাং, এখানে তোমাকে যা বলতে বসেছি, এখন তা না বলে তোমার সঙ্গে ব্যক্তিগত আলাপের জন্য তা যদি মুলতুবি রাখতাম, সেইটেই স্বাভাবিক হত। কিন্তু আমাদের এই কংগ্রেসকর্মীদের ছোট্ট চক্রটির মধ্যেও ঘটনাবলী এখন যে-পথ নিয়েছে, তাকে স্বাভাবিক বলা চলে না। এই কারণেই আমার মনে হয়েছে যে আমার যা বলবার আছে তা লিখিতভাবে বলা প্রয়োজন, যাতে করে এ নিয়ে কোনও ভুল ধারণার সৃষ্টি না হয়।

প্রথমেই তোমাকে জানাই, আদর্শের প্রতি তোমার আনুগত্য এবং আমার প্রতি তোমার ব্যক্তিগত শ্রদ্ধা ও ভালবাসার উপরে আমার পূর্ণ আস্থা বর্তমান। প্রকাশ্য বিষয় নিয়ে এই সর্বপ্রথম আমাদের মতানৈক্য ঘটল না। এই গুরুত্বপূর্ণ সময়ে যে মতভেদ ঘটল, এ খুবই দুঃখের কথা। কিন্তু অতীতেও আমার মনে হয়েছে এবং এখনও আমি মনে করি যে দুই পক্ষের প্রখর কর্তব্যবোধের দরুনই এই মতানৈক্য ঘটল।

গান্ধীজীকে তুমি যে চিঠি লিখেছ, অত্যন্তই যত্ন সহকারে তা আমি একাধিকবার পড়ে দেখেছি। হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের উপরে তুমি যে গুরুত্ব আরোপ করেছ, তা আমি সম্পূর্ণই মেনে নিচ্ছি। কিন্তু এ-যাবৎ কেন এই ঐক্য অর্জনে আমরা ব্যর্থ হয়েছি, এবং ঐক্য অর্জনের জন্য অতঃপর কী ভাবে চেষ্টা করতে হবে, এই দুই ব্যাপারেই তোমার সঙ্গে আমার মতানৈক্য বর্তমান। এই ঐক্যের একটা সুদৃঢ় ভিত্তি গড়ে তুলবার জন্য তুমি আর আমি দুজনেই আমরা বহু বৎসর ধরে চেষ্টা করে এসেছি। কিন্তু আমরা যে শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়েছি, এ-কথা স্বীকার করতেই হবে। অতীতের অভিজ্ঞতা এবং সযত্ন বিবেচনার ফলে এখন আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে যে-পন্থা অনুসারে আমরা কাজ করে এসেছি, তা মূলত ভ্রমাত্মক। এক সঙ্গে কাজ করবার সময় মাঝে-মাঝে এই সত্য আমাদের মনে উঁকি দিয়ে গিয়েছে, এবং তখনই আমরা পিছিয়ে আসবার প্রয়াস পেয়েছি। যেমন লাহোরে। সেখানে আমরা মহল্লা-চৌধুরীদের এক সভা আহ্বান করি। কিন্তু দেখা গেল যে আমরা এক বিষবৃত্তে আটকা পড়েছি। সেই অবস্থায় আর সেখান থেকে বেরিয়ে আসা সম্ভব নয়। আসল কথা এতকাল যাবৎ আমরা ভুল জায়গায় আবেদন জানিয়ে এসেছি। অনন্ত কাল ধরেও যদি এ-কাজ আমরা করে যাই, তবু কোনও সুরাহা হবে না। কোন্ ব্যক্তিবিশেষের—তা তিনি যতই বৃহৎ ব্যক্তি হন না কেন—অভ্যর্থনায় কোথায় ত্রুটি ঘটল, আর কোথায় বা তিনি মহাসমারোহে

অভ্যর্থিত হলেন, এরই উপরে যদি এই বিরাট জাতীয় সমস্যার সমাধান নির্ভর করে, তাহলে এ-কাজ আমাদের ছেড়ে দেওয়াই ভাল।

সার তেজবাহাদুর সপ্রু এখন এই একই ভুল করছেন; বস্তুত ব্যাপারটাকে যেখানে আমরা ছেড়ে দিয়ে এসেছি, সেইখান থেকেই তিনি আবার কাজ শুরু করেছেন। শিগগিরই যে তাঁর মোহভঙ্গ হবে, এ-বিষয়ে আমার কোনও সন্দেহ নেই। তবে তাঁর কাজে বাধা দেবার ইচ্ছে আমার নেই। স্থির করেছি যে যতদিন পর্যন্ত না তিনি ক্লান্ত হয়ে এ-কাজ থেকে অবসর গ্রহণ করছেন, ততদিন পর্যন্ত কোনও বিরূপ সমালোচনা না করে বিনা বাধায় তাঁকে এগিয়ে যেতে দেব। তবে আমি জানি যে সপ্তাহ কয়েক, হয়ত বা দিন কয়েকের বেশী আমাকে অপেক্ষা করতে হবে না; তার আগেই তিনি ক্লান্ত হয়ে অবসর নেবেন।

এ-চিঠিতে আমার পরিকল্পনার ইঙ্গিতমাত্র দিতে পারি, তার বেশী কিছু বলা এখন শক্ত হবে। এখন আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে যে শুধু প্রচার করে হিন্দু-মুসলিম ঐক্য অর্জন করা যাবে না। এমনভাবে এ-কাজ আমাদের করতে হবে যাতে ঐক্য অর্জিত হবে ঠিকই, কিন্তু হিন্দু অথবা মুসলমানরা বুঝতে পারবে না যে ঐক্যের জন্য তারা কাজ করছে। একমাত্র অর্থনৈতিক ভিত্তিতে, এবং অন্যায়ভাবে ক্ষমতা-দখলকারীর হাত থেকে স্বাধীনতা অর্জনের জন্য সংগ্রাম করেই এ-কাজ সম্ভব হতে পারে। বাঁচার অধিকার দুই সম্প্রদায়েরই আছে। এক সম্প্রদায় যখন সেই অধিকার অর্জনের জন্য সংগ্রাম করছে, তখন এমন কথা চিন্তা করা অসম্ভব যে অন্য সম্প্রদায় সেই সংগ্রামের সাফল্য অথবা ব্যর্থতার পরিণাম কখনও উপলব্ধি করতে পারবে না। পরিণাম উপলব্ধি করবার পর সর্বান্তঃকরণে তারাও যে সেই সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়বে না, এমন কথাও ভাবতে পারা যায় না। যিনি সব চাইতে তীক্ষ্ণধী ব্যক্তি, প্রভূত উপহাস আর অপপ্রচারের মধ্যেও লবণ-আইন অমান্যের মধ্যে তিনি এই রকমের একটি অর্থনৈতিক ভিত্তি খুঁজে পেয়েছেন। তাঁর প্রিয় উক্তি উদ্ধৃত করে বলি, ব্যাপারটা "অবিশ্বাস্য রকমের সহজ"। বিস্ময়ের ব্যাপার হল এই যে আর-কেউ এর আগে এ-কথা ভাবেইনি। এত সহজ ব্যাপারও জনসাধারণের মন কাড়তে পারবে কি না, এখনই সে-কথা বলা সম্ভব নয়। কিন্তু তা যদি পারে, হিন্দু ও মুসলমান—উভয় সম্প্রদায়েরই এক বিপুল জয় তাহলে সুনিশ্চিত। আর তা যদি না পারে, তাহলে আর আমাদের কোনও আশা নেই। হিন্দু-মুসলিম ঐক্য এবং সাংবিধানিক ও সাম্প্রদায়িক অধিকারের সমস্ত কথাই সেক্ষেত্রে অর্থহীন।

তুমি বল, দেশ এখনও আইন অমান্যের জন্য প্রস্তুত হয়নি। তা যদি হয়, তাহলে কবে আর তাকে তোমরা প্রস্তুত করবে? কী ভাবেই বা করবে? তোমার কি মনে হয় যে দুই সম্প্রদায়ের তথাকথিত নেতাদের মনোভাব এখন যে-রকম, তাতে মীমাংসার কোনও উপায় নির্ধারণ সম্ভব? সম্ভব কিনা, তাতে আমার ঘোরতর সন্দেহ রয়েছে। আর সম্ভব যদি হয়ও সেই উপায়কে শুধু কাগজে লিখে রাখলে বিদেশী সরকারের বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রাম তাতে কতটুকু সফল হবে? ভারতীয় উদারনৈতিকদের আশাবাদী মনোভাব বড্ডই প্রবল, তাই "না"কেও তাঁরা "হ্যাঁ" বোঝেন; অতখানি প্রবল আশাবাদ থাকলে তবেই বিশ্বাস করা সম্ভব যে মীমাংসার একটা উপায় নির্ধারিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই সরকার আমাদের কাছে এসে আত্মসমর্পণ করে বসবেন। পরস্পরকে কিছু সুবিধা ছেড়ে দেবার ভিত্তিতে যাঁরা এই সব উপায় নির্ধারণ করেন, উপায় নির্ধারণের কোনও অধিকারই তাঁদের নেই। এবং এই নিশ্চিত ধারণা আমার হয়েছে যে যতই এইভাবে উপায় নির্ধারণ করা হক না কেন, হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের যেটুকু কাছে আমরা এখন আছি, এতে করে তার বেশী কাছে যাওয়া সম্ভব হবে না।

গত কয়েক বছরের ঘটনাবলীর কথাও তুমি তুলেছ। এ-বিষয়ে আমার বিশেষ কিছু বলবার নেই। মিঃ জিন্নাকে আমি আমল দিইনি বলে যে-ঘটনার উল্লেখ করেছ, সে সম্পর্কেও না। মিঃ জিন্না সেদিন যা বলেছিলেন তাতে আমি দুঃখিত হয়েছিলাম, এবং তাঁকে খুশী করবার জন্য কৃত্রিম ভদ্রতার আশ্রয় নেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি।

তোমার নিজের অবস্থা, এবং কী কী কারণে অনুরূপভাবে কাজ করতে তুমি বাধ্য হয়েছিলে তাও তুমি বুঝিয়ে বলেছ। তোমার যে অভিমত, তাতে যুক্তিপরায়ণ কোনও ব্যক্তিই তোমার কাজের জন্য তোমাকে দোষ দিতে পারবে না।

সর্বশেষে, ১৯২০ সনে যে-অবস্থা ছিল এবং এখন যে-অবস্থা দাঁড়িয়েছে, তার মধ্যে তুমি একটা সবিস্তার তুলনা টেনেছ। যে দুই অবস্থার মধ্যে দশ বছরের ব্যবধান, কোনও দেশের ইতিহাসেই তা কখনও সম্পূর্ণ অভিন্ন হওয়া সম্ভব নয়। তোমার কয়েকটি কথায় আমি বিস্মিত হয়েছি। যথা, শ্রমিক সরকারের সদিচ্ছা এবং ভাইসরয়ের আন্তরিকতায় জনসাধারণের আস্থা, অথবা এই তথ্য যে কলকাতা-প্রস্তাব সম্পর্কে সরকারের পক্ষে যতখানি সাড়া দেওয়া সম্ভব ছিল, তা সে দিয়েছে। এ-কথা বলা প্রয়োজন যে তোমার ব্যাখ্যাকে আমি মনে নিতে পারছি না। পক্ষান্তরে আমি মনে করি, হলে এখনই হবে, আর নয়ত কখনও হবে না।

আশা করি তুমি বিশ্বাস কর যে আসন্ন সংগ্রামে আমার নিয়তিকে গান্ধীজীর নিয়তির সঙ্গে জড়িত করার অর্থ যে আমার পক্ষে কী, তা আমি জানি। মহত্তম প্রয়াস এবং পরমতম আত্মত্যাগেব সময় যে আজ সমাগত, এই গভীর বিশ্বাস না থাকলে এই বয়সে আমার সমস্ত শারীরিক অক্ষমতা এবং পারিবারিক দায়-দায়িত্ব সত্ত্বেও এত বড় বিপদের ঝুঁকি আমি নিতাম না। দেশের উদাত্ত আহ্বান আমি শুনতে পেয়েছি, সে-আহ্বানে আমি সাড়া দিলাম।

ভবদীয়
মোতিলাল নেহরু

৭১ মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক লিখিত

[১৯২৯ সনের ডিসেম্বর মাসের শেষ কয়েক দিনে এবং ১৯৩০ সনের গোড়ার দিকে জাতীয় কংগ্রেসের লাহোর-অধিবেশনে স্বাধীনতা দাবির সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ১৯৩০ সনের ২৬শে জানুয়ারি তারিখে ভারতবর্ষের সর্বত্র ব্যাপকভাবে "স্বাধীনতা দিবস" পালন করা হল। এর অনতিকাল পরেই গান্ধীজী লবণ সত্যাগ্রহের সিদ্ধান্ত করেন। একদল সহকর্মীকে সঙ্গে নিয়ে সবরমতী আশ্রম থেকে তিনি ডাণ্ডির সমুদ্রোপকূল অভিমুখে যাত্রা করেন। পরবর্তী তিনখানি চিঠি তাঁর এই সমুদ্র-যাত্রার সময়ে লিখিত হয়। এপ্রিলের গোড়ার দিকে তাঁকে ও তাঁর সহকর্মীদের ডাণ্ডিতে গ্রেফতার করা হয়।]

১১ মার্চ, ১৯৩০

প্রিয় জওহরলাল,

রাত প্রায় দশটা বাজতে চলল। জোর গুজব শোনা যাচ্ছে যে আজ রাত্রেই আমাকে গ্রেফতার করা হবে। তোমাকে তার না করবার বিশেষ কারণ এই যে অনুমোদন করিয়ে নেবার জন্য সংবাদদাতারা আগে-থাকতেই তাঁদের সংবাদ পেশ করেন, এবং প্রত্যেককেই যথাসম্ভব দ্রুত কাজ করতে হচ্ছে। তার করবার মত বিশেষ-কিছু খবর নেইও।

ঘটনাবলী অত্যন্তই সুন্দরভাবে পরিণতির পথে এগিয়ে চলেছে। স্বেচ্ছাসেবক হবার জন্য প্রচুর প্রস্তাব এসে পৌঁছচ্ছে। আমাকে যদি গ্রেফতার করা হয়ও,

স্বেচ্ছাসেবকদের যাত্রা তবুও অব্যাহত থাকবে। আর যদি গ্রেফতার না হই, তাহলে আমি তোমাকে তার করব বলে আশা করতে পার। অন্যথায় আমি নির্দেশ রেখে যাব।

আমার বিশেষভাবে কিছু বলবার আছে বলে মনে হয় না। যথেষ্ট লিখেছি। আজ সন্ধ্যায় প্রার্থনার জন্য বালুকারাশির উপরে এক বিরাট জনসমাবেশ হয়েছিল, আমার শেষ বাণী আমি সেখানে দিয়েছি।

ঈশ্বর তোমাকে রক্ষা করুন, তিনি তোমাকে দায়িত্বভার বহনের শক্তি দিন।

তোমাদের সকলকে আমার ভালবাসা জানাই।

বাপু

৭২ মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক লিখিত

১৩ মার্চ, ১৯৩০

প্রিয় জওহরলাল,

যে-চিঠি আমার শেষ চিঠি হতে পারত, আশা করি সেটি তুমি পেয়েছ। আমার গ্রেফতার আসন্ন বলে আমাকে যে খবর দেওয়া হয়েছিল, তা সম্পূর্ণই প্রামাণিক। তবুও নিরাপদে আমরা দ্বিতীয় পর্যায়ে এসে পৌঁছেছি। আজ রাত্রে তৃতীয় পর্যায় শুরু হবে। কর্মসূচীটি তোমাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। বন্ধুরা সবাই বিশেষভাবে বলছেন যে ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে যোগ দেবার জন্য আমেদাবাদ যাওয়া আমার উচিত হবে না। পরামর্শটির মধ্যে যথেষ্টই যুক্তি আছে। সুতরাং সে-দিন আমরা যেখানে থাকব, ওয়ার্কিং কমিটিই সেখানে আসতে পারে। কিংবা তুমি একাও আসতে পার। সংগ্রাম শেষ না করে স্বেচ্ছায় আমরা ফিরে যাব না, এই মনোভাবটিকে বেশ ভালভাবে ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। আমি যদি ফিরে যাই, তাহলে এ-কাজের ঈষৎ ক্ষতি হবে। যমুনালালজী আমাকে বললেন, এ-বিষয়ে তিনি তোমাকে লিখেছেন। আশা করি কমলা ভাল আছে।

গতকাল আমি নির্দেশ দিয়েছি, পুরো খবর দিয়ে যেন তোমাকে তার করা হয়।

শুভার্থী
বাপু

৭৩ মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক লিখিত

৩১ মার্চ, ১৯৩০

প্রিয় জওহরলাল,

তোমার চিঠি পেলাম। আমি যে তার করিনি তার কারণ ডাণ্ডিতে পাঠান আছে বলে আমি মনে করি না; আর তা যদি থাকেও, তাদের সঙ্গে আমরা এঁটে উঠতে পারব। সীমান্ত থেকে যদি সৎ এবং সত্যকারের বন্ধুরাও এসে উপস্থিত হন, তাতে জটিলতার সৃষ্টি হবে। ডাণ্ডিতে যদি আমাকে পৌঁছতে দেওয়া হয়, তাহলে যে-সব জটিলতাকে পরিহার করা যেতে পারে, তার মধ্যে না গিয়ে একটিই মাত্র বিষয় সেখানে আমি উত্থাপন করব। গুজরাটের অবস্থা সত্যিই খুব সুন্দর পরিণতির দিকে এগিয়ে চলছে বলে মনে হয়।

রায় বেরিলিতে ইতিমধ্যেই এত লোককে গ্রেফতার করা হয়েছে জেনে বিস্মিত হলাম। আপাতত লবণ-করের উপরে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে তুমি ঠিক কাজই করেছ বলে আমার মনে হয়। আর কী আমরা করতে পারি অথবা আর কী আমাদের করা উচিত, আগামী পক্ষকালের মধ্যেই তা আমরা জানতে পারব।

আমার কাছ থেকে যদি অন্য খবর না পাও তাহলে ৬ এপ্রিলকেই যুগপৎ কার্যারম্ভের দিন বলে ধরে নিও।

রাত দশটা বাজতে চলল। সুতরাং শুভরাত্রি জানিয়ে এইখানেই শেষ করি।

বাপু

৭৪ মোতিলাল নেহরু কর্তৃক এম. এ. আনসারীকে লিখিত

শাহীবাগ,
আমেদাবাদ, ২০ মার্চ, ১৯৩০

প্রিয় আনসারী,

এখানে পৌঁছে ট্রেন থেকে নামার সঙ্গে-সঙ্গেই তোমার চিঠিখানি আমার হাতে তুলে দেওয়া হয়। জওহরও মহাত্মাজীর কাছ থেকে একখানি চিঠি পেয়েছে। বিশেষ দূতের মারফত এই চিঠি পাঠন হয়েছিল। চিঠি পড়ে জওহর জানতে পারে, তার জন্য যে মোটরগাড়ি অপেক্ষা করছে, তাতে করে তৎক্ষণাৎ যদি সে যাত্রা না করে তাহলে আগামীকাল নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির সভার আগে মহাত্মাজীর সঙ্গে তার আর সাক্ষাতের সম্ভাবনা নেই। বেচারা আগের রাত্রেই আগ্রা থেকে ট্রেনযোগে আমেদাবাদ এসেছে· লোকে-ঠাসা তৃতীয় শ্রেণীর কামরায় সারারাত সে দু চোখের পাতা এক করতে পারেনি। কিন্তু মহাত্মাজীর ইচ্ছা অনুসারে তৎক্ষণাৎ সে যাত্রা করে। রাত দুটো পর্যন্ত একটানা মোটরে যাবার কথা। দুটো নাগাদ একটা নদী পার হতে হবে। নদীতে বাণ ডাকে। অন্য কোনও সময় নদী পার হওয়া নাকি একান্তই অসম্ভব। কোনও গোলমাল যদি না হয় তাহলে ভোর চারটের সময় মহাত্মাজী যখন প্রার্থনায় বসেন, সেই সময় নাগাদ সে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করবে। আজ বিকেল ছটা নাগাদ তার এখানে ফিরে আসবার কথা।

আমার পক্ষে ত এ এক দুঃসাধ্য কাজ। তাই আমি যাইনি। এখন আমার কার্যসূচী হল এই যে আগামী কাল নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির সভা আমরা শেষ করব। দরকার হলে অনেক রাত পর্যন্ত সভার কাজ চলবে। পরদিন সকালের ট্রেনে আমরা ব্রোচ যাত্রা করব। মহাত্মাজী সেদিন যেখানে থাকবেন, সেখানে আমাকে নিয়ে যাবার জন্য ব্রোচে একটি মোটরগাড়ি আমার জন্য অপেক্ষা করবে। বিকেল পাঁচটার সময় মহাত্মাজী তাঁর পরবর্তী গন্তব্য অভিমুখে যাত্রা করবেন। আশা করি তার আগে ঘণ্টা দুয়েকের জন্য তাঁর সঙ্গ পাব। অতঃপর আমার সামনে তিনটি পথ খোলা থাকবে—সুরাটে, ব্রোচে অথবা বরোদায় গিয়ে সুবিধাজনক একটি ট্রেন ধরা। মহাত্মাজীর শিবির থেকে এই তিনটি রেল-স্টেশনের দূরত্ব ঠিক কত, এবং পথের অবস্থাই বা কী রকম, এখানকার লোকরা তা জানে না। তবে মাত্র দুটি ট্রেনই সুবিধাজনক; ফ্রন্টিয়ার মেল ও বোম্বাই-দিল্লি এক্সপ্রেস। ফ্রন্টিয়ার মেলে যেতে হলে ব্রোচে গিয়ে ট্রেন ধরার প্রশ্ন ওঠেই না, তার কারণ ফ্রন্টিয়ার মেল সেখানে থামে না। জাওরায় যাবার জন্য যদি রতলামে নামতে হয়, তাহলে যেখান থেকেই উঠি না কেন, এক্সপ্রেসটিই অধিকতর সুবিধাজনক গাড়ি। সুতরাং আপাতত তুমি ধরে নিতে পার যে ২৩ তারিখ সকাল ছটায় আমি রতলামে পেঁছব। তারপর সারাটা দিন জাওরায় তোমার সঙ্গে কাটিয়ে আবার মাঝ রাতে ফ্রন্টিয়ার মেলযোগে এলাহাবাদ যাত্রা করব। শেষ পর্যন্ত যে এই ব্যবস্থানুযায়ীই কাজ করতে পারব, এমন কথা অবশ্য দিতে পারি না। কিন্তু তুমি চাও যে দুদিন আগে তোমাকে খবর দিতে হবে। সুতরাং জাওরার গাড়ি রতলামে এসে আমাকে না-ও পেতে পারে. এই ঝুঁকি তোমাকে নিতেই হবে। তোমাকে তার পাঠিয়ে বিশেষ লাভ হবে না; তবু সময়মত তা তুমি পেতেও পার, এই ক্ষীণ সম্ভাবনার উপরে নির্ভর করে তোমাকে একটা তার করা।

সাহেবজাদার সদয় আমন্ত্রণের জন্য ধন্যবাদ জানাই। যা বললাম তার থেকেই তিনি বুঝতে পারবেন যে তাঁর আমন্ত্রণ রক্ষার জন্য আমি কতটা উদ্‌গ্রীব। তবে এত তাড়াহুড়োর মধ্যে সব করতে হবে যে তাঁর সঙ্গে পুনর্বার সাক্ষাৎ করবার সুযোগ হয়ত না-ও হতে পারে। সেটা খুবই নৈরাশ্যের ব্যাপার হবে।

ভবদীয়
মোতিলাল নেহরু

ডঃ এম. এ. আনসারী

৭৫ এম. এ. আনসারী কর্তৃক লিখিত

জাওরা স্টেট
৩০ মার্চ, ১৯৩০

প্রিয় জওহর,

এই সঙ্গে একটি পত্রের অনুলিপি পাঠালাম। মূল পত্রটি মহাত্মাজীকে লিখেছি। পণ্ডিতজীর উপরে একমাত্র তোমার এবং মহাত্মাজীর কিছু প্রভাব আছে বলে আমার মনে হয়। পণ্ডিতজীকে যে-পরামর্শ আমি দিয়েছি, তা তাঁর স্বাস্থ্যের বর্তমান অবস্থার কথা ভেবেই দিয়েছি। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এই আন্দোলনে আমি তাঁর সঙ্গী নই। তা তিনি জানেন। তাই আমার এই পরামর্শ হয়ত তাঁর কাছে সৎপরামর্শ বলে মনে হবে না। তৎসত্ত্বেও তাঁর বর্তমান অবস্থার কথা তোমাকে জানান প্রয়োজন বলে মনে করি। তুমি হয়ত যথাসম্ভব তাঁকে বুঝিয়ে বিশ্রাম নেওয়াতে পারবে। বিশ্রাম নেওয়া তাঁর পক্ষে একান্ত প্রয়োজন।

শুভেচ্ছা জানাই।

শুভার্থী
এম. এ. আনসারী

৭৬ এম. এ. আনসারী কর্তৃক মহাত্মা গান্ধীকে লিখিত

জাওরা স্টেট,
৩০ মার্চ, ১৯৩০

প্রিয় মহাত্মাজী

২৫ তারিখে, অর্থাৎ পণ্ডিতজী যেদিন এখানে আসেন তার পরের দিনই, আপনাকে চিঠি লিখব ভেবেছিলাম। কিন্তু ভূপালের বেগম-মাতার চিকিৎসার জন্য অকস্মাৎ আমাকে সেখানে চলে যেতে হয়। কিছু দিন যাবৎ তিনি অসুস্থ আছেন। পণ্ডিতজীর স্বাস্থ্যের অবস্থা এবারে খুবই খারাপ দেখলাম। সম্প্রতি অবিরত তাঁকে যে উদ্বেগ ও কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে তাতে, এবং আপনার কাছে যাওয়ায় ও ধূলিধূসর পথে হাঁটার ফলে, তাঁর হাঁপানির কষ্ট আবার নতুন করে বৃদ্ধি পায়। তাঁর হৃদ্‌যন্ত্র ত আগেই বৃদ্ধি পেয়েছিল, এতে করে তার উপরে আরও চাপ পড়ে। হাঁটতে অথবা সামান্য নড়াচড়া করতেও তিনি হাঁপিয়ে উঠছিলেন। আপনি জানেন, তাঁর রক্তের চাপ ইদানীং বেড়ে গিয়েছে, এবং তা স্থিরও থাকে না। মানসিক ও শারীরিক দুর্বলতার কারণে তাঁর স্বাস্থ্যের সাধারণ অবস্থার অবনতি ঘটেছে। তাঁর এখন যে বয়স, তাতে সেরে উঠবার মত শক্তিও তাঁর নেই। কিন্তু নিজেকে তিনি রেহাই দিচ্ছেন না। ভবিষ্যতেও নিজেকে রেহাই দেবেন না বলে তিনি দৃঢ়সংকল্প। তাঁর স্বাস্থ্যের প্রকৃত অবস্থার কথা আপনার গোচরে আনা, এবং তিনি যাতে বিশ্রাম নেন ও কোনও প্রকার কায়িক পরিশ্রমের কাজ না করেন তার জন্য তাঁকে বুঝিয়ে রাজী করাতে আপনাকে অনুরোধ জানান আমার কর্তব্য।

আপনার কার্যকলাপ আমি সাগ্রহে লক্ষ্য করে যাচ্ছি, এবং আপনার জন্য প্রার্থনা করছি।

সশ্রদ্ধ শুভেচ্ছা জানাই।

ভবদীয়
এম. এ. আনসারী

৭৭ মহাদেব দেশাই কর্তৃক লিখিত

[মহাদেব দেশাই ছিলেন গান্ধীজীর সেক্রেটারি ও তাঁর প্রিয় শিষ্য। লবণ-সত্যাগ্রহ শুরু হবার অত্যল্পকাল পরেই এই পত্রখানি লিখিত হয়।]

আশ্রম, সবরমতী
৭ এপ্রিল, ১৯৩০

প্রিয় জওহরলাল,

বইখানির দ্বিতীয় খণ্ডের জন্য ধন্যবাদ। কিন্তু কবে যে এ-বই পড়বার মত সময় পাব তা জানি না। ভাগ্যক্রমে শিগ্‌গিরই যদি কারারুদ্ধ হতে পারি, তবে হয়ত সেখানে বসে পড়তে পারব। বস্তুত আমি এখন দৃঢ়নিশ্চিত। ৬ তারিখে আমাদের কার্যারম্ভ হয়। আমেদাবাদে আমরা বে-আইনী পণ্য বিক্রি করতে শুরু করি, ১৩ তারিখ পর্যন্ত এ-কাজ চালিয়ে যাব। আমাদের শ্রেষ্ঠ চারজন কর্মী বিদায় নিয়েছেন। বীরঙ্গমে আমরা শুল্ক-বেষ্টনী আক্রমণ করি, এবং মণিলাল কোঠারী ও আমাদের আমেদাবাদের কর্মীদের মধ্যে [কয়েকজন] বিদায় নেন। এই জেলার আর-একটি জায়গা ধোলেরায় বিদায় নিলেন অমৃতলাল শেঠ। কয়রায় ১১৭ ধারা অনুসারে দেরুবর গোপালদাসকে ২ বছর ৩ মাসের নিষ্ঠুর কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। সারা ভারতবর্ষেই হয়ত ১১৭ ধারা প্রয়োগ করা হবে। গোপালদাসের সঙ্গে আরও পাঁচজন গিয়েছেন। ব্রোচে আগামীকাল ডাঃ চাঁদুলালের বিচার হবে। সুরাটে জয়মাল্য পেয়েছেন রামদাস ও তাঁর আরও কয়েকজন সঙ্গী।

তোমাকে স্বীকার করতে হবে যে আমরা বেশ ভাল লড়াই দিতে পেরেছি। ঈশ্বর সহায় হলে এইভাবেই আমরা লড়াই দিয়ে যাব। মাসখানেক আগে বল্লভভাইকে যখন গ্রেপ্তার করা হয়, নিজের উপরে আমার তখন বিশেষ আস্থা ছিল না। কিন্তু জনসাধারণের কাছ থেকে যেভাবে সাড়া পাওয়া যাচ্ছে তাতে আমি আত্মবিশ্বাস অর্জন করেছি। এখন রোজই আমাকে যে-সব সভায় বক্তৃতা দিতে হয়, এর আগে আর কখনও তেমন সভায় বক্তৃতা দিইনি। শৃঙ্খলা ও নৈঃশব্দ্যে এই সভাগুলি আদর্শ-স্থানীয়। বক্তা বলে অভিহিত হবার কিছুমাত্র দাবি আমার নেই। অথচ সেই আমার একটি বক্তৃতা শুনবার জন্য প্রতিদিন সাড়ে ছটায় দশ থেকে পনর হাজার লোক এসে সমবেত হচ্ছে, এবং সন্ধ্যার আগে সভাভঙ্গ করে চলে যাচ্ছে। প্রচুরসংখ্যক স্বেচ্ছাসেবকও এসে যোগ দিচ্ছেন। দু দিন আগে তাঁদের সংখ্যা ছিল ৫০০; আর আজ তাঁদের সংখ্যা হাজারের উপরে। মহিলারাও এসে নাম লেখাচ্ছিলেন। গতকাল অন্যূন ৫০ জন মহিলা এসে নাম লেখালেন। তাঁদের উৎসাহ যেন ফেটে পড়ছে। অবস্থা নিশ্চয়ই এই রকমই চলবে। তা যদি চলে, তাহলে আমার দিনও ফুরিয়ে এসেছে বলতে হয়। তাতে ক্ষতি নেই, কেন না এ-কাজের দায়িত্ব নেবার মত বিস্তর লোক এখন রয়েছেন। আমার সময়কে এখন আশ্রম (আশ্রমের আমি নামে মাত্র প্রধান, কোনও কাজ আমাকে করতে হয় না), প্রাদেশিক কমিটি (একাধারে আমি যার সম্পাদক, সভাপতি ও সমর-সচিব, নবজীবন ও ইয়াং ইণ্ডিয়া (যথাসাধ্য এ দুটি কাগজকে আমার সম্পাদনা করতে হয়; তবে বাপু যখন বাইরে থাকেন, এ-কাজ তখন নেহাতই সহজ), এবং জেলা-সফরের কাজে ভাগ করে দিয়েছি। যে-সব কাজ

আমাকে করতে হচ্ছে, তা নিয়ে বড়াই করার জন্য এ-কথা লিখছি না; হাতে যখন কাজ আসে, একজন সাধারণ মানুষও যে তখন কতখানি কার্যক্ষম হয়ে উঠতে পারে, তোমাকে তার একটা আন্দাজ দেবার জন্যই এত সব লিখলাম। যে-মানুষ যতখানি ভার বহন করতে পারে, ঈশ্বর কখনও তার বেশী ভার তার উপরে চাপান না।

পৃথক একটা মোড়কে তোমাকে অল্প-একটু লবণ পাঠিয়ে দিচ্ছি। ৬ এপ্রিল তারিখে বাপু ডাণ্ডিতে এই লবণ বানিয়েছেন। এই লবণটুকুকে একটা স্মারক হিসেবে রেখে দিও; আর নয়ত নিলাম করে এ-লবণ বিক্রি করবার ব্যবস্থা কর। মূল্য যেন এক হাজার টাকার কম না হয়। আমার কাছে যে ছোট্ট একটি মোড়ক আছে, সেটি কেনা হয়েছে ৫০১৲ টাকায়। পুলিশ পাছে এই চিঠি খুলে অমূল্য লবণটুকুকে বাজেয়াপ্ত করে, এ-চিঠি তাই কৃষ্ণার নামে পাঠালাম।

স্নেহানুরক্ত
মহাদেব

৭৮ মোতিলাল নেহরু কর্তৃক শিবপ্রসাদ গুপ্তকে লিখিত

[শিবপ্রসাদ গুপ্ত ছিলেন যুক্তপ্রদেশের একজন অগ্রগণ্য কংগ্রেসকর্মী। আমার পিতা আদালতে উপস্থিত হবার সিদ্ধান্ত করায় তিনি আপত্তি প্রকাশ করেন; এই নিয়ে তাঁর কাছে এই চিঠিখানি লেখা হয়।]

এলাহাবাদ, ১ জুন, ১৯৩০

প্রিয় শিবপ্রসাদজী,

আপনার ৫ জ্যৈষ্ঠ ১৯৮৬ তারিখের চিঠি পেয়েছি। যাকে আপনি বলেছেন "বিদেশী আদালত", কংগ্রেসের সভাপতি থাকাকালে সেখানে আমার উপস্থিত হওয়াটা আপনার ক্ষোভের কারণ হয়েছে জেনে দুঃখিত হলাম। আপনাকে এই আশ্বাস দিতে পারি যে আমি নিজে এতে কিছুমাত্র মনঃকষ্ট ভোগ করছি না। পক্ষান্তরে এখন যেমন সেখানে আমি উপস্থিত হচ্ছি, তা না করলেই বরং নিজের কাছে আমার মর্যাদা নষ্ট হত।

"এই সংকটকালে কংগ্রেসের মর্যাদা অথবা খ্যাতি" সম্পর্কে আপনি যা বলেছেন, সে-প্রসঙ্গে জানাই: সংশ্লিষ্ট ঘটনার এই বিচিত্র অবস্থায় কংগ্রেসের সভপতি-পদে অধিষ্ঠিত থাকাকালে আমি যদি অন্য-কিছু করতাম, তাহলেই বরং এই মর্যাদা অথবা খ্যাতি সম্পূর্ণ বিনষ্ট হত।

এই মামলা থেকে সসম্মানে মুক্তিলাভের সম্ভবপর ও আইনসঙ্গত সর্বপ্রকার উপায় অবলম্বনের পর আমার নিজের বিবেকাগত আপত্তির কারণে আমি বিচার প্রার্থনা করি, এবং সসম্মানে মুক্তিলাভ করা সত্ত্বেও আমি নিজের উপরে এই দণ্ড আরোপ করি যে আদালতে হাজিরা দেবার জন্য দৈনিক আমি ১,০০০৲ টাকা জরিমানা দেব। যে দশ দিন আমি আগ্রায় ছিলাম, তার বেশির ভাগ সময় কেটেছে কংগ্রেসের কাজে, এবং কংগ্রেসের দ্রুত বিলীয়মান তহবিলে এতে অতিরিক্ত ১০,০০০৲ টাকা জমা পড়েছে। যা-কিছু হয়েছে তা ঠিকই হয়েছে; এতে উদ্বেগের কোনও কারণ নেই।

মোতিলাল নেহরু

বাবু শিবপ্রসাদ গুপ্ত
বারাণসী

৭৯ মোতিলাল নেহরু কর্তৃক কৃষ্ণা নেহরুকে লিখিত

[১৯৩০ সনের ৩০ জুলাই তারিখে নৈনির সেণ্ট্রাল জেল থেকে মোতিলাল নেহরু তাঁর কন্যা কৃষ্ণাকে যে চিঠি লেখেন, তার কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত হল।]

সবাইকে জানিও যে আমি এখন সম্পূর্ণ সুস্থ আছি। দিন আট-নয় আমি অসুস্থ ছিলাম। তখন মাঝে-মাঝে আমার জ্বর হয়েছে। কোন কিছু খেতেও উৎসাহ পেতাম না। কিন্তু সে-অবস্থা এখন কেটে গিয়েছে, এবং ধীরে-ধীরে আমি আবার শক্তি ফিরে পাচ্ছি। একটু অবসন্ন হয়ে পড়েছি বটে, কিন্তু তাতে আশঙ্কার কিছু নেই। আশা করি আগামী শনিবার তোমাদের সকলের সঙ্গে দেখা হবে। শেষ আমার স্বাস্থ্য যে-রকম দেখেছিলে, এবারেও প্রায় সেইরকমই দেখতে পাবে।

আনন্দ ভবন অথবা ৯, কানপুর রোড থেকে (ঠিক কোথা থেকে, তা আমি জানি না) যে খাবার এখন পাঠান হচ্ছে, তা বেশ ভাল। এখানে যে খাবার তৈরী করা হয়, তার চাইতে তা আমার অনেক ভাল লাগে। তবে আর কয়েকদিন মাত্র খাবার পাঠাতে হবে। তারপর এ-রকম অবস্থায় আমি যা করে থাকি, সেই পুরনো অভ্যাসেই আবার আমি ফিরে যাব; যা-যা আমার ভাল লাগে, কুকারে আমি নিজেই তা চাপিয়ে দেব। বরাবরের মত এবারেও মাঝে-মাঝে নতুন-নতুন খাবার উদ্ভাবন করা যাবে; তার মধ্যে অন্তত কিছু-না-কিছু বেশ ভালই হবে।

মনে হয়, এই ধরনের কোনও কাজ নিয়ে একটু অন্যমনস্ক থাকা দরকার। এখন ত অন্য-সবাই আমার হয়ে কাজ করে দেয়। খাওয়া, ঘুমনো আর পড়াশোনা করা—এ ছাড়া আমার কোনও কাজই নেই। আমার সেবার ব্যাপারে হরি এখন জওহরলালের কাছে শিক্ষা নিতে পারে। সকালে চা-পান থেকে শুরু করে রাত্তিরে শুতে যাওয়া পর্যন্ত দেখতে পাই, সব কিছু আমার জন্যে একেবারে গুছিয়ে রাখা হয়েছে। প্রতিটি খুঁটিনাটি ব্যাপারে পর্যন্ত সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয়। আনন্দ ভবনে ত প্রায়ই আমাকে চেঁচিয়ে বাড়ি মাথায় করতে হত; আর এখানে আমাকে কখনও কোনও-কিছু মুখ ফুটে চাইতে পর্যন্ত হয়নি। মামুদ মাঝে-মাঝে সাহায্য করে বটে, কিন্তু আসল ভারটা জওহরকেই সামলাতে হয়। আমি যে এত অলস, আর আমার জন্যে যে জওহরের এত সময় নষ্ট হয়, এজন্যে আমার ভারী খারাপ লাগে; জওহরের এই সময়টা আরও অনেক ভাল কাজে ব্যয়িত হতে পারত। সব কিছুই সে আগে-থাকতে বুঝতে পারে; আমার জন্যে কোনও-কাজই সে তুলে রেখে দেয় না। আমার মত পুত্রভাগ্য বেশী লোকের নেই।

পায়োনিয়ার পত্রিকায় তোমাদের কার্যাদি সম্পর্কে যে-সব সংবাদ প্রকাশিত হয়, তা আমরা লক্ষ্য করে যাচ্ছি। এ-পত্রিকায় খবর অবশ্য খুব অল্পই থাকে। তবু যেটুকু থাকে, তার থেকেই বাকীটা আমরা অনুমান করে নিতে পারি। তোমরা খুবই চমৎকার কাজ করেছ। আশা করি ভবিষ্যতেও এই রকমের উৎসাহ আর উদ্দীপনা নিয়ে কাজ করে যেতে পারবে। তোমাদের সকলের জন্যই—এমন কি ছোট ছোট শিশুদের জন্যও—জওহর ও আমি গর্ব অনুভব করি।

৮০ মোতিলাল নেহরু কর্তৃক লিখিত

[গুরুতর অসুস্থতার জন্য ১৯৩০ সনের শেষার্ধে আমার বাবাকে কারাগার থেকে মুক্তি দেওয়া হয়। এই অসুখ থেকে তিনি আর সেরে ওঠেননি, দু-তিন মাস পরেই তিনি মারা যান। তাঁর সমুদ্রযাত্রার জন্য একটা প্রস্তাব করা হয়েছিল, কিন্তু এত দ্রুত তাঁরা স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটে যে সমুদ্রযাত্রা আর

তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। অসুস্থতা সত্ত্বেও জাতীয় আন্দোলন সম্পর্কে তাঁর আগ্রহ অক্ষুণ্ণ ছিল। এ যখনকার কথা, আমি তখন কারাগারে।]

আনন্দ ভবন,
এলাহাবাদ, ১১ নভেম্বর, ১৯৩০

প্রিয় জওহর,

এই চিঠিতে তোমাকে সর্বশেষ খবর জানাই। আজ বিকেলে অকস্মাৎ মালাকা কারাগারে বেটী ও শাম্মীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। সুন্দরলাল, মঞ্জর আলী ও অন্যান্য কয়েকজনকে তিন দিন আগে গ্রেফতার করা হয়। তাদের বিচার দেখবার জন্য বেটী আর শাম্মী মালাকা কারাগারে গিয়েছিল। সঙ্গে ছিল কমলা, নান, ইন্দু আর তোমার মা। খবরটা আমাকে দেবার জন্য নান সেখান থেকে তৎক্ষণাৎ চলে আসে। আমি তখন বিছানায় বসে কাশছি। গিয়ে আমার কোনও লাভ হত না। তা ছাড়া যাবার ইচ্ছে থাকলেও যাবার মত শারীরিক সামর্থ্য আমার ছিল না। বিচার দেখবার জন্য আবার আমি নানকে সেখানে পাঠিয়ে দিই। কিন্তু সে সেখানে গিয়ে দেখে, তার পৌঁছবার আগেই বিচার শেষ হয়ে গিয়েছে। বেটী, শাম্মী এবং আর যাদের আগেই গ্রেফতার করা হয়েছিল তাদের প্রত্যেককে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৮৮ ধারা (সরকারী কর্মচারী দ্বারা আইনসঙ্গতভাবে যে আদেশ জারী করা হয়েছে, তা লঙ্ঘনের অপরাধ) অনুসারে ৫০, টাকা জরিমানা, অনাদায়ে এক মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। তারা এখন মালাকা জেলে পরস্পরের সঙ্গসুখ উপভোগ করছে। তাদের জামাকাপড়, খাবার ইত্যাদি পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে। যতদূর জানতে পারলাম, বেটী আর শাম্মীর ভূমিকা এতে এইমাত্র যে তারা সঙ্গীত পরিচালনা করছিল, আর দলের অন্য সকলে রাস্তার উপরে বসে গান গাইছিল।

কমলা ও নান এখনও মুক্ত আছে। তবে আর কতদিন থাকবে, সেটা বলা অসম্ভব। তাদের যা হবার, তা এখন তাড়াতাড়ি হলেই ভাল হয়। সেক্ষেত্রে বাড়ি ইত্যাদি সম্পর্কে কী ব্যবস্থা আমাকে করতে হবে, সেটা আমি বুঝতে পারব। ১২৪ ক ধারা অনুসারে আগামী কাল আবার সুন্দরলালের বিচার হবে। খুব সম্ভব আগামী কাল আরও কিছু লোককে গ্রেফতার করা হবে। এলাহাবাদে এইভাবেই যুদ্ধবিরতি দিবস উদ্‌যাপিত হল।

বল্লভভাই ও মহাদেব দু দিন এখানে ছিল। তার মধ্যে অধিকাংশ সময়ই তাদের শয্যাশায়ী থাকতে হয়েছে। এসে পৌঁছবার খানিক পরেই তারা ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়। আজ তারা বোম্বাইয়ে ফিরে গেল।

আমার অবস্থা এখন ক্রমেই খারাপ হচ্ছে। এখন আর মাঝে-মাঝে থুথুর সঙ্গে রক্ত ওঠার ব্যাপার নয়। গত তিন দিন যাবৎ ক্রমাগত থুথু ফেলতে গিয়ে দেখছি, চাপ চাপ রক্ত উঠে আসছে। এলাহাবাদে যত রকম চিকিৎসা সম্ভব, সবই করে দেখা হয়েছে, কিন্তু তাতে কোনও ফল পাওয়া যায়নি। গতকাল সকালে চূড়ান্তভাবে মনঃস্থির করি যে বেটী আর মদন অটলকে সঙ্গে নিয়ে কলকাতায় যাব। ১৯ তারিখে তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার কথা। তার বদলে ১৫ তারিখে যাতে তোমাকে সাক্ষাৎ করতে দেওয়া হয়, তার জন্য মেজর ওবেরয়ের সঙ্গে ফোনে আমার কথা হয়েছে। এ-বিষয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁকে একটি চিঠিও লিখেছি। দয়া করে তিনি তাতে সম্মত হয়েছেন। সুতরাং ১৫ তারিখে ১০টার সময় আমরা—অর্থাৎ আমাদের যে-কজন তখনও কারাগারের বাইরে থাকবে—তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করব। আমার ইচ্ছে, ১৬ অথবা ১৭ তারিখে কলকাতা রওনা হব। ডাঃ জীবরাজ মেটার কলকাতায় একটা মেডিক্যাল এসোসিয়েশনের সভায় যোগদানের কথা আছে; কলকাতায় তিনি

আমার সঙ্গে দেখা করবেন। বেটীর জায়গায় আর কাউকে নেবার দরকার আছে বলে আমি মনে করিনে। মদন এখনও উত্তর দেয়নি। তবে তার সম্মতি যদি পাই, তাহলে আর অন্য-কোনও সঙ্গীর প্রয়োজন হবে না। ইতিমধ্যে কমলাকে যদি গ্রেফতার করা হয়, তাহলে আমার ইচ্ছে ইন্দুকেও আমার সঙ্গে নিয়ে যাব। নয়ত কমলা আব বেটী. এই দুজনেরই অনুপস্থিতিতে ইন্দু বড় নিঃসঙ্গ বোধ করবে। এ-ব্যবস্থায় তোমার সম্মতি আছে কিনা জানিও, তার কারণ ইন্দুকেও সমুদ্রযাত্রার জন্য তৈরী হতে হবে।

সিঙ্গাপুরে যাবার ব্যবস্থা সম্পর্কে প্রয়োজনীয় সংবাদাদি জানতে চেয়ে ২ তারিখে আমি কলকাতায় টমাস কুককে একখানি চিঠি লিখেছিলাম। গতকাল পর্যন্ত তার কোনও উত্তর না পেয়ে আমি তাদের তার করে জানাই যে অবিলম্বে যেন আমার চিঠির উত্তর দেওয়া হয়। আজ তাদের উত্তর এল। তাতে বলা হয়েছে যে আমার কাছ থেকে কোনও চিঠি তারা পায়নি! চিঠিখানি উপাধ্যায় ট্রেনে পোস্ট করেছিল। আইন ও শৃংখলারক্ষাকারীরা বোধ হয় ভেবেছিলেন যে আমি দেশ থেকে পালাব অথবা গুরুতর কোনও অপরাধ করব; তাই চিঠিখানিকে তাঁরা যথাস্থানে পেঁছতে দেননি। আগামীকাল আবার আমি চিঠি লিখব, তাতে গোয়েন্দা-বিভাগের লোকদের জন্য দু-এক লাইন লেখা থাকবে।

১২ নভেম্বর, ১৯৩০

গতকাল রাত্রে যে আমার চিঠি লেখায় বাধা পড়েছিল, তার কারণ হঠাৎ খবর পেলাম যে কিছু লোক বেটী আর শাম্মীর জরিমানার টাকাটা দিয়ে দেবার মতলব করছে। পরে জানা গেল, ইতিমধ্যেই বেটীর জরিমানার টাকাটা দিয়ে দেওয়া হয়েছে, এবং বেটীকে ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে। খবরটা অত্যন্তই উদ্বেগজনক। সুতরাং সংবাদ-পত্রে প্রকাশের জন্য তৎক্ষণাৎ আমি একটি বিবৃতি পাঠিয়ে দিই। বিবৃতিটা আজ সকালে প্রকাশিত হয়েছে। এই সঙ্গে তার একটা কাটিং তোমাকে পাঠালাম। তবে ক্ষতি যা হবার, তা তার আগেই হয়ে গিয়েছে। গোপী কুঞ্জরু নামে যে একটা মূর্খ আছে, গতকাল মাঝরাতে আমি শুয়ে পড়বার পর সে বেটী আর শাম্মীকে গাড়িতে করে এখানে পেঁছে দিয়ে যায়। মাত্র আজ সকালে আমি সেটা জানতে পারলাম। মেয়েদের কাছে গোপী বলে যে আসলে যে-ব্যক্তি টাকাটা মিটিয়ে দিয়েছে, গোপী তার কৌঁসুলী মাত্র, তার নাম সে প্রকাশ করতে পারবে না। আজ সকালে আমার বিবৃতিটা তারা নিশ্চয়ই পড়েছে, এবং নিজেদের সম্বন্ধে—হয়ত আমার সম্বন্ধেও—তাদের ধারণাও নিশ্চয়ই পরিবর্তিত হয়েছে। অতঃপর আবার কাউকে যখন গ্রেফতার করা হয়, এই বিবৃতিটা তখন কাজে লাগবে আশা করি; অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করে কেউ বোকার মতন আর পরোপকার করতে যাবে না।

বেটী যখন ফিরেই এসেছে, তখন আগের ব্যবস্থাই বহাল রইল; সে আমার সঙ্গে কলকাতা ও সিঙ্গাপুরে যাবে। ইন্দু এখন পড়াশোনায় মন দিয়েছে। সে নিজে যদি আমার সঙ্গে যেতে আগ্রহী না হয়, তাহলে আর তাকে বিরক্ত করবার ইচ্ছে আমার নেই।

হিন্দু পঞ্জিকা অনুযায়ী আগামীকাল তোমার জন্মদিন; আর গ্রীগরিয়ান পঞ্জিকা অনুযায়ী পরশু। আগামীকাল অথবা পরশু তোমার সঙ্গে দেখা করবার জন্য আমাকে বলা হয়েছিল। প্রস্তাবটা অবশ্য আমার মনঃপূত হয়নি, তার কারণ কলকাতায় যাত্রা করবার তারিখের যথাসম্ভব কাছাকাছি একটা দিনে তোমার সঙ্গে আমার দেখা করবার ইচ্ছে। ১৬ তারিখে দেখা করবার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু সে-দিন ত

সারা ভারতে 'জওহর দিবস' উদ্‌যাপিত হবে, মেয়েরাও তাই ব্যস্ত থাকবে। আমার ইচ্ছে ১৭ তারিখে পাঞ্জাব মেলে যাত্রা করব।

কলকাতা থেকে যে-সব বই তুমি আনিয়ে দিতে বলেছিলে, অনেক দিন আগেই তার জন্য ফরমাশ দেওয়া হয়েছে, কিন্তু এখনও সেগুলি পাইনি। চিঠিখানাকে হয়ত আটক করা হয়েছে! আমি এখান থেকে রওনা হবার আগে যদি সেগুলি এসে না পৌঁছয়, তবে সেগুলি যাতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়, তার ব্যবস্থা করব।

সাক্ষাৎমত বিস্তারিত কথা হবে। রঞ্জিতকে ভালবাসা জানাই।

বাবা

সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিবৃতি

কুমারী কৃষ্ণা নেহরু—অজ্ঞাত ব্যক্তি কর্তৃক জরিমানার অর্থ প্রদান?

পণ্ডিত মোতিলাল নেহরুর বিবৃতি

পণ্ডিত মোতিলাল নেহরু এক বিবৃতিতে জানাইতেছেন :

"এইমাত্র জানিতে পারিলাম যে আজ বৈকালে আমার কন্যা কৃষ্ণার আকস্মিক গ্রেফতার ও বিচারের পর তাহাকে যে ৫০, টাকা জরিমানা করা হয়, অজ্ঞাত-পরিচয় এক ব্যক্তি সেই জরিমানার টাকাটা দিয়া দিয়াছেন। খবরটা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে বলিব যে এই ব্যক্তি আমার, আমার কন্যার ও দেশের চরমতম অপকার করিয়াছেন। আমার প্রতি, এবং দেশবাসীর যে যৎসামান্য সেবা আমি করিতে পারিয়াছি তাহার প্রতি দেশবাসীর যদি কিছুমাত্র শ্রদ্ধা থাকে, তাহা হইলে আমি আশা করিব যে এই ব্যক্তিকে আমার ও দেশের চরমতম শত্রু বলিয়া তাঁহারা গণ্য করিবেন, এবং তাঁহার প্রতি দেশবাসীর আচরণও তদনুরূপ হইবে।"

৮১ মোতিলাল নেহরু কর্তৃক সুভাষচন্দ্র বসুকে লিখিত

এলাহাবাদ. ১৪ নভেম্বর, ১৯৩০

প্রিয় সুভাষ,

ডাক ও তার-বিভাগ যেহেতু সমান অনির্ভরযোগ্য, এজন্য বিশেষ প্রতিনিধির হাতে তোমাকে এই চিঠি পাঠাচ্ছি। আমি চূড়ান্তভাবে মনঃস্থির করেছি যে আগামী ১৭ তারিখ সোমবার পাঞ্জাব মেলযোগে আমি কলকাতা রওনা হব। সঙ্গে থাকবে আমার ছোট মেয়ে কৃষ্ণা, সে আমার দেখাশোনা করবে। আর একজন ডাক্তার-বন্ধুও আমার সঙ্গে যাচ্ছেন। আমাকে সমুদ্রপথে সিঙ্গাপুর যেতে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। সার নীলরতন সরকার যদি আমাকে যেতে উপদেশ দেন, তাহলে তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী এই ডাক্তার-বন্ধু আমার চিকিৎসা করবেন।

প্রচুর পরিমাণে আমার রক্ত উঠছে। জন-সংবর্ধনার ধাক্কা আমি বোধ হয় সামলাতে পারব না। তেমন কোনও সংবর্ধনার ব্যবস্থা যাতে না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রেখ। মাত্রই জনকয়েক ব্যক্তিগত বন্ধু—তাঁদের সংখ্যাও যেন ছয়ের বেশী না হয়—যেন স্টেশনে এসে আমার সঙ্গে দেখা করেন।

একই কারণে কর্মীদের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা অথবা পরামর্শ আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তবে প্রয়োজন হলে তাঁদের মধ্যে যাঁরা একটু অগ্রগণ্য, তাঁদের দু-একজনের সঙ্গে কথা বলতে পারলে আমি সুখীই হব।

সার নীলরতন সরকারের—দরকার হলে অন্য কোনও চিকিৎসককেও তিনি ডাকাতে পারেন—ব্যবস্থা অনুযায়ী চিকিৎসা করবার জন্য আমাকে বোধ হয় সপ্তাহখানেক কলকাতায় থাকতে হবে। এ কটা দিন স্বভাবতই আমি একটু নিরিবিলি জায়গায়

থাকতে চাই। আমার সঙ্গীদের থাকার জন্য তুমি কি একটা সুব্যবস্থা করে দেবে? আমি নিজে কোনও ব্যবস্থা করিনি।

তোমাদের
মোতিলাল নেহরু

শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু,
১ উডবার্ন পার্ক, কলকাতা

৮২ মোতিলাল নেহরু কর্তৃক লিখিত

এলাহাবাদ, ২০ জানুয়ারি, ১৯৩১

প্রিয় জওহর,

এই সঙ্গে কমলার যে চিঠিখানি পাঠাচ্ছি, সেটি গতকাল সন্ধ্যায় পেয়েছি। আজ সকালেই এ-চিঠি তোমাকে পাঠান উচিত ছিল। কিন্তু আমাদের চিঠি তখনও লেখা হয়ে ওঠেনি। অন্যান্য সূত্রে খবর পেয়েছিলাম, কমলাকে খুবই যত্নে রাখা হয়েছে; কমলার নিজের চিঠি পড়েও সেটা জানা গেল। রাজ খুবই চেষ্টা করছে। লখনউতে আমাদের প্রথম সাক্ষাৎকার হবে ২৫ তারিখে। এত দেরি করা হল কেন, জানি না। আশঙ্কা করি, তার সঙ্গে সাক্ষাতের আনন্দ থেকে নিজেকে বঞ্চিত করতে বাধ্য হব। তার কারণ, ২৪ তারিখে এখান থেকে এতটা যাবার সামর্থ্য যে আমার থাকবে এমন মনে করি না। তোমার মা বেটী ও ইন্দু যাবে।

আমার অবস্থা মোটামুটি সন্তোষজনকই ছিল। গতকাল আবার হঠাৎ বাড়াবাড়ি হয়। সারারাত দু চোখের পাতা এক করতে পারিনি। টেম্পারেচারও স্বাভাবিকের চাইতে একটু বৃদ্ধি পায়। রক্তও বড় সামান্য ওঠেনি। ফলত আজ সারাদিন বড় অবসন্ন বোধ করছি। তবে আশা করি, আজকের রাত্রিটা একটু ভাল যাবে। এর মধ্যে সন্তোষজনক কথা এই যে আমার ওজন ঠিক আছে। আজ ওজন নিয়ে দেখা গেল ১১৯ পাউন্ড।

কবিরাজ বাবু দিন দুয়েকের জন্য বারাণসী গিয়েছেন। আগামী কাল সন্ধ্যায় তিনি ফিরবেন; ভবিষ্যতে আমার কী চিকিৎসা হবে, তখনই সেটা স্থির করা হবে। কে যে অতঃপর আমার চিকিৎসা করবেন, তা আমি জানি না। কবিরাজ বাবুর বিধানের উপরেই সেটা অনেকাংশে নির্ভর করবে।

দিনের মধ্যে বেশির ভাগ সময় তিনি আমাকে নদীর উপরে থাকতে নির্দেশ দিয়েছেন। শুধু রাত্তিরে বাড়িতে এসে ঘুমোতে হবে। মালব্যজী আমার জন্য বারাণসী থেকে একটা হাউস-বোট পাঠিয়ে দেবার চেষ্টা করছেন।

ইন্দু বেশ সুখেই আছে। পুরনো যে কাঠের ঘরটায় আগে হরিণ থাকত, ইন্দু সেটাকে সারিয়ে নিয়ে এখন মোটামুটি একটা গ্রীষ্মকালীন গৃহে পরিণত করেছে। দিনের মধ্যভাগে বেটী আর সে এখন খানিকটা সময় সেখানে গিয়ে কাটায়।

তোমার বাগান থেকে ভারী সুন্দর কিছু মটরশুঁটি পেয়েছি। আমি সেগুলিকে যত্ন করে রেখে দিয়েছি। এখনও সেগুলি কিছুমাত্র বিবর্ণ হয়নি।

তোমাদের দুজনকে আমার ভালবাসা জানাই।

বাবা

৮৩ রবার্ট ও. মেনেল কর্তৃক লিখিত

ওডেন ল, কেনলি, সারে,
৯ ফেব্রুয়ারি, ১৯৩১

প্রিয় বন্ধু,

বিগত সপ্তাহান্তে আপনার কথা আমি এতই ভেবেছি যে আমার মনে হল, একটা

চিঠি আমাকে লিখতেই হবে। আপনি আমাকে চেনেন না, কিন্তু আদালতে আপনি যে বিবৃতি দিয়েছিলেন, তা আমি পড়েছি, এবং আপনার প্রতি আমার হৃদয়ে গভীর শ্রদ্ধা ও অনুরাগের সৃষ্টি হয়েছে।

আপনার গভীর বিয়োগ-ব্যথায় আমি আপনাকে আমার প্রগাঢ় সহানুভূতির কথা জানাতে চাই। বড়ই আশা করেছিলাম যে আপনার বাবা তাঁর জীবদ্দশায় একটা প্রকৃত পরিবর্তন দেখে যাবেন; দেখে যাবেন যে ভারতবর্ষ সত্যিই স্বাধীন হয়েছে। এখনকার জনমতের যে মস্ত একটা পরিবর্তন হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু ক্ষমতা ছেড়ে দেবার ব্যাপারে অনিচ্ছার ভাবটা এখনও আছে।

আগামী কয়েক দিন, সপ্তাহ এবং মাসে যে কী ঘটবে, এখনই তা অবশ্য কারও পক্ষে বলা সম্ভব নয়, তবে এ-আশ্বাস আপনাকে আমি দিতে পারি যে এমন অনেক লোক এখানে আছেন, ভারতবাসীদের সম্পর্কে আস্থা ও অনুরাগসূচক নব-চেতনার প্রসারকল্পে যাঁরা নিজ-নিজ প্রভাব ও আত্মিক শক্তির প্রতিটি বিন্দুকে কাজে লাগাচ্ছেন। আপনি যতখানি ধারণা করতে পারেন, এমন লোকের সংখ্যা তার চাইতে বেশী।

সম্মেলনে যে-সমস্ত নীতি সম্পর্কে মতৈক্য হয়েছে, তাতে যে প্রকৃত প্রগতিই সূচিত হয়, তাতে সন্দেহ নেই। ভারতবাসীদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হলে সেটা একটা উল্লেখযোগ্য কাজ হবে। অতঃপর পুঁজিবাদী আর-একটা আমলাতন্ত্র যাতে গদিতে চেপে না বসে, জনসাধারণের সমর্থনপুষ্ট সরকারই যাতে গঠিত হয়, তার ব্যবস্থা করা আপনাদের পক্ষে সহজতর হবে।

আপনার স্থির সাহস এবং স্বেচ্ছাসেবকদের একনিষ্ঠ আত্মত্যাগে আমার যে কতখানি গর্ব ও আনন্দ হয়েছে, আপনাকে বলতে পারব না। যুদ্ধের মত ন্যক্কারজনক একটা ব্যাপারের সঙ্গে কোনপ্রকার সম্পর্ক রাখতে অস্বীকার করায় যুদ্ধকালে সামরিক আদালতে পাঁচবার আমার বিচার হয়। ২৭ মাসের জন্য আমাকে তখন কারারুদ্ধ করে রাখা হয়েছিল। সুতরাং আপনাদের কথা আমি বুঝতে পারব বলেই আমার মনে হয়। আরও অনেক কথা আমার লিখতে ইচ্ছে করছে, কিন্তু জানি যে পড়বার মত সময় আপনার হবে না। জন-স্বার্থের কথা বিবেচনা করে বিদেশী বস্ত্র আমদানি এবং মদ্য ও অন্যান্য মাদক দ্রব্য বিক্রয়ের পরিমাণ হ্রাসের ব্যাপারে সরকার একটা উদার দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করবেন, এই আমার ঐকান্তিক আশা। মাদক দ্রব্যাদি জনসাধারণের জীবনকে ধ্বংস করে দেয়।

এই সঙ্গে টাইমস্ পত্রিকার কয়েকটি কাটিং পাঠালাম। মনে হয় আরও অনেকে এইসব কাটিং আপনাকে পাঠাবেন। তবু, না-ও পাঠাতে পারেন, এই কথা ভেবে এগুলি আপনাকে পাঠাচ্ছি। আপনার বিয়োগ-ব্যথায় আমার প্রগাঢ় সহানুভূতি, এবং যে মর্যাদাময় মনোভাব আপনি অবলম্বন করেছেন তার জন্য আমার কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা গ্রহণ করুন।

ভবদীয়

পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু — রবার্ট ও. মেনেল

৮৪ রোজার বলডুইন কর্তৃক লিখিত

১৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯৩১

প্রিয় জওহরলাল নেহরু,

সেদিন তোমার কাছে চিঠি লিখবার পর তোমার পিতার মৃত্যু-সংবাদ চোখে পড়ল। আমাদের পত্রপত্রিকায় শোকাবহ এই সংবাদটিকে ব্যাপকভাবে প্রকাশ করা

হয়েছে। তোমাকে ও তোমার পরিবারবর্গকে আমার গভীর সহানুভূতি, এবং তাঁর ব্যক্তিগত ও জন-জীবনের অমূল্য গুণাবলী সম্পর্কে আমার অন্তহীন শ্রদ্ধার কথা জানাই। তাঁর সঙ্গে দেখা করে এবং তারপর থেকে তাঁর অবিচলিত ও আপোষহীন আদর্শনিষ্ঠার কথা পাঠ করে আমি অনুপ্রাণিত হয়েছিলাম। বহু দিক থেকেই তুমি ভাগ্যবান ব্যক্তি। তোমার পিতৃভাগ্যও তার মধ্যে সামান্য নয়!

চিরানুরক্ত
রোজার বলডুইন

৮৫ রোজার বলডুইন কর্তৃক লিখিত

১০০ ফিফ্‌থ অ্যাভেনু,
নিউ ইয়র্ক সিটি,
২৯ এপ্রিল, ১৯৩১

প্রিয় জওহরলাল,

তোমার কাছে এই চিঠি লিখবার আগে দীর্ঘকাল আমি ইতস্তত করেছি। তার কারণ, পত্রপত্রিকায় আনুপূর্ব এবং সুসঙ্গত সংবাদাদি প্রকাশিত হওয়া সত্ত্বেও, ভারতীয় পরিস্থিতিকে বিভ্রান্তিকর বলে আমার মনে হয়েছে। তোমার ও আমার বন্ধুবর্গের সঙ্গে এ নিয়ে আমার আলোচনা হচ্ছে, এবং আমেরিকার সম্পাদকীয় অভিমতের প্রতিও আমি দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছি। আমার মোদ্দা সিদ্ধান্ত এই যে তোমাদের সমগ্র স্বাধীনতা-আন্দোলন এক বিরাট বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে চলেছে। তুমি নিজেও এক সাক্ষাৎকাব প্রসঙ্গে এই রকমের আভাস দিয়েছ, এবং তার বিবরণ এখানে প্রকাশিত হয়েছে। গান্ধী একাই সমগ্র একটা জাতির হয়ে প্রতিনিধিত্ব করছেন; সেই সঙ্গে তাঁর হাতে যে বিপুল ক্ষমতা তুলে দেওয়া হয়েছে এবং তার আপোসকামিতার যে-সব নজির রয়েছে, তাতে এখান থেকে মনে হচ্ছে, প্যারিসে গিয়ে উইলসন যা করেছিলেন গান্ধীর ক্ষেত্রেও ব্যাপারটা সেই রকমই দাঁড়াবে। তিনি যতই না কেন অবিচল মানুষ হন, বিপদের এই ঝুঁকিটা বড় মারাত্মক হয়ে দাঁড়াতে পারে। যে আদর্শের জন্য তোমরা সবাই সংগ্রাম করে এসেছ, তার বিপর্যয়ের আশঙ্কা এর মধ্যে নিহিত রয়েছে। তা ছাড়া আরও বিপদের কথা এই যে অতিশয় অসৎ উদ্দেশ্যকেও ইংরেজরা বেশ সাধু ভাষার আবরণে মুড়ে রাখতে পারে; সব চাইতে সদিচ্ছাপরায়ণ ও সাহসী মানুষকেও তারা মিষ্টিকথায় ভুলিয়ে দেয়; তাঁর উপরে জোর খাটায়, তাঁকে প্রতারিত করে। শক্তি ছাড়া অন্য আর কোনও-কিছুর কাছেই যে ইংরেজরা নতিস্বীকার করে তাদের সাম্রাজ্য ছেড়ে দেবে, এমন কথা আমি কল্পনা করতে পারি না। তোমাদের অহিংস বিপ্লবের মধ্যেও শক্তি আছে। যা তোমাদের পূর্ণ লক্ষ্য, তার কমে কিছুই যে তোমরা গ্রহণ করবে না, এই সংকল্পে অবিচল থেকে যদি তোমরা অনলসভাবে চেষ্টা করে যাও, একমাত্র তাহলেই অভীষ্ট সিদ্ধ হবে।

এত কথা বললাম এই কারণে যে বামপন্থীদের একটা ব্যাপক মনোভাব এর মধ্যে ব্যক্ত হয়েছে। নিজেদের সম্পত্তি বাঁচাবার জন্য ভারতবর্ষের বুর্জোয়া-শ্রেণী ব্রিটিশ শক্তির কাছে আত্মবিক্রয় করেছে বলে কমিউনিস্টরা সমগ্র আন্দোলনটির যে সমালোচনা করে থাকে, সে-সমালোচনায় এই বামপন্থীদের বিশ্বাস নেই। কিন্তু এ-কথা ত তুমি স্বীকার করবে যে চাষী ও মজুরদের শোষণ যদি অব্যাহত থাকে, স্বাধীনতার তাহলে কোনও অর্থ থাকে না। নতুন প্রভুরা সমাজ-বিপ্লবের পথটাকে আরও প্রশস্ত করে দেন, এইমাত্র। এবং রাজনৈতিক বিপ্লবের সঙ্গে-সঙ্গেই আসতে পারে ভূমি ও শিল্প সংস্কারের সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা। এ-বিষয়ে তোমার মনোভাব আমি জানি।

যে-মনোভাব আমি এখানে প্রকাশ করলাম, আমেরিকায় তার সামান্যই সমর্থন বর্তমান। সমস্ত সংবাদপত্র—এমন কি স্বাধীনতার সমর্থক উদারনৈতিক পত্রিকা-গুলিও—একবাক্যে মিঃ গান্ধীকে সমর্থন করছে। এই অবিশ্বাস্য সন্ধির বিরুদ্ধে একটি কথাও তারা বলেনি। ভারতবর্ষের ভাগ্যকে একটিমাত্র লোকের হাতে সমর্পণ করবার যে বিপজ্জনক পরিকল্পনা করা হয়েছে, তার বিরুদ্ধেও না। কিন্তু এর বিপরীত মনোভাবকে যদি আমরা খাড়া করে তুলতে পারি, তাহলে তার সপক্ষেও কিছু সমর্থন আমরা পেতে পারব। মিঃ গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার জন্য রেজমীকে আমরা লন্ডনে পাঠাতে ইচ্ছুক; সেই সঙ্গে লেবার পার্টিতে আমাদের যে-সব বন্ধু আছেন, তাঁদের কাছে আমরা অজস্র চিঠি আর টেলিগ্রাম পাঠাবার ব্যবস্থা করতে চাই। তাতে ভারতবর্ষের পুরো দাবি মেনে নেবার জন্য তাঁদের কাছে দাবি জানান হবে। গান্ধী যদি অবিচল থাকেন, আর দেশ থেকে তুমি যদি তাঁর উপরে ভালভাবে চাপ দেবার ব্যবস্থা কর, তাহলে আমরাও এখান থেকে শক্ত মতন চাপ দেবার ব্যবস্থা করতে পারি। এ-ব্যাপারে তোমাদের সমর্থনের উপরে আমরা আস্থা রাখতে পারি কিনা, এবং আমরা যা করছি তা তোমাদের ও অন্যান্য বামপন্থীদের মনঃপূত কিনা, তা জানিয়ে কি তুমি আমাকে একটা তার করবে?

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসকে সমর্থন করবার অপরাধে সম্প্রতি আমাকে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী লীগ থেকে বহিষ্কৃত করা হয়েছে। উত্তম, তাতে কিছু আসে যায় না। কিন্তু কংগ্রেস যেন আপোসবিহীনভাবে তার সাম্রাজ্যবাদবিরোধী মনোভাবকে বজায় রাখে। সাম্রাজ্যবাদীদের দ্বারা কবলিত প্রাচ্য ভূখণ্ডের সর্বত্রই অনুরূপ বিদ্রোহ তাতে উৎসাহ লাভ করবে।

শুভেচ্ছা জানাই।

রোজার বলডুইন

৮৬ ই. স্টগডন কর্তৃক লিখিত

দি ভিকারেজ, হ্যারো,
৩১ মে, ১৯৩১

প্রিয় নেহরু,

১৯০৬ সনে নেহরু নামে যে সুন্দর ছেলেটি হ্যারোতে হেডমাস্টারের বাড়িতে থাকত, সে কি তুমিই? তা যদি হয়, তাহলে তোমার পিতার মৃত্যুতে সহানুভূতি জানিয়ে আমি তোমাকে চিঠি লিখতে চাই। পিতৃবিয়োগ বড় শোকাবহ। আমার বাবাও হ্যারোতে শিক্ষকতা করতেন। তিনি ছিলেন তীক্ষ্ণবুদ্ধি মানুষ। ৮০ বছর বয়সে তিনি মারা যান। তাতে আমি যে শোক পেয়েছিলাম, এখনও তা কাটিয়ে উঠতে পারিনি। আমার একমাত্র সান্ত্বনা এই যে গভীরভাবে তাঁকে আমি জানতাম, ভালবাসতাম। তাই, এক হিসেবে এখনও তিনি আমার সঙ্গে-সঙ্গে আছেন বলে আমার মনে হয়।

তুমি যদি কখনও ইংল্যান্ডে আস, তাহলে নিশ্চয়ই আমার সঙ্গে এসে দেখা করবে। পুরনো বন্ধুবান্ধবদের সম্পর্কে তখন অনেক গল্প করা যাবে। হ্যারোতে আমি ভারী সুখে ছিলাম। ইস্কুল ছেড়ে এখন আমি ধর্মযাজক হয়েছি; এই ছোট্ট শহরের মানুষরা যাতে সৎপথে থাকে, তার জন্য চেষ্টা করছি।

শুভেচ্ছা জানাই।

তোমাদের
ই. স্টগডন

৮৭ মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক লিখিত

বর্সাদ, ২৮ জুন, ১৯৩১

প্রিয় জওহরলাল,

তোমার চিঠি ও পোস্টকার্ড পেয়েছি। রায় বেরিলিতে ১৪৪ ধারা অনুযায়ী যে আদেশ জারী করা হয়েছিল, তা প্রত্যাহার করা হয়েছে জেনে সুখী হলাম। চীফ সেক্রেটারিকে তুমি যে স্পষ্ট চিঠি লিখেছিলে, তার জন্যই যে এটা হল, তাতে সন্দেহ নেই। ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে যোগদানের জন্য তুমি যখন বোম্বাইয়ে এসে পৌঁছবে, কমিটির ততদিনে স্পষ্ট নির্দেশদানে প্রস্তুত হওয়া উচিত।

আমাদের ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ করে তুলবার উদ্দেশ্যে, গভর্ণর যাতে তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন তার জন্য তোমার গভর্ণরকে অনুরোধ জানাবার প্রয়োজন হবে। এ-বিষয়ে আমি সম্পূর্ণই নিশ্চিত। সাক্ষাৎকারের জন্য অনুরোধ জানাবার কারণ হিসেবে তুমি তাঁকে বলবে, প্রদেশের সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষের সম্মুখে ব্যাপারটা যাতে পরিষ্কারভাবে উপস্থাপিত হয়, তার জন্য তুমি চেষ্টার কোনও ত্রুটি রাখতে চাও না। গভর্ণরের কাছ থেকে তোমাকে হয়ত খালি হাতেই ফিরে আসতে হবে; কিন্তু তুমি যে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের এবং মীমাংসার সর্তপূরণের প্রয়াস পেয়েছিলে, আমাদের শক্তি তাতে দৃঢ়তর হবে। পক্ষান্তরে, তুমি যদি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের প্রস্তাব কর, এবং সে-প্রস্তাব যদি তিনি গ্রহণ করেন, তাতে আমাদের কিছুমাত্র লোকসান নেই।

উনাও জেলার ঘটনাবলী সম্পর্কে ইয়াং ইণ্ডিয়ায় আমি যা লিখেছি, তা তুমি দেখে থাকবে। তোমার এবং অন্যান্যদের কাছ থেকে যে-সমস্ত তথ্য পেয়েছি, তা নিয়ে আবার আমি লিখব।

ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক যে স্থগিত রাখতে হল, এটা দুর্ভাগ্যের ব্যাপার। এলাহাবাদের অবস্থা এখন যে-রকম, তাতে বল্লভভাই সেখানে যাবার সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন। আমারও মনে হয়, যুক্তপ্রদেশে এখন কানপুরের ঘটনা এবং অন্যান্য ব্যাপার নিয়ে যে উত্তেজনা চলছে, তাতে আপাতত এলাহাবাদে না গিয়ে ভালই হল।

বাপু

পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু
আনন্দ ভবন,
এলাহাবাদ

৮৮ মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক লিখিত

বর্সাদ, ১ জুলাই, ১৯৩১

প্রিয় জওহরলাল,

তোমার ২৭ জুন তারিখের চিঠি পেলাম। চিঠিখানাকে বর্দোলি থেকে ঠিকানা পালটে এখানে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। আমি যে বোম্বাই থেকে আবার বর্সাদে ফিরে আসি, তা বোধ হয় তুমি জানতে না। এখানে ফিরে আসবার কারণ এই যে আমাদের কাজকর্মকে এখন বল্লভভাই ও আমার মধ্যে ভাগ করে নেবার প্রয়োজন হয়েছে। সারাক্ষণ উপস্থিত থেকে এবং সতর্ক নজর রেখে বিপদ এড়ান হচ্ছে। তবু যে-কোনও দিন বর্সাদে একটা বিস্ফোরণ ঘটে যেতে পারে। মীমাংসার কাজ বড় কঠিন; দক্ষিণ আফ্রিকায় থাকতে এ-বিষয়ে আমার অভিজ্ঞতা হয়েছে। আমাদের পক্ষের পুরো শক্তির পরিচয় দিতে গিয়ে আমার মাথা ভাঙল; তারপর সরকারকে যখন আপন শক্তির মোটামুটি পরিচয় দিতে বাধ্য করলাম, তখন আমাকে গ্রেফতার করা হল। ভেবেছিলাম মীমাংসার কার্য সম্পর্কে সমস্ত কথাই আমি বিস্মৃত হয়েছি। কিন্তু

এখন দেখছি তা নয়। পুরনো সব কথা আবার মনে পড়ছে; পুরনো অনেক অভিজ্ঞতারও আবার পুনরাবৃত্তি ঘটছে। আমার বড় সন্তোষ অবশ্য এই যে সংগ্রামই চলুক আর শান্তিই প্রতিষ্ঠিত হক, আমরা যদি একনিষ্ঠভাবে কাজ করে যাই, দেশ তাহলে এগিয়ে যাবেই।

চীফ সেক্রেটারিকে লিখিত তোমার সবগুলি চিঠিই আমার ভাল লেগেছে। খুবই আশা করছি, গভর্ণর তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে সম্মত হবেন।

তোমার সম্পর্কে একটা অভিযোগ আছে। এই সঙ্গে সেটা পাঠালাম। টাইপ-করা কাগজখানি তুমি রেখে দিও। তুমি যদি এ-বিষয়ে কিছু লেখ, তখন এটি আমাকে ফেরত দিও অথবা তোমার সঙ্গে করে নিয়ে এস। আমাদের যখন দেখা হবে, তখন এ-বিষয়ে সব কিছু তুমি আমাকে বলবে।

বাপু

৮৯ সরোজিনী নাইডু কর্তৃক লিখিত

দি গোল্ডেন থ্রেশোল্ড,
হায়দরাবাদ-ডেকান,
৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৩১

প্রিয় জওহর,

চূড়ান্ত তালিকাটা এই সঙ্গে পাঠালাম। শ্রীমেননের তালিকাটি দেখে আমি সত্যই বিস্মিত হয়েছিলাম, সে-কথা স্বীকার করছি। তাঁর তালিকাটি নিতান্তই অসম্পূর্ণ। তবে আমি ভেবেছিলাম যে অনেকে হয়ত বিদায় নিয়েছেন, আর নয়ত পাওনা মিটিয়ে দেননি বলে তাঁদের ভোটের অধিকার নেই। এ-তালিকাটি নির্ভর-যোগ্য। আরও চারটে নাম দিতে পারলে ভাল হত, কিন্তু তা সম্ভব নয়।

তোমার ভাষা-বিষয়ক পুস্তিকাটিতে যে কাজ হয়েছে তা খুবই বিস্ময়জনক। যাঁরা অতিশয় ক্ষুব্ধ ছিলেন, তাঁদের মধ্যেও এটি প্রভূত সন্তোষের সৃষ্টি করেছে। উর্দু সাহিত্য-মহলে বুড়ো মৌলবী আবুল হকের মতামতের মূল্য বড় কম নয়। তাঁকে আমি এই পুস্তিকাটির একটি কপি পাঠিয়েছিলাম। তার পরেই তিনি রাজেনবাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। সাক্ষাতের পর খুবই সন্তুষ্ট চিত্তে তিনি ফিরেছেন। অপর সমস্যাটির মীমাংসার ব্যাপারেও তোমার এই পুস্তিকাটি যথেষ্টই সহায়ক হয়েছে, সেটিও এবারে তাড়াতাড়িই ঘটবে। আমাকে কি এই পুস্তিকার আরও বার কপি পাঠান সম্ভব হবে? (তোমার অফিস যদি টাকা রোজগার করতে চায় এবং ভি. পি. তে পাঠাতে বলে, তবে তা-ই পাঠিও।) পাঞ্জাবে এবং অন্যান্য জায়গায় এ-বিষয়ে যে-সব লোকের সঙ্গে আমার আলোচনা হয়েছে, তাঁদের কাছে কয়েক কপি আমি পাঠাতে চাই।

আমার ব্যথা আবার ভীষণ বেড়েছে। তাই সোফায় বসতে চললাম। ব্যথায় আমার পা প্রায় পঙ্গু হয়ে গিয়েছে। এমনই অদ্ভুত ব্যথা যে কেউ যে এর কোনও বিহিত করতে পারবে তাও মনে হয় না।

বিবি খুব ভাল নেই। তবে এই ভাল-না থাকাটা সাময়িক ব্যাপার। আবহাওয়াই এর জন্য দায়ী। এই স্যাঁতসেতে আবহাওয়া এবং অতিরিক্ত পরিশ্রমের ফলেই এমনটা হয়েছে। ইন্দুর কাছে শিগগিরই চিঠি লিখব।

ভালবাসা জানাই।

সরোজিনী

পুনশ্চ: সি এল. ইউ-য়ের জন্য আরও অল্প-কিছু টাকা আমার কাছে আছে।

[সি. এল. ইউ. বলতে সিভিল লিবার্টিজ ইউনিয়নকে বোঝান হয়েছে। আমার উদ্যোগে এই প্রতিষ্ঠানটির কাজ শুরু হয়। সরোজিনী নাইডু এর প্রেসিডেন্ট ছিলেন।]

৯০ রোজার বলড্বইন কর্তৃক লিখিত

২৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৩১

প্রিয় জওহরলাল,

দয়া করে তুমি জেনেভায় আমাকে যে তার করেছিলে, তার জন্য এখনও বোধ হয় তোমাকে ধন্যবাদ জানাইনি। ট্রেনটিকে ধরবার জন্য তোমার পরামর্শমত আমি প্যারিসে যাই। আমার উদ্দেশ্য ছিল বুলোনে যাওয়া। তার কারণ এখনও আমি ব্রিটিশদের বিষ-নজরে আছি, এবং ইংল্যান্ডে গিয়ে গান্ধীর সঙ্গে দেখা করা তাই আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। আমার ভাগ্য ভাল, স্টেশন-প্ল্যাটফর্মে মিসেস নাইডু আমাকে দেখে চিনতে পারেন এবং আমাকে তাঁর কামরায় নিয়ে যান। অন্যথায় এ-ট্রেনে ওঠা আমার সম্ভব হত না; কেন না শুধুমাত্র জাহাজের যাত্রীদের জন্যই এ-ট্রেন সংরক্ষিত থাকে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে একটা ভাল মতন আন্দোলন শুরু করবার প্রয়োজন যে এখন কতখানি, যাঁরা সেখানে উপস্থিত ছিলেন তাঁদের সবাইকেই তা আমি বলেছি। আন্দোলনের প্রয়োজন এখন আরও বেশী এইজন্যে যে ব্রেটেনের ভার এখন ওয়াল স্ট্রীটের ব্যাঙ্কারদের হাতে এবং ম্যাকডোনাল্ড এখন টোরি বনে গিয়েছেন। সম্মেলন যদি ব্যর্থ হয়, তাহলে যখন ব্যর্থ হবে, মিসেস এন.কে তখন পাঠিয়ে দেওয়া হবে এই সম্মতি পাওয়া গিয়েছে। গান্ধীর মধ্যে আপোসের যতখানি ইচ্ছে আছে, তার বেশী যদি না থাকে, তাহলে সম্মেলন ব্যর্থ হবে বলেই আমি মনে করি। বলা দরকার যে দলের মনোভাব আমার ঠিক ভাল লাগেনি। এঁদের উদ্দেশ্যটা সুনির্দিষ্ট নয়, যথেষ্ট ঐক্য অথবা সংকল্পের দৃঢ়তাও এঁদের নেই। তা ছাড়া গান্ধীর উপরে এঁরা এত বেশী নির্ভরশীল যে তাতে বিপদ ঘটতে পারে! গান্ধীকে কী কী করতে বলে দেওয়া হয়েছে তা আমি জানি। তাঁর মানসিক দৃঢ়তা ও বুদ্ধিমত্তার প্রতিও আমি শ্রদ্ধাশীল। কিন্তু তবু!

যা-ই হক, একমাত্র স্বাধীনতার সারবস্তুই যে গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে, এবং তার অর্থ যে সৈন্যবাহিনী, অর্থনীতি ও বৈদেশিক সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণের অধিকার, এই কথা ধরে নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এখন আমাকে কী করতে হবে, তা আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছি; আপোসের ব্যাপার নিয়ে দুশ্চিন্তা না করে সেই কাজই আমি করে যাব। গান্ধী তাঁর দাবি সম্পর্কে স্পষ্টত এই মনোভাবই আমার কাছে ব্যক্ত করেছেন। তিনি চান যে আমাদের কাজ আমরা চালিয়ে যাব। চার্লি অ্যান্ড্রুজেরও এই একই মনোভাব। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ব্যাঙ্কারদের কারণে ব্রিটেনের পরিবর্তিত অবস্থার তাৎপর্য যে কতখানি এবং ভারতবর্ষের রাজনৈতিক বিপ্লবের পিছনে যে কী কী অর্থনৈতিক প্রশ্ন বর্তমান, দেখে বিস্মিত হলাম যে দলের মধ্যে একমাত্র তিনিই সেটা সব চাইতে বেশী বুঝতে পেরেছেন।

বর্তমান আন্দোলনের বুর্জোয়া প্রকৃতি সম্পর্কে কমিউনিস্টরা যা বলছে, আশা করি সেটা ভ্রমাত্মক। তবে এ-কথা আমি জানি যে জমির মালিক ও শিল্পপতিরা এই আন্দোলনকে কতখানি নিয়ন্ত্রিত করছে, যথাসময়ে সেটা প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত এই আন্দোলনের প্রকৃত তাৎপর্য বুঝতে পারা যাবে না। অবশ্য আমরা যারা

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আছি, ভারতবর্ষে সমাজ-বিপ্লব সম্পর্কে প্রকাশ্যে তাদের পক্ষে কিছু বলা সম্ভব নয়। আমরা শুধু "১৭৭৬ সনের মনোভাব"এর সমর্থক। তবে ব্যক্তিগতভাবে গোপনে তোমাকে জানাই, সমাজ-বিপ্লবই হল সমগ্র বিষয়টির প্রাণ-কেন্দ্রস্বরূপ! ধনও এই কথাই মনে করে।

তোমার তারবার্তার জন্য আবার তোমাকে ধন্যবাদ জানাই। সেই সঙ্গে আশ্বাস দিচ্ছি, এক-সকালের আলোচনায় যেটুকু করা সম্ভব তা করা হয়েছে, এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যা-কিছু করা সম্ভব তা করা হবে।

তোমাকে ও তোমার পরিবারবর্গকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই।

রোজার বলডুইন

৯১ মেরি খান সাহেব কর্তৃক লিখিত

[ডঃ খান সাহেব ছিলেন উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের প্রখ্যাত জননায়ক ও খান আব্দুল গফফর খানের ভাই। মেরি খান সাহেব তাঁর স্ত্রী। ইনি ছিলেন ইংরেজ মহিলা।]

৩ মিচনি রোড, পেশোয়ার,
১ অক্টোবর, ১৯৩১

প্রিয় জওহরলাল,

সত্যি মনে হচ্ছে যে তোমার কাছে আমার একটা চিঠি লেখা উচিত। চিঠি লেখার ব্যাপারে খান অতি কুড়ে মানুষ। নেহাতই চিঠি লেখে না বলে অনেক ভাল লোকের সঙ্গে তার যোগাযোগ নষ্ট হয়েছে। একটু বসে যে একখানা চিঠি লিখবে, এমন ক্ষমতাই যেন তার নেই। আসলে অবশ্য বাড়িতে সে থাকে না বললেই হয়; সেই ভোরবেলা বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়, আর অনেক-রাতে ফিরে আসে। এত পরিশ্রান্ত হয়ে ফেরে যে অন্য-কাজ দূরে থাক, একটু গল্প করবার ক্ষমতাও তার থাকে না। প্রায়ই অবশ্য বলে যে তোমার কাছে চিঠি লিখবে; কিন্তু ঐ পর্যন্তই, সংকল্পটা তার বেশী আর এগোয় না। তোমার অনেকগুলি চিঠি তার কেসের মধ্যে রয়েছে। ১৯২১ সনেরও একখানা চিঠি রয়েছে তার মধ্যে। চলন্ত ট্রেনে বসে এই চিঠি তুমি লিখেছিলে। যেই তোমার ফটোখানা এসে পেঁছিল, অমনি সে সবিস্তারে আমাকে বলতে শুরু করল কী কী কথা তোমাকে লিখবে। তা আমি বললাম, বেশ ত, এক্ষুণি বসে লিখতে শুরু করে দাও। তাতে বলল, এক্ষুণি ত হবে না, জরুরী একটা কাজ আছে, এখন বসলে মনোযোগ দিয়ে লেখা যাবে না; আজ বরং তাড়াতাড়ি ফিরে আসব, ফিরে এসে নিশ্চয়ই লিখে ফেলব। কিন্তু লেখা আর হল না। এমন কি, জনও এক বছরের উপর হল একখানা চিঠিতে লিখেছিল: সত্যিই কি উনি আমার বাবা? কই, আমার কাছে ত কখনও উনি চিঠি লেখেন না। আজ সকালে তোমার যে চিঠি এসেছে, সেটি খুলে আমি ওর কাছে পাঠিয়ে দিয়েছি। এ-চিঠির, যাতে উত্তর দেয়, তার জন্য আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করব। তোমাদের ওখানে একদিন দেখা করতে যাব আশা করি। নয়ত তুমিই দেখা করতে আসবে।

তোমার স্ত্রীকে আমার সশ্রদ্ধ শুভেচ্ছা জানাই।

তোমাদের
মেরি খান সাহেব

৯২ মহাদেব দেশাই কর্তৃক লিখিত

৮৮ নাইট্‌স ব্রীজ,
লণ্ডন এস. ডব্লু. ১,
২৩ অক্টোবর, ১৯৩১

প্রিয় জওহরভাই,

বরাবর যা হয়, এবারেও বিমান-ডাকের দিনে অসুবিধেয় পড়ে গিয়েছি। এফ. এস. কমিটির বৈঠকে একটা ছোটখাট বিস্ফোরণ ঘটে গিয়েছিল। তার কারণ বাপু সেখানে অত্যন্তই কড়া এক বক্তৃতা দেন। তাতে তিনি বলেন যে "সম্রাটের অধীনে" এবং এই ধরনের সব কথার পুনরাবৃত্তি শুনে শুনে তাঁর এতে অরুচি ধরে গিয়েছে। অনেক কাল আগেই কংগ্রেস এই ধরনের পথে চিন্তা করা ছেড়ে দিয়েছে, এবং যত তাড়াতাড়ি তাঁরা এখন এ-মনোবৃত্তি পরিত্যাগ করেন, ততই ভাল। বাপুর স্পষ্টোক্তি ও সাহসিকতার জন্য লর্ড স্যাংকি তাঁকে অভিনন্দন জানান। লর্ড স্যাংকি আন্তরিক-ভাবেই অভিনন্দন জানিয়েছেন বলে আমার মনে হয়। তবে আমার ধারণা, ২৭ তারিখের আগে কিছু আশা করা যায় না। মুসলমানদের সঙ্গে আলোচনায় এক অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। তারা যদি বাপুকে না চায়, তাহলে বাপুও আর তাদের দুয়ারে যাবেন না। দত্ত [ডঃ এস. কে.] আমাদের একটা গল্প বললেন। গল্পটা শুনে তুমি নিশ্চয়ই কৌতুক বোধ করবে। জনৈক ইংরেজ বন্ধু—ক্যাম্বেল রোড্‌সএর বাড়িতে সেদিন তাঁরা নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন। সংখ্যালঘুদের প্রশ্ন নিয়ে সেখানে আলোচনা হচ্ছিল। জিন্না তার আগে তিন বোতল শ্যাম্পেন শেষ করেছেন। মিঃ রোড্‌স তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, "একমত হয়ে একটা সমাধান পেশ করে সরকারকে আপনারা নতি স্বীকারে বাধ্য করছেন না কেন? শ্যাম্পেনের সুশীতল (!) প্রভাবে জিন্না তখন বললেন, "ঐখানেই ত আপনারা ভুল করেন। কী কী আমরা পাব, তা না জানা পর্যন্ত কোনও সমাধান সম্পর্কে একমত হওয়া সম্ভব নয়। সরকার আসলে ঘোড়ার সামনে গাড়ি জুতে দিচ্ছেন।" বাপুও ঠিক এই কথাই বলে আসছেন, আর মুসলমানরা তা অস্বীকার করছে! (প্রসঙ্গত, মাদকবর্জনের যারা বিরোধী, এটা তাদের সপক্ষে একটা মস্ত বড় যুক্তি হয়ে দাঁড়াবে।)

লর্ড আরউইন বাপুর সঙ্গে দেখা করেছিলেন। (অথবা বাপুই তাঁর সঙ্গে দেখা করেছিলেন।) বিশেষভাবে বাপুকে তিনি অনুরোধ জানালেন যে তিনি যতক্ষণ না বাপুকে যাবার অনুমতি দিচ্ছেন, ততক্ষণ যেন তিনি যাবার কথা চিন্তা না করেন। তাঁর মতে অবস্থাটা এখনও নৈরাশ্যজনক হয়নি। আর তা যদি হয়েও থাকে, নির্বাচন-পর্ব শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই নৈরাশ্যের ভাবটা কেটে যাবে। তিনি আরও বললেন যে কংগ্রেসের অধিকাংশ দাবিই যে গ্রহণযোগ্য, অন্যদের সেটা বোঝাবার জন্য তিনি অন্তত তাঁর যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন। নির্বাচনে যদি রক্ষণশীল দল জয়লাভ করে (যা কিনা খুবই সম্ভব), আরউইন তাহলে মন্ত্রিত্ব পেতে পারেন। কিন্তু বাপু এইসব সম্ভাবনার উপরে বিন্দুমাত্র নির্ভর করছেন না, এবং স্পষ্টভাবে সর্বত্র তিনি তাঁর মনোভাব ব্যক্ত করে যাচ্ছেন। চ্যাথাম হাউসের সভাটি খুবই সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল। লোথিয়ান যদিও সভাপতিত্ব করলেন, তবু এটি হল রক্ষণশীলদের একটা মস্ত ঘাঁটি। ইউসুফ আলী ও কর্ণেল গিডনি অবশ্য অনেক বাজে কথা বললেন। কিন্তু বাপুর বক্তৃতা খুবই সুন্দর হয়েছিল। অনেকের মনেই তা রেখাপাত করেছে। ঐতিহাসিক জি. পি. গুশকে ত তুমি চেন। তিনি বললেন. চ্যাথাম হাউসে এত বড় সভা অনুষ্ঠিত হতে এর আগে আর তিনি দেখেননি; অনেকের মনেই এই সভা একটা গভীর দাগ কেটেছে। সদানন্দের মাধ্যমে গোটা ব্যাপারটা আমি তার করে জানিয়েছি। তুমি

তা নিশ্চয়ই দেখেছ। চ্যাথাম হাউসের নামোল্লেখ আমি করতে পারিনি। তার কারণ সেখানে যা-কিছু হয়, তাকে গোপনীয় বলে গণ্য করা হয়ে থাকে।

বিশপ আর আর্চবিশপদের সঙ্গেও বাপু অনেক সময় কাটাচ্ছেন! তুমি যে এতে কী মনে করবে, তাই ভাবছি। তবে এতে যে তাঁদের সত্যিকারের শিক্ষা হচ্ছে, তাতে আমার সন্দেহ নেই। শিক্ষাটা তাঁদের ভালও লাগছে নিশ্চয়ই। দু পক্ষেরই সম্মান যাতে অক্ষুণ্ণ থাকে এমনভাবে ভারতবর্ষের সঙ্গে একটা মীমাংসা করে নেবার জন্য পার্লামেণ্টকে (নাকি মন্ত্রিসভাকে? আমার ঠিক স্মরণ নেই।) অনুরোধ জানিয়ে একটা দরখাস্ত পেশ করবার কথা এখানে বিশেষভাবে ভেবে দেখা হচ্ছে। অন্যান্যদের সঙ্গে দুই আর্চবিশপও এতে স্বাক্ষর করবেন।

বাপু তোমার টেলিগ্রামটি হোরের কাছে পাঠিয়ে দেন। হোর এখনও তার উত্তর দেননি। ম্যাকডোনাল্ডকে লিখিত পত্র ও তাঁর উত্তরের অনুলিপি তোমার কাছে পাঠাতে ভুলে গিয়েছি। তাতে অবশ্য বিশেষ কিছু ছিল না, তবু তার অনুলিপি করিয়ে নিয়ে এই সঙ্গে তোমাকে পাঠাতে চেষ্টা করব। ভূপালের ঠিকানায় বাপু সেদিন শুয়াইবকে একটি চিঠি লিখেছেন। কেন্দ্রীয় আর্থিক ব্যবস্থা সম্পর্কে যে-সমস্ত নীতির ভিত্তিতে দেশীয় রাজ্যগুলির একমত হওয়া উচিত, চিঠিতে তার একটা আভাস তিনি দিয়েছেন। দু দিন এ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে, কিন্তু তাতে কোনও ফল পাওয়া যায়নি। “প্রাইভেট থিয়েটার”এ একটা অভিনয় দেখলাম। শুনে স্তম্ভিত হচ্ছ? আসলে প্রাইভেট থিয়েটার যে কী বস্তু, তা আমি জানতাম না। লাইসেন্স ছাড়াই অভিনয় হল। তাতে অবশ্য আমি কিছুই মনে করতাম না, কিন্তু সবগুলি দৃশ্যই (গোটা দশেক) দেখা গেল শয়নকক্ষের দৃশ্য, এবং একঘেয়ে রকমের কুরুচিপূর্ণ! তবে স্বীকার করতেই হবে যে প্রয়োগ-পদ্ধতি একেবারে নিখুঁত! “ব্যারেট্‌স অব উইমপোল স্ট্রীট” বইটি আমার ভাল লেগেছে। সত্য ঘটনা অবলম্বনে রচিত এই নাটকটির কথা আগেই তোমাকে লিখেছি। নাটকটির কাহিনী ও প্রয়োগ-পদ্ধতি খুবই সুন্দর। অভিনয়, মঞ্চ-বিন্যাস, সমস্ত কিছুর মধ্যেই একটি সূক্ষ্ম পবিত্রতার স্পর্শ রয়েছে। ‘পবিত্র’ কথাটা আমি ইচ্ছে করেই ব্যবহার করলাম। “প্রাইভেট থিয়েটার” যে পবিত্র হতে পারে, এমন কথা আমি ভাবতে পারি। সুতরাং আবার আমি “ব্যারেট্‌স” নাটকের অভিনয় দেখতে গিয়েছি! এই সঙ্গে যে কাটিং তোমাকে পাঠাচ্ছি, তা পড়ে তুমি খুবই কৌতুক বোধ করবে। দরিদ্র জাতির যিনি প্রতিনিধি, তাঁর সেক্রেটারিরা এখন এই কাজই করছে!

আজ রাত্রে আমরা ইটনে যাচ্ছি। সেখান থেকে যাব অক্সফোর্ডে। এই সফরের জন্য আমি উদ্‌গ্রীব হয়ে আছি।

স্নেহানুসক্ত

মহাদেব

হ্যাঁ, সপ্রু কোম্পানির সম্পর্কে একটা রসালো খবর দিচ্ছি। বাপুজীর কাছে তিনি জানতে চান—ভারুচার মতই—বাপুজী যে সৈন্যবাহিনীর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতার কথা বলেন, এর দ্বারা কী তিনি চাইছেন! “মহাত্মাজী, গৃহযুদ্ধ যদি বাধে ত আপনি বলবেন, এতে আর কী হয়েছে, একটু না হয় রক্তপাতই আমাদের হবে। কিন্তু গৃহযুদ্ধ আমি সহ্য করতে পারি না। আমার সেক্ষেত্রে সৈন্যবাহিনীকে, ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীকে, ডেকে পাঠাবারই প্রয়োজন হবে!”

আনসারীকে তুমি এর একটা অনুলিপি পাঠিয়ে দেবে? তাঁর কাছ থেকে সুন্দর একটি চিঠি পেয়েছি। তাঁকে জানিও যে তাঁর চিঠি আমার হস্তগত হয়েছে, এবং আমার ইচ্ছে এই যে তুমি আর আনসারী দুজনেই এই চিঠিখানি পড়।

ম. দে.

৯৩ মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক লিখিত

২৮ ডিসেম্বর, ১৯৩১

প্রিয় জওহর,

ইন্দু তোমার চিঠিখানি আমাকে দিয়েছে। কী জানি কেন, তোমাকে গ্রেফতার করায় আমি বিস্মিত হইনি। কমলার কাছে এখনও আমি যেতে পারিনি। আজ রাত্রে হয়ত যাব। তা যদি না হয় ত কাল নিশ্চয়ই যাব। শুনে সুখী হবে যে ইন্দুকে লিখিত তোমার দ্বিতীয় পত্রগুচ্ছও আমি পড়েছি। এ-বিষয়ে আমার কিছু পরামর্শ আছে। আগে আমাদের চলাফেরার স্বাধীনতাটা চাই, তখন সে-সব কথা বলা যাবে।

ইতিমধ্যে তোমাকে ও শেরওয়ানীকে ভালবাসা জানাই।

বাপু

৯৪ মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক লিখিত

২৯ জানুয়ারি, ১৯৩২

প্রিয় জওহর,

তোমার চিঠি পেয়ে আনন্দিত হয়েছি। আমরা যারা বাইরে পড়ে আছি, তাদের ঈর্ষা করবার কোনও কারণই তোমার নেই। বরং যা-কিছু গৌরব তা তুমি পেয়েছ, আর আমরা যারা বাইরে আছি তারা দিনগত পাপক্ষয় করে চলেছি; এই কারণে আমরাই বরং তোমাকে ঈর্ষা করি। কিন্তু আমরাও প্রতিশোধ নেবার চক্রান্ত করছি। আশা করি কিছু-কিছু কাগজ তোমাকে পড়তে দেওয়া হয়। যা-কিছুই আমি করি না কেন, তাতে সব সময়েই তুমি আমার মনশ্চক্ষুর সামনে উপস্থিত রয়েছ।

সেদিন কমলার সঙ্গে দেখা করলাম। তার এখন বেশ-কিছুদিনের জন্য বিশ্রাম নেওয়ার একান্ত প্রয়োজন। আর-একবার তার সঙ্গে দেখা করতে চেষ্টা করব। তখন তাকে বুঝিয়ে বলব যে যতক্ষণ পর্যন্ত না সে আবার সম্পূর্ণ সেরে উঠছে, ততক্ষণ পর্যন্ত যেন নিজের ঘর ছেড়ে সে কোথাও না যায়। ডঃ মামুদ সম্পর্কে যে ব্যবস্থা করা হয়েছে, আশা করি তা তুমি অনুমোদন করবে।

আনন্দ ভবন সম্পর্কে ধার্য যে-টাকাটা দিয়ে দেবার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে, তা যে দিয়ে দেওয়া উচিত, তাতে আমার কোনও সন্দেহ নেই।

তোমাদের দুজনকে ভালবাসা জানাই।

বাপু

ঈশ্বর ও সরকার যদি বাধা না দেন, তাহলে কাল আমি আশ্রমে যাব। দু-তিন দিনের মধ্যেই আবার ফিরে আসব।

৯৫ দেরাদুন ডিস্ট্রিক্ট জেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে লিখিত

[জেলের একটি ঘটনা সম্পর্কে এই চিঠিগুলি লিখিত হয়। অপমানজনক অথবা অন্যভাবে অন্যায় মনে না হলে কারাবাসকালে কারাগারের নিয়ম-কানুন মেনে চলাই আমাদের নীতি। তৎসত্ত্বেও মাঝে-মাঝে অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটত। একবারের কথা বলছি। আমি তখন নৈনি সেণ্ট্রাল জেলে। সেই সময় প্রতিবাদ হিসেবে আমরা কেউ কেউ পুরো তিন দিন (বাহাত্তর ঘণ্টা) অনশন করেছিলাম। সাধারণত কারাবাসকালে আমাদের সাক্ষাতাদি করতে দেওয়া হত। এক সময়ে তিন মাসে একবার সাক্ষাৎ করতে দেবার ব্যবস্থা ছিল। পরে ব্যবস্থা হয় মাসে একবার সাক্ষাৎকারের। এই চিঠিগুলি যখন লেখা হয়,

তখন আমাকে প্রতি পক্ষকালে একবার সাক্ষাৎ করতে দেওয়া হত। আমি তখন দেরাদুন ডিস্ট্রিক্ট জেলে আছি। তাই আমার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য আমার মা ও স্ত্রীকে এলাহাবাদ থেকে অনেকটা পথ আসতে হত। দেরাদুনে এসে পৌঁছবার পর তাঁদের বলা হল, আমার সঙ্গে তাঁদের দেখা করতে দেওয়া হবে না। এই ঘটনার ফলে কয়েক মাসের জন্য আমি দেখাসাক্ষাৎ করা সম্পূর্ণ বন্ধ রাখি। আমার জন্য এই সময় এক রকম নির্জন কারাবাসের ব্যবস্থা করা হয়েছিল, কোনও সঙ্গীই আমার ছিল না।]

ডিস্ট্রিক্ট জেল, দেরাদুন,
২২ জুন, ১৯৩২

দি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট,
ডিস্ট্রিক্ট জেল, দেরাদুন

প্রিয় মহাশয়,

আজ আপনি আমাকে জানিয়েছেন, ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে আপনি এই নির্দেশ পেয়েছেন যে আমার স্ত্রী ও মার সঙ্গে এক মাস কালের জন্য যেন আমাকে সাক্ষাৎ করতে দেওয়া না হয়। কারাগারের নিয়ম ও বিধিতে এই রকম ব্যবস্থা আছে জানি যে উক্ত নিয়মাবলীকে কোন প্রকারে লঙ্ঘন করা হলে তার শাস্তি হিসেবে দেখা সাক্ষাৎ বন্ধ করে দেওয়া হয়ে থাকে। কী ধরণের অপরাধের জন্য আমাকে শাস্তি দেওয়া হল, স্থানীয় শাসন-কর্তৃপক্ষ, অথবা ইন্সপেক্টর-জেনারেল, অথবা যিনিই আপনাকে নির্দেশ দিয়ে থাকুন না কেন, তাঁর কাছ থেকে সেটা যদি জেনে নেন, তা হলে বাধিত হব। আমাকে কোনও কিছু না জানিয়ে যে স্থানীয় শাসন-কর্তৃপক্ষ এই নির্দেশ দিয়েছেন, এটা নিতান্তই অসৌজন্যের কাজ হয়েছে। সুরুচি ও যৌক্তিকতার সীমা যতক্ষণ না লঙ্ঘিত হচ্ছে, ততক্ষণ কারাগারের নিয়মাবলী ও বিধিসমূহকে মান্য করে চলাই আমাদের নীতি। কিন্তু সরকারের কাজের ধরনে যদি সৌজন্য ও সুরুচির অভাব ঘটে, তা হলে বর্তমান মনোভাব বজায় রাখা আমাদের পক্ষে কঠিন হয়ে পড়তে পারে।

এক মাস কালের জন্য আমার সমস্ত দেখা-সাক্ষাৎই বন্ধ করে দেওয়া হল, না কি শুধু আমার স্ত্রী ও মার সঙ্গে আমাকে দেখা করতে দেওয়া হবে না, তা আমার কাছে স্পষ্ট নয়। সে যা-ই হক, এ-প্রশ্ন অবান্তর। অন্যান্যদের সঙ্গে যদি আমাকে দেখা করতে দেওয়া হয়ও, তবু সে-রকম কোনও সাক্ষাতের সুবিধা আমি চাই না।

আপনি জানেন, শুধু আমার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্যই আমার মা ও স্ত্রী দেরাদুনে এসেছেন এবং পরবর্তী সাক্ষাৎ-দিবসের জন্য এখানে অপেক্ষা করছেন। এখন আপনি নতুন যে নির্দেশ পেয়েছেন তার ফলে তাঁদের পরিকল্পনা সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হবে, এবং এখানে তাঁদের অবস্থানও এতে ব্যর্থ হল। তবে সরকারকে ত নীতিঘটিত নানা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে ব্যস্ত থাকতে হয়, তাই সৌজন্য ও সুরুচির সাধারণ নিয়মগুলি নিয়ে বোধ হয় তাঁদের বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা নেই। ভবদীয়

জওহরলাল নেহরু

যুক্তপ্রদেশের কারাসমূহের অস্থায়ী ইন্সপেক্টর-জেনারেল
লেফটেন্যাণ্ট কর্ণেল জি হলরয়েব, আই. এম, এস.
কর্তৃক দেরাদুন ডিস্ট্রিক্ট জেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে লিখিত

লখনউ, ৮ জুলাই, ১৯৩২

বিষয়: 'ক' শ্রেণীর দণ্ডিত অপরাধী পণ্ডিত জোহর লাল নেহরুর দরখাস্ত। দরখাস্তের পিছনে তাঁহার মন্তব্য নং ৮১৮|৪৬, তাং ২৩. ৬. ৩২।

দরখাস্তকারীকে জানান যাইতে পারে যে ১৯৩২ সনের ২৭ মে তারিখে তাঁহার মাতা, পত্নী ও কন্যা এলাহাবাদ ডিস্ট্রিক্ট জেলে মিঃ আর. এস. পণ্ডিতের সহিত সাক্ষাৎ করেন।

তাঁহার স্ত্রী মিঃ আর. এস. পণ্ডিতের হাতে একখানি চিঠি দেন। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের অনুমতি ব্যতিরেকে কারাধ্যক্ষ ইহা করিতে দিতে সম্মত হন না। তাহাতে তাঁহার মা কারাধ্যক্ষের প্রতি অপমানজনক ভাষা ব্যবহার করেন ও ঔদ্ধত্যের পরিচয় দেন।

এই সমস্ত কারণে সরকার আদেশ দিয়াছেন যে মিসেস জোহর লাল নেহরু ও মিসেস মোতিলাল নেহরুকে এক মাসের জন্য দরখাস্তকারীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে দেওয়া হইবে না।

(স্বাঃ)..............
লেফটেন্যান্ট কর্ণেল, আই. এম. এস.
যুক্তপ্রদেশের কারাসমূহের অস্থায়ী ইন্সপেক্টর জেনারেল

৯৬ দেরাদুন ডিস্ট্রিক্ট জেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে লিখিত

দেরাদুন জেল,
১১ জুলাই, ১৯৩২

দি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, ডিস্ট্রিক্ট জেল,
দেরাদুন

প্রিয় মহাশয়,

আমার ২২ জুন তারিখের পত্রের উত্তরে কারাবিভাগীয় ইন্সপেক্টর জেনারেল যা লিখেছেন, অনুগ্রহপূর্বক আজ তা আপনি আমাকে দেখিয়েছেন। তাতে আমাকে জানান হয়েছে যে ২৭ মে তারিখে এলাহাবাদ ডিস্ট্রিক্ট জেলে শ্রী আর. এস. পণ্ডিতের সঙ্গে সাক্ষাৎকালে আমার স্ত্রী শ্রীপণ্ডিতের হাতে একখানি চিঠি দেন, এবং কারাধ্যক্ষ তাতে আপত্তি করলে আমার মা "কারাধ্যক্ষের প্রতি অপমানজনক ভাষা ব্যবহার করেন ও ঔদ্ধত্যের পরিচয় দেন।"

ঘটনার এই বিবরণ যেহেতু অসত্য ও প্রকৃত তথ্যের এতে যেহেতু বিকৃতি ঘটান হয়েছে, এবং সরকার কর্তৃক অবলম্বিত ব্যবস্থার ফলে যেহেতু ব্যাপকতর প্রাশ্নাদির উদ্ভব ঘটেছে, এ-কারণে সংশ্লিষ্ট ব্যাপার সম্পর্কে পুনর্বার আমি আপনাকে চিঠি লিখছি। আপনি এই চিঠিখানিকে সরকারের কাছে পাঠিয়ে দিলে বাধিত হব।

শ্রীপণ্ডিতের তিনটি কন্যা আছে। তাদের বয়স তিন, পাঁচ ও আট বছর। পুনার একটি স্কুলে তারা পড়ে। ২৭ মে তারিখে শ্রীপণ্ডিতের সঙ্গে সাক্ষাৎকালে তাদের খবর তাঁকে দেওয়া হয়। খবরটা ছিল স্কুল থেকে প্রাপ্ত একটি চিঠিতে বা রিপোর্টে। আমার মেয়েও এই একই স্কুলে পড়ে। এলাহাবাদে সে তার ছুটি কাটাতে এসেছিল। এই চিঠি বা রিপোর্টখানি আমার মেয়ের কাছে ছিল। শ্রীপণ্ডিতকে সে এটি পড়ে শোনায়, এবং পরে শ্রীপণ্ডিতের হাতে সে এটি তুলে দেয়, তিনি নিজে যাতে পড়ে দেখতে পারেন। কারাধ্যক্ষ তাতে আপত্তি করেন। সকলের প্রতিই, বিশেষত শ্রীপণ্ডিতের প্রতি, তাঁর আচরণ ছিল অসম্মানসূচক। শ্রীপণ্ডিতকে তিনি অপমান করেন। তা ছাড়া আমার মা ও স্ত্রীর প্রতিও তিনি রূঢ় আচরণ করেন। বলতে গেলে আমার মা তাঁর সঙ্গে কোনও কথাই বলেননি।

তার তিন দিন পরে, ৩০ মে তারিখে, বেরিলি ডিস্ট্রিক্ট জেলে, আমার মা, স্ত্রী

ও কন্যার সঙ্গে আমার পাক্ষিক সাক্ষাৎকার হয়। সেই সময় এই ঘটনার কথা আমি জানতে পারি। কেউ যে আমার মায়ের সঙ্গে এত অভদ্র ব্যবহার করতে পারে, এ-কথা জেনে আমি বিস্মিত হই, এবং আমি আশা করি যে যা ঘটেছে জেল-কর্মচারীরা তার জন্য দুঃখপ্রকাশ করবেন। তার পরিবর্তে এখন দেখতে পাচ্ছি, সরকার আমার মা ও স্ত্রীকে শাস্তিদানের সিদ্ধান্ত করেছেন। কারাধ্যক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত বিবৃতির উপরে নির্ভর করেই এই সিদ্ধান্ত করা হয়েছে বলে আমার মনে হয়। আমি যতদূর জানি, আসলে কী হয়েছিল, তা জানবার জন্য আমার মা অথবা আমার স্ত্রীকে কোনও প্রশ্ন করা হয়নি। সত্য ঘটনা জানবার জন্য আর-কোনও তদন্ত অথবা চেষ্টা না করেই বিনা দ্বিধায় সরকার আমার মা ও স্ত্রীকে অপমান করেছেন, এবং এমনভাবে এটা করেছেন, সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষেরই যাতে চূড়ান্ত অসুবিধা হয়।

কারাবিধি অনুসারে, কাউকে তাঁর ছেলেমেয়ে সম্পর্কে স্কুলের একটা রিপোর্ট দেখানও হয়ত অপরাধ। বড় রকমের অপরাধ যদি নাও নয়, নতুন কোনও অর্ডিন্যান্সের বলে অনায়াসেই এটাকে একটা বড় অপরাধে পরিণত করা যেতে পারে। সুতরাং সরকার যদি এটাকেও দণ্ডনীয় অপরাধ বলে গণ্য করেন, তাতে আমার অভিযোগ নেই। এক মাস অথবা এক বছরের জন্যও যদি আমার দেখা সাক্ষাৎ বন্ধ করে দেওয়া হয়, তাতেও আমি আপত্তি জানাব না। স্বাস্থ্যোদ্ধার মানসে অথবা আমোদ-আহ্লাদ করবার জন্য আমি কারাবরণ করিনি।

কিন্তু এমন কিছু বিষয় আছে, যা আমি নিঃশব্দে মেনে নিতে পারি না। আমার মায়ের প্রতি বিন্দুমাত্র রূঢ় আচরণ অথবা অপমান সহ্য করতে আমি প্রস্তুত নই। সরকারের কাছ থেকে যে-কোনও অবস্থায় যে সৌজন্য আমি প্রত্যাশা করি, আমার মায়ের প্রতি তা তাঁরা দেখাননি, এটা লক্ষ্য করে আমি অতিশয় দুঃখিত হয়েছি। আমার মা "কারাধ্যক্ষের প্রতি অপমানজনক ভাষা ব্যবহার করেন ও ঔদ্ধত্যের পরিচয় দেন", ইন্সপেক্টর-জেনারেলের এই কথার থেকেই বোঝা যায় যে মানুষটির বিন্দুমাত্র মাত্রাবোধ নেই, ভারতীয় সমাজ সম্পর্কে কিছুই তিনি জানেন না, এবং তাঁরা ভাষাজ্ঞানও প্রখর নয়।

সরকার যে ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন, এবং যেভাবে অবলম্বন করেছেন, তাতে স্পষ্টই বোঝা যায় যে কারাগারে এসে যাঁরা আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চান, সরকারী কর্মচারীদের দ্বারা অথবা স্বয়ং সরকারের দ্বারা সব সময়েই তাঁদের অপমানিত হবার সম্ভাবনা রয়েছে। আমার মা এবং স্ত্রীর আবারও যাতে অপমান ঘটতে পারে, এমন সামান্যতম ঝুঁকিও নিতে আমি প্রস্তুত নই। এমতাবস্থায় আমার সামনে একটিমাত্র পথই খোলা রয়েছে; তা হল এই যে মর্যাদার সঙ্গেই দেখা সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হতে পারবে, এবং আমার সঙ্গে যাঁরা সাক্ষাৎ করতে আসবেন তাঁদের প্রতি অসৌজন্য ঘটবার কোনও আশঙ্কা নেই, যতক্ষণ পর্যন্ত না এ-কথা আমি মনে করতে পারছি, ততক্ষণ পর্যন্ত সমস্ত দেখা সাক্ষাৎ আমি বন্ধ রাখব। এ-কারণে আমার স্বজনবর্গকে আমি জানিয়ে দিচ্ছি, ভবিষ্যতে তাঁরা যেন আর কষ্টস্বীকার করে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে না আসেন। শাস্তির এই মাসটা উত্তীর্ণ হয়ে যাবার পরেও না।

অস্থায়ী ইন্সপেক্টর জেনারেল যদি ভবিষ্যতে একটু কষ্টস্বীকার করে আমার নামের বানানটাকে শুদ্ধভাবে লেখেন তাহলে সুখী হব।

আপনার বিশ্বস্ত
জওহরলাল নেহরু

৯৭ মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক লিখিত

যারবেদা সেণ্ট্রাল প্রিজ্‌ন,
পুনা,
৩১ ডিসেম্বর, ১৯৩২

প্রিয় জওহরলাল,

অস্পৃশ্যতা সম্পর্কে স্বরূপ তার প্রস্তাব নিয়ে আলোচনার জন্য সেদিন এখানে এসেছিল। সে বলল, তুমি তাকে সিংহলে গিয়ে বিশ্রাম নিতে বলেছ। আমার মনে হয় তার দরকার হবে না। কিছু কাজ করবার মত ক্ষমতা তার আছে; অস্পৃশ্যতার ব্যাপারে কিছু কাজ করতে সে বেশ ইচ্ছুকও। আমার মনে হয়, যতদিন সে কাজ করতে চায়, ততদিন তাকে কাজ করতে দেওয়া উচিত।

তার কাছে শুনলাম, তোমার আরও কয়েকটা দাঁত পড়ে গিয়েছে, আর এদিকে তারও চুল পাকছে। কিন্তু প্রত্যক্ষদর্শীদের কাছে শুনছি, অন্য দিক থেকে তোমার স্বাস্থ্য ভালই আছে। মনে হয়, এখনও তুমি দর্শনার্থীদের ফিরিয়ে দিচ্ছ। যদি সম্ভব হয়, তাঁদের সঙ্গে দেখা করলেই আমি সুখী হব। এতে তাঁরা সন্তোষলাভ করবেন।

আমাদের সংখ্যা এখন চারে এসে দাঁড়িয়েছে; চারজনে বেশ সুখেই আছি। ছগনলাল যোশী এসে আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন। হরিজনদের কাজে তুমি মন দিচ্ছ কি না জানি না। শাস্ত্রীদের সঙ্গে আমার সময় বেশ ভালই কাটছে। তাতে করে শাস্ত্র সম্পর্কে আমার জ্ঞানবৃদ্ধি হয়েছে বটে, কিন্তু সত্যধর্ম সম্পর্কে আমাকে বিশেষ কিছু দেবার তাঁদের নেই।

আমাদের সকলের ভালবাসা জেন।

বাপু

৯৮ মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক লিখিত

যারবেদা সেণ্ট্রাল প্রিজ্‌ন,
পুনা,
১৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৩

প্রিয় জওহরলাল,

তোমার চমৎকার চিঠির উত্তরে সুন্দর একখানি চিঠি লিখব ভেবেছিলাম। এতদিন আর তাই তোমাকে চিঠি লিখিনি। কিন্তু আর না-লেখা সম্ভব নয়। প্রতিদিনই কাজ বাড়ছে। সুতরাং এখনই আমাকে লিখতে হবে। যতটুকু ভাল করে লিখতে পারি, তা-ই লিখব। হরিজনএর মত নির্দোষ পত্রিকাও তোমাকে পড়তে দেওয়া হয় কি না, জানি না। তবু এই আশায় এটি পাঠাচ্ছি যে তুমি পাবে। যদি পাও, তাহলে দয়া করে তোমার মতামত জানিও। সনাতনীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম এখন ক্রমেই আরও কৌতূহলোদ্দীপক হয়ে উঠছে, সেই সঙ্গে আরও কঠিন হয়েও দাঁড়াচ্ছে। একটা ভাল কাজ এই হয়েছে যে দীর্ঘকালের আলস্য থেকে তাঁদের জাগিয়ে দিতে পারা গিয়েছে। আমার উদ্দেশে যে-সব কটূক্তি তাঁরা করছেন, তা বেশ উপভোগ্য। পৃথিবীর যা-কিছু অসৎ, যা-কিছু দুর্নীতিগ্রস্ত, আমি নাকি তারই প্রতীক। ঝড় কিন্তু কেটে যাবে। তার কারণ আমার অস্ত্র হল অহিংসা, অপ্রতিশোধ। এই শ্রেষ্ঠ অস্ত্র আমি প্রয়োগ করেছি। কটূক্তিকে আমি যতই উপেক্ষা করি, ততই

তা আরও তীব্র হয়ে ওঠে। কিন্তু মৃত্যুর আগে পতঙ্গ যেমন প্রদীপ ঘিরে নৃত্যে মেতে ওঠে, এও ত আসলে তা-ই। বেচারা রাজাগোপালাচারী আর দেবদাস! তাদেরও রেহাই দেওয়া হয়নি। লক্ষ্মীর সঙ্গে বিবাহের ব্যাপারটাকে খুঁচিয়ে তুলে তাই নিয়ে কুৎসিত সব অভিযোগ রটান হচ্ছে। অস্পৃশ্যতাকে এইভাবেই এঁরা বাঁচিয়ে রাখবেন!

অস্পৃশ্যতার ব্যাপার নিয়ে স্বরূপ আর কৃষ্ণা দিন কয়েক আগে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। পারিবারিক সাক্ষাতের জন্য ইন্দুও এসেছিল। ইন্দুর স্বাস্থ্য দেখলাম খুবই ভাল আছে। বেশ আনন্দে আছে বলেই মনে হল। অস্পৃশ্যতা-বিরোধী কাজ নিয়ে স্বরূপ অল্প কদিনের জন্য কাথিওয়াড় ও গুজরাট সফর করছে, আর ইন্দুর এলাহাবাদে যাবার কথা ছিল। রাজাকে সাহায্য করবার জন্য দেবদাস দিল্লি গিয়েছে। অস্পৃশ্যতাবিরোধী বিলের ব্যাপারে রাজা এখন এম. এল. এ.দের উপর চাপ দিচ্ছে। সারাক্ষণ আমরা এখন অস্পৃশ্যতা-সংক্রান্ত কাজ নিয়ে ব্যস্ত আছি। বাইরে যে-সমস্ত চিঠিপত্র পাঠাচ্ছি, তার সংখ্যা ক্রমেই বাড়ছে। খাম যোগাচ্ছেন সর্দার বল্লভভাই। খবরের কাগজগুলিকে তিনি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়েন; অস্পৃশ্যতা-সংক্রান্ত নানা টুকরো খবর তিনি সেখান থেকে উদ্ধার করেন। তাঁর হাস্য-পরিহাসের ভাণ্ডারও অফুরন্ত, নিত্য যোগান দেবার জন্য যেন হাস্যরসের কারখানা খুলে বসেছেন। তাঁর কাছে পরিদর্শন-দিবস আর অন্যান্য দিনের মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই। কখনও কোনও অনুরোধ তিনি জানান না। আর আমি নিত্যই একটা-না-একটা অনুরোধ জানিয়ে চলেছি। এর মধ্যে কোন্‌টা যে বেশী সুখের, তা আমি জানি না। খুশী মনেই আমার পরাজয়গুলিকে যদি আমি গ্রহণ করতে পারি, তবে কেন আমি তাঁর মত সুখী হতে পারি না?

নির্জনতার মধ্যে তুমি পড়াশুনো নিয়ে ব্যাপৃত আছ, এর জন্য আমরা সকলেই তোমার প্রতি ঈর্ষা বোধ করি। এ-কথা সত্য যে আমাদের উপরে যে বোঝা চেপেছে, আমরাই তার জন্য দায়ী। আরও খাঁটি কথা বলতে গেলে বলতে হয়, আমিই তার জন্য দায়ী। বল্লভভাইয়ের আশা ছিল, সংস্কৃত সাহিত্যে পণ্ডিত হবেন; সে-আশা আমি চূর্ণ করে দিয়েছি। হরিজন-সংক্রান্ত কাজ নিয়ে এত উত্তেজনার মধ্যে তিনি পড়াশুনোয় মনোনিবেশ করতে পারেন না। বাংলাদেশের ফুটবল-খেলোয়াড়রা তাঁদের খেলাকে যেমন ভালবাসেন, এখানকার নিত্যকার রসালো সমালোচনাকেও তিনি তেমনই উপভোগ করেন। মহাদেবকে শওকত যা বলতেন, সে এখনও ঠিক তা-ই আছে—দলের হামাল ছেলে। যে-কাজই তাকে দেওয়া যাক, সে করে দেবে; কোনও কাজই তার অসাধ্য নয়। ছগনলাল যোশী এখনও ঠিক ধাতস্থ হয়ে ওঠেননি। তবে তাঁর উন্নতি হচ্ছে। আমাদের দলটা নেহাত খারাপ হয়নি। খেলার নিয়মকানুন আমরা মেনে চলি, তাই আমাদের মোটামুটি সুখী পরিবার বলা চলে। পরিবারটি বর্ণাশ্রম-অনুশাসনের দ্বারা কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত। একমাত্র ডঃ আম্বেদকর জানেন আর আমি জানি যে এই বর্ণাশ্রম নিয়ে সনাতনীদের মধ্যে শিগগিরই আবার নতুন একটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হবে। তার অর্থ আবার একটা ঝঞ্ঝাটে পড়ব। কিন্তু, বিশ্বাস কর, এ-সব ঝঞ্ঝাট আমি চাইনি। আর যেটুকু জায়গা ও সময় আছে তাতে শুধু এইটুকুই জানাতে পারি যে তোমার সর্বাঙ্গীণ উন্নতি অব্যাহত আছে বলেই আমরা সবাই আশা করছি।

সকলের ভালবাসা জেন।

বাপু

৯৯ মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক লিখিত

যারবেদা সেণ্ট্রাল প্রিজন,
পুনা, ২ মে, ১৯৩৩

প্রিয় জওহরলাল,

আসন্ন অনশনের বিরুদ্ধে আমার মনের মধ্যে যখন সংগ্রাম চলেছে, তোমার কথা তখন ভেবেছি; মনে হচ্ছিল যেন সশরীরে তুমি আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছ। কিন্তু তাতে কোনও ফল হয়নি। এর ঐকান্তিক প্রয়োজনীয়তার কথা তুমি বুঝতে পেরেছ, এটা ভাবতে পারলে বড়ই সুখী হতাম। হরিজন আন্দোলন এতই বৃহৎ ব্যাপার যে শুধু বুদ্ধিগত প্রয়াসে কোনও ফলোদয় হবে না। পৃথিবীতে এর চাইতে খারাপ আর কিছু নেই। অথচ ধর্মকে আমি পরিত্যাগ করতে পারি না। সুতরাং হিন্দুধর্মকেও না। হিন্দুধর্ম যদি আমার আশাপূরণে সমর্থ না হয়, আমার জীবন তাহলে একটা বোঝা হয়ে দাঁড়াবে। খ্রীষ্টধর্ম, ইসলাম এবং আরও অনেক ধর্ম-বিশ্বাসকে আমি হিন্দুধর্মের ভিতর দিয়েই ভালবাসি। হিন্দুধর্ম থেকে বিচ্যুত হলে আর কিছুই আমার থাকে না। কিন্তু অস্পৃশ্যতা অর্থাৎ উচ্চনীচভেদজ্ঞানসহ এ-ধর্ম আমার অসহ্য লাগে। সৌভাগ্যবশত হিন্দুধর্মের মধ্যেই এই পাপের এক অমোঘ প্রতিষেধক রয়েছে। সেই প্রতিষেধক আমি প্রয়োগ করেছি। যদি পার তাহলে একথা বুঝবার চেষ্টা কর যে অনশনের পরে আমি যদি বেঁচে থাকি ত ভাল কথা, আর বাঁচবার প্রয়াস সত্ত্বেও দেহের যদি বিনাশ হয় ত তাতেও ভালই হবে। দেহটা আর কী, ভঙ্গুর দীপাধানের চাইতেও ত এই দেহ বেশী অস্থায়ী। দীপাধানকেও তুমি দশ হাজার বছর ধরে অক্ষত অবস্থায় বাঁচিয়ে রাখতে পার, কিন্তু দেহটাকে হয়ত এক মিনিটের জন্যও অক্ষত অবস্থায় ধরে রাখতে পারবে না। আর তা ছাড়া মৃত্যুতেই ত সকল প্রয়াস শেষ হয়ে যায় না। মৃত্যুকে যদি ঠিকমত গ্রহণ করা যায় ত দেখা যাবে যে সে হয়ত এক মহত্তর প্রয়াসের সূচনা। কিন্তু নিজের থেকে যদি এ-কথা তুমি বুঝতে না পেরে থাক ত যুক্তি দিয়ে তোমাকে বোঝাতে পারব না। আমি জানি যে এতে তোমার অনুমোদন যদি না-ও পেয়ে থাকি, অগ্নি-পরীক্ষার এই দিনগুলিতে তোমার অমূল্য ভালবাসা তবু অক্ষুণ্ণ থাকবে।

তোমার চিঠি আমি পেয়েছি। ভেবেছিলাম যে অবসর মতন তার উত্তর দেব। কিন্তু ঈশ্বরের অভিপ্রায় অন্যরকম! কৃষ্ণার সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। মনে হয় কাথিওয়াড়ে স্বরূপের কাজ সম্পর্কে তোমাকে লিখেছি। কমলা তার ঠিকানাটাও আমাকে পাঠায়নি। অনেক দিন হল তার কোনও চিঠি পাইনি। তার সঙ্গে তোমার যখন দেখা হবে, তখন তাকে আর ইন্দুকে আমার ভালবাসা জানিও। অনশন সম্পর্কে কমলা যেন উদ্বিগ্ন না হয়। সম্ভব হলে আমাকে একটা তার পাঠিও।

সকলের ভালবাসা জানাই।

বাপু

১০০ মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক লিখিত

২২ জুলাই, ১৯৩৩

প্রিয় জওহরলাল,

মাঝে-মাঝে তোমার কাছে চিঠি লিখবার ইচ্ছা হয়েছে, কিন্তু লিখে ওঠা সম্ভব হয়নি। আমার হাতে যে-কাজ এখন রয়েছে, তার চাপ বড় বেশী। নতুন করে যেটুকু শক্তিলাভ করেছি, তাব প্রতিটি বিন্দু এতে নিয়োগ করতে হয়েছে।

মা ও কমলার সঙ্গে দেখা হয়েছিল; সময়টা বেশ আনন্দে কাটল। স্বরূপ ও রঞ্জিতের সঙ্গে বিশেষ দেখা-সাক্ষাৎ হয়নি।

কৃষ্ণার সম্পর্কে মা উদ্বিগ্ন রয়েছেন। কৃষ্ণার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তাঁর সঙ্গে আমার অনেক কথাবার্তা হল। এ-ব্যাপারে তোমার যদি কিছু প্রস্তাব থাকে, আমাকে জানিও। আমার গতিবিধি অবশ্য অনির্দিষ্ট। কিন্তু তাতে কোনও ক্ষতি নেই।

দেবদাস ও লক্ষ্মীকে পুনায় রেখে এসেছি। তাদের এখন এখানে আসবার কথা। দেবদাস আপাতত খুব-সম্ভব দিল্লিতেই থাকবে। মহাদেব, বা ও প্রভাবতী আমার কাছেই আছে। তবে শিগগিরই এরা বিভিন্ন জায়গায় চলে যাবে বলে মনে হয়।

অনশনের আগে আমার যে শক্তি ছিল, তা ফিরে পেতে দেরি হচ্ছে। তবে ধীরে ধীরে আমি উন্নতিলাভ করছি।

ভালবাসা জানাই।

বাপু

১০১ মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক লিখিত

[রাজা হাথী সিংয়ের সঙ্গে আমার কনিষ্ঠা ভগ্নী কৃষ্ণার বিবাহ উপলক্ষে এই চিঠিখানি আমাকে লেখা হয়েছিল।]

১৮ অক্টোবর, ১৯৩৩

প্রিয় জওহরলাল,

বধূ ও বরের জন্য আজ বিশেষভাবে আমি যে সুতো কেটেছি, তাই দিয়ে এ-দুটি মালা তৈরী হয়েছে। আমার আশীর্বাদসহ এ-দুটি পাঠালাম। তুমি কি আমার হয়ে এই মালা দুটি তাদের পরিয়ে দেবে! আশা করি মালা দুটি সময়মত তোমার হাতে পৌঁছবে।

মিসেস হাথীসিং যে এই অনুষ্ঠান অনুমোদন করেননি, তার জন্য আমি দুঃখ-বোধ না করে পারছি না। তবে এ-সব ব্যাপারে আমি বোধ হয় সেকেলে লোক।

দীপক সম্পর্কে তোমার কথা আমি বুঝতে পেরেছি। যথাসম্ভব নম্রভাবে সরলা দেবীকে আমি চিঠি লিখব।

তোমাদের সবাইকে ভালবাসা জানাই।

বাপু

মা যে ঝক্কি সামলাতে পেরেছেন, সব কাজ চুকে যাবার পর এই খবরটা আমাকে তার করে জানিও।

১০২ মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক লিখিত

সেবাগ্রাম, ওয়ার্ধা
১০ আগস্ট ১৯৩৪

প্রিয় জওহরলাল,

বোম্বাইয়ের সভাগুলিতে উপস্থিত থাকবার জন্য খান সাহেবের কাছে সাধারণ বিজ্ঞপ্তি পাঠান হয়েছে। সভায় যোগদানের ইচ্ছে তাঁর নেই, এবং তাঁর উপরে চাপ দেবার ইচ্ছেও আমার নেই। বোম্বাইয়ে বিভিন্ন সভা ও অনুষ্ঠানে তাঁকে যোগ দিতে বলা হবে; সেখানে বক্তৃতা দিতেও তিনি অনুরুদ্ধ হবেন। কিন্তু আমি চাই না যে এখনই এ-কাজ তিনি করুন। বরং আমি চাই যে বছরটা তিনি আমার কাছেই কাটান। তাঁর দৈহিক সামর্থ্য খুব বেশী নয়, অসুস্থতা নিবারণের শক্তিও তাঁর নেই। সুতরাং এই সব ব্যাপারে যোগদান করার দায়িত্ব থেকে তুমি কি দয়া করে তাঁকে অব্যাহতি দেবে?

ভালবাসা জানাই।

[খান সাহেব বলতে এখানে খান আব্দুল গফফর খানকে বোঝান হয়েছে।]

১০৩ মহাত্মা গান্ধীকে লিখিত

[আমার স্ত্রীর গুরুতর অসুস্থতার কারণে কারাগার থেকে অকস্মাৎ আমাকে মুক্তি দেওয়া হয়। এ-মুক্তি সাময়িক; বস্তুত দশ দিনের মধ্যেই আমাকে আবার কারাগারে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। মুক্তিলাভের অব্যবহিত পরেই গান্ধীজীকে আমি এই চিঠি লিখি।]

আনন্দ ভবন, এলাহাবাদ,
১৩ আগস্ট, ১৯৩৪

প্রিয় বাপু,

......ঠিক ছমাস আমি একেবারে সঙ্গচ্যুত অবস্থায় কাটিয়েছি; কাজকর্মও প্রায় কিছুই করিনি। তারপর গত ২৭ ঘণ্টা যে উদ্বেগ, উত্তেজনা ও কর্মচাঞ্চল্যের মধ্যে কাটল, তাতে আমি প্রায় দিশেহারা হয়ে গিয়েছিলাম। সারাটা দিন ভিড় করে লোক এসেছে। যদি সুযোগ পাই, আবার আপনাকে চিঠি লিখব। কিন্তু মাস কয়েকের মধ্যে আর তা আমি পাব কি না, সে-বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। সুতরাং বিগত মাস পাঁচেকের মধ্যে কংগ্রেস গুরুত্বপূর্ণ যে-সব সিদ্ধান্ত করেছে, সে-বিষয়ে আমার মনোভাব আপনাকে সংক্ষেপে এখানে জানাচ্ছি। যে-সব সূত্রে আমি সংবাদ পেয়েছি, স্বভাবতই তা অতি সীমাবদ্ধ। তবু যেটুকু সংবাদ আমি পেয়েছি, ঘটনাবলীর সাধারণ প্রবণতা সম্পর্কে একটা মোটামুটি সঠিক ধারণা করে নেবার পক্ষে তা-ই যথেষ্ট বলে আমার মনে হয়।

আপনি আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহার করেছেন, এই খবর যখন পাই, তখন অসুখী বোধ করেছিলাম। প্রথমে শুধু সংক্ষিপ্ত ঘোষণাটাই আমার কাছে পৌঁছয়। তার অনেক পরে আপনার বিবৃতি আমি পাঠ করি। পাঠ করে যে আঘাত আমি পাই, তত বড় আঘাত আমার জীবনে কমই পেয়েছি। আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহারের ব্যাপারটাকে মেনে নিতে আমি প্রস্তুত ছিলাম। কিন্তু এ-কাজের সপক্ষে যে-সমস্ত কারণ আপনি দেখিয়েছেন, এবং ভবিষ্যতের কাজ সম্পর্কে যে-সমস্ত প্রস্তাব আপনি করেছেন, তাতে আমি স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছি। অকস্মাৎ আমার মনে এই তীব্র অনুভূতির সঞ্চার হল যে আমার মধ্যে কিছু-একটা যেন ভেঙে গিয়েছে; যে-বন্ধনকে আমি অত্যন্তই মূল্যবান বলে মনে করে এসেছি, তা যেন ছিঁড়ে গেল। এই বিরাট বিশ্বে নিজেকে আমার নিতান্ত নিঃসঙ্গ বলে মনে হয়েছিল। শৈশব থেকেই নিজেকে আমার সর্বদা ঈষৎ নিঃসঙ্গ বলে মনে হয়েছে। কিন্তু কয়েকটা বন্ধন আমাকে শক্তি দিয়েছিল, দৃঢ় কিছু সমর্থন পেয়েছি বলেই আমি দাঁড়িয়ে থাকতে পেরেছিলাম। সেই নিঃসঙ্গতার অনুভূতি আমাকে কখনও ছেড়ে যায়নি বটে, কিন্তু তার তীব্রতা কমে এসেছিল। কিন্তু এখন আমার মনে হল, আমি সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ; এক ঊষর নির্জন দ্বীপের উপরে আমি পড়ে রয়েছি।

মানুষের এক বিরাট ক্ষমতা এই যে অবস্থার সঙ্গে নিজেকে সে খাপ খাইয়ে নিতে পারে। নতুন অবস্থার সঙ্গে আমিও তাই নিজেকে কিছুটা পরিমাণে খাপ খাইয়ে নিলাম। এ-ব্যাপারে আমার বেদনা প্রায় শারীরিক বেদনা হয়ে উঠেছিল; কিন্তু বেদনার সেই তীব্রতাও এক সময়ে স্তিমিত হয়ে এল, তার আর তত ধার রইল না। কিন্তু আঘাতের পর আঘাতে, একটার পর একটা ঘটনায় সেই বেদনা আবার ক্ষুরধার হয়ে উঠেছে। আমার মন অথবা অনুভূতির আর কোনও শান্তি অথবা বিশ্রাম রইল না। আবার সেই আত্মিক নিঃসঙ্গতার অনুভূতি আমাকে পেয়ে বসল; মনে হল আমি যেন এক ভিন্ন জগতের মানুষ, কারও সঙ্গেই আমার কোনও মিল নেই; যে জনতা আমার সামনে দিয়ে হেঁটে চলে যাচ্ছে শুধু যে তাদের সঙ্গেই আমার মিল

নেই তা নয়, যাদেব আমি আমার প্রিয় ও ঘনিষ্ঠ বন্ধু বলে গণ্য করে এসেছি, তাদের সঙ্গেও না। *এবারকার কারাবাস কালে আমার স্নায়ুর উপর দিয়ে যতটা যন্ত্রণা গিয়েছে, এর আগে আর কোনও বারেই ততটা যন্ত্রণা আমাকে সহ্য করতে হয়নি।* বারংবার যাতে না আমাকে আঘাত পেতে হয়, তার জন্য সমস্ত সংবাদপত্র আমার সামনে থেকে সরিয়ে নিলেই বোধ হয় আমি খুশী হতাম।

শারীরিক স্বাস্থ্য আমার ভালই ছিল। সেদিক থেকে কারাগারে আমি ভালই থাকি। শরীর নিয়ে কোনও ঝঞ্ঝাট আমাকে কখনও পোহাতে হয়নি। প্রভূত অত্যাচার আর পরিশ্রম সে সইতে পারে। মূর্খ অহংকারে আমার মনে হয়েছে যে ভাগ্যসূত্রে যে-দেশের সঙ্গে আমি বাঁধা পড়েছি, এখনও হয়ত আমার দ্বারা তার সত্যিকারের কিছু কাজ হতে পারে; এ-কথা ভেবেছি বলেই আমার শরীরের আমি যত্ন নিয়েছি।

কিন্তু মাঝে-মাঝেই আমার মনে হত. আমি যেন নিজেকে ঠিক খাপ খাইয়ে নিতে পারছি না; মনে হত, আমি যেন এক দম্ভের বুদ্বুদ, নির্মম এক সমুদ্রের উপরে ইতস্তত আমি ভেসে বেড়াচ্ছি। কিন্তু সেই অহংকার আর দম্ভই জয়ী হল; আমার মধ্যে মননের যে ক্রিয়া চলেছে, পরাজয় স্বীকারে সে সম্মত হয়নি। যে-সব আদর্শ আমাকে কর্মের প্রেরণা দিয়েছে এবং ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ আবহাওয়ার মধ্যেও আমাকে একস্থানে ধরে রেখেছে, সেই সব আদর্শ যদি সত্য হয়—তারা যে সত্য, দিনে দিনে এই প্রত্যয় আমার দৃঢ়ীভূত হয়েছে—তাহলে তাদের জয় অনিবার্য; আমার কালের মানুষের জীবদ্দশায় হয়ত সে-জয় ঘটবে না, কিন্তু একদিন ঘটবেই।

কিন্তু নিজের অসহায়তার জন্য আমি যখন যন্ত্রণাবোধ করেছি, আমি যখন এক নীরব সুদূর দর্শকমাত্র ছিলাম. এই বছরের সেই দীর্ঘ ও পরিশ্রান্ত মাসগুলিতে কী ঘটেছে সেই সব আদর্শের? সমস্ত মহান সংগ্রামেই মাঝে-মাঝে পিছিয়ে যাওয়ার পালা আসে, সাময়িকভাবে পরাজয় স্বীকার করতে হয়; এ খুবই সাধারণ ব্যাপার। তাতে আঘাত পেলেও সে-আঘাত মানুষ আবার দ্রুত সামলে ওঠে। দ্রুত আবার সামলে ওঠে, যদি দেখা যায় যে সেই সব আদর্শের দ্যুতিকে ম্লান হয়ে যেতে দেওয়া হয়নি, নীতির নোঙর শক্ত আছে। কিন্তু আমি যা দেখলাম তা ত পিছিয়ে-যাওয়া কিংবা পরাজয় নয়। তা যে আত্মার পরাজয়। তার চাইতে ভয়াবহ আর কিছুই হতে পারে না। ভাববেন না যে আমি পরিষদে প্রবেশের প্রশ্ন নিয়ে কিছু বলছি। তার উপরে আমি সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করি না। এমন কি, তেমন অবস্থার উদ্ভব হলে আমি নিজেই আইন-সভায় প্রবেশ করব, এ-কথাও আমি কল্পনা করতে পারি। কিন্তু আইন-সভার ভিতরেই আমি কাজ করি, আর বাইরেই কাজ করি, বিপ্লবীর মত কাজই আমি করব। বিপ্লবী বলতে সেই মানুষকেই আমি বোঝাতে চাই, রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে মৌলিক ও বৈপ্লবিক পরিবর্তনের জন্য যিনি কাজ করেন। বিপ্লবীর মত কাজ করতে চাই এইজন্য যে অন্য-কোনও রকমের পরিবর্তনের দ্বারা ভারতবর্ষ ও পৃথিবীতে শান্তি অথবা সন্তোষ আনা যাবে না বলেই আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

এই কথাই আমি ভেবেছি। কিন্তু যে-সব নেতা বাইরে কাজ করছিলেন, স্পষ্টতই তাঁরা এ-কথা ভাবেননি। অসহযোগ ও আইন অমান্যের তীব্র সুরা যখন আমাদের মাথায় আগুন জ্বালিয়ে দেয়নি, সেই বিগত যুগের ভাষায় তাঁরা কথা কইতে শুরু করলেন। কখনও কখনও অবশ্য একই শব্দাবলী ও বাক্যাংশ তাঁরা ব্যবহার করেছেন; কিন্তু সেগুলি আসলে মৃত শব্দ, তার মধ্যে না ছিল প্রাণ, না ছিল তার প্রকৃত কোনও অর্থ। এক কালে যাঁরা আমাদের বাধা দিয়েছেন, পিছনে ধরে

রেখেছেন, সংগ্রাম থেকে যাঁরা দূরে সরে থেকেছেন, এবং এমন-কি আমাদের আত্যন্তি প্রয়োজনের মুহূর্তেও যাঁরা বিপক্ষের সঙ্গে সহযোগিতা করেছেন, তাঁরাই হঠা কংগ্রেসের মান্যগণ্য ব্যক্তি হয়ে দাঁড়ালেন। মুক্তি-মন্দিরের প্রধান পুরোহিতের পদে অধিষ্ঠিত হলেন তাঁরা, এবং সংগ্রামের যন্ত্রণাজ্বালার মধ্যে দাঁড়িয়ে যারা দায়িত্বভার বহন করেছে, সেই বীর সৈনিকদের অনেককেই, এমন কি, মন্দির-প্রাঙ্গণেও প্রবেশ করতে দেওয়া হল না। তাদের অছুৎ করে রাখা হল, তাদের সান্নিধ্যেও কেউ যায় না। যখনই তারা সরব হয়ে উঠে নূতন এই সব প্রধান পুরোহিতের কাজের সমালোচনা করতে গিয়েছে, তখনই তাদের ধমকে থামিয়ে দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে যে তারা বিশ্বাসঘাতক, কেননা এই পবিত্র প্রাঙ্গণের শান্তি তারা নষ্ট করেছে।

আমাদের জাতীয় সংগ্রামের এক গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ে শত্রুপক্ষের নির্দেশে ভারতীয় স্বাধীনতার পতাকাকে প্রকৃতপক্ষে যাঁরা ধূলায় টেনে নামিয়েছিলেন, আনুষ্ঠানিক সমারোহ সহকারে সেই পতাকাকে আবার তাঁদেরই হাতে তুলে দেওয়া হল। তুলে দেওয়া হল তাঁদেরই হাতে, নিজের নিজের বাড়ির ছাত থেকে যাঁরা একদিন চেঁচিয়ে তাঁদের রাজনীতি বর্জনের কথা ঘোষণা করেছিলেন। রাজনীতি সেদিন নিরাপদ ছিল না। নিরাপদ যখন হল, তখনই আবার দেখা গেল যে এক লাফে তাঁরা সামনের সারিতে এসে দাঁড়িয়েছেন।

কংগ্রেস ও জাতির মুখপাত্র হিসেবে যে-সব আদর্শ তাঁরা তুলে ধরলেন, তার সম্পর্কেই বা কী বলা যায়? গোলমেলে অর্থহীন সব কথা তাঁরা বলেছেন, আসলে সমস্যাকে এড়িয়ে গিয়েছেন, এমন কি কংগ্রেসের রাজনৈতিক লক্ষ্যকেও যতখানি টেনে নামাতে সাহস করেছেন ততখানি নামিয়েছেন, প্রতিটি কায়েমী স্বার্থের সপক্ষে সানুরাগে ওকালতি করেছেন, এবং স্বাধীনতার যারা প্রকাশ্য শত্রু তাদের অনেকের কাছেই তাঁরা মাথা নুইয়েছেন। প্রচণ্ড হিংস্রতা ও বীরত্বের পরিচয় দিয়েছেন শুধু তখনই, কংগ্রেসের প্রগতিশীল ও সংগ্রামী কর্মীদের বিরুদ্ধে যখন রুখে দাঁড়াবার প্রয়োজন হয়েছে। বিগত কয়েক বছরে কলকাতা কর্পোরেশনের যে অবস্থা ঘটেছে তা লজ্জাজনক। কংগ্রেসকেও কি অতি দ্রুত কলকাতা কর্পোরেশনেরই এক বৃহৎ সংস্করণে পরিণত করা হচ্ছে না? আমাদের মধ্যে অনেকেই যখন কারারুদ্ধ, আইন অমান্য আন্দোলন যখন ক্রমেই প্রসার লাভ করছে বলে মনে করা হয়েছিল, তখন সোল্লাসে যিনি সরকারী কর্মচারী, স্বরাষ্ট্র-সচিব প্রমুখ ব্যক্তিবর্গকে আপ্যায়ন করতেন, বাংলা-কংগ্রেসের প্রধান অংশটিকে কি আজ সেই "মিঃ নলিনীরঞ্জন সরকারের সমৃদ্ধিসাধক সমিতি" বলে অভিহিত করা যায় না? অপর অংশটিকেও হয়ত অনুরূপ প্রশংসনীয় উদ্দেশ্য নিয়ে গঠিত অনুরূপ আর-একটি সমিতি বলে গণ্য করা যায়? কিন্তু দোষ একা বাংলা দেশের নয়। প্রায় প্রত্যেক জায়গাতেই অনুরূপ দৃষ্টিভঙ্গী বর্তমান। কংগ্রেস আজ সার্বিকভাবে এক ক্ষুদ্রবুদ্ধি প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। সুবিধাবাদের তাই জয়জয়কার।

এ-অবস্থার জন্য ওয়ার্কিং কমিটি প্রত্যক্ষভাবে দায়ী নয়। কিন্তু তৎসত্ত্বেও ওয়ার্কিং কমিটিকেই এর দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। অনুগামীদের কার্যকলাপ কী চেহারা নেবে, নেতৃবৃন্দ ও তাঁদের নীতির দ্বারাই সেটা নির্ধারিত হয়। অনুগামীদের উপর দোষ চাপিয়ে দিলে সেটা ন্যায়সঙ্গত অথবা উচিত-কাজ হয় না। নাচতে না জানলে উঠান বাঁকা বলে যে একটা প্রবাদ আছে, প্রতিটি ভাষাতেই তার সমার্থবাচক একটা-না-একটা প্রবাদ বর্তমান। আমাদের লক্ষ্যের বর্ণনায় ইচ্ছে করেই কমিটি কিছু অস্পষ্টতা রেখেছিলেন। এর ফলে বিশৃঙ্খলা ঘটতে ও প্রতিক্রিয়া-কালে

নৈতিক অবনয়ন ঘটতে বাধ্য। শুধু তা-ই নয়, এর ফলে স্বৈরাচারী নেতা ও প্রতিক্রিয়াশীল দলের উদ্ভব হবে।

কংগ্রেসের নিজস্ব আওতায় যা পড়ে, বিশেষ করে সেই রাজনৈতিক উদ্দেশ্যাবলীর কথাই আমি বলছি। বৃথা অনেক সময় কেটেছে, সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিষয়গুলি নিয়ে কংগ্রেসের এখন পরিষ্কারভাবে চিন্তা করা উচিত বলে আমার মনে হয়। তবে আমি জানি যে এসব বিষয়ে শিক্ষালাভ সময়সাপেক্ষ, এবং কংগ্রেস এখন যতখানি অগ্রসর হলে আমি সুখী হতাম, সামগ্রিকভাবে ততখানি অগ্রসর হওয়া তার পক্ষে এখন সম্ভব না-ও হতে পারে। কিন্তু মনে হচ্ছে যে ওয়ার্কিং কমিটি এ-বিষয়ে কিছু জানুন আর না-ই জানুন, বিশেষভাবে পড়াশোনা করার ফলে এ-বিষয়ে যাঁদের নির্দিষ্ট কিছু মতামত রয়েছে, ওয়ার্কিং কমিটি যেন তাঁদের নিন্দা করতে ও দল থেকে বহিষ্কার করতে খুবই আগ্রহী। এইসব মতামতকে বুঝে দেখবার কোনও চেষ্টাই করা হয় না। অথচ পৃথিবীর যোগ্যতম ও ত্যাগীশ্রেষ্ঠ বহু মানুষই এই সব মতামতের পোষক। এ-সব মতামত সত্য হতে পারে, ভ্রান্তও হতে পারে; কিন্তু এটুকু অন্তত প্রত্যাশা করা যায় যে ধিক্কার দেবার আগে ওয়ার্কিং কমিটি এগুলিকে অন্তত বুঝে দেখবার চেষ্টা করবেন। যুক্তিসিদ্ধ কথার উত্তরে যদি ভাবপ্রবণ সব আবেদন জানান হয়, অথবা এই সস্তা মন্তব্য করা হয় যে ভারতবর্ষের অবস্থা আলাদা, অন্যত্র যে-সব অর্থনৈতিক নিয়ম খাটে, এখানে তা খাটে না, তাহলে সে-উত্তর শোভন হয় না। এ-বিষয়ে ওয়ার্কিং কমিটি যে প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন, সমাজবাদের অ-আ-ক-খ সম্পর্কেও সেখানে জ্ঞানের অভাব এতই বিস্ময়করভাবে প্রকট যে তা পড়ে আমার খুবই কষ্ট হয়েছিল; ভেবে খারাপ লেগেছিল যে ভারতবর্ষের বাইরেও এ-প্রস্তাব পড়া হতে পারে। মনে হয়েছিল, কমিটি এই প্রবল আকাঙ্ক্ষার দ্বারা চালিত হয়েছেন যে প্রয়োজন হলে আবোল-তাবোল বকেও কায়েমী স্বার্থগুলিকে আশ্বাস দান করতে হবে।

ইংরেজী ভাষায় সোশ্যালিজ্‌ম কথাটার সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত একটা অর্থ আছে। কথাটাকে সম্পূর্ণ ভিন্ন অর্থে প্রয়োগ করা হলে সোশ্যালিজ্‌ম সম্পর্কে আলোচনাও অতি অদ্ভুত হয়ে দাঁড়ায়। এক-এক জন মানুষ যদি তাঁর আপন মন-গড়া অর্থে এক-একটা শব্দ ব্যবহার করেন, ভাবের আদানপ্রদানে তাতে সুবিধে হয় না। নিজেকে এঞ্জিন-ড্রাইভার বলে ঘোষণা করবার পর যদি কেউ বলেন যে তাঁর এঞ্জিনটি কাষ্ঠ-নির্মিত এবং বলদবাহিত, তাহলে বুঝতে হবে, এঞ্জিন-ড্রাইভার শব্দটিকে তিনি অপব্যবহার করছেন।

যা ভেবেছিলাম, চিঠিখানি তার চাইতে অনেক বড় হল। রাতও অনেক হয়েছে। আমার মস্তিষ্ক এখন পরিশ্রান্ত, তাই লেখাটা হয়ত বিশৃঙ্খল ও ছাড়া-ছাড়া হয়ে গেল। তা হক, আমার মনোভাবের একটা আভাস এতে পাওয়া যাবে। বিগত কয়েক মাস আমার পক্ষে খুবই বেদনাদায়ক হয়েছে। আরও অনেকের পক্ষে হয়েছে বলে বিশ্বাস করি। কখনও কখনও আমার মনে হয়েছে যে কারও পকেটে হাত দেবার চাইতে অন্য-কারও হৃদয় ভেঙে দেওয়াই আজকের পৃথিবীতে বোধ হয় শ্রেয় বলে মনে করা হয়। আগেকার কালেও বোধ হয় এই রকমই মনে করা হত। বস্তুত হৃদয়, মস্তিষ্ক, শরীর, মানবিক সুবিচার, মর্যাদাবোধ—সব কিছুর চাইতেই অর্থ এখন বেশী মূল্যবান, বেশী প্রেয় হয়ে দাঁড়িয়েছে......

আর-একটি বিষয়ের উল্লেখ করতে চাই। বিষয়টি হল স্বরাজ ভবন ট্রাস্ট। শুনলাম ওয়ার্কিং কমিটি সম্প্রতি স্বরাজ ভবনের রক্ষণাবেক্ষণের বিষয়টি বিবেচনা করে দেখেছেন, এবং এই সিদ্ধান্ত করেছেন যে এর জন্য তাঁরা দায়ী নন। তবে

ইতিমধ্যেই কয়েক বছর আগে তাঁরা কিছু অর্থ বরাদ্দ করেছিলেন; সেই অর্থ এখন দেওয়া হয়নি বলে নতুন করে আবার একটা বরাদ্দ মঞ্জুর করা হয়। সম্ভবত মাস কয়েকের জন্য এই বরাদ্দই যথেষ্ট। আর ভবিষ্যতের ব্যাপারে বলা যেতে পারে বাড়ি ও জমির রক্ষণাবেক্ষণের ব্যয়ভার যাতে ঘাড়ে চেপে না বসে, ওয়ার্কিং কমিটি তার জন্য স্পষ্টতই উদ্‌গ্রীব ছিলেন। ট্যাক্স ইত্যাদি সহ এই ব্যয়ভার হল মাসিক ১০০৲ টাকা। এই ব্যয়ভার বহন করতে হবে বলে অছিরা নাকি একটু আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন। তাঁরা প্রস্তাব করেন, রক্ষণাবেক্ষণের টাকাটা তুলবার জন্য বাড়ির কয়েকটি অংশ সাধারণভাবে ভাড়া দেওয়া যেতে পারে। আর-একটি প্রস্তাব ছিল এই যে এই উদ্দেশ্যে জমির কিছুটা অংশ বিক্রি করে দেওয়া হক। এই সব প্রস্তাবের কথা শুনে আমি বিস্ময় বোধ করেছি। তার কারণ প্রস্তাবগুলির মধ্যে কয়েকটিকে এই ট্রাস্টের বিধির বিরোধী এবং সবগুলিকেই এর অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্যের বিরোধী বলে আমার মনে হয়েছে। অন্যতম অছি হিসাবে এ-ব্যাপারে আমার কণ্ঠস্বর সম্পূর্ণই একক; তবুও আমি বলতে চাই যে ট্রাস্ট-সম্পত্তির অনুরূপ অপব্যবহারে আমার তীব্রতম আপত্তি রয়েছে। আমার বাবার ইচ্ছাকে এইভাবে লঙ্ঘন করার কল্পনাও আমার কাছে অসহ্য। এই ট্রাস্ট যে শুধু তাঁর ইচ্ছার প্রতীক, তা নয়; তাঁর ও তাঁর ইচ্ছার এ একটা ছোট্ট স্মারকও বটে। মাসে এক শ টাকার চাইতে তাঁর স্মৃতি আমার কাছে বেশী মূল্যবান। এ-কারণে ওয়ার্কিং কমিটিকে ও অছিদের আমি জানাতে চাই যে সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যে-অর্থ প্রয়োজন তা নিয়ে দুশ্চিন্তার কারণ নেই। কয়েক মাসের জন্য ওয়ার্কিং কমিটি যে-অর্থ মঞ্জুর করেছেন, তা ফুরিয়ে যাবার পর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ব্যক্তিগতভাবে আমি নিজেই দায়ী থাকব, এবং এর পর ওয়ার্কিং কমিটির আর অর্থ মঞ্জুর করবার প্রয়োজন হবে না। অছিদের কাছে এই প্রার্থনাও আমি জানাব যে এ-ব্যাপারে আমার মনোভাবকে যেন তাঁরা সম্মান করে চলেন, সম্পত্তিটাকে যেন তাঁরা ভেঙে না দেন, নিছক ভাড়া দিবার জন্যই যেন একে ভাড়া দেওয়া না হয়।

হিসাব-পত্র আমার কাছে নেই। তবু আমার বিশ্বাস, আর্থিক দিক থেকে স্বরাজ ভবন এখনও ওয়ার্কিং কমিটির উপরে কোনমতেই একটা বোঝা হয়ে চাপেনি। এর জন্য যে অর্থ মঞ্জুর করা হয়েছে, তার পরিমাণ বোধ হয় নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির দপ্তরের জন্য যে-সব ঘর নেওয়া হয়েছে, তার ন্যায্য ভাড়ার চাইতে খুব বেশী হবে না। আরও ছোট এবং আরও সস্তা জায়গা নিয়ে ভাড়ার অঙ্কটা আরও কমিয়ে আনা সম্ভব বটে। কিন্তু এ-কথাও সত্য যে এর আগে মাদ্রাজে শুধু উপরের একটা তলার জন্যই নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতি মাসিক ১৫০৲ টাকা ভাড়া দিয়েছে।

এ-চিঠির কয়েকটা অংশ পড়ে আপনি হয়ত বেদনা পাবেন। কিন্তু আমার মনোভাব আপনার কাছে গোপন করি, এ ত আপনি চান ন।

আপনার স্নেহের
জওহর

১০৪ মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক লিখিত

১৭ অগস্ট, ১৯৩৪

প্রিয় জওহরলাল,

তোমার আবেগময় ও হৃদয়স্পর্শী পত্রখানির উত্তরে যত বড় চিঠি আমার লেখা উচিত, তত বড় চিঠি লেখা আমার শক্তিতে কুলবে না।

সরকার আরও সদয় হবেন বলে আমি আশা করেছিলাম। যা-ই হক, তোমার উপস্থিতির ফলে কমলার, ও মায়েরও, যে উপকার হয়েছে, কোনও ওষুধ অথবা

ডাক্তারের দ্বারা সে-উপকার হত না। মাত্র যে-কটা দিন থাকতে পারবে বলে তুমি মনে করছ, আশা করি তার চাইতে বেশী দিন তোমাকে থাকতে দেওয়া হবে।

যে গভীর দুঃখ তুমি পেয়েছে, তার কারণ আমি বুঝি। তোমার যা মনে হয়েছে, তা সম্পূর্ণ এবং খোলাখুলিভাবে ব্যক্ত করে তুমি ঠিক কাজই করেছ। কিন্তু এ-বিষয়ে আমি নিশ্চিত, আমাদের মিলিত দৃষ্টিকোণ থেকে তুমি যদি লিপিবদ্ধ কথাগুলিকে আরও গভীরভাবে বিবেচনা করে দেখ, তাহলে বুঝতে পারবে, যে দুঃখ ও নৈরাশ্য তুমি বোধ করেছ, তার যথেষ্ট কারণ নেই। নিশ্চিন্ত থাকতে পার যে আমি এখনও তোমাকে পরিত্যাগ করিনি। ১৯১৭ সনে ও তার পরে তোমার কাছে যা আমি ছিলাম, এখনও তা-ই আছি। মিলিত লক্ষ্য অর্জনের জন্য যে-আগ্রহ আমার ছিল বলে তুমি জানতে, সে-আগ্রহ এখনও আমার আছে। ইংরেজী ভাষায় কমপ্লীট ইন্ডিপেন্ডেন্স বলতে যা বোঝা যায়, সার্বিক স্বাধীনতাকে সেই অর্থেই আমি চাই। যে-সমস্ত প্রস্তাব তোমাকে বেদনা দিয়েছে, সার্বিক স্বাধীনতাকে লক্ষ্য রেখেই তার প্রত্যেকটিকে রচনা করা হয়েছে। এই সমস্ত প্রস্তাব এবং তার সামগ্রিক তাৎপর্যের পূর্ণ দায়িত্ব আমাকেই গ্রহণ করতে হবে।

আমার কিন্তু মনে হয়, কোন্ সময়ে কী করা দরকার, তা জানার একটা স্বাভাবিক শক্তি আমার আছে। অবশ্য এইখানেই আসছে উপায় অথবা পন্থা সম্পর্কে তোমার ও আমার গুরুত্ব আরোপের পার্থক্য। উপায় অথবা পন্থাকে আমি লক্ষ্যেরই মত সমান গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করি। এক অর্থে উপায় অথবা পন্থার গুরুত্ব আরও বেশী। তার কারণ, উপায় অথবা পন্থার উপরে আমাদের তবু কিছুটা হাত আছে; আর তাদের নিয়ন্ত্রিত করবার ক্ষমতা যদি আমরা হারাই, লক্ষ্যের উপরে কোনও হাতই তখন আমাদের থাকে না।

"বাজে কথা" সম্পর্কিত প্রস্তাবটিকে খোলা মন নিয়ে পড়ে দেখ। সমাজবাদের কোনও নিন্দাই এতে করা হয়নি। সমাজবাদীদের সম্পর্কে যতখানি বিবেচনা দেখান সম্ভব, এতে দেখান হয়েছে। তাঁদের মধ্যে কাউকে কাউকে আমি অত্যন্তই ঘনিষ্ঠভাবে জানি। তাঁদের ত্যাগের কথা কি আমার অজানা? কিন্তু আমার মনে হয়েছে যে সামগ্রিকভাবে তাঁরা অত্যন্তই তাড়াহুড়ো করছেন। তা তাঁরা করবেনই বা না কেন? শুধু আমি যদি অত তাড়াতাড়ি চলতে না পারি, তাহলে তাঁদের একটু থেমে দাঁড়িয়ে আমাকে তাঁদের সঙ্গে নিতে বলব। আক্ষরিক অর্থে এই হল আমার মনোভাব। সোশ্যালিজ্‌মের অর্থ কী, শব্দকোষে আমি সেটা দেখে নিয়েছি। কিন্তু সংজ্ঞাটা দেখার আগে আমি যতটুকু জানতাম, দেখার পরেও তার থেকে বেশী-কিছু জানতে পারিনি। এর পুরো অর্থ জানবার জন্য এখন আমাকে কী তুমি পড়তে বল? মাসানী আমাকে যে-সব বই দিয়েছিল, তার একখানা আমি পড়ে দেখেছি। এখন নরেন্দ্র দেব যে-বইখানা সুপারিশ করেছেন, অবসর-সময়ে শুধু সেইটিই আমি পড়ছি।

ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের সম্পর্কে অনেক কঠিন কথা তুমি বলেছ। যেমন লোকই তাঁরা হন না কেন, তাঁরা আমাদের সহকর্মী। সর্বোপরি আমাদের এটা একটা স্বাধীন প্রতিষ্ঠান। আস্থাভাজন মানুষ যদি তাঁরা না হন, তবে তাঁদের নিশ্চয়ই সরিয়ে দিতে হবে। কিন্তু তাই বলে, অন্যরা যে-সব যন্ত্রণা বরণ করেছেন, তা বরণ করবার শক্তি যদি তাঁদের না থাকে তা নিয়ে তাঁদের উপরে দোষারোপ করাটা ঠিক হয় না।

বিস্ফোরণের পরে আমি চাই পুনর্গঠন। আমাদের সাক্ষাৎ না-ও হতে পারে; তাই আমি ঠিক কি কাজ করলে তুমি খুশী হও এবং কাকে তুমি তোমার শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি বলে মনে কর, এখনই সেটা আমাকে জানাও।

ট্রাস্ট সম্পর্কে জানাই, আমি উপস্থিত ছিলাম না। বল্লভভাই ছিলেন। তোমার মনোভাবে ক্রোধ প্রকাশ পেয়েছে। অছিদের উপরে এই বিশ্বাস তোমাকে রাখতে হবে যে তাঁদের কর্তব্য তাঁরা করবেন। কোনও অন্যায় হয়েছে বলে আমার মনে হয়নি। অত্যন্তই ব্যস্ত থাকায় এ-বিষয়ে আমি মনোনিবেশ করতে পারিনি। এবারে আমি কাগজপত্র সব পরীক্ষা করে দেখব। বলা বাহুল্য, অন্যান্য অছিরা তোমার মনোভাবকে সম্পূর্ণই সম্মান করে চলবেন। এই আশ্বাস দেবার পর তোমাকে জানাই, ব্যাপারটাকে তুমি যতটা ব্যক্তিগতভাবে নিয়েছ, তা নিও না। তুমি উদার স্বভাবের মানুষ। বাবার স্মৃতিকে তুমি যতটা সম্মান কর, অন্যান্য অছিরাও যে ততটা সম্মানই করেন, এইটে ভাবাই তোমার স্বভাবসঙ্গত হয়। নিজে তুমি জাতির একজন-মাত্র হয়ে সমগ্র জাতির হাতেই বাবার স্মৃতিরক্ষার ভার ছেড়ে দাও।

ইন্দু আশা করি ভাল আছে, এবং নতুন জীবনকে তার ভালই লাগছে। কৃষ্ণার খবর কী?

ভালবাসা জানাই।

বাপু

১০৫ মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক লিখিত

ওয়ার্ধা,
২২ নভেম্বর, ১৯৩৪

প্রিয় জওহরলাল,

শুধু তোমার স্বাস্থ্যের খবর জানতে চেয়ে দিন কয়েক আগে তোমাকে একটি চিঠি লিখেছিলাম। মা কাল এসেছিলেন; তাঁর কাছে শুনলাম, কমলার প্যাকেটে যা পাঠান হয়, তা ছাড়া কোনও চিঠি নাকি তুমি পাও না। তোমার চিঠিপত্র-সংক্রান্ত বিধিনিষেধগুলি কী, সেটা আমি জানতে চাই। কেমন আছ এবং কী ভাবে সময় কাটাচ্ছ, জানিও।

ভালবাসা জানাই।

বাপু

১০৬ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক লিখিত

[আমার স্ত্রীর দ্রুত অবনতি ঘটায় স্থির করা হয় যে চিকিৎসার জন্য তাঁকে ইউরোপে পাঠান হবে। আমি তখন আলমোরা জেলে। পরেও আমাকে সেইখানেই থাকতে হয়। তবে ভাওয়ালি স্যানাটোরিয়ামে গিয়ে আমি যাতে তাঁকে বিদায় জানিয়ে আসতে পারি, তাই একদিনের জন্য আমাকে জেল থেকে বাইরে যেতে দেওয়া হয়েছিল। আমার কন্যা ইন্দিরা এই সময়ে শান্তিনিকেতনে থাকত। তাঁর মায়ের সঙ্গে সে ইউরোপ যাত্রা করে।]

"উত্তরায়ণ"
শান্তিনিকেতন, বাংলা,
২০ এপ্রিল, ১৯৩৫

প্রিয় জওহরলাল,

ইন্দিরাকে আমরা সবাই এক মহামূল্য সম্পদ বলে মনে করতাম; ভারাক্রান্ত হৃদয়ে তাই তাকে আমাদের বিদায় জানাতে হয়েছে। খুবই ঘনিষ্ঠভাবে তাকে আমি দেখেছি; দেখে যে-ভাবে তাকে তুমি মানুষ করে তুলেছ তার প্রতি শ্রদ্ধা বোধ করেছি। শিক্ষকরা সবাই একবাক্যে তার প্রশংসা করেন, ছাত্রমহলেও সবাই তাকে খুবই

ভালবাসে। আশা করি আবার সুসময় আসবে, এবং ইন্দিরাও আবার শিগগিরই এখানে ফিরে এসে তার পড়াশুনোয় মন দিতে পারবে।

তোমার স্ত্রীর রোগযন্ত্রণার কথা যখন ভাবি, তখন আমার কী যে দুঃখ হয়, জানাতে পারব না। তবে আমার নিশ্চিত বিশ্বাস এই যে সমুদ্রযাত্রার ফলে এবং ইউরোপের চিকিৎসার গুণে তাঁর খুবই উপকার হবে, অচিরেই তিনি আবার তাঁর হৃতস্বাস্থ্য ফিরে পাবেন।

সস্নেহ আশীর্বাদান্তে ইতি।

তোমাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১০৭ মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক লিখিত

[এই চিঠিখানি এবং এর পরবর্তী কয়েকখানি চিঠি আমাকে জার্মানির ঠিকানায় পাঠান হয়েছিল। আমার স্ত্রীর স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটায় আলমোরা ডিস্ট্রিক্ট জেল থেকে অকস্মাৎ আমাকে মুক্তি দেওয়া হয়। আমার স্ত্রী সেই সময়ে জার্মানির ব্ল্যাক ফরেস্টের এক স্বাস্থ্য-নিবাসে ছিলেন। মুক্তি পেয়ে তৎক্ষণাৎ আমি তাঁর কাছে চলে যাই।]

ওয়ার্ধা, ৩ অক্টোবর, ১৯৩৫

প্রিয় জওহরলাল,

খুবই নিয়মিতভাবে তোমার চিঠি পাচ্ছি। এ খুবই আনন্দের কথা।

কমলা দেখছি খুবই সাহসের সঙ্গে সংগ্রাম করে যাচ্ছে। এর পুরস্কার সে পাবে। প্রাকৃতিক নিরাময়-পন্থার প্রতি আমার পক্ষপাতের কথা তুমি জান। জার্মানিতেও প্রাকৃতিক নিরাময়ের অনেক প্রতিষ্ঠান আছে। কমলার অসুখ হয়ত এতটা বেঁকে দাঁড়িয়েছে যে প্রাকৃতিক নিরাময়-পন্থায় এখন আর কোনও ফল পাওয়া যাবে না। কিন্তু নিশ্চয় করে কিছু বলা যায় না। এমন কিছু রোগীর কথা আমি জানি, যাদের অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন হয়েছিল। কিন্তু প্রাকৃতিক নিরাময়-পন্থা অনুযায়ী চিকিৎসা করিয়ে তাঁরা সেরে ওঠেন। আমার অভিজ্ঞতার মূল্য কতটুকু জানি না; তবু তোমাকে জানালাম।

আগামী বছরের মুকুট পরিধান সম্পর্কে তুমি যে চিঠি লিখেছ, তা পড়ে আনন্দিত হয়েছি। তোমার সম্মতি পেয়ে সুখী হলাম। এতে যে অনেক সমস্যার সমাধান হবে, এবং দেশের পক্ষেও যে এরই সব চাইতে বেশী প্রয়োজন ছিল, এ বিষয়ে আমি দৃঢ়নিশ্চিত। লাহোরে তুমি সভাপতিত্ব গ্রহণ করেছিলে; কিন্তু লখনউ-সভাপতিত্বের সঙ্গে তার কোনও তুলনা হয় না। আমার বিবেচনায় লাহোরে কোনও ব্যাপারেই তেমন-কিছু অসুবিধের সৃষ্টি হয়নি। লখনউতে কিন্তু কোনও ব্যাপারেই তা হবে না। কিন্তু অবস্থা যা-ই হক, তার সঙ্গে এঁটে উঠবার ক্ষমতা তোমার চাইতে কারও বেশী আছে বলে আমি মনে করিনে। ঈশ্বর তোমাকে এই দায়িত্বভার বহনের শক্তি দান করুন।

যত দ্রুত সম্ভব, তোমার পরিচ্ছেদগুলি পড়ে যাচ্ছি। আমার কাছে এই পরিচ্ছেদ-গুলি খুবই মনোগ্রাহী লাগছে। এর চাইতে বেশী আর কিছু এখনই বলব না।

তোমাদের সবাইকে আমাদের ভালবাসা জানাই।

বাপু

১০৮ সুভাষচন্দ্র বসু কর্তৃক লিখিত

পোস্ট লাগের্ন্‌ড,
হফগাস্টীন,
৪ অক্টোবর, ১৯৩৫

প্রিয় জওহর,

তোমার ২ ও ৩ তারিখের পত্র পেলাম।

ফ্রীবার্গের সার্জনের রিপোর্ট পড়ে খুবই খুশী হয়েছি। আশা করি তাঁর চিকিৎসা-বিজ্ঞান এমন কোনও সাহায্য দিতে পারবে, রোগিণী যাতে তাঁর ফুসফুসধরা-ঘটিত গোলযোগ কাটিয়ে উঠতে পারেন। মিসেস নেহরুকে অন্য-কোথাও স্থানান্তরিত করার সম্ভাব্যতা সম্পর্কে তাঁর মতামত জিজ্ঞাসা করেছ কি? তোমার এই দুঃসময়ে আমার দ্বারা কোনও কাজ যদি হয়, তাহলে আমাকে ডেকে পাঠাতে দ্বিধা কর না।

আমার বইয়ে যে-সব ভুল রয়েছে, তার একটি দেখিয়ে দেবার জন্য তোমাকে আমার ধন্যবাদ জানাই। তুমি জানিয়েছ তথ্যের কিছু ভুল থেকে গিয়েছে। সেটা খুবই সম্ভব। তবে আশা করি মারাত্মক কোনও ভুল নেই। দুর্ভাগ্যবশত অনেকাংশেই আমাকে আমার স্মৃতির উপরে নির্ভর করতে হয়েছে; বিশেষ করে সন-তারিখের ব্যাপারে ত আমাকে খুবই অসুবিধেয় পড়তে হয়েছিল। ঐ সময়কার খবর যাতে পাওয়া যেতে পারে, এমন কোনও বই-পত্র আমি সংগ্রহ করতে পারিনি; হাতের কাছেও এমন কেউ ছিলেন না যাঁর সাহায্য নিতে পারি। পণ্ডিত মোতিলালজীর মৃত্যুর তারিখ সম্পর্কে জানাই, আমার মনে পড়ে যে সঠিক তারিখটা স্মরণ করবার জন্য অনেকক্ষণ আমি মাথা ঘামিয়েছিলাম, তবু তারিখটা আমার মনে পড়েনি। ছাপার ভুলও (ছাপাখানার ভূত) তোমার চোখে পড়বে। সেটা অংশত হয়েছে প্রুফ সংশোধনের ত্রুটির জন্য। মাত্র একবার আমি প্রুফ দেখতে পেরেছিলাম, তাও ভারতে ফিরে যাবার দিন আসন্ন বলে তার কয়েকটি অংশ আমাকে অত্যন্তই তাড়াহুড়োর মধ্যে দেখে দিতে হয়। তা ছাড়া খুবই তাগাদার মধ্যে বইখানি আমাকে লিখতে হয়েছে। আমার স্বাস্থ্যও তখন ভাল ছিল না। যে-সব ভুল তুমি দেখিয়ে দিয়েছ, সেগুলিকে সযত্নে টুকে রাখব, দ্বিতীয় সংস্করণে যাতে প্রয়োজনীয় সংশোধন সাধন সম্ভব হয়।

ম্যানচেস্টার গার্ডিয়ানকে যে চিঠি লিখেছিলাম, এই সঙ্গে তার একটি অনুলিপি পাঠিয়ে দিচ্ছি। চিঠিখানি ১ অক্টোবর তারিখে প্রকাশিত হয়েছে।

খবরটা তুমি নিশ্চয়ই পেয়েছ যে আবিসিনিয়ায় যুদ্ধ শুরু হয়ে গিয়েছে। এখন একমাত্র প্রশ্ন হল, এর ফলে ইংল্যান্ড ও ইতালির মধ্যে যুদ্ধ বাধবে কি না।

স্নেহানুসক্ত
সুভাষ

১০৯ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক লিখিত

শান্তিনিকেতন,
৯ অক্টোবর, ১৯৩৫

প্রিয় জওহরলাল,

তোমার স্ত্রীর অসুখের বিষয়ে খবরের জন্য উদ্বিগ্ন চিত্তে আমরা দৈনিক পত্রগুলি দেখে যাচ্ছি, এবং আশা করছি যে উন্নতিসূচক লক্ষণ দেখতে পাওয়া গিয়েছে বলে

খবর পাওয়া যাবে। ঐকান্তিকভাবে আশা করি, জীবনের নানা উত্থান-পতনের মধ্যে যে বিস্ময়কর মনোবলের পরিচয় তিনি দিয়েছেন, তা তাঁকে সাহায্য করবে। তাঁকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিও।

প্রতি বছর শীতকালে বিশ্বভারতী আমাকে নির্মমভাবে স্মরণ করিয়ে দেয় যে তার সম্বল বড় সামান্য; এই শীতকালেই অর্থ সংগ্রহের জন্যে নিজেকে নাড়া দিয়ে আমাকে বাইরে বেরুতে হয়। মানুষকে আনন্দ দানের ছলে এই ভিক্ষাবৃত্তি, আর নয়ত আদৌ যাঁরা উদার নন, তাঁদের ঔদার্যের কাছে আবেদন জ্ঞাপন, এ আমার এক বিতৃষ্ণাজনক অগ্নিপরীক্ষা। আদর্শের জন্যে এই দুঃখবরণ—অপমান আর ব্যর্থতার কণ্টক-মুকুট মাথায় নিয়ে বিনা প্রতিবাদে এরই মধ্যে আমাকে আনন্দলাভের চেষ্টা করতে হয়। তোমার আপন জীবন আর ব্যক্তিগত স্বাধীনতার চাইতে যে-আদর্শকে তুমি মহত্তর বলে মনে কর, তার জন্য যে-দুঃখ তুমি বরণ করছ, সে-কথা স্মরণ করে আমার সান্ত্বনা পাওয়া উচিত নয় কি? কিন্তু মাঝে-মাঝেই আমার মন এই প্রশ্নের দ্বারা পীড়িত হয় যে, অনুদার পৃষ্ঠপোষকদের টেবিল থেকে অনুগ্রহের মুষ্টিভিক্ষা কুড়িয়ে এই যে আমি আমার উদ্যমের অপচয় করছি, এই কি আমার সঙ্গত কাজ, নাকি স্তূপীকৃত হতাশার গ্লানি থেকে দূরে সরে দাঁড়িয়ে আমার মনকে সতেজ রাখাই আমার কর্তব্য। কে জানে, অপ্রীতিজনক কাজ এড়াবার জন্য এ হয়ত আমার এক অছিলামাত্র। মহাত্মাজীকে অনুরোধ করেছি, তিনি যেন আমার হয়ে বলেন। অনুগ্রহ করে তাতে তিনি সম্মত হয়েছেন। বলাই বাহুল্য, আমার চেষ্টায় যেটুকু সাফল্য লাভের সম্ভাবনা, তিনি যদি তাঁর প্রভাব প্রয়োগ করেন, তার চাইতে অনেক বেশী সাফল্য সম্ভব হবে। সার তেজবাহাদুর সপ্রুও আমাকে সাহায্য করবেন বলে কথা দিয়েছেন।

ইন্দিরাকে আমার কথা বল। আশা করি আবার কখনও সে আমাদের আশ্রমে আসবার, এবং যে-কটা মাস সে এখানে থেকে আমাদের সুখী করে গিয়েছিল তার স্মৃতিকে আবার নতুন করে জাগিয়ে তুলবার সুযোগ পাবে।

ভালবাসা জানাই।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১১০ ই. স্টগডন কর্তৃক লিখিত

দি ভিকারেজ,
হ্যারো,
৫ নভেম্বর, ১৯৩৫

প্রিয় নেহরু,

শনিবার ১টার সময় এখানে এসে মধ্যাহ্নভোজন করা তোমার পক্ষে সম্ভব হবে কি? আবার যদি তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়, বড়ই সুখী হব। তোমাকে তোমার একটা ফটোগ্রাফ দেখাতে পারি; তখন তুমি ছোট্ট ছেলেটি ছিলে, হ্যারো স্কুলে পড়তে। ভারী সুন্দর ছিল তোমার চেহারা। চড়াই পার হয়ে পাহাড়ের একেবারে চূড়ায় আমার বাড়ি। তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে আমার স্ত্রী ভারী খুশী হবেন।

শুভার্থী
ই. স্টগডন

আমি এখানকার ধর্মযাজক হয়েছি, এখন আর স্কুলের শিক্ষক নই।

১১১ এইচ. জে. ল্যাস্কি কর্তৃক লিখিত

দি লণ্ডন স্কুল অব ইকনমিক্স
অ্যাণ্ড পলিটিক্যাল সায়েন্স,
লণ্ডন, ডব্লু. সি. ২,
৬ নভেম্বর, ১৯৩৫

ব্যক্তিগত ও গোপনীয়

প্রিয় নেহরু,

খবর পেলাম যে হ্যালিফ্যাক্সের সঙ্গে দেখা করে ভারতবর্ষের অবস্থা সম্পর্কে তাঁর সঙ্গে আলোচনা করবার জন্য আপনার উপরে চাপ দেওয়া হচ্ছে। খুবই আশা করছি যে তাঁর কাছ থেকে একটা নির্দিষ্ট ও লিখিত অনুরোধ না পেলে এ-কাজ আপনি করবেন না।

অন্যথায়, আমার মনে হয়, সহজেই এর গুরুতর অপব্যাখ্যার আশংকা রয়েছে। সেটা খুবই ক্ষতিকারক হবে।

সানুরাগ শুভেচ্ছা জানাই।

ভবদীয়
হ্যারল্ড জে. ল্যাস্কি

১১২ সি. এফ এণ্ড্রুজ কর্তৃক লিখিত

পেমব্রোক কলেজ,
কেম্ব্রিজ,
৬ নভেম্বর, ১৯৩৫

প্রিয় জওহরলাল,

তোমার দু ভল্যুম পাণ্ডুলিপি নিয়ে শিরোনামা দেখে দেখে এখানে-ওখানে টুকরো-টুকরো ভাবে পড়তে শুরু করেছিলাম। এখন দেখছি তোমার লেখার প্রতি যদি সুবিচার করতে হয় তাহলে সুশৃংখলভাবে আদ্যন্ত আমাকে পড়তে হবে; তারপর যে-ভাবে বাছাই করলে ভাল হয়, অ্যালেন অ্যাণ্ড আনউইনের জন্য সেইভাবেই তার থেকে বাছাই করে দেব। সত্যিই এটা করা দরকার। এডিনবার্গে যাওয়া-আসার পথে সময় পাওয়া সহজ হবে। তার অর্থ ট্রেনে আমি মোটমাট প্রায় পুরো দু দিন সময় পাচ্ছি।

সারাটা বিকেল এই দুটি ভল্যুম আমি দেখলাম। বাছাইয়ের কাজটা বড্ডই কঠিন হবে। বইয়ের একটা উপযুক্ত নাম ঠিক করাটাও বড় সহজ হবে না। অ্যালেন অ্যাণ্ড আনউইনকে তোমার আত্মজীবনীমূলক যে-সব তথ্য তুমি দিয়েছ, ভারতবর্ষের সাম্প্রতিক ইতিহাস সম্পর্কে তোমার মনোভাব তাতে কতখানি ব্যক্ত হয়েছে, তা আমি জানি না। আজই হক আর কালই হক, অ্যালেন অ্যাণ্ড আনউইন এ-বিষয়ে আমার মতামত জানতে চাইবে, এবং তখনই তোমার পাণ্ডুলিপিটি পড়বার সুযোগ হয়ত আমি পাব। পাণ্ডুলিপিটি আমি পড়ে দেখি, এই যে তোমার ইচ্ছে, তা আমি জানি। শেষ পর্যন্ত অবশ্য এই বাছাইয়ের কাজটা তোমারই হাতে গিয়ে পড়বে। শেষ পর্যন্ত যা বাছাই করা হবে, তার মধ্যে যে তোমার প্রকৃত মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে, তোমার নিজের সে-বিষয়ে নিশ্চিন্ত হবার প্রয়োজনই সর্বাধিক। সে হবে তোমার আপন পছন্দের ব্যাপার। আমি শুধু পরামর্শই দিতে পারি।

এই বই থেকে ভারত যে মূল্য আহরণ করবে, তা অসাধারণ! পুনায় যখন আমাদের দেখা হয়, তখন বোধ হয় তোমাকে বলেছিলাম যে, পাশ্চাত্য জগৎ যা সহজে বুঝতে ও অনুধাবন করতে পারে, অগ্রগণ্য ব্যক্তিদের মধ্যে একমাত্র তোমারই যেন

সে-বিষয়ে সহজাত জ্ঞান রয়েছে। বাপুর রচনাগুলিকে সংক্ষিপ্ত করে বারংবার তাকে ব্যাখ্যা করে বোঝাতে হয়েছিল; আর একমাত্র রোমাঁ রোঁলার মত প্রখর প্রতিভা-সম্পন্ন মানুষই তাঁর মূল রচনা পড়ে তাঁর বক্তব্য বুঝিয়ে বলতে পেরেছেন। তিনি এ-কাজ করবার ফলে আরও কিছুটা অগ্রসর হওয়া আমার পক্ষে সহজ হয়েছিল। কিন্তু বাপুর লেখা সর্বত্রই দুরূহ। কাব্য না লিখে যখন গদ্য লেখেন, তখন গুরু-দেবের লেখাও বড় দুরূহ হয়ে দাঁড়ায়। জুবিলী-বছরের জন্য ডঃ সীতারামিয়া এখন 'হিস্ট্রি অব দি কংগ্রেস' রচনায় নিরত আছেন। কিন্তু সে-লেখা পড়ে বুঝতে পারা ইংরেজ পাঠকদের পক্ষে প্রায় অসম্ভব! তাঁর লেখায় যে-সব ভারতীয় শব্দের ছড়াছড়ি, তার অর্থ সবাই জানে বলে যেন তিনি ধরেই নিয়েছেন। তা ছাড়া তাঁর রচনারীতি বড্ডই একঘেয়ে। পক্ষান্তরে 'থ্রু এ প্রিজ্‌ন উইণ্ডো' পড়বামাত্রই অতি স্পষ্টভাবে আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে, ইউরোপের মানুষ সহজেই এ-লেখা বুঝতে পারবে। এ দুটি ভল্যুমকে এক-নজরে দেখেই আমি বুঝতে পারছি যে এর মধ্যে প্রচুর মালমশলা রয়েছে; শুধু ঠিকমত বাছাই করে পারম্পর্য অনুযায়ী তাকে সাজিয়ে দিতে হবে।

কিন্তু আশঙ্কা করি, বাডেনভাইলারে ফিরে গিয়ে এর জন্য তোমাকে প্রচুর খাটতে হবে! এক্ষুণি এ-কাজ করতে যেও না। তার কারণ ইংল্যাণ্ডে এসে এ-যাত্রায় তোমাকে প্রচুর পরিশ্রম করতে হবে; এবং এই ধরনের পরিশ্রমসাধ্য কাজ করবার জন্য দেহে-মনে তোমার সম্পূর্ণই সুস্থ থাকা প্রয়োজন!

অনেক কথা লিখে ফেললাম। কিন্তু এ-ব্যাপারে আমার আগ্রহ যে কতখানি, এবং কাজটাকে যে আমি কত জরুরী বলে মনে করি, এর থেকেই তুমি সেটা বুঝতে পারবে। এডিনবার্গ থেকে ফিরে এসেই আমি বাডেনভাইলারের ঠিকানায় তোমাকে চিঠি লিখব। কেম্ব্রিজে তোমার সঙ্গে দেখা হল না, এতে আমি খুবই নিরাশ হয়েছি। জনকয়েক তরুণ অর্থনীতিবিদ সেখানে আছেন, আমার ইচ্ছে ছিল তাঁদের সঙ্গে তোমার সাক্ষাৎ হয়। যা-ই হক, এর পর ত আবার তুমি আসবে। তাঁদের মধ্যে কে কে দেখা করবার যোগ্য, তার আগেই সেটা আরও সহজে বুঝতে পারা যাবে।

স্নেহানুসক্ত
চার্লি

১১৩ সি. এফ. এণ্ড্রুজ কর্তৃক লিখিত

পেমব্রোক কলেজ,
কেম্ব্রিজ,
৭ নভেম্বর, ১৯৩৫

প্রিয় জওহরলাল,

তোমার 'পৃথিবীর' ইতিহাস পড়তে পড়তে বেশ বড়-রকমের একটা চিন্তা আমার মাথায় এসেছে; তোমাকে সেটা জানাবার ইচ্ছে হল।

(ক) ভারতবর্ষ ও চীন, চূড়ান্ত সমৃদ্ধির সময়ে এই দুই দেশের সভ্যতাই আপন সহজাত বুদ্ধিবলে 'পাশবিক শক্তি'কে হেয় জ্ঞান করেছে, তাকে অসভ্য ও বর্বর ব্যাপার বলে বিবেচনা করেছে। কিন্তু নিজেদের মধ্যে কোনও মৌলিক দুর্বলতা ছিল বলেই এই দুই সভ্যতারই অবক্ষয় ঘটেছে, অন্যের দ্বারা তারা ভয়োৎপীড়িত ও নিগৃহীত হয়েছে।

(খ) ইউরোপীয় সভ্যতা ও ইসলাম প্রকাশ্যেই 'পাশবিক শক্তি'কে আশ্রয় করেছিল, কিন্তু অন্যভাবে তাদেরও অবক্ষয় ঘটেছে। শান্তিকামী

সভ্যতাগুলির মধ্যে যখন দুর্বলতা দেখা দেয়, এই দুই সভ্যতা তখন তাদের উপরে প্রভুত্ববিস্তারে সমর্থ হয়েছে।

এমন কোনও সভ্যতার অস্তিত্ব কি সম্ভব, শান্তিকামী হওয়া সত্ত্বেও যার অবক্ষয় ঘটবে না, অধিকতর পাশবিক-শক্তিপরায়ণ জাতির হাতে যে নিগৃহীত হবে না? আমার তাতে সন্দেহ আছে:

এ নিয়ে হয়ত কোথাও তুমি আলোচনা করেছ। কেম্ব্রিজে থেকে এ সম্পর্কে তোমার সঙ্গে আলোচনা করতে পারলে আমি সুখী হতাম। প্রশ্নটা হয়ত খুবই সাধারণ-গোছের। হরিজন পত্রিকায় বাপুর উত্তর আমি দেখেছি। কিন্তু নৈর্ব্যক্তিক-ভাবে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে একটি সামগ্রিক সভ্যতার কথা আমি ভাবছি, তার কম কিছু নয়। মুসোলিনির এই উক্তি কি সত্য যে শান্তিকামী মতবাদের ফলে নৈতিক দুর্বলতার সৃষ্টি হয়?

স্নেহানুসক্ত
চার্লি

এক্ষুণি আমার কথার উত্তর দিতে হবে না। পরে যখন আমার কাছে চিঠি লিখবে, তখন এ-বিষয়ে তোমার মতামত আমাকে জানিও।

১১৪ লর্ড লোথিয়ান কর্তৃক লিখিত

৮৮ সেণ্ট জেমস্ স্ট্রীট,
লণ্ডন, এস. ডব্লু. ১,
৮ নভেম্বর, ১৯৩৫

প্রিয় পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু,

আমার বন্ধু এডওয়ার্ড টমসনের কাছে শুনলাম আপনি এখন ইংল্যাণ্ডে আছেন। আমি কি আপনার সঙ্গে গিয়ে দেখা করতে পারি, অথবা ভারতবর্ষে ফিরে যাবার আগে আপনার পক্ষে কি একদিন আমার এখানে এসে চা-পান সম্ভব হবে? বিগত কয়েক বছর ধরে আপনার বিভিন্ন রচনা ও নিবন্ধ আমি পাঠ করেছি; ভারতবর্ষের পরিস্থিতি সম্পর্কে আপনার সঙ্গে আলোচনা করতে পারলে আমি খুবই সুখী হব। দুর্ভাগ্যবশত সাধারণ নির্বাচনের কাজে আমি এখন আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়ে আছি। আজ রাত্রে আমাকে কর্নওয়ালে যেতে হচ্ছে। রবিবার সকালে আমাকে লণ্ডন হয়ে যেতে হবে, তবে মঙ্গলবার বিকেলে ও বুধবার সকালে আমি এখানেই থাকব। এ দুদিনের একদিন কি আপনার সঙ্গে গিয়ে দেখা করতে পারি, নাকি আপনিই অনুগ্রহ করে নরফোকের ব্লিকলিং হলে এসে একটা রাত কাটিয়ে যাবেন? এলিজাবেথের আমলের যে-কটি বাড়ি ইংল্যাণ্ডে আছে, তার মধ্যে সব চাইতে সুন্দর বাড়ি বোধ হয় এই ব্লিকলিং হল। আমি সেখানে একাই থাকব। শুধু প্রতি সন্ধ্যায় গ্রামাঞ্চলে গিয়ে আমাকে একটা নির্বাচনী বক্তৃতা দিয়ে আসতে হবে। সুন্দর পরিবেশে শান্তিতে আপনি সেখানে বিশ্রাম নিতে পারবেন। তেজবাহাদুর সপ্রু ত প্রায়ই সেখানে গিয়ে আমার সঙ্গে থাকেন। জায়গাটা নরউইচ থেকে পনর মাইল দূরে। আপনাকে নিয়ে আসবার জন্য নরউইচে আমি গাড়ি পাঠিয়ে দেব। দুর্ভাগ্যবশত কাল আমার অফিস বন্ধ থাকছে। তবে হোয়াইট হল ২২৫১, এই ঠিকানায় যদি একটা খবর দেওয়া হয়, তাহলে রবিবার সকালেই খবরটা আমার কাছে পৌঁছে যাবে। আর নয়ত সোমবার সকালে ১০টার পর যে-কোনও সময়ে আপনি ১৭ ওয়াটার্লু প্লেসে আমার সেক্রেটারিকে একটা খবর দিতে পারেন।

ভবদীয়
লোথিয়ান

পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু,
মাউণ্ট রয়্যাল, মার্ব্‌ল আর্চ, ডব্লু ২.

১১৫ লর্ড লোথিয়ান কর্তৃক লিখিত

ব্লিকলিং হল,
এলশ্যাম, নরফোক,
৬ ডিসেম্বর, ১৯৩৫

প্রিয় মিঃ জওহরলাল নেহরু,

আমি খুবই আশা করছি যে আপনি ভারতবর্ষে ফিরে যাবার আগে আমাদের দুজনের একটা আলোচনা সম্ভব হবে। দুর্ভাগ্যবশত, জানুয়ারি মাসের যথাসম্ভব গোড়ার দিকে আমার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রওনা হবার কথা। বৎসরারম্ভে আপনার ইংল্যাণ্ডে থাকবার কোনও সম্ভাবনা আছে কিনা জানি না। যদি থাকে, তাহলে এই ধরুন মিস আগাথা হ্যারিসনের সঙ্গে এখানে এসে যদি দিন দুয়েক কাটিয়ে যেতে পারেন, সুখী হব। সৌন্দর্যের দিক থেকে ইংল্যাণ্ডের এটি একটি শ্রেষ্ঠ বাড়ি, এর বাগানটিও একটি সেরা বাগান। তা ছাড়া লণ্ডনের কোলাহল থেকে আমরা দূরে থাকতে পারব। গতকাল লর্ড হ্যালিফ্যাক্সের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল: তিনি বললেন, আপনি যদি আসেন, তিনিও তাহলে ইয়র্কশায়ার থেকে সানন্দে ব্লিকলিংয়ে চলে আসবেন, এসে এখানে রাত্রিযাপন করে যাবেন।

খুবই আশা করছি, আমাদের সাক্ষাৎ সম্ভব হবে। ভারতবর্ষের সাম্প্রতিক ঘটনাবলী ও সাধারণভাবে বিভিন্ন রাজনৈতিক প্রশ্ন সম্পর্কে আমাদের মতামতের মধ্যে যে প্রভূত পার্থক্য দেখতে পাওয়া যাবে, তাতে অবশ্য আমার কোনও সন্দেহ নেই; কিন্তু ভালর জন্যই হক আর মন্দের জন্যই হক, ভারতবর্ষ ও ইংল্যাণ্ডের নিয়তি এখন পরস্পরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংবদ্ধ। আমার বিশ্বাস, ভারতীয় ঘটনাবলী সম্পর্কে ইংল্যাণ্ডে আমরা যাঁরা আগ্রহশীল, তাঁদের কারও কারও পক্ষে ভারতবর্ষের সেই তরুণতর নেতৃবৃন্দ—দেশে ভবিষ্যৎ মানস ও নীতিকে যাঁরা নিয়ন্ত্রিত করবেন, তাঁদের কয়েকজনের সঙ্গে পরিচিত হবার একান্ত প্রয়োজন রয়েছে। আপনাদের পক্ষেও আমাদের কয়েকজনের সঙ্গে পরিচিত হবার প্রয়োজন কিছু কম নয় বলেই আমি মনে করি। অসীম তাৎপর্যময় এক ঐশিক উদ্দেশ্য যে আজ মানবতার মধ্যে সক্রিয় রয়েছে, এতে আমার কিছুমাত্র সন্দেহ নেই। পুরনো আন্তর্জাতিক বিধান এবং পুরনো অর্থনৈতিক বিন্যাস আজ ভেঙে পড়ছে। প্রতিটি বৈপ্লবিক যুগেই যা হয়, খুব অল্প লোকই আজ নূতন বিশ্ব-বিধানের এক সামান্য অংশের বেশী দেখতে পাচ্ছে; সেখানে পৌঁছবার সঠিক পন্থাও দেখতে পাচ্ছে খুব কম লোকই। এই কারণেই মীমাংসা এত কঠিন, এবং অগ্রগতি এত শ্লথ ও বেদনাময় সংঘাতে সংক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে। সৌহার্দময় ও ঘরোয়া এই সব ব্যক্তিগত যোগাযোগ, এতে করে কোনও আশু মীমাংসা যদি সম্ভব না-ও হয়, পরবর্তী কালে এরই ফলে হয়ত একটা সমঝোতা সম্ভব হবে।

সুতরাং আমি খুবই আশা করছি যে ঐ সময়ে ইংল্যাণ্ডে আসা আপনার সম্ভব হবে। পারলে আমি আমার সমুদ্রযাত্রার দিন ৪ জানুয়ারির ওদিকে আর পিছিয়ে দিতে চাই না। তার কারণ, তারপর দিন দশেকের মধ্যে আর ভাল কোনও জাহাজ নেই। আমার ইচ্ছে, ১ জানুয়ারি তারিখ নাগাদ এখানে আসব, এবং লর্ড হ্যালিফাক্সকে অনুরোধ করব তিনি যেন ২ জানুয়ারি বৃহস্পতিবার এসে এখানে রাত্রিযাপন করেন। তাহলে শুক্রবার বিকেলে আমাদের লণ্ডনে প্রত্যাবর্তন সম্ভব হয়, এবং পরদিন আমি আমার জাহাজ ধরতে পারি। আর আপনি, মিস হ্যারিসন ও অন্যান্যেরা যদি সপ্তাহান্তিক দিনগুলি এখানে কাটিয়ে যেতে পারেন, তাহলে আমি খুবই খুশী হব। আশা করেছিলাম আপনার কন্যাকেও আপনি সঙ্গে করে

নিয়ে আসতে পারবেন। কিন্তু শুনলাম তাঁকে নাকি বাইরে থাকতে হবে। আমি যাতে আমার কর্মসূচী স্থির করতে পারি, তার জন্য যথাসম্ভব শীঘ্র আপনি আপনার সিদ্ধান্ত আমাকে জানাবেন কি?

ভবদীয়
লোথিয়ান

জওহরলাল নেহরু, এস্কোয়ার.
পেনসন এরহার্ড্ট,
বাডেনভাইলার, জার্মানি

পুনশ্চ: ১৭ ওয়াটার্লু প্লেস, লণ্ডন, এস. ডব্লু. ১, দয়া করে এই ঠিকানায় উত্তর দেবেন।

১১৬ লর্ড লোথিয়ানকে লিখিত

পেনসন এরহার্ড্ট,
বাডেনভাইলার,
৯ ডিসেম্বর, ১৯৩৫

প্রিয় লর্ড লোথিয়ান,

আপনার ৬ তারিখের চিঠি সবেমাত্র আজ পেলাম। বিমান-ডাকে প্রেরিত চিঠিও এত দেরিতে এসে পৌঁছয় কেন, জানি না। যা-ই হক, দ্রুত আপনার চিঠির উত্তর দিতে বসেছি।

আপনার সঙ্গে দেখা করতে আমার খুবই আগ্রহ। আপনার যে-সব রচনা আমার চোখে পড়েছে, তার সম্পর্কেও আমার যথেষ্টই আগ্রহ বর্তমান। বিভিন্ন প্রশ্ন সম্পর্কে আপনার মনোভাব অথবা সিদ্ধান্ত আমি মেনে নিতে পারিনি বটে, কিন্তু সব সময়েই তা আমার চিন্তাকে উদ্রিক্ত করেছে; আবার কখনও-কখনও আপনার সঙ্গে খানিকটা মতৈক্যও আমার হয়েছে। চিন্তারাজ্যের নূতন নূতন পথ যাঁরা উন্মুক্ত করে দেন, বিশ্ব-জগতের এক ক্ষুদ্র কোণে সাধারণ মানুষের চিন্তা-ভাবনার যে একটা বাঁধা-ধরা চৌহদ্দি রয়েছে, মানুষকে তার বাইরের পৃথিবীরও অল্প-একটুখানি চিনিয়ে দিতে যাঁরা সাহায্য করেন, তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়াটা সব সময়েই আনন্দের বিষয়। আপনি ঠিকই বলেছেন, খুব কম মানুষই এই ছোট্ট কোণটির বেশী আরও কিছু দেখতে পায়; এবং বর্তমান কালের এই বেদনাময় সংঘাত, দৃষ্টিভঙ্গির সংকীর্ণতার কারণেই এই সংঘাত আরও জটিল হয়ে উঠেছে। যে-কোনও সময়েই এটা দুর্ভাগ্যের ব্যাপার; বর্তমান বৈপ্লবিক যুগে এটাকে আরও বেশী দুর্ভাগ্যের ব্যাপার বলতে হয়। তবে শুভেচ্ছাপরায়ণ ব্যক্তিদের মধ্যে নিছক সৌহার্দ্যময় যোগাযোগের দ্বারাই যে জাদুমন্ত্রবলে এই সংঘাতকে মুছে ফেলা সম্ভব হবে, এমন কথা আমি মনে করি না। এ-সংঘাতের মূল আরও গভীরে; এবং প্রচণ্ড কতকগুলি মৌলিক শক্তি যেখানে পরস্পরের বিরুদ্ধে সক্রিয় রয়েছে, শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের ভূমিকাকেও সেখানে তুলনায় অনেক কম গুরুত্বপূর্ণ বলেই আমার মনে হয়। এই সব সংঘাতের মূল কারণগুলিকে যথাসাধ্য আমরা বুঝবার চেষ্টা করতে পারি; অতঃপর সেগুলিকে উৎপাটিত করবার প্রয়াস পেতে পারি। কিন্তু আমাদের নিজ-নিজ পূর্বসংস্কার এবং গোষ্ঠীগত স্বার্থ থেকে আলাদা করে এগুলিকে বিচার করে দেখবার কাজটা অত্যন্তই দুরূহ। ওষ্ঠপ্রান্তে সব চাইতে মধুর হাসিটিকে ফুটিয়ে তুললেও এই সব বদ্ধমূল পূর্বসংস্কার এবং তজ্জনিত বিরোধী সব বিশ্ব-দৃষ্টিভঙ্গীর ঊর্ধ্বে ওঠা সম্ভব হয় না। সৌহার্দ্যময় সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা তবু করতেই হবে; তার কারণ সে-সম্পর্ক

না থাকলে পৃথিবী এখনকার চাইতে আরও নীরস হয়ে উঠবে। এ-সব সম্পর্কে খানিকটা পরিমাণে অবশ্যই সেই আবহাওয়া সৃষ্টির সহায়ক হয়, যার ফলে পরবর্তী কালে একটা বোঝাপড়া সম্ভব হতে পারে। বিভিন্ন মানুষ ও দলের মধ্যকার তিক্ততা এতে হ্রাস পায়; মানুষের দৃষ্টিপথের পরিধি এতে বেড়ে যায়; তা ছাড়া সত্যিই যাঁরা উপযুক্ত মানুষ—তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়াটা জীবনের একটা প্রধান আনন্দও ত বটে।

বলা বাহুল্য, এই সব কিছুই অতি কাঙ্ক্ষণীয় বস্তু। সুতরাং এই ধরনের যোগাযোগ স্থাপনেরও আমি সম্পূর্ণই সপক্ষে। ব্যক্তিগতভাবে, আমার সুদৃঢ় প্রত্যয় সত্ত্বেও, জীবন ও তার বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে আমার মনোভাব হল শিক্ষার্থীর মনোভাব। ধর্মীয়ই হক, আর রাজনৈতিকই হক, আর অর্থনৈতিকই হক, গোঁড়া কোনও মতবাদ আমার ভাল লাগে না; আমার মন সর্বদাই সেই পথটিকে খুঁজে ফিরছে, যে-পথ আমার অবলম্বন করা উচিত। আমার মন যাতে একদেশদর্শী হয়ে না ওঠে, তারই জন্য আমি চেণ্টা করি। ব্যক্তিগত যোগাযোগকে এই কারণেই আমি আরও স্বাগত জানাতে পারছি। বই পড়েও অনেক কাজ হয়; বহু বৎসর যাবৎই গ্রন্থাদি আমার সান্ত্বনালাভের এক অনিবার্য উৎস হয়ে রয়েছে। কিন্তু গ্রন্থ আর চিন্তা আর কাজের পিছনে যাঁরা আত্মগোপন করে রয়েছেন, তাঁদের সঙ্গে ব্যক্তিগত যোগসম্পর্ক স্থাপনের মধ্যে এমন অমোঘ কিছু আছে, এমন কি গ্রন্থাদির মধ্যেও যার সন্ধান পাওয়া যাবে না।

আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে আমি সুখী হতাম। স্বাগত জানিয়ে বন্ধুত্বপূর্ণ যে চিঠিখানি আপনি লিখেছেন, তাতে আপনার সঙ্গে দেখা করবার আকাঙ্ক্ষা আমার আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। ইংল্যান্ডের সুন্দর সব বাড়ি আর পল্লী-অঞ্চলকে আমি ভালবাসি। ব্রিকলিংয়ের যে উচ্ছ্বসিত বর্ণনা আপনি দিয়েছেন, তাতে আমি আকর্ষণ বোধ করছি। কিন্তু আসলে মানুষটিকেই আমি দেখতে চাই, তাঁর বাড়িটিকে নয়। লর্ড হ্যালিফ্যাক্সের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলেও আমি সুখী হতাম; তবে আপনার কাছে স্বীকার করতে চাই যে বিগত কয়েক বৎসরের বিভীষিকার মধ্যে ভারতের শাসন-ব্যবস্থার সঙ্গে সরকারীভাবে যাঁরা সংশ্লিষ্ট ছিলেন, তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আমি খানিকটা দ্বিধা বোধ করি। ঐ সময়টা আমাদের কাছে এক আতঙ্কের অধ্যায় হয়ে রয়েছে। কোনও অনুভূতিশীল মানুষ যে কী করে এই সব আতঙ্কের কাজকে—অনুমোদন করা ত দূরের কথা—সহ্য করতে পারেন, তা আমি বুঝতে পারি না। ভারতবর্ষের অনেক শ্রেষ্ঠ গুণকে এই সময়ে নিগ্রহ ও দমন করা হয়েছে। কিন্তু সেই নিগ্রহ ও দমনের কথাও আমি ততটা বলছি না, যতটা বলছি তার ধরনের কথা। যেভাবে এই নিগ্রহ ও দমন চালান হয়েছে, তার মধ্যে এমন একটা কুরুচি ও অশালীনতা ছিল, এবং এখনও আছে, যা আমি কল্পনাও করতে পারিনে। বিস্ময়ের কথা এই যে ইংল্যান্ডের খুব কম লোকই এ-কথা বোঝেন; ভারতবর্ষের মন ও হৃদয়ে যে কী ঘটছে, খুব কম লোকেরই সে-বিষয়ে কোনও ধারণা আছে।

আশা করি, এই ভাবটা একদিন কেটে যাবে। কিন্তু এই অমোঘ পটভূমিকার সামনে দাঁড়িয়ে ব্যক্তিগত যোগাযোগের কথা ভাবতে পারাটা একটু শক্ত। যে-মানুষ আপনাকে শ্বাসরুদ্ধ করে মারবার চেণ্টা করছে, তার সঙ্গে করমর্দন করাটা খুব সহজ নয়। কিন্তু তৎসত্ত্বেও আমি নিশ্চিত যে এমন একটা সময় আসবে যখন আমরা করমর্দন করব। সেই সময়কে ত্বরান্বিত করবার দায়িত্ব আমাদেরই।

আপনার প্রস্তাব গ্রহণ করতে, এবং বিশেষ করে জানুয়ারির শুরুতে ইংল্যান্ডে গিয়ে আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আমি খুবই প্রলুব্ধ বোধ করেছি। আমার সঙ্গে

সাক্ষাত করবার উদ্দেশ্যে আপনি যে আপনার আমেরিকা-যাত্রার তারিখ কয়েক দিন পিছিয়ে দেবার প্রস্তাব করেছেন, এ আপনার যথেষ্টই সহৃদয়তার পরিচায়ক। যেতে আমার খুব ইচ্ছে। কিন্তু যেতে হলে আগে থাকতেই যে-সব ব্যবস্থা আমি করে রেখেছি, তার অনেক পরিবর্তন করতে হয়। প্রধান কারণ আমার স্ত্রী। ঠিক ঐ সময়টাতেই আমাদের কন্যা আমাদের কাছে এসে থাকবে, এবং স্ত্রীকে আমি কথা দিয়েছি যে তখন আমি তাঁরই কাছে থাকব। ইউরোপের অন্যান্য অঞ্চল থেকেও ঐ সময় কয়েকজন বন্ধুবান্ধবের এখানে আসবার কথা আছে। তা ছাড়া আমার ইচ্ছে আছে যে জানুয়ারির শেষের দিকে আমি একবার ইংল্যাণ্ডে যাব; জানুয়ারির প্রথম দিকে গেলে পরে তার আমার যাওয়া হবে না, এবং বহু বন্ধু তাতে হতাশ হবেন। সম্ভবত ফেব্রুয়ারির প্রথম দিকেই আমি ভারত অভিমুখে যাত্রা করব।

আপনার আমেরিকা-যাত্রার পূর্বে আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎকারের পরিকল্পনা তাই আমাকে দুঃখের সঙ্গেই বর্জন করতে হবে। সত্যিই আমি এতে খুব নিরাশ হয়েছি। গ্রীষ্মের শেষ দিকে আবার আমার ইউরোপে আসবার একটা সম্ভাবনা আছে। যদি আসি, নিশ্চয়ই আপনার সঙ্গে গিয়ে দেখা করব।

মিস আগাথা হ্যারিসন আমাকে লিখেছেন যে আপনার বাড়িতে গেলে মিঃ অ্যালেক্স. ফ্রেজারের সঙ্গে হয়ত আমার দেখা হতে পারত। পশ্চিম আফ্রিকায় সম্পূর্ণ নতুন ধরনের যে কলেজ তিনি করেছেন, দূর থেকে এবং খানিকটা অস্পষ্ট-ভাবে হলেও, তার সৎ কাজকর্মকে আমি সাগ্রহে লক্ষ্য করে গিয়েছি; তাঁর সঙ্গে দেখা না হওয়াটা তাই অতিরিক্ত একটা পরিতাপের বিষয়।

ভবদীয়
জওহরলাল নেহরু

লর্ড লোথিয়ান,
১৭ ওয়াটার্লু প্লেস, লণ্ডন এস ডব্লু. ১

১১৭ লর্ড লোথিয়ান কর্তৃক লিখিত

ব্যক্তিগত

সেমুর হাউস,
১৭ ওয়াটার্লু প্লেস, লণ্ডন এস. ডব্লু. ১,
৩১ ডিসেম্বর, ১৯৩৫

প্রিয় মিঃ নেহরু,

আপনার সদয় পত্রের জন্য ধন্যবাদ জানাই। বর্তমানে একটা সাক্ষাৎকার যে সম্ভবপর বলে মনে হচ্ছে না, তার জন্য আমি দুঃখিত। তবে আশা করি পরে কখনও সুযোগ আসবে। ইতিমধ্যে ভারতবর্ষ ও ব্রিটেন সম্পর্কে যে-সব ভাবনা আমার মনের মধ্যে রয়েছে, তা আপনাকে জানাচ্ছি। ভরসা করি, আপনি পড়ে দেখতে পারেন।

মানব-ইতিহাসের এক অত্যন্তই সৃষ্টিশীল যুগে আমরা বাস করছি। লীগ অব নেশন্স যে-সব আদর্শের প্রতিনিধিত্ব করছে, একদিকে সেই আদর্শ অনুযায়ী আমরা ধীরে ধীরে সমানাধিকারসম্পন্ন স্বায়ত্তশাসিত রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে এক ন্যায়তন্ত্র প্রতিষ্ঠার দ্বারা যুদ্ধের অবসান ঘটাতে, এবং সেই সঙ্গে যা প্রায় যুদ্ধের অপেক্ষাও হীনতর, সার্বভৌম রাষ্ট্রসমূহের বর্তমান উচ্ছৃংখল আচরণের দ্বারা সৃষ্ট অথবা পোষিত সেই ঘৃণা, আতঙ্ক, সন্দেহ, অজ্ঞান, দারিদ্র্য ও কর্মহীনতারও অবসান ঘটাতে চলেছি। অন্যদিকে সমাজবাদ শব্দটি যে-সমস্ত আদর্শের প্রতীক, আমরা তাকে বাস্তবে রূপায়িত করতে চলেছি। সমাজবাদ এমনই একটি প্রথা, যাতে পৃথিবী ও

তার সম্পদসমূহকে সমাজের সকল মানুষের মঙ্গলার্থে কাজে লাগান হবে; সমাজের প্রতি তাঁদের সেবার পরিমাণ অনুযায়ী, সম্পদের ব্যক্তিগত মালিকানার আকস্মিকতা অনুযায়ী নয়। উভয় ব্যাপারেই যে-উপায়ে অভীষ্ট সাধিত হবার সম্ভাবনা, এক দিকে লীগ অব নেশনস্-এর সনদ, অথবা অন্য দিকে উৎপাদন ও বণ্টনের উপায়াবলীর সার্বিক জাতীয়করণ এবং রাষ্ট্র কর্তৃক তার পরিচালন-ভার গ্রহণের আদর্শের থেকে তা পৃথক হবে বলেই মনে হয়। এই লক্ষ্য অর্জনে বহু বৎসর, সম্ভবত বহু শতাব্দী সময় লাগতে পারে। তার কারণ, সাফল্য অর্জন করতে হলে, নূতন আইন ও নূতন উপায়াবলী বাস্তবে রূপায়িত হবার আগে আমাদের মতামত ও চরিত্রগত দৃঢ়মূল অভ্যাসগুলির আমূল পরিবর্তন সাধন এবং দায়িত্ব পালনের জন্য নূতন শক্তি "অর্জন" করা দরকার। তবে শেষ পর্যন্ত এই সব আদর্শ বাস্তবে রূপায়িত হবেই। তার কারণ, স্বপ্নকে সফল করবার উপায় কী, তার হদিশ এ-যাবৎ খুব কম লোকে পেলেও, অসংখ্য মানুষ এই আদর্শের স্বপ্ন দেখেছেন।

ব্রিটেন ও ভারতবর্ষের ভূমিকা আজ পৃথক। ব্রিটেন তার পুরনো সাম্রাজ্যবাদ পরিহার করছে। সেই সঙ্গে সর্বজাগতিক জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার সংক্রান্ত দাবির মধ্যে যে নৈরাজ্যের আশঙ্কা নিহিত, তা যাতে নূতন যুদ্ধের সূত্রপাত না ঘটায়, অথবা সাম্রাজ্যবাদের এক নূতন প্রলয়ের মধ্যে যাতে না তার পরিসমাপ্তি ঘটে, ব্রিটেন এখন তারই উপায় উদ্ভাবনের প্রয়াসে যত্নশীল রয়েছে। এ ছাড়া ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও ব্যক্তিগত উদ্যোগের উদার ঐতিহ্যের সঙ্গে সমাজবাদের সমন্বয় সাধনের যে বাস্তব সমস্যা রয়েছে, অচিরেই সে তার সমাধানে ব্রতী হবে। বর্তমান সভ্যতার অবক্ষয়ের মূল কারণ হচ্ছে ধর্মীয় ও জাতীয়তাবাদী যুদ্ধবিগ্রহ। ভারতবর্ষ যদি তার ঐক্য হারায় তাহলে ইউরোপের মত সেও এইসব যুদ্ধবিগ্রহের নৈরাজ্যের কবলে গিয়ে পড়বে। ঐক্য বিসর্জন না দিয়ে তাই আপন শাসন-ব্যবস্থার দায়িত্ব গ্রহণ এবং—যা এখন অত্যন্তই প্রয়োজনীয়—সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সেই সংস্কারসাধনের ন্যায় গুরুতর কর্তব্য তাকে সাধন করতে হবে।

যে শাসনতন্ত্র গৃহীত হয়েছে তার মাধ্যমে কীভাবে ভারতবর্ষের পক্ষে তার লক্ষ্যে উপনীত হওয়া সম্ভব, এ-প্রশ্ন আপনি তুলবেন। এ-শাসনতন্ত্র যে ত্রুটিযুক্ত, তাতে সন্দেহ নেই; বিশেষ করে আপনার দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে একে ত্রুটিযুক্ত বলেই মনে হবে। কিন্তু এই শাসনতন্ত্র, ও যে পরিণাম-সম্ভাবনা এর মধ্যে নিহিত রয়েছে, তদ্ব্যতিরেকেই ভারতবর্ষের পক্ষে তার লক্ষ্যে উপনীত হওয়া সম্ভব কিনা, সে-কথা বিবেচনা করে দেখবার জন্য আপনাকে অনুরোধ জানাব।

দুর্ভাগ্যের কথা এই যে, রাজনীতিক্ষেত্রে আমাদের কারও পক্ষেই অতীতকে একেবারে মুছে ফেলে দিয়ে কাজ শুরু করা সম্ভব নয়। ইতিহাসের মধ্য থেকে যে-সব তথ্য জন্মলাভ করছে, সর্বদা সেইসব তথ্যের থেকেই আমাদের কাজ শুরু করতে হয়। নির্দিষ্ট একটা সময়ে আদর্শবাদ আর তথ্যের মধ্যে কী-পরিমাণ সমন্বয়সাধন সম্ভব, সেটা নির্ধারণ করাই রাষ্ট্রনীতিবিদের কাজ। ভারতীয় জনসাধারণের শোচনীয় দারিদ্র্য, সেই দারিদ্র্যের পরিণামফল, এবং সেই দারিদ্র্যকে দ্রুত অপনয়ন করবার পথে যে-অসুবিধা রয়েছে, তার কথা স্বীকার করে নিয়েও বলা যায়, ভারতবর্ষ আজ বিরাটতম যে-বিপর্যয়ের সম্মুখীন তা হল এই যে তার শাসনব্যবস্থা অথবা শাসনতন্ত্রগত ঐক্য বিনষ্ট হবার আশঙ্কা রয়েছে। এর চাইতে বড় বিপর্যয় একমাত্র এই হতে পারে যে ব্রিটেন অথবা অন্য-কোনও বিদেশী রাষ্ট্রের অধীনে থাকতে সে স্বেচ্ছায় স্বীকৃত হবে। আত্মশাসিত জাতি হিসেবে ভারতবর্ষ যদি তার আপন আভ্যন্তর ঐক্যরক্ষায় নেহাতই সমর্থ না হয়, ত সে আলাদা কথা। নয়ত,

ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনের যে-শক্তি বর্তমান, এবং গোঁড়া প্রাচীনপন্থীদের কথাকে অমান্য করবার ও গত আগস্ট মাসে গৃহীত শাসনতন্ত্রের মাধ্যমে ক্ষমতার শেষ চাবি-কাঠিকে হস্তান্তরিত করবার যে-সিদ্ধান্ত গ্রেট ব্রিটেন করেছে, তাতে আমার মনে হয় যে উল্লিখিত দ্বিতীয় বিপর্যয়ের ঝুঁকি আর এখন নেই। ভারতীয় টুয়েণ্টিয়েথ সেঞ্চুরি পত্রিকার জন্য এই শাসনতন্ত্রের উপরে আমি একটি প্রবন্ধ লিখেছিলাম (তার একটি কপি এইসঙ্গে পাঠালাম); শাসনতন্ত্রকে এইভাবে ব্যাখ্যা করবার কারণ সেখানে আমি দেখিয়েছি। এখানে আর তার পুনরাবৃত্তি করব না। কিন্তু প্রথমোক্ত বিপর্যয়ের আশঙ্কা এখনও বর্তমান। পৃথিবীর অবশিষ্টাংশের অভিজ্ঞতা যদি সম্পূর্ণই ভিত্তিহীন না হয়, তাহলে দেখা যাবে, ভারতবর্ষের রাজনৈতিক শ্রেণীগুলির হাতে যখন ক্ষমতা আসবে, এবং শিক্ষা ও সংবাদপত্রের প্রভাব যখন বাড়বে, ধর্ম জাতি ও ভাষার রাজনৈতিক গুরুত্ব ও ক্ষমতাও তখন ক্রমেই বৃদ্ধিলাভ করবে, এবং ফলত এই শক্তিগুলি তখন ক্রমেই আরও ঐক্যনাশক হয়ে উঠবে। রেনেসাঁস ও রিফর্মেশনের প্রভাব মধ্যযুগীয় ক্যাথলিক চার্চ ও হোলি রোমান এম্পায়ারের ক্ষমতা যখন সদ্য সংকুচিত হয়ে আসছে, তখন, এবং বিজ্ঞান, শিক্ষা ও ফরাসী বিপ্লবের নূতন ভাবনা-বুদ্ধি এসে নূতন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আনুগত্যবোধের সৃষ্টি করে যতদিন না ধর্মের অবিসংবাদী রাজনৈতিক ক্ষমতার অপহ্নুতি ঘটিয়েছে, ততদিন পর্যন্ত ইউরোপের যে অবস্থা ছিল, ভারতবর্ষেরও এখন সেই অবস্থা; ভারতীয় জনসাধারণের উপরে আজও ধর্মশক্তির প্রভাবই সব চাইতে বেশী। প্রধানত ক্যাথলিক ও প্রোটেস্ট্যাণ্ট ধর্মমতের মধ্যে বিরোধের ফলে ১০০ বছর ধরে যে যুদ্ধবিগ্রহ হয়, ইউরোপে তাতে রক্তের প্লাবন বয়ে গিয়েছিল (জার্মানির জনসংখ্যা তার ফলে ৩ কোটি থেকে ৫০ লক্ষে এসে দাঁড়ায়)। পরবর্তী কালে সম্রাট ও পোপের বদলে বিভিন্ন রাজার মধ্যে, ও তারও পরে বিভিন্ন জাতীয়াবাদের মধ্যে জাতি ও ভাষাভিত্তিক যুদ্ধবিগ্রহের ফলে আবারও ইউরোপ সেই একই রক্তবন্যায় নিমজ্জিত হয়। সম্মিলিতভাবে ইউরোপের পূর্বেকার ঐক্যকে এরা সম্পূর্ণ বিনষ্ট করেছে, এবং শুল্ক, অস্ত্রসজ্জা ও যুদ্ধবিগ্রহের মাধ্যমে এক বিশৃঙ্খল অবস্থার সৃষ্টি করেছে। এই বিশৃঙ্খল অবস্থাই ইউরোপের নৈতিক অবনয়ন ও অবক্ষয়ের মূল কারণ। এইসব শক্তির অপক্রিয়ার শেষ অধ্যায় দেখা গিয়েছে আয়ার্ল্যাণ্ডে। ইংল্যাণ্ড সেখানে শেষ পর্যন্ত ডোমিনিয়ন হোম রুল ব্যবস্থার সুবিধাদানে বাধ্য হল বটে, কিন্তু দেখা গেল যে জাতিবুদ্ধির দ্বারা বর্ধিতশক্তি ধর্মের দাপট সেখানে কেল্টিক রোমান ক্যাথলিক অধ্যুষিত আয়ার্ল্যাণ্ড থেকে স্কট প্রোটেস্ট্যাণ্ট অধ্যুষিত আলস্টারকে রাজনৈতিকভাবে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছে।

আপনি বলতে পারেন, অর্থনৈতিক দিকটিকে—অর্থাৎ মার্ক্সীয় মতবাদকে—আমি উপেক্ষা করছি। তা আমি উপেক্ষা করছি না। ইতিহাসের যে জড়বাদী অথবা অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা হতে পারে, মার্ক্স তা নিয়ে বাড়াবাড়ি করেছেন। ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রের তৎকালিক চিন্তাধারা অর্থনীতির দ্বারা যথেষ্টই প্রভাবিত হয়, কিছুটা পরিমাণে অর্থনীতি তাকে নিয়ন্ত্রিতও করে। কিন্তু তার ভূমিকা সর্বথাই অপ্রধান। পুঁজিবাদ আহরণলিপ্সাকে উদ্দীপ্ত করে বটে, কিন্তু জীবনযাত্রার মানেরও সে প্রভূত উন্নতি ঘটায়। আন্তর্জাতিক বিশৃঙ্খলার অভিশাপকে সে আরও ঘনীভূত করে বটে, কিন্তু তার স্রষ্টা সে নয়। পুঁজিবাদের ফলে প্রতিযোগিতার সৃষ্টি হওয়া সম্ভব, কিন্তু রাষ্ট্রের মধ্যে সে গৃহযুদ্ধের সূত্রপাত করে না। মোট কথা এ-বিষয়ে কোনও সন্দেহ থাকতে পারে বলে আমার মনে হয় না যে বাস্তব রাজনীতিতে রাজনৈতিক পর্যায়ের কথাটাই প্রথমে বিবেচ্য। রাশিয়ায় যে-অবস্থা ঘটেছিল, তার কথা অবশ্য সম্পূর্ণই আলাদা। বহির্যুদ্ধে হৃতশক্তি

জারতন্ত্র সেখানে সহজেই ধ্বসে পড়েছিল। তা ছাড়া সেখানকার বৈপ্লবিক আন্দোলন ছিল অত্যন্তই সুপরিচালিত। যে-দেশে বস্তুত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কোনও অস্তিত্বই ছিল না, সেই দেশে জীবনের প্রায় সর্বক্ষেত্রে সেই আন্দোলন একদলীয় একনায়কতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ঘটায়; তার জন্য এমন সব উপায় অবলম্বন করা হয়েছিল, তখনও পর্যন্ত মানবতা যাতে অভ্যস্ত হয়ে ওঠেনি। একমাত্র এই রাশিয়ার কথা যদি ছেড়ে দেওয়া যায়, তাহলে দেখা যাবে যে সচেতন অর্থনৈতিক কারণে সাড়া দেবার আগে ধর্ম-জাতি- অথবা ভাষা-ভিত্তিক রাজনৈতিক কারণেই জনসাধারণ সাড়া দেয়। রুশ বিপ্লবের পর থেকে ইউরোপের ইতিহাসে এইরকমই ঘটেছে। মনে হয় বামপন্থীরাও এখন স্বীকার করেন যে এইসব কারণকে হটিয়ে দিয়ে অর্থনৈতিক কারণ যখন তার স্থান দখল করে, তখনও—গণতান্ত্রিক ও শাসনতন্ত্রসম্মত উপায়ের বদলে বৈপ্লবিক উপায়ের সহায়তা গ্রহণ করলে--কমিউনিজ্‌মের নয়, ফ্যাসিজ্‌মেরই জয়লাভ ঘটে।

ভারতবর্ষে যদি শাসনতন্ত্রসম্মত পন্থাকে বর্জন করা হয়, তাহলে ভারতবর্ষও ইউরোপের মতন গৃহযুদ্ধের সূচনা করবে বলে আমি মনে করি। এ প্রায় অনিবার্য। তার কারণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসাধনের জন্য একবার যদি ধর্মীয় অনুভূতিকে উদ্দীপ্ত করে তোলা হয়, জনসাধারণ তখনও ধর্মীয় আহ্বানে সাড়া দিয়ে যাবে। গৃহযুদ্ধ বাধলে ভারতবর্ষ তার ঐক্যকে অক্ষুণ্ণ রাখতে পারবে না, ইউরোপের মতন সে-ও তখন একনায়কশাসিত কয়েকটি রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়ে পড়বে। জাতি ও ভাষার বিরোধ তাদের বিভক্ত করে রাখবে, এবং সামরিক ও অর্থনৈতিক কারণে পরস্পরের বিরুদ্ধে তারা সদাসশস্ত্র হয়ে থাকবে; ফলত তাদের আভ্যন্তর উন্নতির পথও রুদ্ধ হবে। আর নয়ত—চীনে আজ যেমন ঘটছে—ভারতবর্ষ আবারও কোনও সাম্রাজ্যবাদী বৈদেশিক শক্তির নিয়ন্ত্রণাধীন হয়ে পড়বে। কখনও-কখনও বলা হয় যে বিপর্যয়ের পথই হয়ত অগ্রগতির শ্রেষ্ঠ পথ। এ-কথা মহাত্মা একবার আমাকে বলেছিলেন। কোনও-কোনও সময়ে কথাটা হয়ত সত্য হতে পারে। কিন্তু আমার বিশ্বাস, সে-রকম সময় অত্যন্তই দুর্লভ, এবং অন্য-কোনও আশা যখন থাকে না একমাত্র তখনকার সম্পর্কেই কথাটা খাটে। এ-কথা খুবই সত্য যে ভারত-সরকারের শক্তি যদি ধ্বসে পড়ে, এবং বিরোধী সৈন্যবাহিনীগুলি যদি অনিবার্যভাবেই এসে দেখা দেয়, এবং চীনের আজ যে-অবস্থা ঘটেছে ভারতবর্ষেরও যদি সেই অবস্থা ঘটে—অবস্থা আরও খারাপ হবে, কেন না ধর্ম- জাতি- ও ভাষা- গত পার্থক্য ভারতবর্ষে আরও বেশী—তাহলে কিছু-কিছু সামাজিক ও অর্থনৈতিক দুর্নীতির হয়ত অবসান ঘটবে। কিন্তু যে মৌলিক ঐতিহ্য, রুচিবোধ ও অভ্যাসের অভাবে সমাজবাদী অথবা ব্যষ্টি-কেন্দ্রিক কোনও রকমেই সভ্যজীবন গড়ে তোলা যায় না, এইসব সংকটকাল তাকে ধ্বংস করে। গত মহাযুদ্ধ যেমন করেছিল। যুদ্ধের মাধ্যমে নয়, শাসনতন্ত্রসম্মত উপায়ের মাধ্যমে যখন সামাজিক অথবা অর্থনৈতিক অগ্রগতির জন্য সংগ্রাম চলতে থাকে, একমাত্র তখনই এই মৌলিক ঐতিহ্য, রুচিবোধ ও অভ্যাসের বিকাশ হয়।

আমার মনে হয়, গণতান্ত্রিক বিশ্ব মহত্তম যে রাজনৈতিক নেতার জন্ম দিয়েছে, তিনি আব্রাহাম লিংকন। সাধারণ মানুষের প্রতি তাঁর সহানুভূতি ছিল অত্যন্তই তীব্র, কিন্তু তিনি বুঝেছিলেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সম্মুখে দাসত্বপ্রথা নয়, ইউনিয়নের প্রশ্নটিই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। ইউনিয়নের যদি অবসান ঘটে, তাহলে শুধু দাসত্বপ্রথাই যে টিকে থাকবে, তা নয়, ইউরোপের মত আমেরিকাও তাহলে জাতীয়তাবাদী বিভিন্ন রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়ে পড়বে। ইউরোপ থেকে সেইসব রাষ্ট্রে তখন জাতি- ও ভাষা- বুদ্ধিপরায়ণ মানুষদের অনুপ্রবেশ ঘটবে; শুল্ক ও অস্ত্র-সজ্জার প্রাচীর উঠবে তাদের মধ্যে; ফলত নৈরাশ্য, দারিদ্র্য ও অন্তহীন যুদ্ধবিগ্রহই

তাদের ভাগ্যলিপি হয়ে দাঁড়াবে; এবং মনরো নীতি, ও ১৭৮৭ সনে গণতন্ত্রের যে মহান পরীক্ষার সূত্রপাত হয়েছিল তারও অবসান ঘটবে। সুতরাং দাসত্বপ্রথার প্রশ্নে যুদ্ধ চালাতে অসম্মত হয়ে তিনি ইউনিয়নের ঐক্যরক্ষার সংগ্রামে ব্রতী হলেন। তিনি বুঝেছিলেন, ঐক্যকে যদি তিনি অক্ষুণ্ণ রাখতে পারেন, তাহলে এইসব মারাত্মক সঙ্কটকেই যে শুধু এড়ান যাবে, তা নয়, দাসত্বপ্রথারও তাহলে অনিবার্যভাবেই একদিন অবসান ঘটবে।

আমার মনে হয়, ভারতবর্ষের সম্মুখে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ যে-প্রশ্নটি আজ দেখা দিয়েছে তা হল এই যে ভারতবর্ষ কি আজ মূলত গণতান্ত্রিক ও শাসনতন্ত্র-সম্মত এক ফেডারেশন হিসেবে তার মুক্তি অর্জনে সচেষ্ট হবে, নাকি সে তার জন্য বিপর্যয়ের পথটাকেই অবলম্বন করবে। বিশ্বের সম্মুখেও এ আজ অত্যন্তই গুরুত্বপূর্ণ এক প্রশ্ন। ভারতবর্ষ যদি প্রথম পথটাকে বেছে নেয় তাহলে তার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের শুভবুদ্ধিই দেশীয় রাজ্যগুলিকে ধীরে ধীরে নিয়মতান্ত্রিক রাজত্বে পরিণত করবে, সাম্প্রদায়িকতা এবং জাতি- ও ভাষা- বুদ্ধির স্থলে প্রতিষ্ঠিত করবে ভারতীয় দেশপ্রেম ও জনহিতৈষণাকে, ধীরে ধীরে ভারতবর্ষকে সে স্বহস্তে তার শাসন-ব্যবস্থার পূর্ণ নিয়ন্ত্রণভার গ্রহণে সমর্থ করে তুলবে, এবং সমাজবাদের সঙ্গে উপযুক্ত-পরিমাণ ব্যক্তি-স্বাধীনতার সমন্বয়কেও সে সম্ভব করবে। আর ভারতবর্ষ যদি তাব শাসনতান্ত্রিক ঐক্যকে হারায়, তাহলে সবই গেল। সঙ্কটের অন্ধকারে সে তাহলে নিমজ্জিত হবে; জাতি হিসেবে তার পরিচয়কে এবং আপন ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতাকে সে তাহলে হারাবে। সরকারই যদি না থাকে, স্বায়ত্ত-শাসন অথবা সমাজবাদ—কোনওটাই তাহলে সম্ভব হবে না।

কিন্তু সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে যে-শাসনতন্ত্র রচিত হয়েছে, যার দ্বারা গ্রেট ব্রিটেনের হাতে অসংখ্য রক্ষাকবচ তুলে দেওয়া হল, এবং প্রতিটি কায়েমী স্বার্থ ও সম্পত্তি-মালিকানার অধিকার যার দ্বারা সুরক্ষিত হয়েছে, তার মাধ্যমে ভারতবর্ষের পক্ষে কী ভাবে আপন শাসন-ব্যবস্থার দায়িত্বভার গ্রহণ এবং তার শান্তি ও সত্যকারের সমৃদ্ধির জন্য আভ্যন্তর ক্ষেত্রে সামাজিক ও অর্থনৈতিক যে-সমস্ত সংস্কারের একান্ত প্রয়োজন কী ভাবে তার ব্যবস্থা করা সম্ভব, আবার এই প্রশ্ন আপনি তুলবেন। আমার উত্তর দ্বিবিধ। প্রথমত, শাসন-ব্যবস্থার সমস্ত ক্ষমতা যদি কংগ্রেসের হাতে থাকত, এবং সেই ক্ষমতাকে প্রয়োগ করে কংগ্রেস যদি তার বিরোধী সমস্ত শক্তিকে দমন করে বলপূর্বক মতৈক্যসাধনে সমর্থ হত, একমাত্র তাহলেই কংগ্রেসের আপন অভিপ্রায় অনুযায়ী মূলত পৃথক একটি শাসনতন্ত্র রচনা সম্ভব হত বলে আমি মনে করি,—অন্যথায় নয়। বিদেশী শাসনের হাত থেকে মুক্তিলাভে কৃতসংকল্প একটি কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিদেশী-বিরোধী জাতীয়তাবাদকে কংগ্রেস কাজে লাগিয়েছে। কংগ্রেসের আসল শক্তির এইটেই উৎস, নাকি ব্রিটিশ-শাসনের অকস্মাৎ যদি অবসান ঘটে, কংগ্রেস তাহলে মুসলিম সম্প্রদায়, দেশীয় রাজন্যবর্গ, সম্পত্তিবান শ্রেণী ও জনসাধারণের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় আনুগত্য লাভ করে শাসনতন্ত্রসম্মত পন্থায় সর্বভারতীয় শাসন-ব্যবস্থা পরিচালনা করতে সমর্থ হবে—এ আপনি আমার চাইতে অনেক ভাল বুঝবেন। আমার ধারণা অবশ্য এই যে বর্তমান শাসনতন্ত্রে সাম্প্রদায়িকতা, রাজন্যবর্গ ও সম্পত্তিবান শ্রেণীকে যে-সব সুবিধা দেওয়া হয়েছে, কংগ্রেসও যদি না সর্বাংশে না হলেও মৌলিক কয়েকটি বিষয়ে সেই একই সুবিধা দিত, তাহলে কোনও সময়েই তার পক্ষে সারা ভারতের জন্য সকলের সম্মতিক্রমে একটি উদার শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হত না। আর বলপূর্বক সে যদি ক্ষমতার আসনে অধিষ্ঠিত হবার চেষ্টা করত, তাহলে তাকে গৃহযুদ্ধের সম্মুখীন হতে হত। সেক্ষেত্রে

হয় সে পুলিশ ও সৈন্যবাহিনীর সাহায্যে একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে সকল একনায়কতন্ত্রেই যা দেখা যায় সেই প্রচণ্ড দমননীতির আশ্রয় নিতে বাধ্য হত, আর নয়ত ভারতবর্ষের ঐক্যরক্ষার প্রয়াসই তাকে বর্জন করতে হত। এই কারণেই, বাস্তব রাজনীতির দিক থেকে বর্তমান শাসনতন্ত্রের মৌলিক কোনও বিকল্প যে সম্ভব ছিল, এমন কথা আমার মনে হয় না।

আমার দ্বিতীয় উত্তর এই যে এই শাসনতন্ত্রের মধ্যে বিকাশলাভের অশেষ সম্ভাবনা বর্তমান, এবং এর মধ্যে যে-সমস্ত ত্রুটি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, তৎসত্ত্বেও শাসন-ব্যবস্থা এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংস্কারের জন্য যে অভিজ্ঞতা ও শক্তি প্রয়োজন, এরই মাধ্যমে ভারতবর্ষের ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রাণ-চেতনা সেই অভিজ্ঞতা ও শক্তির বিকাশ ঘটাতে পারে; আপাতত তার পক্ষে এইটিই শ্রেষ্ঠ পন্থা। সারা ভারতের শাসন- ও প্রতিরক্ষা- ব্যবস্থার গুরুভার দায়িত্ব গ্রহণে সমর্থ হবার জন্য ভারতবর্ষের পক্ষে তার বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও নিয়মতান্ত্রিক অভ্যাস-গুলিকে যতখানি দৃঢ় ও সজ্ঞান করে তুলবার প্রয়োজন রয়েছে, তা করে তুলবামাত্র ভারতবর্ষ স্ট্যাটুট অব ওয়েস্টমিনস্টার-এ বর্ণিত স্বাধীনতা অর্জন করতে পারবে; সে-পথ তার সম্মুখে অবারিত রয়েছে। এ-কথা মনে করবার সপক্ষে যে-সব যুক্তি বর্তমান, এই চিঠিতে আমি তার পুনরাবৃত্তি করব না। টুয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরি পত্রিকায় আমার যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে, তাতে এইসব যুক্তির কথা আমি সবিস্তারে লিখেছি। আমি শুধু এইটুকু এখানে বলব যে ভারতবর্ষের মত এত বিরাট ও বিচিত্র একটি ভূখণ্ডে পরিবর্তনের প্রাথমিক পর্যায়ে শাসন-ব্যবস্থা যাতে অচল হয়ে না পড়ে তারই জন্য কিছু-কিছু রক্ষাকবচের গুরুতর প্রয়োজন দেখা দিতে পারে। কিন্তু যে-দেশে এত বিশ্ববিদ্যালয় এবং জনপ্রিয় সংবাদপত্র রয়েছে, সে-দেশের জনমত ও রাজনৈতিক সংস্থাগুলি যদি দাবি করে যে জনসাধারণের দ্বারা নির্বাচিত আইন-সভার কাছে দায়ী মন্ত্রিসভার হাতে দায়িত্বভার তুলে দিতে হবে, তাহলে এইসব রক্ষাকবচের দ্বারাও সেই দাবিকে প্রতিরোধ করা বোধহয় সম্ভব হবে না। অবশ্য এইসব মন্ত্রিসভা ও আইন-সভার যদি শাসন-ব্যবস্থা সংক্রান্ত প্রাথমিক কর্তব্য পালনের মোটামুটি যোগ্যতা থাকে। রক্ষাকবচের যে ব্যবস্থা রাখা হয়েছে, তাতে এ-ব্যাপারে একটু বিলম্ব ঘটান যেতে পারে, কিন্তু একে নিরুদ্ধ করা সম্ভব হবে না। দায়িত্বশীল শাসন-ব্যবস্থার সমগ্র ইতিহাসে এই কথাই সর্বত্র প্রমাণিত হয়েছে।

শুধু তা-ই নয়, রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংস্কারে ব্রতী রাজনৈতিক দলগুলিকে বিকশিত করে তুলবার পূর্ণ সুযোগও এই শাসনতন্ত্রে পাওয়া যাবে। এই রাজনৈতিক দলগুলিই হল সেই গতিশীল শক্তি, শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে যা গতি ও প্রাণ সঞ্চার করে। এরা যাতে কাজ শুরু করে দিতে পারে, তার জন্য এই শাসনতন্ত্র জনসমর্থনপুষ্ট এক পর্যাপ্ত ক্ষেত্রেরও ভিত্তি রচনা করে দিয়েছে। এ-কথা বলবার কারণ, প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষদের মধ্যে শতকরা চল্লিশ জনেরও বেশী ভোটাধিকার লাভ করবে।

তা ছাড়া নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে এই শাসনতন্ত্রেরও আত্মবিকাশের অশেষ সম্ভাবনা বর্তমান। দায়িত্বশীল শাসন-ব্যবস্থার প্রথা অনুসারে, যে-সমস্ত পরিবর্তন সর্বাপেক্ষা মৌলিক, অন্তত নূতন কারও হাতে ক্ষমতা ও দায়িত্ব তুলে দেবার জন্য যে-সব পরিবর্তনের প্রয়োজন দেখা দেয়, তা ঘটাবার জন্য শাসনতন্ত্রের বিধিনিয়ম-গুলিকে না পালটিয়ে বরং [তার বদলে] রীতি ও প্রথাকে পালটিয়েই সে-প্রয়োজন মেটান হয়ে থাকে। দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায়, এককালে যা "পরামর্শ" মাত্র ছিল, ধীরে ধীরে তা বাধ্যতামূলক হয়ে উঠেছে, এই যে প্রথা—এরই ভিত্তিতে অধিকাংশ

ক্ষেত্রে এ-দেশে পার্লামেণ্টের ক্ষমতা ও বিদেশে ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাসের প্রতিষ্ঠা ঘটেছে। তা ছাড়া, যে-প্রথা অনুযায়ী প্রধানত পার্লামেণ্টই শাসনতন্ত্রের বিষয়বস্তুকে পরিবর্তিত করবার ক্ষমতা রাখে, সংশ্লিষ্ট দেশের মানুষদের কাছে তা আপত্তিকর মনে হলেও, তার কতকগুলি বাস্তব সুবিধা বর্তমান। সমস্ত শাসনতন্ত্রেরই মস্ত একটা সমস্যা এই যে সেখানে এমন একটা ব্যবস্থা রাখার প্রয়োজন ঘটে যাতে দলীয় রাজনীতির স্বার্থে তার কোনও পরিবর্তন সাধন সম্ভব না হয়; সত্যিকারের একটা জাতীয় দাবি দেখা দিলে একমাত্র তখনই যাতে তার পরিবর্তন ঘটান যায়। দলের স্বার্থে সহজেই যে-সমস্ত শাসনতন্ত্রের পরিবর্তন ঘটান সম্ভব, বিশৃঙ্খলা ও একনায়কতন্ত্রের মধ্যে তার বিলুপ্তির আশঙ্কা রয়েছে। আবার যে-সব শাসনতন্ত্র অত্যন্তই অনমনীয়, সত্যিকারের সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রগতিও তার দ্বারা ব্যাহত হয়ে থাকে। যে-প্রথা ডোমিনিয়ন স্বাধীনতার স্ফূর্তি ঘটিয়েছে, বস্তুত সে অতি সুন্দরভাবে সমস্যার সমাধান করেছে বলতে হবে। কেননা এর তাৎপর্য এই যে পরিবর্তন অতি সহজেই ঘটান যেতে পারে বটে, কিন্তু তার পিছনে জাতির সম্মতি থাকা চাই; শুধু দলীয় জয়লাভের কারণে পরিবর্তন ঘটান যাবে না।

১৭৮৭ সনের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত ভারতবর্ষও এখন লিপিবদ্ধ একটি শাসনতন্ত্রের ভিত্তিতে তার আত্মশাসিত জীবনের ক্ষেত্রে উত্তীর্ণ হতে চলেছে; ভারতবর্ষের ক্রমপ্রসরমাণ প্রয়োজন অনুযায়ী সহজেই—তবে অতি সহজে নয়—এই শাসনতন্ত্রের পরিবর্তন ঘটান যেতে পারে। এই যে ঘটনা, এর তাৎপর্য অপরিসীম বলেই আমি মনে করি। শাসনতন্ত্র নিয়ে হেলাফেলা করাটা বর্তমানে একটা ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছে। তার কারণ, একটি বিশ্ব-শাসনতন্ত্র—যার প্রয়োজন এখন সর্বাধিক —না থাকায় আন্তঃরাষ্ট্রিক বিশৃঙ্খলতা আজ যে-পরিমাণে কর্মহীনতা, যুদ্ধবিগ্রহ ও একনায়কতন্ত্রের সৃষ্টি করেছে, তাতে দেশের পর দেশে নিয়মতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা অসম্ভব হয়ে পড়ছে। ভারতবর্ষও যাতে তার ঐক্য হারিয়ে এই নৈরাজ্য ও যুদ্ধবিগ্রহের দুর্যোগের মধ্যে গিয়ে না পড়ে, তার ব্যবস্থা করার ঐকান্তিক প্রয়োজন বর্তমান।

এ-কারণে আমি মনে করি, শাসনতন্ত্রের ধরনটা কেমন হবে, আজকের ভারতবর্ষে তার গুরুত্ব সর্বাধিক নয়। সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন এই যে তাকে একটি প্রবল, গঠনাত্মক ও সৃষ্টিশীল পার্টি-ব্যবস্থার বিকাশ ঘটাতে হবে; এমন অন্তত দুটি দল থাকা প্রয়োজন, যাদের প্রত্যেকেই ভারতবর্ষের সমস্ত অঞ্চল ও শ্রেণীর এতখানি আনুগত্য পেতে পারে, যাতে তার পক্ষে ভারত-শাসনব্যবস্থার গুরুভার দায়িত্ব বহন সম্ভব হয়। প্রতিটি দলের অভ্যন্তরে আদর্শবাদ ও প্রতিক্রিয়াশীলতা, দুর্নীতি ও সাধুতা এবং জনহিতৈষা ও লোভের যে দ্বন্দ্ব চলতে থাকে, এবং বিভিন্ন দলের মধ্যে যে সংঘর্ষ (শাসনতন্ত্রসম্মত হলেও তার তীব্রতা কিছু কম নয়) দেখা দেয় সেই দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষের মধ্য দিয়েই জাতির রাজনৈতিক বিকাশ ঘটে, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংস্কারের জন্য সে প্রস্তুত হয়ে ওঠে। শাসনব্যবস্থার দায়িত্ব বহন করার ফলে এবং নিজেদের প্রতিশ্রুতি ও আদর্শকে সফল করে তুলবার জন্য রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে একটা শৃঙ্খলানুবর্তিতা দেখা দেয়। এই রাজনৈতিক দলগুলি সামগ্রিক জনমানসকে পূর্বোক্তভাবে প্রস্তুত করে তুললে তবেই সাম্প্রদায়িকতা ও পৃথক নির্বাচন-প্রথার অবসান, দেশীয় রাজ্যগুলিতে প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি, সত্যকারের একটি ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর বিকাশ, ব্রিটেন ও ভারতবর্ষের মধ্যে অর্থনৈতিক সম্পর্কের পুনর্বিন্যাস, জনজীবনের মানোন্নয়ন, কায়েমী স্বার্থকে প্রতিরোধ, এবং ভোট-কুড়ান বন্ধ করার জন্য যে শক্তি প্রয়োজন তার উদ্ভব সম্ভব

হবে। চূড়ান্ত ভবিষ্যৎ সম্পর্কে যাঁর যে অভিমতই থাক না কেন, সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আজ এই যে তিন কোটিরও বেশী ভোটদাতার সংস্পর্শে এসে গোটা বার আইন-সভার হাজার দুয়েক সদস্য নির্বাচনের মাধ্যমে যে গঠনাত্মক বাস্তব অভিজ্ঞতা হবে, নরনারী নির্বিশেষে ভারতবর্ষের যুবসমাজের আজ সেই অভিজ্ঞতা অর্জনে ব্রতী হওয়া প্রয়োজন। ভারতশাসনব্যবস্থার অধিকাংশই থাকবে আইন-সভার এই সদস্যদের হাতে, সামাজিক ও সাধারণ সব সংস্কারের পরিকল্পনাও তাঁরাই রচনা করবেন, এবং মতবাদের ক্ষেত্রে নয়, বাস্তব ক্ষেত্রে এবং তথ্য সমালোচনা ও ফলাফল-সাপেক্ষে ভারতশাসনব্যবস্থার অন্যান্য দায়িত্বও তাঁদেরই গ্রহণ করতে হবে। গঠনাত্মক বাস্তব অভিজ্ঞতার এই ভিত্তি রচিত হলে, তবেই আর-সব-কিছু পাওয়া যাবে।

উপসংহারে একটি কথা বলতে চাই। খুব সম্ভব আপনি এই উত্তর দেবেন যে যা-কিছু আমি বলেছি, ইতিহাসের মার্ক্সীয় অথবা অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা তাতে উপেক্ষিত হয়েছে; হয়ত বলবেন যে নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে সমাজবাদের প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়, তার জন্য সর্বহারাদের শ্রেণী-চেতনার ভিত্তিতে বৈপ্লবিক একনায়কতন্ত্রের প্রয়োজন। আমার পত্র ইতিমধ্যেই বড় দীর্ঘ হয়ে পড়েছে; এই দীর্ঘপত্রের শেষে আর আমি সমাজবাদী-ব্যক্তিবাদী বিতর্কে প্রবৃত্ত হতে চাই না। আমি শুধু এইটুকু বলব, এ-দেশের সমাজবাদী মনস্বীদের অধিকাংশই এই সিদ্ধান্ত করেছেন যে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র-ব্যবস্থার মাধ্যমেই সমাজবাদী আদর্শকে বাস্তবে রূপায়িত করা সম্ভব। তাঁদের বিবেচনায় লক্ষ্যার্জনের এইটিই শ্রেষ্ঠ পন্থা। তার কারণ, উদার যুগের সুফলগুলি এতে অক্ষুণ্ণ থাকে এবং কমিউনিজ্‌মের পূর্ব-পর্যায়ে আজকাল যে ফ্যাসিজ্‌মের উদ্ভব ঘটে থাকে, সেই ফ্যাসিজ্‌মের পথও এতে রুদ্ধ হয়। আমার মতামতের সপক্ষে আমার নিজের যুক্তি আমি দেখাতে চাই না; শুধু ছোট্ট একখানি বইয়ের উল্লেখ করতে চাই! বইখানির নাম মডার্ন ট্রেণ্ড্‌স ইন সোশ্যালিজ্‌ম। বইখানি পড়ে আমার খুবই ভাল লেগেছে। তরুণ কয়েকজন সমাজবাদী এই বইটি লিখেছেন; সম্পাদনা করেছেন আমার এক বন্ধু, জি. ই. জি. ক্যাটলিন।

পরিশেষে, চিঠিখানি অত্যন্তই বড় হয়ে গেল বলে আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি। কিন্তু আমার মনে হয়, এতকাল পরিশ্রমের পর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে মৌলিক যে-সব সিদ্ধান্ত আমি করেছি, ভবিষ্যৎ ভারতের একজন নেতার সম্মুখে তার কয়েকটিকে পেশ করে আমি যুক্তিযুক্ত কাজই করলাম। বিপর্যয়ের পথ আর শাসনতন্ত্রসম্মত পথ, কংগ্রেসকে আজ এ-দুয়ের একটিকে বেছে নিতে হবে। ইউরোপের অভিজ্ঞতা থেকে দ্বিতীয় পথটির সপক্ষে আর প্রথম পথটির বিপক্ষে যে-সব যুক্তি আমি আহরণ করেছি, সেগুলির কথা আপনাকে বলা উচিত বলেই আমার মনে হয়।

উপসংহারে আবার জানাই, আপনি ভারতবর্ষে ফিরে যাবার আগে যে আর আপনার সঙ্গে আমার দেখা হবে না, তার জন্য আমি অত্যন্তই দুঃখিত; আশা করি পরে হয়ত আমাদের দেখা হবে। আপনার স্ত্রীর অবস্থার উন্নতি হচ্ছে বলে খুবই আশা করছি।

ভবদীয়
লোথিয়ান

জওহরলাল নেহরু, এস্কোয়ার,
পেন্‌শন এরহার্ড্‌ট. বাডেনভাইলার

১১৮ লর্ড লোথিয়ানকে লিখিত

বাডেনভাইলার,
১৭ জানুয়ারি, ১৯৩৬

প্রিয় লর্ড লোথিয়ান,

আপনার দীর্ঘ পত্রটি আমি একাধিকবার পাঠ করেছি। টুয়েণ্টিয়েথ সেঞ্চুরিতে প্রকাশিত আপনার প্রবন্ধটিও পড়লাম। যে-সব বিষয় সম্পর্কে আমাদের সকলেরই গভীর আগ্রহ বর্তমান, এবং আমাদের সকলেরই ভাগ্য যার সঙ্গে গভীরভাবে সংশ্লিষ্ট রয়েছে, সে সম্পর্কে এত সবিস্তারভাবে আমার কাছে লিখবার জন্য আপনাকে যে কষ্ট স্বীকার করতে হয়েছে, তার জন্য আবার আপনাকে ধন্যবাদ জানাই। আপনার পত্রের উত্তর দিতে আমি ঈষৎ অসুবিধা বোধ করছি। তার কারণ, এত সব বিষয় নিয়ে আপনি আলোচনা করেছেন যে তার যথাযথ একটা উত্তর দিতে হলে পৃথিবীর গুরুতর সমস্যাগুলির অধিকাংশ নিয়েই আমাকে আলোচনা করতে হয়। তা যে করি এমন সাধ্য আমার নেই। তবে খুব বেশী যুক্তিতর্কের আশ্রয় না নিয়ে কয়েকটি বিষয় সম্পর্কে আমি দু-চার কথা বলবার চেষ্টা করব, এবং আমার চিন্তা-ভাবনার কিছু আভাস তাতে হয়ত আপনি পাবেন।

মানবেতিহাসে আমরা যে অত্যন্তই সৃষ্টিশীল ও পরিবর্তনশীল এক যুগে বাস করছি, এ-বিষয়ে আমি আপনার সঙ্গে সম্পূর্ণই একমত। সত্যিই মনে হয় যে একটি যুগকে শেষ করে আর-এক যুগের দ্বারপ্রান্তে আমরা উপনীত হয়েছি। এ-সম্পর্কেও আমি আপনার সঙ্গে একমত যে বুদ্ধিমান ও অনুভূতিপ্রবণ ব্যক্তিদের চিত্তকে যে-দুটি আদর্শ এখন সর্বাধিক প্রভাবিত করছে তা হল : সার্বভৌম রাষ্ট্রগুলি যে নৈরাজ্যের সৃষ্টি করেছে, তাদের ঘৃণা, ভয় ও বিরোধসহ সেই নৈরাজ্যের উচ্ছেদসাধন এবং এক বিশ্ব-বিধান প্রতিষ্ঠা; দ্বিতীয় হল সমাজবাদী আদর্শ। এ-আদর্শের লক্ষ্য "এমনই একটি প্রথা, যাতে পৃথিবী ও তার সম্পদসমূহকে সমাজের সকল মানুষের মঙ্গলার্থে কাজে লাগান হবে· সমাজের প্রতি তাঁদের সেবার পরিমাণ অনুযায়ী, সম্পদের ব্যক্তিগত মালিকানার আকস্মিকতা অনুযায়ী নয়।" আপনি বলছেন, লীগ অব নেশন্স হল প্রথম আদর্শটির প্রতীক। প্রতিষ্ঠানটি যে ব্যাপক মনোভাবের প্রতিনিধিত্ব করছে, তাতে সে-দিক থেকে কথাটা সত্য বলেই আমি মনে করি। বাস্তবে এই প্রতিষ্ঠানটি কিন্তু আদৌ সে-পথে কাজ করছে না; আপন অবস্থার বিশেষ সুবিধা অথবা নিরঙ্কুশ সার্বভৌমত্ব পরিহারের বিন্দুমাত্র বাসনা যাদের নেই, এবং এই পৃথিবীকে নিজেদের পক্ষে নিরাপদ রাখবার জন্য লীগকে যারা কাজে লাগাতে চেষ্টা করে, এমন কয়েকটি বৃহৎ রাষ্ট্রের নীতিরই সে প্রতিনিধিত্ব করছে।

আর-একটি প্রশ্ন উঠবে। লীগের পিছনে যে-সব ব্যক্তি রয়েছেন, সত্যিই যদি তাঁরা সার্বভৌম রাষ্ট্রগুলির নৈরাজ্যের অবসান কামনা করতেন, অথবা জনমতের চাপে সেই পথেই যদি তাঁদের চলতে হত, তাহলেও কি সমাজ-ব্যবস্থার মৌলিক পরিবর্তন না ঘটিয়ে, অর্থাৎ—ভাষান্তরে—সমাজবাদকে গ্রহণ না করে সেই লক্ষ্য তাঁরা অর্জন করতে পারতেন? বলাই বাহুল্য, তার জন্য সাম্রাজ্যবাদকে তাঁদের পরিহার করতে হত। বর্তমান পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে অতিক্রম করে লীগ আজ কিছুই দেখতে পায় না; বস্তুত সাম্রাজ্যবাদের অবসান ঘটাবার কথাও সে চিন্তা করছে না। আসলে যে-স্থিতাবস্থার ভিত্তির উপরে সে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সেই স্থিতাবস্থাকে বাঁচিয়ে রাখাই হল লীগের প্রধান কাজ। সুতরাং কার্যত দেখা যাচ্ছে, লোকে এই প্রতিষ্ঠানটিকে যে-আদর্শের প্রতীক বলে মনে করে, আসলে কিন্তু সেই আদর্শকে বাস্তবে রূপায়িত করবার পথে সে এক বাধাস্বরূপ। এ-কথা যদি সত্য হয় যে

সাম্রাজ্যবাদ আর সার্বভৌম রাষ্ট্রগুলির নৈরাজ্য হল পুঁজিবাদের বর্তমান পর্যায়েরই অনিবার্য পরিণতি, এবং এ-কথা সত্য বলেই আমি বিশ্বাস করি, তাহলে এই সিদ্ধান্তই করতে হয় যে দ্বিতীয়টিকে যদি বর্জন না করেন ত প্রথমটিকেও বর্জন করা যাবে না। বস্তুত, লীগকে যে-সব আদর্শের প্রতীক বলে মনে করা হয়, সেইসব আদর্শের সঙ্গে লীগের কিছুমাত্র সম্পর্ক নেই; বরং সেইসব আদর্শকে সফল করে তুলবার পথে সে বিঘ্ন সৃষ্টিই করে থাকে। আবার অন্য নিরপেক্ষভাবে এই আদর্শগুলিও এমনই যে তাদের অনুসরণ করতে গেলে কানাগলিতে ঢুকে পথ হারাতে হয়। লীগকে যে প্রায়ই অর্থহীন সব পরস্পরবিরোধী ব্যাপারের মধ্যে জড়িয়ে পড়তে হয়, তাতে তাই বিস্ময়ের কিছু নেই। স্থিতাবস্থার ভিত্তিতে তার পক্ষে সম্মুখে অগ্রসর হওয়া কোনক্রমেই সম্ভব হতে পারে না। তার কারণ এই স্থিতাবস্থার সাম্রাজ্যবাদী ও সামাজিক চরিত্র, উভয়ের বিচারেই দেখা যাবে যে এই স্থিতাবস্থাই হল বিপত্তির মূল কারণ। এ অতি ন্যায্য ও সঙ্গত কাজ যে আবিসিনিয়ায় ইতালি যে অভিযান চালিয়েছে, লীগ তাকে ধিক্কার দেবে ও সেই অভিযানকে দমন করবার চেষ্টা করবে; কিন্তু যে-প্রথাকে লীগ রক্ষা করে থাকে, যাকে সে চিরকাল টিকিয়ে রাখবার প্রয়াস পায়, সেই প্রথারই অনিবার্য পরিণতি এই অভিযান। মুসোলিনি যে বিদ্রূপ করে বলেন, তাঁর মত এত নগ্নভাবে না করলেও অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ইতিপূর্বে যা করেছে, এখনও যা করছে, তিনিও তা-ই করছেন মাত্র, কোনও সাম্রাজ্যবাদীই তাঁর এই বিদ্রূপের কোনও সদুত্তর খুঁজে পাবে না। পূর্ব আফ্রিকায় ইতালি যে বোমা-বর্ষণ করেছে তাকে ধিক্কার দিয়ে অতঃপর ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে ব্রিটিশ সরকার যে বোমাবর্ষণ করেছেন তার সম্পর্কে যখন মর্যাদাসূচক নীরবতা অবলম্বন করা হয়, তখন ব্যাপারটাকে অযৌক্তিক বলে মনে না হয়ে পারে না।

আপনার নিজেরই এই মত যে লীগের সনদে যে-পন্থার কথা বলা হয়েছে, তদনুযায়ী লক্ষ্যার্জন সম্ভব হবে বলে মনে হয় না। তাহলে দেখা যাচ্ছে বিশ্ব-বিধান ও শান্তির সপক্ষে অস্পষ্ট ও ব্যাপক একটা মনোভাবের প্রতিনিধিত্ব করা ছাড়া আর বিশেষ-কিছু আশাই লীগ দিতে পারছে না। সেই মনোভাবকে সংহত করবার ও বিরোধকে ঠেকিয়ে রাখবার ব্যাপারে লীগ মাঝে-মাঝে সহায়তা করে থাকে মাত্র।

যে-দুটি আদর্শের আপনি উল্লেখ করেছেন, পরস্পরের সঙ্গে তারা অঙ্গাঙ্গীভাবে সম্পৃক্ত, এবং তাদের বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব বলে আমি মনে করিনে। দ্বিতীয় আদর্শ অর্থাৎ সমাজবাদের মধ্যেই প্রথম আদর্শটি রয়েছে, এবং এ-কথা বলা যেতে পারে যে বিশ্ব জুড়ে যখন সমাজবাদের বাস্তব রূপায়ণ ঘটবে, প্রকৃত বিশ্ব-বিধান ও শান্তিও একমাত্র তখনই পাওয়া যাবে। আপনি এ-কথা ঠিকই বলেছেন যে প্রকৃত সমাজবাদের প্রতিষ্ঠা ঘটাতে হলে আমাদের মতামত ও চরিত্রগত দৃঢ়মূল অভ্যাসগুলির আমূল পরিবর্তন সাধন প্রয়োজন, এবং অবশ্যই তা সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। তবে অবস্থা অনুকূল হলে এবং সংশ্লিষ্ট বহুসংখ্যক মানুষের শুভেচ্ছা থাকলে একপুরুষের মধ্যেই এইসব পরিবর্তন ঘটতে পারে। কিন্তু অবস্থা এখন যেমন, তাতে শুভেচ্ছার পরিবর্তে প্রচণ্ডতম বিরোধিতা ও অশুভেচ্ছাই আমরা পাচ্ছি, এবং এ-কারণে আরও অনেক বেশী সময় লাগবার সম্ভাবনা। এখন যে-পরিবেশ ও অবস্থায় এই গভীর পরিবর্তন ঘটতে পারে, কী করে সেই পরিবেশ ও অবস্থা সৃষ্টি করা যায়, তা আমাদের ভেবে দেখতে হবে। এইটেই এখন প্রধান প্রশ্ন। এই প্রশ্নটাকে ভেবে দেখলেই ঠিকপথে পদক্ষেপ করা হবে। বর্তমান অবস্থায় দেখা যাচ্ছে পরিবেশ আমাদের বিরুদ্ধে, এবং যে ঘৃণা, স্বার্থপরতা ও আহরণলিপ্সা আমাদের বিরোধের পথে ঠেলে দেয়, বর্তমান পরিবেশ সেই অন্যায় বৃত্তিগুলিকে দমন করবার পরিবর্তে সেগুলিকে

আরও বাড়িয়ে তুলছে। এ-কথা সত্য যে এই মারাত্মক অসুবিধা সত্ত্বেও কিছু অগ্রগতি সম্ভব হয়েছে; এবং আমাদের মধ্যে কেউ-কেউ অন্তত আমাদের পুরনো অভ্যাস ও অভিমতগুলির বিরুদ্ধে দাঁড়াতে শুরু করেছেন। তবে এর গতি অত্যন্তই শ্লথ, এবং সে-তুলনায় বিরুদ্ধ প্রবণতা আরও দ্রুত বিকাশ লাভ করছে।

আহরণলিপ্সা এবং এই যে সব দৃঢ়মূল চিত্তবৃত্তির হাত থেকে আমরা এখন মুক্ত হতে চাইছি, পুঁজিবাদ এদের উদ্দীপ্ত করে তুলেছিল। প্রাথমিক পর্যায়ে পুঁজিবাদ অনেক ভাল কাজও অবশ্য করেছে; উৎপাদন বাড়িয়ে জীবনধারণের মানকে সে প্রভূত পরিমাণে উন্নত করে তুলেছে। অন্যান্যভাবেও পুঁজিবাদ একটা প্রয়োজনীয় উদ্দেশ্য সাধন করেছে, পূর্ববর্তী পর্যায়ের তুলনায় পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে নিশ্চয়ই একটা উন্নততর ব্যবস্থা বলা যেতে পারে। তবে প্রয়োজন ফুরিয়ে যাবার পরেও এই ব্যবস্থা টিঁকে রয়েছে বলে মনে হয়; এবং সমাজবাদের পথে সকল প্রগতিকে এই ব্যবস্থা যে শুধু বিঘ্নিত করছে তা নয়, সেইসঙ্গে আমাদের বহু অবাঞ্ছনীয় অভ্যাস ও প্রবৃত্তিকে সে উদ্দীপ্ত করে তুলেছে। যে-সমাজের ভিত্তি হল আহরণলিপ্সা, এবং যার প্রধান প্রেরণা হল মুনাফাবৃত্তি, সেই সমাজে বাস করে কী ভাবে যে আমাদের পক্ষে সমাজবাদের পথে চলা সম্ভব, তা আমি জানি না। সুতরাং, নূতন ও অধিকতর বাঞ্ছনীয় অভ্যাস ও চিত্তবৃত্তির বিকাশার্থে যথাসাধ্য এই আহরণলিপ্সু সমাজের ভিত্তিকে পরিবর্তিত করে মুনাফা-লোভকে দূর করবার প্রয়োজন রয়েছে। তা যদি করতে হয়, পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকেও তাহলে বিদায় দিতে হবে।

আপনি ঠিকই বলেছেন যে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যে নৈরাজ্য বর্তমান, পুঁজিবাদী ব্যবস্থা তার স্রষ্টা নয়। পুঁজিবাদী ব্যবস্থা তার পরে এসেছে। অতীতে রাষ্ট্রাভ্যন্তরে গৃহযুদ্ধের সে অবসান ঘটিয়েছে, অথবা তার তীব্রতাকে প্রশমিত করেছে। কিন্তু সেই সঙ্গে শ্রেণী-বিরোধকে সে তীব্রতর করে তুলেছে, এবং এই বিরোধের মাত্রা এতই বৃদ্ধি পেয়েছে যে ভবিষ্যতে তার ফলে গৃহযুদ্ধের সূত্রপাত হতে পারে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও আরও বৃহত্তর পটভূমিকায় নৈরাজ্যকে সে টিঁকিয়ে রেখেছে, এবং ছোটখাটো যুদ্ধবিগ্রহের পরিবর্তে সে বিরাট ও প্রচণ্ড সব আন্তর্জাতিক সংঘর্ষের সৃষ্টি করেছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, এই নৈরাজ্যের সে স্রষ্টা না হলেও অনিবার্যভাবেই এই নৈরাজ্যের মাত্রাকে সে বাড়িয়ে দেয়। নিজের অবসান না ঘটালে সে এই নৈরাজ্যের অবসান ঘটাতে পারবে না। বর্তমান কালের যে-সব সাম্রাজ্যবাদী শক্তি শুধু পৃথিবীর এক বৃহৎ অংশ ও মানবসমাজকে চূর্ণ ও শোষণ করেই ক্ষান্ত থাকছে না, পরস্পরের সঙ্গেও অবিরত সংঘর্ষে লিপ্ত হচ্ছে, সেই সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির জন্মদাতা এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থা।

ইতিহাসের যে জড়বাদী অথবা অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা হতে পারে, মার্ক্স হয়ত তার ভূমিকা সম্পর্কে অতিশয়োক্তি করেছেন। এই অতিশয়োক্তির সহজ কারণ এই যে ইতিপূর্বে একে বহুলাংশে উপেক্ষা করা হয়েছে; অন্তত এর সপক্ষে কিছুই প্রায় বলা হয়নি। কিন্তু আরও যে-সব কারণে ঘটনার রূপ নির্ধারিত হয়, তাদের প্রভাবকেও মার্ক্স কখনও অস্বীকার করেননি। তবে অর্থনৈতিক দিকটির উপরেই তিনি সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। এ-ব্যাপারে ঈষৎ বাড়াবাড়ি হয়ে থাকলেও তাতে কিছু যায় আসে না। আমার বিবেচনায় এই সত্যটা তবু থেকেই যায় যে ইতিহাসের মার্ক্সকৃত ব্যাখ্যাই একমাত্র ব্যাখ্যা, ইতিহাস যাতে কিছু-পরিমাণে বিশ্লেষিত হয়েছে, এবং ইতিহাসের অর্থটাকে যাতে পাওয়া যায়। এই ব্যাখ্যার সাহায্যে বর্তমান কালকে আমরা বুঝতে পারি। এটাও একটা উল্লেখযোগ্য ব্যাপার যে তাঁর ভবিষ্যদ্বাণীই সফল হয়েছে।

কী ভাবে সমাজবাদের প্রতিষ্ঠা হবে? আপনি বলছেন যে উৎপাদন ও বণ্টনের উপায়াবলীকে সার্বিকভাবে রাষ্ট্রায়ত্ত করলেই যে তার প্রতিষ্ঠা হবে, এমন আপনার মনে হয় না। তার জন্য কি মুনাফা-বৃত্তি ও আহরণলিপ্সার অবসান ঘটিয়ে তার জায়গায় সামাজিক ও সামবায়িক বৃত্তির উদ্ভব ঘটাবার প্রয়োজন হবে না? এবং বর্তমান ভিত্তির থেকে পৃথক এক ভিত্তির উপরে নূতন এক সভ্যতাকে গড়ে তুলবার প্রশ্নটিও কি এর সঙ্গে জড়িত নয়? ব্যষ্টিক উদ্যোগের অনেকখানিকেই হয়ত বর্তমান অবস্থাতেই রাখতে হবে; কতকগুলি বিষয়ে, যেমন সাংস্কৃতিক ইত্যাদি বিষয়ে তা অবশ্যই রাখতে হবে। কিন্তু বৈষয়িক অর্থে যে-সব ব্যাপার গুরুত্বপূর্ণ, তাতে উৎপাদন ও বণ্টনের উপায়াবলীকে রাষ্ট্রায়ত্ত করা অনিবার্য বলেই মনে হয়। রফা করবার চেষ্টা হয়ত হবে; কিন্তু পরস্পরবিরোধী ও বিবদমান দুটি ব্যবস্থাকে পাশাপাশি চলতে দেওয়া কারও পক্ষেই সম্ভব নয়। এ-দুটির মধ্যে একটিকে বেছে নিতেই হবে; এবং সমাজতন্ত্র যাঁর লক্ষ্য, তাঁর সামনে আর বাছাইয়ের প্রশ্ন নেই।

পূর্ণ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা যদি থাকে, গণতান্ত্রিক পন্থাতেই যে তাহলে সমাজবাদের প্রতিষ্ঠা সম্ভব, যুক্তির দিক থেকে এ-কথা মেনে নেওয়া যেতে পারে বলেই আমি মনে করি। কার্যত অবশ্য তাতে যথেষ্টই অসুবিধা ঘটবার সম্ভাবনা। তার কারণ সমাজবাদের বিরোধীরা যখন দেখবেন যে তাঁদের ক্ষমতা সংকটাপন্ন, গণতান্ত্রিক পন্থাকে তাঁরাই তখন পরিহার করবেন। সমাজবাদীদের পক্ষ থেকে গণতন্ত্রকে পরিহার করা হয় না, করা উচিতও নয়; পরিহার অন্য পক্ষই করবে। বলা বাহুল্য, তারই নাম ফ্যাসিজ্‌ম। কী করে তাকে এড়ান যেতে পারে? নানা ব্যাপারে গণতান্ত্রিক পন্থা সাফল্য অর্জন করেছে, কিন্তু রাষ্ট্র অথবা সমাজের মৌলিক ভিত্তিগত বিরোধ নিরসনে সে অদ্যাবধি সফল হয়েছে বলে আমার জানা নেই। প্রশ্ন যখন উঠবে, তখন যে গোষ্ঠী অথবা শ্রেণী রাষ্ট্র-ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রণ করছে, সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের দাবি অনুসারে রাষ্ট্র-ক্ষমতাকে তারা ছেড়ে দেবে না; তা তারা দেয় না। যুদ্ধোত্তর ইউরোপে, এবং গণতন্ত্রের অবক্ষয়ের মধ্যে এর অনেক দৃষ্টান্ত আমরা দেখেছি। জনসাধারণের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের শুভেচ্ছা, অন্তত নিষ্ক্রিয় স্বীকৃতি ব্যতিরেকে যে সমাজবাদী কোনও রূপান্তর সাধন সম্ভব নয়, তা বলাই বাহুল্য।

গ্রেট ব্রিটেন ও ভারতবর্ষের প্রসঙ্গে আপনার পত্রে এমন অনেক ধারণা ব্যক্ত হয়েছে দেখলাম, যার কোনও যুক্তি আছে বলে আমি মনে করি না। যে-সব তথ্য অনুযায়ী আপনি সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন, তার অনেকগুলিকেই যেহেতু আমি মানি না, তাই আপনার কিছু-কিছু সিদ্ধান্তও আমি মেনে নিতে পারছি না। আপনি বলেছেন, "ব্রিটেন তার পুরনো সাম্রাজ্যবাদ পরিহার করছে। সেই সঙ্গে সর্বজাগতিক জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার সংক্রান্ত দাবির মধ্যে যে নৈরাজ্যের আশঙ্কা নিহিত, তা যাতে নূতন যুদ্ধের সূত্রপাত না ঘটায়, অথবা সাম্রাজ্যবাদের এক নূতন প্রলয়ের মধ্যে যাতে না তার পরিসমাপ্তি ঘটে, ব্রিটেন এখন তারই উপায় উদ্ভাবনের প্রয়াসে যত্নশীল রয়েছে।" ব্রিটেন যে এই ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে, এ-কথা আমি একেবারেই মেনে নিতে পারছি না। ব্রিটেন তার পুরনো সাম্রাজ্যবাদ পরিহার করছে, এমন কোনও লক্ষণ আমি দেখতে পাচ্ছি না। কয়েকটি ক্ষেত্রে জনসাধারণের সামনে তার অন্য-এক চেহারাকে উপস্থাপন করা হয়েছে বটে, কিন্তু আসলে দেখছি তার সাম্রাজ্যবাদী ক্রিয়া-কলাপেরই পুনরাবৃত্তি ঘটছে, এবং প্রাণপণে এই সাম্রাজ্যবাদকেই সে আঁকড়ে ধরে থাকবার ও তাকে শক্তিশালী করে তুলবার চেষ্টা করছে। নূতন যুদ্ধ বাধুক, ব্রিটেন তা অবশ্যই চায় না। তার ক্ষুধার তৃপ্তি ঘটেছে; বরং তৃপ্তিসাধনের জন্য যেটুকু আহারের তার প্রয়োজন ছিল, তার বেশীই সে আহার করেছে। এখন যা তার

আছে, তার সম্পর্কে সে কোনও ঝুঁকি নিতে যাবে কেন? স্থিতাবস্থাকে সে এখন অক্ষুণ্ণ রাখতে চায়, কেননা তাতেই তার সুবিধে। নয়া সাম্রাজ্যবাদকে যে সে পছন্দ করছে না, তার কারণ এই নয় যে সাম্রাজ্যবাদে তার অরুচি এসেছে; পছন্দ করছে না এইজন্য যে এইসব নয়া সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে তার পুরনো সাম্রাজ্যবাদের বিরোধ ঘটতে পারে।

ভারতবর্ষে "শাসনতন্ত্রসম্মত পন্থা" অবলম্বনের কথাও আপনি বলেছেন। এই শাসনতন্ত্রসম্মত পন্থা বলতে কী বোঝাতে চেয়েছেন আপনি? গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র যেখানে বর্তমান, শাসনতন্ত্রসম্মত কার্যকলাপের কথা সেখানে আমি বুঝতে পারি। কিন্তু তা যেখানে নেই, শাসনতন্ত্রসম্মত পন্থাও সেখানে অর্থহীন। শাসনতন্ত্রসম্মত কথাটার অর্থ সেখানে নেহাতই আইনসম্মত। আর আইনসম্মত কাজের অর্থ হল, জনমতের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করে স্বেচ্ছাচারী যে শাসকবর্গ আইন বানাতে পারেন এবং ডিক্রী আর অর্ডিন্যান্স জারি করতে পারেন, সেই স্বেচ্ছাচারী শাসকবর্গের ইচ্ছার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ কাজ। আজকের জার্মানি অথবা ইতালিতে কাকে আপনি শাসনতন্ত্রসম্মত পন্থা বলবেন? ঊনবিংশ শতাব্দীর অথবা বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগের ভারতবর্ষে এমন কোন্ পন্থা ছিল, অথবা আজকের ভারতবর্ষেই বা এমন কোন্ পন্থা বর্তমান, যাকে শাসনতন্ত্রসম্মত পন্থা বলতে পারা যায়? ভারতবর্ষের জনসাধারণ যাকে যথেষ্টভাবে প্রভাবিত করতে পারে, এমন কোনও শাসনতন্ত্রসম্মত উপায়ের মাধ্যমে ভারতবর্ষে একটা পরিবর্তন ঘটাবার সম্ভাবনা তখন ছিল না (আজও নেই)। ভিক্ষা, অথবা বিদ্রোহ—এই দুটিমাত্র পথই তাদের সামনে ছিল। ভারতীয় জনসাধারণের এক বিপুলাংশের পক্ষে যে আপন ইচ্ছাকে কার্যকরী করা সম্ভব নয়, এতেই বোঝা যায় যে তাদের সামনে শাসনতন্ত্রসম্মত কোনও পথ উন্মুক্ত নেই। যাকে তারা অত্যন্তই অপছন্দ করে, হয় তার সামনে তারা নতিস্বীকার করতে পারে, আর নয়ত এমন পন্থা অবলম্বন করতে পারে, যা কিনা তথাকথিত শাসনতন্ত্র-সম্মত পন্থা নয়। অবস্থার বিচারে সেই পন্থাকে বিজ্ঞজনোচিত অথবা মূঢ় পন্থা বলা যেতে পারে, কিন্তু সেটা শাসনতন্ত্রসম্মত কিনা, সে-প্রশ্নই এখানে উঠতে পারে না।

আমার মনে হয়, অনেকেই আমরা অত্যধিক স্বজাতিপ্রীতির মোহ থেকে মুক্ত হতে পারি না, এবং নিজেদের দোষত্রুটিকে প্রায়শই আমরা উপেক্ষা করে থাকি। আমি জানি যে আমার নিজের ক্ষেত্রেও অবশ্যই এমনটা হতে পারে,—বিশেষ করে আমি যখন ব্রিটেন ও ভারতবর্ষের সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করছি। এটুকু আপনাকে মেনে নিতে হবে। তৎসত্ত্বেও আমি বলব, ব্রিটিশ জাতি যেভাবে তাদের বৈষয়িক স্বার্থের সঙ্গে নীতিপরায়ণতার মিশাল দেয়, তা দেখে আমি যতটা বিস্ময় বোধ করি, ততটা আর কিছুতেই নয়। সবসময়েই সাধুতম উদ্দেশ্য নিয়ে তারা জগৎ-সংসারের উপকার করে বেড়াচ্ছে, আর যত-কিছু বিপত্তি বিরোধ আর অসুবিধা, অপরের জেদ আর দুষ্টবুদ্ধিই তার জন্য দায়ী, এই স্বতঃসিদ্ধ ধারণা নিয়ে ব্রিটিশ জাতি যে কীভাবে কথা বলে, তা আমি ভেবে পাই না। তাদের এই স্বতঃসিদ্ধ ধারণাকে যে সর্বত্র মেনে নেওয়া হয় না, তা আপনি জানেন। ইউরোপ আমেরিকা আর এশিয়ায় তাদের এই ধারণা সম্পর্কে সরস সব মন্তব্যও করা হয়ে থাকে। ব্রিটিশ শাসন সম্পর্কে অতীতে আমাদের যে অভিজ্ঞতা হয়েছে, এবং বর্তমানেও যে অভিজ্ঞতা হচ্ছে, তাতে বিশেষ করে ভারতবর্ষে আমরা যদি এই ধারণাকে গ্রহণের সম্পূর্ণ অযোগ্য বলে মনে করি, তা হলে আমাদের মার্জনা করা যেতে পারে। ভারতবর্ষে যা ঘটেছে এবং এখনও ঘটছে, তার পরেও যদি কেউ গণতন্ত্র ও শাসনতন্ত্রসম্মত ব্যবস্থার কথা বলেন, তাতে

করে এই দুটি শব্দের তাৎপর্যকে চূড়ান্তভাবে বিকৃত করা হবে বলেই আমার মনে হয়। কোনও শক্তি অথবা শ্রেণী স্বেচ্ছায় কখনও ক্ষমতা ত্যাগ করেছে, ইতিহাসে এমন নজির নেই। ইতিহাসের শিক্ষাও যদি যথেষ্ট না হয়ে থাকে, ভারতবর্ষে রূঢ় বাস্তবের থেকে ত আমরা পর্যাপ্ত অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি।

ব্রিটেনের শাসক-শ্রেণীর যে অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতিসাধনের একটা সহজাত শক্তি আছে, এ-কথা সত্য বলেই আমার মনে হয়। কিন্তু যেক্ষেত্রে তাঁদের ক্ষমতার একেবারে ভিত্তিতেই টান পড়েছে, সেক্ষেত্রে ত আর উপর-উপর সঙ্গতিসাধনের কোনও অবকাশ নেই। যদি কেউ মনে করেন যে ব্রিটিশ সরকার অথবা পার্লামেণ্ট ভারতবর্ষের স্বাধীনতার সদয় অছিমাত্র, এবং দয়াপরবশ হয়ে তাঁরা একে বিকশিত করে তুলেছেন, তাহলে তিনি চূড়ান্ত রকমের অস্বাভাবিক এক মোহে আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছেন বলেই আমার মনে হয়। আমি বিশ্বাস করি যে, এমন অনেক ব্রিটিশার রয়েছেন, ভারতবর্ষের প্রতি সত্যিই যাঁরা সদয় অনুভূতিসম্পন্ন, ভারতবর্ষ স্বাধীন হক এইটেই যাঁরা চান। কিন্তু নীতি নির্ধারণে তাঁদের কোনও হাত নেই। এবং তাঁরাও, অথবা তাঁদের মধ্যে অধিকাংশই ভারতবর্ষের জন্য এমন স্বাধীনতার কথা ভাবেন, ব্রিটিশ জাতির আকাঙ্ক্ষা ও স্বার্থের সঙ্গে যেটা খাপ খেয়ে যায়। আমাদের বলা হয় যে স্বাধীনতা ও দায়িত্বপালনের যোগ্যতা দেখালেই আরও স্বাধীনতা, আরও দায়িত্ব আমাদের দেওয়া হবে। আর ব্রিটেনের পরিকল্পনার সঙ্গে আমরা কতটা খাপ খাইয়ে নিতে পারছি, সেইটেই হল সেই যোগ্যতা বিচারের মাপকাঠি। ইংল্যাণ্ডে আমাদের যে-সব উপদেষ্টা ও হিতাকাঙ্ক্ষী রয়েছেন, মাঝে-মাঝে তাঁদের বলতে ইচ্ছে হয়, ঈশপের উপাখ্যানগুলির সঙ্গে তাঁরা যেন তাঁদের পরিচয়টাকে নতুন করে আবার ঝালিয়ে নেন; বিশেষ করে নেকড়ে আর মেষশাবকের গল্পটা যেন তাঁরা নতুন করে আবার পড়েন।

এ-কথা খুবই সত্য যে অন্যান্য অধিকাংশ ব্যাপারের মতন রাজনীতির ব্যাপারেও একেবারে গোড়ার থেকে শুরু করা যায় না। এও সত্য যে জীবন মাঝে-মাঝে এতই জটিল চেহারা নেয় যে মানবিক যুক্তিতর্ক দিয়ে তার ব্যাখ্যা সম্ভব হয় না। ভাল লাগুক আর না-ই লাগুক, ঘটনাকে তার বাস্তব রূপেই আমাদের গ্রহণ করতে হয়; আদর্শবাদের সঙ্গে তার রফাও করে নিতে হয়। কিন্তু ঠিক পথেই আমাদের চলতে হবে। আপনার বিবেচনায় ঠিক পথ চলার অর্থ এই যে সর্বপ্রথমে ভারতবর্ষের ঐক্য অক্ষুন্ন রাখতে হবে; অতঃপর আসবে সাম্প্রদায়িকতার উচ্ছেদ, কায়েমী স্বার্থ নিয়ন্ত্রণ ও তার ক্রমিক বিলোপসাধন, জনজীবনের মানোন্নয়ন, প্রকৃত এক ভারতীয় সৈন্যবাহিনী গঠন এবং গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রয়োজন অনুযায়ী ভারতীয় যুবসমাজকে হাতে-কলমে গঠনাত্মক কাজের শিক্ষাদান। আর এই সমস্ত-কিছুর শেষে রয়েছে সমাজবাদী আদর্শ। সেই সঙ্গে এই আদর্শ প্রকৃতই যাতে কার্যে পরিণত হয় তার জন্য যে দৃঢ় সহজাত বৃত্তি ও অভ্যাসের প্রয়োজন রয়েছে, পটভূমিকাটা এমন হওয়া চাই যাতে সেই সহজাত বৃত্তি ও অভ্যাসের বিকাশ ঘটান সম্ভব হয়।

আমার মনে হয়, আমাদের মধ্যে অনেকেই এই বক্তব্যকে আনুপূর্ব মেনে নেবেন। তবে আমরা হয়ত অন্য কথায় এই বক্তব্যকে প্রকাশ করব, এর সঙ্গে আরও-কিছু যোগ করব, এবং কয়েকটি বিষয়ের উপরে অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করব। রাজনৈতিক পর্যায়টির কথাই যে প্রথমে আসবে, এ-বিষয়েও আমি আপনার সঙ্গে একমত। বস্তুত রাজনৈতিক পর্যায়ের কথা বাদ দিলে অন্যান্য পর্যায়ের কোনও সম্ভাবনাই থাকে না। তার সঙ্গেসঙ্গেই, অথবা অব্যবহিত পরেই, আসবে সামাজিক পরিবর্তন। রাজনৈতিক গণতন্ত্র থেকে সামাজিক গণতন্ত্রে উত্তীর্ণ হওয়া যাবে, শুধু এই আশাতেই ব্যক্তিগত-

ভাবে আমি রাজনৈতিক গণতন্ত্রকে গ্রহণ করতে সম্পূর্ণই প্রস্তুত। রাজনৈতিক গণতন্ত্রই চূড়ান্ত লক্ষ্য নয়, চূড়ান্ত লক্ষ্যকে অর্জন করবার সে উপায় মাত্র। অর্থনৈতিক পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা থেকেই প্রকৃতপক্ষে একে দাবি করা হয়। সে-আকাঙ্ক্ষা কখনও-কখনও অবচেতনও হয়ে থাকে। দ্রুত সেই পরিবর্তনগুলি যদি দেখা না দেয়, রাজনৈতিক কাঠামো তাহলে দুর্বল হয়ে পড়তে পারে। আমার মনে হয়, ভারতবর্ষের আজ যে অবস্থা, তাতে অর্থনৈতিক পরিবর্তন সাধনের প্রয়োজন সেখানে জরুরী হয়ে উঠেছে। গুরুত্বপূর্ণ কোনও রাজনৈতিক পরিবর্তন যদি সেখানে ঘটে, তাহলে তার সঙ্গেসঙ্গে, অথবা তার পরে, অনিবার্যভাবেই সেখানে প্রবল কিছু অর্থনৈতিক পরিবর্তনও দেখা দেবে। মোট কথা, রাজনৈতিক পরিবর্তনটা এমন হওয়া চাই, এইসব সামাজিক পরিবর্তনের পথ যাতে প্রশস্ত হয়ে যায়। আর এটা যদি সেইসব সামাজিক পরিবর্তনের প্রতিবন্ধক হয়, তাহলে এটা বাঞ্ছনীয় নয়; এতে আমাদের কোনও লাভ হবে না।

ভারতের ঐক্য ছাড়া অন্য-কোনও পথে চিন্তা করেন, এমন কোনও দায়িত্বশীল ভারতীয়ের কথা আমি জানি না। ভারতের ঐক্য হল আমাদের রাজনৈতিক বিশ্বাসের একটা মূল কথা। ঐক্যই আমাদের প্রতিটি কাজের লক্ষ্য। সে-ঐক্য যে সম্ভবত ফেডারেল ঐক্য হবে তা আমি স্বীকার করছি; কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে নতুন আইনে যে ফেডারেশনের কথা বলা হয়েছে, সে-ঐক্য তার মতন কিছু-একটা হবে। সে-ঐক্য একই জোয়ালে বাঁধা মানুষদের দাসত্বের ঐক্যও নয়। সাময়িক বিশৃঙ্খলার ফলে ভারতবর্ষে যে অনৈক্যের সৃষ্টি হতে পারে এবং পৃথক পৃথক রাষ্ট্রের উদ্ভব হতে পারে, এমন সম্ভাবনা সত্ত্বেও আমার মনে হয় যে এ-আশঙ্কা নিতান্তই অমূলক। সারা দেশ জুড়ে ঐক্যের প্রবণতা আজ অত্যন্তই প্রবল হয়ে উঠেছে।

ধর্ম, জাতি ও ভাষা, আপনার মতে এই তিনটিই হল ঐক্যবিনাশী শক্তি। জাতির কোনও গুরুত্ব আছে বলে আমি মনে করি না। জাতি ও ধর্ম, ভারতবর্ষে এ-দুটি বস্তু অবিচ্ছেদ্যভাবে পরস্পরের সঙ্গে জড়িত হয়ে যায়, এবং জাতি সেখানে অংশত বর্ণের রূপ নেয়। হিন্দু ও মুসলমান, এরা পৃথক দুটি জাতি নয়, আসলে এরা একাধিক জাতির একই সংমিশ্রিত রূপ। সুতরাং দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন জাতি থাকলেও আসলে তারা পরস্পরের অঙ্গীভূত; এবং জাতিগত ও সাংস্কৃতিক বিচারে মোটের উপরে তারা একটিই সত্তা। ভারতবর্ষে যে শত শত তথাকথিত ভাষা আছে, আমাদের সমালোচকদের এটা একটা পছন্দসই বিষয়। তবে সচরাচর দেখা যায় যে এর একটিমাত্র ভাষার সঙ্গেও এইসব সমালোচকের কিছুমাত্র পরিচয় নেই। প্রকৃত প্রস্তাবে ভাষাগত দিক থেকে ভারতবর্ষ কিন্তু অত্যন্তই সুসংবদ্ধ দেশ; তবু যে এত সব উপভাষার সৃষ্টি হয়েছে, জনশিক্ষার অভাবই তার কারণ। ভারতবর্ষে প্রধান দশটি ভাষা আছে; ছোটখাটো কয়েকটি অঞ্চলের কথা ছেড়ে দিলে সারা দেশের মানুষ এই দশটি ভাষারই কোনও-না-কোনওটিতে কথা বলে। এই দশটি ভাষা দুটি গোষ্ঠীর অন্তর্গত—ভারতীয় আর্য গোষ্ঠী ও দ্রাবিড় গোষ্ঠী। এই দুই গোষ্ঠীর ভাষার আবার একই সাধারণ পটভূমিকা বর্তমান—সংস্কৃত। আশা করি আপনি জানেন যে ভারতীয় আর্য ভাষা-গোষ্ঠীর মধ্যে বিভিন্ন আঞ্চলিক বুলিসহ এক হিন্দুস্থানী-ভাষী লোকের সংখ্যাই ১২ কোটিরও বেশী। এই ভাষা ক্রমেই আরও প্রসার লাভ করছে। অন্য যে-সব ভারতীয় আর্য ভাষা রয়েছে সেই বাংলা, গুজরাতী ও মারাঠী ভাষার সঙ্গেও এর সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ। ভারতীয় ঐক্যের পথে আর যে অসুবিধারই আমরা সম্মুখীন হই না কেন, ভাষার প্রশ্নটি যে একটা বড় রকমের অসুবিধা হয়ে দাঁড়াবে না, এ-বিষয়ে আমি নিশ্চিন্ত।

রেনেসাঁস ও রিফর্মেশনের সময়কার ইউরোপের ধর্মীয় অবস্থার সঙ্গে ভারতবর্ষের ধর্মীয় অবস্থার আপনি তুলনা করেছেন। এ-কথা সত্য যে জীবন সম্পর্কে ভারতীয় জনসাধারণের একটা নির্দিষ্ট ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি বর্তমান; মধ্যযুগীয় ইউরোপের দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে তার তুলনা চলতে পারে। কিন্তু যে-সাদৃশ্য আপনি দেখিয়েছেন তা উপরকার সাদৃশ্য মাত্র। যে ধর্মীয় যুদ্ধবিগ্রহের ফলে ইউরোপ রক্তবন্যায় স্নান করে উঠেছিল, ভারতবর্ষের সুদীর্ঘ ইতিহাসের কোনও অধ্যায়েই তার নজির মেলে না। ভারতবর্ষের ধর্ম সংস্কৃতি ও দর্শনের সামগ্রিক যে পটভূমিকা আমরা দেখতে পাই, তা হল সহিষ্ণুতার পটভূমিকা। অন্য বিশ্বাসকে যে এখানে শুধু সহ্যই করা হয়েছে তা নয়, তাকে উৎসাহও দেওয়া হয়েছে। ইসলামের আগমনের পর কিছু বিরোধের সৃষ্টি হয়েছিল বটে, কিন্তু সেই বিরোধও প্রধানত রাজনৈতিক, ধর্মীয় নয়। ধর্মীয় দিকটির উপরেই যদিও সর্বদা গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে। সে-বিরোধ বিজেতা ও বিজিতের বিরোধ। ভারতবর্ষে যে কখনও ব্যাপকভাবে ধর্মীয় বিরোধের সৃষ্টি হবে, সাম্প্রতিক ঘটনাবলী সত্ত্বেও এ-কথা আমি কল্পনা করতে পারি না। বর্তমানে যে সাম্প্রদায়িকতা আমরা দেখতে পাচ্ছি, তার কারণ আসলে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক; এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যেই তা সীমাবদ্ধ। আমার ধারণা (যদিও ব্যক্তিগতভাবে জেনে এ-কথা আমি বলছি না) ভারতবর্ষের যে-কোনও স্থানের ধর্মীয় তিক্ততার তুলনায় আলস্টারের ধর্মীয় তিক্ততা বর্তমানে অনেক বেশী দৃঢ়মূল। এ-সত্য কারও বিস্মৃত হওয়া উচিত নয় যে ভারতবর্ষে যে-সাম্প্রদায়িকতা দেখতে পাওয়া যায়, তা পরবর্তী কালের ব্যাপার; আমাদের চোখের সামনে এই সাম্প্রদায়িকতার বিকাশ ঘটেছে। তাতে অবশ্য এর তাৎপর্য হ্রাস পায় না, এবং একে উপেক্ষাও হয়ত আমরা করব না। তার কারণ এতে আমাদের যাত্রাপথে এক বিরাট প্রতিবন্ধকের সৃষ্টি হয়েছে, এবং আমাদের ভবিষ্যৎ প্রগতিও এতে ব্যাহত হতে পারে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও আমি মনে করি যে একে বাড়িয়ে দেখান হচ্ছে এবং প্রয়োজনের অতিরিক্ত গুরুত্ব এর উপরে আরোপ করা হচ্ছে; জনসাধারণের ক্রোধকে মাঝে-মাঝে উদ্দীপ্ত করে তুললেও জনসাধারণের মৌলিক কোনও ক্ষতি এর দ্বারা হচ্ছে না। সামাজিক প্রশ্নগুলির গুরুত্ব বৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গেই এর গুরুত্ব হ্রাস পেতে বাধ্য। যারা চূড়ান্ত সাম্প্রদায়িক, তাদের সাম্প্রদায়িক দাবিগুলিকে পরীক্ষা করে দেখুন; দেখতে পাবেন যে সেই দাবিগুলির কোনটির মধ্যেই জনসাধারণের কথার সামান্যতম উল্লেখও নেই। সমস্ত গোষ্ঠীর সাম্প্রদায়িক নেতারাই সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রশ্নগুলির সম্পর্কে দারুণ আশংকা পোষণ করেন। সামাজিক প্রগতির বিরুদ্ধে তাঁদের ঐক্যবদ্ধ হতে দেখে কৌতুক বোধ করতে হয়।

ভারতে ব্রিটিশ শাসন অনিবার্যভাবেই এ-দেশে রাজনৈতিক ঐক্য সৃষ্টির সহায়ক হয়েছে। মিলিত দাসত্বই এনে দিয়েছে দাসত্বমোচনের মিলিত আকাঙ্ক্ষা। এ এক অনিবার্য পরিণাম। যে-সত্যকে যথেষ্টরূপে উপলব্ধি করা হয় না, তাকে মনে রাখা প্রয়োজন: ইতিহাসের সমস্ত অধ্যায়েই দেখা গিয়েছে যে ভারতবর্ষে সাংস্কৃতিক ও ভৌগোলিক ঐক্যের এক অসাধারণ বোধ বর্তমান; এবং আধুনিক যানবাহন- ও যোগাযোগ-ব্যবস্থায় রাজনৈতিক ঐক্য অর্জনের আকাঙ্ক্ষা যে বৃদ্ধি পাবে, এ অনিবার্য। ব্রিটিশ শাসনের আমলে শাসক-সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে অবশ্য বরাবরই এই ঐক্যকে ব্যাহত করবার চেষ্টা করা হয়েছে। কিছুটা সচেতন ও উদ্দেশ্যমূলকভাবে, কিছুটা বা আপন মনের অজ্ঞাতসারে। তবে এইটেই তাঁদের কাছে প্রত্যাশা করা গিয়েছিল, কেননা সমস্ত সাম্রাজ্য ও সমস্ত শাসক-সম্প্রদায়ই অনুরূপ নীতি অনুসরণ করে এসেছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর ভারতবর্ষে যাঁরা ছিলেন উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী,

খোলাখুলিভাবে তাঁরা যে অভিমত ব্যক্ত করে গিয়েছেন, তা কৌতূহলোদ্দীপক। সমস্যাটা তখন খুব গুরুতর ছিল না বটে, কিন্তু জাতীয় আন্দোলনের বিকাশের সঙ্গে-সঙ্গে—বিশেষত গত তিরিশ বছরে—সেই সমস্যা তীব্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। ব্রিটিশ সরকারের উপরে এর প্রতিক্রিয়া হয়েছে এই যে, ভেদবিরোধ সৃষ্টির জন্য এবং সম্ভব হলে এইসব ভেদবিরোধকে চিরস্থায়ী করবার জন্যই তাঁরা নব নব উপায় উদ্ভাবন করেছেন। ভারতবর্ষের মধ্যেই যে এই ভেদপ্রবণতার বীজ নিহিত ছিল না, কারও পক্ষেই এমন কথা বলা সম্ভব নয়; এবং এমন আশঙ্কাও ছিল যে রাজনৈতিক ক্ষমতালাভের সম্ভাবনা দেখা দেবার সঙ্গে-সঙ্গেই এই ভেদপ্রবণতা আরও বৃদ্ধি পাবে। ভেদপ্রবণতা যাতে হ্রাস পায়, এমন নীতি গ্রহণ করা সম্ভব ছিল; আবার এই ভেদ-প্রবণতা যাতে আরও বৃদ্ধি পায়, এমন নীতিও গ্রহণ করা যেতে পারত। দ্বিতীয় নীতিটিকেই সরকার গ্রহণ করলেন, এবং দেশের ঐক্যবিনাশী শক্তিকে সর্বতোভাবে তাঁরা উৎসাহ দিয়ে যেতে লাগলেন। জনসাধারণের ঐতিহাসিক অভ্যুদয়কে রোধ করা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। কারও পক্ষেই সম্ভব নয়। তবে সেই অভ্যুদয়ের পথে তাঁরা বাধাবিঘ্ন সৃষ্টি করতে পারেন। তা-ই তাঁরা করেছেন। সর্বশেষ এবং সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বাধা রয়েছে এই নূতন আইনটির মধ্যে। এ-আইনের আপনি প্রশংসা করেছেন, তার কারণ আপনাব বিবেচনায় ভারতবর্ষের ঐক্যের এটি প্রতীক। বস্তুত এটি ঠিক তার বিপরীত। (বাধা দেওয়া না হলে) এই আইনের মধ্য দিয়ে বৃহত্তর অনৈক্যের সূচনা হবে। এ-আইন ভারতবর্ষকে ধর্মীয় ও আরও অসংখ্য ভাগে বিভক্ত করেছে, এবং ভারতবর্ষের বৃহৎ কয়েকটি অঞ্চলকে সামন্ততান্ত্রিক চক্র হিসেবে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেছে। এই অঞ্চলগুলিকে স্পর্শ করা যাবে না, কিন্তু অন্যান্য অঞ্চলের উপরে এরা প্রভাব বিস্তার করতে পারবে। যে সুস্থ রাজনৈতিক দলসমূহের বিকাশকে আপনি বর্তমান ভারতবর্ষের "সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন" বলে মনে করেন, সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রশ্নের ভিত্তিতে সেই রাজনৈতিক দলসমূহের বিকাশও এই আইনের দ্বারা ব্যাহত হয়েছে।

সামাজিক প্রশ্নেও ব্রিটিশ সরকারের নীতি সমান স্পষ্ট। কোনও প্রকারেরই সমাজবাদ তার লক্ষ্য নয়, কায়েমী স্বার্থসমূহকে বিলুপ্ত করতেও সে চাইছে না। পক্ষান্তরে অসংখ্য কায়েমী স্বার্থকে সে সজ্ঞানে রক্ষা করে এসেছে, নতুন নতুন কায়েমী স্বার্থের সৃষ্টি করেছে, এবং সর্ব সময়েই ভারতবর্ষের রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় জীবনের প্রতিক্রিয়াপন্থীদের সঙ্গেই সে হাত মিলিয়েছে। নতুন আইনে এই নীতিই তার চূড়ান্ত রূপ পরিগ্রহ করল। এই কায়েমী স্বার্থ, বিঘ্নসৃষ্টিকারী ও প্রতিক্রিয়াপন্থীরা এবারে নূতন ফেডারেল ভারতবর্ষে যতখানি ক্ষমতা লাভ করবে, এর আগে আর কখনও তারা ততখানি ক্ষমতা পায়নি। যে সামাজিক প্রগতি আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত বলে আপনি মতপ্রকাশ করেছেন, বিদেশী ও ভারতীয় কায়েমী স্বার্থগুলিকে বাঁচিয়ে রেখে ও সুরক্ষিত করে এ-আইন আইনসম্মতভাবেই সেই সামাজিক প্রগতির পথ রুদ্ধ করল। কায়েমী স্বার্থগুলিকে পোষণ করবার জন্য দেশের অর্থসম্পদের এক বিরাট অংশ যেহেতু বাঁধা রাখা হল, যৎসামান্য সামাজিক সংস্কারও তাই সহজে সম্ভব হবে না।

প্রতিক্রিয়া ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিটি দেশকেই আজ তীব্র সংগ্রাম করতে হচ্ছে। ভারতবর্ষও এই নিয়মের ব্যতিক্রম নয়। কিন্তু অবস্থার শোকাবহতা এইখানে যে ভারতবর্ষে যা-কিছু অন্যায়, ব্রিটিশ জাতি আজ তাঁদের পার্লামেণ্ট ও রাজকর্মচারীদের মাধ্যমে আপন অজ্ঞাতসারেই সম্পূর্ণরূপে তার পক্ষাবলম্বন করেছেন। স্বদেশে এক মুহূর্তের জন্যও যা তাঁরা বরদাস্ত করবেন না, ভারতবর্ষে তাকেই তাঁরা উৎসাহ দিচ্ছেন।

মহান মানব আব্রাহাম লিংকনের নামোল্লেখ করে ইউনিয়নের প্রতি যে গভীর গুরুত্ব তিনি আরোপ করতেন, তার কথা আপনি আমাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। আপনি সম্ভবত মনে করেন, ঐক্যবিনাশী শক্তির বিরুদ্ধে ভারতবর্ষের ঐক্য রক্ষার অনুরূপ মহান উদ্দেশ্য নিয়েই ব্রিটিশ সরকার কংগ্রেস-আন্দোলনকে দমন করবার প্রয়াস পেয়েছেন। এ-আন্দোলনের দ্বারা ভারতবর্ষের ঐক্য যে কীভাবে বিপন্ন হয়েছিল, তা আমি জানি না। বস্তুত আমি মনে করি যে একমাত্র এই আন্দোলন অথবা অনুরূপ কোনও আন্দোলনই এ-দেশে জীবন্ত ঐক্য সৃষ্টি করতে সমর্থ, এবং ব্রিটিশ সরকারের ক্রিয়াকলাপই বরং আমাদের তার বিপরীত পথে ঠেলে দিচ্ছে। কিন্তু সে-কথা বাদ দিলেও, একটা দেশের স্বাধীনতা-আন্দোলনকে চূর্ণ করবার জন্য এক সাম্রাজ্যবাদী শক্তি যে-প্রয়াসে নিরত রয়েছে, তার সঙ্গে লিংকনের প্রয়াসের তুলনাটা কি নিতান্তই কষ্টকল্পিত নয়?

জনসাধারণের অবাঞ্ছনীয় ও স্বার্থপর অভ্যাস ও প্রবৃত্তির আপনি অবসান ঘটাতে চান। আপনার কি মনে হয় যে ভারতস্থ ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ এ-কাজের সহায়তা করছেন? প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলির প্রতি তাঁদের সমর্থনের কথা সম্পূর্ণ ছেড়ে দিয়েও ব্রিটিশ শাসনের পটভূমিকাটি বিবেচনা করে দেখা যেতে পারে। চূড়ান্ত ও ব্যাপক হিংসাই এই শাসনের ভিত্তি, এবং জনসাধারণের ত্রাসের উপরে এই শাসন টিঁকে আছে। যে স্বাভাবিক স্বাধীনতা থাকলে জনসাধারণের বিকাশ সম্ভব হয় বলে মনে করা হয়ে থাকে, এই শাসন সেই স্বাধীনতাকে দমন করে রাখে; যারা উদ্যোগী, যারা সাহসী, যারা স্পর্শপ্রবণ, এই শাসন তাদের চূর্ণ করে দেয়; আর যারা ভীরু, যারা সুবিধাবাদী, তাৎকালিক সুবিধা বুঝে যারা চলে, যারা চক্রান্তকারী, অন্যের উপরে যারা উৎপীড়ন চালায়, এই শাসন উৎসাহ দেয় তাদেরই। এই শাসনকে ঘিরে রয়েছে বিরাট এক গুপ্তচরবাহিনী এবং গোপনে সংবাদ সরবরাহকারী ও প্ররোচকের দল। বাঞ্ছনীয় গুণাবলীর যেখানে বিকাশ সম্ভব হয়, গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের যেখানে সমৃদ্ধি ঘটে, এই কি সেই পরিবেশ?

মৌলিক কয়েকটি বিষয়ে সাম্প্রদায়িকতা, রাজন্যবর্গ ও সম্পত্তিবান শ্রেণীকে একই ধরনের সুবিধা না দিয়ে কংগ্রেসের পক্ষেও কোনও সময়েই সারা ভারতের জন্য সকলের সম্মতিক্রমে একটি উদার শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব হত কিনা, আপনি আমাকে এই প্রশ্ন করেছেন। তাতে মনে হয় আপনি ধরেই নিয়েছেন যে বর্তমান আইন সকলের সম্মতিক্রমে এক উদার শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করল। এই যদি উদার শাসনতন্ত্র হয়, তাহলে অনুদার শাসনতন্ত্র যে কী জিনিস, তা বোঝা আমার পক্ষে ঈষৎ শক্ত হয়ে দাঁড়ায়; আর সম্মতির প্রসঙ্গে জানাই, এই নূতন আইন যে-পরিমাণ অসন্তোষ ও আপত্তির কারণ ঘটিয়েছে, এর আগে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সরকারের আর-কোনও কাজই ততখানি অসন্তোষ ও আপত্তির সৃষ্টি করেছে কিনা, তাতে আমার সন্দেহ আছে। প্রসঙ্গত জানাই, প্রয়োজনীয় সম্মতি লাভার্থে সারা দেশ জুড়ে হিংস্রতম নিপীড়ন চালান হয়েছিল, এবং বর্তমানেও—এই আইনকে কার্যকর করবার সূচনা হিসেবে—সর্বরকমের ব্যক্তি-স্বাধীনতাকে দমন করে কেন্দ্রে ও বিভিন্ন প্রদেশে নানা আইন পাশ করা হয়েছে। এমতাবস্থায় সম্মতির কথা বলাটা সত্যিই বড় বিস্ময়কর বলে মনে হয়। এ সম্পর্কে ইংল্যান্ডে যে ব্যাপক ভুল ধারণা রয়েছে, তা অতি আশ্চর্যজনক। সমস্যার সম্মুখীন যদি হতেই হয়, প্রধান তথ্যগুলিকে তাহলে উপেক্ষা করা চলে না।

সরকার যে রাজন্যবর্গ এবং বিভিন্ন সংখ্যালঘু-দলের সঙ্গে একটা মোটামুটি ব্যবস্থা করে নিতে পেরেছেন, তা সত্য। তবে প্রতিনিধিত্ব-সংক্রান্ত খুচরো কয়েকটি ব্যবস্থা সম্পর্কে তাদের আংশিক সন্তোষের কথা ছেড়ে দিলে দেখা যাবে, এই সব

সংখ্যালঘু-দলও অতিমাত্রায় অসন্তুষ্ট হয়ে রয়েছে। সংখ্যালঘু দলগুলির মধ্যে যারা প্রধান, সেই মুসলমানদের কথাই ধরুন। যে অভিজাত, আধা-সামন্ততান্ত্রিক, নির্বিচারে নির্বাচিত মুসলমান সদস্যরা গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান করেছিলেন, তাঁরাই যে মুসলমান জনসাধারণের প্রতিনিধি, কারও পক্ষেই এ-কথা বলা সম্ভব নয়। শুনে হয়ত আপনি বিস্মিত হবেন যে যথেষ্টসংখ্যক মুসলমান এখনও কংগ্রেসকে সমর্থন করেন।

কংগ্রেস কি এর চাইতে ভাল কিছু করতে পারত? কংগ্রেস যার প্রতীক ও প্রধান পতাকাবাহী, সেই জাতীয় আন্দোলন যে এর চাইতে অনেক বেশী সুফল এতে দিতে পারত, তাতে আমার সন্দেহ নেই। কংগ্রেস অবশ্যই একটি বুর্জোয়া সংস্থা (সংস্থাটি আর-একটু সমাজবাদী হলে আমি সুখী হতাম), এবং এই কারণেই সম্পত্তির প্রশ্নটা সে-অবস্থায় তেমন তীব্র হয়ে দেখা দিত না। সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্নটির সম্মুখীন অবশ্য হতেই হত, তবে সাময়িকভাবে বহুলাংশের সম্মতিক্রমেই তার একটা মীমাংসাও সম্ভব হত বলে আমার মনে হয়। তার পরেও কিছু-পরিমাণ সাম্প্রদায়িকতা হয়ত সূচনায় থেকে যেত; তবে নূতন আইনের ফলে যে-পরিমাণ সাম্প্রদায়িকতা দেখা দিয়েছে, সে-তুলনায় তার মাত্রা অনেক কম হত। তার চাইতে গুরুত্বপূর্ণ কথা এই যে এমন অবস্থার তখন সৃষ্টি করা হত, অদূর ভবিষ্যতে সাম্প্রদায়িকতার যাতে অবসান ঘটে এবং সমাজবাদের পথে যাতে বিকাশ সম্ভব হয়। ভূমি-সমস্যার সমাধানের জন্য চেষ্টা করা হত। প্রকৃত অসুবিধা থাকত দুটিমাত্র: ব্রিটিশ সরকারের ও সিটি অব লণ্ডনের কায়েমী স্বার্থ এবং রাজন্যবর্গ। তার মধ্যে আবার প্রথম অসুবিধাটাই প্রধান, বাকী সব গৌণ সমস্যা মাত্র। রাজন্যবর্গ সেক্ষেত্রে নূতন অবস্থার সঙ্গে নিজেদের অনেকখানি খাপ খাইয়ে নিতেন, এবং কংগ্রেসের সংগঠন এখন যেমন, তাতে কংগ্রেসও এই ব্যাপারে তাঁদের অনেকখানিই স্বাধীনতা দিত। জনমতের—তার মধ্যে তাঁদের আপনাপন রাজ্যের প্রজারাও থাকতেন—চাপ এত প্রবল হয়ে উঠত যে তাকে প্রতিরোধ করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব হত না। এই জনমত যাতে কার্যকর হয়ে উঠে ঘটনার রূপ নিয়ামনে সমর্থ হয়, তার জন্য সূচনায় হয়ত দেশীয় রাজন্যবর্গের সঙ্গে সাময়িক একটা ব্যবস্থা করা হত। অবশ্য ধরেই নেওয়া হচ্ছে যে রাজন্যবর্গের নিরঙ্কুশ স্বৈরাচারকে উৎসাহ দানের জন্য ব্রিটিশ সরকার উপস্থিত থাকতেন না। তা না থাকলে দেশীয় রাজ্যগুলিও যে ধীরে ধীরে ঠিক-পথে এসে দাঁড়াত, তাতে সন্দেহ নেই। গৃহযুদ্ধের কোনও প্রশ্নই সেক্ষেত্রে উঠতে পারত না।

এ যা বললাম, আমার আকাঙ্ক্ষার তুলনায় এ-সাফল্য অনেক কম। কিন্তু আর-কিছু না হক, সঠিক পথে এ যে এক সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক ও গণতান্ত্রিক পদক্ষেপ হত, তাতে সন্দেহ নেই। শাসনতন্ত্র অথবা রাজনৈতিক কাঠামো রচনায় সংশ্লিষ্ট সকলের সম্মতিলাভ সম্পূর্ণই অসম্ভব ব্যাপার। তবে অধিকাংশের সম্মতিলাভের জন্যই মানুষ চেষ্টা করে। বাকী সবাই, অর্থাৎ যারা সম্মতি দান করেনি, গণতান্ত্রিক পদ্ধতি অনুযায়ী তারা সেটাকে মেনে নেয়। অন্যথায় সেটাকে মেনে নিতে তাদের বাধ্য করা হয়। স্বৈরাচারী ও কর্তৃত্বপরায়ণ ঐতিহ্যের প্রতিনিধি ব্রিটিশ সরকারের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল আপন স্বার্থরক্ষা। রাজন্যবর্গ ও অন্যান্য কয়েকটি প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির সম্মতি লাভের জন্যই তাঁরা চেষ্টা করলেন, আর জনসাধারণের অধিকাংশকেই তা মেনে নিতে বাধ্য করা হল। কংগ্রেসের কাজ যে এর থেকে সম্পূর্ণ পৃথক হত, তাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নেই।

এ-সবই অবশ্য অন্তঃসারহীন কথার কথা মাত্র। তার কারণ প্রধান বিষয়টিই এখানে বাদ পড়েছে। তা হল ব্রিটিশ সরকার ও ব্রিটেনের বৈষয়িক স্বার্থ।

আর-একটি কথাও বিবেচনা করে দেখার যোগ্য। মিঃ গান্ধীর নেতৃত্বে অহিংসার উপরে কংগ্রেস যথেষ্টই গুরুত্ব আরোপ করে এসেছে। বিপক্ষের উপরে বলপ্রয়োগ করবার পরিবর্তে কংগ্রেস তার মনের পরিবর্তন ঘটাতে চেয়েছে। চূড়ান্ত বিচারে এই মতবাদের পরমার্থিক তাৎপর্য এবং সম্ভাব্যতা যা-ই হক না কেন, এ-বিষয়ে কোনও সন্দেহের অবকাশ নেই যে এই মতবাদ গৃহবিবাদের বিরুদ্ধে এবং ভারতবর্ষের বিভিন্ন দলকে শান্তিপূর্ণভাবে স্বমতে আনয়নের প্রয়াসের সপক্ষে এক দৃঢ় মনোভাবের সৃষ্টি করেছে। ভারতবর্ষের ঐক্যরক্ষা ও বিরোধিতার উত্তেজনা হ্রাসে এই মতবাদ আমাদের যথেষ্টই সহায়ক হয়েছে।

শাসনতন্ত্রসম্মত কাজ হয়েছে কিনা, এইদিক থেকে অনেকে অসহযোগ ও আইন অমান্য আন্দোলন সম্পর্কে আলোচনা করে থাকেন। ইতিপূর্বে এই বিষয়টির আমি উল্লেখ করেছি। আন্দোলন দুটি কীভাবে আমার মনের উপরে রেখাপাত করেছে, তা কি আপনাকে জানাতে পারি? এই দুই আন্দোলনের ফলে ব্রিটিশ সরকারের উপরে যে প্রবল চাপ পড়েছিল এবং শাসন-ব্যবস্থা যে টলে উঠেছিল, তা বলা বাহুল্য। কিন্তু আমার বিবেচনায় আমাদের স্বদেশবাসী বিশেষত গ্রামীণ জনসাধারণের উপরে এর যে প্রভাব পড়েছিল, সেইখানেই এর আসল গুরুত্ব। দারিদ্র্য ও দীর্ঘকালব্যাপী স্বৈরাচার, এবং তার অনিবার্য সহচর হিসেবে ত্রাস ও বলপ্রয়োগের যে পরিবেশ সৃষ্ট হয়েছিল, তার ফলে এই জনসাধারণের নীতিবোধ সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়ে যায়, তাদের অবনতি ঘটে। নাগরিক হবার জন্য যে গুণাবলী থাকা দরকার, তা তাদের ছিল না বললেই চলে। প্রতিটি খুদে রাজকর্মচারী, কর-আদায়কারী, পুলিশ আর জমিদারের প্রতিনিধির হাতে তারা তখন নিগৃহীত, উৎপীড়িত হয়েছে। উৎপীড়নের বিরুদ্ধে যে মিলিতভাবে রুখে দাঁড়াবে অথবা তাকে প্রতিরোধ করবে, এমন এতটুকু সাহস অথবা ক্ষমতা তাদের ছিল না। পরস্পরের বিরুদ্ধে তারা তখন চক্রান্ত করেছে, এ ওর নামে গিয়ে লাগিয়েছে। জীবন যখন দুর্বিষহ হয়ে উঠত, মরে গিয়ে তারা তখন জীবনের হাত থেকে পরিত্রাণ লাভের প্রয়াস পেয়েছে। এ সবই যে দুঃখদায়ক ও নিন্দার্হ তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু এর জন্য তাদের দোষও ত দেওয়া যায় না। অমোঘ এক পরিবেশের হাতেই তারা মার খেয়েছে। অসহযোগ আন্দোলন এই পঙ্ককুণ্ড থেকে উদ্ধার করল তাদের; তাদের মধ্যে আত্মমর্যাদাবোধ ও আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে তুলল। মিলিতভাবে কাজ করতে অভ্যস্ত হল তারা। কাজ করল সাহসের সঙ্গে; অন্যায় উৎপীড়নের কাছে আর অত সহজে তারা নতিস্বীকার করল না। তাদের দৃষ্টি উদার হল; সমগ্র ভারতবর্ষের পরিপ্রেক্ষিতেও তারা একটু-আধটু চিন্তা করতে শুরু করল। হাটে-বাজারে ও অন্যান্য মিলন-স্থানে তারা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে লাগল (সে-আলোচনার ভঙ্গী যে স্থূল, তাতে সন্দেহ নেই)। নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীও এই একই ভাবে প্রভাবিত হয়েছে, তবে জনসাধারণের যে পরিবর্তন ঘটল, সেইটেই সব চাইতে তাৎপর্যময় ব্যাপার। এ এক অত্যন্তই উল্লেখযোগ্য রূপান্তর, আর এর সবটুকু কৃতিত্ব কংগ্রেসের প্রাপ্য; গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেসই এই রূপান্তর ঘটিয়েছে। এই যে রূপান্তর,—শাসনতন্ত্র আর শাসন-ব্যবস্থার কাঠামোর চাইতে এর গুরুত্ব অনেক বেশী। এই সেই ভিত্তি, যার উপরে একটা দৃঢ় কাঠামো অথবা শাসনতন্ত্র গড়ে তোলা যেতে পারে।

এর জন্য ভারতীয় জীবনের এক দারুণ অভ্যুত্থানের অবশ্যই প্রয়োজন হয়েছিল। অন্যান্য দেশে সচরাচর এর জন্য ব্যাপকভাবে ঘৃণা ও হিংসার আশ্রয় নেওয়া হয়েছে। অথচ তৎসত্ত্বেও তুলনামূলকভাবে দেখতে গেলে ভারতবর্ষে যে-পরিমাণ ঘৃণা ও হিংসার সৃষ্টি হয়েছিল, তা যৎসামান্য। এ-কৃতিত্ব মহাত্মা গান্ধীর। যুদ্ধকালীন

নানা গুণাবলীর বিকাশ ঘটিয়েছিলাম আমরা। অথচ যুদ্ধের ভয়ংকর সব অভিশাপ আমাদের স্পর্শ করতে পারেনি। ভারতবর্ষের প্রকৃত ও জীবন্ত ঐক্যের যত কাছে গিয়ে আমরা উপনীত হয়েছিলাম, তত কাছে আর কখনও কেউ যায়নি। এমন কি, ধর্মীয় ও সাম্প্রদায়িক বিরোধও প্রশমিত হয়ে এসেছিল। ভারতবর্ষের শতকরা পঁচাশি ভাগই হল গ্রামাঞ্চল। আর আপনি জানেন, ভূমি-সমস্যাই হল গ্রামীণ ভারতের সব চাইতে বড় সমস্যা। ভারতবর্ষে যে অভ্যুত্থান ঘটেছিল, অন্য কোনও দেশে তা ঘটলে সেই অভ্যুত্থান ও তৎকালীন অর্থনৈতিক মন্দার পরিণামে নিদারুণ এক কৃষি-বিপ্লব ঘটে যেতে পারত। ভারতবর্ষে যে তা হয়নি, এ এক অসাধারণ ব্যাপার। না-হবার কারণ সরকারী উৎপীড়ন নয়, গান্ধীর শিক্ষা ও কংগ্রেসের বাণী।

দেশের জীবন্ত শক্তিকে কংগ্রেস এইভাবে মুক্তি দিয়েছিল; সেইসঙ্গে অন্যায় ও বিভেদসৃষ্টিকর প্রবণতাকে সে দমিয়ে রেখেছে। এত বড় শক্তিকে এইভাবে মুক্তিদানের মধ্যে অনিবার্য একটা ঝুঁকি ছিল বটে, কিন্তু তবুও শান্ত, সুশৃংখল ও অনুরূপ অবস্থায় যতটা সভ্যতাসম্মতভাবে করা সম্ভব ততটাই সভ্যতাসম্মতভাবে কংগ্রেস এ-কাজ করেছে। সরকার তার কী উত্তর দিয়েছেন? তা ত আপনি ভালভাবেই জানেন। সেই জীবন্ত ও সতেজ শক্তিকে চূর্ণ করবার প্রয়াস পেয়েছেন সরকার; অন্যায় ও বিভেদসৃষ্টিকারী প্রবণতাকে তাঁরা উস্কে দিয়েছেন। এবং এ-কাজ তাঁরা করেছেন অত্যন্তই সভ্যতাবিরোধীভাবে। গত ছ বছর ব্রিটিশ সরকার যে-পন্থায় ভারতবর্ষে কাজ চালিয়েছেন, তা নিছক ফ্যাসিবাদী পন্থা। তফাতটা শুধু এই যে ফ্যাসিবাদী দেশগুলি যেখানে অনুরূপ কাজের জন্য প্রকাশ্যেই গর্ব করে, ব্রিটিশ সরকার তা করেননি।

চিঠিখানি অত্যন্তই দীর্ঘ হয়ে গিয়েছে; এখন আর নূতন শাসনতন্ত্রের আইন সম্পর্কে সবিস্তারে আলোচনা করতে চাই না। তার তেমন প্রয়োজনও নেই। কেননা ভারতবর্ষে বহু ব্যক্তি ইতিমধ্যে এই আইনের বিশ্লেষণ ও সমালোচনা করেছেন। সকল মতের লোকই তাঁদের মধ্যে আছেন। কিন্তু একটা ব্যাপারে তাঁদের মধ্যে মিল রয়েছে—সকলেই তাঁরা এই আইন সম্পর্কে তীব্র আপত্তি জানিয়েছেন। খুব সম্প্রতি ভারতীয় উদারমতাবলম্বীদেব বিশিষ্টতম একজন নেতা নূতন শাসনতন্ত্রটিকে জনান্তিকে এই বলে বর্ণনা করেছেন যে এ হল "আমাদের জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি বিষাক্ততম বিরোধিতার এক ঘনীভূত নির্যাস।" আমাদের নরমপন্থী রাজনীতিকরাও যেখানে এমন কথা ভাবছেন, সেখানে ভারতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি এত ব্যাপক সহানুভূতি সত্ত্বেও আপনি এই শাসনতন্ত্র অনুমোদন করে বলছেন যে এর ফলে "ভারতবর্ষের আসল ক্ষমতা ভারতীয়দের হাতেই ন্যস্ত হবে"—এ কি বিস্ময়কর নয়? আমাদের চিন্তাধারার পার্থক্য কি এতই দুস্তর? এর কারণ কী? সমস্যাটা আর ততটা রাজনৈতিক অথবা অর্থনৈতিক থাকছে না; সমস্যাটা প্রায় মনস্তত্ত্বের এলাকায় গিয়ে পড়ছে।

মনস্তত্ত্বের বিষয়টাও অত্যন্তই গুরুত্বপূর্ণ। বিগত কয়েক বছরে ভারতবর্ষের কী ঘটেছে, ইংল্যাণ্ডে তা উপলব্ধি করা হয় কি? উপলব্ধি করা হয় কি যে মানবিক মর্যাদা ও সুরুচিকে চূর্ণ কববার এই প্রয়াস, আত্মার উপরে এই আঘাত—শারীরিক আঘাতের চাইতে যা আরও বেশী করে বেজেছে, ভারতীয় জনসাধারণের মনের উপরে কী ভাবে এর একটা স্থায়ী ছাপ পড়ে গিয়েছে? ক্ষমতাকে যারা প্রয়োগ করে, আর তার ফলে যারা নির্যাতিত হয়, ক্ষমতার স্বৈরাচারী প্রয়োগের ফলে তাদের উভয় পক্ষেরই যে কী ভাবে নৈতিক অধঃপতন ঘটে, এর আগে আর কখনও তা আমি এত স্পষ্টভাবে বুঝতে পারিনি। যা কিছু সুন্দর, যা কিছু সম্মানজনক, তাকে বিস্মৃত

না হয়ে কী করে আমরা এ-কথা বিস্মৃত হতে পারি? কী করে আমরা একে ভুলতে পারি, দিনের পর দিন যখন এই একই ব্যাপার চলছে? এই কি স্বাধীনতা আর ক্ষমতা-হস্তান্তরের সূচনা?

উৎপীড়নের ফলে বিভিন্ন ধরনের মানুষের উপরে বিভিন্ন ধরনের প্রতিক্রিয়া ঘটে। কেউ বা ভেঙে পড়ে, কেউ বা আরও শক্ত হয়ে ওঠে। যেমন অন্যত্র, তেমনি ভারতবর্ষেও এই দুই ধরনেব মানুষই আছে। আমাদের যে-সব সহকর্মী কারারুদ্ধ হয়ে অথবা অন্যভাবে যন্ত্রণা সহ্য করছেন, আমাদের অনেকের পক্ষেই তাঁদের পরিত্যাগ করা সম্ভব নয়। তা তার ফলে ব্যক্তিগতভাবে আমাদের যে-পরিণামই ভোগ করতে হক না কেন। গান্ধীর সঙ্গে একমত হই, আর না-ই হই, তাঁকে অসম্মান করা হলে আমাদের অনেকের পক্ষে তা সহ্য করা সম্ভব নয়। তার কারণ গান্ধী আমাদের কাছে ভারতবর্ষের মর্যাদার প্রতীক। বুদ্ধিমান কোনও মানুষই বিরোধ আর যন্ত্রণা আর বিপর্যয়ের পন্থাকে পছন্দ করেন না। আপন অস্তিত্বের মূল ভিত্তিটাকে বাঁচিয়ে রেখে ভারতীয় জাতীয় আন্দোলন তার সাধ্যানুযায়ী এই পন্থাকে পরিহার করবার প্রয়াস পেয়েছে। ব্রিটিশ সরকার কিন্তু এই পন্থাই অবলম্বন করেছেন, এবং শান্তিপূর্ণ মীমাংসাকে ক্রমেই আরও কষ্টসাধ্য করে তুলেছেন। ব্রিটিশ সরকার যদি মনে করে থাকেন যে এই পন্থাকে আঁকড়ে ধরে থাকলেই তাঁরা সফলকাম হবেন, তাহলে বুঝতে হবে, ইতিহাস থেকেও তাঁরা ভুল শিক্ষা নিয়েছেন, ভারতীয় জনসাধারণের বর্তমান মানসিক অবস্থাকেও তাঁরা বুঝতে পারেননি। বিপর্যয়কে যদি এড়াতে হয়, ব্রিটিশ সরকারকেই তার জন্য পশ্চাদপসরণ করতে হবে।

চিঠিখানি বড়ই দীর্ঘ হয়ে গেল, তার জন্য আমাকে মার্জনা করবেন।

ভবদীয়
জওহরলাল নেহরু

দি মার্কুইস অব লোথিয়ান,
সেমুর হাউস, ১৭ ওয়াটার্লু প্লেস, লণ্ডন এস. ডব্লু. ১

১১৯ এডওয়ার্ড টমসন কর্তৃক লিখিত

লণ্ডন,
২৬ নভেম্বর, ১৯৩৫

প্রিয় নেহরু (লৌকিকতার প্রয়োজন আমাদের নেই),

মাস খানেকের মধ্যেই আমি ভারত-যাত্রা করছি। তবে এপ্রিলের শেষে আবার ফিরে আসব।

তোমার স্ত্রী রুগ্ণা, তাই তোমার বইয়ের ব্যাপারে ইতস্তত দৌড়োদৌড়ি করা তোমার পক্ষে সম্ভব নয়। সুতরাং, প্রকাশক জোগাড় করে দেবার ব্যাপারে আমি যদি কিছু সাহায্য করতে পারি, এপ্রিল মাসে তোমার পাণ্ডুলিপি তুমি অতি অবশ্য আমার কাছে পাঠিয়ে দিও। সাহায্য করতে আমি পারি। করবও। আমাদের মধ্যে মতের মিল হক আর নাই-ই হক, তাতে কিছু যায় আসে না; তোমার বক্তব্য আদ্যন্ত এবং অবাধে সবাইকে শোনাবার অধিকার তুমি অর্জন করেছ। সমালোচনার সময় যখন আসবে, তখন সে-ব্যাপারেও আমি সাহায্য করতে পারি।

তোমাকে দেখে আমার মনে হয়েছিল, তুমি অত্যন্তই পরিশ্রান্ত। আমি নিজেও অত্যন্ত পরিশ্রান্ত, এবং ভগ্নস্বাস্থ্য। সুতরাং তোমাকে আমি সহানুভূতি জানাতে পারি। আমি চাই ব্রিটেন ও ভারতবর্ষের মধ্যে বন্ধুত্ব প্রতিষ্ঠিত হক। শুধু তা-ই নয়, আমি চাই, এখানে ও ভারতবর্ষে এক ন্যায়সঙ্গত সামাজিক ব্যবস্থার সূচনা হক। সুতরাং তোমার আত্মজীবনী, এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রশ্ন সম্পর্কে তুমি যে

একখানি বই লিখবে বলে আমি আশা করি, এ দুটি গ্রন্থের ব্যাপারে আমাকে কাজে লাগাতে দ্বিধা কর না। যেটুকু আমার পক্ষে করা সম্ভব, আমি করব। আশা করি মিসেস নেহরু ক্রমেই সুস্থ হয়ে উঠবেন।

এস সি. বি. সম্পর্কে বারংবার আমার যথাসাধ্য চেষ্টা আমি করেছি। তবে ঊর্ধ্বতন মহলে আমি নিজে আদৌ গণ্যমান্য লোক নই!

তোমাদের
এডওয়ার্ড টমসন

[এস. সি. বি. বলতে সুভাষচন্দ্র বসুকে বোঝান হয়েছে।]

১২০ রিচার্ড বি. গ্রেগ কর্তৃক লিখিত

এলিয়ট স্ট্রীট সাউথ ন্যাটিক,
মাসাচুসেট্‌স. ইউ. এস. এ.
৩ ডিসেম্বর, ১৯৩৫

প্রিয় নেহরু,

তোমার ১৪ নভেম্বর তারিখের চিঠি ও ২০ নভেম্বর তারিখের পোস্টকার্ডের জন্য ধন্যবাদ জানাই। দুখানি বই-ই নির্বিঘ্নে তোমার কাছে পৌঁছেছে জেনে সুখী হয়েছি।

এ-বিষয়ে আমি তোমার সঙ্গে একমত যে সুস্থ সমাজ গঠনের জন্য যে-সমস্ত পরিবর্তনের প্রয়োজন, বৈপ্লবিক অথবা সংস্কারমূলক একটা সুদৃঢ় অর্থনৈতিক ও সামাজিক কর্মসূচী না থাকলে শুধু অহিংস প্রতিরোধের দ্বারা সে-সমস্ত পরিবর্তন ঘটান যাবে না। গান্ধীর কর্মসূচীকে এইজন্য আমার ভাল লাগে যে এর মধ্যে অর্থনৈতিক একটা অংশ রয়েছে; তাকে অবলম্বন করে প্রতিদিনই প্রত্যেকের পক্ষে অল্প-কিছু কাজ করা সম্ভব। খদ্দর- ও গ্রামশিল্প-পরিকল্পনা যে অসম্পূর্ণ, এ-কথা মেনে নিয়েও বলা যায়, এ-পরিকল্পনার একটা সুবিধে রয়েছে। সেটা হল এই যে অহিংস নীতির সঙ্গে এই পরিকল্পনা সঙ্গতিপূর্ণ, এবং কৃষি-জীবনের অর্থনৈতিক অবস্থার উপরে এর একটা নির্দিষ্ট প্রভাব বর্তমান। অহিংস প্রতিরোধের সঙ্গে-সঙ্গে এই সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তন সাধনের বিষয়টি নিয়ে আমি বিশেষভাবে চিন্তা করছি, এবং আমি নিশ্চিত যে পরিকল্পনার এই গঠনাত্মক অর্থনৈতিক অংশটিকেও আরও পূর্ণভাবে বিকশিত করে তুলতে হবে।

স্পষ্টতর সামাজিক লক্ষ্যের আপেক্ষিক গুণাবলী এবং সেই লক্ষ্যে উপনীত হবার উপায় সম্পর্কে গান্ধীর সঙ্গে তোমার যে পত্র-বিনিময় হয়েছিল, তা আমি সাগ্রহে পাঠ করেছি। প্রেরণার প্রতীক ও উৎস হিসেবে, এবং জনসাধারণের উদ্যমকে তার উপরে স্থিরনিবদ্ধ করবার উপায় হিসেবে ভবিষ্যৎ সমাজ-ব্যবস্থার একটি সুনির্দিষ্ট নকশার মূল্য আমি বুঝি। কিন্তু দুটি কারণে আমি উদ্বেগ বোধ করছি। প্রথমত, মানবিক বিষয়াবলী এতই জটিল যে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আগে থাকতেই নিশ্চয় করে কিছু বলা সম্ভব নয়; এবং ভবিষ্যৎ রাষ্ট্র সম্পর্কে আমাদের পরিকল্পনা যতই সম্পূর্ণ হক না কেন, তার যে-রূপ আমরা পরিকল্পনা করছি, বাস্তবে সেই রূপ সে কখনও পরিগ্রহ করবে না। রাশিয়া সমেত বর্তমান সকল রাষ্ট্র সম্পর্কেই এ-কথা সত্য। আমার মনে হয়, সর্বকালেই সত্য থাকবে। মৌল সুনির্দিষ্ট নকশাটিকে আমরা যদি বড্ড বেশী আঁকড়ে ধরে থাকি, আমাদের কাজ তাতে ফলপ্রসূ হবে না। পরিস্থিতির সঙ্গে আমাদের খাপ খাইয়ে নিতে হবে; চলিষ্ণু শক্তিগুলির যেমন-যেমন বিকাশ ও পরিবর্তন ঘটবে, সেই মত আমাদের ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে।

আমার অপর সন্দেহটি এই যে ভবিষ্যতের আদর্শ রাষ্ট্রের বিশদ ব্যবস্থাবলী কী হবে, সেইটে নির্ধারণ করতেই যদি আমরা অতিরিক্ত সময় ও উদ্যম ব্যয় করে বসি, তাহলে খ্রীষ্টানদের উপরে ঈশ্বরের রাজ্য বিষয়ক খ্রীষ্টীয় ধারণার যে প্রতিক্রিয়া হয়েছিল, আমাদের উপরেও এর সেই একই প্রতিক্রিয়া হবে। আদর্শ ও বর্তমান বাস্তবের মধ্যকার পার্থক্যের ফলে আদর্শের রূপায়ণ এতই পিছিয়ে যায় যে মানুষ তখন আদর্শকে নিছক আদর্শ বলেই জ্ঞান করতে থাকে, তাকে বাস্তবে রূপায়িত করবার জন্য যে বিরাট ত্যাগস্বীকারের প্রয়োজন রয়েছে, এ-কথা তারা ভাবে না। এটা তখন নিষ্ক্রিয়তা ও ভণ্ডামির একটা অজুহাত হয়ে দাঁড়ায়। এই কারণেই আমার মনে হয়, উপায়ের উপরে গুরুত্ব আরোপ করে গান্ধী বিচক্ষণ কাজই করেছেন। উপায়টাকে আরও ভালভাবে বিকশিত করে তুলে অহিংস প্রতিরোধের পরিপূরক হিসেবে দৈনন্দিন অর্থনৈতিক ও সামাজিক কর্মপ্রয়াসকেও যদি তার অন্তর্ভুক্ত করা যায় ,এবং কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি বিষয়ের কাজের মধ্য দিয়ে যদি অন্যান্য বিষয়ের কর্ম নিষ্পন্ন করবার জন্য প্রস্তুতি ও শৃঙ্খলা গড়ে ওঠে, তাহলে কি এমন সব প্রতীক সৃষ্টি করা যাবে না, মানবিক কর্মোদ্যোগ যাতে জাগ্রত হয়, নিবিষ্ট হয়, সুরক্ষিত হয় এবং অন্যান্য ক্ষেত্রেও সঞ্চারিত হয়ে যেতে পারে? ভবিষ্যৎ সমাজবাদী আদর্শ রাষ্ট্রের কল্পচিত্রের মতনই কি এ সমান শক্তিশালী হবে না?—উপরন্তু যে-দুটি বিপদের ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি, এর মধ্যে তা থাকবে না।

তোমার চিঠি পড়ে বুঝলাম, জনতা সম্পর্কে নাইবুরের নৈরাশ্যবাদী ধারণার সঙ্গে তুমি একমত। তা-ই যদি হয়, তাহলে আমাকে স্বীকার করতেই হবে যে তোমাকে অথবা নাইবুরকে যে কী ভাবে সমাজবাদী বলা যেতে পারে, তা আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না। তার কারণ, একটা সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর বলপ্রয়োগের মাধ্যমে যদি না তুমি সমাজবাদ প্রতিষ্ঠা ও তাকে রক্ষা করতে চাও, তবে তার জন্য জনসাধারণের উচ্চমান ও দীর্ঘস্থায়ী নৈতিক আচরণের প্রয়োজন হয়ে থাকে। আর সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর বলপ্রয়োগের মাধ্যমেই যদি সমাজবাদ প্রতিষ্ঠিত ও রক্ষিত হয় তাহলে অর্থনৈতিক উৎপাদনের উপায়সমূহের নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতাও সেই লংখ্যালঘু গোষ্ঠীকেই করায়ত্ত করতে হবে, এবং সেক্ষেত্রে সেই গোষ্ঠীকে আমি এক শাসক-শ্রেণী বলেই গণ্য করব। তাদের সহিংস আচরণের ফলে বিরোধিতার সৃষ্টি হবে, এবং শাসক-শ্রেণী সচরাচর যে-ধরনের পরিস্থিতি গড়ে তোলে, দেখা যাবে যে ঠিক তারই পুনরাবৃত্তি ঘটছে। অতঃপর স্বাধীনতা অর্জনের জন্য জনসাধারণকে আবার (অন্তত সাম্যবাদী নীতি অনুযায়ী) এক সহিংস বিপ্লবের মাধ্যমে সেই শাসক শ্রেণীকে ক্ষমতাচ্যুত করতে হবে।

তোমার স্ত্রীর স্বাস্থ্যের উন্নতি হচ্ছে জেনে খুব সুখী হয়েছি। আশা করি এই উন্নতি অব্যাহত থাকবে। পৃথক মোড়কে তোমাকে আমার একখানি পুস্তিকা পাঠাচ্ছি। হয়ত এটি তুমি দেখেছ। না-ও দেখে থাকতে পার। প্রকাশকই পুস্তিকাটির নামকরণ করেছেন। নামটার মধ্যে গান্ধীর কর্মসূচী ও সমাজবাদের মধ্যকার বিরোধের যে ইঙ্গিত রয়েছে, তার জন্য আমি দুঃখিত। পুস্তিকাটিতে বিরোধী কথা বলতে আমি চাইনি; আমি শুধু একটা তুলনা টেনে দেখাতে চেয়েছি।

শুভেচ্ছা জানাই।

তোমাদের
রিচার্ড বি. গ্রেগ

পুনশ্চ : ভবিষ্যৎ সমাজের—সে-সমাজ সমাজবাদীই হক আর যা-ই হক—পূর্ণাঙ্গ চিত্র সম্পর্কে জনসাধারণকে শিক্ষিত করে তোলার জন্য অত্যধিক পরিশ্রম স্বীকার

ও এর উপরে অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপের বাঞ্ছনীয়তা সম্পর্কেও আমার মনে একটা সন্দেহ দেখা দিয়েছে। বিশেষ কোনও ধরনের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংগঠনই ত চূড়ান্ত লক্ষ্য নয়, চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্জনের এ একটা পন্থা মাত্র। চূড়ান্ত লক্ষ্য হল জনসাধারণের জন্য একটা পূর্ণাঙ্গ ও সন্তোষজনক জীবন-ব্যবস্থা। বিশেষ কোনও ধরনের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংগঠনের উপরে যদি অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়, এবং তারই খুঁটিনাটি ব্যবস্থা নিয়ে যদি বছরের পর বছর প্রচার ও শিক্ষা-বিতরণের কাজ চালিয়ে যাওয়া হয়, তাহলে এইটেকেই হয়ত চূড়ান্ত লক্ষ্য বলে ধরে নেওয়া হবে; এইটেই আমাদের জীবন ও শক্তিকে করায়ত্ত করে মানুষের চোখে এতই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দেখা দেবে যে সমৃদ্ধতর মানব-জীবনের পথে এইটেকে একটা উপায় বলে মনে না করে, মানব-জীবনকেই স্বেচ্ছায় তখন তারা একটা উপায়মাত্রে পর্যবসিত করতে প্রস্তুত থাকবে. এবং এই বিশেষ ধরনের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংগঠনকেই মনে করবে চূড়ান্ত লক্ষ্য। ভবিষ্যৎ সমাজ-ব্যবস্থার খসড়া চিত্র রচনা করতে গেলে সেটা হয়ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের মতই একটা লিপিবদ্ধ রূপ পরিগ্রহ করবে, এবং অনড় হয়ে দাঁড়াবে; ভবিষ্যৎ অবস্থায় পরিবর্তন ঘটিয়ে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেবার ক্ষমতা তার থাকবে না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের লিপিবদ্ধ সংবিধানের তুলনায় অলিখিত ব্রিটিশ সংবিধানের এই একটা সুবিধা বর্তমান। ব্রিটিশ সংবিধান একটা নির্দিষ্ট লিপিবদ্ধ অনড় রূপ নেয়নি বলেই সে নমনীয় রয়েছে, নিজেকে সে পরিবর্তিত করতে পারে। মাঝে-মাঝেই অবশ্য কোনও অজুহাতের ছদ্মবেশে সে-পরিবর্তন ঘটান হয়; তবু ঘটান যে হয়, এইটেই প্রধান কথা। আমার মনে হয়, সমাজবাদী আদর্শের একটা মোটামুটি চিত্র সম্পর্কে মতৈক্য সাধিত হবার পর থেকে যে-উপায়ে জনসাধারণের পক্ষে ক্ষমতা করায়ত্ত করা সম্ভবপর, প্রধানত সেই সম্পর্কে তাদের শিক্ষিত করে তোলার জন্য চেষ্টা করাই বিচক্ষণতার কাজ হবে। একবার যদি তারা ক্ষমতা করায়ত্ত করতে পারে, তখন যে-ধরনের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংবিধান বাঞ্ছনীয় বলে মনে হবে, সেই ধরনের সংবিধানই তারা গ্রহণ করতে পারবে। অবশ্য এ-সব চিন্তা আমার মনে সবে ছায়া ফেলেছে মাত্র। তোমার যদি সময় থাকে, এবং এ-সব চিন্তা সম্পর্কে তোমার সমালোচনা যদি আমাকে জানাও, তাহলে তোমার সাহায্যের জন্য আমি কৃতজ্ঞ বোধ করব।

আর. বি. জি.

১২১ রফি আহমদ কিদোয়াই কর্তৃক লিখিত

লখনউ,
৯ ডিসেম্বর, ১৯৩৫

প্রিয় জওহরলালজী,

আপনার ১৫ নভেম্বর তারিখের চিঠি ২৮ তারিখে মাসৌলিতে এসে পৌঁছয়। *২ তারিখে মাসৌলিতে পৌঁছে সে-চিঠি আমি পেয়েছি। চিঠির উপরে 'বাই এয়ার মেল' লেবেলটি দেখলাম নাকচ করে দেওয়া হয়েছে।*

কমলাজীর অবস্থা আবার খারাপ হয়ে পড়েছিল জেনে দুঃখিত হলাম। সকলেই আমরা সাগ্রহে আশা করে আছি যে শিগগিরই তিনি সেরে উঠবেন। আশা করছি, তিনি সুস্থ হয়ে উঠবেন, এবং আপনার পক্ষেও তাড়াতাড়ি ভারতবর্ষে ফিরে আসা সম্ভব হবে।

বর্তমানে আমি এক চূড়ান্ত রকমের দুঃখদায়ক অবস্থার মধ্যে পড়েছি, এবং এ-অবস্থায় এনে ফেলার জন্য আপনাকেই দোষ দিচ্ছি। ১৯২৫-২৭ সনের শোকাবহ

অভিজ্ঞতার পর আমি স্থির করেছিলাম, প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির কর্ম-পরিষদ থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখব। কিন্তু ১৯৩১ সনে আমি বারংবার প্রত্যাখ্যান করা সত্ত্বেও আপনি আমাকে জোর করে আবার তারই মধ্যে এনে বসিয়ে দিলেন। কোথা থেকে যে বিরোধিতার সৃষ্টি হতে পারে, সে-বিষয়ে আমি আপনাকে সতর্ক করে দিয়েছিলাম। যা আমি আশংকা করেছিলাম, তা-ই এখন ঘটছে। বর্তমানে আমি এক অত্যন্তই অস্বস্তিজনক অবস্থার মধ্যে পড়েছি। আমি যদি সরে দাঁড়িয়ে অবসর নেবার চেষ্টা করি ত এই বলে আমার উপরে দোষারোপ করা হয় যে আর-এক সংকট আমি সৃষ্টি করছি। আর আমি যদি সক্রিয় থাকতে চাই ত প্রতিটি সুযোগে আমাকে অপমান করা হয়। এর ফলে আমাদের প্রতিষ্ঠানের শৃংখলা ক্ষুণ্ণ হতে পারে, তবু।

বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে আপনাকে বিব্রত করতে চাই না। শুধু কোনও দিন যদি শোনেন যে আমি বোকার মতন কোনও কাজ করে বসেছি, তাহলে দয়া করে মনে রাখবেন যে যে-রকম নৈরাশ্যজনক অবস্থার মধ্যে আমাকে এনে ফেলা হচ্ছে, সেই অবস্থাই তার হেতু।

আপনার রফি

১২২ রাজেন্দ্র প্রসাদ কর্তৃক লিখিত

শিবির ঃ ওয়ার্ধা,
১৯ ডিসেম্বর, ১৯৩৫

প্রিয় জওহরলালজী,

দিন কয়েক আগে আপনার চিঠি পাই। আমি তখন দাক্ষিণাত্যে সফর করছিলাম। ১৩ তারিখে এখানে এসেছি। এখানে এসে বাপু ও মহাদেবের কাছে লিখিত আপনার কয়েকখানি চিঠি পড়বার সুযোগ হল। পরবর্তী কংগ্রেসে আপনিই বোধহয় সভাপতি নির্বাচিত হবেন। আপনার দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে বল্লভভাই, যমুনালালজী ও আমার দৃষ্টিভঙ্গির যে কিছু পার্থক্য আছে, তা আমি জানি। এই পার্থক্য মূলগতও বটে। কিন্তু বিগত কয়েক বছর ধরেই এই পার্থক্য রয়েছে, এবং তৎসত্ত্বেও মিলিতভাবে আমরা কাজ করেছি। বাপু এখন এক হিসেবে অবসর নিয়েছেন; উপদেশ চাইলে তবেই তিনি উপদেশ দেন। সুতরাং এই পার্থক্যগুলি এবারে আরও প্রকট হয়ে উঠতে পারে। তবে আমি বিশ্বাস করি, আমাদের কর্মসূচী ও কর্মপন্থার যদি মৌলিক কোনও পরিবর্তন ঘটান না হয়, তাহলে এর পরেও আমরা মিলেমিশে কাজ করে যেতে পারব। বর্তমানে যে-অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, তাতে যে আপনি অসন্তুষ্ট, তাতে সন্দেহ নেই। এ-অবস্থায় আমরাও কেউই সন্তুষ্ট নই। তবে অসুবিধার কারণগুলি এই পরিস্থিতির মধ্যেই নিহিত হয়ে রয়েছে, এবং আমার মনে হয় যে জোর করে গতিবেগ বৃদ্ধি করা অথবা কোনও সার্বিক পরিবর্তন ঘটান সম্ভব নয়। বড় বড় সমস্ত সংগ্রামেই আমাদের অনুরূপ পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়ে থাকে, এবং যতই না কেন আমরা ক্রোধ ও অসন্তোষ প্রকাশ করি, অবস্থাকে মেনে নিয়ে চুপ করে আমাদের তখন কাজ করে যেতে হয় ও সুসময়ের জন্য ধৈর্য ধরে থাকতে হয়। অনুরূপ এক সংকটের মধ্য দিয়ে আমরা এখন চলেছি। তবে এতে নিরাশ হয়ে পড়বার মতন কোনও কারণ আমি দেখছি না। মুক্তি-চেতনা ত চূর্ণ হয়ে যায়নি, কিংবা সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে অসহায়ের মতন নতিস্বীকার করবার মতন মনোভাবও ত দেখা দেয়নি। অসহযোগ-আন্দোলনের পূর্বে যে-মনোভাব বিদ্যমান ছিল, আমাদের কেউই যে আবার সেই মনোভাবের ক্ষেত্রে ফিরে গিয়েছেন, এমন কথা আমি বিশ্বাস করি না। আমার মনে হয় না যে আমরা আবার ১৯২৩-২৮

সনের অবস্থায় ফিরে গিয়েছি। আমাদের মনোভাব এখনও ১৯২৮-২৯ সনের মনোভাবের মতনই রয়েছে, এবং শিগ্‌গিরই যে সুদিন আসবে, তাতে আমার সন্দেহ নেই। বুদ্ধি ও সাধ্য অনুযায়ী যতখানি কাজ করা সম্ভব, তা আমরা করছি। এর চাইতে বেশী কিছু করা কারও পক্ষে সম্ভব নয়। যা-ই হক, আপন ইচ্ছানুযায়ী ঘটনার রূপ নিয়মনের ও ওয়ার্কিং কমিটি নিয়োগের অধিকার আপনার অবশ্যই আছে, এবং এ-বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন যে কেউই আমরা কোনও অসুবিধার সৃষ্টি করব না। এমন কি, যেখানে আমাদের পক্ষে সাহায্য করা সম্ভব নয়, সেখানেও আমরা কখনও বাধাসৃষ্টি করব না।

যে-কর্মসূচীকে আমরা সফল করে তুলবার চেষ্টা করছি, চিঠিতে তার ব্যাখ্যা সম্ভব নয়। এ-কাজ উদ্দেশ্যহীন নয়, অথবা এ শুধু সুদিনের প্রতীক্ষায় বসে থাকাও নয়। কিন্তু এ-কাজ যদি আপনার মনঃপূত না হয়, তাহলে এর চাইতে ভাল কোনও কর্মসূচী পাওয়া গেলে কেউই একে অন্ধভাবে আঁকড়ে বসে থাকবে না। অবস্থা যেটুকু জটিল ছিল, তার চাইতে বেশী জটিল আমরা তাকে করিনি। অনায়াসেই আপনি আবার নতুন করে কাজ শুরু করতে পারেন।

ভ্রমাত্মক ও অন্যায়ভাবে এ-কথা মনে করা হয়েছে যে নূতন শাসনতন্ত্র অনুসারে দপ্তর ছাড়া ওয়ার্কিং কমিটি আর কোনকিছুই চিন্তা করছেন না। বস্তুত, এ-বিষয়ের প্রতি কোনও গুরুত্বই আমরা আরোপ করিনি। পক্ষান্তরে, আমরা যাতে একটা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে বাধ্য হই, অন্যরাই তার জন্য চেষ্টা করছে। গত এপ্রিল মাসে জব্বলপুরে প্রথম এই চেষ্টা করা হয়েছিল। আমরা তখন মনে করেছিলাম, এত তাড়াতাড়ি এ-বিষয়ে কোনও সিদ্ধান্ত করা উচিত হবে না। মাদ্রাজে আমাদের সে-মনোভাব অনুমোদন করা হয়। সেই মনোভাবকেই এখনও আমরা আঁকড়ে আছি। লখনউতে এই ব্যাপারের একটা মীমাংসা করবার প্রয়োজন হবে। কোনও দিক থেকেই ব্যাপারটা নির্বিঘ্ন নয়।

আমার মনে হয়, প্রশ্নটা শুধু দপ্তর গ্রহণ অথবা দপ্তর বর্জনের, এমন কথা মনে করাটা ঠিক নয়। আমার বিবেচনায় নিছক দপ্তর গ্রহণের জন্য কেউ দপ্তর গ্রহণ করতে চান না। সরকার যেভাবে এই শাসনতন্ত্রকে কর্মক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে চান, কেউই কামনা করেন না যে সেইভাবেই এটার প্রয়োগ হক। যে-সব প্রশ্ন আমাদের মনে দেখা দিয়েছে, তা সম্পূর্ণই পৃথক। এই শাসনতন্ত্র সম্পর্কে কী ব্যবস্থা আমরা অবলম্বন করব? আমরা কি একে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে নিজেদের পথেই চলতে থাকব? তা করা কি সম্ভব? আমরা কি একে দখল করে আপন ইচ্ছানুযায়ী যথাসম্ভব একে কাজে লাগাব? আমরা কি ভিতর থেকে এর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করব, নাকি বাইরে থেকে? কোন্ পথেই বা সংগ্রাম করব? এই শাসনতন্ত্র প্রবর্তিত হবার ফলে যে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, আসলে এটা বর্তমান অবস্থানুসারে সে সম্পর্কে ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য একটা সুনির্দিষ্ট কর্মসূচী রচনারই প্রশ্ন। তথাকথিত পরিবর্তনকামী অথবা পরিবর্তনবিরোধী, সহযোগী অথবা বিঘ্নসৃষ্টিকারীর পূর্ব-নির্দিষ্ট ধারণার উপরে ভিত্তি করে এ-প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যাবে না। কিছু পরিমাণে কুৎসা রটনা করা হয়েছে বটে, কিন্তু সে ত অনিবার্য। আমাদের দেখতে হবে দেশের কিসে মঙ্গল হয়; এবং যে মহান লক্ষ্যের উপরে আমরা দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছি, তার উপর আমাদের সিদ্ধান্তের কী প্রতিক্রিয়া ঘটে। পূর্বোক্ত প্রশ্নটি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে এ ছাড়া আর সমস্ত কিছুকেই উপেক্ষা করতে হবে।

দেশীয় রাজ্য সংক্রান্ত প্রশ্নটি সম্পর্কে আমাদের মনে হয়েছে যে মাদ্রাজে এ-বিষয়ে যা বলা হয়েছিল, তার বেশী কিছু করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। প্রভূত চিন্তার

পরেই এ-সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল, এবং আমাদের ও অন্যান্যদের চিন্তার মধ্যে যদি বিরাট কোনও পার্থক্য থাকে, তবে তাকে স্বীকার করেই নিতে হবে।

বৈদেশিক প্রচার সংক্রান্ত প্রশ্নটি সম্পর্কে যে-অবস্থার উদ্ভব হয়েছে, তার সঙ্গে এর প্রভূত সাদৃশ্য বর্তমান। আর্থিক অসুবিধার কথা ছেড়ে দিলেও, এর ফলে সত্যিকারের কোনও কাজ হবে কিনা, তা আমরা জানি না। আপনার মত বন্ধুদের দ্বারা যে-সব যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তার মারফত বৈদেশিক ব্যাপার সম্পর্কে আমরা ওয়াকিবহাল থাকতে পারি, এবং এখানকার অবস্থা সম্পর্কে সত্য খবরও আমরা এখনকার মতই তাঁদের মারফতে বাইরে প্রচার করতে পারি। এর বেশী কিছু করা সম্ভব নয়। এখানকার প্রকৃত পরিস্থিতি সম্পর্কে আমরা খুবই সচেতন। বাইরের দেশগুলির উপরে তা কোনও দাগ কাটবে বলে আশা করা যায় না। তাদের নিজেদেরই অন্যান্য জটিল সমস্যা রয়েছে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও, আমরা যদি শক্তিশালী ও ঐক্যবদ্ধ হতাম, তাহলে আমাদের উপেক্ষা না করতে তাদের বাধ্য করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হত।

ঘরোয়া ধরনের আর-একটি প্রশ্ন রয়েছে। সেটি হল গঠনতন্ত্র সংশোধনের প্রশ্ন। এ-বিষয়ে আপনার মন্তব্য আমি দেখেছি। আপনার কয়েকটি পরামর্শ আমার ভাল লেগেছে। এ-বিষয়ে বিবেচনা করে দেখবার জন্য আমরা একটি সাব-কমিটি নিয়োগ করেছি। কংগ্রেসের অধিবেশনের আগেই আমরা একটি রিপোর্ট দাখিল করতে পারব। আপনার যদি আর কোনও পরামর্শ থাকে, দয়া করে আমাদের জানাবেন।

একটা বড় মজার প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। গঠনতন্ত্রে এই ব্যবস্থা আছে দেখবেন যে কোনও নির্বাচিত কমিটির সদস্যপদে অথবা কোনও দপ্তরের জন্য কাউকে যদি নির্বাচন করতে হয়, তবে তার আগে ছ মাসের জন্য তাঁর কংগ্রেসের সদস্যপদে অধিষ্ঠিত থাকা দরকার; সেইসঙ্গে এটাও আবশ্যক যে তিনি নিয়মিতভাবে খাদি পরিধান করবেন এবং কায়িক পরিশ্রমের কিছু কাজ করবেন। আগে যাঁরা সভাপতি ছিলেন, অথবা কারাগারে থাকার দরুন কি অন্য কোনও কারণে যাঁদের পক্ষে এইসব সর্তপালন সম্ভব নয়, এমন কি তাঁদের জন্যও গঠনতন্ত্রে কোনও ব্যতিক্রম রাখা হয়নি। গঠনতন্ত্রের ব্যবস্থা অনুসারে আপনার ও সুভাষবাবুর এমন অধিকার নেই যে আপনারা ডেলিগেট অথবা কর্মকর্তা হিসেবে নির্বাচিত হতে পারেন। এমন কি, অনবধানবশত ডঃ আনসারীও যথাসময়ে সদস্য-ফর্মে স্বাক্ষর করেননি, এবং এ-সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভার আমার উপরে অর্পণ করা হয়েছে। আমার সিদ্ধান্ত এখনও জানাইনি। অনুমোদন লাভের জন্য ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের আমি নূতন একটি নিয়মের কথা জানাচ্ছি। এইসঙ্গে যে কাগজপত্র আপনাকে পাঠালাম, তাতে আপনি নিয়মটি দেখতে পাবেন।

কংগ্রেসের সভায় মিলিত হবার আগে যে আমাদের পক্ষে মিলিত হয়ে চিন্তা-ভাবনার আদান-প্রদান সম্ভব হয় না, এটা আক্ষেপের বিষয়। এও দুর্ভাগ্যের কথা যে ফিরে আসবার পর ঘটনাবলী সম্পর্কে প্রত্যক্ষ জ্ঞানলাভের জন্য অত্যন্তই অল্প সময় আপনি পাবেন। ফেব্রুয়ারি মাসের তৃতীয় সপ্তাহের পূর্বে আপনার ফিরে আসবার সম্ভাবনা নেই; কংগ্রেসের অধিবেশন হবে মার্চ মাসে। তারিখ এখনও আমি ঠিক করিনি, তবে তারিখটাকে মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহের পরে পিছিয়ে দেওয়ার পক্ষে অসুবিধা আছে। আশা করি, এতে আপনার অসুবিধা হবে না।

আমরা ঠিক করেছি যে প্রতিনিধি নির্বাচনের শেষ তারিখ হল ৭ মার্চ, এবং সভাপতি নির্বাচনের শেষ তারিখ ২৫ জানুয়ারি। সমস্ত প্রদেশে একই সঙ্গে নির্বাচনের কাজ সম্পন্ন করতে হবে।

সভাপতি নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার জন্য জানুয়ারি শেষে ওয়ার্কিং কমিটির একটি সভা ডাকতে হবে। পরবর্তী কংগ্রেসের জন্য ওয়ার্কিং কমিটিকে যে খসড়া পরিকল্পনা রচনা করতে হবে, তা নিয়ে আমি আলোচনা করতে চাই। তবে মনে হয়, আপনার অনুপস্থিতিতে তা সম্ভব হবে না। সুতরাং এজন্য আপনার প্রস্তাব অনুযায়ী যে-কোনও সময়ে আমি আর-একটি সভা ডাকব। তবে কাজটা যত তাড়াতাড়ি হয়, ততই ভাল। ইতিমধ্যে, আপনার প্রস্তাব সম্পর্কে ভেবে দেখবার জন্য আমরা যাতে কিছুটা সময় পাই, তার জন্য সম্ভব হলে আপনার প্রস্তাবগুলি দয়া করে আমার কাছে পাঠিয়ে দেবেন।

বাপুর রক্তের চাপ এখনও খুব বেশী চলছে। ডঃ গিল্ডার ও জীবরাজ মেটা তিন দিন আগে তাঁকে পরীক্ষা করেছেন, এবং দু মাস তাঁকে বিশ্রাম নিতে উপদেশ দিয়েছেন। আশা করি কমলাজী ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠছেন এবং আপনার অনুপস্থিতির জন্য তাঁর খুব অসুবিধা হবে না।

ভবদীয়

Rajendra Prasad

১২৩ এফ লেজনি কর্তৃক লিখিত

ইণ্ডো-চেকোস্লোভাক সোসাইটি অব
দি ওরিয়েণ্টাল ইনস্টিট্যুট,
প্রাহা ৩, ভ্লাসকা ১৯, চেকোস্লোভাকিয়া, প্রাহা,
১৯ নভেম্বর, ১৯৩৫

প্রিয় মহাশয়,

আপনার গ্রন্থ গ্লিম্পসেস অব ওয়ার্ল্ড হিস্ট্রির একটি কপি আপনি অনুগ্রহ করে আমাকে পাঠিয়েছেন, তার জন্য আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। এই কপিটি পাবার আগে মিঃ নাম্বিয়ারের অনুগ্রহে তাঁর কপিটি পড়বার সুযোগ আমার হয়েছিল। এইভাবে এই গ্রন্থপাঠ আমার সম্পূর্ণ হয়েছে। বিশ্ব ইতিহাসের প্রধান প্রধান গতিধারা সম্পর্কে আপনি যে সর্বাঙ্গীণ উপলব্ধি ও ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন, বিশেষ করে তাতে আমি মুগ্ধ হয়েছি। এ ছাড়া আপনার পত্রাবলীতে অতি নিবিড় একটি আন্তরিকতার স্পর্শ রয়েছে। আপনার আরও দুটি গ্রন্থ, বিশেষ করে লেটার্স ফ্রম এ ফাদার টু হিজ ডটার গ্রন্থটির জন্যও আপনাকে ধন্যবাদ জানাই। এ-বইটি সত্যিই অপূর্ব।

আমাকে কিছু বইপত্র পাঠিয়ে দেবার জন্যও দয়া করে আপনি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সম্পাদক মিঃ কৃপালনীকে অনুরোধ জানিয়েছেন। এই ভদ্রলোকের কাছ থেকে ইতিমধ্যেই এ-বিষয়ে আমি সদয় একটি চিঠি পেয়েছি।

আপনাদের মহান দেশের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ককে দৃঢ় করে তোলাই আমাদের সমিতির উদ্দেশ্য; আপনার মূল্যবান সাহায্যের ফলে এই উদ্দেশ্য যে সফল হবে, এ-বিষয়ে আমি নিশ্চিত।

মিসেস নেহরুর স্বাস্থ্যের যে প্রভূত উন্নতি হয়েছে, এবং তিনি যে এখন বিপন্মুক্ত, এ-কথা জেনে সত্যিই বড় আনন্দিত হলাম। দয়া করে তাঁকে আমার সশ্রদ্ধ শুভেচ্ছা জানাবেন।

আপনার কন্যা ইন্দিরার কাছে পৃথক মোড়কে আমাদের প্রাহা সম্পর্কে একটি বই পাঠাচ্ছি। এই ছবিগুলি দেখে আপনার হয়ত নিকট ভবিষ্যতে আমাদের এখানে

আসবার ইচ্ছা হবে। যদি আসেন, আমাদের এই সুন্দর দেশে আপনাকে ও আপনার পরিবারবর্গকে পেয়ে আমরা খুবই সুখী হব।

মিঃ নেহরু, আবার আপনাকে আমার ধন্যবাদ ও সশ্রদ্ধ শুভেচ্ছা জানাই।

ভবদীয়

জওহরলাল নেহরু, এস্কোয়ার — এফ লেজনি

১২৪ মাদলিন রলাঁ কর্তৃক লিখিত

১২ জানুয়ারি, ১৯৩৬

ভিলা লিঅনেত—ভিলনাভ (ভোদ)

প্রিয় মিঃ নেহরু,

কিছুকাল যাবৎ গান্ধীজীর কাছ থেকে সরাসরি কোনও খবর পাইনি। তবে ডিসেম্বর মাসের হরিজনে এবং আজ লন্ডনের কয়েকটি কাগজে খবর দেখলাম যে অত্যধিক পরিশ্রম ও রক্তের চাপবৃদ্ধির ফলে তিনি গুরুতররূপে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। ভারতবর্ষ থেকে সর্বশেষ যে খবর পেয়েছেন, তা যদি আমাকে জানান, সুখী হব।

এ ছাড়া, গান্ধীর সম্পর্কে সৌম্যেন ঠাকুর যে বই লিখেছেন, তা নিয়ে ইউরোপের কোনও-কোনও সমাজবাদী ও সাম্যবাদী মহলে বর্তমানে যে শোকাবহ প্রচারকার্য চালান হচ্ছে, তার প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। মাত্রই গত সপ্তাহে জেনেভার সমাজবাদী পত্রিকা দ্রোয়া দে পাপ্‌ল-এ এই বই সম্পর্কে পুরো একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে; পুঁজিবাদীদের কাছে তিনি আত্মবিক্রয় করেছেন, জাতির প্রতি তিনি বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন, গান্ধীর বিরুদ্ধে আনীত এইসব অভিযোগের উপরে উক্ত প্রবন্ধে বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। পাশ্চাত্ত্য ভূখণ্ডে এমন হাজার হাজার সরল মানুষ রয়েছেন, এখানকার দৈনিকপত্রে প্রকাশিত উক্তিমাত্রকেই যাঁরা সত্য বলে ধরে নেন! এই ধরনের আক্রমণাত্মক লেখা তাঁরা পড়েন, বিশ্বাসও করেন।

অবশ্য আন্তরিকতাসম্পন্ন মানুষমাত্রেরই গান্ধীর কিছু-কিছু অভিমতকে গ্রহণ না করবার অধিকার রয়েছে। এমন কি, এইসব অভিমত যে পর্যাপ্ত নয়, অথবা এগুলি যে বিপজ্জনক, এমন কথা ভেবে এর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবার অধিকারও তাঁদের আছে। কিন্তু ভুল তারিখ, বিকৃত উদ্ধৃতি এবং অবাঞ্ছনীয় ও পক্ষপাতদুষ্ট সব উক্তির উপরে নির্ভর করে এই যে সব অভিযোগ আনা হয়েছে, এগুলি ন্যক্কারজনক। এবং জনৈক ভারতবাসী কর্তৃক আনীত এইসব অভিযোগে সমগ্র ভারতবর্ষই কালিমালিপ্ত হয়েছে।

পাশ্চাত্ত্য ভূখণ্ডে ভারতবর্ষের প্রকৃত যে-সব বন্ধু রয়েছেন, তাঁদের নামে, এবং যা ঐতিহাসিক সত্য, তার নামে—গান্ধীজীর প্রতি বন্ধুতার দোহাই আমি দেব না, কেননা তিনিই সর্বপ্রথম বলবেন যে বন্ধুতার জন্য সত্যকে যেন বলি দেওয়া না হয়—আমি আপনাকে অনুরোধ জানাচ্ছি, গান্ধীর চরিত্রকে ভুল বোঝার দরুন এ-বইয়ে আক্রমণাত্মক যে-সব উক্তি করা হয়েছে, তার মধ্যে প্রধান-প্রধান উক্তিগুলিকে খণ্ডন করে সংক্ষেপে হলেও আপনি যেন একটা উত্তর দেন।

প্রিয় মিঃ নেহরু, দয়া করে আমাকে ক্ষমা করবেন। দেশের মঙ্গলার্থে বহু কাজে যে আপনি ব্যস্ত আছেন, তা আমি জানি। কিন্তু ভারতবর্ষকে যে-মানুষ তার অন্তর্নিহিত শক্তি সম্পর্কে সচেতন করে তুলেছেন, এবং আপন বিশ্বাস অনুযায়ী ভারতবর্ষের সেবা করবার জন্য ও আপন সন্তসুলভ হৃদয়ের সমস্ত উৎসাহ দিয়ে নিপীড়িত মানুষকে সমর্থন করবার জন্য নিজের সমগ্র জীবনকে যিনি উৎসর্গ করে দিয়েছেন, উন্মাদ কতকগুলি মানুষ যাতে না তাঁর সুনামকে কালিমালিপ্ত করতে পারে, তার ব্যবস্থা করাও কি আপনার অন্যতম কাজ নয়?

এ-বিষয়ে আপনি যদি কোনও প্রবন্ধ লিখে পাঠান, অবিলম্বে তা আমি ফরাসীতে তর্জমা করে দিতে প্রস্তুত আছি। আমার ভাইয়ের সহায়তায় প্রবন্ধটি যাতে ফরাসী পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়, তার জন্যও আমি চেষ্টা করব।

আশা করি মিসেস নেহরু দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠছেন, এবং সামনের বসন্তেই সুইটজারল্যাণ্ডে আমাদের সাক্ষাতের সুযোগ হবে। তাঁকে আমার শুভেচ্ছা জানাই। আপনার কন্যাকে আমার সপ্রীতি শুভকামনা জানাচ্ছি।

প্রীতিবদ্ধ
মাদলিন রলাঁ

১২৫ মাদলিন রলাঁ কর্তৃক লিখিত

১৭ই ফেব্রুয়ারি, ৩৬
ভিলনাভ (ভোদ)

প্রিয় মিঃ নেহরু,

আমার ভাইয়ের জন্মদিন উপলক্ষে আপনি যে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন, তার জন্য তিনি আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছেন। আপনি বিদায় নেবার আগে তাঁর পক্ষে যে আপনার সঙ্গে দেখা করা সম্ভব হবে না, এজন্য তিনি খুবই দুঃখিত। তবে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস এই যে এই অল্প কটা দিন আপনি আপনার পরিবারবর্গের সঙ্গেই কাটাতে চান।

জেনে সুখী হলাম যে মিসেস নেহরু এখন আগের চাইতে ভাল আছেন। আশা করি আগামী মাসে ডাক্তার আমাকে তাঁর সঙ্গে দেখা করবার অনুমতি দেবেন। তা ছাড়া, দেখা করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হবে কিনা, হলে কখন হবে, সেটা জেনে নেবার জন্য আগেই আমি ক্লিনিকে একবার ফোন করব।

Sentinelle পত্রিকার যে-সংখ্যায় গান্ধী সম্পর্কে আপনার প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছে, তার একটি কপি এইসঙ্গে পাঠালাম। Vendredi পত্রিকার পক্ষে আপনার এই প্রবন্ধটি প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি, তার কারণ ইতিমধ্যেই আপনার একটি প্রবন্ধ তাঁরা নিয়েছেন। তবে এটি আমি Europe পত্রিকাতেও পাঠিয়েছি। কাগজটির পরিচালন-ব্যাপারে কিছু পরিবর্তন হওয়ায় এখনও এঁদের কাছ থেকে আমি কোনও উত্তর পাইনি। তবে মিঃ রাজা রাও মাঝে-মাঝে সেখানে যান। এ-ব্যাপারে যা করণীয়, তা করবার জন্য তাঁকে আমি বলে দিয়েছি।

কুমারী ইন্দিরাকে অনুরোধ জানিয়েছি, আপনি কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হওয়ায় সে যেন আপনাকে আমাদের অভিনন্দন জানায়।

ভবদীয়
মাদলিন রলাঁ

দয়া করে সেখানকার বন্ধুবর্গকে আমাদের নমস্কার জানাবেন।

১২৬ রমাঁ রলাঁ কর্তৃক লিখিত

ভিলনাভ (ভোদ), ভিলা অলগা
মার্দি, ২৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৬

প্রিয় বন্ধু,

আমার স্বাস্থ্য ভাল যাচ্ছে না, তাই আপনি বিদায় নেবার আগে আপনার সঙ্গে দেখা করা সম্ভব হল না। তবে, যতক্ষণ আমরা কাছাকাছি আছি, তারই মধ্যে আপনাকে, আপনাব স্ত্রীকে ও আপনার প্রিয় স্বদেশকে আমার সপ্রীতি শুভেচ্ছা জানাতে চাই।

স্ত্রীকে ছেড়ে যেতে আপনার যে কষ্ট হচ্ছে, তারই কথা আমি ভাবছি। কামনা করি, এই বসন্তে মিসেস নেহরুর স্বাস্থ্যোন্নতি হক, এবং স্বদেশে ফিরে গিয়ে যে মহান সংগ্রামে আপনাকে যোগ দিতে হবে, শান্ত চিত্তে যেন তাতে গিয়ে আপনি যোগ দিতে পারেন।

জাতীয় স্বাধীনতা এবং সামাজিক প্রগতির পথে যা-কিছু বিঘ্ন, আমাদের এই প্রতীচ্যভূমির মত ভারতবর্ষও আপনার নেতৃত্বে তার বিরুদ্ধে এক "গণ-ফ্রন্ট" গড়ে তুলতে পারবে বলে আশা করি।

আমাকে বলা হয়েছে, "বিশ্ব শান্তি সম্মেলন"এর প্রতি সমর্থন জ্ঞাপনের জন্য আপনাকে ও গান্ধীকে যেন আমি অনুরোধ জানাই। সম্ভবত আগামী সেপ্টেম্বর মাসে জেনেভায় এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। সম্মেলনটি হবে বৃহৎ ও শক্তিশালী। বলা যেতে পারে যে পৃথিবীর শান্তিকামী সমস্ত শক্তি এর দ্বারা সংহতি লাভ করবে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বহু বড় বড় সংস্থা এবং ফ্রান্স, ইংল্যান্ড, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, চেকোস্লোভাকিয়া, স্পেন, বেলজিয়ম ও হল্যান্ডের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি ইতিমধ্যেই এতে যোগ দিয়েছেন। (ইংল্যান্ডে যোগ দিয়েছেন লর্ড রবার্ট সিসিল, মেজর অ্যাটলি, নর্মান এঞ্জেল, ফিলিপ নোয়েল বেকার, আলেকজান্ডার ও অধ্যাপক ল্যাস্কি। ফ্রান্সে যোগ দিয়েছেন হেরিও, পিয়ের কত্, জুর্হ, কাজ্জাঁ, রাকাম, অধ্যাপক লাঁজেভ্যাঁ প্রমুখ ব্যক্তিবৃন্দ। চেকোস্লোভাকিয়ায় যোগ দিয়েছেন বেনেস, হোডজা। স্পেনে যোগ দিয়েছেন আজানা, আলভারেজ দেল ভাগো প্রভৃতি। বেলজিয়মে যোগ দিয়েছেন লুই দ্যু ব্রুকের, আঁরি লাফতাইন প্রভৃতি।) পৃথিবী জুড়ে আগুন জ্বলে উঠবার যে আশংকা দেখা দিয়েছে, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলাই এই সম্মেলনের উদ্দেশ্য। অনুগ্রহ করে আপনার ভারতীয় বন্ধুদের কাছে এ-বিষয়ে কথা বলবেন ও তাঁদের আমার শুভেচ্ছা জানাবেন। তাঁদের ও আপনার উত্তর আমার কাছে অথবা যুদ্ধ ও ফ্যাসিবিরোধী বিশ্ব-কমিটির সদরদপ্তরের ঠিকানায় (পারী ১০. ২৩৭ রু লাফায়েত) পাঠাতে পারেন। আমাকে এই কমিটির অবৈতনিক সভাপতি করা হয়েছে।

আশা করি আপনার ও ভারতীয় বন্ধুদের সঙ্গে আমাদের পত্রালাপ অক্ষুন্ন থাকবে। ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ও সামাজিক কাজ সম্পর্কে অবহিত থাকাটা প্রতীচ্যের পক্ষে খুবই প্রয়োজনীয়। এমন অনেক লোক আছে, ইচ্ছে করে এ-বিষয়ে যারা নীরব থাকে, আর নয়ত মিথ্যে খবর রটায়।

আন্তরিকতার সঙ্গে আপনার করমর্দন করি। প্রিয় বন্ধু, আপনার স্বাস্থ্য অটুট থাকুক, আপনি সুখী হন, এবং ভারতবর্ষের যে আদর্শ নিয়ে আপনি সংগ্রাম করছেন, তা জয়যুক্ত হক।

অনুরক্ত
রমাঁ রলাঁ

আর একটি কথা। গান্ধী এবং তাঁর যে বন্ধুরা—মীরা, প্যারেলাল ও মহাদেব দেশাই—ভিলনাভে এসেছিলেন, তাঁদের আমার প্রীতি জানাই।

মাদাম আঁদ্রে ভির্ভোলির পরিচিতিসহ আপনার যে-প্রবন্ধটি Vendredi পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে, সাগ্রহে সেটি আমি পাঠ করেছি। 'ইউরোপ' পত্রিকার জন্য অন্য যে-লেখাটি আপনি আমার বোনের কাছে পাঠিয়েছেন, সেটি মার্চ সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

১২৭ বার্ট্রান্ড রাসেল কর্তৃক লিখিত

টেলিগ্রাফ হাউস,
হার্টিং, পিটার্সফীল্ড,
৩০ জানুয়ারি, ১৯৩৬

প্রিয় মিঃ নেহরু,

অত্যন্তই দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি, আপনার ইংল্যাণ্ড সফরকালে আপনার সঙ্গে দেখা করা আমার সম্ভব হবে না। আমার স্ত্রী অসুস্থ; উষ্ণতর জলবায়ুর দেশে তাঁকে যেতে বলা হয়েছে, কিন্তু কোথাও যাবার জন্য যেটুকু সুস্থ হয়ে ওঠা দরকার, তাঁকে সেটুকুও সুস্থ করে তোলা যাচ্ছিল না। এই জন্যেই এতদিন পর্যন্ত আমি এখানে আটকে ছিলাম। এইবারে আমি বেরিয়ে পড়ব। আপনার কাজের প্রতি, বিশেষ করে জাতীয় আন্দোলনকে সমাজবাদের সঙ্গে যুক্ত করার প্রয়াসের প্রতি. আমার সম্পূর্ণ সহানুভূতি বর্তমান। সে-কথা অবশ্যই আপনি জানেন। সরকারের দিক থেকে দেখলে সময়টা অবশ্য বিশেষ অনুকূল নয়; তবুও আশা করি, আপনার সফর ফলপ্রসূ হবে।

আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই। ভবদীয়

১২৮ এম. এ. আনসারী কর্তৃক লিখিত

দার-এস-সালেম, দরিয়াগঞ্জ, দিল্লি,
১১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৬

প্রিয় জওহর,

তোমার সুন্দর ও কৌতুহলোদ্দীপক চিঠিখানির জন্য ধন্যবাদ জানাই। চিঠি জিনিসটা যে অত্যন্তই ব্যক্তিগত ও ঘনিষ্ঠ, এবং সচিত্র পোস্টকার্ডের সঙ্গে যে তার তুলনা চলতে পারে না, এ তুমি ঠিক কথাই বলেছ। আমি অবশ্য, চিঠিপত্রের তাল সামলান যখন অসম্ভব, তখন তোমার ভারলাঘব করতে চেয়েছিলাম মাত্র। তবে জনজীবনের প্রতিই হক, আর ব্যক্তিগতই হক, সমস্ত দায়িত্ব বীরের মতন পালন না করলে তোমার চরিত্রের সঙ্গে সেটা সঙ্গতিপূর্ণ হয় না। আমি নিজে ত বিদেশের বন্ধুবান্ধবদের কাছে সাধারণ ডাকে চিঠি লেখা প্রায় ছেড়েই দিয়েছি। মাত্র এক সপ্তাহের পুরনো খবরের আদানপ্রদান যখন সম্ভব, তখন দু-তিন সপ্তাহের পুরনো খবর দেওয়াটাকে সময়ের একটা বিরাট অপব্যয় বলেই মনে হয়। আশা করি জায়গা পালটে লসনে গিয়ে কমলা সুস্থ হয়ে উঠছে। লসনে কোন্ স্যানাটোরিয়ামে সে আছে? লসন জায়গাটা সম্পর্কে আমার ঈষৎ দুর্বলতা আছে। শহরটি ভারী সুন্দর, তা ছাড়া একেবারে কেন্দ্রে অবস্থিত। ওখান থেকে অতি অল্প সময়ের মধ্যে লেসিন অথবা মন্তানায় যাওয়া সম্ভব। কমলার স্বাস্থ্যোন্নতির সুখবর পাবার জন্য আমি উদ্‌গ্রীব হয়ে আছি। তোমার ত এতদিনে লসনে ফিরে আসবাব কথা। কমলা তাতে খুবই প্রফুল্ল হয়ে উঠবে।

কিন্তু, কংগ্রেসের সভাপতিপদে নির্বাচিত হয়ে এখন যে তুমি কী করবে, ভেবে পাচ্ছি না। কমলা এখন এতই দুর্বল যে তাকে ভারতবর্ষে ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয়। মার্চ মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত তুমি ওখানে থাকতে পার, তার পরে ত আর ওখানে তুমি থাকতে পারবে না। আবার এও আমি জানি যে কমলাকে ছেড়ে তুমি যখন ভারতবর্ষে চলে আসবে, তার উপরে তার প্রতিক্রিয়াটা খুবই খারাপ হবে। তার

স্বাস্থ্যের এখন যে অবস্থা, তাতে কী করে যে দীর্ঘকালের জন্য তার কাছ থেকে তুমি দূরে থাকতে পারবে, তা আমি জানি না। সত্যি কথা বলতে কি, বরাবরই আমার মনে হয়েছে যে তোমার পারিবারিক অসুবিধার কথা এবং জনসাধারণের স্বার্থের কথা, যে-দিক থেকেই ভেবে দেখা হক না কেন, বর্তমান বছরে তোমার নির্বাচনের জন্য যাঁরা দায়ী, তাঁরা অত্যন্তই নির্বুদ্ধিতা এবং তোমার প্রতি নির্দয়তার পরিচয় দিয়েছেন। বর্তমান অবস্থায় তোমার সভাপতিত্বের এই বছরে তোমার মতন এত জীবন্ত ব্যক্তিত্বও যে বিশেষ-কিছু করতে পারবে, এ আমার মনে হয় না। এবং শেষ পর্যন্ত যদি দেখা যায় যে কিছুই করা যায়নি, তাহলে আমাদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মানুষও যে কোনপ্রকার সাফল্যলাভে ব্যর্থ হলেন, এতে নিরতিশয় হতাশার সৃষ্টি হবে। আমার মনে হয়, বর্তমান অবস্থায় পার্লামেণ্টারী কর্মসূচী (এতে করে স্বাধীনতা অথবা তার সার বস্তুরও কাছাকাছি পেঁীছবার কোনও সুবিধা যদিও হবে না) আর-কিছু না হক, রণক্লান্ত জনসাধারণকে কিছুটা বিশ্রামের অবসর অন্তত দিতে পারত, এবং ভবিষ্যৎ অগ্রগতির বেশ-কিছু প্রস্তুতির কাজও এতে করে সম্ভব হত। স্বাস্থ্য ভাল না থাকায় সক্রিয় রাজনীতি থেকে অবসর নিতে আমি বাধ্য হয়েছি বটে, তবু তুমি ফিরে আসবার পর খোলাখুলিভাবে ও সবিস্তারে তোমার সঙ্গে আলোচনা করবার খুবই ইচ্ছে।

সানন্দে জানাই, মহাত্মাজী এখন আগের চাইতে ভাল আছেন। তবে শুনছি এবারে নাকি তাঁর অবস্থা খুবই খারাপ হয়ে পড়েছিল। আমার নিজের স্বাস্থ্যও এখন আগের চাইতে ভাল যাচ্ছে। তবে আমিও খুব অল্পের জন্য রক্ষা পেয়েছি, এবং আমাকে অতি সাবধানে থাকতে হবে। জোহরার পরীক্ষার ফল এখনও বার হয়নি। আশা করি এবারে সে উত্তীর্ণ হবে। সে যে কী করতে চায়, তা আমি ঠিক জানি না। কখনও বলে ভারতবর্ষের কোনও কলেজে ভর্তি হয়ে বি.এ. পরীক্ষা দেবে, আবার কখনও বা কেম্ব্রিজে গিয়ে পড়তে চায়। ব্যাপারটা আমি পুরোপুরি তারই হাতে ছেড়ে দেব। তোমাকে, কমলাকে ও ইন্দুকে সে তার ভালবাসা ও শ্রদ্ধা জানাচ্ছে।

তোমাদের সবাইকে আমার ভালবাসা জানাই।

স্নেহানুরক্ত

এম. এ. আনসারী

পুনশ্চ: আমার বই রিজেনারেশন অব ম্যান-এর একটি কপি আমি সাধারণ ডাকে তোমাকে পাঠিয়েছি। বইখানি তোমার ভাল লাগবে আশা করি।

১২৯ এলেন উইলকিনসন কর্তৃক লিখিত

হাউস অব কমন্স, লণ্ডন,

১৭ ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৬

প্রিয় জওহরলাল,

(আশা করি নামটা এবারে ঠিকমত লিখতে পেরেছি!)

টাইপ-করা চিঠি পাঠাচ্ছি, এর জন্য মার্জনা কর। টাইপ-করা চিঠি পাঠাবার কারণ তোমার চিঠি পাবার পর থেকে কাজের চাপে আমি নিশ্বাস ফেলবার ফুরসত পাচ্ছি না। ইতিমধ্যে বিমানযোগে বার্লিনেও দৌড়তে হয়েছিল।

পৃথক ডাকে তোমাকে এক কপি টাইম অ্যাণ্ড টাইড পাঠাচ্ছি। তোমার সফর সম্পর্কে অধ্যাপক ল্যাস্কি এতে যে-সব মন্তব্য করেছেন, তা তোমার ভাল লাগবে মনে করি। অধ্যাপক ল্যাস্কির মন্তব্যের সঙ্গে আমরা সবাই একমত।

শান্তিকে অক্ষুণ্ণ রাখবার সম্ভাব্য উপায়াবলী সম্পর্কে জেরাল্ড হার্ড যে ধারাবাহিক প্রবন্ধ লিখছেন, এর পরে প্রকাশের জন্য টাইম অ্যান্ড টাইড পত্রিকায় তোমার পক্ষে একটি প্রবন্ধ দেওয়া সম্ভব হবে কিনা, লেডি রন্ডা আমাকে জিজ্ঞেস করেছেন। ব্রিটেনের উপনিবেশসমূহ ও "সর্বহারা" দেশগুলির মধ্যে একটা ব্যবস্থা করা সম্পর্কে লয়েড জর্জ যে পন্থা অবলম্বন করবেন বলে তুমি শুনেছিলে, পার্লামেন্টের বেশ কিছুসংখ্যক সদস্য সেই পন্থা অবলম্বন করছেন। তুমি তোমার বক্তৃতায় বলেছিলে, "ঔপনিবেশিক দেশগুলির সম্পর্কে কী করা হবে? যা ঘটবে, সে সম্পর্কে, এবং প্রভুর পরিবর্তন অথবা আদৌ কোনও প্রভু তারা চায় কি না, এ-বিষয়ে কি তাদের কথাই বলতে দেওয়া হবে না?" তোমার এই কথাগুলিতে যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছিল, লেডি রন্ডাকে আমি তা জানাই। "মৈত্রীভাব" সৃষ্টির এই যে সদিচ্ছামূলক চেষ্টা এ-দেশে চলছে, এ সম্পর্কে ঔপনিবেশিক দেশগুলির মনোভাবের কথা যাতে সবাই জানতে পারে তার জন্য এ-বিষয়ে তুমি লিখবে কিনা, লেডি রন্ডা তা জানতে চান। যত কড়াভাবে খুশি, তুমি লিখতে পার। তুমি যদি সময় করতে পার, তাহলে এ-বিষয়ে তোমার লেখা উচিত বলেই আমার মনে হয়। অবশ্যই এই লেখার জন্য টাকা দেওয়া হবে। তবে, আশংকা করি, টাকার অংকটা বড় হবে না। লেডি রন্ডা মনে করেন, প্রবন্ধটির শব্দ-সংখ্যা হবে মোটামুটি এক হাজার। তোমার যদি মনে হয় যে ভারত-যাত্রার আগে তোমার পক্ষে এ-কাজ করা সম্ভব হবে না, তবে জাহাজে বসে লিখে সেখান থেকে পাঠিয়ে দিতে পারবে, তাহলে লেডি রন্ডাকে এক ছত্র লিখে জানিয়ে দিও যে কাজটা তুমি করবে। তাঁর অফিসের ঠিকানা হল ৩২ ব্লুমসবেরি স্ট্রীট, ডব্লু. সি. ১।

কমলা যে আগের চাইতে ভাল আছে এবং হয়ত বা বিপদ কাটিয়ে উঠেছে, এ-খবর পেয়ে খুবই সুখী হয়েছি।

তোমাকে আমাদের মধ্যে পেয়েছিলাম, এ আমাদের মহা সৌভাগ্য। তোমার সফরের ফলে অবিশ্বাসীদের যে কতখানি উপকার হয়েছে, তা যদি তুমি বুঝতে পারতে।

তোমাদের দুজনকে আমার সশ্রদ্ধ শুভেচ্ছা জানাই।

তোমাদের
এলেন

মিঃ জওহরলাল নেহরু

১৩০ সুভাষচন্দ্র বসু কর্তৃক লিখিত

কুরহস হকলান্ড,
বাডগাস্টীন, (অস্ট্রিয়া),
৪ মার্চ, ১৯৩৬

প্রিয় জওহর,

দীর্ঘ ও ক্লান্তিকর পথের শেষে গতকাল সকালে এখানে এসে পেঁৗছেছি। জায়গাটা সুন্দর এবং শান্ত। কর্মের আবর্তে আবার ঝাঁপিয়ে পড়বার আগে তুমি যদি ইউরোপে কিছুদিন বিশ্রাম নিতে পারতে, আমি সুখী হতাম।

তোমাকে যে-সব কথা বলেছি, সেইমত একটা বিবৃতি দেব কিনা, তোমার কাছ থেকে আসার পর থেকে সেই কথাই ভাবছি। দেওয়াই উচিত বলে আমার মনে হয়, তার কারণ আবার আমার কারারুদ্ধ হবার সম্ভাবনা রয়েছে; এবং এমন কিছু লোক হয়ত আছে, যারা আমার পরামর্শ কামনা করে। আমার বিবৃতি যথাসম্ভব ছোট

হবে, এবং তাতে স্পষ্টভাবে এই কথাই আমি বলব যে তোমাকে আমার পূর্ণ সমর্থন দানের সিদ্ধান্তই আমি করেছি।

বর্তমানে যাঁরা অগ্রগণ্য নেতা, তাঁদের মধ্যে একমাত্র তোমার কাছেই আমরা এই আশা করতে পারি যে কংগ্রেসকে প্রগতির পথে পরিচালনা করা হবে। তা ছাড়া তোমার প্রতিষ্ঠাও অসামান্য, এবং আমার মনে হয় যে মহাত্মা গান্ধীও তোমার কথাকে যতখানি মেনে নেবেন, অন্য আর কারও কথাকেই ততখানি মেনে নেবেন না। আমি খুবই আশা করছি যে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে জনচিত্তে তোমার প্রতিষ্ঠাকে তুমি পুরোপুরি কাজে লাগাবে। যেটুকু শক্তি সত্যিই তোমার রয়েছে, তার চাইতে কম শক্তিশালী বলে নিজেকে তুমি মনে কর না। তুমি যাতে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পার, এমন মনোভাব গান্ধীজী কখনও অবলম্বন করবেন না।

আমাদের সর্বশেষ আলোচনায় তোমাকে জানিয়েছি, তোমার আশু কর্তব্য হবে দুটি—(১) দপ্তর গ্রহণকে সর্বতোভাবে বাধাপ্রদান করতে হবে, ও (২) ওয়ার্কিং কমিটির সংগঠনকে প্রশস্ত ও উদার করে তুলতে হবে। তা যদি তুমি করতে পার ত নৈতিক অবনতির হাত থেকে কংগ্রেসকে তুমি বাঁচাবে, দুর্গতি থেকে তাকে উদ্ধার করবে। বড় বড় সমস্যাগুলিকে ভবিষ্যতের জন্য মুলতুবি রাখা যেতে পারে; নৈতিক অবনতির হাত থেকে কংগ্রেসকে রক্ষা করা আমাদের আশু কর্তব্য।

শুনে আমি অত্যন্তই সুখী হয়েছি যে কংগ্রেসে তুমি একটি বৈদেশিক বিভাগ খুলতে চাও। আমার অভিমতের সঙ্গে এর সম্পূর্ণই মিল রয়েছে।

যাত্রার জন্য তুমি নিশ্চয়ই খুব ব্যস্ত আছ; যাত্রার আগে নিশ্চয়ই টুকিটাকি নানান কাজও তোমার রয়েছে। তাই এই চিঠিকে আর দীর্ঘ করতে চাই না। কামনা করি, নির্বিঘ্নে যেন তুমি স্বদেশে ফিরতে পার, এবং যে ক্লান্তিকর কর্মভার তোমাকে তুলে নিতে হবে, তাতে ভাগ্য যেন তোমার সহায় হয়। আমাকে যদি লখনউয়ে যেতে দেওয়া হয়, তাহলে তোমাকে সাহায্য করবার জন্য আমি প্রস্তুত থাকব।

স্নেহানুসক্ত
সুভাষ

১৩১ এইচ. এন. ব্রেল্‌সফোর্ড কর্তৃক লিখিত

৮ মার্চ, ১৯৩৬
৩৭ বেলসাইজ পার্ক গার্ডেন্‌স থেকে,
লণ্ডন, এন. ডব্লু. ৩

এ-চিঠির উত্তর দেবেন না!

প্রিয় নেহরু,

মনে হয়, বেশ কয়েক মাস ধরেই আপনি এই আঘাতের আশঙ্কা করছিলেন। তবু হয়ত আপনার মনে সারাক্ষণ এই আশা ছিল যে প্রকৃতি একটা অসাধ্যসাধন করবে। সেই আঘাতই এবারে এল, কিন্তু ভয় হয়, দীর্ঘকাল ধরে একটা উদ্বেগের মধ্যে থাকার দরুন আঘাতের সম্মুখীন হবার মত শক্তি আপনি হারিয়েছেন। আপনার বন্ধুবর্গ আপনাকে এমন কোনও সান্ত্বনার কথাই শোনাতে পারেন না, আপনার বিয়োগব্যথা যাতে লাঘব হতে পারে। আমি অবশ্য সামান্য সময়ের জন্য আপনার স্ত্রীকে একবার দেখেছিলাম। তবু, আমরা যারা তাঁকে দেখেছি, তারা বুঝতে পারি যে কী গভীর শোক আপনি পেয়েছেন। তার কারণ আমরা জানি যে তিনি ছিলেন অত্যন্তই মধুর চরিত্রের এক অসাধারণা নারী। হয়ত আপনি সান্ত্বনা

পেতে পারেন, এই কথা ভেবে আপনাকে আমাদের গভীর ও আন্তরিক সহানুভূতি জানাচ্ছি।

শোকের এই মুহূর্তে নিজের মূল্যকে আপনি লঘু করে দেখবেন না। আপনাকে দিয়ে, বিশেষ করে এবং ব্যক্তিগতভাবে আপনাকে দিয়ে, ভারতবর্ষের এক মহান প্রয়োজন সাধিত হবে। এ-কথা বলবার হেতু এই যে অন্যান্য সম্ভাব্য নেতাদের আমি অল্পবিস্তর চিনি বলেই আমার ধারণা। আপনার মত সাহস, মানসিক শক্তি, এবং সর্বোপরি শ্রেণীহীন এক মানবিক সমাজের যে কল্পনা আপনার রয়েছে, তা আর কারও নেই। নেতার আসন গ্রহণের জন্য ইতিহাস যে আপনাকেই নির্বাচিত করেছে, এই বিশ্বাস থেকে শক্তিলাভের চেষ্টা করুন।

আপনার ইতিহাস-গ্রন্থখানি আমাকে পাঠিয়ে যে সৌজন্য দেখিয়েছেন, তার জন্য ধন্যবাদ জানাই। গভীর আগ্রহের সঙ্গে বইটি আমি পড়ব। আপনি যে আমাকে মনে রেখেছেন, তাতে অভিভূত বোধ করছি।

ভবদীয়
এইচ. এন. ব্রেল্‌সফোর্ড

১৩২ মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক লিখিত

দিল্লি,
৯ মার্চ, ১৯৩৬

প্রিয় জওহরলাল,

কমলাকে চিরকালের মত ইউরোপে রেখেই তাহলে তোমাকে ফিরতে হল। তার আত্মা কিন্তু কখনও ভারতবর্ষকে ছেড়ে যায়নি। তা তোমার, এবং আমাদেরও অনেকেরই, এক মহামূল্য সম্পদ হয়ে রইল। শেষ যখন আমাদের কথা হয়, চারটি চক্ষুই তখন সজল হয়ে উঠেছিল। সে-কথা আমি কখনও বিস্মৃত হব না।

এখানে এক গুরুভার দায়িত্ব তোমাকে গ্রহণ করতে হবে। এ-দায়িত্ব তোমার উপরে ন্যস্ত করা হল, তার কারণ একে বহন করবার মত সামর্থ্য তোমার আছে। তোমার কাছে যে যাব, এমন সাহস নেই। আমার শরীরের সেই নমনীয়তা যদি ফিরে আসত, তাহলে যেতাম। শরীর যন্ত্রের কোনও বিকলতা কিন্তু আমার ঘটেনি। এমন কি, দেহের ওজন বেড়েছে। কিন্তু মাত্র তিন মাস আগেও তার যে সজীব স্ফূর্তি ছিল, তা সে হারিয়েছে। বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে কখনও কিন্তু আমি অসুস্থ বোধ করিনি। শরীর তবু দুর্বল হয়ে পড়ল, এবং যন্ত্রের পরীক্ষায় দেখা গেল রক্তের চাপ খুবই বৃদ্ধি পেয়েছে। আমাকে সাবধানে থাকতে হবে!

দিন কয়েক বিশ্রাম নেবার জন্য দিল্লিতে আছি। তোমার আগেকার কর্মসূচী অনুযায়ী কাজ করা হলে তোমার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য আমি ওয়ার্ধাতেই থাকতাম। জায়গাটা তোমার পক্ষে আরও শান্তিপূর্ণ হত। তবে তোমার যদি অসুবিধে না হয়, তাহলে দিল্লিতেও আমাদের দেখা হতে পারে। অন্তত ২৩ তারিখ পর্যন্ত আমি দিল্লিতে থাকব। আর ওয়ার্ধাই যদি তোমার মনঃপূত হয়, তাহলে আমি তাড়াতাড়ি সেখানে ফিরতে পারি। কিংসওয়েতে হরিজনদের জন্য নতুন যে-সব বাড়ি তৈরি হয়েছে, দিল্লিতে এলে সেখানে আমার কাছে তুমি থাকতে পার। জায়গাটা বেশ ভালই। কবে আমাদের দেখা হবে, যখন পার সেই তারিখটা আমাকে জানিয়ে দিও। রাজেনবাবু ও যমুনালালজী হয় তোমার কাছেই আছেন, নয়ত তোমার কাছেই থাকবেন। বল্লভভাইও থাকতেন, কিন্তু আমাদের সকলেরই মনে হল যে তিনি দূরে থাকলেই ভাল। অন্য দুজন যে সেখানে গিয়েছেন সেটা রাজনৈতিক আলোচনার জন্য নয়, শোক জ্ঞাপনের জন্য। আমরা সবাই যখন একত্র হব, এবং

তোমার পারিবারিক কাজকর্ম যখন চুকে যাবে, রাজনৈতিক আলোচনা তখনই হবে।

কমলার মৃত্যু, এবং ঠিক তার পরেই তোমার কাছ থেকে বিচ্ছেদের দুঃখকে ইন্দু আশা করি সহ্য করতে পেরেছে। তার ঠিকানা কী?

তোমার সর্বৈব মঙ্গল হক।

ভালবাসা জানাই।

বাপু

১৩৩ সুভাষচন্দ্র বসু কর্তৃক লিখিত

কুরহস হকলাণ্ড,
বাডগাস্টীন, অস্ট্রিয়া,
১৩ মার্চ, ১৯৩৬

প্রিয় জওহর,

ভিয়েনার ব্রিটিশ কনসালের কাছে থেকে এইমাত্র আমি জরুরী এক চিঠি পেয়েছি। চিঠিখানি এই ঃ

> "আপনার নিকট এই মর্মে এক সাবধান-বাণী প্রেরণের জন্য পররাষ্ট্র-সচিবের নিকট হইতে আজ আমি নির্দেশ পাইয়াছি যে আপনি ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তন করিতে ইচ্ছুক বলিয়া সংবাদপত্রে যে বিবৃতি বাহির হইয়াছে, ভারত সরকার তাহা দেখিয়াছেন, এবং ভারত সরকার স্পষ্টভাবে আপনাকে জানাইয়া দিতে চাহেন যে আপনি যদি তাহা করেন, তাহা হইলে মুক্ত থাকিবার আশা আপনি করিতে পারেন না।
>
> (স্বাঃ) জে. ডব্লু. টেলর
> হিজ ম্যাজেস্টি'জ কনসাল

যাত্রার ব্যবস্থা প্রায় সম্পূর্ণ করতে চলেছি, এমন সময় এই চিঠি পেলাম। বস্তুত, সমুদ্রপথে গেলে আমার বেশী সুবিধে না বিমানপথে, এই নিয়ে ভাবনাচিন্তা করছিলাম বলেই তখনও আমি টিকিট বুক করিনি। বিমানপথে গেলে এখানে আমার পুরো কোর্সের চিকিৎসা সম্পূর্ণ হতে পারত। চিকিৎসায় মোট ২৫ দিন লাগে।

এ-ব্যাপারে পরামর্শ করতে পারি, এমন কেউ এখানে নেই। কন্টিনেণ্টেও এমন কেউ আছেন বলে আমার মনে হয় না। তোমার নিজের প্রতিক্রিয়া থেকেই তুমি অনুমান করে নিতে পারবে যে এই সতর্কবাণীকে উপেক্ষা করে দেশে যেতেই এই মুহূর্তে আমি ইচ্ছুক। শুধু একটা বিষয় বিবেচনা করে দেখা দরকার : জন-স্বার্থ কিসে অক্ষুন্ন থাকবে। ব্যক্তিগত ইচ্ছা-অনিচ্ছাকে আমি আদৌ আমল দিই না; এবং জন-স্বার্থের খাতিরে যে-কোনও পথ অবলম্বনেই আমি প্রস্তুত। জনসেবার ক্ষেত্র থেকে এত দীর্ঘকাল ধরে আমি দূরে রয়েছি যে কী ব্যবস্থা অবলম্বন করলে জনসাধারণের অধিকতর মঙ্গল হবে, সে-বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া আমার পক্ষে শক্ত। এই ধরনের সংকটের মুহূর্তে আর-একজনকে উপদেশ দেওয়া যে তোমার পক্ষেও শক্ত তা আমি জানি। তবে ব্যক্তির কথা তুমি বিস্মৃত হতে পার—জনস্বার্থ-সংক্রান্ত প্রশ্ন দেখা দিলে তা যে তুমি পার তা আমি জানি—এবং শুধু জনস্বার্থের দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাপারটাকে বিচার করে দেশকর্মীকে তুমি উপদেশ দিতে পার। আমাদের দেশের জনসেবার ক্ষেত্রে যে অসামান্য প্রতিষ্ঠা তোমার রয়েছে, তাতে এই রকমের অদ্ভুত ও অস্বস্তিকর অবস্থায় কাউকে উপদেশ দেবার প্রয়োজন দেখা দিলে তোমার দায়িত্বকে তুমি এড়িয়ে যেতে পার না।

এ-রকম একটা ব্যাপারে তোমাকে বিরক্ত করবার সপক্ষে আমার একমাত্র যুক্তি

এই যে এমন আর কারও কথা আমি ভাবতে পরছি না, যার উপরে আমি অধিকতর আস্থা রাখতে পারি। সময় এতই অল্প যে এক গাদা লোকের কাছেও উপদেশ চাইতে পারছি না। আমার নিজের আত্মীয়স্বজনদের কাছে উপদেশ চেয়ে লাভ নেই, তার কারণ ব্যাপারটাকে জনস্বার্থের দিক থেকে বিচার করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব না-ও হতে পারে। সুতরাং একটিমাত্র পথ আমার কাছে খোলা রয়েছে, সে হল তোমার উপদেশের উপরে নির্ভর করা। ২০ তারিখ নাগাদ এই চিঠি তোমার হাতে পেঁছবার কথা। তার অব্যবহিত পরেই তুমি যদি আমাকে একটা তার পাঠাও, তা হলে সময়মতই তা আমার হাতে পেঁছবে। কে. এল. এম. বিমান ২ এপ্রিল তারিখে রোম থেকে রওনা হবে। সে-বিমান আমি ধরতে পারি। সুতরাং, শেষ পর্যন্ত ভারতবর্ষে রওনা হব বলে ২১ তারিখ, এমন কি ২২ তারিখেও যদি আমি সিদ্ধান্ত করি, তাহলে ২ এপ্রিল তারিখে যে-বিমান রোম ছাড়ছে, তাতে একটা আসন পাব বলেই আমার বিশ্বাস। এমনও সম্ভব যে ২৯ মার্চ তারিখে যে-বিমান রওনা হচ্ছে, তাতেও একটা আসন পেয়ে যেতে পারি।

লখনউ কংগ্রেসে যোগদানের জন্য সময়মত দেশে যাব বলে যখন সংকল্প করেছিলাম, তখন অবশ্য এমন সম্ভাবনা ছিল যে দেশের জমিতে অবতরণ করা মাত্র আমাকে কারারুদ্ধ করা হবে। কিন্তু অন্তত কিছুকালের জন্য আমাকে মুক্ত থাকতে দেওয়া হবে, এমন সম্ভাবনাও তখন ছিল। শেষোক্ত সম্ভাবনাটি এখন সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হল, এবং এখন দেশে যাওয়ার একমাত্র অর্থ হল কারাগারে যাওয়া। অবশ্য জনস্বার্থের দিক থেকে কারাগারে যাওয়ারও একটা উপযোগিতা আছে, এবং এই ধরণের একটা সরকারী আদেশ অমান্য করে জেনেশুনে কারাবরণ করবার সপক্ষেও অনেক-কিছুই বলা যেতে পারে।

যথাসম্ভব শিগগির একটা উত্তর দিও। এই ঠিকানায় তার পাঠাতে পার ঃ

বোস, কুরহস হকলান্ড, বাডগাস্টীন, অস্ট্রিয়া।

আশা করি তোমার ভ্রমণ-পথ আরামদায়ক হয়েছে, এবং তোমার স্বাস্থ্যও ভাল আছে।

স্নেহানুসক্ত

সুভাষ

সবে গতকাল সংবাদপত্রে একটা বিবৃতিতে আমি এই ইঙ্গিত দিয়েছিলাম যে এখানকার চিকিৎসা সম্পূর্ণ হবার পর আমি বিমানযোগে রওনা হতে পারি।

সু. চ. ব

১৩৪ এলেন উইলকিনসন কর্তৃক লিখিত

হাউস অব কমন্স, লণ্ডন

২২ মার্চ, ১৯৩৬

প্রিয় জওহরলাল,

টাইপ-করা চিঠি পাঠালাম, তার জন্য ক্ষমা কর। তাড়াহুড়ো অথবা লৌকিকতা এর কারণ নয়; কারণটা নিছক এই যে অতি-ব্যবহারের ফলে এই যন্ত্রের লেখাই আমার স্বাভাবিক লেখায় পরিণত হয়েছে (গান্ধীজীর প্রভাব!)। লেন-কোম্পানী তোমার বইয়ের পেজ-প্রুফ আমাকে পাঠিয়েছেন। পেয়ে সত্যিই ভারী আনন্দিত হয়েছি। এ-কথা বিনয় করে বলছি না। জরুরী কিছু কাজের তাগিদে কমন্স সভা থেকে তাড়াতাড়ি ফিরে এসেছিলাম। বইখানি সামনেই ছিল। সারারাত জেগে বইখানি পড়লাম। নিজের হাতে চা বানিয়ে তোমাকে স্মরণ করে সেই চা যখন মুখে তুললাম, তখন সকাল হয়ে এসেছে, প্রায় সাড়ে পাঁচটা বাজে।

বইখানি গুরুত্বপূর্ণ। ভারতবর্ষের বর্তমান পরিস্থিতিকে যদি বুঝতে হয়, তাহলে এ-বই পড়তেই হবে। বইখানিকে নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করা হবে কিনা, তোমার প্রকাশকদের মনে এই নিয়ে উদ্বেগের সৃষ্টি হয়েছে। নিষিদ্ধ করা হবে কিনা, একমাত্র বড়কর্তারা ছাড়া আর কারও পক্ষেই তা বলা সম্ভব নয়। সে ত তুমিও জান। আমার মনে হয়, বইখানির প্রকাশের সময়কার পরিস্থিতির উপরেই সেটা নির্ভর করবে। এমনটাও মনে করা হতে পারে যে গান্ধীজীকে তুমি যে সমালোচনা করেছ, তার ফলে হয়ত কংগ্রেসের মধ্যে বিভেদসৃষ্টির সহায়তা হবে। এ-দেশের সরকারী কর্মচারীদের মনোভাব সম্পর্কে নিশ্চয় করে কিছুই বলা যায় না। তাদের মধে যারা একটু বুদ্ধিমান মানুষ, তারাও যেন তোমাদের দেশে গিয়ে কী রকম হয়ে যায়।

যা-ই হক, বইখানিতে ভারতবর্ষে যদি নিষিদ্ধ করা হয়, তাহলে ইংল্যান্ড আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তাতে অসাধারণ বিজ্ঞাপনের কাজ হবে। কমন্স-সভায় এ নিয়ে আমরা তুমুল হৈ-চৈ তুলব, এবং জনসাধারণের দৃষ্টিকে এদিকে আকর্ষণ করব। প্রকৃত প্রস্তাবে ইংল্যান্ডেই আরও বেশী করে এ-বইয়ের প্রচার হওয়া প্রয়োজন। ভারতবর্ষ সম্পর্কে এমন কি সৎ "বামপন্থী"দেরও অজ্ঞতা এখানে অন্তহীন। আমার মনে হয়, এ-বইয়ের শেষের কটি অধ্যায়ে কংগ্রেস ও গান্ধীজীকে তুমি যে-ভাবে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছ ও তোমার বক্তব্যের যে সমাজবাদী উপসংহার টেনেছ, ইংল্যান্ডের সমাজবাদীরা তাতে প্রভূত উৎসাহ লাভ করবেন। তালুকদারদের সম্পর্কে গান্ধীজীর মনোভাবের সবটুকুই তাঁরা জানতে পেরেছেন। ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ান ও দি টাইম্‌স পত্রিকাই তা জানিয়েছে। এমন একটা সাধারণ ধারণাও এখানে ছিল যে তুমিই হচ্ছ গান্ধীজীর মানসপুত্র ও উত্তরাধিকারী।

কিন্তু প্রধানত ভারতবর্ষের জন্যই এ-বই তুমি লিখেছ। সুতরাং এ-সব কথায় তুমি সান্ত্বনা না-ও পেতে পার। বইখানিকে যদি নিষিদ্ধ করা হয়, তবে সেটা অত্যন্তই লজ্জার কথা হবে। তার কারণ, যে-সব ব্যাপার নিয়ে তুমি ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে উঠতে পারতে, সে সম্পর্কেও তুমি আশ্চর্য বস্তুনিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছ। প্রকাশিত হবার আগে দু-একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি যাতে বইটি পড়েন, আমি তার ব্যবস্থা করব। তাতে সুফল হতে পারে।

তোমার শোকের সংবাদ যখনই পাই, তখন আমি তোমাকে চিঠি লিখিনি। আমার মনে হয়েছিল যে, কথায় যেটুকু বলা যায়, আমার টেলিগ্রামে ত শুধু সেইটুকুই বলা যাবে। কমলার সমস্ত স্মৃতিই স্পষ্টভাবে আমার মনে ফুটে উঠেছিল। আমরা যখন ভারতবর্ষে ছিলাম, তখন কমলা তার সমস্ত যন্ত্রণা আর দুঃখের মধ্যেও যে দয়ার্দ্র মনের পরিচয় দিয়েছে, তোমার বইয়ে কমলার কথা পড়তে পড়তে আবার তা আমার মনে পড়ে গেল। জীবনের শেষ বছরটিতে যারা তোমাকে তার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিল, নিজেদের সম্পর্কে যে তারা লজ্জাবোধ করবে, এটুকুও বোধহয় আশা করা যায় না।

যুদ্ধের প্রস্তুতি এমন কি আশু যুদ্ধের জন্য ভারী শিল্পের পুনর্গঠন সম্পকেই কমন্স-সভায় এখন আমাদের বিতর্ক চলছে। বিতর্কের এই হল একমাত্র বিষয়বস্তু। তুমি চলে যাবার পর অবস্থা এখন আরও অনেক খারাপ হয়ে দাঁড়িয়েছে। রাইন-ল্যান্ডের উপরে হিটলারের আক্রমণের ফলে ফ্যাসিবিরোধীরা স্বভাবতই উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। তাদের ধারণা ফ্রান্সকে এই সময়ে সমর্থন করলে হিটলারকে ধ্বংস করায় সাহায্য করা হবে। ১৯১৪ সনে যা শুনেছিলাম, এখন আবার সেই একই কথা শুনতে পাচ্ছি ঃ "গণতন্ত্রের স্বার্থে পৃথিবীকে রক্ষা করুন।" ধ্বনিটাকে বড়

ভয়ঙ্কর বলে মনে হচ্ছে। এর অর্থ এই যে শ্রমিক-আন্দোলনকে এবারে আবার জঙ্গিবাদের পথে পরিচালনা করা হবে। লান্সবেরি তাঁর সমস্ত উৎসাহ নিয়ে যে "যুদ্ধ চাই না" আন্দোলনের সূচনা করেছেন আমি তাতে যোগদানে সম্মত হয়েছি। এটা সমাজবাদ নয়, কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী কলহে লিপ্ত হয়ে শ্রমিকরা যাতে না আর পরস্পরকে হত্যা করে, এতে করে হয়ত সে-বিষয়ে অন্তত তাদের সতর্ক করে দিতে পারব।

লখনউতে তোমাকে যে দারুণ সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে, তাতে তোমার সৌভাগ্য কামনা করি (সৌভাগ্য বলতে যা-ই বোঝাক না কেন)। এ-বছরে কংগ্রেসের সভাপতি হবার মত কঠিন কাজ বোধহয় সারা পৃথিবীতে আর একটিও নেই। যা-কিছুই তুমি কর না কেন, তীব্রভাবে তোমাকে সমালোচনা করা হবে। তবে তোমার বই পড়ে এ-বিষয়ে সবাই নিশ্চিত হবে যে যা-কিছুই করবার সিদ্ধান্ত তুমি কর না কেন, তা হবে প্রকাশ্য ও সৎ কাজ, এবং দেশবাসীর প্রতি গভীর ভালবাসা-বশতই তা তুমি করবে। তবে আমাদের মধ্যে রাজনীতিকে যাঁরা মনে প্রাণে গ্রহণ করেছেন, বড়ই কঠিন পরিবেশে তাঁদের কাজ করতে হয়।

বলা বাহুল্য, এমন কোন-কিছুর কথা যদি তোমার মনে হয়, যাতে আমার দ্বারা অথবা আমি যাঁদের প্রভাবিত করতে পারি তাঁদের দ্বারা কোনপ্রকার সাহায্য হতে পারে, তাহলে শুধু একবার জানালেই আমি সাহায্য করব। লখনউর খবর ও তার পরবর্তী খবরের জন্য অত্যন্তই উদ্বিগ্ন চিত্তে আমরা প্রতীক্ষায় থাকব। তোমার সফরের ফলে ভারত-সংক্রান্ত ব্যাপারে শ্রমিক পার্টির আগ্রহ যথেষ্টই বৃদ্ধি পেয়েছে। ইন্ডিয়া অফিস জানতে চাইছে, সবকিছুই যখন শান্ত হয়ে এসেছিল, তখন আবার প্রশ্নোত্তর-কালে আমরা এত উত্তেজিত হয়ে উঠেছি কেন!!

এলেন

১৩৫ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লিখিত

১ এপ্রিল, ১৯৩৬

প্রিয় গুরুদেব,

কমলা সম্পর্কে আপনি যা বলেছেন, আজ বিশ্বভারতী নিউজ-এ তার ইংরেজী তর্জমা পড়লাম। অত্যন্তই সদয় যে-সব কথা আপনি বলেছেন, তাতে আমি অভিভূত বোধ করেছি। আপনার আশীর্বাদে, এবং আমরা যারা প্রায়শই ভুল করে থাকি, তাদের সত্যপথে ধরে রাখবার জন্য যে আপনি রয়েছেন এই কথা ভেবে যে আমি কতখানি শক্তি পেয়েছি, তা আপনাকে জানাতে চাই।

দিল্লি স্টেশনে আপনার দেখা পেয়ে আমার খুব আনন্দ হয়েছিল। কিন্তু রেলওয়ে স্টেশন ত সাক্ষাৎকারের উপযোগী জায়গা নয়। আমি তাই তৃপ্ত হতে পারিনি। আশা করি অনতিকালের মধ্যেই এর চাইতে ভাল সুযোগ আমি পাব।

বিশ্বভারতীর জন্য দিল্লিতে যে আপনি বেশ বড় অঙ্কের টাকা পেয়েছেন, তাতে আমি খুবই খুশী হয়েছি। আশা করি এই সফরের পর আপনি বিশ্রাম গ্রহণ করবেন।

আপনার সঠিক কর্মসূচী না জানায় শান্তিনিকেতনের ঠিকানায় এই চিঠি পাঠালাম।

ভালবাসা ও শ্রদ্ধা জানাই। স্নেহার্থী

জওহরলাল নেহরু

[রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে আমরা প্রায় সকলেই গুরুদেব বলে সম্বোধন করতাম। এর অর্থ শ্রদ্ধেয় শিক্ষক]

কমলা নেহরুর স্মরণে

কমলা নেহরুর মৃত্যুর পর ৮ মার্চ, ১৯৩৬ তারিখে শান্তিনিকেতন আশ্রমে অনুষ্ঠিত এক স্মরণ-সভায় রবীন্দ্রনাথ এক ভাষণ প্রদান করেন। বিশ্ব-ভারতী নিউজ পত্রিকায় সেই ভাষণের সংক্ষিপ্ত ইংরেজী তর্জমা প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থের মূল ইংরেজী সংস্করণে ইংরেজী তর্জমাটি উদ্ধৃত হয়েছে। গ্রন্থের এই বঙ্গানুবাদে কবির মূল বাংলা ভাষণটিই প্রদত্ত হল।

আজ কমলা নেহরুর মৃত্যু দিনের কথা বিশেষভাবে স্মরণ করবার জন্য আমরা আশ্রমবাসীরা মন্দিরে সমবেত। একদিন তাঁর স্বামী যখন কারাগারে, যখন তাঁর দেহের উপরে মরণান্তিক রোগের ছায়া ঘনায়িত, সেই সময় তিনি তাঁর কন্যা ইন্দিরাকে নিয়ে আমাদের আশ্রমে এসেছিলেন। আমাদের সৌভাগ্য এই যে সেই দুঃসময়ে তাঁর কন্যাকে আশ্রমে গ্রহণ করে কিছুদিনের জন্যে তাঁদের নিরুদ্বিগ্ন করতে পেরেছিলাম। সেই দিনের কথা আজ মনে পড়ছে—সেই তাঁর প্রশান্ত গম্ভীর অবিচলিত ধৈর্যের মূর্তি ভেসে উঠছে চোখের সামনে।

সাধারণত শোক প্রকাশের জন্য যে-সব সভা আহূত হয়ে থাকে, সেখানে অধিকাংশ সময় অনুষ্ঠানের অঙ্গরূপেই অত্যুক্তি দ্বারা বাক্যকে অলংকৃত করতে হয়। আজ যাঁর কথা স্মরণ করার জন্যে আমরা সবাই মিলেছি, তাঁকে শোকের মায়া বা মৃত্যুর ছায়া দিয়ে গড়ে তোলবার দরকার নেই। তাঁর চরিত্রের দীপ্তি সহজেই আত্মপ্রকাশ করেছে, কারো কোনো ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয়নি। বস্তুত এই যে নারী, যিনি চিরজীবন আপন স্তব্ধতার মধ্যে সমাহিত থেকে পরম দুঃখ নীরবে বহণ করেছেন, তাঁর পরিচয়ের দীপ্তি কেমন করে যে আজ স্বতই সমস্ত ভারতে ব্যাপ্ত হল সে-কথা চিন্তা করে মন বিস্মিত হয়। আধুনিক কালে কোনো রমণীকে জানিনে, যিনি মৃত্যুকে অতিক্রম করে অনতিকালের মধ্যে সমস্ত দেশের সম্মুখে এমন অমৃত মূর্তিতে আবির্ভূত হতে পেরেছেন।

কমলা নেহরু যাঁর সহধর্মিনী, সেই জওহরলাল আজ সমস্ত ভারতের তরুণ হৃদয়ের রাজাসনে প্রতিষ্ঠিত হবার অধিকারী; অপরিসীম তাঁর ধৈর্য, বীরত্ব তাঁর বিরাট—কিন্তু সকলের চেয়ে বড়ো তাঁর সুদৃঢ় সত্যনিষ্ঠা। পলিটিক্সের সাধনায় আত্মপ্রবঞ্চনা ও পরপ্রবঞ্চনার পঙ্কিল আবর্তের মধ্যে নিজেকে কখনো হারিয়ে ফেলেননি। সত্য যেখানে বিপদজনক সেখানে সত্যকে তিনি ভয় করেননি, মিথ্যা যেখানে সুবিধাজনক সেখানে তিনি সহায় করেননি মিথ্যাকে। মিথ্যার উপচার আশু প্রয়োজনবোধে দেশ-পূজার যে অর্ঘ্যে অসঙ্কোচে স্বীকৃত হয়ে থাকে, সেখানে তিনি সত্যের নির্মলতম আদর্শকে রক্ষা করেছেন। তাঁর অসামান্য বুদ্ধি কূটকৌশলের পথে ফললাভের চেষ্টাকে চিরদিন ঘৃণাভরে অবজ্ঞা করেছে। দেশের মুক্তিসাধনায় তাঁর এই চরিত্রের দান সকলের চেয়ে বড়ো দান।

কমলা ছিলেন জওহরলালের প্রকৃত সহধর্মিনী। তাঁর মধ্যে ছিল সেই অপ্রমত্ত শান্তি, সেই অবিচলিত স্থৈর্য, যা বীর্যের সর্বোত্তম লক্ষণ। তাঁদের দুজনের কারো মধ্যে দেখিনি অতি ভাবালুতার চঞ্চল উত্তেজনা তাঁদের এমন পরিপূর্ণ মিলনে, কি জীবনে কি মৃত্যুতে, বিচ্ছেদের স্থান নেই নিশ্চয়ই। আজ তাঁর স্বামী মরণের মধ্যে দিয়ে কমলাকে দ্বিগুণ করে লাভ করেছেন। যিনি তাঁর জীবনসঙ্গিনী ছিলেন, আজও তিনি জীবনসঙ্গিনীই রইলেন।

দূর অতীতের বৃহৎ পরিপ্রেক্ষণিকায় আমরা পুরাণবিখ্যাত সাধ্বী ও বীরাঙ্গনা-দেরকে তাঁদের বিরাট স্বরূপে দেখতে পাই। কমলা নেহরু আজও কালের সেই

পরিপ্রেক্ষণিকায় উত্তীর্ণ হননি। তিনি ছিলেন অত্যন্ত নিকটবর্তী বর্তমানের প্রত্যক্ষ গোচর; এখানে বড়োর সঙ্গে ছোটো, মূল্যবানের সঙ্গে অকিঞ্চিৎকর জড়িত হয়ে থাকে। তৎসত্ত্বেও আমরা তাঁর মধ্যে দেখছি যেন একটি পৌরাণিক মহিমা; তিনি তাঁর আপন মহত্ত্বের পরিপ্রেক্ষণিকায় নিত্যরূপে পরিপূর্ণরূপে প্রকাশমান।

আজ হোলির দিন, আজ সমস্ত ভারতে বসন্তোৎসব। চারিদিকে শুষ্কপত্র ঝরে পড়েছে, তার মধ্যে নবকিশলয়ের অভিনন্দন। আজ জরাবিজয়ী নূতন প্রাণের অভ্যর্থনা জলে স্থলে আকাশে। এই উৎসবের সঙ্গে আমাদের দেশের নবজীবনের উৎসবকে মিলিয়ে দেখতে চাই। আজ অনুভব করব যুগসন্ধির নির্মম শীতের দিন শেষ হল, এল নবযুগের সর্বব্যাপী আশ্বাস। আজ এই নবযুগের ঋতুরাজ জওহরলাল। আর আছেন বসন্তলক্ষ্মী কমলা তাঁর সঙ্গে অদৃশ্যসত্তায় সম্মিলিত। তাঁদের সমস্ত জীবন দিয়ে ভারতে যে বসন্ত সমাগম তাঁরা ঘোষণা করেছেন, সে তো অনায়াস আরামের দিক দিয়ে করেননি। সাঙ্ঘাতিক বিরুদ্ধতা প্রতিবাদের ভিতর দিয়েই তাঁরা দেশের শুভ সূচনা করেছেন। এই জন্যে আমাদের আশ্রমে এই বসন্তোৎসবের দিনকেই সেই সাধ্বীর স্মরণের দিনরূপে গ্রহণ করেছি। তাঁরা আপন নির্ভীক বীর্যের দ্বারা ভারতে নবজীবনের বসন্তের প্রতীক।

এই নারীর জীবনে বিরুদ্ধ শক্তির সঙ্গে প্রতিদিন যে দুঃসহ সংগ্রাম চলেছিল, যে সংগ্রামে তিনি কোনো দিন পরাভব স্বীকার করেননি, সে আমাদের গৌরবের সঙ্গে স্মরণীয়। স্বামীর সঙ্গে সুদীর্ঘ কঠিন বিচ্ছেদ তিনি অচঞ্চলচিত্তে বহন করেছেন স্বামীর মহৎ ব্রতের প্রতি লক্ষ্য করে। দুর্বিষহ দুঃখের দিনেও স্বামীকে তিনি পিছনের দিকে ডাকেননি, নিজের কথা ভুলে সংকটের মুখ থেকে স্বামীকে ফিরিয়ে আনবার জন্যে তাঁকে বেদনা জানাননি। স্বামীর ব্রতরক্ষা তিনি আপন প্রাণরক্ষার চেয়ে বড়ো করে জেনেছিলেন। এই দুষ্কর সাধনার জোরে তিনি আজও, মৃত্যুর পরেও দুর্গম পথে স্বামীর নিত্যসঙ্গিনী হয়ে রইলেন।

আজ এই আমাদের বলবার কথা যে, আমরা লাভ করলুম এই বীরঙ্গনাকে আমাদের ইতিহাসের বেদীতে। আধুনিক কালের চলমান পটের উপর তিনি নিত্যকালের চিত্র রেখে গেলেন। তাঁকে হারিয়েছি এমন অশুভ কথা আজ কোনোমতেই সত্য হতে পারে না। (আনন্দবাজার পত্রিকা থেকে উদ্ধৃত)

১৩৬ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক লিখিত

"উত্তরায়ণ"
শান্তিনিকেতন, বাংলা,
৫ এপ্রিল, ১৯৩৬

প্রিয় জওহরলাল,

তোমার চিঠি পেলাম। আশ্রমে আমার ছাত্রদের কাছে কমলার বিষয়ে যে অল্প কয়েকটি কথা বলেছি, তুমি তাতে আশা ও শক্তি পেয়েছ জেনে সুখী হয়েছি। বিশ্বাস কর, তোমার এই বিপুল বিয়োগ-ব্যথাকে আমি অত্যন্তই আন্তরিকভাবে অনুভব করেছি।

ট্রেণে যে অল্প কয়েক মিনিটের জন্য তোমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল, আমি নিজেও তাতে তৃপ্ত হতে পারিনি। পথের পরিশ্রমে আমার দেহ আর মন, দুই-ই ছিল ক্লান্ত, কথা বলবার শক্তিও আমার ছিল না বললেই চলে। দিন কয়েকের জন্য

তোমাকে এখানে এসে আমার সঙ্গে থাকতেই হবে। এই আশ্বাস তোমাকে দিতে পারি যে শান্তি নিকেতনের গরম এলাহাবাদের চেয়ে বেশী নয়।

স্নেহানুসক্ত
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৩৭ রফি আহ্‌মদ কিদোয়াই কর্তৃক লিখিত

যুক্তপ্রদেশ প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতি,
আমিনাবাদ পার্ক, লখনউ,
২০ এপ্রিল, ১৯৩৬

প্রিয় জওহরলালজী,

বিগত কয়েকদিন আমি মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করেছি। আপনিই ছিলেন আমাদের একমাত্র ভরসা; কিন্তু সে-ভরসা কি অলীক বলে প্রতিপন্ন হতে চলল? গান্ধীবাদের সমবেত বিরুদ্ধতা ও প্রভাবকে আপনি কতখানি ঠেকিয়ে রাখতে পারবেন, কিছু-কিছু লোকের মনে সে-বিষয়ে সন্দেহ ছিল।

নতুন করে ওয়ার্কিং কমিটি গঠনের সুযোগ আপনি পেয়েছিলেন। ট্যাণ্ডন, নরীম্যান, পট্টভী ও শার্দুল সিংকে আপনি বাদ দিয়েছেন। গোবিন্দ দাস ও শরৎ বসুকে না নিয়ে ভুলাভাই ও রাজাগোপালাচারীকে আপনি নিয়েছেন। অথচ এঁদের নিলে আপনার শক্তিবৃদ্ধি হত। দালালদের কাছ থেকে আপনাকে দূরে রাখবার জন্যই এঁরা চেষ্টা করেছেন। নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতি ও প্রতিনিধি প্রেরণ, উভয় ব্যাপারেই আমরা দুর্বল হয়ে পড়েছি। যে ওয়ার্কিং কমিটি আপনি গঠন করেছেন, আগের ওয়ার্কিং কমিটির চাইতে তা আরও বেশী প্রতিক্রিয়াশীল হতে বাধ্য।

হতে পারে আমারই দৃষ্টি সংকীর্ণ। মতবাদ নিয়ে আলাপ-আলোচনার চাইতে সংখ্যার উপরে আমি বেশী আস্থা রাখি। তবে অবস্থা দেখে আমার মনে যে প্রতিক্রিয়া ঘটেছে, তা আপনাকে জানাতে আমি উদ্‌গ্রীব ছিলাম। অতঃপর আর এ-বিষয়ের কোনও উল্লেখ আমি করব না।

রফি

১৩৮ মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক লিখিত

২১ এপ্রিল, ১৯৩৬

প্রিয় জওহরলাল,

সংক্ষিপ্ত মন্তব্যগুলি সুপাঠ্য হয়েছে। তোমার উত্তরগুলি মোটামুটি সম্পূর্ণ, এবং—বলাই বাহুল্য—সুস্পষ্ট।

আসন্ন বৈঠক সম্পর্কে তুমি দুশ্চিন্তা বোধ করছ কেন? আলোচনা যদি হয় ত আপনাপন মতামত পরস্পরকে বুঝিয়ে বলবার জন্যই তা হবে। যখনই বুঝবে যে কোনও একটা প্রস্তাবের সপক্ষে সর্বরকমের যুক্তি দেখান হয়ে গিয়েছে, তখনই সে-বিষয়ে আলোচনা তুমি থামিয়ে দেবে। আসলে তুমি চাও যে মিলেমিশে কাজ করা হক। তা করা হবে বলে আমি খুবই আশা রাখি।

২৩ তারিখে সন্ধ্যায় আমি নাগপুরে পৌঁছাব।

আশা করি নিজের সম্পর্কে রঞ্জিত যত্ন নেবে। সে খালিতে গিয়েছে জেনে সুখী হলাম। আশা করি স্বরূপ তোমার সঙ্গে যাবে।

সর্দার এখনও রোগে ভুগছেন। আপাতত শুধু ননীতোলা দুধই তাঁর পথ্য। ৮ই মে'র পরে আমি তাঁকে নন্দী পাহাড় নিয়ে যাব। তুমিও যদি আসতে পারতে, সুখী হতাম।

ভালবাসা জানাই।

বাপু

১৩৯ মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক আগাথা হ্যারিসনকে লিখিত

ওয়ার্ধা,
৩০ এপ্রিল, ১৯৩৬

প্রিয় আগাথা,

তোমার ১৭ তারিখের চিঠি পেলাম। জওহরলালের কাছে এর চাইতে কম-কিছু আশা করা যেত না। তার ভাষণের মধ্যেই তার বিশ্বাসের স্বীকৃতি রয়েছে। যে-ভাবে সে ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করেছে, তার থেকেই বুঝতে পারবে যে ১৯২০ সন থেকে যাঁরা ঐতিহ্যসম্মত দৃষ্টিভঙ্গীর প্রতিনিধিত্ব করে আসছেন, তাঁদের মধ্যে থেকেই সে অধিকাংশ লোক নিয়েছে। এই অধিকাংশ যে আমারই মতের সমর্থক তাতে সন্দেহ নেই। যদি সম্ভব হত ত নয়া শাসনতন্ত্রকে আজই আমি ধ্বংস করতাম। এমন প্রায় কিছুই এর মধ্যে নেই, যা আমি পছন্দ করতে পারি। তবে জওহরলালের পথ আর আমার পথ এক নয়। ভূমি ইত্যাদি সম্বন্ধে তার আদর্শ আমি মানি। তবে প্রকৃত পক্ষে তার কোনও পন্থাই আমার মনঃপূত নয়। শ্রেণী-সংগ্রাম যাতে না হয় তার জন্য আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করব। মনে হয় সেও করবে। তবে শ্রেণী-সংগ্রামকে এড়ান সম্ভব হবে বলে সে বিশ্বাস করে না। আর আমি বিশ্বাস করি যে আমার পন্থা যদি গ্রহণ করা হয় তাহলে সেটা খুবই সম্ভব। তবে আপন পন্থার সমর্থনে জওহরলাল যদিও চরম সব কথা বলে, কাজের ব্যাপারে সে কিন্তু ধীরস্থির। তাকে আমি যেটুকু জানি, তাতে বলতে পারি যে বিরোধকে সে ত্বরান্বিত করবে না। আবার সেই বিরোধকে যদি তার উপরে চাপিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে সে তাকে এড়িয়েও যাবে না। তবে এ-ব্যাপারে সমগ্র কংগ্রেস একমত নয়। মতের পার্থক্য সেখানে অবশ্যই আছে। বিরোধ যাতে না বাধে, তার ব্যবস্থা করাই আমার পন্থার উদ্দেশ্য। কিন্তু তার পন্থা ত তেমন নয়। আমার নিজের ধারণা এই যে জওহরলাল তার অধিকাংশ সহকর্মীর সিদ্ধান্তকেই মেনে নেবে। তার যা মানসিক গঠন, তাতে এ অতি শক্ত কাজ। ইতিমধ্যেই সে তা বুঝতে পারছে। তবে যা-ই সে করুক না কেন, সে-কাজ উদার ভঙ্গিতেই করবে। জীবন সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য আরও বৃদ্ধি পেয়েছে তাতে সন্দেহ নেই, তবে হৃদয়ের দিক দিয়ে আমরা আজ পরস্পরের যত নিকটবর্তী, এত নিকটে এর আগে আর কখনও আমরা আসিনি।

এ-চিঠি প্রকাশ্যে ব্যবহারের জন্য নয়। তবে তোমার বন্ধুবান্ধবদের স্বচ্ছন্দে এ-চিঠি দেখাতে পার।

তোমার প্রশ্নের উত্তরে তুমি আর-কিছু জানতে চাও বলে আমার মনে হয় না।

ভালবাসা জানাই। বাপু

মিস আগাথা হ্যারিসন

১৪০ মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক লিখিত

নন্দী পাহাড়,
১২ মে, ১৯৩৬

প্রিয় জওহরলাল,

আগাথার চিঠির যে উত্তর আমি লিখেছি, তোমার মনোভাব সম্পর্কে আমি সেখানে ঠিক কথা বলেছি কিনা, এইটে জানবার জন্যই উত্তরটা আমি তোমার কাছে পাঠিয়েছিলাম।

কিন্তু উল্টে তুমিই যে আমার উপরে আক্রমণ চালিয়েছ, তাতে আমি খুশী

হয়েছি। যে ব্যবস্থার ফলে এক অবিশ্রান্ত ও প্রলয়ংকর শ্রেণী-সংগ্রামের সৃষ্টি হবে, তাকে সমর্থনের, অথবা যে ব্যবস্থা মূলত হিংসার ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত, তার প্রতি অনুমোদন জ্ঞাপনের, অথবা সামান্য ত্রুটির জন্য কাউকে কাউকে তিরস্কার করে ও ধিক্কার দিয়ে অতঃপর তার চাইতে অনেক বড় ব্যর্থতার জন্য যারা দায়ী তাদের প্রশংসা করবার অপরাধে আমি অপরাধী নই

এমনটা সম্ভব যে আমার যে-সব ত্রুটির কথা তুমি বলেছ, তা হয়ত আমার আছে, কিন্তু সে-বিষয়ে আমি সচেতন নই। তা-ই যদি হয় ত সেক্ষেত্রে তার স্পষ্ট দৃষ্টান্ত তোমার দেওয়া উচিত। আমার বিবেচনায় আমার কর্মপন্থা যে তোমার কর্মপন্থার থেকে পৃথক, সে-কথা আমি আগেই স্বীকার করেছি। তবে বর্তমান ব্যবস্থা সম্পর্কে আমাদের মনোভাবের কোনও পার্থক্য নেই।

ডঃ আনসারীর মৃত্যু এক কঠিন আঘাত হয়ে নেমেছে। তাঁর সঙ্গে আমার যে সম্পর্ক ছিল, রাজনৈতিক মৈত্রীর চাইতে তা অনেক বেশী।

আশা করি তুমি খালিতে যাবে অথবা আমার কাছে এসে ঠাণ্ডা হাওয়ায় শরীর জুড়িয়ে যাবে।

স্বরূপকে জানিও যে তার চিঠি দুটি আমি পেয়েছি। সার তেজকে আমি চিঠি লিখব।

ভালবাসা জানাই।

বাপু

১৪১ মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক লিখিত

নন্দী পাহাড়,
২১ মে, ১৯৩৬

প্রিয় জওহরলাল,

হিন্দু পত্রিকা থেকে দুটি কাটিং এই সঙ্গে পাঠাচ্ছি। রিপোর্টার তোমার কথাগুলিকে যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করেছে বলে আমি বিশ্বাস করি না। তবে এ দুটি বিষয় সম্পর্কে তুমি আসলে যা বলেছিলে, তা যদি আমাকে জানাও, সুখী হব। মেয়েদের যে বাদ দেওয়া হয়েছে, তার দায়িত্ব সম্পূর্ণই তোমার নিজের। বস্তুত ওয়ার্কিং কমিটি থেকে মেয়েদের যে বাদ দেওয়া যেতে পারে, এমন কথা আর কেউ ভাবতেও পারেননি। আর আমার ধারণা, খাদির বিষয়ে তুমি এই কথা বলেছ যে জাতির বর্তমান অর্থনীতিতে খাদি অপরিহার্য, এবং জাতি যখন আত্মনির্ভর হবে, হাতে-তৈরী কাপড়কে তখন হটে গিয়ে মিলের কাপড়ের জন্য জায়গা করে দিতে হবে।

ভালবাসা জানাই।

বাপু

১৪২ মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক লিখিত

বাঙ্গালোর,
২৯ মে, ১৯৩৬

প্রিয় জওহরলাল,

তোমার ২৫ তারিখের চিঠি পেয়েছি। তুমি তাহলে প্রায় বিদ্যুদ্বেগে সফর করে বেড়াচ্ছ। প্রয়োজনীয় শক্তি যেন তুমি লাভ কর। মাত্র এক সপ্তাহও যদি খালিতে থাক, সে এক অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্য বলেই বিবেচিত হবে।

খাদি সম্পর্কে যে বিবৃতি তুমি দিয়েছ, প্রকাশ্যভাবে আমি তাকে কাজে লাগাতে চাই। এ-বিষয়ে অনেকেই আমাকে প্রশ্ন করে পাঠাচ্ছেন। আমাদের আপন লোকদের মধ্যে যাঁরা খাদিতে বিশ্বাসী, বিকৃত সংক্ষিপ্ত বিবরণটি তাঁদের মনে উদ্বেগ সৃষ্টি করেছে। তোমার বিবৃতিটি অবস্থাকে একটু শান্ত করবে।

ওয়ার্কিং কমিটিতে কোনও মহিলা-সদস্য না নেওয়া সম্পর্কে তুমি যে যুক্তি দেখিয়েছ, তাতে আমি সন্তুষ্ট হতে পারিনি। কমিটিতে একজন মহিলাকে গ্রহণ করবার কিছুমাত্র আগ্রহও যদি তুমি দেখাতে, তাহলে প্রবীণদের মধ্যে একজনের সরে দাঁড়াবার ব্যাপারে কিছুই অসুবিধা হত না। একমাত্র ভুলাভাই সম্পর্কেই চাপ দেওয়া হয়েছিল, যদি অবশ্য একে চাপ বলা যায়। এবং প্রথম যখন তাঁর নাম উল্লেখ করা হয়, তোমার তখন কোন আপত্তি হয়নি। অন্য কোনও সদস্য সম্পর্কেই চাপ দেওয়া হয়নি। অতঃপর একজন সমাজবাদীর নাম বাদ দিয়ে একজন মহিলাকে গ্রহণ করবার পথে কোনও বাধাই তোমার ছিল না। তবে যতদূর আমার মনে পড়ে, সরোজিনী দেবীর পরিবর্তে কাকে নেওয়া হবে, এ নিয়ে তুমি নিজেই বরং অসুবিধেয় পড়েছিলে, এবং তাঁকে বাদ দিতেই তুমি ব্যগ্রতা দেখিয়েছিলে। এমন কি, এ-কথাও তুমি বলেছিলে যে ওয়ার্কিং কমিটিতে সর্বদাই যে একজন মহিলা এবং কিছুসংখ্যক মুসলমান সদস্য রাখতে হবে, এই ঐতিহ্য অথবা প্রথায় তোমার আস্থা নেই। সুতরাং মহিলা-সদস্য বর্জনের ব্যাপারে আমার মনে হয়, আপন স্বাধীন অভিরুচি অনুযায়ীই এ-কাজ তুমি করেছ। প্রথাকে লঙ্ঘন করবার আকাঙ্ক্ষা অথবা সাহস অন্য কোনও সদস্যের হত না। এ-কথাও তোমাকে আমার বলতে হবে যে কোনও কোনও কংগ্রেসী মহলে গোটা দোষটা আমার উপরে চাপান হচ্ছে, কেননা আমিই নাকি মিসেস নাইডুকে বাদ দিয়েছি, এবং কোনও মহিলা-সদস্য যাতে না থাকেন তার জন্য পীড়াপীড়ি করেছি। অথচ, তোমাকে বলেছি, এমন-কিছু করবার সাহস আমার নেই। মহিলা-সদস্য বাদ দেব কি, মিসেস এন.কেও আমি বাদ দিতে পারতাম না।

অন্যান্য সদস্যদের সম্পর্কেও আমি এই ধারণা পোষণ করে আসছি যে আদর্শের জন্য উচিত মনে করেছ বলেই তুমি তাঁদের বেছে নিয়েছ। সকলেই যেখানে মহত্তম উদ্দেশ্য অর্থাৎ আপনাপন বুদ্ধি-বিবেচনা অনুসারে আদর্শসেবার উদ্দেশ্যে অনুপ্রাণিত, সেখানে 'বেহায়া' অথবা 'হায়াদার'এর কোনও প্রশ্নই ওঠে না। তোমার চিঠিতে তোমার বিবৃতি সমর্থিত হয়েছে। তোমাকে জানাতে পারি যে এই বিবৃতি পড়ে রাজেনবাবু, সি. আর. এবং বল্লভভাই খুবই বেদনা পেয়েছেন। তাঁরা মনে করেন যে সম্মানজনকভাবে, এবং সহকর্মী হিসেবে তোমার প্রতি অটুট আনুগত্য নিয়েই তাঁরা কাজ করবার চেষ্টা করেছেন। এ-বিষয়ে আমি তাঁদের সঙ্গে একমত। তোমার বিবৃতি থেকে মনে হয়, তোমার প্রতি অন্যায় করা হয়েছে।

তৃতীয় বিষয়টি সম্পর্কে জানাই, বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে গেলেই আমি সুখী হব। তুমি কী বলতে চাও আমি জানি না, তবে যতক্ষণ না আমাদের দেখা হচ্ছে, ততক্ষণ সেটা মুলতুবী থাক। যে ক্লেশ তোমাকে ইতিমধ্যেই বহণ করতে হচ্ছে, আমি আর তার মাত্রা বাড়াব না।

ডঃ আনসারীর স্মৃতিরক্ষা সম্পর্কে জানাই, আসফ আলীকে আমি আমার এই সুস্পষ্ট অভিমত জানিয়েছি যে রাজনৈতিক অবস্থার যতদিন না উন্নতি হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত বাবার স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা যেমন মুলতুবি রাখা হয়েছে, ডঃ আনসারীর স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থাও তেমনি মুলতুবি রাখা উচিত। তোমার কি অন্যরকম মনে হয়?

কমলার স্মৃতিরক্ষার কাজ ধীরে ধীরে এগোচ্ছে।

রাজকুমারীর চিঠি এইসঙ্গে পাঠালাম। এর মধ্যে ইন্দুর উল্লেখ আছে।

ভালবাসা জানাই।

বাপু

১০ তারিখ পর্যন্ত বাঙ্গালোর সিটির ঠিকানায় আছি।

১৪৩ মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক লিখিত

সেবাগ্রাম,
১৯ জুন, ১৯৩৬

হাতের লেখার অস্পষ্টতার জন্য চিঠিখানি যদি পড়তে না পারা যায়, তাহলে ফেলে দিও।

প্রিয় জওহরলাল,

তোমার অবগতির জন্য সঙ্গের কাগজখানিকে গতকাল তোমার কাছে পাঠাতে যাচ্ছি, এমন সময় তোমার চিঠি পেলাম।

রঞ্জিত এখন আগের চাইতে ভাল আছে জেনে সুখী হয়েছি। নিজের যত্ন তাকে নিতেই হবে।

আমি চাই না যে তোমার ওয়ার্কিং কমিটিতে কোনও মহিলা-সদস্য না নেওয়া সম্পর্কে বিশেষ কোনও বিবৃতি তুমি দাও। মহিলা-সদস্য না থাকাটা এবং অন্যান্য সদস্যের গ্রহণ অথবা বর্জন তুল্যমূল্য নয়। ওয়ার্কিং কমিটি থেকে মহিলাদের একেবারে বাদ দেবার মতন সাহস অথবা ইচ্ছা আমাদের কারও ছিল না। তোমার মনোভাবের এইটেই যদি সঠিক ব্যাখ্যা হয়, তাহলে সময় যখন আপনা থেকে আসবে তখনই সেটা বুঝিয়ে বলা উচিত।

অন্যান্যদের বিষয়ে জানাই, যা হয়ে গিয়েছে এখনও যে তার সম্পর্কে তুমি ক্ষুব্ধ হয়ে আছ, এতে আমি দুঃখিত। আদর্শের খাতিরে অনিচ্ছাসত্ত্বেও ভুলাভাইকে তুমি গ্রহণ করেছ। এবং প্রথম আলোচনার সময়েই তুমি এ-ব্যাপারে কোন-কিছু উল্লেখ করবার আগেই আমি বলেছিলাম যে ওয়ার্কিং কমিটিতে অবশ্যই কিছু সমাজবাদী সদস্য নিতে হবে। তাঁদের নামও আমি বলেছিলাম। যা-ই হক, কে কার নাম বলেছিল, তার উপরে আমি গুরুত্ব আরোপ করতে চাই না; আমি গুরুত্ব আরোপ করতে চাই এই ব্যাপারটার উপরে যে সকলের সমবেত আদর্শকে সফল করে তুলবার জন্য চেষ্টা করা ছাড়া অন্য কোনও উদ্দেশ্য দ্বারা কেউ পরিচালিত হননি; সকলেই এই একই উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয়েছেন।

আমার যতদূর মনে পড়ে, যে-বিবৃতিটি আমি দেখেছিলাম আর তুমি আমাকে যা পাঠিয়েছ তা এক নয়। তুমি যেটিকে চিঠির সঙ্গে পাঠিয়েছ, সেটিকে আমি এই প্রথম দেখলাম মনে হচ্ছে। দয়া করে ডঃ হ-কে জিজ্ঞেস কর, অন্য কোনও বিবৃতি তিনি প্রচার করেছেন কিনা। এমন কি, যেটি তুমি পাঠিয়েছ, তারও সঙ্গে ডাক্তার আমাকে যা বলতেন তার পার্থক্য বর্তমান। তাঁর মতামতকে আমি যদিও ত্রুটিযুক্ত বলে মনে করি, তবু তাঁর মতপ্রকাশে আমার কিছুমাত্র আপত্তি নেই। আমার অভিযোগ এই যে তিনি আমার কাছে এক কথা বলেছেন, অতঃপর প্রকাশের সময় অন্য কথা বলেছেন। ডঃ হ-কে তুমি স্বচ্ছন্দে এ-চিঠি দেখাতে পার।

আশা করি কুশলে আছ। পাঞ্জাবে যে-রকম ঝড়ের বেগে তুমি সফর করে ফিরলে, আমি তাতে তখন উদ্বেগ বোধ না করে পারিনি।

ভালবাসা জানাই।

বাপু

Santiniketan
May 31. 1936

Dear Jawaharlal

I have just finished reading your great book and I feel intensely impressed and proud of your achievement. Through all its details there runs a deep current of humanity which overpasses the tangles of facts and leads us to the person who is greater than his deeds and truer than his surroundings.

Yours very sincerely
Rabindranath Tagore

১৪৪ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক লিখিত

শান্তি নিকেতন,
৩১ মে, ১৯৩৬

প্রিয় জওহরলাল,

তোমার মহান গ্রন্থখানি সবেমাত্র পড়ে শেষ করেছি। বইটি আমার উপরে গভীর রেখাপাত করেছে। তোমার এই বিরাট কাজের জন্য আমি গৌরব বোধ করি। এর খুঁটিনাটি নানা বিবরণের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে গিয়েছে মানবিকতার সেই গভীর স্রোতোধারা, তথ্যের জটিলতাকে অতিক্রম করে যা আমাদের সেই মানব-সত্তার কাছে উত্তীর্ণ করে দেয়, আপন কর্মের থেকে যে মহত্তর, পরিবেশের থেকে সত্যতর।

তোমাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

WALLINGTON.
CAMBO,
MORPETH.

June. 12. 1936.

Dear Mr Nehru,

I have read your book. I should like to meet the man whom it reveals. You and I both began at Harrow where we were not taught to be champions of the underdog. But the oppression and poverty of your people taught you and the war and the slums taught me. We think pretty much alike. I should wish if ever you are in England that you should let me know. I don't think I shall be coming to India. For I have no wish to

go to the black lands, Germany, India, Italy, when there are red or reddish ones to go to. But if I do come I will find you out in prison or free.

Yours fraternally,

Charles Trevelyan

---

১৪৫ চার্লস ট্রেভেলিয়ন কর্তৃক লিখিত

ওয়ালিংটন, কাম্বো,
মোরপেট,
১২ জুন, ১৯৩৬

প্রিয় মিঃ নেহরু,

আপনার বই আমি পড়েছি। বইয়ের মধ্যে যে-মানুষটির পরিচয় পেলাম, তাঁর সঙ্গে আমার দেখা করবার ইচ্ছে। আপনি আর আমি, দুজনেই আমরা হ্যারোতে আমাদের জীবন শুরু করেছি। নিপীড়িত মানুষের পক্ষ নিয়ে দাঁড়াবার শিক্ষা সেখানে আমরা পাইনি। আপনাকে শিক্ষা দিয়েছে আপনার দেশবাসীর নির্যাতন আর দারিদ্র্য, আর আমাকে শিক্ষা দিয়েছে যুদ্ধ আর বস্তি-জীবন। আমাদের দুজনের চিন্তার মধ্যে যথেষ্টই সাদৃশ্য রয়েছে। যদি কখনও ইংল্যাণ্ডে আসেন, অবশ্যই আমাকে জানাবেন। আমি যে ভারতবর্ষে যাব, এমন মনে হয় না। তার কারণ, যাবার মতন লাল অথবা লালাভ সব দেশ যেখানে রয়েছে, সেখানে জার্মানি, ভারতবর্ষ আর ইতালির মতন কালো দেশে যাবার ইচ্ছা আমার নেই। তবে একান্তই যদি যাই, আপনাকে আমি খুঁজে বার করব। তা সে আপনি কারাগারেই থাকুন আর মুক্তই থাকুন।

মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ
চার্লস ট্রেভেলিয়ন

১৪৬ সার মহম্মদ ইকবাল কর্তৃক লিখিত

লাহোর,
২১ জুন, ১৯৩৬

প্রিয় পণ্ডিত জওহরলাল,

গতকাল আপনার যে চিঠি পেয়েছি, তার জন্য ধন্যবাদ জানাই। আপনার প্রবন্ধগুলির উত্তরে আমি যখন লিখি, তখন আমার বিশ্বাস ছিল যে আহমদীদের রাজনৈতিক মনোভাব সম্পর্কে আপনার কোন ধারণা নেই। বস্তুত আমি যে একটা উত্তর লিখেছিলাম, তার প্রধান কারণ এই যে বিশেষ করে আপনাকে আমার দেখাবার ইচ্ছে ছিল. মুসলিম আনুগত্যের উদ্ভব কী করে হয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত কী ভাবেই বা তা আহমদী ধর্মবিশ্বাসের মধ্যে একটা প্রকাশের ভিত্তি খুঁজে পেয়েছে। আমার প্রবন্ধটি প্রকাশের পর সবিস্ময়ে আমি উপলব্ধি করলাম যে ঐতিহাসিক কী কী কারণে আহমদী ধর্মবিশ্বাসের শিক্ষাগুলি তার বর্তমান রূপ নিয়েছে, এমন কি শিক্ষিত মুসলমানরাও তা জানেন না। তা ছাড়া পাঞ্জাবে ও অন্যত্রও আপনার মুসলিম অনুরাগীরা আপনার প্রবন্ধগলি পড়ে বিচলিত বোধ করেছিলেন; তার কারণ তাঁদের মনে হয়েছিল যে আহমদী আন্দোলনের প্রতি আপনি সহানুভূতি-সম্পন্ন। এ-কথা ভাববার প্রধান হেতু এই যে আহমদীরা আপনার প্রবন্ধগুলি পড়ে অত্যন্তই উল্লসিত হয়ে উঠেছিল। আপনার সম্পর্কে এই ভুল ধারণা সৃষ্টি হবার জন্য আহমদী পত্রিকাগুলিই প্রধানত দায়ী। যা-ই হক, আমার ধারণা যে ভ্রমাত্মক, এ-কথা জেনে আমি সুখী হয়েছি। ধর্মতত্ত্বে আমার নিজের বিশেষ আগ্রহ নেই, তবে আহমদীদের আপন অস্ত্রে তাদের ঘায়েল করবার জন্যই এ নিয়ে আমাকে নাড়াচাড়া করতে হয়েছিল। এ-বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন যে ইসলাম ও ভারতবর্ষের সম্পর্কে অত্যন্তই সৎ উদ্দেশ্য নিয়ে আমার প্রবন্ধটি লিখেছিলাম। ইসলাম ও ভারতবর্ষ, আহমদীরা এই দুয়ের প্রতিই যে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, এ-বিষয়ে আমার কিছুমাত্র সন্দেহ নেই।

লাহোরে আপনার সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ নষ্ট হওয়ায় আমি অত্যন্তই দুঃখিত। আমি তখন অত্যন্তই অসুস্থ ছিলাম; ঘর থেকে বাইরে যাবার সাধ্য আমার ছিল না। নিরবচ্ছিন্ন অসুস্থতার ফলে গত দু বছর ধরে কার্যত আমাকে অবসর-জীবন যাপন করতে হচ্ছে। এর পর কবে আবার পাঞ্জাবে আসছেন, দয়া করে আমাকে জানাবেন। আপনার প্রস্তাবিত ব্যক্তি-স্বাধীনতা সঙ্ঘ সম্পর্কে আমার চিঠি কি আপনি পেয়েছিলেন? আপনার চিঠিতে তার প্রাপ্তিস্বীকার না থাকায় আশঙ্কা করি যে আমার সে-চিঠি আপনার হাতে পেঁছয়নি।

ভবদীয়
মহম্মদ ইকবাল

১৪৭ রাজেন্দ্র প্রসাদ ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ কর্তৃক লিখিত

ওয়ার্ধা,
২৯ জুন, ১৯৩৬

প্রিয় জওহরলালজী,

মতামত ও দৃষ্টিভঙ্গীর সুপরিজ্ঞাত পার্থক্য সত্ত্বেও লখনউ কংগ্রেসের পর আপনি যখন ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যপদে আমাদের নিয়োগ করেন, তখন আমরা আশা করেছিলাম যে একটা মিলিত কর্মপন্থা স্থির করে নেওয়া সম্ভব হবে, এবং মতপার্থক্যের কথা ভুলে গিয়ে ও যে-যে বিষয়ে আমাদের মতৈক্য হবে তার উপরে

দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে মিলেমিশে আমরা কাজ করতে পারব। নিজেদের খাপ খাইয়ে নেবার জন্য যথাসাধ্য আমরা চেষ্টা করে আসছি, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এমন কোনও সামঞ্জস্য সম্ভব হয়নি, পৃথক মতাবলম্বী দুই পক্ষ যাতে মিলেমিশে কাজ করতে অথবা মিলিতকণ্ঠ হয়ে কথা বলতে পারে। আমরা মনে করি যে বিশেষ করে এই সময়ে, কংগ্রেস যখন সমাজবাদের প্রস্তাব গ্রহণ করেনি তখন তার সভাপতি ও ওয়ার্কিং কমিটির অন্যান্য সমাজবাদী সদস্য যে সমাজবাদ প্রচার করছেন ও তার উপরে গুরুত্ব আরোপ করছেন, এতে করে দেশের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হবে। আমাদের সকলেরই মনে হয় যে দেশের প্রথম ও চূড়ান্ত লক্ষ্য এখন স্বাধীনতা। সেই স্বাধীনতা লাভের জন্য যে জাতীয় সংগ্রামে আমরা নিরত রয়েছি, তারও সাফল্যের সম্ভাবনা এতে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আপনারও এই ধারণা বলে মনে হয়, এবং এ-ধারণা আপনি ব্যক্তও করেছেন যে আপনার ইচ্ছানুযায়ী ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করা হয়নি, পক্ষান্তরে এই কমিটিকে আপনার উপরে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে, এবং আপন ইচ্ছার বিরুদ্ধে একে আপনি মেনে নিয়েছেন। লখনউর ঘটনাবলী সম্পর্কে আমাদের ধারণা কিন্তু আপনার ধারণার বিপরীত। আমাদের কেউই [আপনার] উপরে সামান্যতম চাপ দিয়েছে বলেও আমরা জানি না। যা-ই হক, আপনার ঘোষণাবলীর দ্বারা যে-অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে তা অত্যন্তই অসন্তোষ-জনক, এবং যে-সব সহকর্মীকে আপনি বিঘ্ন বলে গণ্য করেন, ওয়ার্কিং কমিটিতে তাঁদের উপস্থিতির ফলে আপনার কাজের ব্যাঘাত ঘটছে, এ-কথা যাতে আপনার মনে না হয়, তার জন্য আমরা মনে করি যে কাজের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আপনাকে আমাদের দেওয়া উচিত। পক্ষান্তরে এও আমরা মনে করি যে ১৯২০ সন থেকে কংগ্রেস যে-সব আদর্শ, কর্মপন্থা ও নীতি অনুসরণ করে আসছে, এবং বিশেষ করে বর্তমান অবস্থায় যে-সব আদর্শ কর্মপন্থা ও নীতিকে আমাদের দেশের পক্ষে সর্বোত্তম বলে আমরা বিবেচনা করি, এবং ইতিমধ্যেই যা প্রভূত ফলপ্রসূ হয়েছে, কংগ্রেসের পক্ষে এখনও তাকেই অনুসরণ করা কর্তব্য। আমাদের অভিমত এই যে আপনার ও অন্যান্য সমাজবাদী সহকর্মীর বক্তৃতার ফলে, এবং সেইসব বক্তৃতায় উৎসাহিত হয়ে অন্যান্য সমাজবাদীরা যে-সব কাজ করেছেন তার ফলে দেশের সর্বত্রই কংগ্রেস সংগঠন দুর্বল হয়ে পড়েছে; এবং এমন কোনও লাভ তার হয়নি যাকে এর ক্ষতিপূরণ হিসেবে গণ্য করা যায়। জাতির আশু রাজনৈতিক কর্তব্য, বিশেষত নির্বাচনী কর্মসূচী সম্পর্কে আপনি যে-সব কথা প্রচার করেছেন, তার ফলাফল অত্যন্তই ক্ষতিকর হয়েছে; এবং আমরা মনে করি, যে-অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে তাতে আসন্ন নির্বাচনের ব্যাপারে সংগঠন ও সংগ্রামের দায়িত্ব গ্রহণ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

আত্যন্তিক অনিচ্ছাসত্ত্বেও এ-কারণে ওয়ার্কিং কমিটি থেকে আমরা পদত্যাগের সিদ্ধান্ত করেছি। প্রভূত চিন্তার পর যে-ব্যবস্থা অবলম্বনের সিদ্ধান্ত আমরা করেছি, আপনার ও আমাদের নিজেদের দিক থেকে এটা সুসঙ্গত ব্যবস্থা বলেই আমাদের মনে হয়, এবং আমাদের বিবেচনায় দেশেরও এতে সর্বাধিক মঙ্গল হবে।

রাজেন্দ্র প্রসাদ
সি. রাজাগোপালাচারী
জয়রামদাস দৌলতরাম
যমুনালাল বাজাজ

বল্লভভাই প্যাটেল
জে. বি. কৃপালনী
এস. ডি. দেব

১৪৮ রাজেন্দ্র প্রসাদ কর্তৃক লিখিত

ওয়ার্ধা,
১ জুলাই, ১৯৩৬

প্রিয় জওহরলালজী,

গতকাল আমাদের সাক্ষাৎ শেষ হবার পর মহাত্মাজীর সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে আমাদের কথাবার্তা হয়েছে; নিজেদের মধ্যেও দীর্ঘকাল ধরে আমরা পরামর্শ করেছি। আমরা জানতে পারলাম যে আমরা যে ব্যবস্থা অবলম্বন করেছি, তাতে আপনি অত্যন্তই দুঃখিত হয়েছেন; বিশেষ করে আমাদের চিঠির বাচনভঙ্গিতে আপনি খুবই বেদনা পেয়েছেন। আপনাকে বিব্রত করবার অথবা দুঃখ দেবার কোনও উদ্দেশ্যই আমাদের ছিল না, এবং আপনি যদি এমন কোনও আভাষ অথবা ইঙ্গিত দিতেন যে এতে আপনি দুঃখিত হয়েছেন, তাহলে বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে চিঠিখানির আমরা সংশোধন অথবা পরিবর্তন করতাম। কিন্তু সমগ্র অবস্থাকে পুনর্বিবেচনা করে আমরা এই চিঠি ও আমাদের পদত্যাগ প্রত্যাহার করবার সিদ্ধান্ত করেছি।

আমাদের পদত্যাগ আমরা প্রত্যাহার করছি; সুতরাং এই ব্যক্তিগত পত্রে আমাদের মনোভাবকে আরও বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করে ব্যাপারটাকে পরিষ্কারভাবে বিবৃত করবার অনুমতি আপনি নিশ্চয়ই আমাদের দেবেন। যে-চিঠি প্রকাশিত হতই, তাতে এত বিস্তারিতভাবে আমাদের মনোভাব বর্ণনা করা সম্ভব ছিল না। আপনাকে দুঃখ দেবার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নিয়ে এ-কাজ করতে বসিনি।

আমাদের মনে হয়েছে যে সংবাদপত্রে আপনার যে-সব বক্তৃতা প্রকাশিত হয়েছে, তাতে কংগ্রেসের সাধারণ কর্মসূচী সম্পর্কে তত কথা আপনি বলেননি, যতটা এমন এক বিষয় সম্পর্কে বলেছেন, কংগ্রেস কর্তৃক যা গৃহীত হয়নি। আমরা আশা করেছিলাম যে কংগ্রেস-সভাপতি হিসেবে কংগ্রেসের সংখ্যাগরিষ্ঠ পক্ষের মুখপাত্র হয়েই আপনি কথা বলবেন। কিন্তু এতে করে দেখা যাচ্ছে যে তা না করে ওয়ার্কিং কমিটি ও কংগ্রেসে আমাদের যে-সব সহকর্মী সংখ্যালঘুপক্ষভুক্ত, তাদের মুখপাত্র হিসেবেই আপনি কথা বলেছেন। অবশ্য এমনটা সম্ভব, এবং আপনি সে-কথা আমাদের বলেওছেন যে আপনার বক্তৃতার মধ্যে যে-অংশে সমাজবাদের কথা থাকে, শুধু সেইটুকুই প্রকাশ করা হয়, সংবাদপত্রগুলিতে বাকী অংশগুলিকে প্রাধান্য দেওয়া হয় না, কেননা সংবাদ হিসেবে তার মূল্য কম বলে বিবেচনা করা হয়। কিন্তু এ-কথা আমাদের মনে রাখতে হবে যে আপনার বক্তৃতার প্রকাশিত বিবরণ যারা পাঠ করে তাদের সংখ্যা শতগুণ বেশী, এবং আপনার বক্তৃতাবলীর এই বৃহত্তর শ্রোতৃবর্গের উপরে তার যে প্রভাব পড়ে, তা উপেক্ষা করা আপনার ঠিক হয় না।

আমাদের বিরুদ্ধে এক রীতিমত অবিশ্রান্ত অভিযান চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে। আমাদের সম্পর্কে এমন আচরণ করা হচ্ছে যেন আমাদের কার্যকাল শেষ হয়ে গিয়েছে; যে-সব ভাবনাচিন্তা পর্যুষিত ও বর্তমানকালে যার কোনও মূল্য নেই, যেন আমরা তারই প্রতিভূ; যেন দেশের অগ্রগতিকে আমরা শুধু বিঘ্নিতই করছি; যেন অন্যায়ভাবে আমরা ক্ষমতা অধিকার করেছি এবং ক্ষমতার ক্ষেত্র থেকে আমাদের বিতাড়িত করলেই সঙ্গত হয়। গান্ধীজীর সঙ্গে থাকাকালীন যে-সব আদর্শ, কর্ম-পন্থা ও কৌশল আমরা শিক্ষা করেছি, কোনও প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ক্ষমতা নিয়ে কাড়াকাড়ি করাকে তাতে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। আমাদের মনে হয়েছে যে অন্যরা আমাদের প্রতি এক বিরাট অবিচার করেছেন ও এখনও করছেন, এবং সহকর্মী ও সভাপতি হিসেবে আপনার কাছে যে-আশ্রয় পাবার ন্যায়সঙ্গত অধিকার আমাদের ছিল, তা আমরা পাচ্ছি না। আমাদের বিতাড়িত করবার জন্য যখন ব্যাপক প্রস্তুতি

চলছে, এবং আপনার উপস্থিতিতেই যখন সেই মর্মে ঘোষণা করা হয়, এবং ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসে যেমন বলা হয়েছিল তেমনভাবে যখন বলা হয় যে এইসব গোষ্ঠীর প্রতিই আপনি সহানুভূতিসম্পন্ন, তখন আমাদের মনে হয় যে এসব কথা যারা বলে, এতে শুধু তাদের মনোভাবেরই পরিচয় পাওয়া যায় না, কিছু পরিমাণে আপনার অভিমতেরও পরিচয় পাওয়া যায়। এতে আমরা বেদনাবোধ করি। তার কারণ কোনও ক্ষমতাকেই আঁকড়ে থাকবার কিছুমাত্র ইচ্ছে আমাদের নেই। ধাপে ধাপে এই কথাই আমরা মনে করতে বাধ্য হয়েছি যে সহকর্মী হিসেবে আপনার কাছ থেকে যে-পরিমাণ আস্থা পাওয়া আমাদের উচিত ছিল তা আমরা পাচ্ছি না, এবং আমাদের সম্পর্কে অথবা আমাদের মতামত সম্পর্কে আপনার আর কিছুমাত্র শ্রদ্ধা নেই। স্বভাবতই এর ফলে আমাদের মনে হয়েছে যে আপনি আমাদের একটা বিঘ্ন বলেই মনে করেন, এবং সেক্ষেত্রে আমরা যদি এই অবস্থায় আসীন থাকি, তার দ্বারা কোনও লাভ হবে না।

বোম্বাইয়ের মহিলা-সভায় আপনি যে বক্তৃতা দেন তার ফলে আমরা অনেকেই চমকিত হয়ে উঠি, এবং আমাদের মনে হয় আপনি ত হয়ত ভাবছেন যে আমাদের গ্রহণ করতে আমরা আপনাকে বাধ্য করেছি এবং আপন ইচ্ছার বিরুদ্ধেই বর্তমান ওয়ার্কিং কমিটিকে আপনার মেনে নিতে হয়েছে। এই যে আপনার মনোভাব, লখনউতে যদি এ-কথা আমরা জানতে পারতাম, ঘটনার গতি তাহলে অবশ্যই অন্য-রকমের হত।

গঠনাত্মক কার্যক্রমকে আমরা কংগ্রেসের কর্মসূচীর এক অবিচ্ছেদ্য ও গুরুত্বপূর্ণ অংশ বলেই মনে করি। এ-কথাও আমাদের মনে হয়েছে যে দেশের অবস্থা সম্পর্কে যে-রকম ব্যবস্থা আপনি অবলম্বন করছেন, গঠনাত্মক কার্যক্রম তাতে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

ব্যক্তিগত ব্যাপারের কথা সম্পূর্ণ ছেড়ে দিলেও অত্যন্তই তীব্রভাবে এ-কথা আমরা অনুভব করেছি যে গত ষোল সতের বছর যাবৎ যে আদর্শ ও নীতির জন্য আমরা সংগ্রাম করে এসেছি এবং দেশের পক্ষে যাকে আমরা একমাত্র সত্য আদর্শ ও নীতি বলে বিশ্বাস করি, অতি সুপরিকল্পিতভাবে তার ক্ষতিসাধন করা হচ্ছে, এবং এই খেলায় যারা নিরত রয়েছে, আপনার নিজের মনোভাব ও সহানুভূতি তাদেরই দিকে। আমাদের মনে হয়েছে, আমরা এর সঙ্গে সম্পর্কিত থাকার ফলে একটা ভুল ধারণার সৃষ্টি হচ্ছে এবং এক হিসেবে আমাদের অনিচ্ছাসত্ত্বেও আপন অজ্ঞাতসারে এ-কাজের আমরা সহায়তাই করছি। এই ধরনের কাজের ফলেই ধীরে ধীরে কংগ্রেস সংগঠন ও দেশে কংগ্রেসের মর্যাদা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে; তার কারণ সামগ্রিকভাবে দেশ এখনও পূর্বোক্ত আদর্শ ও নীতিতে আস্থা রাখে। এর ফলে কংগ্রেস দুর্বল হয়ে পড়ে, এবং কর্মীদের মধ্যে ঐক্যবিনাশী প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। এবং স্বভাবতই আগামী নির্বাচনে কংগ্রেসের সাফল্যের সম্ভাবনাও এতে হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। এ-ব্যাপারে আপনি ভিন্নমত পোষণ করেন। নির্বাচনের ফলাফল সম্পর্কে অবশ্য নিশ্চয় করে কিছু বলা যায় না, এবং এ-ব্যাপারে মতের পার্থক্য থাকা স্বাভাবিক। আমরা এই যুক্তির ন্যায্যতাকে মেনে নিয়েছি যে আমাদের পদত্যাগ ও তার ফলাফলের দ্বারা নির্বাচনে সাফল্যের সম্ভাবনা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত না হলেও হ্রাসপ্রাপ্ত যে হবে না, এ-বিষয়ে নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত যে-চূড়ান্ত ব্যবস্থা আমরা অবলম্বন করব ভাবছিলাম তা যেন আমরা না করি। আমাদের মধ্যে কয়েকজন মনে করেন যে আমাদের এই কাজের ফলে এমন সব ঘটনা ঘটা সম্ভব, যাতে করে নির্বাচনের ব্যাপারে অবস্থা আরও খারাপ হয়ে দাঁড়াবে, এবং এ-ব্যাপারে কোনও ঝুঁকি নেওয়া উচিত বলে আমরা মনে করি না। একই সঙ্গে অবস্থা সম্পর্কে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার

থেকেই আমাদের মনে এই আশঙ্কার সৃষ্টি হয়েছে যে কংগ্রেস সংগঠন ও শৃঙ্খলার সার্বিক শৈথিল্য ঘটেছে, এবং যে-পন্থা আপনার সর্বোত্তম বলে মনে হয় তদনুযায়ী আপনি যাতে এ সম্পর্কে ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারেন তার জন্য এ-বিষয়ে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করা আমাদের কর্তব্য বলে আমরা মনে করি।

আপনাকে বারংবার আমরা বলেছি যে বিশেষ কোনও একটি কাজ অথবা বক্তৃতার ফলে যে আমাদের মনে এই ধারণার সৃষ্টি হয়েছে তা নয়, সামগ্রিক কার্য-কলাপের ফলেই এই ধারণার সৃষ্টি হয়েছে; এবং আমাদের মনোভাব আপনি যাতে সম্যক অবগত থাকেন ও এ-বিষয়ে কিছু করবার প্রয়োজন বোধ করলে যে-ব্যবস্থা আপনার সর্বোত্তম বলে মনে হয় তা যাতে আপনি অবলম্বন করতে পারেন, তার জন্য খোলাখুলিভাবে এ-কথা আপনাকে জানান উচিত বলে আমরা মনে করি। আপনি এতে বেদনা পেয়েছেন, এজন্য আমরা দুঃখিত। অবস্থার আরও অবনতি হক, এ আমরা কখনও কামনা করি না। আশা করি এই চিঠিতে অবস্থা আরও খারাপ না হয়ে বরং পরিষ্কার হয়ে যাবে। সকলের সঙ্গে পরামর্শ করে এবং আমাদের সকলেরই পক্ষ থেকে এই চিঠি লিখছি। আমাদের দিক থেকে আমরা বলতে পারি, এই ঘটনার জন্য আমরা দায়ী বটে, তবে দেশের যাতে সর্বাধিক মঙ্গল হবে বলে আমরা মনে করি, সেই অনুযায়ীই এ-কাজ আমরা করেছিলাম। পদত্যাগ-পত্রটি সম্পর্কে আপনি ধরে নিতে পারেন যে আদৌ এটা আমরা পেশই করিনি। সুতরাং পদত্যাগপত্রটি দয়া করে ফিরিয়ে দেবেন।

বলা বাহুল্য, ব্যক্তিগতভাবে শুধু আপনার উদ্দেশেই এ-চিঠি লেখা হল। দপ্তরের নথিপত্রের অংশ হিসেবে এটাকে ব্যবহার করা হক, এ আমরা চাই না।

ভবদীয়
রাজেন্দ্র প্রসাদ

১৪৯ মহাত্মা গান্ধীকে লিখিত

এলাহাবাদ,
৫ জুলাই, ১৯৩৬

প্রিয় বাপু,

গতকাল রাত্রে এখানে এসে পৌঁছেছি। ওয়ার্ধা পরিত্যাগের পর থেকেই আমি শারীরিকভাবে দুর্বল ও মানসিকভাবে উদ্বিগ্ন বোধ করছি। অংশত দৈহিক কারণই যে এর জন্য দায়ী তাতে সন্দেহ নেই--ঠাণ্ডা লেগে আমার গলার অসুখ আরও বেড়েছে। কিন্তু অংশত এর অন্যান্য কিছু কারণও রয়েছে। এমন সব কারণ মন ও আত্মার উপরে যার প্রত্যক্ষ প্রভাব বর্তমান। ইউরোপ থেকে ফিরবার পর থেকেই আমি দেখতে পাচ্ছি, ওয়ার্কিং কমিটির সভার পর আমি অতন্তই ক্লান্ত বোধ করি। এই সভাগুলি আমার জীবনীশক্তিকে যেন দমিয়ে দেয়, এবং প্রতিটি সভার পরেই আমার মনে হয় যেন আমার বয়স আরও বেড়ে গিয়েছে। ওয়ার্কিং কমিটিতে যাঁরা আমার সহকর্মী, তাঁদেরও যদি এই রকমের অভিজ্ঞতা হয়ে থাকে, তাতে আমি বিস্মিত হব না। অভিজ্ঞতাটা অশুভ; এতে করে ভালাভাবে কাজকর্ম করা যায় না। ইউরোপ থেকে প্রত্যাবর্তনের পর আমাকে বলা হয়েছিল যে দেশের নৈতিক অবনয়ন ঘটেছে, এবং তারই ফলে আমাদের ধীরগতিতে এগোতে হচ্ছে। গত চার মাসে আমার যে সামান্য অভিজ্ঞতা হয়েছে, তাতে কিন্তু এই ধারণার সমর্থন পেলাম না। বস্তুত যেখানেই আমি গিয়েছি, সেখানেই আমি উচ্ছলিত জীবনীশক্তির পরিচয় পেয়েছি। জনগণ যেভাবে সাড়া দিয়েছে, তাতে আমি বিস্ময়বোধ করেছি। এর

কারণ কী, তা অবশ্য আমি নিশ্চয় করে বলতে পারব না। আমি শুধু নানারকমের অনুমান করতে পারি। স্বভাবতই জনতার এই উদ্দীপনা আমার মনে আশার সঞ্চার করেছে ও নূতন উদ্যমে আমাকে ভরিয়ে তুলেছে। কিন্তু ওয়ার্কিং কমিটির প্রতিটি বৈঠকেই আমার এই উদ্যম যেন চুপসে যায় এবং নিঃশেষিত ব্যাটারির মত আমাকে ফিরে আসতে হয়। শারীরিকভাবেও অসুস্থ ছিলাম বলে এবারে এই প্রতিক্রিয়া যেন তীব্রতম হয়ে দেখা দিয়েছিল।

তবে আমার শারীরিক অথবা মানসিক অবস্থা জানাবার অভিপ্রায়ে আপনাকে এই চিঠি লিখতে বসিনি। এর চাইতে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি বিষয়ে আমি উদ্বিগ্ন রয়েছি, এবং এ-যাবৎ আমি এর থেকে উদ্ধার লাভের পরিষ্কার কোনও পথ খুঁজে পাইনি। তাড়াহুড়া করে অথবা বিষয়টিকে সম্পূর্ণরূপে বিবেচনা না করে কোনও-কিছু আমি করতে চাই না। তবে কোন্ পথে আমি চিন্তা করছি, মনঃস্থির করবার পূর্বেই সেটা আপনাকে আমি জানাতে চাই।

গোলযোগ মিটিয়ে দেবার জন্য ও সংকট নিবারণে সাহায্য করবার জন্য যা-কিছু আপনি করেছেন, তার জন্য আপনার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। তখনও এ-বিষয়ে আমি নিশ্চিত ছিলাম এবং এখনও এ-কথা আমি নিশ্চয় করে জানি যে যে-অনৈক্য ঘটতে বসেছিল, নির্বাচনসমেত আমাদের সকলেরই কাজের পক্ষেই তার পরিণাম মারাত্মক হয়ে দাঁড়াত। কিন্তু এত করেও কোথায় এসে দাঁড়ালাম আমরা, এবং ভবিষ্যতেই বা কী আমরা আশা করতে পারি? রাজেনবাবুর চিঠিখানি (দ্বিতীয় চিঠি) এবং আমার বিরুদ্ধে তাঁর প্রচণ্ড অভিযোগ আমি আবার পড়লাম। এ-অভিযোগ প্রচণ্ড বটে, কিন্তু মহিলা-সভায় প্রদত্ত আমার বক্তৃতাটি ছাড়া এ-অভিযোগের স্পষ্ট কোনও কারণ তিনি দেখাননি। বস্তুত, মহিলা-সভায় যে বক্তৃতা আমি দিয়েছিলাম, তার সঙ্গেও বৃহত্তর কোনও সমস্যার যোগ নেই। আসল কথা হল এই যে, আমার কার্য-কলাপে কংগ্রেসের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হচ্ছে। যে-কাজ কংগ্রেসের ক্ষতি করছে, এবং নির্বাচনে তার জয়লাভের সম্ভাবনাও তাতে ক্ষীণ হচ্ছে। আমি যদি এই ধরণের কাজই করে যাই, অবস্থার তাতে আরও অবনতি ঘটবে, এবং এই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে আমার সহকর্মীরা কোনও ঝুঁকি নিতে চান না।

এখন বলাই বাহুল্য, এ-অভিযোগের মধ্যে যদি কিছুমাত্র সত্যতা থেকে থাকে, তার সম্মুখীন আমাকে হতেই হবে। বিষয়টি এতই গুরুতর যে একে উড়িয়ে দেওয়া চলে না। এর মধ্যে সাদা আর কালো, দু রঙের মিশ্রণ নেই, পরিণামগত শুভাশুভের সূক্ষ্ম বিচার এটা নয়। এর সবটাই কালো রঙে এঁকে দেখান হয়েছে, আর তাই এ-বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়াটাও সহজতর হবে। আসলে যত নরমভাবেই কথাটা বলা হয়ে থাক না, প্রকৃত বক্তব্য এই দাঁড়াচ্ছে যে আমি এক দুঃসহ আপদ-স্বরূপ, এবং কিছু দক্ষতা, উদ্যম, আগ্রহ আর ব্যক্তিত্ব—যার অস্পষ্ট কিছু আবেদন বর্তমান, এই যে সব গুণ আমার রয়েছে, এই গুণাবলীও বিপজ্জনক, কেননা অপাত্রে এগুলি ন্যস্ত হয়েছে। এর থেকে একটিমাত্র সিদ্ধান্ত করা যায়।

লখনউর আগে, এবং এমন কি কিছু-পরিমাণে লখনউতেও আমার এই ধারণা হয়েছিল যে এ-বছর মিলেমিশে কাজ চালিয়ে যাওয়াটা আমাদের পক্ষে শক্ত হবে না। এখন স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে যে আমি ভুল ধারণা করেছিলাম। দু পক্ষের কোনও পক্ষ থেকেই অবশ্য চেষ্টার কোনও ত্রুটি হয়নি। দোষ সম্ভবত আমারই। তবে আমার দোষ সম্পর্কে আমি সচেতন নই। নিজের দোষ অবশ্য কারও চোখেই পড়ে না। সে যা-ই হক, এ-কথা অনস্বীকার্য যে আত্মিক এমন কোনও আনুগত্য বর্তমানে নেই যা আমাদের সকলকে একত্র বেঁধে রাখতে পারে। এ একটা যান্ত্রিক সমষ্টি

হয়ে দাঁড়িয়েছে। দু পক্ষই চাপা অসন্তোষে ও আত্মনিরোধী মনোভাবে ক্ষুব্ধ হয়ে রয়েছেন। মনস্তত্ত্বের ছাত্রমাত্রেই জানেন যে এই অবস্থা থেকে ব্যক্তিগত ও সামাজিক নানাপ্রকারের অবাঞ্ছনীয় গূঢ়ৈষার সৃষ্টি হয়ে থাকে।

এবার যখন বোম্বাইয়ে গিয়ে পৌঁছই, তখন বহু লোকই অবাক বিস্ময়ে আমার দিকে দৃষ্টিপাত করেছিলেন। কীভাবে যে আমি সংকট কাটিয়ে উঠলাম, তাঁরা ভেবে পাচ্ছিলেন না। সকলেই যেন সেখানে জানতেন (টাইম্‌স অব ইণ্ডিয়ায় ইতি-পূর্বে এই সংবাদও প্রকাশিত হয়েছিল) যে এক শান্তিপূর্ণ নির্বাণ আমি লাভ করতে চলেছি। বলাই বাহুল্য এ-নির্বাণ রাজনৈতিক। সব ব্যবস্থাই ঠিক করে রাখা হয়েছিল, বাকী ছিল শুধু অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া। বিস্ময়বোধের এই হল কারণ। ভেবে অবাক হয়ে গেলাম যে সাধারণ বহু লোকও এত খবর রাখে, আর এইসব জোর গুজবের কিছুই আমি জানি না। কিন্তু আমি না জানলেও এইসব গুজব রটবার সুস্পষ্ট কারণ ছিল। বর্তমানে আমি যে কতখানি দূরে সরে এসেছি, এতেই তা বুঝতে পারা যাবে।

আমার বর্তমান চিন্তা-ভাবনা সম্পর্কে আমার গ্রন্থে ও তার পরেও আমি বিস্তারিতভাবে লিখেছি। আমাকে যদি বিচার করতে হয় ত তথ্যের অভাব হবে না। এ-সব চিন্তা ক্ষণকালের চিন্তা নয়। এরা আমারই এক অবিচ্ছেদ্য অংশস্বরূপ। ভবিষ্যতে হয়ত আমার চিন্তা-ভাবনার পরিবর্তন অথবা রদবদল ঘটবে, কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত তার প্রতি আমার নিষ্ঠা রয়েছে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে প্রকাশ না করে আমার উপায় নেই। বৃহত্তর ঐক্যের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করি বলেই যথাসম্ভব নম্রভাবেই এইসব চিন্তাকে আমি প্রকাশ করতে চেষ্টা করেছি। একটা অনড় সিদ্ধান্ত হিসাবে এগুলিকে আমি প্রকাশ করিনি; এমনভাবে প্রকাশ করেছিলাম, অন্যের চিন্তা যাতে উদ্রিক্ত হয়। এই যে মনোভাব, কংগ্রেসের কাজের সঙ্গে এর কোনও বিরোধ আমি দেখতে পাইনি। আর নির্বাচনের প্রসঙ্গে বলতে পারি, আমার এই মনোভাবের ফলে আমাদের লাভই হয়েছে, এ-মনোভাব জনসাধারণকে উৎসাহিত করে তুলেছে। কিন্তু এত নম্র ও অস্পষ্ট হওয়া সত্ত্বেও আমার সহকর্মীরা আমার এই মনোভাবকে বিপজ্জনক ও ক্ষতিকারক বলে মানে করেন। এমন কি, এ-কথাও আমাকে বলা হয়েছে যে সবসময়েই যে আমি ভারতবর্ষের দারিদ্র্য ও বেকার-সমস্যার উপরে গুরুত্ব আরোপ করি এটা বিচক্ষণতার পরিচায়ক নয়। অন্তত আমি যে-ভাবে এটা করছি, সেটা ঠিক নয়।

আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে, দিল্লি ও লখনউ—এই দু জায়গাতেই আমি পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছিলাম যে সামাজিক ব্যাপারে আমার মনোভাবের প্রকাশ করবার স্বাধীনতা আমার থাকবে। আপনি ও কমিটির সদস্যারা তাতে সম্মত হয়েছিলেন বলেই আমার ধারণা। প্রশ্নটা এখন আর ততটা মতামত-সংক্রান্ত নয়, যতটা মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা-সংক্রান্ত। তার চাইতেও বেশী। এ-প্রশ্ন জীবনের মূল্যবোধ-সংক্রান্ত প্রশ্ন। যার প্রতি আমরা প্রভূত মূল্য আরোপ করে থাকি, তাকে বর্জন করা আমাদের পক্ষে সম্ভব না-ও হতে পারে।

বিরোধ যে দেখা দিয়েছে, এ-কথা অনস্বীকার্য। কে সত্য আর কে ভ্রান্ত, এ নিয়ে তর্ক করা বৃথা। তবে ঠিক পথে আমরা চলছি কিনা, গত সপ্তাহের ঘটনাবলীর পর তা নিয়ে আমার মনে সন্দেহ দেখা দিয়েছে। আমার মনে হয় ব্যাপারটাকে সংক্ষেপে নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির পরবর্তী সভায় পেশ করে তার নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করাই এখন আমাদের পক্ষে সঙ্গত। ঠিক কীভাবে এটা করলে সব চাইতে ভাল হয়, সে-বিষয়ে এখনও আমার স্পষ্ট কোনও ধারণা নেই। তবে

বেশী যুক্তিতর্কের মধ্যে না গিয়ে যথাসাধ্য সহজভাবেই এ-কাজ করা উচিত হবে। আমার পক্ষ থেকে যুক্তিতর্ক আদৌ উত্থাপন করা হবে না বললেও চলে।

এর ফল সম্ভবত এই হবে যে আমি অবসর গ্রহণ করব, এবং অধিকতর ঐক্য-সম্পন্ন একটি কমিটি গঠিত হবে।

আপনি আমাকে বলেছিলেন, একটা বিবৃতি আপনি প্রচার করবেন। তা যদি করেন, আমি সুখী হব। তার কারণ আমি চাই যে, প্রতিটি বক্তব্যকেই স্পষ্টভাবে দেশের সম্মুখে পেশ করা হক।

এখনও কারও কাছে এ-ব্যাপারের আমি উল্লেখ করছি না। তবে আমি জানি যে আপনার হাতে গিয়ে পৌঁছবার আগেই উঁকি-মারা ধৃষ্ট কিছু-কিছু চোখ এ-চিঠি দেখে নেবে। কিন্তু তাদের সহ্য না করে উপায় নেই।

বোম্বাইয়ে মৃদুলার সঙ্গে আমার আলোচনা হয়েছে। বিশেষ করে আমার অনুরোধেই আমেদাবাদ থেকে কয়েক ঘণ্টার জন্য সে এসেছিল। তার কাছে জানতে পারি যে আপনি তাকে যা বলেছেন তার সঙ্গে আমি যা লিখেছি অথবা বলেছি তার তথ্যগত কোনও পার্থক্য সে লক্ষ্য করেনি (অথবা উল্লেখ করেনি)। বস্তুত আপনার কাছে লিখিত তার চিঠিতে সে স্পষ্টভাবে এ-কথা জানিয়েওছে। তবে সে-চিঠির দু-একটা বাক্য হয়ত আপনার চোখে পড়েনি। আপনি নিজে যাতে দেখতে পান, তার জন্য সে তার পূর্বেকার চিঠির একটি অনুলিপি আপনার কাছে পাঠাবে বলেছে।

ওয়ার্ধায় শুনলাম, গুজরাটী মেয়েরা নাকি বলাবলি করছে যে ওয়ার্কিং কমিটিতে যে মহিলা-সদস্য নেওয়া হয়নি, আপনি অথবা বল্লভভাই অথবা আপনারা দুজনেই তার জন্য দায়ী। এ-বিষয়ে মৃদুলার কাছে খোঁজ করেছিলাম। সে আমাকে বলল যে সে যতদূর জানে এমন কথা কেউ বলে না অথবা ভাবেও না।

এ-বিষয়ে সরোজিনীর সঙ্গেও আমার আলোচনা হয়েছে।

জীবরাজ মেহতা এবং খুর্শেদের সঙ্গে আমি দেখা করেছি। ব্যয়ভার ইত্যাদি সম্পর্কে জীবরাজ বিধানের সঙ্গে একমত নন। তবে তাঁর পূর্বের অংকটা তিনি কিছু-পরিমাণে কমিয়ে এনেছেন। এখন তিনি বলছেন যে নির্মাণ-কার্য, সরঞ্জাম ইত্যাদির জন্য ২ লাখই যথেষ্ট হওয়া উচিত। সংরক্ষিত তহবিল হিসেবে আরও ২ লাখ থাকলে তিনি খুশী হবেন। এই অভিমতও তিনি জানালেন যে আগের পরিকল্পনা অনুযায়ী স্বরাজ ভবনের জমিতে বাড়ি না তুলে আনন্দ ভবনের পুব দিককার জমিতে বাড়ি তোলা উচিত। এ-বিষয়ে মিউনিসিপ্যালিটিতে আমি খোঁজ নেব।

নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশনের সময় বোম্বাইয়ে কমলা মেমো-রিয়ালের ট্রাস্টীদেরও এক বৈঠক আহ্বান করতে আমি ইচ্ছুক। সেইসঙ্গে স্বরাজ ভবনের ট্রাস্টীদেরও বৈঠক আহ্বান করতে চাই।

বোম্বাইয়ে নার্গিস আমাকে পীড়াপীড়ি করে এক জার্মান গলরোগ-বিশেষজ্ঞের কাছে পাঠিয়েছিল। এই ভদ্রলোক আমাকে বলেছেন যে গলাকে বিশ্রাম দেবার জন্য এক সপ্তাহের জন্য আমাকে একেবারে চুপ করে থাকতে হবে। এ অতি কঠিন কাজ।

ভালবাসা জানাই।

আপনার স্নেহের
জওহরলাল

১৫০ মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক লিখিত

সেবাগ্রাম, ওয়ার্ধা,
৮ জুলাই, ১৯৩৬

প্রিয় জওহরলাল,

এইমাত্র তোমার চিঠি পেলাম। ওয়ার্ধার ঘটনাবলী সম্পর্কে সময় করে তোমার কাছে চিঠি লিখব ভাবছিলাম। তোমার চিঠি পাবার পর সে-কাজটা শক্ত হয়ে দাঁড়াল। আমি শুধু এইটুকু বলতে চাই যে প্রত্যাহার-পত্রটি যখন তোমাকে দেওয়া হয়, তখন তার যে-অর্থ তুমি করেছিলে, ওটির অর্থ আসলে তা নয়। চিঠিখানি আমি দেখবার পর তবেই তোমাকে পাঠান হয়েছিল। পদত্যাগের পরিবর্তে অনুরূপ একটি চিঠি পাঠাবার পরামর্শ আমিই দিয়েছিলাম। চিঠিখানির প্রতি তুমি আর-একটু সুবিচার করলেই আমি সুখী হব। সে যা-ই হক, আমার দৃঢ় অভিমত এই যে বছরের বাকী সময়টায় সমস্ত কলহ থেকে নিবৃত্ত থাকা উচিত, এবং কারও পদত্যাগ করা উচিত নয়। সংকটের সৃষ্টি হলে নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতি পঙ্গু ও ক্ষমতাহীন হয়ে পড়বে, এ সম্পর্কে কোনও ব্যবস্থাই সে করতে পারবে না। দুই বিরোধী ভাবাবেগের মধ্যে সে আন্দোলিত হতে থাকবে। নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতিকে ইতিপূর্বে কখনও সংকটের সম্মুখীন হতে হয়নি; এখন যদি গণতন্ত্রের দোহাই দিয়ে তাকে এক সংকটের সম্মুখীন করে দেওয়া হয় ত সে অত্যন্তই অন্যায় কাজ হবে। চিঠিখানির তাৎপর্যকে তুমি বাড়িয়ে দেখছ। তর্ক আমি করব না। তবে শান্ত চিত্তে অবস্থাটাকে বিবেচনা করে দেখবার জন্য এবং নৈরাশ্যের মুহূর্তে তার কাছে আত্মসমর্পণ না করবার জন্যই তোমাকে আমি অনুরোধ জানাব। নৈরাশ্য তোমাকে শোভা পায় না। ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে তোমার পরিহাসপ্রবণতার পরিচয় দেবে না কেন? এত বছর ধরে কিছুমাত্র বিবাদ না করে যাঁদের সঙ্গে কাজ করে এসেছ, তাঁদের সঙ্গে মিলেমিশে চলা তোমার পক্ষে এত শক্ত হবে কেন? তাঁরা যদি অসহিষ্ণুতার অপরাধে অপরাধী হয়ে থাকেন, সে-অপরাধ ত তোমারও কিছু কম নয়। তোমাদের পারস্পরিক অসহিষ্ণুতার জন্য দেশ যেন না ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

জার্মান বিশেষজ্ঞ অতি সঙ্গত উপদেশ দিয়েছেন। আশা করি সে-উপদেশ তুমি গ্রহণ করেছ।

ভালবাসা জানাই।

বাপু

১৫১ জে. বি. কৃপালনী কর্তৃক লিখিত

স্বরাজ ভবন, এলাহাবাদ,
১১ জুলাই, ১৯৩৬

প্রিয় জওহর,

বোম্বাই থেকে তুমি কিছুটা অসুস্থ হয়েই ফিরেছিলে। আমি তখন তোমাকে বিরক্ত করতে চাইনি। এখন তুমি আবার মোটামুটি স্বাভাবিক স্বাস্থ্য ফিরে পেয়েছ। তাই তোমাকে কয়েক ছত্র লিখছি।

ওয়ার্ধার এবারকার ঘটনার প্রতি তুমি যতখানি ব্যক্তিগত তাৎপর্য আরোপ করেছ, ততখানি ব্যক্তিগত তাৎপর্য তার নেই। আমার কাছে অন্তত এই ব্যাপারটার তাৎপর্য নিতান্তই রাজনৈতিক। এ-কথা আমি কখনও কল্পনাই করিনি যে আমার সহকর্মীদের সঙ্গে যোগদানের ফলে তোমার প্রতি আমার ব্যক্তিগত অনুরাগের অভাব সূচিত হয়েছে। তোমার বন্ধুত্বকে আমি সর্বদাই মূল্যবান বলে বিবেচনা করেছি।

এর ভিত্তি অবশ্যই রাজনৈতিক। কিন্তু তোমার সঙ্গে আমার দীর্ঘকালের ঘনিষ্ঠতা এই সম্পর্ককে বন্ধুত্বে পরিণত করেছে। এর পরিমাণ যে কতখানি তা তুমি না-ও জানতে পার। তার কারণ, কথায় কখনও তা প্রকাশ করা হয়নি। আজ হয়ত শুনে তুমি বিস্মিত হবে কিন্তু কথাটা সত্য যে তুমি মুক্ত ছিলে না বলে আমার বিবাহকে আমি দেড় বছরের জন্য পিছিয়ে দিয়েছিলাম। যে-ক্ষেত্রে এই অনুষ্ঠানে আর-কেউই উপস্থিত থাক বলে আমি চাইনি, সে-ক্ষেত্রে আমি চেয়েছিলাম যে তুমি উপস্থিত থাকবে। এ-সবই সুচেতাকে আমি বুঝিয়ে বলেছিলাম। আমার বয়সের কথা ভেবে স্বভাবতই সুচেতা যদিও আর অপেক্ষা করতে চাইছিল না, তবু সে আমার মনোভাব বুঝেছিল ও তা মেনে নিয়েছিল। খুর্শেদ বেন আমাদের দুজনেরই বন্ধু; তোমার প্রতি আমার অনুরক্তির কথা সে জানে।

বাপু বললেন, আমার জন্যই তুমি সর্বাধিক দুঃখ পেয়েছ। তোমার অভিযোগ এই যে মাঝে-মাঝেই আমাদের দেখা হওয়া সত্ত্বেও এ-সব কথা আমি তোমাকে জানাইনি। তোমার অভিযোগ যে অতি ন্যায্য, এ আমি স্বীকার করে নিচ্ছি। আমার দিক থেকে দুর্জ্ঞেয় এক লজ্জার কারণেই এ-সব কথা আমি তোমাকে জানাতে পারিনি। লখনউর পর থেকেই ভাবছি যে এ নিয়ে তোমার সঙ্গে কথা বলব। কিন্তু যে-ভাবেই হক, আমাদের গতিবিধি ও কাজের তাড়াহুড়ো ও চাপের জন্য আলোচনাটাকে ক্রমাগতই মুলতুবি রাখতে হয়েছে; কথা বলবার সুযোগ সৃষ্টি করে নিতে আমি পারিনি।

ওয়ার্ধার ঘটনা—আমি যতদূর জানি—আকস্মিক; এ-ঘটনা পূর্বপরিকল্পিত নয়। যাঁরা সই করেছেন, তাঁদের মানসিক প্রতিক্রিয়ার মধ্যে একটা ঐক্য ছিল। এ-কাজের যে কোনও ব্যক্তিগত তাৎপর্য থাকতে পারে, এ-কথা কেউ কল্পনাও করেনি। তুমি এ-কথা না জানতে পার, কিন্তু প্রথম চিঠিখানির প্রায় সবটাই এবং দ্বিতীয় চিঠিখানির সবটাই রাজেন্দ্রবাবু মুসাবিদা করেছেন। তুমি হয়ত শুনে বিস্মিত হবে, কিন্তু সত্যিই আমরা সকলেই মনে করছিলাম যে তুমি আমাদের একটা বিঘ্ন বলেই মনে কর, এবং পরিবর্তন যদি ঘটে, তুমি তাতে দুঃখিত হবে না। এও আমরা ভেবেছিলাম যে সমাজবাদীদের নিয়েই যে কার্য-পরিষদের পুনর্গঠন করতে হবে এমন কোনও কথা নেই, তবে সমাজবাদী দলের সঙ্গে যুক্ত না হয়েও মোটামুটি যাঁরা তোমার সঙ্গে একমত, এমন কিছু লোককে নিয়ে কার্য-পরিষদকে পুনর্গঠন করা যেতে পারে। সকলের কথা আমি বলতে পারি না, কিন্তু আমাদের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তিই এ-কথা ভাবেননি যে তুমি এতে—বিপর্যস্ত বোধ করা দূরে থাক—বিব্রত বোধ করবে। আমরা যে ভুল ভেবেছিলাম, ঘটনাবলীর দ্বারা সে-কথা প্রমাণিত হবার পর তোমাকে এত কথা এই কারণে জানাচ্ছি যে এর ফলে আপন অজ্ঞাতসারে বন্ধুদের প্রতি অবিচার না করে ঠিকমত তুমি তাদের কাজের বিচার করতে পারবে।

ব্যক্তিগত কৈফিয়ত হল এই। সম্প্রতি আমার যে রাজনৈতিক মনোভাবের কথা আমি প্রকাশ করেছি, স্বভাবতই তাতে তুমি বিস্মিত হয়েছ। বেশ কিছুকালের জন্য ঘটনাস্থল থেকে তুমি দূরে ছিলে। পটভূমিকা সম্পর্কে তোমার যে ধারণা রয়েছে, তা খুব স্পষ্ট নয়। সমাজবাদী বন্ধুদের সঙ্গে মতবিরোধ ঘটেছে বোম্বাই কংগ্রেসের আগেই। এমন কি এ-মতবিরোধ পুনা সম্মেলনের আগেই দেখা দেয়। তুমি হয়ত জান যে আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহার করা সম্পর্কে পুনা সম্মেলনে তারা যা বলেছিল, তার বিরুদ্ধে আমিই ছিলাম প্রধান বক্তা। বরং বলা যায় একমাত্র বক্তা। এ-কথাও হয়ত তুমি জান যে কতিপয় বন্ধু—বিশেষ করে ভুলাভাই ও অন্য

কয়েকজন—আমার এই বিরোধিতাকে পছন্দ করেননি। দপ্তর গ্রহণের অনেক আগে থেকেই আমি তাঁদের বিরোধিতা করেছি। এই বিরোধিতার কারণ—এবং প্রসঙ্গত আমার মনোভাব—তোমাকে সংক্ষেপে জানাচ্ছি।

বাপুর মর্যাদা হানি করবার চেষ্টা এবং তাঁর নীতিকে আক্রমণ করাকে আমি এক বিরাট প্রমাদ বলেই গণ্য করি। আমি বিশ্বাস করি যে তিনি যদি বেঁচে থাকেন, তাহলে সংগ্রামের জন্য আবার তাঁকে আমাদের প্রয়োজন হবে। আমি জানি, সংগ্রামে অবতীর্ণ হবার জন্য তিনি ব্যাকুল হয়ে উঠেছেন। এখন তিনি শুধু উপযুক্ত সময়ের প্রতীক্ষায় আছেন। এ-কারণে, তাঁর প্রভাবহানির চেষ্টা করলে অথবা তাঁর পরিকল্পনা সম্পর্কে ঠাট্টাবিদ্রূপ করলে রাজনৈতিক ব্যাপারে সেটা মূঢ়তারই পরিচায়ক হবে। অথচ সমাজবাদীরা ব্যক্তিগতভাবে ও সম্মিলিতভাবে এই কাজই করেছে, ও এখনও করছে।

আমি বিশ্বাস করি যে এক হিসেবে আমিও সমাজবাদী। রাশিয়ায় যা সম্ভব হয়েছে, অনেকের মত আমিও সে সম্পর্কে স্বভাবতই শ্রদ্ধাশীল। এ-বিষয়ে উল্লেখ-যোগ্য অধিকাংশ বই-ই আমি পড়েছি। কিন্তু ভাবুক মানুষ আমি ততটা নই, যতটা কাজের মানুষ। এ-কারণে, কবে আমার চোখের সামনে সম্পূর্ণ চিত্রটা ফুটে উঠবে, কাজ শুরু না করে তার জন্য আমি প্রতীক্ষায় বসে থাকতে পারি না। কোনও সংস্কারকই কখনও তা করেছেন অথবা করতে পারেন বলে আমার মনে হয় না। আর যদিই বা তা কেউ করেন ত আমার মনে হয়, তিনি দেখতে পাবেন যে তাঁর কাজের শক্তি নষ্ট হয়ে গিয়েছে। শিল্পীরা ত বস্তুনিষ্ঠ হবার জন্য তাঁদের চিত্রের মধ্যে সমস্ত-কিছুকে প্রকাশ করেন না বা সমস্ত-কিছু খুঁটিনাটিকে তার মধ্যে এনে ঢোকান না। আমাদেরও শিল্পীর মত হওয়া প্রয়োজন। যা-কিছু দূরে রয়েছে, কর্মী হিসেবে আমি তাই তার সম্পর্কে কিছুটা অসহিষ্ণু। উপস্থিত মুহূর্তই আমার সমস্ত মনোযোগ ও কাজকে আচ্ছন্ন করে রাখে। উপস্থিত মুহূর্ত বলতে সংকীর্ণ আদর্শহীন কিছু আমি বোঝাচ্ছি না; উপস্থিত মুহূর্ত বলতে বাস্তববাদী সংস্কারক যা বোঝেন, তাকেই বোঝাচ্ছি। আমি বিশ্বাস করি যে জাতীয়তাবাদ একটা পর্যুষিত আদর্শ নয়; বিশেষ করে আজকের ভারতবর্ষে ত নয়ই। যতদিন না আমরা রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করতে পারছি, ততদিন পর্যন্ত এ-আদর্শ বাসী হয়ে যাবে না বলেই আমি বিশ্বাস করি। এ-কারণে এই বিশ্বাসও আমি রাখি যে সমস্ত শ্রেণী এবং প্রায় সমস্ত স্বার্থকেই এই আদর্শের পরিপূরণে নিয়োগ করা যেতে পারে, এবং এরই ভিত্তিতে একটি সম্মিলিত কর্মক্ষেত্রও রচনা করা সম্ভব। আমি বিশ্বাস করি যে স্বাধীনতার আদর্শ এক যথেষ্টই উদ্দীপনাময় আদর্শ, এবং সে-আদর্শের পরিপূরণ সহজসাধ্য নয়। আমি বিশ্বাস করি যে এই আদর্শ ভারত-বর্ষের সমস্ত শ্রেণীর হৃদয়ে এখনও প্রবেশ করেনি। এ-কারণে সাধারণ মানুষের দৃষ্টিপথে আরও সুদূর কোনও লক্ষ্য তুলে ধরতে আমি ভয় পাই, পাছে তাদের একাগ্রতা তাতে বিনষ্ট হয়। একাগ্রতা নষ্ট হলে তাদের কর্মশক্তিও নষ্ট হবে। এ-সত্য আংশিক সত্য। তাই আমি জানি যে যুক্তির জোরে একে খণ্ডন করা সম্ভব। কিন্তু, বিশ্বাস যখন কর্মের রূপ নেয়, সাময়িকভাবে খণ্ডসত্যও তখন পূর্ণ-সত্য হয়ে উঠতে পারে।

এ-কথাও আমি বিশ্বাস করি যে আমরা একটা ক্ষয়িষ্ণু জাতি নই। এমন কিছু মূল্যবোধ আমাদের আছে, যার আয়ুষ্কাল শেষ হয়ে গিয়েছে বলে আমি মনে করি না। মনস্তাত্ত্বিক মুহূর্তে বাপু যেমন করেছিলেন, আমার দেশবাসীও নিজেদের জন্য তেমন-কিছু একটা উদ্ভাবন করে নিতে পারবে, তাদের বুদ্ধির উপরে এই

আস্থা আমি রাখি। সেটা যে ঠিক কী হবে, তা আমি জানি না। তবে যাঁদের চিন্তা, আদর্শ ও কর্মপন্থা সম্পূর্ণরূপেই বিদেশ থেকে আমদানীকৃত, তাঁদের সুদৃঢ় আস্থা যা-ই হক না কেন, আপাতত আমি তাঁদের কাউকেই বিশ্বাস করি না। দুর্ভাগ্যবশত, আমি বিশ্বাস করি যে আমার তরুণ সমাজবাদী বন্ধুদের সকলের সম্পর্কেই এ-কথা খাটে।

প্রবীণতর গোষ্ঠী অতীতে যতই না কেন যোগ্যতর পরিচয় দিয়ে থাকুন, তাঁদের চাইতে এই তরুণদের সঙ্গেই আজ তুমি বেশী মতৈক্য খুঁজে পেয়েছ বলে আমার বিশ্বাস। তরুণদের সান্নিধ্যেই তুমি বেশী স্বস্তি বোধ কর। আদর্শগতভাবে বাপুর চাইতে তোমার সঙ্গেই তাদের বেশী মিল। সমাজবাদীরা যে-ভাবে মৈত্রী স্থাপন করেন, তাতেও আমার অনাস্থা। তাঁদের মৈত্রী সাময়িক। পুণায় তাঁরা যমুনাদাস নামক জনৈক ব্যক্তির সহায়তা নিয়েছিলেন। আশু ব্যাপারে সাময়িক একটা সুবিধা লাভ করলে পাঞ্জাব ও বাংলার সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের সঙ্গে হাত মেলাতেও তাঁদের আপত্তি নেই। ভারতীয় রাজনীতিতে একে আমি বিপজ্জনক মনে করি। এই বিপজ্জনক ব্যাপারের হাত থেকে বাপু আমাদের অনেকখানিই রক্ষা করেছেন বলে আমার বিশ্বাস। আমি জানি যে বাপুর অনুগামীরাও এ-কাজ করে থাকে। পার্থক্যটা শুধু মাত্রার। আমার বিশ্বাস ভ্রান্ত হতে পারে, কিন্তু আমি বিশ্বাস করি যে সমাজবাদী বন্ধুরাই এ-খেলায় সর্বাধিক নৈপুণ্য দেখিয়েছেন। চরিত্রহীন, সাহস-হীন ও অধঃপতিত একটা দেশের পক্ষে এ-খেলা অতি মারাত্মক।

আদর্শগতভাবে যে-দল বাপুর অধিকতর নিকটবর্তী, এ-কারণে স্বভাবতই আমি তাঁদের সঙ্গে যোগ দিয়েছি। গত বছর ভিতর থেকে এই দলের সঙ্গে আমি যে সংগ্রাম করেছি, সমাজবাদী বন্ধুরাও সে-কথা ভালভাবেই জানেন। কিন্তু আজ আমি দেখছি যে যতই ত্রুটিপূর্ণভাবে হক, একমাত্র সেই দলটিই গঠনাত্মক কার্যক্রম ও মোটামুটিভাবে বাপুর মতবাদকে সমর্থন করছে, এবং ভারতীয় রাজনীতিতে বাপুর প্রয়োজন যে সমানই রয়েছে, একমাত্র সেই দলটিই এ-কথা বলছে। শুনে তুমি বিস্মিত হবে, লখনউতে আমি যখন শুনলাম যে ভুলাভাইকে ওয়ার্কিং কমিটিতে গ্রহণ করবার কথা চিন্তা করা হচ্ছে, তখন জয়রামদাসের সঙ্গে এ-বিষয়ে আমার কথা হয়, এবং দুজনেই আমরা দ্রুত বাপুর কাছে গিয়ে বল্লভভাইয়ের সম্মুখেই এ-বিষয়ে আমাদের মতামত অত্যন্ত দৃঢ়ভাবেই বাপুকে জানাই। যমুনালালজীও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। বাপু তখন আমাদের পি. বোর্ডের অবসানের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বললেন যে ঐ বোর্ডের কার্যক্রমের প্রতিনিধি হিসেবে কাউকে রাখতেই হবে। যা-ই হক, তাঁকে অথবা 'ব' অথবা শেঠজীকে আমরা কিছুমাত্র টলাতে পারলাম না। সমাজবাদী বন্ধুদের যখন গ্রহণ করা হয়, তখন আমরা অনুরূপ কোনও আপত্তি তুলিনি।

গত দু-তিন বছর ধরে যে-পথে আমি চিন্তা করছি, সংক্ষেপে তা তোমাকে জানাবার চেষ্টা করলাম। যে-সব কথা লিখলাম, তা যে তোমার ভাল লাগবে, এমন আশা আমি করি না। তবে তোমার প্রতি আমার যে গভীর ভালবাসা ও শ্রদ্ধা বর্তমান, সে সম্পর্কে যে তোমার কোনও সন্দেহ নেই, শুধু এইটুকু জানলেই আমি সুখী হব। প্রকৃতই এ-কথা আমি বলতে পারি যে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে একমাত্র বাপু ছাড়া এমন আর কেউই নেই, তোমার চাইতে যাকে আমি বেশী ভালবাসি অথবা শ্রদ্ধা করি।

চিঠিখানি দীর্ঘ হয়ে গেল। কিন্তু তার জন্য আমি সঙ্কুচিত নই। কেননা, বলতে গেলে আমার মনের কথা এখনও প্রায় কিছুই বলা হয়নি। এর ফলে, আমরা

যাতে সবিস্তারে এ-সব বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে পারি, তার জন্য যদি আমাদের সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা হয়, তাহলে সেই সুযোগকে আমি স্বাগত জানাব। তার একমাত্র ফল যদি এই হয় যে ভবিষ্যতে রাজনীতিক্ষেত্রে যে-কাজ করতেই আমি বাধ্য হই না কেন, আমার ব্যক্তিগত অনুরাগ সম্পর্কে তুমি সন্দিহান হবে না, তাতেই আমি সন্তুষ্ট হব।

চিরানুগত
জীবত

১৫২ সুভাষচন্দ্র বসু কর্তৃক লিখিত

C/o. দি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অব পুলিস,
দার্জিলিং,
৩০ জুন, ১৯৩৬

প্রিয় জওহর,

তোমার ২২ তারিখের চিঠি ২৭ তারিখে আমার হাতে পৌঁছেছে। চিঠিখানি পেয়ে খুশী হয়েছি। কাগজ পড়ে মনে হল তুমি অত্যধিক পরিশ্রম করছ। তোমার স্বাস্থ্যের কথা ভেবে তাই উদ্বিগ্নও হয়েছিলাম। অল্পকালের জন্য হলেও তুমি যে বিশ্রাম নিতে মুসৌরি গিয়েছিলে, এ-কথা জেনে আমি সুখী হয়েছি। অত্যধিক পরিশ্রম না করা যে তোমার পক্ষে কতখানি শক্ত, তা আমি বুঝি; তবুও আশা রাখি যে নিজেকে তুমি খুব-বেশী ক্লান্ত করে ফেলবে না। তুমি যদি অসুস্থ হয়ে পড়, সকলেই তাতে অসুবিধেয় পড়বে।

তোমার ভগ্নীপতি রঞ্জিতের সম্পর্কে যা জানিয়েছ, তা অতি উদ্বেগজনক। যা-ই হক, ডাক্তাররা যে গুরুতর কিছু আশংকা করেন না, এ-কথা জেনে কিছুটা আশ্বস্ত হয়েছি। বায়ু-পরিবর্তন ও বিশ্রামের ফলে তিনি সুস্থ হয়ে উঠবেন আশা করি।

আমি এখানে মোটামুটি ভালই আছি। অল্প-কিছুটা পেটের গোলমাল চলছে। সেইসঙ্গে ফ্লুতেও ভুগে উঠলাম (এটা অবশ্য নিছক জীবাণুঘটিত গলরোগও হতে পারে)। তবে ধীরে ধীরে এ সমস্তই সেরে যাবে।

তোমার লাইব্রেরিতে যদি নীচের বইগুলির কিছু-কিছু থাকে, এবং এগুলি দিতে যদি তোমার অসুবিধে না হয়, তাহলে এক-এক দফায় একটি-দুটি করে পাঠিও।

১। গর্ডন ঈস্ট প্রণীত হিস্টরিক্যাল জিয়োগ্রাফি অব ইউরোপ।
২। পিট রিভার্স প্রণীত ক্ল্যাশ অব কালচার্স অ্যাণ্ড কনট্যাক্ট অব রেসেস।
৩। জে. এ. স্পেণ্ডার প্রণীত শর্ট হিস্ট্রি অব আওয়ার টাইমস্।
৪। আর. পি. দত্ত প্রণীত ওয়র্ল্ড পলিটিক্স ১৯১৮-৩৫।
৫। জে. বি. এস. হলডেন প্রণীত সায়েন্স অ্যাণ্ড দি ফিউচার
৬। হাক্সলি প্রণীত আফ্রিকা ভীউ।
৭। র‍্যাল্‌ফ ফক্স প্রণীত জেঙ্গিস (চেঙ্গিস) খান।
৮। বার্নেস প্রণীত দি ডিউটি অব এম্পায়ার।

সম্প্রতি যে-সব কৌতূহলোদ্দীপক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে, উল্লিখিত বইগুলির পরিবর্তে সেগুলিও কোন-কোনটি পাঠাতে পার। চিঠিপত্র অথবা বই C/o. সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অব পুলিস, দার্জিলিং, এই ঠিকানায় পাঠাতে হবে।

আশা করি তুমি এখন আগের চাইতে ভাল আছ।

ভালবাসা জানাই।

স্নেহানুরক্ত
সুভাষ

পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু,
এলাহাবাদ

পরীক্ষান্তে প্রেরিত
স্বাঃ.................
সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট অব পুলিস,
দার্জিলিং

১৫৩ মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক লিখিত

আমাদ্বারা সংশোধিত নয়

সেবাগ্রাম,
১৫ জুলাই, ১৯৩৬

প্রিয় জওহরলাল,

১। টি অব আই-র চিঠি সম্পর্কে আমার তার আশা করি তুমি পেয়েছ। গতকল্য এটি সংগ্রহ করে আমি আদ্যন্ত পাঠ করি। এর বিষয়বস্তু সম্পর্কে কেউই কখনও আমাকে কিছু লিখে জানায়নি। চিঠিখানি পড়ে আমার এই বিশ্বাসই দৃঢ় হল যে, তোমার যে মানহানি করা হয়েছে, সে-সম্পর্কে তোমার আইনগত ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত।

২। তুমি যদি আমাকে ভুল না বোঝ ত বলি, ব্যক্তি-স্বাধীনতা সঙ্ঘের সঙ্গে তুমি আমাকে জড়িত না করলেই আমি সুখী হব। আপাতত কোনও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে আমি যোগ দিতে চাই না। আর তা ছাড়া বরাবর যে-ব্যক্তি আইন অমান্য করে আসছে, তার এতে যোগদানের কোনও সার্থকতাও নেই। সঙ্ঘে আমি যোগদান করি আর না-ই করি, সে-কথা ছেড়ে দিলেও আরও গভীরভাবে বিবেচনা করবার পর আমার এই অভিমতই দৃঢ় হয়েছে যে সরোজিনীকে এর প্রেসিডেণ্ট করাটা ভুল হবে। বস্তুত কোনও আইন-অমান্যকারীকেই এর প্রেসিডেণ্ট করা ঠিক হবে না। এখনও আমার অভিমত এই যে শাসনতন্ত্র সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ কোনও খ্যাতনামা ব্যবহারজীবীকেই এর প্রেসিডেণ্ট করা উচিত। আর তা যদি তোমার পছন্দ না হয় ত এমন একজন খ্যাতনামা লেখককে তোমার প্রেসিডেণ্ট করা উচিত, যিনি আইন-অমান্যকারী নন। সদস্য-সংখ্যা সীমাবদ্ধ রাখতেও আমি তোমাকে অনুরোধ জানাব। উৎকর্ষে তোমার প্রয়োজন, সংখ্যায় নয়।

৩। তোমার চিঠিখানি মর্মস্পর্শী। তোমার ধারণা, তোমার প্রতিই সব চাইতে অন্যায় করা হয়েছে। প্রকৃত ব্যাপার এই যে তোমার সহকর্মীরা তোমার মতন সাহস ও খোলাখুলি মনোভাবের পরিচয় দিতে পারেননি। তার ফল হয়েছে মারাত্মক। আমি সব সময়েই তাঁদের বুঝিয়েছি যে, তাঁরা যেন খোলাখুলিভাবে ও অকুতোভয়ে তাঁদের মনের কথা তোমাকে বলেন। কিন্তু সাহস না থাকার ফলে যখনই তাঁরা কথা বলেছেন, অতি অগোছালোভাবে বলেছেন, এবং তুমি বিরক্ত বোধ করেছ। তুমি সহজে বিরক্ত হও; তাঁদের তুমি সহ্যও করতে পার না; তাই তোমাকে তাঁরা ভয় পেয়ে এসেছেন। তোমার তিরস্কারে ও দাপটে তাঁরা ক্ষুব্ধ হয়েছেন। সর্বোপরি তোমার ভাবে তাঁদের মনে হয়েছে যেন নিজেকে তুমি অভ্রান্ত বলে মনে কর ও তাঁদের চাইতে অনেক বেশী বোঝ। তাঁদের মতে এ তোমার অন্যায় দাবি। তাঁদের ধারণা, কিছুমাত্র সৌজন্য তুমি তাঁদের দেখাওনি, এবং সমাজবাদীদের ব্যঙ্গবিদ্রূপ ও অপব্যাখ্যার হাত থেকে তুমি কখনও তাঁদের রক্ষা করনি।

তোমার অভিযোগ এই যে তোমার কার্যকলাপকে তাঁরা অনিষ্টজনক বলেছেন। তার অর্থ ত এই নয় যে তুমি অনিষ্টকারী। তোমার গুণাবলী অথবা কাজের সমালোচনা করবার উদ্দেশ্য নিয়ে তারা চিঠি লেখেননি। তোমার গতিময়তা এবং

দেশের জনসাধারণ ও যুবসমাজের উপর তোমার প্রভাব সম্পর্কে তাঁরা সম্পূর্ণই সচেতন। তোমাকে ছাড়া যে চলবে না, তা তাঁরা জানেন। এইজন্যই তাঁরা তোমাকে পথ ছেড়ে দিতে চেয়েছিলেন।

গোটা ব্যাপারটাকেই আমার একটা বিয়োগাদ্য প্রহসন বলে মনে হচ্ছে। এ-কারণে লঘুচিত্তেই এই সমগ্র ব্যাপারটাকে দেখবার জন্য আমি তোমাকে অনুরোধ জানাব। নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতিকে যদি ব্যাপারটা তুমি জানাও, তাতে আমার মনে করবার কিছু নেই। কিন্তু তোমার পারিবারিক ব্যাপারে সালিশি করবার অথবা তাঁদের ও তোমার মধ্যে একপক্ষকে বেছে নেবার দুর্বহ দায়িত্ব তুমি নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির উপর অর্পণ কর, এ আমি চাই না। যা-ই কর না কেন, কাজকর্ম নিজে সম্পন্ন করে তবেই তোমাকে নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির সম্মুখীন হতে হবে।

প্রতিটি সাব-কমিটি ইত্যাদিতে তাঁদের সংখ্যাধিক্য ঘটেছে, এ নিয়ে তুমি আপত্তি করছ কেন? এইটেই কি সব চাইতে স্বাভাবিক ব্যাপার নয়? সর্বসম্মতিক্রমে তাঁরা তোমাকে দপ্তরের জন্য নির্বাচিত করেছেন বটে, কিন্তু এখনও তুমি ক্ষমতা হাতে পাওনি। অন্যভাবে ক্ষমতা পেতে তোমার যত সময় লাগত, তার চাইতে কম সময়ে তুমি যাতে ক্ষমতা পাও, এইজন্যই তোমাকে দপ্তর দেওয়া হয়েছে। কণ্টক-মুকুটের জন্য আমি যখন তোমার নাম প্রস্তাব করি, তখন অন্তত এই কথাই আমার মনে ছিল। মাথায় যদি কাঁটার আঘাত লেগেও থাকে, তবু এ-মুকুট মাথায় করেই রেখ। কমিটির সভাগুলিতে আবার তোমার পরিহাসপ্রবণতার পরিচয় দাও। সেইটেই তোমার স্বাভাবিক ভূমিকা। তুচ্ছতম ব্যাপারে যে ক্রোধে ফেটে পড়তে উদ্যত হয়, সেই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত, সদাবিরক্ত মানুষের ভূমিকা তোমার নয়।

শুনেছি নববর্ষের দিনে লাহোরে নাকি তুমি ত্রিবর্ণ পতাকা ঘিরে নৃত্য করেছিলে। তুমি যদি আমাকে তার করে জানাও যে সেদিন তুমি যতখানি উৎফুল্ল ছিলে, আমার চিঠি পড়বার পর আবারও তুমি ততখানি উৎফুল্ল হয়ে উঠেছ, তাহলে খুব খুশী হব।

তোমার গলাকে একবার বিশ্রাম দিতেই হবে।

আমি আমার বিবৃতিটির পুনর্মার্জনা করছি। স্থির করেছি যে তুমি না দেখা পর্যন্ত এটি আমি প্রকাশ করব না।

স্থির করেছি একমাত্র মহাদেব ছাড়া আর কেউই আমাদের চিঠিপত্র দেখবে না।

ভালবাসা জানাই।

বাপু

১৫৪ আর্নস্ট টলার কর্তৃক লিখিত

লণ্ডন,
২১ জুলাই, ১৯৩৬

প্রিয় নেহরু,

তোমার চিঠির জন্য ধন্যবাদ জানাই। গত সপ্তাহের বিভিন্ন সমালোচনায় আমাদের নাম যে একই সঙ্গে একবার উল্লেখিত হয়েছে, আমিও তার জন্য গর্ববোধ করছি। এ-যাবৎ যতগুলি আত্মজীবনী আমি দেখেছি, তোমারটি তার মধ্যে সেরা কয়েক-খানির অন্যতম। এতে যে শুধু বিরাট এক ব্যক্তিত্বেরই পরিচয় পাওয়া যায় তা নয়, বাইরের এবং ভিতরের বন্ধন থেকে মুক্ত হবার জন্য তোমার দেশবাসীরা যে মহান সংগ্রামে নিরত রয়েছে, তারও পরিচয় এতে পাওয়া যায়। তোমার বইখানি পড়তে পড়তে বারবার আমাদের ভাবনাগত ঐক্যকে আমি অনুভব করেছি। মাঝে-

মাঝেই আমার মনে হয় যে যারা কারাজীবন যাপন করেছে, সেইসব মানুষের মধ্যে এক অদৃশ্য ভ্রাতৃত্ব-সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এ-সম্পর্ক যন্ত্রণার উপরে, এবং কারাবাস-কালে হৃদয়ের যে মহত্তর উপলব্ধি হয় তার উপরে প্রতিষ্ঠিত।

তোমার কন্যা ইন্দিরার কাছ থেকে খবরাখবর পাবার জন্য মিসেস টলার ও আমি সাগ্রহে প্রতীক্ষা করছি। সে যদি আমাদের সঙ্গে দেখা করতে আসে, খুশী হব।

সপ্তাহ কয়েক আগে মিসেস টলার আমার নতুন একখানি নাটকে অভিনয় করলেন। নাটকখানির নাম "নো মোর পীস"। তাঁর অভিনয় খুবই সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল। সম্ভবত শীতকালে তিনি লণ্ডনে গিয়ে অভিনয় করবেন। সেপ্টেম্বর মাসের শেষে আমি আমেরিকায় যাচ্ছি। সেখানে নানা বিষয়ে আমি বক্তৃতা দেব। কয়েকটি বিষয় হলঃ

"হিটলার, সম্ভাবনা ও বাস্তব।"

"আপনি কি আপনার যুগের জন্য দায়ী?"

"আধুনিক নাট্যশালা।"

ইউরোপের পরিস্থিতি সম্পর্কে তোমাকে আমার কিছু লিখবার দরকার নেই। এ সম্পর্কে আমি যেটুকু জানি, তুমিও সেটুকু জান। জাতিসঙ্ঘের অন্তর্নিহিত দুর্বলতা ক্রমেই আরও বেশী করে প্রকাশ পাচ্ছে, এবং ফ্যাসিস্ট একনায়করা তার সুযোগ গ্রহণ করছেন। ইউরোপে ফ্যাসিবাদী ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগোষ্ঠীর মধ্যে একটা চূড়ান্ত সংগ্রাম অনিবার্য হয়ে দাঁড়াবে। একমাত্র সমস্যা হল এই যে গণ-তান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি একটা স্পষ্ট কর্মসূচী ও দৃঢ় সংকল্প নিয়ে একতাবদ্ধ হবে কিনা। তা যদি না হয়, তাহলে যা তারা এড়াতে চাইছে, তাদের কাজের ফলে ঠিক সেইটেই ঘটবে। অর্থাৎ অদূর ভবিষ্যতেই যুদ্ধ বাধবে। দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে ইতিহাস থেকে কেউ শিক্ষা নেয় না। জার্মান গণতন্ত্রও ছিল দুর্বল; তাই গৃহযুদ্ধ এড়াবার চেষ্টায় হিটলারকে তারা একটার পর একটা সুবিধা ছেড়ে দিয়েছিল। নিজেদের ধ্বংসের পথ এরা নিজেরাই পরিষ্কার করে দিয়েছে।

তোমার প্রবন্ধটি আমি সাগ্রহে পাঠ করলাম। প্যালেস্টাইনে ইহুদী-সমস্যা সম্পর্কে তুমি যা বলেছ, তার সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ একমত। দুটি বিপদ বর্তমান। এক হল ইহুদী জাতীয়তাবাদী দল, জাতীয়তাবাদের মোহে জাতীয়তাবাদের থেকে যা মহত্তর, আধুনিক যুগের সেইসব চিন্তাদর্শের কথা যারা ভুলে যায়। আর দ্বিতীয় বিপদ আরব জাতীয়তাবাদী দল, ফ্যাসিবাদী প্রচারের ফলে মন বিষিয়ে যাওয়ায় যারা বৃহত্তর সমস্যাগুলির কথা বিস্মৃত হয়েছে।

তোমার বই এ-দেশে, এমন কি তোমার বিরোধীদের মধ্যেও, প্রবল সাড়া জাগিয়ে তুলেছে।

দিন কয়েক আগে লর্ড্‌স সভার প্রখ্যাত একজন সদস্যের সঙ্গে আলোচনা হচ্ছিল। তিনি বললেন, ইতিমধ্যেই বইখানি তিনি দুবার পড়েছেন। মুখে এক, কাজে আর...শুভেচ্ছা জানাই।

চিরানুরক্ত

Ernst Toller.

১৫৫ ক্রিস্টিয়ান টলার কর্তৃক লিখিত

লণ্ডন, ২৭ অগাস্ট, ১৯৩৬

প্রিয় মিঃ নেহরু,

কাল দুপুরে ইন্দিরা আমাদের সঙ্গে খেল। দুঃখের কথা মিঃ টলার উপস্থিত থাকতে পারেননি; আমেরিকার ভিসা পাবার চেষ্টায় তাঁকে মার্কিন কনসালের কাছে যেতে হয়েছিল। এ-ব্যাপারে মিঃ টলার কিছু অসুবিধেয় আছেন। ইন্দিরার সঙ্গে দেখা না হওয়ায় তিনি খুবই নিরাশ হয়েছেন।

ইন্দিরার সঙ্গে দেখা হওয়ায় আমি ভারী খুশী হয়েছি। অতি সুন্দরী মেয়ে, এবং অপাপবিদ্ধা। দেখে আনন্দ হয়, আবার নিজেকে বড় অসহায়ও লাগে। আমার মনে হল, ও যেন ছোট্ট একটি ফুল, হাওয়া এসে অনায়াসে ওকে উড়িয়ে নিতে পারে। তবে হাওয়াকে ও ভয় পায় বলে ত মনে হল না।

প্রবল আগ্রহ এবং গভীর সহানুভূতি নিয়ে আপনার জীবনী পড়তে শুরু করছি।

শুভেচ্ছা ও গভীর শ্রদ্ধা জানাই।

ভবদীয়
ক্রিস্টিয়ান টলার

আন্তরিক শুভেচ্ছা।

চিরানুরক্ত
আর্নস্ট টলার

১৫৬ মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক লিখিত

সেবাগ্রাম,
৩০ জুলাই, ১৯৩৬

প্রিয় জওহরলাল,

'উদ্ভট' সব কর্মসূচী বাদ দিয়ে সকলের যাতে মঙ্গল হয়, সেই কাজের জন্য তুমি তোমার উদ্যমকে যদি সঞ্চয় করে রাখ, তাহলেই আমি সুখী হব।

তুমি তোমার চিত্তের সরসতা যদি না হারাও, এবং বর্তমান সহকর্মীদের মাধ্যমেই তোমার নীতিকে যথাসম্ভব সফল করবার প্রয়াসে তোমার কার্যকাল পর্যন্ত স্বপদে থাকতে মনঃস্থির কর, তাহলেই আবার সব ঠিক হয়ে যাবে। ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অর্থাৎ আগামী বছরের পরিকল্পনা সম্পর্কে চিন্তা করবার সময় এখন এসেছে। যা-কিছুই ঘটুক, বিরোধিতা করা তোমার চলবে না। এই আমার দৃঢ় অভিমত। বাবার মতন তুমি যখন অনুভব করবে যে কংগ্রেসের পূর্ণ দায়িত্বভার গ্রহণ করতে তুমি প্রস্তুত, বর্তমান সঙ্গীরাও তখন তোমার বিরোধিতা করবে বলে আমার মনে হয় না। আশা করি, বোম্বাইতে তুমি সহজেই সাফল্য লাভ করবে।

কমলা মেমোরিয়ালের ব্যাপারে আমি উদ্বিগ্ন রয়েছি। অর্থ সংগ্রহ অথবা পরিকল্পনার কাজ কতটুকু কী এগোল, তা আমি জানি না। খুর্শেদ অথবা স্বরূপ অথবা দুজনেই যদি এই কাজে মনোনিবেশ করে থাকে ত ভাল কথা। স্বরূপকে জানিও, এ-ব্যাপারে তার কাজকর্ম সম্পর্কে সে আমাকে ওয়াকিবহাল রাখবে বলেই আমি আশা করি।

সমাজবাদের প্রশ্ন নিয়ে এখানে আমি আলোচনা করব না। আমার লেখার পুনর্মার্জনা শেষ হয়ে গেলেই সেটা তোমাকে পাঠিয়ে দেব। তারপর সেটা ছাপাখানায় যাবে। দূর ভবিষ্যৎ নিয়ে আমার চিন্তা-ভাবনা নেই। একমাত্র বর্তমান মুহূর্তের উপরেই আমি মনোনিবেশ করতে পারি, এবং এই বর্তমানই মাঝে-মাঝে আমাকে

উদ্বিগ্ন করে তোলে। বর্তমান মুহূর্ত সম্পর্কে যদি ঠিকমত ব্যবস্থা অবলম্বন করা যায়, ভবিষ্যতের ভাবনা তাহলে ভবিষ্যতের জন্যই তুলে রাখা যেতে পারে। কিন্তু আগে থাকতে কিছু বলা আমার উচিত নয়।

আশা করি সত্যিই তুমি ভাল আছ।

ভালবাসা জানাই।

বাপু

জেঙ্কিন্‌স ও আমার মধ্যে যে পত্রবিনিময় হয়েছে, তা তুমি দেখবে। মামলা-মোকদ্দমা আমিও অপছন্দ করি। কিন্তু মনে হচ্ছে যে এটা এমনই ব্যাপার যে একটা ব্যবস্থা অবলম্বন করা দরকার।

১৫৭ মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক লিখিত

সেবাগ্রাম,
২৮শে আগস্ট, ১৯৩৬

প্রিয় জওহরলাল,

গতকালকের আলোচনা আমাকে ভাবিয়ে তুলেছে। যা তোমার কাছে এত সোজা তা আমি যেন কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছি না। বুদ্ধির দিক থেকে আমি দেউলিয়া হয়েছি বলে ত' মনে করিনে। কাজেই তোমার বক্তব্য যাতে বুঝতে পারি সে ভাবেই স্পষ্ট করে বলা উচিত নয় কি? হয়ত তোমার সঙ্গে আমি একমত হব না; কিন্তু সে কথাটা বলার সুযোগ দেবে তো! অথচ তুমি কি বলতে চাও কালকের অলোচনায় তার কিছুই স্পষ্ট হয়নি। সম্ভবত আমার মত অন্যান্যরাও তোমার কথা স্পষ্ট বুঝতে পারেন নি। আমি রাজার সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করছি। তুমিও যদি সময় করে তোমার কর্মসূচী নিয়ে ওঁর সঙ্গে আলোচনা কর, ভাল হয়। সময় সংক্ষেপ বলে বিস্তারিত লিখলাম না। তবে কী বলতে চাই তা নিশ্চয় বুঝতে পেরেছ।

ভালবাসা জেনো

বাপু

১৫৮ এডওয়ার্ড টমসন কর্তৃক লিখিত

হোটেল সিসিল, দিল্লী,
২৬শে অক্টোবর, ১৯৩৬

প্রিয় নেহরু,

গবর্ণমেণ্ট (এ দেশের গবর্ণমেণ্ট 'রাজদ্রোহের' মান অনেকটা নীচে নামিয়ে ফেলেছে) আমার চিঠিপত্রের উপরেও যেন খরদৃষ্টি রেখেছেন। আমি নিঃসন্দেহ যে, এ চিঠিও আপনার নিকট পৌছতে যথেষ্ট দেরী হবে। সেজন্য আমি আগে থাকতেই লিখছি।

আমি ২।৩ দিন এলাহাবাদে ঘোর রাজদ্রোহী রাইট্ অনারেবল্ স্যার তেজ-বাহাদুর সপ্রুর সঙ্গে কাটাব। সম্ভবত ৩০শে বা ৩১শে অক্টোবর তারিখে আমি এলাহাবাদ পৌছব।

আপনি কবে এলাহাবাদ যাবেন তা সপ্রুকে লিখে জানাবেন কি?

আমি কবে নাগাদ এলাহাবাদ যাব আজ সঠিক করে বলতে পারছিনে, কারণ সেটা নির্ভর করছে সপ্রুর উপরে—কোন্ দিনটা তাঁর পক্ষে সুবিধাজনক হবে, ২৯শে কি ৩০শে! তবে পরশুর মধ্যেই খবরটা পেয়ে যাব মনে করি। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমার চিঠি এক দিনের পথ যেতে চার পাঁচ দিন লেগে যায়।

আমার এই চিঠি আপনার হাতে পেঁছিবার আগে যে ভদ্রলোক এটা পড়ে দেখবেন আমার বিশ্বাস, তিনি খুব ভদ্রলোক, দয়ামায়াও আছে। সুতরাং আশা করি, একটা নকল রেখে তিনি তাড়াতাড়িই চিঠিটা আপনার নিকট পাঠাবেন।

আপনার একান্ত
এডওয়ার্ড টমসন

পুনশ্চ—লণ্ডনের একখানি কাগজ আমার কাছে লেখা চেয়ে পাঠিয়েছে! তা যে কোন বিষয়েই হউক। কি লেখা যায়, তাই বিবেচ্য। ভাবছি, রাজদ্রোহের ব্যাপারে ভারত সরকারের ধারণা সম্বন্ধে হুল ফোটানো বা আঁতে ঘা দিয়ে একটি প্রবন্ধ লিখব। ভারত সম্বন্ধে আমার ২৬ বছরের অভিজ্ঞতা থেকে যদি লিখি তা নিশ্চয়ই কৌতূহলোদ্দীপক হবে বলে মনে করি।

১৫৯ এডওয়ার্ড টমসন কর্তৃক লিখিত

৩০শে অক্টোবর, ১৯৩৬

প্রিয় নেহরু,

সম্ভবত আগামীকাল ১৮-৩৮ এর ট্রেণে আমি কলকাতা যাব।

এত তাড়াহুড়োর মধ্যে সুষ্ঠুভাবে কিছু লেখা সম্ভব নয়। যাহোক প্রস্তাবনা আকারে আমি কি বলতে চাই ঐ সঙ্গে তা পাঠাচ্ছি। এটা যাচ্ছে-তাই হয়েছে; সময় পেলে ভাল করা যেত। কিন্তু কি বলা হয়েছে তা আপনার জানা দরকার। সি. আই. ডি.রা এটা আটকেও রাখতে পারে।

তারপর. কতকগুলি প্রশ্নও এই সঙ্গে পাঠাচ্ছি। ঠিকভাবে লেখা না হলেও মোটামুটি এগুলিই আপনার ইংলণ্ডের বন্ধুদের জিজ্ঞাস্য। জবাব দিতে গিয়ে যদি মনে করেন কোথাও ভুল মানে হতে পারে, তবে সেটা ছেড়ে দেবেন। যেমন 'টাচ্' কথাটির ভুল তাৎপর্য হওয়া সম্ভব। কিংবা যদি কোন বিষয়ে আমি প্রশ্ন না করে থাকি অথবা যে বিষয়ে আপনি কিছু বলা প্রয়োজন মনে করেন তবে নিজেই প্রশ্ন করে উত্তর দিয়ে দেবেন।

আপনার কাছে হয়ত একটু কেমন ঠেকবে; কিন্তু, আমি ত' ঝানু সাংবাদিক নই (বরং নিকৃষ্ট)।

কিছুদিন আগে "নিউজ ক্রনিকলে" আমি কি লিখেছিলাম তা আপনাকে জানানো উচিত। আমি লিখেছিলাম যে, আমার মতে (১) পরিণামে কংগ্রেস সংবিধান অনুযায়ী কাজ করবে। (২) গান্ধী আর প্রথম শ্রেণীর রাজনৈতিক নেতা হিসাবে গণ্য হবেন না (এটা যদি ভুল বিচার হয়ে থাকে সেজন্য তিনিই প্রধানতঃ দায়ী। তিনি আমাকে বন্ধু বলে ডাকলেও তাঁর কাছ থেকে ন্যায্য ব্যবহার পাইনি!!!) (৩) সংবিধানের আওতায় কাজ সুরু করলে কংগ্রেসের পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী: তার আগেকার অবস্থা আর থাকবে না।

আমার সম্পূর্ণ ভুল মেনে নিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু যাতে ভুল না হয় সেজন্য সাধ্যমত চেষ্টা করেছি: কিছু কিছু যে ঠিক এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত।

এদেশে এসেই আমি কিছু লিখেছিলাম—ছাপাবার উদ্দেশ্যে নয়—সেগুলি এই সঙ্গে পাঠালাম। এ থেকে মোটামুটি আমার দৃষ্টিভঙ্গি বুঝতে পারবেন। হয়ত বা আমি একজন খাঁটী উদারপন্থী।

ওটা নষ্ট করে ফেলবেন। এ সব এখন চলবে না। দেখছি ওটা আগাগোড়া ভুল ধারণা থেকে লেখা হয়েছিল।

আপনার
এডওয়ার্ড টমসন

পুনশ্চ—সংখ্যা উল্লেখ করে উত্তর লিখলেই আমি বুঝতে পারবো আপনি কোনটার কথা বলছেন। আপনি ঠিক জানবেন আমি ভারতের স্বাধীনতার একান্ত পক্ষপাতী; এবং একবার যদি এ বিষয়ে আমার মনে বিশ্বাস জন্মে তবে আমি তা দৃঢ়ভাবে সমর্থন করব। কিন্তু আমি যদি আপনাদের সঙ্গে একমত হতে না পারি তবে সমর্থকের ভান করতে পারবো না।

১৬০ এডওয়ার্ড টমসন কর্তৃক লিখিত

১৬ সদর স্ট্রীট, কলিকাতা,
১লা নভেম্বর, ১৯৩৬

প্রিয় নেহরু,

বইগুলি পেয়ে আমি খুব খুশী হয়েছি। কিন্তু আপনি ত বইগুলিতে আমার নাম লিখে দেননি!

আপনি আমার লিখিত কোন বই চান কি না জানতে চেয়েছিলাম। আপনি বলেছেন,—না। দুঃখের বিষয়; কিন্তু আর কোনো বই না হলেও মেসোপটেমিয়ার যুদ্ধের উপন্যাসখানি অন্তত পড়বার মতো।

একটি কথা ছাড়া গান্ধী সম্বন্ধে আর কিছু বলব না। আইন অমান্য আন্দোলন কিছুটা সাফল্যলাভ করা সত্ত্বেও ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। তিনি যদি অতঃপর নতুন কোনও পথ আবিষ্কার না করতে পারেন তাহলে হয়ত তিনি কেবল নামে মাত্র একজন ক্ষমতাশীল 'গণপতি' হয়েই থাকবেন; গণদের মধ্যে উদ্দীপনা সৃষ্টি করা ছাড়া তাদের একটা স্থির লক্ষ্যে পরিচালনা করতে পারবেন না।

দেশীয় রাজন্যবর্গের সম্বন্ধেও তিনি কোনরূপ উচ্চবাচ্য করছেন না, অথচ ওটা আপনাদের দেশের কলঙ্ক। আসলে তিনি রক্ষণশীল।

আপনার সঙ্গে আগে দেখা হলে "নিউজ ক্রনিকেলে" আমার দুটি প্রবন্ধ অন্য রকমের লেখা হত। তবুও আমার মনে হয় কেবলমাত্র কংগ্রেসীদের সঙ্গে মেলামেশা করলে কংগ্রেসের শক্তি সম্বন্ধে ধারণাটা উচ্চ হওয়াই সম্ভব। গতকাল যখন একদল যুবক আমাকে ঘিরে ধরে অভিযোগ করেছিল যে আমি কেবল লিবারেলদের সঙ্গেই দেখা সাক্ষাৎ করছি, তখন নিজের সমর্থনে অন্তত ঐ কথাটা বলা যেত।

বর্তমানে সর্বপ্রধান বিষয় আমার যা মনে হয় তা এই—(১) শাসিতদের উপরে শাসকদের ক্ষমতা আগের তুলনায় অনেক বেশী; (২) শাসকবর্গের নিষ্ঠুরতার মাত্রা চরমে উঠেছে।

আমি যখন বলেছিলাম আপনারা ভুল পন্থা অবলম্বন করেছেন, তখন আপনাদের (এবং সর্বত্র সকল স্বাধীনতাকামীদেরই) বিরুদ্ধে শাসক শ্রেণীর কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন এবং শক্তি সমাবেশ করার কথাটাই মনে পড়ছিল। আমি অতীত ঘটনার চুলচেরা বিচার করার পক্ষপাতী নই, সে সম্বন্ধে কাউকে দোষারোপ করতেও চাইনে। কিন্তু প্রায় রোজই সংবাদপত্রে যা দেখছি তাতে বোকা বনে' থাকবারও কোন মানে হয় না। লোকেরা ত আর নিজেদের ধ্বংস চায় না। আপনার

এডওয়ার্ড টমসন

১৬১ এডওয়ার্ড টমসন কর্তৃক লিখিত

স্কার্টপ, বোরস্ হিল্; অক্সফোর্ড,
২৪শে নভেম্বর, ১৯৩৬

প্রিয় নেহরু,

অশেষ ধন্যবাদ। আপনি যে সময় করতে পেরেছেন সে আপনার সৌজন্য।

একে ত বয়স হয়েছে, তার ওপরে ভারত ও পাশ্চাত্ত্যের সব ব্যাপারে ভুল ভেঙ্গেছে, নিরাশও হয়েছি। তাই স্থির করেছি, শেষ কটা দিন নিজের দেশের ব্যাপারেই মনোনিবেশ করব। যা সত্য ও সুন্দর বলে বোধ হয়েছে তার প্রসারের জন্য ২৬ বছর বিফল চেষ্টা করে বর্তমানে উপলব্ধি করছি, ভারতের জন্য যে ইংরেজ নিজেকে বিব্রত করে,—সে নির্বোধ। ভারতীয়রাও তাই মনে করে এবং সেটা যে ঠিক তাতে কোন সন্দেহ নেই। আমি কিছুটা বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করছি যে, বিদেশীদের মধ্যে যাঁরা ভারতের সব কিছুই মোহাচ্ছন্ন দৃষ্টিতে দেখে থাকেন আপনার দেশবাসীরা তাঁদেরই সমর্থন করেন এবং মিত্র বলে মনে করেন। অবশ্য এটা ঠিক যে, সকলেই যার যার ব্যাপার ভাল বোঝেন; তবে আপনার দেশবাসীরা এই সব অন্ধ-অনুরাগীদের অকর্মণ্যতা যদি না দেখতে পান, তাহলে বলতে হবে যে আমি বুঝতে না পারলেও এরাই সত্যিকারের কাজের লোক। আমার মনে হয় উচ্ছ্বাসসর্বস্ব ও বিচার বুদ্ধিহীন হুজুগ প্রিয়দের বিরাট দলই ভারতবর্ষকে গাধার টুপী মাথায় দেওয়া এক কিম্ভূতকিমাকার চেহারায় দাঁড় করিয়েছে। (ভেবে দেখলে আপনারও ঐ রকম মনে হবে।)

গত ২৬ বছর কাল যাবৎ আমি দেখে আসছি বৃটিশ, ইউরোপীয় ও আমেরিকা-বাসীরা—এদের মধ্যে আবার বাজে মার্কা স্ত্রীলোকও আছে—ভারতবর্ষের পেছনে অনবরত লেগে থেকে একটা কৃত্রিম প্রাধান্য অর্জন করে নেয় এবং বেশ জাঁকিয়ে বসে। অথচ এসব লোক এত খেলো যে ভারতের বাইরে কেউ এদের অভিমতের কানাকড়ির মূল্যও দেয় না। কিন্তু ভারত এমন একটা বিষয়বস্তু যার দৌলতে এসব মূর্খের দল ভারতের সংবাদপত্রসমূহে প্রাধান্য পায় এবং এমন কি দেশবিদেশে কতকটা খ্যাতিও লাভ করে। আত্মম্ভরিতার বশেই এসব লোক আপনাদের কাছে আসে, আদতে ভারতের উপর এদের কোন টান নেই।

আপনার জন্যে দুঃখ হয়। বাস্তবিক এত অল্প দিনের পরিচয়ে আপনাকে আমার যেমন ভাল লেগেছে, বহুকাল আর কাকেও তেমন ভাল লাগেনি। আমি এখনও মনে করি যে, যদি আমরা পরস্পরকে আরও ঘনিষ্ঠভাবে জানতে পারতাম এবং অবসর সময়ে নিজেদের বিভিন্ন অভিজ্ঞতা নিয়ে আলোচনা করা যেত, তাহলে আমরা একে অপরের জ্ঞানবৃদ্ধিতে সাহায্য করতে পারতাম। কিন্তু আমাদের দুজনের পথ ভিন্ন; অবশ্য পথ পথই এবং সে পথেরও শেষ আছে। আমার যাত্রা-পথের শেষটুকু কাটবে ইংরেজ কবি ও উপন্যাসিকের যা যথার্থ পেশা তাতে আত্ম-নিয়োগ করে। আর আপনি আপনার দেশবাসীর নির্বুদ্ধিতার ফলে দারুণ নিরাশ হবেন।

আমি বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করেছি যে, আপনি মানসিক স্থৈর্য বজায় রাখতে পারেন; এমন কি, যখন বাধ্য হয়ে ভারতমাতার নূতন মন্দিরে পূজা দেন কিংবা ত্রিবাঙ্কুরে হরিজনদিগকে যৎসামান্য কিছু উৎসর্গ করার আনুষ্ঠানিক আড়ম্বরে যোগ দেন, তখনও। আপনি অদ্ভুতভাবে নিজের আত্মসম্মানটুকু বজায় রেখেছেন। কিন্তু কতদিন আর তা পারবেন? মহাত্মাজীকে যেমন একটা চক্র ঘিরে ধরেছে, তেমনি আপনিও তার ক্রমবর্ধমান পরিবেষ্টনের হাত থেকে রেহাই পাবেন না। এই আপনার নিয়তি, নিদারুণ দুর্ভাগ্য। কারণ কখনও কখনও ঘটনার নীরব দর্শক হওয়া ছাড়া আপনার গত্যন্তর থাকে না।

পণ্ডিতজী, সব কিছুরই একটা হেতু আছে। এমন কি ইংরেজদের অযৌক্তি-কতারও। আজকের দিনটি বছরের সেই তিন দিনের একদিন যেদিন শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ 'দর্শন' দেন। যেখানে আমি এই চিঠিটা লিখছি সেই পণ্ডিচেরীতে নিশ্চয় আজ

ছোঁয়াচ লেগে গেছে। যত সব মূঢ়ের দল তার 'দর্শন' লাভ করতে যাচ্ছে এবং মুহূর্তের মধ্যে ভক্তিভরে প্রণাম আর পূজা সেরে বের হয়ে আসছে। শ্রীঅরবিন্দ 'মা'কে পাশে দাঁড় করিয়ে নিজেকে ঈশ্বরের অবতার বলে জাহির করে থাকেন; ম্যাক্ রিচার্ড বলেন 'মা' কখনও 'পার্বতী' কখনও বা 'ইন্দ্র'। যাহোক যে দেশে এমন আজগুবি ব্যাপার ঘটে সে দেশে আপনি কী করতে পারেন? আশ্চর্য যে, বুদ্ধিমান লোকেরাও এতে যোগ দেন। অথচ এক কালে অরবিন্দ প্রখর ধীশক্তি-সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। আমার একজন ভারতীয় সহকর্মী ছিলেন, স্বভাব চরিত্রের দিক থেকে তাঁকে খুব সৎ এবং সরল বলে জানতাম; এখন তিনিও তাঁর একজন অনুগত শিষ্য!

কিন্তু সম্ভবতঃ আমার এ ধরণের কথা লেখা উচিত নয়। আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই কিছু না কিছু অসামঞ্জস্য আছে। এই যেমন আপনি আপনার "গ্লিম্পসেস্ অব্ ওয়ালর্ড হিস্ট্রী"তে নেপোলিয়নের স্তুতিবাদ করে পাঠকদের অবাক করে দিয়েছেন। (জওহরলাল নেহরুর পক্ষে এটা খুবই বিস্ময়কর!) সুতরাং পণ্ডিচেরী আশ্রমের কার্যকলাপের মধ্যে চিরন্তন সত্যের প্রকৃত কার্যকারিতা এবং রহস্যময় ব্রহ্মাণ্ডের শক্তির পরিচয় আপনি পেয়েও যেতে পারেন। সেক্ষেত্রে আমি ক্ষমা চাই।

এবার অন্য কথায় আসা যাক্। অনেক বিষয়েই আপনাদের নেহরু পরিবার খুব ভাগ্যবান। বিশেষ করে রূপে গুণে অতুলনীয়া মেয়েদের বেলায়। ইন্দিরাকে লেখা আপনার চিঠিগুলি অপূর্ব সৃষ্টি। তিনি যদি আমার স্ত্রী ও আমাকে বন্ধুভাবে গ্রহণ করেন তবে আমরা সম্মানিত বোধ করব। এবং আমরা যে শুভানুধ্যায়ী তা তিনি বুঝতে পারবেন।

বোম্বে থেকে ৫ই ডিসেম্বর পি এণ্ড ও কোম্পানীর 'মালোজা' জাহাজে আমি রওনা হব এবং সেই সঙ্গে ভারতের ব্যাপারে আমার সক্রিয় যোগাযোগেরও ইতি ঘটবে; কিন্তু তার আগে আমার দুটি ঐতিহাসিক গ্রন্থের খসড়াটা দেখা এবং আরও দু' একটা খুচরা কাজ সেরে নিতে হবে।

ভারতের কোন কিছুই আমি ঠিক বুঝতে পারিনে। এ যেন অরবিন্দ ঘোষের নূতন অব্যক্ত ধর্মের মতই দুর্বোধ্য। কিন্তু এসব চলবেই। আমি আপনার সৌভাগ্য কামনা করি। আপনি ঠিকই বলেছেন, সব কিছুর আমূল পরিবর্তন প্রয়োজন। কিন্তু আপনার এবং আমার দেশের প্রত্যেক শ্রেণীর লোকই যার যার স্বার্থানুযায়ী একটি অংশের পরিবর্তন চায় এবং তারা নিজেদের স্বার্থ বজায় রাখবার জন্য অন্যায়ভাবে সংগ্রাম করতে প্রস্তুত।

অনুগ্রহ করে আপনার বোনকে আমার কথা মনে করিয়ে দেবেন। তাঁর আতিথেয়তা আমার অনেক কাল মনে থাকবে। আমার স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় হলে ভাল হত। আপনি আবার যখন অক্সফোর্ডে আসবেন আশা করি, তখন তাঁর সঙ্গে আমার স্ত্রীর পরিচয় হবে।

আপনার
এডওয়ার্ড টমসন

১৬২ এডওয়ার্ড টমসন কর্তৃক লিখিত

বোরস্ হিল্, অক্সফোর্ড,
৬ই ডিসেম্বর, ১৯৩৬

প্রিয় নেহরু,

আপনি যে চিঠি লিখেছেন সে আপনার সদাশয়তা। "নিউজ ক্রনিক্ল্"এ প্রকাশিত প্রবন্ধটি আমাদের সাক্ষাতের পূর্বেই লিখেছিলাম। তবু মনে হয়,

দ্ভাগ্যক্রমে প্রবন্ধটির মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ঠিক আছে। আমি যখন ভারতে যাই তখনই জানতাম ইউরোপে এবং আমার নিজের দেশেও গণতান্ত্রিক আদর্শ ক্রমশ লোপ পাচ্ছে। ভারতবর্ষ ছেড়ে যাবার আগে জেনে গেলাম যে এদেশেও এই আদর্শের অবলুপ্তি ঘটছে।

"নিউজ ক্রনিক্‌ল্‌" পত্রিকায় লেখার সময় আমি আপনার "আত্মজীবনী" সম্বন্ধেই একান্তভাবে ভাবছিলাম। অধিকাংশ পাঠকের মতে শাস্ত্রীর প্রতি আপনার উষ্মার প্রকাশ, এই সুন্দর বইখানির একটি মস্ত খুঁত। সম্ভবতঃ আপনিও তা বুঝতে পারছেন। আপনার প্রতি যে অবিচার করেছি সেটা সংশোধন করে আমি "নিউজ ক্রনিক্‌ল্‌"এ লিখব।

শাস্ত্রী আমার বন্ধু। এছাড়া রাজন্যবর্গের সম্পর্কে তিনি সাহসের পরিচয় দিয়েছেন বলে আমি মনে করি। আমার গত দু' বছরের ঐতিহাসিক গবেষণা আমাকে ঘোরতর রাজন্যবর্গ-বিদ্বেষী করে তুলেছে। আপনিও বলেছেন ভারতে ও ইংলণ্ডে আগা খাঁ যে হালচালে চলেছেন তা দেখে আপনি স্তম্ভিত হয়েছেন। আমিও হয়েছি। এবং দেশীয় রাজন্যবর্গের হালচাল দেখে আমারও অবাক লাগছে।

"নিউজ ক্রনিক্‌ল্‌"এ ঐ প্রবন্ধটি লেখার সময় মনে করেছিলাম সপ্রু এবং আম্বেদকরকে জাতীয় আন্দোলনে টেনে আনা যাবে; কিন্তু এখন দেখছি সেটা ভুল। সপ্রু ত সমাজতন্ত্রের আতঙ্কেই অস্থির, আর শেষোক্ত দলের লোকেদের এখনও দেশাত্মবোধ জাগেনি। আগে এদের অন্ততঃ একপুরুষ সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যাপার সুবিচার লাভ করুক।

মন থেকে এই বিশ্বাস দূর করুন যে, আমি ভারতবর্ষ সম্বন্ধে একটা বিদ্বেষ পোষণ করছি কিংবা 'মাদার ইণ্ডিয়া' বইয়ের মত কতকগুলি তর্কসাপেক্ষ বিষয় সংগ্রহে ব্যস্ত আছি। আমার বিশ্বাস 'মডার্ণ রিভিয়ু' প্রভৃতি কাগজ মারফৎ যে সব কথা রটেছে যা অধিকাংশই কাল্পনিক, তা থেকেই আমার সম্বন্ধে আপনার এ ধারণা জন্মেছে। এবং কিছুদিন আগে পর্যন্ত লোকের কথার উপর নির্ভর করেই আমিও আপনার সম্বন্ধে একটা ধারণা করে নিয়েছিলাম। কয়েকটি গুরুতর বিষয়ে আপনাকে বাস্তবিকই আমি ভুল বুঝেছি। কিন্তু, আমাকে ভুল বুঝলেন কি না বুঝলেন তা নিয়ে আপনি সম্ভবতঃ মাথা ঘামান না। আর আমি যদি ভেবে থাকি যে, যারা "মডার্ণ রিভিয়ু" গোষ্ঠির মত দেশপ্রেমিকদের কথায় গুরুত্ব দেন আপনি তাঁদেরই একজন, তাহলে তাতে আপত্তির কারণ থাকতে পারে বলে আমিও মনে করব না। গত বিশ বছর ধরে প্রকাশিত আমার রচনাগুলিতে যথেষ্ট ভুলভ্রান্তি আছে বটে, কিন্তু যে ধরণের ক্ষুদ্রতার জন্য আপনি আমাকে দোষারোপ করেছেন তা নেই। অবশ্য আমি জানি, যদি কেউ ভুলেও কখনও সমালোচনা করে থাকে তবে তাকে শত্রু মনে করা হয়। বস্তুত যাঁরা কালেভদ্রে সমালোচনা করেন তাঁরা জাতীয় আন্দোলনের প্রকৃত শত্রু নয়। আসলে শত্রু হল আন্দোলনের যত গলগ্রহ দল, যেমন, শৈলেন ঘোষ, সৈয়দ হোসেনরা ও রেজমী প্রভৃতি (যাদের দেশপ্রেম হায়েনার দেশপ্রেমের মত), আর যত অজ্ঞ পশ্চিমী চাটুকার। হয়ত একদিন আপনিও একথা স্বীকার করবেন। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভের ব্যাপারে যদি কোন সাহায্য করতে পারি আমি নিশ্চয়ই তা করব। কিন্তু সম্ভবতঃ এটা আপনার বিশ্বাস হবে না।

দেখছি, আমার চিঠিখানা আপনার ভাল লেগেছে। আমার শরীর মন বড় ক্লান্ত। তবে ঐ চিঠিতে পণ্ডিচেরী সম্পর্কে একটা বিশেষ উল্লেখ ছিল। আমি স্বীকার করছি, অরবিন্দের উদ্ভট কাজ-কারবারের কোন গুরুত্ব নেই। তবু অনেক মোহভঙ্গের পরেও যদি আবার বিভ্রান্ত হতে হয় তবে সেটা দুঃখের ব্যাপার। অরবিন্দ একজন

বিরাট জ্ঞানী ও আদর্শ চরিত্রের লোক এবং প্রকৃত দেশপ্রেমিক বলেই বরাবর আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। তাঁকে জঘন্য ভণ্ডরূপে দেখবার জন্য আমি প্রস্তুত ছিলাম না। আমার জানা এক ভদ্রলোক অরবিন্দের একজন প্রধান সহকারী (আশ্রম কর্তৃপক্ষ তাঁর সঙ্গে আমাকে দেখা করতে দেননি)। যাহোক, উনি এককালে আমার সহকর্মী ছিলেন, পরবর্তীকালে আবার (অমৃতসরের ঘটনার অব্যবহিত পরেই) আমার কলেজটি ধ্বংস করবার চেষ্টাও করেছিলেন। ওঁর মধ্যে তখন নিঃস্বার্থ দেশপ্রেম জ্বল জ্বল করত, কপটতার লেশমাত্র ছিল না। কিন্তু এখন তার পরিবর্তন দেখে আমার মনে দুঃখ হয়েছে। এক মুসলমান ভদ্রলোকের কথা বলছি; পরম ধর্মনিষ্ঠ বলে ভারত ও ইংলণ্ডের সর্বত্র এত খ্যাতি। সম্প্রতি তাঁর সকালবেলাকার উপাসনা ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি দেখবার আমার সুযোগ হয়েছিল এবং আপাতখাঁটি ধর্মটা আমাকে মুগ্ধ করেছিল, আবার ওঁর সাম্প্রদায়িক ভাবও এত উগ্র যে, যেখানেই তাঁর হাতে ক্ষমতা সেখানে হিন্দুরা কখনও সুবিচার পায় না;—এই লোকটিকেই দেখলুম অরবিন্দকে 'শিব' আর সেই ফরাসী স্ত্রীলোকটিকে 'পার্বতী' জ্ঞানে পুজা করছেন। ক্যান্টারবেরির আর্চবিশপ একজন প্রচ্ছন্ন থিয়সফিস্ট, এমন কথা শুনলে আমার মনের অবস্থা যেমন হত এও তাই হল। যদি এমন একজন প্রখ্যাত মুশ্লিম প্রধান এ রকম ভণ্ডকে পুজা করেন তবে আর বিশ্বাস করবেন কাকে?

যদি আবার কখনও আমাদের দেখা হয় (হবে, আশা করি; যদি কখনও আবার অক্সফোর্ডে আসেন তবে আমাদের এখানে এসেই উঠবেন ত?—জবাব দেবার দরকার নেই, মনে রাখলেই হবে) আপনাকে জিজ্ঞেস করব, রাগের অনেক কারণ থাকা সত্ত্বেও যখন আপনার আত্মজীবনীতে একটা মহানুভবতার পরিচয় দিতে পেরেছেন, তখন "গ্লিম্পসেস্ অব্ হিস্ট্রী" বইয়ে আগাগোড়া আমার দেশবাসীর সম্পর্কে এমন অনুদার মনোভাব প্রকাশ করলেন কেন? এ ঠিক আপনার মহৎ স্বভাবের সঙ্গে খাপ খায়নি। তথ্যের দিক থেকে ভুল আমরা সকলেই করে থাকি! আর আপনার বইয়ে ত অদ্ভুত পটুত্ব প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু এ ভুল ত প্রধানত তথ্যের দিক থেকে নয়। তবে আমি মনে করি এর একটা বিশেষ বা সাময়িক কারণ ছিল; শরীর মন অসুস্থ থাকলে এ রকম হয়ে থাকে, এই যেমন ভারত সম্পর্কে আমার বর্তমান মানসিক প্রতিক্রিয়া। এ বিষয়ে পত্রালাপ করে খামকা আপনার সময় নষ্ট করতে আমি বলব না। যে কোনও ব্যাপারেই হোক চিঠিতে বরাবর ভুল বোঝাবুঝি হয়। পরিণামে আপনার জীবন ব্যর্থই হোক কিংবা যে গুটিকতক ব্যক্তি মানবজাতির মধ্যে আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে তোলেন আপনি তাদেরই একজন হন—আপনার খ্যাতি ও প্রভাবের দিক থেকে বিষয়টা বিবেচনা করে দেখা আপনার উচিত। আপনার নিজের জন্যই একটা কিছু 'প্রায়শ্চিত্ত' করা উচিত,—আমার দেশবাসীর জন্য আপনার কোন দায় নেই, কেননা তাদের দিক থেকে উষ্মার সৃষ্টি হয়েছিল বলেই ত আপনি অবিচার করেছেন।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, আপনার হাতে পেঁৗছবার আগে নিশ্চয়ই এ চিঠি অন্যে পড়ে দেখবে। তাই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি আমি খুব সহজ করে লেখাই ভাল মনে করি।

আমি কোন রকম ভারত-বিরোধী মনোভাব নিয়ে যাচ্ছিনে। কিন্তু আমি জানি আমরা, ভারতীয় বা ইংরেজরা উভয়েই অতি হতভাগ্য জীব; আমি অত্যন্ত নিরাশ বোধ করছি।

মনে হয়, অন্যান্য জাতীয়তাবাদীদের মত আপনার মনের কোণেও এই বাসনা যে, কোন ইংরেজ যদি ভারতের বন্ধু বলে বিবেচিত হতে চায়, তবে কখনও ভারতের

সমালোচনা করা তার উচিত নয়। আমাদের দেশের শ্রমিক দলও তাই চায়; অথচ এই দলে বিশ্বাসঘাতকতা, দলত্যাগ এবং ডিমোক্রাসি-বিরোধী কার্যকলাপের অন্ত নেই। যাহোক আমার দ্বারা একাজ হবে না। যদি ভেবে থাকেন, কাজটা ভুল হচ্ছে জেনেও আমি মুখ বুজে থাকব, তবে আমাকে শত্রু বলেই মনে করবেন।

১৬ বছর আগেকার অসহযোগ আন্দোলনটাকে অন্যায় বলে মনে করিনি। নৈতিক দিক থেকে এ আন্দোলন যুক্তিযুক্তই মনে হয়েছে এবং চালাতে পারলে সাফল্যলাভ করত। কিন্তু মুসলমান ও আরও অনেক দল যখন এ আন্দোলনকে সমর্থন করল না, তখন এটা বন্ধ করে অন্য পন্থা অবলম্বন করা উচিত ছিল। দীর্ঘকাল ধরে দ্বিধাগ্রস্ত মনে এ আন্দোলন চালানোর ফলে মুসলমান ও কায়েমী স্বার্থবাদীরা শক্তিশালী হয়েছে।

গোল-টেবিল বৈঠকের আগে পর্যন্ত আমি কখনও গান্ধীকে ভ্রান্ত মনে করিনি; ঐ সময়ে তিনি উদ্ধত ও অযৌক্তিক মনোভাব দেখিয়ে ছিলেন। হয়ত বৈঠকে না আসাই তাঁর উচিত ছিল। কিন্তু আসার পরে তিনি যে ব্যবহার করলেন তা সমর্থনযোগ্য নয়; ভারতবর্ষ থেকে আরও যাঁরা এসেছিলেন তাঁদের তিনি বন্ধু বলে স্বীকার করেননি, তাঁদের সঙ্গে একটা পরামর্শ করাও যুক্তিযুক্ত মনে করেননি; অথচ সকলেরই উদ্দেশ্য ছিল এক, চেষ্টা এক এবং ওঁদের মধ্যে অনেকেই নিজেদের মতামতের জন্য ইতঃপূর্বে লাঞ্ছনা ভোগ করেছেন।

কংগ্রেসের যে কোন অগ্রগতি নেই, এই ধারণাটাই কংগ্রেসের পক্ষে সবচেয়ে ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে; (কথাটা শুনুন, আমি যে সব বিষয়ে বা সম্পূর্ণ ভুল করি তা নয়)। গত ২৬ বছর ধরে আন্দোলন সম্বন্ধে আমার যে ধারণা হয়েছে তাতে দেখছি যে কংগ্রেস কদাচিৎ তার সংগ্রামী কৌশল পরিবর্তন করে, আর করলেও খুবই দ্বিধাগ্রস্তভাবে করে। বঙ্গভঙ্গ কালে আন্দোলনের অবস্থা যে রকম ছিল আজও অনেকটা তাই আছে। গান্ধীজি সম্বন্ধে সম্প্রতি আমার যে ধারণা হয়েছে তিনি যদি তাই হন তাহলে আমি বলব, জনগণের মধ্যে বর্তমানে উদ্দীপনা সৃষ্টি কার ছাড়া তাঁর আর কোন ক্ষমতা নেই। আর, সে উদ্দীপনাকে কোন্ পথে চালিত করবেন অথবা কোন কাজে লাগাবেন তারও কোন ধারণা নেই।

খুব ভাসা ভাসা ভাবে দেখলে আমি নিঃসন্দেহ যে আপনার নিজস্ব সমাজ-তন্ত্রবাদ একটি ভুল পদ্ধতি। কিন্তু এ ক্ষেত্রে আমি বিশ্বাস করি আপনার ধারণাই শেষ পর্যন্ত ঠিক বলে প্রমাণিত হবে। সমগ্র অর্থনৈতিক ও সামাজিক (এবং বিশেষতঃ ভারতবর্ষের ধর্মীয়) কাঠামোটা অদ্ভুত। এতে যে আপনার বিরুদ্ধ-বাদীদের জোর একটু বেড়েছে তা জানি; কিন্তু তথাপি এমন কথা আমি বলতে পারছিনে যে, আপনার কার্যপদ্ধতিটা এখন পরিবর্তন করা উচিত।

আমি যে পদ্ধতিগুলি ভ্রান্ত বলে মনে করি সেগুলিই আপনার উপর জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। আমার মতে জগতের পরিস্থিতির দিকে লক্ষ্য রেখে কংগ্রেসের সহযোগিতা করা উচিত; এবং সহযোগিতা যে করতে যাচ্ছে সে কথা স্পষ্ট করে বলা উচিত। সেই সঙ্গে সংবিধানের যে সব অংশে নৈতিক গুরুত্ব নেই অথচ কেবলমাত্র গায়ের জোরে টিকিয়ে রাখা হয়েছে, সেগুলিকেও সরাসরি প্রত্যাখান করা উচিত। ভগবানের দয়ায় শুভ মুহূর্তে এতেই আপনাদের বাহুতে অমিতশক্তি সঞ্চারিত হবে। (ঘটনার গতি দেখে মনে হয় তেমন শুভ মুহূর্ত তিনি নিশ্চয়ই দেবেন)। বর্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ রাজনীতিবিদ হচ্ছেন রুজভেল্ট আর ডি. ভ্যালেরা; এ'রা দুজনেই নৈতিক ধারা বজায় রেখেছেন, এবং কার্য দ্বারা যা বস্তুত সমর্থিত হয়েছে ওঁরা তাই বলেছেন, তার বেশি নয়। ডি. ভ্যালেরা ধাপে ধাপে আয়র্ল্যাণ্ডকে

অগ্রগতির পথে নিয়ে গেছেন; আর মাত্র এক ধাপ এগিয়ে গেলেই যা হওয়া দরকার তাই হবে।

আপনার কাজটা আরও বেশি শক্ত। কারণ, দেশীয় রাজন্যবর্গ এবং মুসলমান সম্প্রদায় আপনাদের বিপক্ষে। আর, আপনাদের একেবারে সীমানার মধ্যেই ত আপনাদের আলস্টার রয়েছে; তাছাড়া প্রতিক্রিয়াশীল পুরুত ও গোঁড়ার দল ত আছেই। জনসাধারণকে প্রথমে বিভ্রান্ত ও পরে তাদের সন্দেহ উদ্রেক করে কংগ্রেস তার নিজের পথ ক্রমেই বন্ধুর করে তুলেছে। কথার ত একটাই অর্থ হবে, সুতরাং কাজের দ্বারা যা শীঘ্রই মিথ্যা প্রতিপন্ন হবে লোকে তেমন কথা কেন বলবে? আপনারা নিজেরাই নিজেদের পরাজয় ডেকে আনছেন। এর প্রতিক্রিয়া খুবই ভয়াবহ এবং ক্ষতিকর হবে। দুঃখের বিষয়, আপনি আমাকে ভারত-বিদ্বেষী বলে মনে করেন। আপনি অবশ্য তা মনে করতে পারেন। আমার এই তিক্ততা ভারতের বিরুদ্ধে নয়, পৃথিবীটার মতিগতির বিরুদ্ধে। মুসলমানদের ও রাজন্যবর্গের কঠোর মনোভাব আমার জানা আছে। এরা আমাদের দেশের রক্ষণশীল দলের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে এবং সাধ্যমত সব কিছু গ্রাস করতে ও আঁকড়ে ধরে থাকবার জন্য প্রত্যেকটি সম্ভাব্য অস্ত্র তারা প্রয়োগ করবে। আর এই জেদী শত্রুর পাল্লায় পড়ে কংগ্রেস হয় (১) শাসন কার্যে যোগ না দিয়ে রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ পদগুলি ওদেরই দখল করতে দেবে, (২) কিংবা শাসন ব্যবস্থাকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করবে এবং তাতে শত্রুপক্ষ বাইরের দলের সঙ্গে দৃঢ়ভাবে জোট পাকাবার একটা ওজুহাত পাবে।

না। আপনারা আপনাদের কথাটা স্পষ্ট করে খুলে বলুন যাতে করে মনে কোন সন্দেহ না থাকে, এবং জগৎ যাতে তা শোনে ও উপলব্ধি করে, সেই ব্যবস্থা করুন। এটা কিন্তু সেই ৩০ বছরের পুরণো অসহযোগের ঠিক পুনরাবৃত্তি নয়। যে যে জায়গায় সম্ভব মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করুন। এবং আইন ও শাসন কার্য মারফৎ যা কিছু ভাল করা সম্ভব তা করুন। আর, আপনাদের প্রতিটি অধিকার ও প্রতি ইঞ্চি ভূমি দাবী করুন। এবং আরও যে অনেক কিছু দাবী করবেন তা প্রথম সুযোগেই বলে দিন।

এভাবেই ক্রমশ আপনারা মুসলমানদের বোঝাতে পারবেন যে তাদের ভবিষ্যৎ ভারতের সঙ্গে জড়িত, বৃটিশ টোরিদের সঙ্গে নয়। আপনাদের জাতীয় আন্দোলন বর্তমানে যে অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে তাতে একে হিন্দু আন্দোলনই বলা চলে। (মনে কিছু করবেন না!) এটাকে ভারতীয় আন্দোলনে পরিণত করুন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস আপনারা আপনাদের লক্ষ্য থেকে পিছিয়ে পড়ছেন; তাই অন্য রকম বলা ঠিক হবে না।

আমার এ চিঠির উত্তর দেবার প্রয়োজন নেই; তবে আমি ভারত বিদ্বেষী বলে আপনার যে দৃঢ় ধারণা জন্মেছে আপাতত সে মনোভাবটা পরিহার করুন।

আপনার একান্ত
এডওয়ার্ড টমসন

১৬৩ এডওয়ার্ড টমসন কর্তৃক লিখিত

বোরস্ হিল, অক্সফোর্ড,
৩রা জানুয়ারী, ১৯৩৭

প্রিয় নেহরু,

এই দেখুন, কি ভাবে সাক্ষাৎকারের বিবরণটা খবরের কাগজে বেরিয়েছে। অসঙ্গত শিরোনামা, বড় হরফে ছাপা প্রভৃতির জন্য আমি দায়ী নই। দুঃখের বিষয়,

গোড়াতে যে মন্তব্য করেছিলাম তা একেবার বাদ দেওয়া হয়েছে। তা থেকে বোঝা যেত, আপনার সম্বন্ধে কত উচ্চ ধারণা আমার আছে। মোদ্দা কথা এই, বর্তমানে আমাদের সভ্যতার প্রায় কৈশোর অবস্থা চলছে, তাই সব ব্যাপারকেই উত্তেজনামূলক করে দাঁড় করাতে হয়। সিনেমা এবং ব্যাপক ফেমিনিজ্‌ম্ আমাদের শেষ করে দিয়েছে। বর্তমান যুগের মজ্জায় মজ্জায় ঘুন ধরেছে।

আমাদের মাথার উপরে যে বিপদ ঘনিয়ে এসেছে তাতে বুঝি বা আমরাও ভারতের দিকে তেমন করে নজর দিতে পারছিনে।

প্রসঙ্গক্রমে জানাচ্ছি যে, আমার একটা প্রবন্ধ আপনার ভালই লাগত এবং মূলত আমার সঙ্গে একমতও হতেন; কিন্তু অনেক সপ্তাহ কেটে গেলেও এখনও তা প্রকাশিত হয়নি। কারণ প্রথমত, মিসেস সিম্পসন্ কাগজ দখল করেছিল এবং পরে সম্ভবত কোন একজন চিত্রতারকার রোম্যান্সের ব্যাপারটাই কাগজ জুড়ে ছিল। দুঃখের বিষয়, আমার একটা শিক্ষা হল। আর কখনও জনপ্রিয় কাগজে লিখে সময়ের অপব্যবহার করব না। এদের বিশ্বাস করা যায় না।

কিছুদিন হল প্যাট্রিসিয়া এগুণ্য নামে একটি মেয়ে আমাদের কাছে এসেছিল। সে আপনার মেয়ের একজন খুব অনুরাগী বন্ধু। আপনার মেয়ের সম্বন্ধে সে অবিশ্রান্ত গল্প করত। তারা স্কুলে এক সঙ্গে পড়েছে।

১৯৩৭ সনের জন্য শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

আপনার একান্ত
এডওয়ার্ড টমসন

নিউজ ক্রনিক্‌ল, ২রা জানুয়ারী, ১৯৩৭

শাসন সংস্কারের সূচনায় ভারতে বিপজ্জনক পরিস্থিতি
'নিউজ ক্রনিক্‌ল্'এর প্রতিনিধির সহিত নেহরুর আলোচনা

নতুন বছর আবার ভারতকে পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চের কেন্দ্রস্থলে নিয়ে এল। আগামী মাসেই নতুন শাসনতন্ত্রের অধীনে আইন সভার নির্বাচন হবে এবং পয়লা এপ্রিল থেকে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন কার্যকরী হবে।

জাতীয়তাবাদীদের বা 'হোমরুল' পন্থীদের বেসরকারী পার্লামেণ্ট অর্থাৎ ভারতের জাতীয় কংগ্রেস এই শাসনতন্ত্র বর্জন এবং চালু করার ব্যাপারে নানা রকম বাধা সৃষ্টি করবার সিদ্ধান্ত করেছে। হ্যারো এবং কেম্ব্রিজে শিক্ষাপ্রাপ্ত জওহরলাল নেহরু এই বিরোধী দলের নেতা এবং কিছুদিন আগে তিনি তৃতীয়বারের জন্য কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন।

'নিউজ ক্রনিক্‌ল্'এর পক্ষ থেকে ভারত সম্বন্ধে খ্যাতনামা বিশেষজ্ঞ এডওয়ার্ড টমসনের সঙ্গে এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে নেহরু বলেন "শাসনতন্ত্র ব্যর্থ হতে বাধ্য" এবং বৃটিশ সৈন্যবাহিনীকে অবশ্য ভারত ছাড়তে হবে।

"আমাদের সম্পর্ক ছিন্ন করতেই হবে"—এডওয়ার্ড টমসন

নেহরু চরিত্র আমি যতটা বুঝেছি তাতে তিনি যে সাম্রাজ্য থেকে ভারতকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করতে চান, এমনটা মনে হয় না।

তাঁর যদি এ বিশ্বাস থাকত যে বৃটিশ সাম্রাজ্য প্রকৃতই সমাধিকার সম্পন্ন জাতিগুলির একটি সম্মিলিত পরিবার এবং এর অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেকটি জাতি তার যোগ্য সম্মান পেয়ে থাকে, তাহলে ভারতবর্ষকে এই দলে রাখতে তাঁর আপত্তি হত না।

কিন্তু তিনি মনে করেন, কায়েমী স্বার্থ আমাদের পেয়ে বসেছে এবং আমাদের দাম্ভিকতা ও মস্তিষ্কহীনতার দরুণ ভারতের দাসত্বের এখন চরম অবস্থা; সুতরাং

আমাদের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন না করলে ভারতের মুক্তি নাই। নেহরুর সঙ্গে আমার আলোচনা প্রশ্ন ও উত্তরের আকারে নিম্নে বর্ণিত হল:—

প্রশ্ন :—জানা গেল আপনি বলেছেন, ভারতবর্ষ নতুন শাসনতন্ত্র 'স্পর্শই' করবে না। একথা বলতে আপনি কি বোঝাতে চেয়েছেন?

উত্তর :—শাসনতন্ত্র 'স্পর্শ' না করার প্রশ্নই ওঠে না। কেননা আমরা যখন নির্বাচনপ্রার্থী হয়েছি তখন এ শাসনতন্ত্রের সংস্পর্শেও এসে গেছি।

আসল কথা এই যে, আমরা শাসনতন্ত্রের প্রতি সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে অগ্রসর হচ্ছিনে।

এই শাসনতন্ত্র আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করে চাপানো হয়েছে। আমাদের কিছুমাত্র পছন্দ হয়নি এবং যাতে এটা কার্যকরী না হয় তার জন্য আমরা যথাসম্ভব বাধা সৃষ্টি করব।

এর যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কিত অংশটুকু আরও জঘন্য।

প্রশ্ন :—ভারতের দারিদ্র্য অতি ভীষণ; এ অবস্থায় লোকে যাতে দুর্দশার হাত থেকে কতকটা রেহাই পায় সেজন্য এই শাসনতন্ত্রকে কাজে লাগান ভাল হবে না কি?

প্রধান সমস্যা

উত্তর :—এই শাসনতন্ত্র ব্যর্থ হতে বাধ্য, কেননা এর দ্বারা ভারতের কোন একটি প্রধান সমস্যারও সমাধান সম্ভব নয়। ভূমি, দারিদ্র্য, বেকার সমস্যাগুলির সমাধান ত একান্ত দরকার।

কিন্তু বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের অধীনে এর সুষ্ঠু সমাধান হবে বলে আমরা মনে করিনে। আমরা পন্থা বাৎলে দিয়েছি এবং তা হল কনস্টিটুয়েণ্ট এসেম্বলি।

প্রশ্ন :—আমার কথা হল এই যে, দেশীয় রাজ্যের প্রজাদের অস্তিত্ব স্বীকার করা এবং তাদের ন্যায়সঙ্গত দাবীদাওয়া নিয়ে কোন কথা বলার সাহস কংগ্রেসের নেই। আপনি কি বলেন?

উত্তর:—কংগ্রেস দেশীয় রাজ্যের প্রজাদের উপেক্ষা করে না; তবে কিনা কংগ্রেসের কার্যকলাপ বেশির ভাগ বৃটিশ ভারতেই সীমাবদ্ধ। যেমন অন্যান্যদের বেলা তেমনি দেশীয়রাজ্যের প্রজাদের। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, নাগরিক ইত্যাদি অধিকারের দাবী কংগ্রেস সমর্থন করে থাকে।

অবশ্য অন্যান্য স্থানের সমস্যা নিয়ে বিশেষ ব্যতিব্যস্ত থাকার দরুণ এবং নেতাদের মধ্যে অনেকেই বোঝার ভার বাড়াতে রাজী না হওয়াতে কংগ্রেস দেশীয়রাজ্যের প্রজাদের জন্য বিশেষ কিছুই করে উঠতে পারেনি।

একনায়কত্ব চলবে না

কিন্তু নীতি হিসাবে তা গ্রহণ করা হয়েছে এবং প্রচারও করা হয়েছে।

প্রশ্ন:—প্রকৃত 'ডোমিনিয়ন স্টেটাস' কি? স্বাধীনতার সমতুল্য নয়?

উত্তর:—'বৃটিশ ডোমিনিয়ন'গুলির ন্যায় পদমর্যাদা পেলেও সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত থেকে ভারত কি ধরনের প্রকৃত স্বাধীনতা লাভ করবে তা আমি ধারণা করতে পারছিনে। এ দুটো এক নয়। আমি এটা বুঝতে পারি যে একমাত্র স্বাধীন ভারতবর্ষই ব্রিটেনের সঙ্গে বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হতে পারে।

প্রশ্ন:—ফ্যাসিস্ট দেশগুলির ন্যায় ভারতেও একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হোক—এটা কি আপনি ইচ্ছা করেন?

উত্তর:—আমি এই মতের সম্পূর্ণ বিরোধী, বিশেষ করে ব্যক্তিগত এক-

নায়কত্বের। তবে ঘোর সংকটের সময়, প্রধানত সামরিক সংকটকালে কতকটা সমষ্টিগত একনায়কত্বের প্রয়োজন হতে পারে বলে মনে করি।

কিন্তু সাধারণ পরিস্থিতিতে এই ব্যবস্থার প্রবর্তন যুক্তিযুক্ত নয়।

প্রশ্ন:—ভারতের ঐক্যটা অতি কৃত্রিম ও অল্প দিনের নয় কি?

ভাষা ও বর্ণের ভিত্তিতে ভারত ভিন্ন ভিন্ন জাতিতে বিভক্ত হলে আরও ভাল হয় না কি?

উত্তর:—আমার বিশ্বাস, ভারত এই ভাবে বিভক্ত হলে খুবই দুর্ভাগ্যের বিষয় হবে। ভারতের ঐক্য শুধু বাঞ্ছনীয় নয় একান্ত আবশ্যকও বটে এবং এ সম্বন্ধে ভিন্ন মত পোষণ করেন এমন কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি ভারতে আছেন কিনা আমার সন্দেহ। দেখতে হবে এই ঐক্য যেন পীড়াদায়ক না হয়ে, সাংস্কৃতিক এবং অন্যান্য ব্যাপারে অবাধ স্বাধীনতা প্রদান করে।

প্রশ্ন:—ভারতের দারিদ্র্য প্রত্যেক পর্যবেক্ষককে সন্ত্রস্ত করে তোলে। সে সমস্যার সমাধানকল্পে আপনি কি প্রস্তাব করেন?

উত্তর:—আমার মনে হয় ভারতের বিশেষ সমস্যাগুলির সমাধান করতে হলে কৃষি, বৃহৎ শিল্প, গ্রামোন্নয়ন, সমাজকল্যাণ প্রভৃতি বিষয়ে এক সর্বাঙ্গীন অর্থ-নৈতিক পরিকল্পনা গ্রহণ করাই একমাত্র পন্থা।

কায়েমী স্বার্থ বজায় রাখা চলবে না

কায়েমী স্বার্থের ন্যায় বড় বড় বাধা দূর করলেই এইরূপ ব্যবস্থা কার্যকরী করা সম্ভব। সুতরাং সর্বাগ্রে এই ধরনের বাধাগুলি দূর করা প্রয়োজন।

প্রশ্ন:—বৃটিশরাই আপনাদের একমাত্র প্রতিবন্ধক নয়। সাম্প্রদায়িক কলহ এবং রাজন্যবর্গও যে ভারতের স্বাধীনতার অন্তরায় একথা কি আপনার মনে হয় না?

উত্তর:—অর্থনৈতিক সমস্যার তুলনায় সাম্প্রদায়িকতার গুরুত্ব অতি সামান্যই। আর বৃটিশ রাজপ্রতিনিধিদের সঙ্গে শতবর্ষ পূর্বেকার চুক্তির জোরে রাজন্যবর্গ যে সামন্ততান্ত্রিক ও স্বৈরাচারী শাসন চালিয়ে যেতে পারবে, এরকম আশা করা বাতুলতা মাত্র। শেষ পর্যন্ত দেশীয়রাজ্যের প্রজারাই তাদের রাজাদের একটা ব্যবস্থা করবে।

প্রশ্ন:—ভারতীয় সৈন্যবাহিনীতে দুটি প্রদেশ থেকেই সর্বাপেক্ষা অধিকসংখ্যক সৈন্য সংগৃহীত হয়, কয়েকটি প্রদেশের অধিবাসীরা সৈন্যবাহিনীতে যোগই দেয় না, আর অবশিষ্ট প্রদেশগুলি মাত্র কয়েক শত লোক সৈন্যবাহিনীতে পাঠায়। সেখানে একটি ক্ষুদ্র অংশের হাতে রয়েছে অস্ত্রশস্ত্র, আর দেশের বৃহদাংশের ঝুঁকিও তাকে নিতে হচ্ছে; সে অবস্থায় সেখানে কি কখনও গণতান্ত্রিক সরকার গঠন সম্ভব বলে আপনি মনে করেন?

উত্তর:—সৈন্যবাহিনীর সমস্যা খুব একটা গুরুতর নয়। সেনাবাহিনী বলুন আর দেশরক্ষী দলই বলুন ভারতের সকল স্থান থেকেই সৈন্য সংগ্রহ করতে হবে। আর বর্তমান ভারতীয় সৈন্যবাহিনী নতুন সরকারের সংবিধানের অনুগত হবে না, এমন কথা মনে করবার কোন কারণ নেই।

বৃটিশ সৈন্যবাহিনীকে অবশ্যই বিদায় নিতে হবে।

১৬৪ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক লিখিত

শান্তি নিকেতন, বেঙ্গল,
২১শে ডিসেম্বর, ১৯৩৬

প্রিয় জওহরলাল,

ইন্দিরা তার চিঠিতে আমার প্রতি যে আন্তরিকতা প্রকাশ করেছে তাতে আমি

সত্যিই অভিভূত হয়েছি। ইন্দিরা চমৎকার মেয়ে; সে তার শিক্ষক ও সহপাঠীদের মনে একটা মধুর স্মৃতি রেখে গেছে। তোমার চারিত্রিক দৃঢ়তা ও আদর্শ সে পেয়েছে; এবং আত্মসুখপরায়ণ ইংরেজ সমাজের সঙ্গে যে সে নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারেনি এতে আমি মোটেই আশ্চর্য হইনি। এর পরে তুমি যখন তার কাছে চিঠি লিখবে তাকে আমার আশীর্বাদ জানিও। আমাদের বাৎসরিক উৎসব চলছে। আমার বর্তমান শারীরিক অবস্থায় লোকের ভিড় ও কর্মব্যস্ততা অত্যন্ত পীড়াদায়ক। কিন্তু বুদ্ধিমানের মত তোমার অবস্থার সঙ্গে আমার অবস্থার তুলনা আর করলাম না!!

আন্তরিক আশীর্বাদ জেনো।

তোমার একান্ত
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু
কংগ্রেস শিবির, ফৈয়াজপুর

১৬৫ মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক লিখিত

২৮শে ডিসেম্বর, ১৯৩৬

প্রিয় জওহরলাল.

আশা করি তুমি আজকের মধ্যেই কাজ শেষ করতে পারবে, এবং সম্ভবত কাল দুপুরের পরেই আমাকে চলে যেতে দেবে।

ভবিষ্যতে গ্রামে গ্রামে কংগ্রেসের অধিবেশনের অনুষ্ঠান করা সম্বন্ধে আমার প্রস্তাব যদি তুমি যুক্তিযুক্ত মনে কর, তবে যাতে পূর্বেকার নিয়ম অনুযায়ী ফেব্রুয়ারী ও মার্চ মাসের মাঝামাঝি একটা সময়ে অধিবেশন হয় তার জন্য কংগ্রেসকে তুমি নির্দেশ দাও, এ আমি ইচ্ছা করি। শীতে হাজার হাজার লোকের যাতে কষ্ট না হয় সে ব্যবস্থা করা উচিত। এই সময়ে কংগ্রেসের অধিবেশনে যাতে উপস্থিত থাকা যায় পার্লামেণ্টের সদস্যদেরও সেই ব্যবস্থা করে নিতে হবে। আইন সভায় যদি কংগ্রেস সংখ্যা গরিষ্ঠতা লাভ করে তবে বড়দিন, ইস্টার ইত্যাদি উৎসবে ছুটির মতই কংগ্রেসের অধিবেশন উপলক্ষেও ছুটির ব্যবস্থা না করার কোন যুক্তি নেই। আমি স্বরূপকে বলেছি কমলার স্মৃতির রক্ষাকল্পে যেখানেই হোক শীঘ্র জমির ব্যবস্থা করতে হবে এবং তারপর বাড়ী বাড়ী চাঁদা আদায় সুরু করতে হবে।

ভালবাসা নিও।

বাপু

১৬৬ ভি. গোলাঞ্জ কর্তৃক লিখিত

লণ্ডন,
৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৭

প্রিয় নেহরু,

এলবার্ট হলে অনুষ্ঠিত সভায় আপনার প্রেরিত বাণীর জন্য আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানবেন। বাণীপ্রেরকের নাম আমি প্রথমে ঘোষণা করিনি : কিন্তু "ভারতের জনগণ" কথাটি পড়া মাত্র করতালি ধ্বনিতে বধির হবার উপক্রম হয়েছিল : টেলিগ্রামের শেষ অংশটুকু পড়ার সঙ্গে সঙ্গে উল্লাস-ধ্বনি দ্বিগুণ হল—তখনও কিন্তু আপনার নাম পড়া হয়নি। শেষকালে আপনার নাম যখন ঘোষণা করা হল শ্রোতাদের প্রশংসাধ্বনি চতুর্গুণ বেড়ে গেল। শ্রোতাদের এই উল্লাস নিঃসন্দেহে প্রতিপন্ন করেছে যে প্রত্যেকটি শ্রোতা আপনার আহ্বানে সাড়া দিতে প্রস্তুত।

আপনি জেনে খুশি হবেন, এই সভা অদ্ভুত সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে এবং আমাদের

বিশ্বাস এর একটা বিশেষ রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া হতে পারে।

আমার অশেষ ধন্যবাদ ও আন্তরিক শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন।

আপনার ভ্রাতৃপ্রতিম
ভি. গোলাঞ্জ

পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু
স্বরাজ ভবন, এলাহাবাদ
যুক্তপ্রদেশ

১৬৭ স্যার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রীপ্‌স্‌ কর্তৃক লিখিত

৩, এলম কোর্ট; টেম্প্‌ল্‌ ই. সি. ৪,
৩রা মার্চ, ১৯৩৭

প্রিয় নেহরু,

সময় করে আমাকে যে এরূপ দীর্ঘ ও সুন্দর একখানি চিঠি লিখেছেন সে আপনার বিশেষ অনুগ্রহ। চিঠিতে অনেক প্রয়োজনীয় তথ্য আছে; তা ছাড়া বর্তমানে আমার দেশবাসীর যা বিশেষ প্রয়োজন সেই জয়ের আশা ওতে ব্যক্ত হয়েছে; সুতরাং চিঠিটা 'ট্রিবিউন' পত্রিকায় প্রকাশ করব স্থির করেছি।

ট্রেড ইউনিয়নগুলির ও পার্টির কর্মকর্তাদের প্রচণ্ড বিরোধিতা সত্ত্বেও আমাদের ঐক্য আন্দোলন অগ্রসর হচ্ছে। এই আন্দোলন ইতিমধ্যেই যথেষ্ট রাজনৈতিক আলোড়ন সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে এবং এ পর্যন্ত ভাল ছাড়া খারাপ কিছুই করেনি।

ভারতীয় জনসাধারণের মধ্যে আপনি যেরূপ অদ্ভুত অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করেছেন তাতে আমার ঈর্ষা হয়। কর্মপ্রেরণার বিরাট প্রভাব সত্যিই আমার ঈর্ষার বস্তু। ওরকম একটি আন্দোলন এখানে হলে ভালই হয়। কিন্তু সম্ভবত আমাদের মধ্যে একটু বেশি কৃত্রিমতা ঢুকেছে, এবং আমাদের গণতন্ত্র অনেক বেশী সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করেছে। নির্বাচনে আপনাদের অদ্ভুত সাফল্যের জন্যে আপনাকে ও কংগ্রেসকে আমার অভিনন্দন জানাচ্ছি। অতঃপর, কংগ্রেসের অধিবেশনে আপনারা কি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, ইণ্ডিয়া এ্যাক্ট প্রবর্তন সম্পর্কেই বা আপনারা কি অভিমত প্রকাশ করেন তা জানবার আমাদের বিশেষ আগ্রহ থাকবে।

আমার বিশ্বাস সর্বপ্রকার সাম্রাজ্যবাদ এবং আজকাল ভারতে যে সমস্ত ফ্যাসিস্ট কার্যাবলী অনুষ্ঠিত হচ্ছে, আপনারা তার দৃঢ় বিরোধিতা করবেন। আমরা আপনাদের বিশেষ কিছু সাহায্য করতে পারব বলে মনে করিনে, কারণ সাম্রাজ্যবাদ-জনিত পরিস্থিতির তাৎপর্য সম্বন্ধে আমাদের পার্টি এখনও সচেতন নয়; কিন্তু আমরা এ সম্পর্কে তাদের ওয়াকিবহাল করার এবং এ ধরনের আন্দোলনের দায়িত্ব বোঝাবার চেষ্টা করছি।

'ট্রিবিউন' পত্রিকায় ভারতের খবরাখবর বেশি করে প্রকাশ করার বিশেষ প্রয়োজন আছে বলে মনে করি। আপনি নানা কাজকর্মে দারুণ ব্যস্ত থাকেন; তবু যদি মাঝে মাঝে দু' একটা চিঠি কিংবা ক্ষুদ্র প্রবন্ধ পাঠান খুব ভাল হয়।

আবার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

আপনার একান্ত
R. Stafford Cripps

১৬৮ লর্ড লোথিয়ান কর্তৃক লিখিত

সিমুর হাউস
১৭, ওয়াটারলু প্লেস, এস. ডব্লিউ-১
৪ঠা মার্চ ১৯৩৭

ব্যক্তিগত

প্রিয় মিঃ জওহরলাল নেহরু,

এখানে এখন আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিটাই প্রধান বিবেচ্য বিষয়, তবু এদেশে যতটা সম্ভব আমি ভারতের নির্বাচন বিশেষভাবে লক্ষ্য করে আসছি। কংগ্রেস সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করাতে, পরন্তু ছয়টি প্রদেশে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা করায় আমি খুশী হয়েছি। কারণ, ভারতবর্ষে এই প্রথম একটি কার্যক্ষম ও নিয়মানুবর্তী জাতীয় দল দায়িত্ব ও ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবে। আমি আন্তরিকভাবে আশা করি যে কংগ্রেস যেখানে যেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়েছে সেইসব প্রদেশে মন্ত্রীসভা গঠন করে দায়িত্ব গ্রহণ করবে। আমি জানি আপনারা এবিষয়ে বিরুদ্ধ মত পোষণ করেন এবং সেটা বৃটিশ শক্তির প্রাধান্য বজায় রাখবার জন্যে শাসনতন্ত্রে যে রক্ষাকবচের ব্যবস্থা রয়েছে শুধু সে জন্যেই নয়, কেন্দ্রীয় আইনসভায় জমিদাররাও যে প্রাধান্যলাভ করবে তাও একটা কারণ।

দুটি কারণে আমি এই অনুরোধ করছি। প্রথমত যেখানে দায়িত্বশীল গবর্ণমেণ্টের নীতি প্রবর্তিত হয়েছে সেখানে শাসনতন্ত্রের মধ্যে যে কোন রক্ষাকবচই থাকুক না কেন তার জন্য আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দল যে শাসন পরিচালনার সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করতে সমর্থ হয় না,—ইতিহাসে এমন একটিও নজীর নেই। আঞ্চলিক প্রশাসনিক ক্ষমতার ভিত্তিতে পার্লামেণ্ট প্রদেশগুলিতে পূর্ণ দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠা করতে আগ্রহশীল। মন্ত্রীসভা যদি জনসাধারণের বিরাট অংশের মত-বিরোধী কোন নীতি না গ্রহণ করেন এবং জনসাধারণের প্রতিনিধিরাও যদি গৃহীত পন্থার ভবিষ্যৎ ফলাফলের দায়িত্ব নিতে পারেন তবে কোন গভর্নরই বেশী দিন ধরে মন্ত্রীসভার বিরোধিতা করতে পারবেন না। সুতরাং আমি বিশ্বাস করি শাসন পরিচালনার অধিকাংশ ক্ষেত্রে এখন কংগ্রেস পূর্ণ দায়িত্ব খাটাতে পারবে, এবং একটা অভিজ্ঞতাও অর্জন করবে যা সরকার পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করা ছাড়া অর্জন করা যায় না।

বৃটেনের সঙ্গে কংগ্রেসের মূল বিরোধটা হল শাসনতন্ত্রে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা সম্পর্কে; কংগ্রেস শাসনক্ষমতা আয়ত্ত করে নিয়ে বৃটেনের সঙ্গে এ বিষয়ে একটা বোঝাপড়া করতে পারবে।

দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে এই যে, আমি বিশ্বাস করি বর্তমানে যে সুসংবদ্ধ ঐক্য বিরাজ করছে তা বজায় রাখাই ভারতের একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ স্বার্থ; যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্রে এই ঐক্যের কাঠামোটা বজায় রাখবার ব্যবস্থাও করা হয়েছে। ছাব্বিশটি সার্বভৌম রাষ্ট্রে বিভক্ত ইউরোপের অবর্ণনীয় দুর্দশা, অসীম ব্যর্থতা এবং সমস্যা সমাধানে সম্পূর্ণ অক্ষমতা লক্ষ্য করে দেখলে এটা বুঝতে পারবেন যে, শুরুতেই সমগ্র দেশটার জন্যে একটা শাসনতন্ত্র হাতে পেলে ভারতবর্ষের পক্ষে মস্ত সুবিধা হবে। এমন একদিন ছিল যখন চীনদেশে মাঞ্চুদের মত, রাশিয়ার জারদের মত, ব্রিটেনেও স্বৈরাচারী পন্থায় ভারতবর্ষে ঐক্য বজায় রাখত। সেদিন আর নেই। আপনারা চান শাসনতন্ত্রে ভোট প্রদানের ব্যবস্থা বিভিন্ন হোক! কিন্তু সেজন্য যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোটা ধ্বংস ও দেশের ঐক্যকে বিনষ্ট করে ভারতকে ইউরোপের অবস্থায় এনে দাঁড় করানোর চেয়ে ঐ যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার আওতায় থেকেই সেটা লাভ করার জন্য

সংগ্রাম করা অধিকতর সমীচীন নয় কি? আমার ত' মনে হয় অন্য কোন পন্থার চাইতে এই পন্থা অনুসরণ করলে আপনারা আরো তাড়াতাড়ি আপনাদের লক্ষ্যে পেঁছতে পারবেন, জনসাধারণের পক্ষেও বেশি লাভজনক হবে।

পরিশেষে আমার বক্তব্য এই যে গভর্নররা যাতে তাঁদের সংরক্ষিত ক্ষমতা প্রয়োগ না করেন এরূপ অঙ্গীকার দাবী করা উচিত হবে বলে আমি মনে করিনে। তাঁরা এ ধরনের অঙ্গীকার করতে পারেন না এবং এরকম প্রতিশ্রুতি আদায় করার চেষ্টা অবাস্তব বিষয়ে বিবাদ করারই নামান্তর মাত্র। দায়িত্ব গ্রহণ করাই হচ্ছে আসল কথা। এবং দেখতে হবে সেই দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে যাতে কেউ হস্তক্ষেপ না করে, কেননা আপনারা ত' আপনাদের কার্যনীতির সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিতে রাজীই আছেন।

বছরখানেক আগে আমাদের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ আলোচনা হয়েছিল বলেই আমার বিশ্বাস, আমার আজকেই এই চিঠি আপনি ক্ষমার চোখে দেখবেন। আমি এই চিঠি লিখছি আপনার ও ভারতের প্রতি সদিচ্ছা প্রণোদিত হয়ে, আর এই বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে যে, বিশেষত ভোটাধিকারের মারফৎ এই শাসনতন্ত্র ভারত-বাসীদের হাতে এমন ক্ষমতা এনে দিয়েছে যাতে (অবশ্য একেবারে বিনা সংগ্রামে ও নির্বিঘ্নে নয়) তারা নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে তাদের উদ্দেশ্য হাসিল করতে পারে;—যে পদ্ধতি অধুনা পৃথিবীতে ধনতান্ত্রিক শোষণ-ব্যবস্থার চেয়েও হীন ট্রাজেডি সৃষ্টি করেছে—যা একমাত্র গণতন্ত্রই দূর করবার চেষ্টা করেছে—সেই পদ্ধতিতে নয়।

আপনার একান্ত
লোথিয়ান

১৬৯ বল্লভভাই প্যাটেল কর্তৃক লিখিত

আমেদাবাদ,
৯ই মার্চ, ১৯৩৭

প্রিয় জওহরলাল,

খবরের কাগজে দেখছি ৮ই তারিখে পুণাতে এম. পি. সি. সি'র অধিবেশনে মন্ত্রীত্ব গ্রহণের বিপক্ষে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। আবার সেইদিনই মহারাষ্ট্রের নব-নির্বাচিত আইনসভার সদস্যেরা একটি সভার অনুষ্ঠান করে মন্ত্রীত্ব গ্রহণের পক্ষে প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন। তাঁরা সেখানেই থামেননি; অধিকন্তু আর এক প্রস্তাবে মুখ্য-মন্ত্রী পদে নিয়োগের জন্য মিঃ নরীম্যানের নাম সুপারিশ করেছেন। এটা খুব অন্যায় হয়েছে। আপনি সম্প্রতি এ সম্বন্ধে যে নির্দেশ জারী করেছিলেন তা সরাসরি লঙ্ঘন করা হয়েছে। বম্বে থেকে মন্ত্রীত্ব পদের জন্য সক্রিয় প্রচারকার্যের দরুণ এটা হয়েছিল বলে আমি আশংকা করি। এ থেকে বোঝা যাচ্ছে এম. পি. সি. সি আইনসভায় নির্বাচিত সদস্যদের নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম নয়। কেন্দ্র থেকে যদি দৃঢ়ভাবে নিয়ন্ত্রণ না করা হয় তাহলে সমস্তই গোলমাল হয়ে যাবে। আপনার অবগতির জন্য আমি এ রিপোর্টের কাটিং এই সঙ্গে পাঠাচ্ছি।

আমি ১৪ই তারিখ সন্ধ্যায় বম্বে হয়ে দিল্লী পেঁছব।

আশা করি আপনি ভাল আছেন।

আপনার একান্ত
বল্লভভাই

मार्च ३७-५००

गुजरात प्रांतिक समिति.

प्रमुख :
सरदार वल्लभभाई पटेल
उपप्रमुख :
श्री. गोपाळदास अं. देसाई
मंत्रीओ :
श्री. भोगीलाल लाला
श्री. मोरारजी देसाई

तारनुं पत्ता : "CONGRESS"
टेलीफोन नंबर : २२७६
"कोंग्रेस हाउस" भद्र,
अमदावाद, ता. 9.3.1937

My dear Jawaharlal,

I see from the Press reports ~~that~~ the M.P.C.C. met at Poona on the 8th and decided against office acceptance, but on the same day the Assembly members of Maharashtra (newly elected) held a meeting and passed a resolution in favour of office acceptance. They did not stop there but went further and passed another resolution ~~~~ recommending the nomination of Mr Nariman as Chief Minister. This is too bad. It is in direct contravention of your instructions recently issued in this behalf. I am afraid this resolution is the result of active canvassing for Ministership from Bombay. It appears that the M.P.C.C. is unable to control their elected members of the Assembly. Unless stronger control from the Centre is exercised things will go wrong. I am enclosing a cutting of these reports for your information.
I am reaching Delhi via Bombay

on the 14th evening.
Hope you are doing well
Yours
Vallabhbhai

১৭০ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক লিখিত

উত্তরায়ণ,
শান্তি নিকেতন, বঙ্গদেশ,
২৮শে মার্চ, ১৯৩৭

প্রিয় জওহরলাল,

এইমাত্র তোমার টেলিগ্রাম পেলাম আগামী ১৪ই এপ্রিল আমাদের অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করিবার জন তুমি আসতে পারবে জেনে আশ্বস্ত হওয়া গেল। কিন্তু রাজনৈতিক পরিস্থিতির অনিশ্চয়তা সম্বন্ধে যে উল্লেখ করেছ, আমার ক্ষুদ্র অনুষ্ঠানের পক্ষে তা যথেষ্ট উদ্বেগের কারণ। এই ব্যাপারটাকে আমি কি ভাবে দেখছি তা তোমাকে বোঝাবার জন্যই আবার এই চিঠি লিখছি।

চীনদেশবাসীরা এক বিরাট লাইব্রেরী ও সেই সঙ্গে ৫০ হাজার টাকা ভারতকে দান করেছেন। আমরা যদি এটা সঠিক পরিপ্রেক্ষিতে না দেখি তবে খুবই দুর্ভাগ্যের বিষয় হবে। এই ব্যাপারে উদ্যোক্তা হচ্ছেন চীন-ভারত সাংস্কৃতিক সমিতি। মার্শাল চিয়াং কাইশেক, প্রেসিডেণ্ট ডক্টর শাই-তি-তাও এবং চীনা জাতীয় গবেষণা পরিষদের ডিরেক্টর প্রভৃতি চীনদেশের জনজীবনের নেতারাই এই সাংস্কৃতিক সমিতির সংগঠক। অতএব বন্ধুত্ব ও সহযোগিতার যথাযোগ্য মনোভাব নিয়েই এ দানকে গ্রহণ করা আমাদের অবশ্যকর্তব্য। এবং এই সমিতির কার্যের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন এমনভাবে করা দরকার যাতে আমাদের চীনা বন্ধুদের এই ধারণা হয় যে, ভারত তাঁদের এই মহান দানের মর্যাদা রক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা করবে। উদ্বোধন অনুষ্ঠানের জন্য তোমার চেয়ে অধিক উপযুক্ত লোক ত' আমি ভেবে পাচ্ছিনে। তুমি অবশ্যই আসবে। যদি প্রয়োজন হয় তুমি বিমানযোগেও আসতে পার, আমাদের এখানে সুন্দর বিমান অবতরণের ক্ষেত্র আছে। ইন্দিরাকে সঙ্গে আনতে ভুলো না। আশীর্বাদ জেনো।

তোমার একান্ত
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৭১ আর্ণষ্ট টলার কর্তৃক লিখিত

দি মিরামার
সাণ্টা মণিকা, ক্যালিফোর্ণিয়া
৩০শে মার্চ ১৯৩৭

প্রিয় জওহরলাল নেহরু

আপনাকে চিঠি লেখার পর কয়েকমাস কেটে গেছে। আমি একান্তভাবে আশা করছি এ চিঠি যখন পৌঁছবে তখন আপনার শরীর বেশ সুস্থ থাকবে।

আমি অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে আপনার জীবন ও কার্যাবলী লক্ষ্য করছি; আমেরিকার কয়েকটি পত্রপত্রিকায় ভারতের অবস্থার সঠিক এবং বিস্তারিত খবর পাওয়া যায়।

বক্তৃতাপ্রদান উপলক্ষে অক্টোবরের প্রথম ভাগে আমি যুক্তরাষ্ট্রে এসেছি। হিটলার ও নাৎসীবাদের বিরুদ্ধে বক্তৃতা করাই এই সফরের উদ্দেশ্য। হিটলারের আভ্যন্তরীণ নীতি এবং সংখ্যালঘু, উদারনৈতিক ও সমাজতন্ত্রীদের উপর তার নির্যাতন ও দমননীতির বিরুদ্ধেই কেবলমাত্র নয়,—বিশ্বশান্তির পক্ষে আশঙ্কাজনক তার পররাষ্ট্রনীতির বিরুদ্ধে বক্তৃতা করাও উদ্দেশ্য ছিল। স্পেন দেশে ফ্রাঙ্কো বিদ্রোহের প্রস্তুতিতে হিটলারের যোগসাজস ও সেই বিদ্রোহে তাঁর সমর্থন সম্পর্কেও আমাকেও বলতে হয়েছে। আমি আমেরিকার সর্বত্র ভ্রমণ করেছি ও সাধারণ জন-সমাবেশ, বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ, মহিলা সঙ্ঘ, লেখক ও বার্তাজীবি এবং বেতার প্রভৃতি সমাজের বিভিন্ন স্তরের লোকের কাছে বক্তৃতা করেছি।

বক্তৃতা সফর তিন মাস ধরে চলেছিল। এমন প্রায়ই ঘটেছে যে আমি দিনে দুবার করে বক্তৃতা করেছি, এমনকি একদিন চারবার বলতে হয়েছে। আমার কাজ সম্পর্কে আপনার ঔৎসুক্য আছে জানি বলেই আমি আমার বক্তৃতা সম্পার্কিত কিছু কিছু কাটিং এই সঙ্গে পাঠাচ্ছি।

যাদের কাছ থেকে আশা করা যায়নি সেই জনসাধারণ এবং হলিউডের ফিল্ম আর্টিস্টদের কাছ থেকে যে সাড়া পাওয়া গেছে তা সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত এবং উল্লেখযোগ্য ব্যাপার।

হলিউডে একটি অত্যন্ত প্রভাবশালী নাৎসী বিরোধী লীগ আছে। হলিউডের শ্রেষ্ঠ চিত্র-প্রযোজক, কাহিনীকার এবং চিত্রতারকাদের অনেকেই এর সভ্য।

সফর শেষ করে হলিউডে ফিরে এসেছি। বর্তমানে আমি মেট্রো গোল্ডুইন মেয়ারের হয়ে "লোলা মনটেজ" নামে এক সিনেমার কাহিনী লিখছি। লোলা মনটেজ এক অদ্ভুত আইরিশ মেয়ে; একজন বিশিষ্ট কর্মচারীর কন্যা। ভারতে যৌবন কাটিয়ে সে পরবর্তী জীবনে"স্প্যানিশ ড্যান্সার"রূপে লণ্ডনে আবির্ভূতা হয়। পরে ব্যাভেরিয়ার রাজা প্রথম লাডউইগের বান্ধবীরূপে পরিগণিত হয়েছিল। বহু বছর যাবৎ ১৮৪৮ সনের মিউনিক বিদ্রোহের সময় পর্যন্ত—এই রাজার রাজ-নীতির উপর স্ত্রীলোকটির বিশেষ কর্তৃত্ব ছিল; পরিশেষে ওর নির্বাসন এবং রাজার রাজ্যচ্যুতি ঘটে; বিদ্রোহও থামে। ইতিহাসে প্রায়ই যেমন বিস্ময়কর ব্যাপার ঘটে থাকে, তেমনি এই লোলা মনটেজকে ইউরোপের প্রতিক্রিয়ার সময়ে স্বাধীনতার মুখপাত্র হিসেবে দেখা গিয়েছিল।

আমার এখানকার কাজ শেষ হলে আমি নিউ ইয়র্কে ফিরে যাবো। সেখানে আমার দু'টি নাটক অভিনীত হবে। দুটোই পুস্তক আকারে মুদ্রিত হবে এবং প্রকাশিত হওয়া মাত্র আপনাকে পাঠাব। গত ১৯২৯ সালের পরে আর আমার এখানে আসা হয়নি। দেখছি ইতিমধ্যে আমেরিকার বিরাট পরিবর্তন হয়েছে। প্রবল আর্থিক সংকট জনসাধারণের, বিশেষ করে দেশের যুব সম্প্রদায়ের মনে খুব একটা নাড়া দিয়ে গেছে। তুচ্ছ আশাবাদ এবং ডলার প্রীতির পরিবর্তে বর্তমানে এখানে একটা আধ্যাত্মিক অস্থিরতা, সামাজিক সমস্যার স্বরূপ অবগত হওয়ায় একটা ইচ্ছা এবং সমাজ ও আর্টের ক্ষেত্রে সততার প্রতি অনুরাগ লক্ষ্য করা যায়।

আমার আরও মনে হয় যে আমেরিকাই একমাত্র দেশ যে ফ্যাসীবাদ থেকে অতিদ্রুত শিক্ষা গ্রহণ করেছে।

জনসংখ্যার এক বিরাট অংশ "স্বাধীনতা সচেতন" হয়েছে; এবং রুজভেল্টের নির্বাচন ব্যাপারে প্রধান প্রশ্ন ছিল স্বাধীনতার পক্ষে কি বিপক্ষে? আগামী মাসে রুজভেল্টের সঙ্গে দেখা করবো আশা করি। আমেরিকার ইতিহাসে তিনি একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি।

কবে যে ইংলণ্ডে ফিরবো তা এখন বলতে পারছিনে। আপাততঃ কিছুদিন আমি আমেরিকায় থাকব।

ইউরোপের ঘটনাবলীর খবর আমি যা জানি, অনুমান করছি, আপনিও তা জানেন। ইউরোপে যুদ্ধ ঘনিয়ে এসেছে সন্দেহ নেই। বর্তমানে এক এক দেশের পল্টন বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সৈন্য দলের ভিতর লড়াই চলছে। যে কোন সময়ে যুদ্ধ বেধে যেতে পারে।

ইংলণ্ড ও ইটালির মধ্যেকার বিরোধ ক্রমশই ঘোরালো হয়ে উঠেছে এবং আমার মনে হয় মুসোলিনী যে হিটলারের সঙ্গে যোগ দিয়েছে তার কারণ তাঁর ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাব। কখনো কখনোও মনে হয় যে হিটলার এবং সোভিয়েট রাশিয়ার মধ্যে আঞ্চলিক যুদ্ধ না হয়ে ইংলণ্ড ও ইটালির মধ্যেই হয়ত আঞ্চলিক যুদ্ধ সুরু হয়ে যাবে। গণতন্ত্রী দেশগুলি স্পেনের ব্যাপারে অর্থনৈতিক দিক থেকে একটা ভুল করেছে, এটা পরবর্তীকালে বিশ্ববাসী নাও বুঝতে পারে। ফ্রাঙ্কো এবং ফ্যাসী নাৎসী মৈত্রীর জয়লাভের পরে ইউরোপের পরিস্থিতি কি দাঁড়াবে সে চিন্তা না করে তাঁরা নিজেদের নিরপেক্ষ ঘোষণা করেছেন; তাতে ইউরোপে গণতন্ত্রের অনিশ্চিত অবস্থাটা আরও শোচনীয় হয়ে উঠেছে। এই ব্যাপারে আশা করি, অতীতের অন্যান্য ব্যাপারের মত গণতন্ত্রী দেশগুলি হস্তক্ষেপ করতে অতিরিক্ত দেরী করে ফেলবে না।

ভারতবর্ষে কি ফ্যাসী আন্দোলন আছে? ওখানেও কি নাৎসীরা প্রচারকার্যের দ্বারা প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করছে?

আপনার মেয়ের খবর কি? সে কি এখনও লণ্ডনে আছে?

আপনি আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করবেন।

আপনার
আর্ণষ্ট্ টলার

১৭২ মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক লিখিত

সেবাগ্রাম, ওয়ার্ধা
৫ই এপ্রিল, ১৯৩৭

অসংশোধিত

প্রিয় জওহরলাল,

তুমি অসুস্থ হবে কেন? আর অসুস্থ হলে বিশ্রাম নেবে না কেন? ভেবেছিলাম ইন্দু আসার পর তুমি চুপি চুপি কোথাও সরে পড়বে। ইন্দু পেঁছিলে তাকে আমার ভালবাসা জানিও। এই সঙ্গে তাকেও একছত্র লিখে পাঠাচ্ছি।

এবার তোমার বিরক্তির কারণ সম্বন্ধে বলি। যে কারণেই হোক, আমি যা কিছু বলি বা করি তাই যেন তোমার কাছে অপ্রীতিকর হয়ে দাঁড়ায়। চুপ করে থাকা সম্ভব ছিল না। আমি মনে করি এই প্রসঙ্গে ভদ্রতা ও অভদ্রতা কথা দুটির প্রয়োগ ঠিকই হয়েছিল। এই বিবৃতি সম্পর্কে কংগ্রেসের তরফ থেকে তুমিই প্রথম অভিযোগ করেছ। সবারই যদি এ অভিযোগ হত আমার কিছুই করার ছিল না। তুমি লিখেছ বলে আমি খুশী হয়েছি। যতক্ষণ ব্যাপারটা আমার কাছে খোলসা না হচ্ছে কিংবা তোমার আশঙ্কা দূর না হচ্ছে ততক্ষণ তুমি আমার সঙ্গে মানিয়ে চলবে। আমার বিবৃতির ফলে খারাপ কিছু হবে বলে আশঙ্কা করিনে। তোমার মনে কি এমন কিছু আছে যা আমি বুঝতে পাচ্ছিনে?

কমলাদেবী ওয়ার্ধা থেকে মাদ্রাজ পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে ভ্রমণ করেছেন। তিনি

দিল্লী থেকে আসছিলেন। আমার কামরায় দ্বার এসে অনেকক্ষণ ধরে আলাপ-আলোচনা করেছেন। শেষ পর্যন্ত তিনি জানতে চাইলেন কেন সরোজিনী দেবীকে বাদ দেওয়া হয়েছে, রাজাজী কেন লক্ষ্মীপতিকে দূরে রাখলেন, কেনই বা অনসূয়া বাঈকে বাদ দেওয়া হল, ইত্যাদি। এই বাদ দেওয়ার ব্যাপারে আমার কতটা হাত ছিল তা তাঁকে বুঝিয়ে দিলাম এবং সেই মৌন দিবস সোমবারে তোমাকে যা লিখেছিলাম তার যতটা মনে এল প্রায় সবই তাঁকে বললাম। অবশ্য, একথা তাঁকে বললাম যে সরোজিনীকে আগে বাদ দেওয়া কিংবা পরে অন্তর্ভুক্ত করার ব্যাপারে আমার কোন হাত ছিল না। এ কথাও বলেছি যে আমি যতদূর জানি, লক্ষ্মীপতিকে বাদ দেওয়ার ব্যাপারে রাজাজীর কোন হাত ছিল না।

আমি মনে করি তোমার এসব কথা জানা দরকার।

আশা করি চিঠি যখন পেঁছবে তখন তুমি সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করেছ। তুমি কিন্তু 'মা'র কথা কিছু উল্লেখ করো না।

ভালবাসা জেনো—

বাপু

১৭৩ লর্ড লোথিয়ান কর্তৃক লিখিত

ব্লিক্লিং হল,
এইলশেয়াম,
৯ই এপ্রিল, ১৯৩৭

গোপনীয়

প্রিয় মিঃ জওহরলাল নেহরু,

আপনার ২৫শে মার্চ তারিখের চিঠির জন্য অশেষ ধন্যবাদ। 'টাইমস' পত্রিকায় লিখিত আমার চিঠিতে লক্ষ্য করে থাকবেন যে, 'নিয়মতান্ত্রিক শাসনকার্যে মন্ত্রীদের পরামর্শকে নাকচ করার জন গভর্নর তার বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ করবেন না'—এই রকম আশ্বাস যদি দেওয়া হয় তবেই কংগ্রেস মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করবে, কংগ্রেস কমিটির এই যে অভিমত এটা আমি 'খুব শোভন' বলে মনে করিনে। এখানে আমি আমার যুক্তির পুনরুক্তি করব না, তবে এটুকু বলা দরকার যে আসলে ব্যাপারটা হল এই যে—গভর্নরের বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ করা, না করা বাধ্যতামূলক নয়; পরন্তু সেটা নির্ভর করে তাঁর বিবেচনার উপর। অর্থাৎ বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ করলে আইন ও শৃঙ্খলা এবং সংখ্যালঘুদের অধিক ক্ষতি করা, না, মন্ত্রিসভার পরামর্শ গ্রহণ করলে ক্ষতিটা বেশী হবে, গভর্নর তা আগেই বিবেচনা করে দেখবেন। গতকাল লর্ডসভায় জেটল্যান্ডও একথা বলেছেন। দায়িত্বশীল গভর্নমেন্টের এই মূলনীতির জনই যেখানেই এই শাসন পদ্ধতি প্রবর্তিত হয়েছে এবং জনপ্রিয় মন্ত্রিসভা কার্যভার গ্রহণ করেছে সেখানেই এই পদ্ধতি নির্বাচকমণ্ডলী ও আইন-সভার হাতে ক্রমে ক্রমে সমস্ত ক্ষমতা হস্তান্তর করে দিয়েছে। কারণ এটা অবশ্যম্ভাবী। যতক্ষণ পর্যন্ত মন্ত্রিসভা তার নীতির অযৌক্তিকতার দ্বারা নির্বাচকমণ্ডলীকে বিরুদ্ধ-বাদী করে না তুলছে ততক্ষণ পর্যন্ত গভর্নরের পক্ষে তার বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ করা অসম্ভব না হলেও কার্যত কঠিন; কেননা বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ করলেই নিয়ম-তান্ত্রিক সংকটের সৃষ্টি হয় এবং শেষ পর্যন্ত আর একটি সাধারণ নির্বাচনের অনুষ্ঠান করতে হয়, এবং সেক্ষেত্রে অপ্রার্থিত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ক্ষমতা জারি করার ফলে নির্বাচকমণ্ডলী গভর্নরের নীতির পরাজয় ঘটায়। সুতরাং একথা বলা চলে যে, আপনাদের দৃষ্টিভঙ্গীর দিক থেকেও পূর্বাহ্নে কোনও প্রকার আশ্বাস চাওয়ার

নীতি ঠিক নয়। আপনারা নিজেরা যেমন কোন অঙ্গীকারে আবদ্ধ হতে চান না তেমনি গভর্নরও চান না; এবং এই ধরনের অঙ্গীকার বেশি ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি করবেই। তার চেয়ে বরং প্রচলিত পন্থায় মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করুন, আইন প্রণয়ন করুন এবং তাতে হস্তক্ষেপ করবার জন্য গভর্নরকে আহ্বান করুন না কেন? যদি তিনি হস্তক্ষেপ নাই করেন তবে ত' পুরাপুরি ক্ষমতাই আপনাদের হাতে থাকবে; এবং মাত্র কয়েক সপ্তাহ কিংবা মাস কয়েকের মধ্যে প্রদেশগুলিতে পার্লামেণ্টারি ব্যবস্থা পূর্ণদমে কার্যকরী হবে; মন্ত্রীমণ্ডলী যদি নির্বোধের মত কার্য না করে তবে সুরু হবার পর থেকে যতই দিন যাবে ততই হস্তক্ষেপ করা ক্রমশ কঠিন ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে। যদি তিনি হস্তক্ষেপ করেনই, আপনাদের দৃষ্টিভঙ্গীর দিক থেকেই আপনাদের অবস্থা বর্তমানের চেয়ে অনেক বেশি ভাল হবে।

আপনার চিঠির শেষ প্যারায় আপনি লিখেছেন, যে ভারতবর্ষের ভৌগোলিক অখণ্ডতা রক্ষা এবং সুদৃঢ় করার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আপনি সম্পূর্ণ একমত, কিন্তু নতুন শাসনতন্ত্রে যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কে যে ব্যবস্থা করা হয়েছে তার দ্বারা এই সংহতি বজায় রাখার সুবিধে হবে বলে আপনি মনে করেন না। আমি কিন্তু এটা বুঝতে পারছি না। আমেরিকা, কানাডা বা অস্ট্রেলিয়ার শাসনতন্ত্রের সঙ্গে এই নূতন ভারতীয় শাসনতন্ত্রের মূলগত কোনই প্রভেদ নাই। অর্থাৎ নির্বাচক-মণ্ডলী সমেত দেশবাসী প্রত্যেকের প্রতিনিধিত্ব করবে যে যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভা তারই মাধ্যমে ভারতের অখণ্ডতা বজায় থাকবে, এবং বিভিন্ন রাজ্য ও প্রদেশসমূহ শাসনতন্ত্র অনুযায়ী আইনানুগ ক্ষমতা পরিচালনা করবে। সমগ্র ভারতবর্ষের জন্য যে কোনও সংবিধান উদ্ভাবন করতে হলেই এই সব নীতির উপর নির্ভর করতে হবে। একথা সম্পূর্ণ সত্য যে এর মধ্যে এমন কিছু কিছু বিষয় আছে যা সাময়িক ভাবে প্রয়োজন হতেও পারে কিংবা নাও হতে পারে; কিন্তু আপনাদের দৃষ্টিভঙ্গীর দিক থেকে তো বটেই অপর যে কোনও লোকের দিক থেকেও এগুলি খুবই আপত্তিজনক। এই যেমন যুক্তরাষ্ট্রীয় আইন পরিষদে গণ-তন্ত্র ও স্বৈরতন্ত্রের পাশাপাশি অবস্থান এবং অন্যায়ভাবে দেশীয় রাজ্যগুলিকে ভোটদানের ক্ষমতা প্রদান। ঐরূপ আর একটি বিষয় হল জমিদারদের রক্ষাকবচ। যুক্তরাষ্ট্রীয় আইন পরিষদের সদস্যদের সরাসরি ও জনপ্রিয়তার ভিত্তিতে নির্বাচিত না হওয়াটাও আমি ব্যক্তিগতভাবে একটি ত্রুটি বলে মনে করি; কারণ যে পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদে প্রদেশগুলির প্রতিনিধিরা থাকবে সে পর্যন্ত ভাঙ্গন ধরাবার মজ্জাগত প্রবৃত্তির দরুণ প্রদেশগুলি কেন্দ্রে অতিরিক্ত আসনলাভ করবে। তদুপরি সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা তো যেন আছেই। তবে আমি মনে করি যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-তন্ত্রটিকে ধ্বংস না করে এই সব ত্রুটি শুধরে নেওয়া যায়। একটি নতুন গণ-পরিষদের মধ্যে মুসলীম অথবা অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অধিকাংশকে আপনারা পাবেন কি না সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। কিন্তু দায়িত্বশীল গভর্নমেণ্ট জনগণের প্রতিনিধিদের হাতে যে ক্ষমতা প্রদান করে তার একটা স্পষ্ট ধারণা আমার আছে: তাতে আমার বিশ্বাস শাসনতন্ত্রের কাঠামোর মধ্যে থেকে বুদ্ধি খাটিয়ে এবং দ্রুত ঐ সকল ত্রুটি সারানো যতটা সহজ হবে বাইরে থেকে সংবিধানকে বাতিল করবার চেষ্টা করে তত সহজে তা সম্ভব হবে না। তাছাড়া আমি মনে করি যে, এই শাসনতন্ত্র বাতিল করার চেষ্টার অনিবার্য পরিনাম হবে ভারতের নিজস্ব ভৌগোলিক সংহতিকে নষ্ট করা। আমি বিশ্বাস করি দায়িত্বশীল শাসন পদ্ধতি যদি কোনও সুনিয়ন্ত্রিত শক্তিশালী দলের দ্বারা পরিচালিত হয় তাহলে তারা শাসনতন্ত্রে কিছু পরিবর্তন সাধন করতে পারেন, কেননা ঐ ক্ষমতা ভারতীয় আইন-

সভাগুলির হাতেই আছে। আর তা ছাড়া ভারতীয়রা যদি একমত হয় তাহলে আপত্তিকর বিষয়গুলি সম্পর্কে ঐ শাসনতন্ত্রটা একেবারে নতুন করে ঢেলে সাজিয়ে দেবার জন্য বৃটিশ পার্লামেণ্টকে বাধ্য করতেও পারেন; গোলটেবিল বৈঠকের অধিবেশন কালেই যাতে কোন প্রকারে শাসনতন্ত্রটা চালু করা যায় সে উদ্দেশ্যেই ঐরকম কতগুলো বিষয় ওতে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল। আপনি অবশ্য এ বিষয়ে আমার সঙ্গে একমত হবেন না; কেননা আমি ত' জানি যেটা আপনাদের প্রধান উদ্দেশ্য—সেই 'স্বাধীনতা'লাভের জন্য দায়িত্বশীল শাসন পদ্ধতি একটা সুনিয়ন্ত্রিত সংখ্যাগুরু দলের হাতে যে ক্ষমতা দেয় তার উপরে আপনার তেমন আস্থা নেই, যেমন আমার আছে। যাহোক আমার বিশ্বাস আপনি যদি সপ্রুর সঙ্গে এ বিষয়ে আলাপ করেন তাহলে তিনি আপনাকে বুঝিয়ে দিতে পারবেন যে আপনারা যতটা ধারণা করতে পারেন তার চেয়ে অনেক বেশী ক্ষমতা এই সংবিধান সংখ্যাগরিষ্ঠ দলকে দিয়ে থাকে। বস্তুত ক্ষমতা পরিচালনার আসল চাবিকাঠিই আপনাদের হাতে যাচ্ছে, অবশ্য সেটা কাজে লাগাতে পারা চাই। ঠিক এই জন্যই এখানকার রক্ষণশীল দল এটা নিয়ে এত বেশি লড়েছিলেন।

একান্ত আপনার
লোথিয়ান

পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু
এলাহাবাদ

১৭৪ এডওয়ার্ড টমসন কর্তৃক লিখিত

৩রা মে, ১৯৩৭

প্রিয় নেহরু,

আপনার অসুখের সংবাদে খুব দুঃখিত হলাম। আশা করি আপনি এখন অপেক্ষাকৃত সুস্থ আছেন। আপনি যে আমাকে চিঠি লিখবার সময় করতে পেরেছেন, সে আপনার বিশেষ সৌজন্য। ভারতের রাজনৈতিক ব্যাপারে কথা বলার অধিকার আপনার তুলনায় আমার কিছুই নেই। আমাদের যখন মতের অনৈক্য ঘটে তখন সম্ভবত ভুলটা আমারই হয়। তবু আমি যে ভারতের ব্যাপারে ঔৎসুক্য প্রকাশ করি সেটা একজন বাইরের লোক কিংবা একজন ইংরেজ হিসেবে করিনে। পরন্তু ভারতের কংগ্রেস আন্দোলনের গুরুত্ব, আধুনিকতা ও অতুলনীয়তায় আমি বিশ্বাস করি বলেই আমার এই আগ্রহ; তাছাড়া কংগ্রেস যার জন্য লড়াই করছে আমিও আমার দেশের জন্য তা চাই এবং আপনাদের সংগ্রামকে আমার সংগ্রাম বলেই মনে করি। আমার বিশ্বাস 'নিউজ ক্রনিক্‌ল্'এ রাজনৈতিক বিষয়ে একটিমাত্র প্রবন্ধই প্রকাশিত হয়েছিল। এবং আপনাকে ত' বলেছি যে সেটাও বম্বেতে আগেই না লেখা হলে অন্যরকম ভাবে লেখা হত। অন্য প্রবন্ধটি কয়েকটি নিছক বিবৃতির সমষ্টিমাত্র; সেটাও আবার এক সহ-সম্পাদক অরো সহজ করেছেন এবং তা করতে গিয়ে কোন কোন স্থলে ভুলও করেছেন যেমন তিনটে লাইন কমাতে গিয়ে "জাতীয় কংগ্রেস বৃটিশ কর্মচারীদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল"—এই কথাটি আমারই বক্তব্য বলে ছাপিয়েছিলেন। যাই হোক, একটা বিষয়ে আপনি মনে দ্বিধা রাখবেন না, এবং তাতে আমার প্রতি একটু সুবিচার করা হবে। যখন আমাদের সাক্ষাৎ হয়েছিল তখন আমি খুব পীড়িত, শ্রান্ত, অসুখী ও বিভ্রান্ত ছিলাম। আপনার সঙ্গে যে কথাবার্তা হয়েছিল তা গোপনে; কখনো কিছু প্রকাশ্যে বলিনি, কাগজেও ছাপাইনি: তবু আমার কথাবর্তার ধরনে আপনার এ ধারণা হওয়া বিচিত্র নয় যে, রেজমী,

রামানন্দ চ্যাটার্জি এবং ঐ শ্রেণীর অন্যান্যদের আমি খুব বড় দরের বলে বাড়িয়েছি। কিন্তু আমি যখন প্রকৃতিস্থ থাকি তখন তাঁদের শ্রদ্ধা ত' করিই না, এমনকি তাঁদের নিয়ে বছরে পাঁচ মিনিটও মাথা ঘামাইনে। অবশ্য অতীতে এ'রা মাঝে মাঝে আমার মন বিগড়ে দিয়েছেন। তাও এই কারণে যে নানা স্বার্থান্বেষী ও আত্মপ্রচারবাগীশ লোক এবং যতসব নির্বোধ লোক আপনাদের আন্দোলনে এসে জুটেছে। আপনাদের আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত না থাকলে কখনও এদের কেউ গ্রাহ্য করত না। এইরকম লোকেরই শেলী 'ইলাসম্প্রিয়াস অব্‌স্‌কিওর' এই আখ্যা দিয়েছেন। বুদ্ধিমান ও সুচারুসম্পন্ন লোকদের কাছে এরা ধরা পড়ে যায় এবং ওঁদের কাছে আপনাদের উদ্দেশ্য হেয় হয়। অন্যান্য দেশের লোকেরা যে ভারতের ব্যাপারে গুরুত্ব দেয় না তার জন্য আপনাদের এই সব লোকেরাই অনেকাংশে দায়ী। যাহোক আমি স্বীকার করছি, এ'রা মন বিগড়ে দিতে পারেন, এ মর্যাদাটুকু এ'দের দেওয়া উচিত নয়।

আচ্ছা, যে যে বিষয়ে আমরা উভয়েই একমত এখন সেই সব বিষয়ের আলোচনা করা যাক। গতবার ভারত পরিদর্শনের ফলে আমার যে বড় পরিবর্তন হয়েছে তা হল এই যে আমি এখন রাজন্যবর্গের ভীষণ বিরোধী হয়ে উঠেছি। আমি যে ইতিহাসের বই লিখছি তাতে এটা প্রকাশ পাবে। আর এই শরৎকালে আমার যে বই বের হবে তাতেও থাকবে। আমার বিবেচনায় এই সামন্ত রাজারা একটা উৎপাত বিশেষ এবং অধিকাংশই একেবারে বাজে লোক। তাঁদের সম্পর্কে যে সব অবিশ্বাস্য চাটুবাদ শোনা যায় তাও ত' সাংঘাতিক! এ'দের হাত থেকে নিস্তার পাওয়া সহজ হবে না।

জেটল্যাণ্ডের বহ্বাড়ম্বর সম্পর্কেও আমি আপনার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত। তিনি বিশেষ করে একজন দলীয় লোক, এই আমার ব্যক্তিগত ধারণা। সাধারণ লোকের চিন্তা, ভাবনা ও দুঃখকষ্ট সম্বন্ধে তাঁর কোন ধারণাই নেই। তাঁর দ্বারা ভারতের কিংবা আমার দেশের কোন কাজ হবার নয়। তিনি শুধু একজন খাঁটি টোরী।

হাঁ, সম্ভবত দৈহিকশক্তির কথাটাই আমি খুব বেশি ভাবছি। আমার বয়স এখন ৫১ বছর। আমি লিবারেল দলের লোক। এই দলের চমৎকার (অর্থাৎ কিনা এককালে ছিল ও নির্ভীক আন্দোলন যুদ্ধের প্রাক্কালে শ্রমিক শ্রেণীর জন্য কিছু সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করেছিল, বলতে গেলে আজ পর্যন্ত যা করা হয়েছে তার সবটাই)। উদারনৈতিক দল বিশ্বাস করত যে শান্তিপূর্ণ উপায়ে সর্বত্র সকল রকমের অন্যায় অবিচার দূর করা যায়। আমাদের অধিকাংশই আজ চিরনিদ্রায় অভিভূত এবং আর যাঁরা আছেন তাঁরাও বিভ্রান্ত ও অকালে ভগ্নোদ্যম হয়ে পড়েছেন। ১৯১৩ সনে আমরা স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি যে এমন দিনও আমরা দেখবো যখন জার্মান গুপ্তচরদের টাওয়ারে গুলী করে মারা হয়েছে এবং একজন লোককে 'গুরুতর রাজদ্রোহের' কারণে তৃতীয় এডওয়ার্ডের কোন আইনবলে ফাঁসী দেওয়া হচ্ছে। কাপুরুষতার জন্য গুলী করে মারা হবে এমন একটি লোককে আমি তার আগের রাত্রিতে নিজের চোখে দেখেছি। আর এখন দেশে দেশে স্ত্রী পুরুষকে তাদের একটু উদার রাজনৈতিক মতামতের জন্য মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হচ্ছে। মাত্র কয়েকদিন আগে একরাত্রে বেতারের সংবাদ এত একঘেয়ে বিয়োগান্ত হয়ে উঠেছিল যে শেষটায় প্রহসনে দাঁড়াল। প্রথমে শোনা গেল মরক্কোতে ৩০জন লোককে গুলী করে মারা হয়েছে; তারপরে শুনলাম স্পেনের একদলকে, তারপর আবিসিনিয়াতে, তারপর চীনদেশে এবং শেষ পর্যন্ত শুনলাম রাশিয়াতে এক স্টেশন মাস্টারকে গুলী করে মারা হয়েছে যেহেতু তিনি নির্দেশ দিতে গিয়ে সব গুলিয়ে ফেলায় এক ট্রেন

দুর্ঘটনা ঘটেছিল। সেই জন্যই আমরা কোন অবস্থাতেই স্বেচ্ছাচারিতা অথবা সামরিক আইনের অবিচার অসম্ভব বলে ধরে নিতে পারিনে।

এই দেখুন না সাগরের ওপারেই ত' আয়র্ল্যান্ড; বেশি দিনের কথা নয় তথাকার ফ্রী স্টেট গভর্নমেণ্ট কয়েক সপ্তাহে ৮০ জনেরও বেশি লোককে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে।

দ্বিতীয়ত, স্পেন নিয়েও আমাদের ভাবনার অন্ত নেই; আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও সহকর্মী জিওফ্রে গ্যারাট ও অন্যান্য বন্ধুরা অনেকদিন যাবৎ সেখানেই আছেন। কংগ্রেসের সঙ্গে আপনার সম্পর্কটা যেমন আমার চেয়ে বেশি, তেমনি আবার স্পেনের সঙ্গে আমার সম্পর্ক আপনার চেয়ে বেশি। ভারতে থাকাকালীন, আমি জেনেছি যে বলপ্রয়োগে 'রাজদ্রোহ' দমন করবার জন্য একদল ভারতীয় ও বৃটিশ নির্মমভাবে প্রস্তুত হয়েছেন, অবশ্য যদি তেমন অবস্থার উদ্ভব হয় এবং ইংলণ্ডের সমর্থন পাবার জন্য তারা উত্তেজনার সৃষ্টি করতে পারেন। আমি মনে করতাম এবং আজও করি, যে, সময়মত ক্ষমতায় আসীন থেকে প্রয়োজনীয় আইনাদি প্রণয়ন করবার জন্য কংগ্রেসের মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করা উচিত। আর কংগ্রেস যদি মন্ত্রীত্ব গ্রহণ না করে তাহলে বিগত কুড়ি বছর ধরে যেমন ঘটেছে তেমিভাবে সাম্প্রদায়িক ও স্বার্থান্বেষী ব্যক্তিরা এর মধ্যে নিজেদের দলীয় ও ধর্মীয় লোক ঢোকাবে, এবং ফলে উদ্ভট, অকেজো ও অপদার্থ মন্ত্রীসভাই থেকে যাবে।

যাক, এর কোন কিছুতেই বিশেষ কিছু যায় আসে না। শুধু একথা যেন মনে না করেন যে, আপনার চিঠি লেখাটা পণ্ডশ্রম হয়েছে। আপনার চিঠিটা আমি গভীর মনোযোগ দিয়ে পড়েছি এবং এর প্রায় সবটাই খুব যুক্তিপূর্ণ। যদি মুসলীম সাম্প্রদায়িকতা থেকে নিস্কৃতি পেতে পারেন তবে একটা মস্ত কাজ হবে। আপনার চিঠি পড়ে মনে হচ্ছে যে, আপনারা জয়লাভ করছেন এমনকি সাম্প্রদায়িকদের বিরুদ্ধেও। আমি জানি আপনাদের শাসানো একটু বেশি কড়া হলে ওরা গায়ের জোর খাটাবে। আপনারা মুসলীম নৃপতিবর্গ ও মৌলভীদের বিরুদ্ধেও দাঁড়িয়েছেন কিনা? যাই হোক আমি আপনাদের সাফল্য কামনা করি। আমি জানি না কি করে আপনার এমন ধারণা হল যে, কংগ্রেস আন্দোলনকে আমি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আন্দোলন বলে মনে করিনে। আমি যদি আপনাদের সাহায্য করতে পারি নিশ্চয়ই করব। অবশ্য কি করে করব তা বলা শক্ত, তবে সুযোগ আসবেই; এবং যখন আসবে তখন আমার উপর বিশ্বাস রাখতে পারেন।

আপনার একান্ত
এডওয়ার্ড টমসন

গ্লিম্পসেস অফ হিস্ট্রি সম্পর্কে—

বইখানি পড়ে মনে হয় কেবল ইংরেজদের দোষ ধরা হয়েছে; এটা আপনার মত লোকের পক্ষে শোভন হয়নি। আমি হলে যে যে অংশে এদের উল্লেখ আছে সেগুলো খুব খুঁটিয়ে দেখতাম। আরও বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে ভারতের গুরুতর অভিযোগগুলো আপনি কেন ভদ্র ভাবে এবং ফলাও করে আলোচনা করেছেন; অথচ ভারতের প্রশ্ন জড়িত নেই এমন বিষয় আলোচনা কালে কিংবা যেসব ক্ষেত্রে ইংলণ্ডের কাজ যুক্তিসঙ্গত বলে বহু ঐতিহাসিক মত প্রকাশ করেছেন সেগুলোর উল্লেখ করবার বেলায়ও আপনার উদার মনোভাব প্রকাশ পায়নি। আমার বিশ্বাস, যে অংশে নেপোলিয়ন সম্পর্কে লেখা হয়েছে সেটাই এই বইখানির নিকৃষ্টতম অধ্যায়। স্বীকার করছি যে, আপনার নেপোলিয়ন-স্তুতির হেতুটা আমি ঠিক বুঝতে পারছিনে। ঐ কয়েক পৃষ্ঠায় নেপোলিয়নের দোষ ঢাকবার চেষ্টা করা হয়েছে বলে মনে করি। ডিউক ডি. এন্. হাইমের অথবা নুরেমবার্গে পুস্তক বিক্রেতা পামে-এর ঘৃণ্য

হত্যাকাণ্ড সম্বন্ধে এতে কোন উল্লেখই নেই। ইংরেজদের 'নীচাশয়তা'র নিন্দাটা বাস্তবিকই মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে। ১৮১৪ সনেও নেপোলিয়নের সঙ্গে খুবই ভাল ব্যবহার করা হয়েছিল; তা সত্ত্বেও তিনি যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে ইউরোপে রক্তস্রোত বইয়ে দিলেন। তখন তাঁর পক্ষীয় বুরবোঁরা কিংবা প্রুশীয়রা সুযোগ পেলে তাঁকে গুলী করে মেরে ফেলত। একথা ঠিক যে নেপোলিয়নের পতনের পর সর্বত্র একটা প্রতিক্রিয়ার যুগ এসেছিল এবং তাঁর বিজেতারাও ছিল মহা অপদার্থ। এদিকে যদিও তারা নেপোলিয়নকে গ্রাহ্যের মধ্যে আনেননি, তবু রাজাদের দেবদত্ত অধিকার মেনে নিয়ে তারা তাঁকে বিশেষ শাস্তি না দিয়েই ছেড়ে দিয়েছিল। এবং সেই সব নেপোলিয়ন-স্তুতি ও সেণ্ট হেলেনার ব্যাপারকে এত গুরুত্ব দিয়েছেন দেখে আমার অবাক লাগছে। আমার বইয়ের তাকে "সেণ্ট হেলেনার প্রকৃত শহীদ" সম্পর্কে একখানি পুরনো বই আছে। আশা থাক্ বা না থাক্ নেপোলিয়ন কিন্তু ওখান থেকে প্রত্যাবর্তনের জন্য যড়যন্ত্রকারী দলবল সহ নানাভাবে চেষ্টা করছিলেন; এমতাবস্থায় 'হাডসন লো'র জন্য আপনার দুঃখ হয় না কি? ঐ পৃষ্ঠা কয়টি পড়ে মনে হয় যেন আক্রমণে সাফল্যলাভ করাতেই আপনি তাঁর প্রশংসা করেছেন। এসব আর বাদ দেওয়া চলে না, এতে বইয়ের সুনাম নষ্ট হয়েছে। নিজেকেই জিজ্ঞাসা করে দেখুন না ১৮১৪ সনে বা ওয়াটারলুর পর মিত্রশক্তি কি করতে পারত অথবা কি করা তাদের উচিত ছিল, আর তাহলেই বা ব্যাপারটা কোথায় গিয়ে দাঁড়াত!

যুদ্ধের প্রসঙ্গেও আমার দেশবাসীর প্রতি আপনি অনুদার হয়েছেন। আপনার শব্দসম্ভার ও রচনায় এই ইঙ্গিত রয়েছে যে, আমরা কেবলমাত্র একটা নৌ অবরোধ খাড়া করেছিলাম আর যুদ্ধের খরচ যোগান দিয়েছিলাম। এক্ষেত্রে আপনি ভুল করেছেন বলে মনে করি; যেমন আমি অনেক সময় করেছি। অর্থাৎ এসব যেন বিতর্ক সভার নিস্পৃহ মনোভাব নিয়ে লেখা হয়েছে; এবং তাও এমন একটা ব্যাপার সম্পর্কে যেটা, ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত যারা, তাদের কাছে একান্তই সত্য ও শোচনীয় এবং যার পেছনে একটা বিশেষ মনোভাব রয়েছে। অনুগ্রহ করে এই ধরনের মনস্তাত্বিক ভুল করবেন না—কারণ এই ধরনের ভুলের জন্য অনেক মাশুল যোগাতে হয়। জালিয়ানওয়ালাবাগে জেনারেল ডায়ারের মনের অবস্থা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে আমি এরূপ ভুল করেছিলাম বলে আপনার মনে হয়েছে। আমি ত' মনে করি আপনিও সেই ভুল করেছেন, যুদ্ধের বিবরণ লিখতে গিয়ে, যে যুদ্ধে আমার দেশের দশ লক্ষাধিক সেরা যুবক প্রাণ হারিয়েছে, আমরা প্রত্যেকে কেউ ভ্রাতা, কেউ পুত্র, কেউ বা নিকট বন্ধু হারিয়েছি। প্রসঙ্গত বেলজিয়ম আক্রমণের ব্যাপারটাই ধরুন না; ঐ ঘটনার ফলাফল সম্পর্কে আপনি ত' সম্পূর্ণ ভুল কথা লিখেছেন। চব্বিশ ঘণ্টা আগে থাকতেই আক্রমণকারী সৈন্যবাহিনীর চলাচল শুরু হওয়াতে যা প্রমাণিত হয়েছে বলে আপনি লিখেছেন আদতে তার কিছুই নয়। আমি জানি ফ্রান্সের সঙ্গে যোগ দেওয়া আমাদের একান্ত প্রয়োজন ছিল, না হলে আমরা নিজেরাই ধ্বংস হতাম। যুদ্ধের সমসাময়িক একজন ইংরেজ হিসেবে এও জানি যে, বেলজিয়মের আক্রমণ আমার দেশবাসীকে হঠাৎ বিস্মিত করেছিল কেননা, যুদ্ধে নামবার দিনকয়েক আগেও বৃটেন মনে করেনি তার গায়ে যুদ্ধের ছোঁয়াচ লাগবে। জনসাধারণের কাছে বেলজিয়মের রাজা আবেদন করাতেই সকলে একজোট হয়ে গভর্নমেণ্টের পেছনে দাঁড়িয়েছিল; দেখা গেছে তখনকার দিনে বিভিন্ন জাতি তাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করত। কংগ্রেস সম্বন্ধে বলতে গিয়ে আমি যে ধরনের ভুল করি বলে আপনি বলে থাকেন—যেমন, সরকার কিংবা কর্মকর্তা কিংবা নেতৃগোষ্ঠির সমর্থক জনগণের কথা বিস্মৃত হই,—অন্য জাতিগুলোর সম্বন্ধে বলতে গিয়ে আপনিও কি তেমন ভুল

করেন না? যিনি দারুণ দুঃখভোগের পরেও অমন মহৎ ও উৎকৃষ্ট একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করতে পেরেছেন—আপনার 'আত্মজীবনী'র কথা বলছি—তিনি কি করে নিজের স্বাক্ষরে ভাবের দিক থেকে বিপরীত অন্য কিছু বিদেশীদের—বৃটিশই হোক কিংবা আমেরিকান—সমক্ষে উপস্থাপিত করতে পারেন? এই বইয়ের নানান জায়গায় অনুদারতা প্রকাশ পেয়েছে বলে আমি মনে করি। কিন্তু তার খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে আমি আপনাকে বিরক্ত করব না এবং সেভাবে বইটা আমি বিচারও করিনি। আপনার গ্রন্থটি একটি বিস্ময়কর কীর্তি। এ অবস্থায় আমি শুধু ঐ কথাই বলছি (আমার আগেই বলা উচিত ছিল), এবং কাল রাত্রে বইখানির পাতা উল্টাতে উল্টাতে যে সামান্য ভুলগুলি চোখে পড়ল তার উল্লেখ করছি।

পৃঃ ৬৫৯। মেটকাফ্ ১৮৩০ সনে সুপ্রীম কাউন্সিলের সদস্য ছিলেন, এবং ১৮৩৪ সনের পূর্বে গভর্নর (জেনারেল) হননি, কিংবা ১৮৩৫ সন পর্যন্ত (আগ্রার) গভর্নর ছিলেন না।

পৃঃ ৬৭৩। শেষের দিক থেকে চতুর্থ ছত্রে 'প্রোগ্রেস' কথাটির স্থলে 'প্রোফেস' হবে।

পৃঃ ৬৭৪। পরে সমর্থন করেছিলেন বটে কিন্তু বস্তুত রামমোহন রায় সতীদাহ প্রথা রদ করাটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে বলে মনে করেননি। কেবলমাত্র কয়েকটি ক্ষুদ্র সহজ নিয়ন্ত্রিত গণ্ডীর মধ্যে; যেমন (আমার বিশ্বাস) শ্রীরামপুরে দিনেমাররা, গোয়ায় পর্তুগীজরা এবং তাঞ্জোরে মারাঠারা ঐ প্রথা নিষিদ্ধ করেছিল। এ ছাড়া এমন কোনও শাসক আমার জানা নেই যে, অগে এই প্রথা নিষিদ্ধ করেছিল। তাও একেবারে বন্ধ হয়নি; উনিশ শতাব্দীতেও তাঞ্জোরে বিধবাদের দাহ করা হয়েছে। কিন্তু স্মরণ রাখতে হবে যে, অনেক সময় স্থানীয় কার্যকারণের দরুণ এই প্রথা বন্ধ করা সহজ হয়েছে। মালাবারে বংশে মাতার প্রাধান্য হেতু সেই উপকুলে সতীদাহ প্রথা বন্ধ হয়েছিল, এবং সেই মনোভাব সমগ্র দক্ষিণ ভারতে ছড়িয়ে পড়েছিল। মোগল সম্রাটদের মত মেটকাফও দিল্লীতে এই প্রথা নিবারণ করেছিলেন। আকবর ও শাজাহানের রাজত্বকালে অবশ্য সময়ে সময়ে লোকে এই নিষেধাজ্ঞা এড়িয়ে যেত। ১৬৬৫ সম্ভবত মাদ্রাজের একজন ব্রিটিশ গভর্নর ঐ সহরে সতীদাহের একটি ঘটনা বন্ধ করেছিলেন বলে আমি জানি। আমার হাতের কাছে এই সংক্রান্ত কোনও বইপত্র নেই, আর আমার লেখা নোটগুলিও হারিয়ে গেছে; তবে এটা সম্পূর্ণ অসত্য যে মারাঠারা সতীপ্রথা নিষিদ্ধ করেছিল। পুণার বিটিশ এজেণ্ট ম্যালেট ঘন ঘন সতীদাহ দেখে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলেন। "সঙ্গমের" ধারে উক্ত ম্যালেটের একটি বাড়ি ছিল; পরে সেটা এলফিনস্টোন দখল করেছিলেন। যেটা সত্য সেটা হচ্ছে এই যে ভারতে অনেক বিষয়ে মারাঠাদের মধ্যেই মানবিক ঐতিহ্য প্রকাশ পেয়েছে এবং তাদের দেশে সতীদাহের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম হয়েছে। কিন্তু শিবাজীর পরে পাইকারী হারে ক্রীতদাস-দাসী ও জন্তুদের হত্যাকাণ্ড থেকে শুরু করে ঐ রকম অসংখ্য ঘটনা ঘটেছিল। মারাঠাদের সম্বন্ধে আমার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও অনুরাগ রয়েছে। সেইযুগে মানবিকতার দিক থেকে তারা অবশ্য আমার দেশবাসীকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তাঞ্জোর ছাড়া আর কোথাও তারা সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধ করেনি, বরং তাঞ্জোরেও সফল হয়নি। আসল কথা, একজন মহৎ লোক এই প্রথা নিষিদ্ধ করেছিলেন এবং তিনি হলেন লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিক, সেটা স্বীকার করেন না কেন এবং একজন মহৎ লোককে শ্রদ্ধা জানাতেই বা কুণ্ঠা কেন? উজ্জয়িনীতে সতীদাহের অনেক গল্প প্রচলিত আছে; মহেশ্বরে অহল্যা বাঈদের পুত্রবধূই আগুনে ঝাঁপ দিয়েছিল।

পৃঃ ৬৮৪। হাঁ, দেখছি আপনিও ঠিক ধরেছেন যে মহর্ষি ছিলেন রবীন্দ্রনাথের পিতা।

পৃঃ ৬৯৯। পিকিং লুণ্ঠনের অনেক কাহিনী আমি প্রত্যক্ষভাবে শুনেছি এবং চীনাদের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করা হয়েছে বলে আপনি লিখেছেন তার অনেকক্ষেত্রে আমি আপনার সঙ্গে একমত। কিন্তু মিশনারী মাত্রই দুর্জন, আপনার এই কথা আমি মোটেই বিশ্বাস করিনে। নিহত মিশনারীদের অনেকেই "চায়না ইন্‌ল্যান্ড মিশনের" অন্তর্ভুক্ত ছিল; ওটা একটা অসাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান; সদস্যরা নেহাৎ দীন-দরিদ্র, ওদের কোন ক্ষমতা ত' নেই-ই, এমনকি মাসে মাসে বেতনটার জন্যও অদৃষ্টের উপর নির্ভর করে থাকতে হয়। অবশ্য একথা সত্যি যে মিশনারীদের হত্যাকাণ্ডকে জার্মানী কিয়াওচো অধিকারের ছুতো হিসেবে ব্যবহার করেছিল। আর ঠিক সেই সময়ে বৃটিশ মিশনারী সোসাইটিগুলি (অতীতের কথা স্মরণ থাকা সত্ত্বেও বলছি,—উদ্দেশ্য মহৎ না হলেও তাদের ভাল কাজের সুখ্যাতি করুন) লক্ষ্য রেখেছিল যাতে তাদের গভর্নমেণ্ট মিশনারীদের হত্যাকে নিজেদের উদ্দেশ্য-সিদ্ধির কাজে না লাগায়। আমি মনে করি মিশনারীদের কথাটা আপনি ঠিক মত বিবেচনা করেননি; বইয়ের চীন সম্পর্কিত অংশ পড়ে মনে হয় মিশনারীরাই সব কিছুর মূলে, কিন্তু বস্তুত তা নয়। পিকিংএর লুণ্ঠনকর্ম মিশনারীদের দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল। (পৃঃ ৭২২) আপনার এই উক্তির প্রমাণ কোথায়? আমার কিন্তু এতে সন্দেহ আছে।

পৃঃ ৭৮০ ff. পারস্যদেশ। যদি বৃটেনের প্রকৃতই ইচ্ছা থাকত তাহলে যুদ্ধ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই অনায়াসে পারস্য অধিকার বা রক্ষার ব্যবস্থা করতে পারত। কামাল কর্তৃক গ্রীকদের পরাজয়ের সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক তো আমি দেখতে পাইনে (যদিও আপনি সোজা কথায় বলেছেন যে, এটা বৃটেনের ফন্দির পরাজয় কিন্তু সম্ভবত আপনি জানেন যে এর জন্য একা লয়েড জর্জই দায়ী।) আসল কথা, আমাদের গভর্নমেণ্টও বুঝতে পেরেছিলেন যে, সাম্রাজ্যবাদী কাজ-কারবারের শুরু থেকে এযাবৎ অনেক তার দখলে এসেছে, সুতরাং পারস্যের দশা যা হোক না কেন, তা নিয়ে আর মাথা ঘামায়নি। এমন কি আমাদের মিত্র, মহম্মেরার শেখকেও—স্বাধীনতা হারাতে হয়েছিল; তাকে জোর করে নিয়ে যাওয়া হয় তেহরাণে, আর তার রাজ্য পারস্যের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। আমার মনে হয়, যুদ্ধের শেষে সব ব্যাপারে যে রকম বিভ্রান্তি ও জটিলতার সৃষ্টি হয়েছিল সে সম্বন্ধে আপনার ধারণা নেই। বলশেভিকদের যে একটা গুরুত্ব আছে সে সম্বন্ধে আমাদের কোন ধারণা ছিল না। তারা যখন প্রথম ক্ষমতাপন্ন হয়ে উঠল তখন আমি টাইগ্রীসের পূর্বতীরবর্তী অঞ্চলে ছিলাম। আমার মনে আছে (নভেম্বর, ১৯১৭) ব্যাপার দেখে শুনে আমাদের সেনাপতিরা যেন কৌতুক বোধ করেছিল আর কিছুটা হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছিল। আপনার কি মনে হয় না যে এস্থলে এমন বিষয় আপনি উল্লেখ করেছেন যা বস্তুত পরবর্তী কালে ঘটেছিল?

পৃঃ ৮৮২। বৃটিশরা ওয়াশিংটন সহরটা পুড়িয়ে দিয়েছিল এটা ঠিক কিন্তু খুব অন্যায় করেছিল। তবে আগে আমেরিকাবাসীরা কানাডার ঘরবাড়ী ও পুরানো বইপত্রের দপ্তরখানা নির্মমভাবে জ্বালিয়ে দিয়েছিল বলেই ইচ্ছা করে প্রতিশোধ নেওয়া হয়েছিল।

পৃঃ ৯৬৮। এ বিষয়ে আগেই উল্লেখ করেছি। "ইংলণ্ড বহু আগে থেকেই তার মতলব ঠিক করে রেখেছিল। এবং পরে বেলজিয়ামের ব্যাপারটা একটা সুবিধা-জনক অজুহাত হিসেবে খাড়া করে রেখেছিল"—একথা আমি বিশ্বাস করিনে। আমি বেশ ভালভাবেই জানি আপনি কি বলতে চান। কিন্তু এই ধরনের বক্তব্য

অনুদার ভঙ্গীতে প্রকাশ করার একটা বিপদ আছে। ব্যাপারটা সঠিক হলেও লোকে বিশ্বাস করতে চায় না। আপনি নেহরু, আপনার পক্ষে এইভাবে লেখা শোভা পায় না। আপনি ত' রামানন্দ চ্যাটার্জি কিংবা শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ নন। আপনি হচ্ছেন জওহরলাল নেহরু; একজন ইংরেজ সে কথাটা আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে বলে ক্ষমা করবেন।

পৃঃ ৪৬৫। ডাইনীদের জীবন্ত পুড়িয়ে মারা সম্পর্কে,—ইউরোপের মূল ভূখণ্ডে এবং স্কটল্যাণ্ডে তাদের পোড়ান হয়েছিল বটে, কিন্তু আমার বিশ্বাস ইংলণ্ডে ডাইনী পোড়াবার একটিও নজীর নেই। তাদের ফাঁসী দেওয়া হয়েছে—অথবা ডুবিয়ে মারা হয়েছে। যাহোক এটা একটা তুচ্ছ ব্যাপার। কিন্তু আমার মনে আছে যে "আমেরিকাস্থ ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি" সেই গর্দভ শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ বোস্টনে এক সভায় বলেছিলেন, "১৮১৮ সালেও আপনারা বোস্টনের প্রকাশ্য স্থানে ডাইনীদের জীবন্ত পুড়িয়ে মেরেছেন, সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত শ্রোতৃবৃন্দ (মেয়েদের সংখ্যা ছিল বেশী) একসঙ্গে দাঁড়িয়ে উঠে সমস্বরে চীৎকার করে বলল 'না'!!! তিনটি কারণে বোস্টনের লোকের ক্ষুব্ধ হয়েছিল—সনটা ১৮১৮ না হয়ে ১৬৯০ হবে, জায়গাটা ছিল সালেম, বোস্টন নয়, আর তাদের পোড়ান হয়নি, ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল। তারপর তাঁর বক্তৃতার প্রতিটি কথায় সকলে টিটকারী দিয়েছিল।

প্রসঙ্গক্রমে বলছি যে, মানবজাতির ইতিহাস অতি শোচনীয় হলেও ইংরেজ-জাতির তিনটি গুণ আছে, যা আপনি বিশ্বাস করতে পারেন। অন্য যে কোনও জাতির অপেক্ষা অনেক আগে আমরা ডাইনি নিধনকার্য ত্যাগ করেছি, আদালত-ঘটিত অত্যাচারও আমরা আগে বন্ধ করেছি। এবং ক্রীতদাসদের মুক্তির জন্য যে মূল্য দিতে হয়েছে সেটা আমাদের পক্ষে সত্যি একটি মহৎ কাজ হয়েছে। কদাচিৎ হলেও আমাদের প্রাপ্য প্রশংসাটা যেন আপনি দেন। এতে আপনার সমালোচনা আরও বেশি জোর ধরবে।

পৃঃ ৪৮১ এবং অন্যত্র। 'অশোকের' পরিবর্তে 'অশোকা' নামকরণ সুন্দর হয়নি।

পৃঃ ৫০৭। অন্ধকূপ সম্পর্কে সঠিক মন্তব্য এই নয় যে, ওটা উদ্ভাবন করা হয়েছিল (আমি তা বিশ্বাস করিনে); আমি বলি ওটা নেহাৎ বোকামির কাজ, উদ্দেশ প্রণোদিত শয়তানি নয়; এবং ১৯১৮ সালে মোপ্‌লা বন্দীদের শ্বাসরোধ করে মারাও "ঠিক একই ধরনের" বোকামি হয়েছিল (যা আরও কম ক্ষমার্হ)।

পৃঃ ৫১০। যখন আপনি বলেন দাক্ষিণাত্যে মারাঠারা ইংরেজদের পরাজিত করেছিল আমি অনুমান করি আপনি 'ডেকান' কথাটার আক্ষরিক অনুবাদ করেছেন। দক্ষিণ অঞ্চল বলতে কিন্তু আমরা মহীশূরের আশপাশই বুঝি, ওয়ারগাঁও অঞ্চল নয়।

পৃঃ ৫৫৯। আপনি মনে করেছেন তেরটি কলোনীর সঙ্গে ইংরেজের কলহটা সাধারণ ব্যাপার; কিন্তু তা বিশ্বাস করা কঠিন। যুদ্ধের ফলে লাভবান হওয়া সত্ত্বেও তাদের নীচতা, যুদ্ধের খরচ দেবার অনিচ্ছা, ইত্যাদি সম্পর্কে ইংলণ্ডের বলার কিছু ছিল না, আপনার এই অভিমতও মেনে নেওয়া যায় না। আমি মনে করি এই অংশগুলি গ্রন্থটির সাধারণ মানের চেয়ে নীচু স্তরের হয়েছে। সম্ভবত কোন ভাল আমেরিকান ঐতিহাসিক এগুলো অনুমোদন করবেন না। যুদ্ধে যোগদানের জন্য ইংলণ্ড আগে থেকেই প্রস্তুত ছিল, বেলজিয়ম আক্রমণকে সাক্ষাৎ 'অজুহাত' পেয়েছিল মাত্র, এই যদি আপনার অভিমত হয় তবে প্রতিনিধিত্ব ব্যাতিরেকেই কর ধার্যের মানেটা কি? কিন্তু আপনি নিশ্চয়ই জানেন এছাড়াও কত গূঢ় কারণ ছিল।

দক্ষিণাঞ্চলের রাষ্ট্রগুলিও একেই পৃথক হবার অধিকার দাবী করছিল; তাতে আবার সেই তেরটি কলোনী একযোগে এত কম কাজ করেছিল যে, যখন গৃহযুদ্ধ আরম্ভ হল তখন ঐ রাষ্ট্রগুলি আইনের দিক থেকেও সুবিধা পেয়ে গেল। ১৭৮৯ সালে (সম্ভবত) ভার্জিনিয়ার বিপক্ষে এই অধিকার সম্পর্কে কোনও প্রশ্ন তোলা হয়নি। কিন্তু আপনি ত' জানেন, আমেরিকার নব্যযুগের ঐতিহাসিকরা সেই রাষ্ট্র-বিপ্লবের যুদ্ধকে কি ভাবে বর্ণনা করে থাকেন।

পৃঃ ৬০৯। পরিশেষে শেষ প্যারাগ্রাফটা সম্বন্ধে নিজে আবার একটু ভেবে দেখবেন এবং আপনার বিবেচনায় "ভদ্র এবং উদার ব্যবহার" কাকে বলে আমাকে তা জানাবেন।

এ এক মহান কীর্তির অতিক্ষুদ্র সমালোচনা। আপনিই এটা চেয়েছিলেন। কিন্তু আমি বেশ ভালভাবেই জানি যে, কোনও ক্ষতি না করেও যে-কথা মুখে বলা যায় সেটাই লিপিবদ্ধ করলে সব সময়ই অপ্রীতিকর হয়ে দাঁড়ায়। আপনার বিরুদ্ধে এসবের চাইতেও আমার গুরুতর অভিযোগ আছে ঃ আপনি ঐ তিনখানি বইতে আমার নাম লিখে দেননি। তিন টুকরা কাগজে "এডওয়ার্ড টমসন ফ্রম জওহরলাল নেহরু" এই কথা কয়টি আপনার লিখে পাঠান উচিত ছিল বলে মনে করি।

ইন্দিরাকে বলতে ভুলবেন না এখানে এলেই যেন উনি আমাদের সঙ্গে দেখা করেন। প্যাট্রিসিয়া এ্যাগনু আমার স্ত্রীর এক প্রিয়তমা বান্ধবীর (যিনি সম্প্রতি মারা গেছেন) কন্যা। শুভেচ্ছা জানবেন।

আপনার একান্ত
এডওয়ার্ড টমসন

১৭৫ মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক লিখিত

সেবাগ্রাম, ওয়ার্ধা,
২৫শে জুন, ১৯৩৭

প্রিয় জওহরলাল,

এইমাত্র সীমান্ত প্রদেশ সম্পর্কিত নীতির উপর তোমার বিবৃতিটা পেলাম। খান সাহেব আর আমি ওটা পড়লাম। আমার খুব ভাল লেগেছে। আচ্ছা, ব্রিটিশ এবং স্পেনীয় বোমাবর্ষণ, এ দুটোই কি ঠিক এক রকম? ব্রিটিশের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণটা জানা গেছে কি? ব্রিটিশ কর্তৃক বোমাবর্ষণের কি অজুহাত দেখান হয়েছে? এসব ব্যাপার আবার তোমাদের মত আমার ভাল জানা নেই, সুতরাং রাগ কোর না বা হেসো না। খবরের কাগজ আমি কমই পড়ি, সুতরাং তা থেকে খুব সামান্যই জানিতে পারি। কিন্তু আমার ঐ প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্য ব্যস্ত হয়ো না। তোমার বিবৃতির কি প্রতিক্রিয়া হয় তা লক্ষ্য করব। হয়ত এ বিষয়ে কিছু আলোকসম্পাত করবে। আর নয়ত সাক্ষাৎমতে তুমিই সে অভাব পূরণ করবে। আশা করছি মৌলানাও আসবেন। কিন্তু যদি তিনি না-ই আসেন তুমি ঐ তারিখটি বজায় রাখবে; আশা করি তিনটে দিন যেন একটু নিরিবিলি কাটাতে পারি। আশা করি ইন্দু ভাল আছে।

ভালবাসা জেনো
বাপু

১৭৬ মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক লিখিত

সেবাগ্রাম, ওয়ার্ধা,
(তারিখ নেই)

প্রিয় জওহরলাল,

তোমার চিঠিগুলো আমার ভাল লাগে। তাতে এমন অনেক খবর থাকে যা আমি অন্য কোন রকমে পাইনে। প্যান-ইসলাম আন্দোলন সম্বন্ধে আমি কিছুই জানতাম না। কিন্তু এতে আমি খুব আশ্চর্যও হইনি। সাক্ষাৎকার সম্পর্কে আমার বিবৃতিটা তুমি দেখে থাকবে। তুমি আমার কাজের পদ্ধতি তো জানই। এইসব দেখা-সাক্ষাতের ফলে আমার ক্ষমতা বাড়ে। দেশের লোকে যাতে আমার কাজের প্রকৃত তাৎপর্য বুঝতে পারে, তোমার এবং অন্যান্য সহকর্মীদের তা দেখা দরকার। সি. আর. সম্বন্ধে তুমি ভেবো না। তিনি ঠিক আছেন। তথাপি যে যে বিষয়ে তোমার দ্বিধা আছে সেগুলো নিয়ে ওঁর সঙ্গে আলোচনা করতে পার। ১৫ তারিখ বিকেলে আমি শান্তি নিকেতন রওনা হচ্ছি এবং সেখান থেকে ১৯শে যাব ওয়ালিকান্দা।

ভালবাসা জেনো
বাপু

১৭৭ মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক লিখিত

সেবাগ্রাম, ওয়ার্ধা
১০ই জুলাই, ১৯৩৭

প্রিয় জওহরলাল,

গতকাল মৌলানা সাহেবের সঙ্গে আমার অনেক কথা হয়েছে। প্রদেশগুলিতে মুসলমান মন্ত্রীদের মনোনয়ন ব্যাপারে যদি তাঁর পরামর্শ নিতেই হয় তবে আমি মনে করি জনসাধারণকে তা আগে জানিয়ে দেওয়া দরকার। মৌলানা এতে রাজী আছেন। আর যদি তুমি মনে কর ওয়ার্কিং কমিটির সঙ্গেও আলোচনার প্রয়োজন আছে, তাহলে সেটা টেলিগ্রামে করা হোক।

আশা করি, তুমি হিন্দী-উর্দু প্রসঙ্গটা নিয়ে শীঘ্রই লিখবে।

তোমার একান্ত
বাপু

১৭৮ মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক লিখিত

সেবাগ্রাম, ওয়ার্ধা
১৫ই জুলাই, ১৯৩৭

অসংশোধিত

প্রিয় জওহরলাল,

আজই নির্বাচনের দিন। আমি অপেক্ষা করে আছি। এই চিঠি লেখার উদ্দেশ্য হল তোমাকে জানানো যে, আমি কংগ্রেস মন্ত্রিসভার কর্তব্য কার্য এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয় সম্বন্ধে লিখতে শুরু করে দিয়েছি। প্রথমটা আমি ইতস্ততঃ করেছিলাম; কিন্তু ব্যাপারটা নিয়ে আমার মনে একটা তোলপাড় চলছে কিনা, তাই ভাবলাম আমার লেখাই উচিত। 'হরিজন' পত্রিকার জন্য লেখা আমার প্রবন্ধের একটা কপি তোমাকে আগে পাঠাতে পারলে ভাল হোত। মহাদেব ওটা দেখবে। যদি তার কাছে কোনও কপি থাকে তাহলে সে তোমাকে পাঠাবে। তুমি পড়ে আমাকে জানিও আমি ও ভাবে লিখে যাব কিনা। সমস্ত ব্যাপারটাই তুমি পরিচালনা করছ, আমি তাতে হাত দিতে চাইনে। কেননা, দেশের কাজে আমার সর্বাপেক্ষা

প্রত্যাশা তোমার কাছে। আমার লেখার দরুণ যদি তুমি বিব্রত বোধ করে থাক তবে সেটা স্পষ্টত ক্ষতির কারণ হবে।

আশা করি মৌলানার সম্বন্ধে লেখা আমার চিঠিটা পেয়েছে।

ভালবাসা জেনো
বাপু

১৭৯ মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক লিখিত

সেবাগ্রাম, ওয়ার্ধা
২২শে জুলাই, ১৯৩৭

প্রিয় জওহরলাল,

মৌলানা সাহেব একদিনের জন্য ওয়ার্ধায় এসেছিলেন। তাঁর সঙ্গে অনেক কথাবার্তা হল। পরিষদের মুসলীম লীগ সদস্যদের সঙ্গে কংগ্রেস সদস্যদের যে একটা চুক্তি হয়েছে তার খসড়াটা আমাকে দেখালেন। দলিলটা ভাল হয়েছে বলেই তো মনে হল। কিন্তু মৌলানা বললেন, যে এটা তোমার পছন্দসই হয়েছে কিন্তু ট্যাণ্ডনজীর হয়নি। মৌলানার কথা মত আমি ট্যাণ্ডনজীকে এ বিষয়ে লিখেছি কিন্তু আপত্তির কারণটা কি?

৫০০৲ (পাঁচশ' টাকা) বেতন এবং তদুপরি বড় বাড়ী ও মোটরগাড়ী ভাতা ইত্যাদি সম্পর্কে কঠোর সমালোচনা হচ্ছে। যতই ভাবছি, ততই শুরুতেই এতটা বাড়াবাড়ি আমার খারাপ লাগছে। এ সম্পর্কেও মৌলানার সঙ্গে আমার কথা হয়েছে।

ইন্দু কেমন আছে?

ভালবাসা জেনো
বাপু

১৮০ বল্লভভাই প্যাটেল কর্তৃক লিখিত

কংগ্রেস হাউস,
বোম্বাই-৪
৩০শে জুলাই, ১৯৩৭

গোপনীয়

প্রিয় জওহরলাল,

গত কয়েক দিনের মধ্যে কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার উদ্ভব হওয়াতে আমি ২৭শে তারিখে ওয়ার্ধায় গিয়েছিলুম; আবার আজ সকালে ফিরেছি। বাপুর সঙ্গে নানান বিষয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে। বিভিন্ন প্রদেশে যে বেতন এবং ভাতার হার স্থির হয়েছে তার বিবরণ শুনে তিনি স্পষ্টতই খুব উদ্বিগ্ন হয়েছেন। বাপুর সঙ্গে আলোচনার পর বিভিন্ন বিষয়ে যে সব নির্দেশ রচনা করা হয়েছে তার একটি খসড়া আপনার অনুমোদনের জন্য এইসঙ্গে পাঠালাম; আপনার যেমন ইচ্ছা অদল বদল করতে পারেন। কিন্তু বিষয়টি জরুরী বলে খসড়া নির্দেশাবলীর কপি ছ'জন মুখ্যমন্ত্রীকে তাঁদের জ্ঞাতার্থে অগ্রিম পাঠান হল, অবশ্য বলে দেওয়া হল যে, এগুলি খসড়া নির্দেশের অগ্রিম কপি এবং আপনার অনুমোদন সাপেক্ষ। আপনার সমর্থন পেলেই চূড়ান্ত নির্দেশ ওঁদের জানিয়ে দেওয়া হবে।

খবরের কাগজে দেখলাম আপনার প্রদেশে মুসলীম লীগের সঙ্গে কথাবার্তা নিস্ফল হয়েছে। বর্তমানে এই রকম কোনও মীমাংসার আশা করা যায় না।

ওয়ার্ধা থেকে প্রত্যাবর্তনের পর মিঃ নরীম্যানের প্রতিহিংসা প্রবৃত্তিটা যেন আরো বেশি তীব্র হয়ে উঠেছে। সংবাদপত্রগুলো রীতিমত ইতরামি ও ভয় প্রদর্শন

করছে। আপনি নিশ্চয়ই সংবাদপত্রে নরীম্যানের সর্বশেষ বিবৃতিটা দেখে থাকবেন। তিনি তদন্ত দাবী করেছিলেন, কিন্তু দেখা যাচ্ছে এখন সেটাকে কোনও প্রকারে এড়িয়ে যেতে চাইছেন এবং সেজন্যে তিনি ওয়ার্কিং কমিটির উপর দোষারোপের চেষ্টা করছেন। তিনি বাপুর সঙ্গে চিঠিপত্র লেখালেখি করছেন এবং সম্ভবত শীঘ্রই বাপু তাঁর শেষ কথা সংবাদপত্রের মারফৎ জানিয়ে দেবেন। আপনার চিঠির কয়েকটি অংশ উধৃত করে নরীম্যান তাঁকে লিখেছেন। যদি প্রয়োজন হয় তাহলে ঐ চিঠিটা যাতে পুরোপুরি প্রকাশ করা যায় সেজন্য আপনার অনুমতি চাই। সমস্ত বাক-বিতণ্ডা থেকে আমি আপাতত দূরে সরে আছি; অবশ্য বিতণ্ডা একতরফাই চলছে। বাপুর বিবৃতি প্রকাশের পর হয়ত আপনাকেও একটা বিবৃতি দিতে হতে পারে, তাই তাঁদের মধ্যে যে সমস্ত চিঠিপত্র বিনিময় হয়েছে আপনার অবগতির জন্য তার নকল আমি আপনাকে আগামী কাল পাঠিয়ে দেব। দিন কয়েকের জন্য আমি আগামী কাল আমেদাবাদ যাচ্ছি। আশা করি ভাল আছেন।

আপনার একান্ত
বল্লভভাই

পুনশ্চ—চিঠিটা সই করবার পরেই এ. পি. থেকে খবর পেলাম নরীম্যান তদন্তের দাবী প্রত্যাহার করে এইমাত্র এক দীর্ঘ বিবৃতি প্রচার করেছেন। কিন্তু তিনি অভিযোগগুলি প্রত্যাহার করেন নি। অথচ একজন ভদ্রলোক হিসেবে তাঁর সেটা করা উচিত ছিল। বাপু সত্বর একটা বিবৃতি প্রচার করছেন; আপনি তারপরে শেষ একটা বিবৃতি যেন দেন।

পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু
এলাহাবাদ।

১৮১ মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক লিখিত

সেবাগ্রাম, ওয়ার্ধা,
৩০শে জুলাই, ১৯৩৭

প্রিয় জওহরলাল,

হিন্দী ভাষার উপরে তুমি যে প্রবন্ধ লিখে পাঠিয়েছ তার প্রাপ্তিসংবাদ মহাদেবের কাছে পেয়ে থাকবে; তা ছাড়া ভাইসরয় যে আমাকে ৪ঠা তারিখে দিল্লী যাবার নিমন্ত্রণ জানিয়েছেন—কোন বিশেষ কারণে নয়, নিছক দেখা সাক্ষাতের অভিপ্রায়ে—সে খবরটাও আশা করি মহাদেব তোমাকে দিয়েছেন। ঐ আমন্ত্রণের উত্তরে আমি জানিয়েছি যে, আমার সীমান্ত ভ্রমণের ইচ্ছা এবং খান সাহেবের উপর নিষেধাজ্ঞা জারী সম্পর্কে আমি যে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাই, এটা তিনি পূর্বেই বুঝতে পেরেছেন। যাহোক আমি ৪ঠা তারিখে দিল্লী পৌঁছব। সাক্ষাৎকারের সময় বেলা সাড়ে এগারোটা; সুতরাং আশা করছি সেই দিনই দিল্লী থেকে রওনা হয়ে ৫ই তারিখে আমি সেবাগ্রামে ফিরতে পারবো।

বোম্বাইয়ের সাম্প্রতিক দাঙ্গা এবং অশুভ হিন্দী-উর্দু বিতণ্ডার ব্যাপারে আমার যে মানসিক প্রতিক্রিয়া হয়েছিল তা জানিয়ে জাকিরকে আমি একটা চিঠি লিখেছিলাম। তার উত্তরে জাকির আমাকে যে চিঠি লিখেছে তার একটা নকল পাঠাবার জন্য তোমাকে এই চিঠি লিখছি। এই সুচিন্তিত চিঠিখানি তোমারও দেখা দরকার বলে আমি মনে করি।

ঝাঁসীর নির্বাচনকে আমি চূড়ান্ত পরাজয় বলে মনে করি না। এ পরাজয় গৌরবের এবং এর দ্বারা এই আশাই সূচিত হচ্ছে যে, যদি আমরা এভাবে ধীরভাবে

অগ্রসর হই, তাহলে মুসলমানদের কাছে কার্যকরীভাবে কংগ্রেসের বাণী পেঁৗছে দিতে পারব। তবে আমি এখনও এই মত পোষণ করি যে, আসল কাজ ব্যতিরেকে গ্রামে গ্রামে কেবলমাত্র বাণী প্রচার করলে পরিণামে তারা আমাদের প্রয়োজনে সাড়া দেবে না, কিন্তু সব নির্ভর করছে আমাদের কার্যপ্রণালীর উপর, কিভাবে আমরা তাদের উদ্বুদ্ধ করব।

মাদ্রাজে মেহের আলীর বক্তৃতা আমার চোখ খুলে দিয়েছে। জানিনে তিনি সাধারণ সমাজতান্ত্রিক অভিমত কতটা পোষণ করেন। তাঁর বক্তৃতার কাটিং রাজাজী আমাকে পাঠিয়েছেন। আশা করি তোমাকেও এক কপি পাঠিয়েছেন। বক্তৃতাটি খুব খারাপ হয়েছে বলে মনে করি, তুমি সেটা খেয়াল করবে। পড়ে দেখলাম এগুলো কংগ্রেসের নীতির বিরুদ্ধে যাচ্ছে।

মাদ্রাজে আবার রায়ও বক্তৃতা দিয়েছেন। তুমি এসবের 'কাটিং' পাও মনে করি। তবু পিয়ারীলাল আমার জন্য যে সমস্ত 'কাটিং' রেখেছে তোমার আশু অবগতির জন্য সেগুলি এই সঙ্গে পাঠাচ্ছি। রায় আমাকেও চিঠি লিখছেন। তার শেষ চিঠিটা তোমার দেখা দরকার। যদি নষ্ট না করে থাকি তাহলে এই সঙ্গে পাঠাব। তাঁর মনোভাবটা তোমার কেমন লাগছে? আমি ত' তোমাকে আগেই বলেছি আমি তাঁকে বুঝতে পারছিনে। তুমি খদ্দরকে "লিভারি অফ্ ফ্রীডাম" আখ্যা দিয়েছ। ভারতবর্ষে যতদিন আমরা ইংরেজী ভাষায় কথাবার্তা বলব ততদিন তোমার এই কথাটা স্থায়ী হবে। এই সুন্দর প্রবচনটির যে অন্তর্নিহিত ভাব তা হিন্দীতে রূপান্তরিত করার জন্য একজন প্রথম শ্রেণীর কবির প্রয়োজন। আমার কাছে এটা শুধুমাত্র কাব্য নয়। এতে এক মহাসত্য উচ্চারিত হয়েছে যার প্রকৃত তাৎপর্য আমরা এখনও হৃদয়ঙ্গম করতে পারিনি।

ভালবাসা নিও

বাপু

যেখানে মেহের আলীর বক্তৃতার উল্লেখ করেছি তার পরের প্যারাতেই আবার রায়ের বক্তৃতার কথাটা লিখেছি; এর দ্বারা আমি বলছিনে যে, রায়ের বক্তৃতা ঐ একই পর্যায়ে পড়ে।

১৮২ মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক লিখিত

ট্রেন কামরা

৩রা আগস্ট, ১৯৩৭

প্রিয় জওহরলাল,

দিল্লিগামী ট্রেনে বসে তোমাকে এ চিঠি লিখছি। এই সঙ্গে আমার মুখবন্ধ বা যা কিছু বল পাঠাচ্ছি। আরও বিশদ করে লিখতে পারলাম না।

পুস্তু এবং পাঞ্জাবী কথা দুটোর আগে তুমি 'সম্ভবত' কথাটি ব্যবহার করেছ। ঐ ক্রিয়া বিশেষণটি বাদ দাও। এই যেমন খান সাহেব, তিনি কখনও পুস্তু ছাড়বেন না। আমার ধারণা ওটা কোনো একটা হরফে লেখা হয়, তবে সেটা কি আমি ভুলে গেছি। আর পাঞ্জাবী? গুরুমুখী অক্ষরে লেখা পাঞ্জাবীর জন্য শিখেরা মরতে পারে। ও লিপিমালার কোন সৌন্দর্য নেই। কিন্তু শুনেছি শিখজাতিকে অন্যান্য হিন্দুদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করার উদ্দেশ্যে সিন্ধী-লিপির মতই ওটা বিশেষ করে উদ্ভাবন করা হয়েছিল। যাই হোক না কেন, বর্তমানে জোর করে শিখদের গুরুমুখী পরিত্যাগে রাজী করান অসম্ভব বলে মনে করি।

দাক্ষিণাত্যের চারটি ভাষার মধ্যে থেকে একটা সাধারণ লিপি উদ্ভাবন করার

প্রস্তাব তুমি করেছ। আমার মনে হয় চারটি ভাষার সংমিশ্রণের পরিবর্তে দেবনাগরি লিপি গ্রহণ করা তাদের কাছে সহজ হবে। বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী থেকে দেখলে ঐ চারটি ভাষার যোগে একটা মিশ্রণ উদ্ভাবন করা যাবে না। সংস্কৃতের সঙ্গে যে সমস্ত প্রাদেশিক ভাষার মূলত সংযোগ রয়েছে—যদি সংস্কৃতের একটা অঙ্গ না হয়—তবে তারা দেবনাগরী হরফই গ্রহণ করতে পারে, এই হল সাধারণ অভিমত; আমার ইচ্ছা তুমি এই মতই সমর্থন কর। হয়ত জান এই ধরনের প্রচারকার্য চলছে। তাছাড়া তোমার আমার চিন্তাধারা যদি এক হয় তাহলে তুমি এ আশা প্রকাশ করতে দ্বিধা কর না যে, হিন্দু আর মুসলমান একদিন একাত্ম হবেই এবং তারা হিন্দুস্থানী ভাষা বললেও একই লিপিমালা অর্থাৎ দেবনাগরী গ্রহণ করবে; কারণ এই লিপি অধিকতর বিজ্ঞানসম্মত এবং সংস্কৃত থেকে উৎপন্ন ভাষাগুলির প্রাদেশিক মহান লিপিমালার সমজাতীয়।

তুমি আমার প্রস্তাব যদি আংশিক বা সম্পূর্ণ গ্রহণ কর তাহলে যে যে স্থানে অদল-বদল প্রয়োজন ত্রুটি নির্দেশে সেই জায়গাগুলি চিহ্নিত করতে তোমার কোন বেগ পেতে হবে না। তোমার সময় বাঁচাবার জন্য আমার নিজেরই ঐরূপ করার ইচ্ছে ছিল কিন্তু আমার শরীরের ওপর এখন এই অতিরিক্ত পরিশ্রম চাপান ঠিক হবে না।

আমার ধারণা এই যে, তোমার প্রস্তাব আমার অনুমোদন করার মানে এই নয় যে, আমি হিন্দী সম্মেলনকে হিন্দী শব্দটিকে বর্জন করতে বলব। তুমি যে এই মানে করবে না সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত। আমার পক্ষে যতদূর সম্ভব এই নিয়ে চিন্তা করেছি।

যদি তুমি আমার মতামত গ্রহণ করতে না পার তাহলে নির্ভুলতার জন্য 'ভূমিকায়' নিম্নলিখিত বাক্যটি যোগ করে দিলে ভাল হয়—"অন্তত এটা মোটামুটি অনুমোদন করতে আমার মনে কোনও দ্বিধা নেই।"

আশা করি ইন্দুর অপারেশন নির্বিঘ্নেই সম্পন্ন হবে। ভালবাসা নিও।

বাপু

১৮৩ মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক লিখিত

৩রা আগস্ট, ১৯৩৭

হিন্দী-উর্দুর প্রশ্নে জওহরলাল নেহরুর প্রবন্ধটি অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে পড়লাম। সমস্যাটা শেষের দিকে এক অপ্রীতিকর বিতণ্ডায় পরিণত হয়েছে। অবস্থার এই অপ্রীতিকর পরিবর্তনের কোন ন্যায্য কারণ নেই। যাই হোক, জাতীয়তা এবং কেবলমাত্র শিক্ষার দিক থেকে বিচার করলে দেখা যাবে, বিষয়টির উপযুক্ত ব্যাখ্যায় জওহরলালের প্রবন্ধ এক অমূল্য অবদান। তাঁর গঠনমূলক প্রস্তাবগুলি যদি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা ব্যাপকভাবে গ্রহণ করেন তাহলে যে মতদ্বৈধতা সাম্প্রদায়িকতার দিকে তার অবসান ঘটবে। প্রস্তাবগুলি ব্যাপক এবং খুবই যুক্তি-সঙ্গত।

এম. কে. গান্ধী

১৮৪ মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক লিখিত

ট্রেন কামরা
৪ঠা আগস্ট, ১৯৩৭

প্রিয় জওহরলাল,

আমি আচ্ছা বোকা! তোমার চিঠি পেয়েই আমার কাগজপত্র ঘেঁটে দেখলাম,

অবাক কাণ্ড। মেহের আলীর বক্তৃতার 'কাটিং' ওর মধ্যেই থেকে গেছে। আমি চিঠিতে মেহের আলীর বক্তৃতার উল্লেখ করেছি, মাসানীর নয়।

ওয়ার্ধা ফিরে চলেছি; ট্রেনে ভীষণ ঝাঁকুনি, এই অবস্থায় এই চিঠি লিখছি। এখন রাত সাড়ে দশটা। ঘুম ভেঙ্গে গেল এবং বক্তৃতাটার কথা মনে হতেই খুঁজতে শুরু করলাম। গতকালের কামরাটা এর চেয়ে ভাল ছিল।

ভাইসরয়ের সঙ্গে দেখা করেছি। সরকারী ইস্তাহার নিশ্চয়ই দেখে থাকবে। ওতে সাক্ষাৎকারের সঠিক বিবরণই দেওয়া হয়েছে। আরও কিছু প্রাসঙ্গিক ব্যাপারেরও আলোচনা হয়েছে। কৃপালনীর কাছে সব শুনবে। তবে একটা কথা বলে রাখছি—ভাইসরয় আমার মত তোমাকেও সাক্ষাতের জন্য অনুরোধ করতে পারেন। আমি তাঁকে বলেছি যে, তোমাকে যদি আমন্ত্রণ জানানো হয় সম্ভবত তুমি তা প্রত্যাখান করবে না। ঠিক বলেছি কি?

রায়ের বক্তৃতাগুলি তোমার উপর জোর করে চাপিয়ে দিয়েছি বলে আমি দুঃখীত। আমার মনে হয় তোমারও ওগুলি পড়াতেই হত। যাহোক ঐ সম্বন্ধে তোমার অভিমত জানবার জন্য আমার খুব তাড়া নেই। ইতোমধ্যে যদি না পড়ে থাক, তাহলে ধীরে সুস্থে পড়লেই চলবে।

ইন্দুর অস্ত্রোপচার বোম্বাই-তে হবে, এই আমি মনে করি।

ভালবাসা নিও।

বাপু

১৮৫ মহাদেব দেশাই কর্তৃক লিখিত

ঝাঁসীর নিকটবর্তী কোনও স্থান
৪ঠা আগস্ট, ১৯৩৭

প্রিয় জওহরভাই

সারাদিনের মধ্যে প্রতিশ্রুত চিঠি লেখা আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি। ঝাঁসীতে রাত্রি ১-৫০ মিঃ বাপুর চিঠি ডাকে দিতে হবে বলেই সেই সঙ্গে আমার চিঠিটাও জুড়ে দিলাম। আপনাকে যে বিষয়গুলি সম্বন্ধে বলতে চেয়েছিলাম তা এইঃ—
(১) পাঞ্জাবী ও পুস্তুর আগে 'সম্ভবত' শব্দটি না থাকাই বাঞ্ছনীয়। (পৃঃ ২ ও ১০)

বাপুর তাই মত; এই প্রসঙ্গে আমি শুধু বলতে চাই যে, শিখদের (গুরু নানক ও অন্যান্যদের) অধিকাংশ শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত যা তাদের গর্বের বস্তু, সেগুলি পাঞ্জাবী ভাষায় লিখিত। শিখরা যদি এর স্বীকৃতির জন্য কোন সংগ্রাম নাও করে থাকে তবু আমাদের স্বীকার করা উচিত। আমার মনে পড়ছে, খান সাহেব বলেছিলেন, সিন্ধীর মত পুস্তুরও একটা লিপিমালা আছে, সেটা অনেকটা উর্দুরই পরিবর্তিত রূপ এবং সমস্ত পাঠানেরা এই ভাষায় কথা বলে। খান সাহেব এবং আরো কয়েকজন উর্দু জানেন এবং বলেন, কারণ তাঁরা ওটা শিখবার চেষ্টা করেছেন। এবং আর সবাই অর্থাৎ বিরাট বিরাট জনসমষ্টি আদৌ উর্দু জানেন না। (২) পৃ ৪ (১ ও ২ অনুচ্ছেদ) এবং পৃঃ ১১ (৬ ও ৭ অনুচ্ছেদ)। সিন্ধী—আপনি বলেছেন উর্দু ভাষা সিন্ধী ভাষাকে নিজের অন্তর্ভুক্ত করে নিতে পারবে। কিন্তু উল্টোটা হবে না তো? সিন্ধী ভাষা খুব ভালরূপে উর্দু ভাষাটা গ্রহণ করেছে এবং এখন কয়েকটি অক্ষর তাতে যোগ করেছে আর উচ্চারণ সংস্কৃতের মত, আরবী বা ফরাসীর মত নয়। বলাটা দোষের নয় যে, সিন্ধী উর্দুকে সর্বাঙ্গ সুন্দর করেছে। সুতরাং সিন্ধীরই উর্দুকে আয়ত্ত করার কথা। উর্দুর সিন্ধীকে নয়। কিন্তু আমি মনে করি, আপনিও ঐ কথাই বলতে চান তবে একেবারে অপ্রীতিকরভাবে নয়। আমি ঠিক বলেছি কিনা?

দক্ষিণ ভারত—৪র্থ পৃষ্ঠা—উপরের প্যারা হিন্দীর বিরুদ্ধে অনর্থক আতঙ্ক সৃষ্টি করে এক শ্রেণীর গোঁড়া, তেলেগু তামিল এবং কানাড়ী ভাষাভাষী লোক একটা ভেদ নীতি খাড়া করেছে; ঐ প্যারাটা অজ্ঞাতসারে তা উস্কে দিতে পারে। বস্তুত পণ্ডিতেরাও স্বীকার করেন যে, একদিকে তামিল ও মালয়ালম এবং অন্যদিকে দেবনাগরীর মধ্যে যতটা সম্পর্ক আছে, তেলেগু ও কানাড়ী এবং অন্যদিকে দেবনাগরীর মধ্যেও যতটা সাদৃশ্য রয়েছে, তামিল ও মালয়ালম এবং তেলেগু-কানাড়ীর মধ্যে ততটা সম্পর্ক নেই। ভাষা হিসেবে তামিল ও মালয়ালম একগোষ্ঠিভুক্ত; তেলেগু ও কানাড়ী অন্যগোষ্ঠিভুক্ত। দক্ষিণ ভারতে যাতে দেবনাগরী গ্রহণযোগ্য হতে পারে সে উদ্দেশ্যে কিছু কিছু পরিবর্তনের প্রস্তাব করে রাজাগোপালাচারী কয়েকটি প্রবন্ধ লিখেছেন। প্রকৃতপক্ষে বহুসহস্র দক্ষিণ ভারতীয় অতি অল্প আয়াসে দেবনাগরী লিপিমালা শিক্ষা করেছেন; এটা কিন্তু সমগ্র দক্ষিণ ভারতের দেবনাগরী লিপি প্রচলনের সপক্ষে যাচ্ছে। আমি কিছুদিন আগে সৌরাষ্ট্রের (জনসংখ্যা প্রায় ৫০,০০০) থেকে একজন দক্ষিণ ভারতীয়ের চিঠি পেয়েছি। তাতে তিনি লিখেছেন যে, তাদের ওখানে তেলেগু-তামিল মিশ্রিত একটা লিপি ছিল; বর্তমানে সেটা লোপ পেয়েছে এবং তারা তেলেগু-তামিলের বদলে সানন্দে দেবনাগরী গ্রহণ করবে।

তামিল, তেলেগু এবং কানাড়ী ভাষীরা আমাদেরই ধর্মগ্রন্থ পড়ে; সেগুলি আবার সবই সংস্কৃতে লেখা। তাদের কাছ থেকে এইটুকু আশা করা যায় যে তাদের দেবনাগরী গ্রহণ করতে বলাটা যে জুলুম করা হয় তা নয়, বরং ধর্মগ্রন্থ-পাঠ তাদের কাছে সহজসাধ্য হবে।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, যদি চারিটি দক্ষিণ ভারতীয় ভাষার মিশ্রণে একটি লিপিমালার উদ্ভাবন করা হয়, (যেটা অসম্ভব বলে মনে করি) তাহলে উত্তর ভারতের পক্ষে দক্ষিণ ভারতীয় ভাষা শিক্ষার ব্যাপারে চিরকালের জন্য বাধা সৃষ্টি করা হবে। অপরপক্ষে একটি লিপিমালার ব্যবস্থা হলে তামিল তেলেগুর ন্যায় ভাষা শিক্ষার জন্য উত্তর ভারতের লোকদের খুব উৎসাহ হবে। (আমি এখানে মাত্র দুটি ভাষার উল্লেখ করলাম, কারণ মালায়লম ভাষা তামিল আর সংস্কৃতের মিশ্রণ, ওদিকে তামিল কিংবা তেলেগুর সাথে তুলনা করা যেতে পারে এমন কোন সাহিত্য কানাড়ী ভাষায় নেই)।

আর একটিমাত্র বিবেচ্য বিষয় আছে, যা আমি উল্লেখ করতে ভুলে গেছি। তেলেগু, কানাড়ী এবং মালয়ালমের মধ্যে খুব বেশী পরিমাণে সংস্কৃত শব্দের মিশাল রয়েছে। এবং সেটা দিন দিন বেড়ে চলেছে। এমনকি তামিল ভাষাও আজকাল অনেক সংস্কৃত শব্দ গ্রহণ করছে। দেবনাগরী লিপির ব্যবস্থা হলে এ কাজে আরো জোর ধরবে।

আমি তাই আশা করছি আপনি দেবনাগরী এবং পারসী এই দুটি লিপিমালার বেশী আর মনে স্থান দেবেন না।

(৩) পৃঃ ৭। এটা একটা তুচ্ছ ব্যাপার এবং একটি খবর হিসেবেই বলা হচ্ছে। আপনি বলেছেন জনগণের মধ্যে সংযোগ স্থাপনের ব্যাপারে বাংলা ভাষা সর্বাপেক্ষা অধিক অগ্রসর হয়েছে। আমি জানিনে। কিছুদিন আগে আমি অমিয় চক্রবর্তীর সঙ্গে কথা বলেছিলাম। তিনি বললেন, এমন কি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বইয়েরও যথেষ্ট বিক্রী নেই। এত বছরে 'গীতাঞ্জলী' উর্ধ্বসংখ্যায় ২০০০ কপি, 'জীবন-স্মৃতি' ১০০০ কপি বিক্রী হয়েছে, এবং অন্যান্য বইয়েরও ঐ একই দশা। এর থেকে আমার যা ধারণা হয়েছে, আপনারও তা হবে কিনা তাই ভাবছি।

ঝাঁসী এসে গেল, এবার আমাকে আসতে হচ্ছে। এটা আর একবার দেখে দেবার মত সময় নেই। বিশ্রী হাতের লেখাটা মাফ্ করবেন। দোষ ট্রেনের, আমার নয়।

আপনার
মহাদেব

১৮৬ মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক লিখিত

সেবাগ্রাম, ওয়ার্ধা,
৮ই আগস্ট, ১৯৩৭

প্রিয় জওহরলাল,

মেহের আলীর বক্তৃতা উল্লেখ করে যে চিঠি লিখেছিলাম তাতে একটি বিষয় লিখতে ভুলে গেছি। গ্রীষ্মকালীন বিদ্যালয়ের বন্দীদের মুক্তি দিয়ে রাজাজী যে ইস্তাহার জারি করেছেন তার কথা বলছি। তোমার চিঠি পাওয়ার আগেই আমি ওটা পড়েছিলাম। এতে আমি অসন্তুষ্ট হইনি। সম্ভবত এই কারণে যে তুমি গ্রীষ্ম-কালীন বিদ্যালয়ের ছাত্রদের কাজটা অনুমোদন করেছ, আর আমি কোন রকমেই তা সমর্থন করতে পারিনি। কিন্তু মুক্তিদানের দ্বারা যে অপরাধ সমর্থন করা বোঝায়নি, সে দৃষ্টি আকর্ষণ করা দরকার ছিল বলে মনে করি; যদিও আইনের চোখে ওটা অপরাধ। আমার আশঙ্কা হয় কংগ্রেস ক্ষমতায় আসীন হয়ে অনেক সময় পূর্ব-বর্তীরা যে ভাষা প্রয়োগ করে গেছে সে ভাষাই ব্যবহার করবে, যদিও উদ্দেশ্য হবে বিভিন্ন।

ইন্দুর অস্ত্রোপচার উপলক্ষে বোম্বাইতে তোমার সময় বেশ ভালই কাটবে বলে আশা করি। অস্ত্রোপচার হয়ে গেলে টেলিগ্রাম করে খবরটা দিও।

ভালবাসা জেনো।

বাপু

যদি নরীম্যান তোমার কাছে আসেন তাহলে তাকে তদন্তের অনুমতি দিও। এ ব্যাপারে বোম্বাইতে তোমাকে কিছুটা ঝঞ্ঝাট সহ্য করতে হবে বলে আমি দুঃখীত। আমি কি করছি তা মহাদেব তোমাকে বলবে।

বাপু

১৮৭ আর্নষ্ট টলার কর্তৃক লিখিত

সাণ্টা মণিকা, ক্যালিফোর্ণিয়া
২৩শে আগষ্ট, ১৯৩৭

প্রিয় জওহরলাল নেহরু,

আপনার ১৯শে জুলাইয়ের চিঠির জন্য অশেষ ধন্যবাদ। এ আপনার অসীম অনুগ্রহ যে, এতটা কষ্ট স্বীকার করেছেন। আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞ। আমার বই হিন্দী ও মারাঠী ভাষায় প্রকাশিত হলে আমার পক্ষে যে সেটা কত আনন্দের ব্যাপার হবে সে আপনি অনুমান করতে পারেন।

আমার "নো মোর পিস" নামক মিলনান্তক নাটকখানি আপনি পেয়েছেন কি? আমার প্রকাশককে বইটা আপনাকে পাঠাতে বলেছিলাম।

আমার স্ত্রী হলিউডে আমার কাছেই আছেন। তিনি অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়ে-ছিলেন। তবে সৌভাগ্যের বিষয় তিনি হাসপাতাল থেকে এসেছেন এবং দ্রুত আরোগ্যলাভ করছেন।

আমি অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে চীনের ঘটনাবলী লক্ষ্য করছি। মনে হচ্ছে চীনাদের

প্রচণ্ড প্রতিরোধ সত্ত্বেও জাপান তার ইচ্ছামত অঞ্চল দখল করতে সমর্থ হবে। 'লীগ অব্ নেশনস'এর অবস্থাটা বড় করুণ ও হাস্যকর হয়ে দাঁড়িয়েছে। মূলতঃ মানুষের অধিকার রক্ষার্থে এবং মানুষের প্রতি আক্রমণ প্রতিরোধার্থে প্রতিষ্ঠিত হয়েও লীগ এমন অবস্থায় পেঁাছেচে যে, দৈনন্দিন জরুরী সমস্যারও আলোচনা করতেও সাহস পায় না, কোনো ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ত' দূরের কথা। আমাদের কালের সংকট এই যে, ফ্যাসীবাদী ও আধাফ্যাসীবাদী রাজ্যগুলি তাদের প্রয়োজন সম্পর্কে সচেতন এবং তাদের অভিমত চাপিয়ে দেবার জন্য যে কোন পন্থা অবলম্বন করে থাকে; অপর পক্ষে গণতন্ত্রী দেশগুলি নেহাৎ সংকোচের সঙ্গে তার প্রতিরোধ করে চলে, প্রকৃত ঘটনার সম্মুখীন না হয়ে আপোষ মীমাংসার মাধ্যমে এড়িয়ে যেতে চায়; অথচ দেখা গেছে আপোষে কোন কিছুর সমাধান হয় না। স্পেন তার আর একটি উদাহরণ। বর্তমান যুগের এই অভ্যুত্থান সমগ্র পৃথিবীর রাষ্ট্রীয় এবং সামাজিক সমস্যাগুলিকে নাড়াচাড়া দেবে। ১৯১৪ সালে যে বিশ্বযুদ্ধ সুরু হয়েছিল তা প্রকৃতপক্ষে শেষ হয়নি এবং আরও কতদিন চলবে তা জানিনে। শুধু এই আশা করতে পারি যে কতকগুলো ব্যাপার অপরিহার্যরূপে ঘটলেও পৃথিবীর বিশেষ অংশসমূহ ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে না।

জার্মানী থেকে যে সংবাদাদি পাই তাতে বুঝতে পারি নাৎসী-বিরোধী দল খুব জোর আন্দোলন করছে কিন্তু তারা বর্তমান শাসন পদ্ধতির কোনো পরিবর্তন করবার মত যথেষ্ট শক্তিশালী নয়। এদিকে নাৎসীরা তো জার্মানীকে যুদ্ধের জন্য তৈরী করছেই, সুতরাং যতদিন না কার্যতঃ সংকট উপস্থিত হয় ততদিন পর্যন্ত নাৎসীদের সঙ্গে বোঝাপড়া করেই চলতে হবে। অবশ্য আমি বলছি না যে তারা অচিরেই যুদ্ধ চায়। ভয় দেখিয়ে এবং ধাপ্পা দিয়ে তারা রাজ্য জয় করতে চায়, যুদ্ধও এড়াতে চায়, কেননা যুদ্ধের ফল তাদের পক্ষে শোচনীয় হতেও পারে। ইতিমধ্যে তারা ফ্যাসীবাদী শক্তিগুলিকে সংগঠনের চেষ্টা করছে। কয়েকদিন আগে "নিউ ইয়র্ক টাইমস্-এ" একটা প্রবন্ধ পড়েছিলাম; তাতে দক্ষিণ আমেরিকার কোন কোন অংশে তাদের প্রভাব বিস্তারের চমকপ্রদ বিবরণ ছিল।

সকন্যা আপনি আমার স্ত্রীর এবং আমার শুভেচ্ছা ও প্রীতি জানবেন। আশা করি আমার চিঠির জবাব পাব।

আপনার
আর্নষ্ট টলার

১৮৮ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক লিখিত

শান্তিনিকেতন, বঙ্গদেশ
২০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩৭

প্রিয় জওহরলাল,

বিপদে এবং জীবনের বাঁধন যখন সহসা শিথিল হয়ে আসবে তখন তোমার প্রীতির উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করতে পারব জেনে আশ্বস্ত হলাম। আমি এতে সত্যি অভিভূত হয়েছি।

প্রীতিশীল
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৮৯ মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক লিখিত

সেবাগ্রাম, ওয়ার্ধা
১লা অক্টোবর, ১৯৩৭

প্রিয় জওহরলাল,

আমার দিক থেকে বলতে পারি পট্টভির মনোনয়ন ঠিক হয়েছে। তবে আমি মনে করি, তুমি কমিটির সভ্যদের মতটা জেনে নেবে।

ওয়ার্ধায় যে শিক্ষা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে তাতে যোগদান করার সময় তুমি পাবে কিনা জানিনে; অবশ্য তোমার কাছে নিমন্ত্রণ পত্র পাঠানো হয়েছে। যদি পার এসো; কিন্তু জরুরী কাজের প্রয়োজনে যদি তোমার অন্য কোথাও উপস্থিতির প্রয়োজন হয় তাহলে আমি তোমাকে সম্মেলনে আসতে বলছিনে। দুটো দিন বেশ ধকল সহ্য করতে হবে সন্দেহ নেই, তবু তুমি এলে আমি একটু ভরসা পাব।

ভালবাসা জেনো।

বাপু

পুনশ্চঃ—এই সঙ্গে একখানি চেক এবং চিঠি পাঠাচ্ছি; এর থেকে সৈয়দ হাবিবের সঙ্গে আমার যে পত্রালাপ হয়েছিল, তার কি ফল হল তা জানতে পারবে। যেখান-সেখান থেকে সে টাকা নিচ্ছে বলে আমি তাকে শুধু তিরস্কার করেছিলাম; তোমার সঙ্গে আমার যে কথাবার্তা হয়েছে তা উল্লেখ করিনি।

১৯০ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক লিখিত

শান্তিনিকেতন, বঙ্গদেশ
১০ই অক্টোবর, ১৯৩৭

প্রিয় জওহরলাল,

তোমার চিঠির জন্য ধন্যবাদ। তোমার সঙ্গে সাক্ষাতের আশায় আমি খুব আনন্দিত। তবে শান্তিনিকেতনে আসার কষ্ট থেকে তোমাকে অব্যাহতি দিলাম। আগামীকাল ১১ই অক্টোবর থেকে এ মাসের শেষ পর্যন্ত আমি কলকাতায় থাকব বলে আশা করি, সুতরাং ২৫শে তারিখ কিংবা যে কোন দিন তোমার সুবিধা হবে আমার সঙ্গে ওখানে দেখা করলে খুশি হব। আমি এখনও চিকিৎসাধীন আছি এবং কলকাতায় যদি অত্যাশ্চর্য বৈদ্যুতিক চিকিৎসা ব্যবস্থায় রাজী না হই—তাহলে নাকি প্রকৃতির পক্ষ থেকে গুরুতর শাস্তি পাবার আশঙ্কা আছে। তুমি যদি সময় করতে পার তাহলে আমার সাথে একবারের জায়গায় দুবার দেখা করবে। সম্ভবত আমি সহরতলীর কোন বাগানবাড়ীতে বাস করব। তখন কৃষ্ণা কলকাতায় থাকবে এবং সেই তোমাকে আমার কাছে নিয়ে আসবে। ভালবাসা নিও।

প্রীতিশীল
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৯১ মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক লিখিত

সেবাগ্রাম, ওয়ার্ধা
১২ই অক্টোবর, ১৯৩৭

প্রিয় জওহরলাল,

তোমার চিঠি পেয়েছি। ২৫শে এখান থেকে রওনা হয়ে কলিকাতা যাবার চেষ্টা করছি। তখন কংগ্রেস প্রদেশগুলিতে মন্ত্রীসভা কি কি কাজ করেছে তা আমাকে জানাবে। আশা করি তোমার সর্দি ও গলার ব্যাথাটা সাময়িক এবং পাঞ্জাবে

তোমার যে খাটুনি গেছে তাতে বেগ পেতে হয়নি। সীমান্ত প্রদেশের আবহাওয়া নিশ্চয়ই খুব চমৎকার। ভালবাসা জেনো। অন্তত কিছুদিনের জন্যে তুমি সমস্ত জিনিস যদি সহজভাবেই নিতে পার তবে ভাল হয়।

বাপু

১৯২ অমৃত শের গিল কর্তৃক লিখিত

[অমৃত শের গিল একজন প্রতিভাসম্পন্না নারী চিত্রশিল্পী ছিলেন। তিনি প্যারিসে শিক্ষালাভ করেন এবং তাঁর চিত্রাদি সেখানকার একাদেমীতে প্রদর্শিত হয়েছিল। যৌবনের প্রারম্ভেই তাঁর আকস্মিক মৃত্যু হয়।]

৬ই নভেম্বর, ১৯৩৭

এই কিছুক্ষণ আগে কে একজন আমাকে বললে, "জওহরলাল নেহরু অসুস্থ তা জানেন তো?" সত্যি বলতে কি আমি জানতাম না; কারণ খবরের কাগজ আমি কখনও পড়িনে। কিছুকাল যাবৎ আমি আপনার কথা খুব ভাবছিলাম; সম্ভবত সেজন্যেই আপনাকে চিঠি লেখার কথা মনে হয়নি ।

তাই আপনার চিঠিটা পেয়ে খুব অবাক হয়ে গিয়েছি এবং যারপরনাই খুশি হয়েছি।

বইখানার জন্য ধন্যবাদ।

সাধারণত জীবনী বা আত্মজীবনী আমার ভাল লাগে না। মনে হয় সব ভুয়া। যত সব বড় বড় কথা আর নিজেকে জাহির করার চেষ্টা। কিন্তু আপনারটি বোধ করি আমার ভাল লাগবে। সময় সময় আপনি আপনার পরিবেশটা ছাড়তে পারেন। এই যেমন, আপনি বলবেন, "যখন প্রথম সমুদ্র দর্শন করলাম;" কিন্তু অপরে বলবেন, "যখন সমুদ্র আমাকে প্রথম দেখল।"

আমি আপনাকে আরো ভাল করে জানতে চাই। যাদের সামগ্রিক চরিত্রের মধ্যে এমন সামঞ্জস্য রয়েছে যার দরুণ তাদের আচরণের মধ্যে অসঙ্গতি যদি বা থাকে, পরস্পর বিরুদ্ধতা থাকে না, আর যারা কদাপি কোনো আফশোসের আঁটাল সুতাকে আপনাদের পেছনে টেনে চলে না, সেইরকম লোক সর্বদা আমাকে আকর্ষণ করে।

জীবনের একেবারে সুরুতেই সব কিছু গোলমেলে ঠেকে বলে আমি মনে করিনে; তবে কিছুদিন পরে দেখা যায় প্রথমে যে ব্যাপার খুব সাধারণ বলে মনে হয়েছে এবং যে অনুভূতি অকপট মনে হয়েছে তা বস্তুত খুব পীড়াদায়ক ও জটিল। একমাত্র অসমাঞ্জস্যের মধ্যেই সামঞ্জস্য বিরাজ করে।

কিন্তু আপনার মনে একটা স্থৈর্য আছে।

আমার চিত্রশিল্পের সম্পর্কে আপনার সত্যি কোন আগ্রহ ছিল বলে আমার বিশ্বাস হয় না; আপনি আমার আঁকা ছবির দিকে তাকিয়েছেন কিন্তু মন দিয়ে দেখেননি।

আপনি খুব কঠোর প্রকৃতির লোক নন। আপনার মুখের ভাব কোমল। আপনার মুখের চেহারা আমার ভাল লেগেছে। স্পর্শকাতর, ভোগাসক্তি এবং একটা যেন নির্লিপ্ততার ভাব রয়েছে। আপনাকে একটা কাটিং এই সঙ্গে পাঠাচ্ছি,—আমার বাবা আপনাকে পাঠাতে বললেন। এটা তিনি লিখেছেন।

আপনার
অমৃত শের গিল

১৯৩ সরোজিনী নাইডু কর্তৃক লিখিত

মহাত্মাজীর শিবির
কলিকাতা
১৩ই নভেম্বর, ১৯৩৭

প্রিয় জওহর,

আমি আধুনিক টাওয়ার অব্ ব্যাবেল থেকে লিখছি। বাংলা, হিন্দী, গুজরাটী ও ইংরেজীর তর্ক নিয়ে জগৎ যখন তাঁর চারদিকে তুমুল তরঙ্গ ভঙ্গে জোয়ার ভাঁটায় বইতে থাকে তখন ঐ ছোট্ট মানুষটি (গান্ধী) নির্লিপ্তভাবে পালং শাক চিবোতে ও কুমড়ো সেদ্ধ খেতে থাকেন। নিজের স্বাস্থ্য সম্পর্কে একগুঁয়েমির দরুণ বিধান এবং তাঁর সহকর্মীরা হতাশ হয়ে পড়েছেন। তিনি সত্যই অসুস্থ......কেবলমাত্র ভঙ্গুর অস্থিতে আর ক্ষীয়মাণ রক্তধারাতেই নয়, অন্তরের অন্তস্থলেও পীড়িত। অত্যন্ত নিঃসঙ্গ ও ট্র্যাজিক মূর্তি......ভারতের ভাগ্যনিয়ন্তা আজ নিজের ধ্বংসের শেষ সীমায় উপনীত হয়েছেন।

আর তুমি আর একজন ভাগ্যনিয়ন্তা, তোমাকে আমি জন্মদিনের অভিনন্দন পাঠাচ্ছি। তোমার চিঠিপত্র মাঝ পথে খুলে পরীক্ষা করা হয় বলে এটা তোমার কাছে হয়ত ঠিক সময়ে পৌঁছবে না। গত দু বছর ধরে তোমার মনঃকষ্ট ও নিঃসঙ্গতা আমি গভীরভাবে বোধ করে আসছি; অবশ্য প্রতিকারও নেই।

তোমার জীবনে নতুন বছরে তোমার জন্য কি প্রার্থনা করব? সুখ? শান্তি? সাফল্য? এসব জিনিষ সাধারণ লোকের কাছে অত্যন্ত প্রিয় কিন্তু তোমার কাছে এর কোন গুরুত্ব নেই, আনুষঙ্গিক ব্যাপার মাত্র। ব্যক্তিগত স্বাধীনতা নয়, একটা জাতির দাসত্ব মোচনই যাদের কাম্য এবং সেই স্বাধীনতাকে যারা জীবনের চেয়েও বেশি মূল্যবান মনে করে সেই সব স্বাধীনতাকামীদের নানা বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করতে হয়,—তোমাকেও করতে হবে; আমি তাই বন্ধু তোমার জন্য অবিচলিত নিষ্ঠা ও অদম্য সাহস প্রার্থনা করছি। দুরূহ এবং বিপদসঙ্কুল পথে দৃঢ়পদক্ষেপে এগিয়ে চল, থাকনা জীবনে দুঃখ, বেদনা, আর নিঃসঙ্গতা। মনে রেখ তোমার সবকিছু ত্যাগের চরম পুরস্কার হবে স্বাধীনতা..... কিন্তু এই চলার পথে তুমি একা নও।

স্নেহশীলা সরোজিনী

১৯৪ মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক লিখিত

ওয়ার্ধার পথে
১৮ই নভেম্বর, ১৯৩৭

প্রিয় জওহরলাল,

সেই রবিবারের কালরাত্রিতে এবং মৌনদিবস সোমবারে তুমি যখন আমার পাশে ঘুর ঘুর করছিলে তখন আমি যেন তোমার চোখের দৃষ্টিতেই ব্যক্তিগত চিঠির কথাগুলো পড়তে পেরেছিলাম। এখনও আমার শারীরিক দুর্বলতা যায়নি। সমস্ত মানসিক পরিশ্রম থেকে আমার দীর্ঘ দিনের অবসর প্রয়োজন কিন্তু সম্ভবত তা আর হয়ে উঠবে না।

বাংলার বন্দীদের ব্যাপারে আমি কি করেছি তা তোমাকে জানাবার জন্য এই চিঠি লিখছি; তাছাড়া কাজটা তোমার মনোমত হল কি না তাও জানা দরকার। কথাবার্তার কাজটা বড় বিরক্তিকর লেগেছে। এই ব্যাপারে অগ্রসর হওয়ার পূর্বে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে—মুক্তিলাভ বাঞ্ছনীয় কি না, এই বিষয়ে আমি ভ্রাতৃদ্বয়ের সঙ্গে আলাপ করেছি। অবশ্য ফলাফলের জন্য ব্যস্ত হবার কিছু ছিল না; আর

বন্দীমুক্তি যখনই হোক, সেজন্য জনমতই যে চাপ দেবে এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকা সম্ভব ছিল। ভ্রাতৃদ্বয়ের কিন্তু ইচ্ছা যে কথাবার্তা চালানো হোক, ওদিকে গণ-বিক্ষোভও চলুক। আমি কি ভাবে অগ্রসর হতে চাই তা ওঁদের খুলে বললুম; আন্দামানের বন্দীদের টেলিগ্রামে যে পরামর্শ দিয়েছিলুম, আমার প্ল্যানটা সেই রকমের ছিল।

তদনুযায়ী আমি দ্বীপান্তর প্রত্যাগত ও দেউলী প্রত্যাগত বন্দীদের সাথে এবং গত রাত্রে হিজলী বন্দীদের সাথে দেখা করি। মন্ত্রিগণ "গ্রামে এবং স্বগৃহে অন্তরীণ" রাজবন্দীদের অবিলম্বে মুক্তি দিতে স্বীকৃত হয়েছেন এবং আগামী চার মাসের মধ্যে বন্দী শিবিরের যে সমস্ত রাজবন্দীদের নিরাপদ বিবেচনা করবেন তাদেরও মুক্তি দেবেন। আর যারা থাকবে তাদের যদি শীঘ্র মুক্তি দেওয়া নাই হয়, তবে গভর্নমেণ্ট আমার সুপারিশ গ্রহণ করবে। বন্দীদের বর্তমান মনোভাবটা জানতে পারলে তবে আমি সুপারিশ করতে পারবো। স্বাধীনতালাভে অহিংস পন্থায় তারা আর বিশ্বাসী নয় এবং তারা কংগ্রেস অনুমোদিত কার্যক্রম মেনে চলবে, এই কথা যদি আমি সরকারকে বোঝাতে পারি তাহলে সরকার তাদের মুক্তি দেবেন। এই সম্পর্কে গভর্নমেণ্ট যে কোন সময়ে তাদের নীতি ঘোষণা করতে পারেন। বিভিন্ন জেলে এবং হিজলী ক্যাম্পে সব বন্দীদের সঙ্গে আমার যে কথাবার্তা হয়েছে তার বিস্তারিত বিবরণ দেবার প্রয়োজন বোধ করছিনে। জানিনে এসব তোমার মনোমত হবে কিনা। যদি তোমার ঘোর আপত্তি থাকে তাহলে টেলি করে জানাবে; অন্যথা তোমার চিঠির প্রত্যাশায় থাকবো।

সংবাদপত্রের খবর ছাড়া আমেদাবাদের ধর্মঘট সম্বন্ধে আমি কিছু জানিনে। শোলাপুরের খবরও কাগজেই যা পাচ্ছি। এসব ব্যাপারে অশান্তি বোধও করছি। কংগ্রেসীদের একাংশ কংগ্রেসের নিয়ম শৃঙ্খলা না মানতে পারে, কিংবা কংগ্রেস বহির্ভূত লোকজনের কার্যকলাপ সংযত করা না যেতে পারে; তা বলে অবস্থা যদি আমরা আয়ত্তে না আনতে পারি তবে গদি দখল করে থাকাটা কংগ্রেসের নীতির দিক থেকে ক্ষতিকর হবে।

'বন্দে মাতরম' সম্পর্কে বাকবিতণ্ডার আজও শেষ হয়নি। ওয়ার্কিং কমিটির সিদ্ধান্তে বাংলা দেশের অনেকেই ক্ষুব্ধ হয়েছে। সুভাষ আমাকে বলেছে যে, সে আবহাওয়াটা শান্ত করার চেষ্টা করছে।

নতুন গভর্নর কার্যভার গ্রহণ করার পরেই একবার আমাকে বাংলাদেশে যেতে হবে বলে মনে করি।

আশা করি তুমি ভাল আছ। সংবাদপত্রে স্বরূপের সম্পর্কে যে খবর বের হয়েছে তা উদ্বেগজনক। অত পরিশ্রম করা বোধ করি ওর স্বাস্থ্যে কুলোয় না?

নাগপুরের কাছাকাছি এসে এই চিঠি লিখছি। আজ সন্ধ্যায় আমরা ওয়ার্ধা পৌঁছব। ভালবাসা নিও।

বাপু

১৯৫ মহাদেব দেশাই কর্তৃক লিখিত

মগনওয়াদি, ওয়ার্ধা
১৯শে নভেম্বর, ১৯৩৭

প্রিয় জওহর ভাই,

আপনার ৮ তারিখের চিঠি পেলাম। সামুয়েলের সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে যা লিখেছেন তা বুঝতে পারছি। পোলককে লিখে দিচ্ছি যে, যদি তিনি আপনার সাথে দেখা

করতে চান তাহলে আপনি আনন্দেই দেখা করবেন। অনুপচাঁদ শা'র প্রস্তাবে আপনি যে গান্ধী সেবা সংঘের অস্তিত্ব জানিয়ে তাকে চিঠি লিখেছেন সে আপনার সদাশয়তা। আমিও এখন তাকে লিখছি।

মহীশূরে প্রস্তাবের উপর বাপুর লিখিত প্রবন্ধ সম্বন্ধে তিনি নিজেই আপনার ১৪ই তারিখের চিঠির উত্তর দিতেন। কিন্তু পারেননি, এমন কি মুখে বলে যেতেও পারলেন না। তিনি এখন দুর্বল হয়ে পড়েছেন যে চিকিৎসকেরা মনে করেন সামান্য খাটুনিও তার পক্ষে বিপজ্জনক। আপনার চিঠির মোট কথাটা তাঁকে বলেছি। তিনি বললেন, পর ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করার নীতিটা যে লঙ্ঘন করা হয়েছে সে বিষয়ে তিনি নিঃসন্দেহ। তিনি জানেন কংগ্রেস অতীতেও মধ্যস্থতা করেছে এবং কাজটা ঠিক হয়নি; এক্ষণে ওটা বন্ধ করা অবশ্য কর্তব্য বলে মনে না করলে তিনি ঐ প্রবন্ধ লিখতেন না। প্রস্তাবের ভাষাটা যে খারাপ ছিল এটা আপনি বুঝতে পেরেছেন জেনে তিনি খুশী হয়েছিলেন; আর তিনি ঠিক জানেন যে ওয়ার্কিং কমিটির অন্যান্য সভ্যেরা যদি প্রস্তাবটি যে বিধিবহির্ভূত সে বিষয়ে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতেন তাহলে প্রস্তাবের সমর্থনে যে বক্তৃতা করা হয়েছে তা বন্ধ করতে পারতেন। বস্তুত, ঐ বক্তৃতাগুলো প্রস্তাবটার চাইতেও খারাপ হয়েছিল। যাহোক, তিনি বলতে চান যে আপনাকে তিরস্কার করার উদ্দেশ্য তার কখনও ছিল না। আপনি ত' কাজের মধ্যে ডুবে ছিলেন, সুতরাং আপনার দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করা ওয়ার্কিং কমিটির অন্যান্য সহকর্মীদেরই কর্তব্য ছিল। আপনি নিয়ম শৃংখলা মেনে চলেন, এমন অবস্থায় তাঁদের পরামর্শ নিশ্চয়ই উপেক্ষা করতেন না; তাই তিনি মনে করেন সভ্যেরাই কর্তব্যে অবহেলা করেছেন।

আমার এই নিরুত্তাপ কড়া ভাষায় বাপুর মনের ভাব সঠিক ব্যক্ত করা গেল না। যেদিন হঠাৎ তাঁর স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটল সেদিনই প্রস্তাবটা নিয়ে খুব খেটেছিলেন। আজও যখন সেই বিষয়ে কথা বলছিলেন তখন ওঁর অবস্থাটা যেন আবার সেদিনের মতই হল। তাঁকে থামিয়ে দিলাম এবং বললাম তিনি যা বলতে চান তা আমার সাধ্যমত গুছিয়ে লিখে আপনাকে জানাব।

রক্তের চাপ এত অনিয়মিত যে, চিকিৎসকেরা বলেন তাঁকে তার খুশিমত কিছু করতে দেওয়া ঠিক হবে না। পক্ষকালের মধ্যে তাঁর কলকাতা যাবার ইচ্ছে ছিল; কিন্তু নিজেই বুঝতে পারছেন যে সেটা তার পক্ষে কার্যত অসম্ভব। তাই অন্তত প্রেসারটা ঠিক হবার পরও পক্ষকাল কিংবা আরো কয়েকদিন বিছানায় থাকতে রাজী হয়েছেন। প্রীতি জানবেন।

আপনার
মহাদেব

১৯৬ এ্যাগনেস স্মেডলী কর্তৃক লিখিত

জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স
চীনা অষ্টম রুট সৈন্যবাহিনী
(লালফৌজ)
পশ্চিম সাঁসী প্রদেশ, চীন
২৩শে নভেম্বর, ১৯৩৭

প্রিয় মিঃ নেহরু,

বিশেষ জরুরী ব্যাপারে আবার আপনাকে লিখছি। খাস জাপ-অধিকৃত অঞ্চল যথা সুইওয়ান, চাহার এবং হোপেই প্রদেশগুলিতে হাজার হাজার চীনা ছাত্র, কৃষক,

মজুর বিদ্রোহ করেছে এবং তারা স্বেচ্ছাবাহিনী গঠন করে জাপানীদের সঙ্গে লড়াই করছে। তাদের অস্ত্রশস্ত্র আছে, কিন্তু শীতবস্ত্র নেই, জুতো নেই এবং অনেক সময়ে কয়েকদিন ধরে খেতেও পাচ্ছে না। এখানে আমাদের সৈন্যবাহিনীও অত্যন্ত অভাব-গ্রস্থ; তারা উত্তরাঞ্চলে জনগণকে সংগঠিত এবং অস্ত্রসজ্জিত করছে। স্বেচ্ছাসেনাদের জন্য ব্যয় করবার মত অর্থ এদের নেই। ২000 হাজার লোকের একটা স্বেচ্ছা-সেনাবাহিনীর জন্য মাত্র ১000 হাজার ডলার দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ জনপ্রতি প্রায় ৫0 সেন্ট মাত্র! উপবাসকালীন আহার্য হিসেবে বরাদ্দ করলেও এতে মাত্র ৪।৫ দিন চলতে পারে।

চীনা স্বেচ্ছাবাহিনীর জন্য ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস কিছু অর্থ দান করতে পারে কি? গত সপ্তাহে এবং আজও আমাদের সদর দপ্তরের সঙ্গে আমি এ সমস্যার আলোচনা করেছি। আর্থিক দিক থেকে চীনারা সর্বত্রই খুব চাপে আছে। সুতরাং এখানে চীন থেকে এবং আমেরিকা থেকে আমরা অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা করছি। এখন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের নিকট আবেদন জানাচ্ছি। স্বেচ্ছাসেবকদের জন্য আমাদের কিছুদিন আর যদি দেন তবে নিম্নলিখিত ঠিকানায় ব্যাংক অফ্ চায়নার সিয়ানফু শাখার (সিয়াং, চীন) ড্রাফ্‌ট পাঠাতে পারেন।

বিমানযোগে
হংকং হইয়া

মিস এ্যাগনেস স্মেডলী
কেয়ার অফ্, লিন পে-চু চি শেন চাওয়াং ১১
সিয়াংফু, সেনসি প্রদেশ, চীন

জাপানীরা দক্ষিণ দিকে এগিয়ে আসছে, সুতরাং যা করবার তাড়াতাড়ি করবেন। হংকং থেকে সিয়াংএ সোজা বিমান পথ আছে সুতরাং কেবল হংকংএর পথে বিমানযোগেই পাঠাবেন। অধীনতার বিরুদ্ধে চীনা জনগণ যে সংগ্রাম করছে তাতে সাহায্য করবার জন্য আমরা আপনাদের একান্ত অনুরোধ করছি।

একান্ত আপনার
এ্যাগনেস স্মেডলী

১৯৭ চু তে কর্তৃক লিখিত

চীনা ভাষায় লিখিত চিঠির অনুবাদ

জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স, অষ্টম রুট সৈন্যবাহিনী
সাঁসি, চীন, ২৬শে নভেম্বর, ১৯৩৭

প্রিয় মিঃ নেহরু,

চীন দেশে প্রেরিত সংবাদাদি পড়ে জানা গেল আপনি আমাদের মুক্তি সংগ্রামের সমর্থনে ভারতের নগরে নগরে বহু জনসভা আহ্বান করেছেন। চীনের জনসাধারণের পক্ষ থেকে এবং বিশেষ করে চীনা অষ্টম রুট সৈন্যবাহিনীর (চীনা লাল ফৌজ) তরফ থেকে আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

আপনি জানেন, জাপানীরা চীনের বহু সহর ও প্রধান প্রধান রেলপথগুলি অধিকার করেছে। আমাদের অষ্টম রুট সৈন্যবাহিনী—চীনা জনগণের বিপ্লবী-বাহিনী জনসাধারণকে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের জন্য সংগঠিত ও অস্ত্রসজ্জিত করছে; পরিণামে অবশ্য আমাদের জয় হবে, মুক্তিলাভ হবে। আমাদের কাজটা খুবই শক্ত, কারণ আমাদের সৈন্যবাহিনীর বড় অর্থাভাব। উত্তরে যে যে জায়গায় আমরা আমাদের সৈন্যবাহিনী পরিচালিত করেছি সেখানেই আমরা দলভুক্ত চাষিগণকে সাহায্য করতে পেরেছি এবং তারাও অতিদ্রুত সৈন্যবাহিনীর এক মূল অংশরূপে পরিগণিত

হচ্ছে। কিন্তু একটি সমস্যার সমাধান আমরা করতে পারছিনে এবং সে কারণেই আপনাকে লিখছি।

সাঁসীর উত্তর প্রান্তের রেলপথ বরাবর, সুইওয়ানে ও চাহার প্রদেশে এবং পশ্চিম হোপেই প্রভৃতি প্রকৃত জাপানী অধিকৃত এলাকায় সহস্র সহস্র শ্রমিক, কৃষক এবং ছাত্রদের স্বতঃস্ফূর্ত অভ্যুত্থান ঘটেছে। তারা অস্ত্রাদি অধিকার করেছে এবং আক্রমণকারী সাম্রাজ্যবাদী সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে স্বেচ্ছাসেনানীরা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে যুদ্ধ করছে। এই স্বেচ্ছাসেনাবাহিনীর অস্ত্রশস্ত্র আছে কিন্তু তাদের কোনো শীতবস্ত্র নেই, কম্বল নেই, জুতা নেই; কখনো যৎসামান্য খাদ্যের সংস্থান থাকে, আবার কখনও বা একেবারেই থাকে না। সম্প্রতি দু' হাজার লোকের একটা দল এই প্রদেশের উত্তর-পূর্ব সীমান্তে আমাদের সৈন্যবাহিনীর এক ইউনিটের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। আমরা তাদের মাত্র ১০০০ চীনা ডলার দিতে পেরেছি, অর্থাৎ গড়ে জন প্রতি ৫০ সেণ্ট। এ টাকায় এক সপ্তাহকাল মাত্র দিনে একবেলা আহারের ব্যবস্থা করা যাবে। আমাদের সমস্যা এত বিরাট যে, আমরা স্বেচ্ছাবাহিনীর প্রয়োজন মেটাতে অক্ষম। এটাই আমাদের প্রধান সমস্যা এবং আমরা এখানে চীনে এবং বিদেশে তাদের জন্য অর্থ সংগ্রহ করছি। মিস স্মেডলী বলেছিলেন, আমরা আপনার কাছে আবেদন করতে পারি এবং তাঁর নিশ্চিত ধারণা যে, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস,—যার সভাপতি আপনি কিছু অর্থ দান করবেন এবং সেটা আমাদের সৈন্যবাহিনী স্বেচ্ছাসেবকদের দিতে পারবে। এটুকু জানবেন যে, আপনাদের দানের প্রতিটি আনা সাদরে গৃহীত হবে এবং স্বেচ্ছাসেবকদের হাতে পৌঁছবে, যাতে তারা সংগ্রাম চালিয়ে যেতে পারে।

চীনা স্বেচ্ছাসেনাবাহিনীর নামে চাঁদা সংগ্রহের জন্য আপনি একটা সমিতি গঠন করতে পারবেন বলে মনে করি। যদি সম্ভব হয় তাহলে এখনই করুন। আমরা জানি আপনার দেশের লক্ষ লক্ষ অধিবাসী আমাদের এই সংগ্রামে সহানুভূতিশীল এবং তাঁরা সাহায্যের জন্য কিছু দিতে রাজী হবেন।

চীনাদের নিয়ে গঠিত অষ্টম রুট সৈন্যবাহিনীর সর্বাধিনায়ক হিসেবে আমি আপনাকে এবং ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসকে এবং সেই সঙ্গে ভারতের সমগ্র জনসাধারণকে এই বলতে চাই যে, চীনদেশ পরাধীন নয়, পরাজিতও নয়, এবং আমরা কখনও পরাধীন হতে পারিনে বা হবও না। আমাদের সৈন্যবাহিনী উত্তর চীন থেকে কখনও পশ্চাদপসরণ করবে না। যতক্ষণ না তাদের শেষ সৈন্যটিকে আমাদের দেশ থেকে, মাঞ্চুরিয়া থেকেও বিতাড়িত করতে পারছি ততক্ষণ আমরা জনসাধারণের সঙ্গেই থাকব এবং আক্রমণকারী জাপানী সাম্রাজ্যবাদী সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে বিরামহীন যুদ্ধ চালাবার জন্য তাদের অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত ও সংগঠিত করব। জাপানীদের মিথ্যে কথা বা প্রচারকার্যের দ্বারা বিভ্রান্ত হবেন না। আমাদের সংগ্রাম সবেমাত্র সুরু হয়েছে। স্থায়ী চীনা সরকারী সৈন্যবাহিনী যুদ্ধ করছে। আমরা কখনই পরাজিত হব না, কারণ আমাদের বাহিনী জনগণ দ্বারা গঠিত এবং হাজার হাজার লোক ক্রমাগত আমাদের বাহিনীতে যোগ দিচ্ছে আর যুদ্ধ করছে।

আমাদের এই সৈন্যবাহিনী সুনিয়ন্ত্রিত, সুশিক্ষিত এবং শক্তিশালী; আমাদের সৈন্যদের—নতুন স্বেচ্ছাসেবক হতে সুরু করে সেনানায়ক পর্যন্ত,—সকলেরই উচ্চ রাজনৈতিক শিক্ষা আছে। বর্তমানে এবং ভবিষ্যতে এশিয়ার ব্যাপারে আমরা কি অংশ গ্রহণ করবো সে সম্বন্ধে আমরা সম্পূর্ণ এবং বিশেষ সচেতন। আমরা জানি যে আমরা কেবলমাত্র চীনা জাতি বা চীনা জনসাধারণের জন্য যুদ্ধ করছিনে—সমগ্র এশিয়ার জনগণের হয়েই যুদ্ধ করছি; পৃথিবীর নিপীড়িত শ্রেণী ও অত্যাচারিত

জাতির মুক্তিবাহিনীর আমরা একটা অংশ। এই বিষয়ে সচেতন আছি বলেই আমাদের সংগ্রামে যে কোনও প্রকারে এবং সকল রকমে আমাদের সাহায্য করার জন্য আমরা ভারতীয় জনসাধারণের মহান নেতা হিসেবে আপনাকে অনুরোধ করছি। চীনা স্বেচ্ছাবাহিনীর নামে আমরা আর্থিক সাহায্য সাদরে গ্রহণ করব; ঔষধ এবং অস্ত্রোপচারের যন্ত্রাদি, শিক্ষিত শল্য চিকিৎসক ও নার্স পেলে খুশি হব; তাছাড়া আমাদের সুখ দুঃখের ভাগী হয়ে এই যুদ্ধে আমাদের স্বেচ্ছাসেবকদলে যোগ দিতে রাজী আছে এমন ভলান্টিয়ারও আমরা চাই। আমাদের অনুরোধ আপনি বিষয়টা ভাল করে ভেবে দেখবেন; আমাদের সাহায্য করবার এবং জাপানী দ্রব্য বর্জনের জন্য জোর আন্দোলন করবেন; এবং আমাদের এই মুক্তিসংগ্রামের ব্যাপারটা আপনার দেশবাসী যাতে সম্যক বুঝতে পারে সে চেষ্টা করবেন। জাপানীরা যদি চীনকে অধীন করতে পারে তাহলে বহু বৎসর এমন কি বহুযুগের মধ্যেও এশিয়ার কোন জাতি স্বাধীনতা অর্জনে সক্ষম হবে না। আমাদের সংগ্রাম আপনাদেরও সংগ্রাম। আমাদের দেশের জন্য আপনি এ পর্যন্ত যা করেছেন তার জন্য আমাদের সৈন্যবাহিনী আর একবার আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছে।

আপনার সখ্যানুরক্ত
চু তে
চীনা অষ্টম রুট সৈন্যবাহিনীর সর্বাধিনায়ক

১৯৮ হাজী মির্জা আলী কর্তৃক লিখিত
(ইপির ফকির সাহেব)

শীওয়াল
ওয়াজিরিস্তান
১০ রজব, ১৩৫৬ অল্ হিজরী
(১৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩৭)

স্বাধীনতাকামী জনগণের নেতা এবং ভারতীয় জাতির কীর্তিমান প্রধান সমীপেষু—

যথাবিহিত সম্মানপুরঃসর নিবেদন এই (বহুত বহুত তসলিমবাদ আরজ এই):—

ভারতের নানা সংবাদপত্র হইতে অবগত হইলাম যে, সারা ভারত জুড়িয়া আমাদের বিপক্ষে বহু বিরুদ্ধ প্রচার চলিতেছে (আমাকে ক্ষমা করিবেন)। পয়গম্বরের মতই আমাদের দশা, যদিও তাঁহার তুলনায় আমরা তুচ্ছ। আমরা প্রকৃতই আমাদের জনগণ ও জাতির প্রতি প্রগাঢ়ভাবে অনুরক্ত। এই কারণেই এই যুগের খৃস্ট-বিরোধীদের ঈর্ষাপ্রণোদিত এই মিথ্যা রটনা—তাহারা আমাদের আজাদী হইতে বঞ্চিত করিতে চায়। কিন্তু মহাশয়, আপনি নিশ্চিত থাকিতে পারেন, যদি এই অত্যাচারীদের আমাদের ভূমি হইতে তরবারীর অগ্রে উৎখাত করিতে না পারি, অথবা এই সংগ্রামে লোপ পাইয়া না যাই, আমাদের এবং ভারত সরকারের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে না। আমাদের নিকট এক লহমার আজাদীও হাজার হাজার বৎসরের গোলামী অপেক্ষা শ্রেয় (এমন কি তাহাতে যদি আমাদের প্রাকৃতিক অবস্থার কিছুটা উন্নতিও ঘটে)।

আমাদের আরও আর্জি এই যে, বান্নু এবং ডেরা ইসমাইল খানের নিকটবর্তী অঞ্চলে মাঝে মাঝে যে দস্যুবৃত্তি এবং অপহরণের ঘটনাগুলি ঘটিতেছে, সেগুলি সম্পূর্ণই ব্রিটিশ চরদের কারসাজি। আমরা এই দুষ্কার্যের নিশ্চয়ই সমর্থন করি

না। আমাদের ধর্মে এই সকল কার্য স্পষ্টতই নিষিদ্ধ। ইসলামধর্ম অনুসারে এইরূপ দুষ্কার্য যাহারা করে, তাহারা জালিম (জুলুমকারী) ও মর্দুদ (ধর্মদ্রোহী) এবং ইসলামের এলাকার বাহিরে। কারণ, ইসলাম শান্তি ও ঐক্যের বাণী—অত্যাচার আর বাড়াবাড়ির সে সমর্থক নহে—সেগুলি তো স্পষ্টই সয়তানি আর দুষমনি।

ইসলাম দুনিয়ায় সংঘাত এবং সমরের সমর্থন করে না। আবার অত্যাচারকে বাধা না দেওয়া বা অত্যাচারীর নিকট কাপুরুষের ন্যায় আত্মসমর্পণ ইসলামী ভাবধারার বিরোধী। ইসলাম কাপুরুষকে চরমদণ্ডের ভীতিই প্রদর্শন করিয়া থাকে।

জনাব, আপনি পরিষ্কার বুঝিতে পারিবেন যে, আমাদের এবং অত্যাচারী সরকারের মধ্যে এই যে লড়াই—আমাদের আজাদীর উপর অন্যায় আক্রমণই ইহার হেতু, আমাদের ধর্মান্তরীকরণের উন্মাদনা ইহার কারণ নহে। আল্লাহ্ আমাদের ধর্মবিষয়ে সহজ উপদেশই দিয়াছেন এবং পবিত্র পুঁথিতে ইহাই শিখাইয়াছেন যে, 'ধর্মে কোনও বাধ্যতা নাই'। ইহার অর্থ এই যে, ধর্ম বাছাই করার ব্যাপারে প্রতিটি মানুষ স্বাধীন। হিন্দু, মুসলমান বা খৃস্টান—যাহা খুশী সে হইতে পারে। কোরান হইতে ইহাই সিদ্ধান্ত করা যায় যে, ধর্ম মানুষের মতিগতি, প্রকৃতি এবং আধ্যাত্মিক ভাবধারার বিষয়। এই জন্যই মৃত্যুর পরে শেষ হিসাব-নিকাশের দিন ধার্য হইয়াছে, যখন মানুষ নহে, আল্লাহ্ স্বয়ং জীবনের কার্যাবলীর জন্য দণ্ড অথবা পুরস্কার দিবেন। শ্রদ্ধেয় মহাশয়, আপনি আমাদের নিকট হইতে ইহা জানিবেন যে, ওয়াজিরিস্তানের হালফিল এই দশা (ব্রিটিশের) বাড়াবাড়ি এবং ভারত সরকারের আক্রমণাত্মক অভিযান নীতি গ্রহণের ফল। ইহার অন্য কোন কারণ নাই। তাই যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের জীবনের নিঃশ্বাসটুকু আছে, ততক্ষণ পর্যন্ত গোলামীর নিকট আত্মসমর্পণ আমাদের পক্ষে অসম্ভব। আল্লাহ্‌র সাহায্যে ভারত যেন তাহাদের হস্ত হইতে নিজেকে মুক্ত করিতে পারে এবং আমরা যেন আমাদের জন্মভূমিকে অসির অগ্রে স্বাধীন করিতে পারি। যেন তাহাই হয়। আমীন (ঈশ্বর যেন এইরূপই করেন)!

শীলমোহরাঙ্কিত
হাজী মির্জা আলী
(ইপির ফকির সাহেব)

১৯৯ মহাত্মা গান্ধীকে লিখিত

১৪ই নভেম্বর, ১৯৩৭

প্রিয় বাপু,

এই মাত্র নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির (এ আই সি সি) বৈঠকের উপরে লেখা আপনার প্রবন্ধটি পড়লাম। মহীশূর প্রস্তাব (সংকল্প) সম্পর্কে আপনি বলেছেন যে, ওটি নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির আওতার বাইরে। যদি তাই-ই হয়ে থাকে, ওটির উপরে আলোচনার অনুমতি দেওয়ার আমার কারণ ছিল না এবং ওটি নিষিদ্ধ করাই উচিত ছিল। শাসনতান্ত্রিক এমন কোন বিধান আমার জানা নেই যাতে এই পরিণতি হতে পারে। এবং শুধু এই ধরণের বিধানই সাধারণভাবে প্রস্তাবিত এবং নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিকাংশ দ্বারা সমর্থিত সংকল্পকে বাধা দিতে পারে। শাসনতন্ত্রের কথা বাদ দিলেও, কংগ্রেস বা নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির পূর্ববর্তী এমন কোনো সিদ্ধান্ত আমার জানা নেই যাতে বলা হয়েছে যে, এই বিষয়গুলির বিবেচনা করা হবে না। যদিও বা এমন প্রস্তাব থেকেই থাকে, আর সেটি চলিত নিয়মভুক্ত হয়ে না থাকে, আমি তো বুঝতে পারি নে, নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির কোনো বিষয়ে বিবেচনা করার ইচ্ছে হলে কি করে তা বাধা সৃষ্টি

করতে পারে। নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির নিজের আগেকার গৃহীত প্রস্তাবের বিপরীত হলেও সে-প্রস্তাব সম্পর্কে বিবেচনা করার তার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে। যদি অবশ্য কোন চলিত নিয়ম বা কার্যক্রম থেকে থাকে, তাহলে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি তা বদল না করা পর্যন্ত সেই অনুসারেই কাজ করতে হবে। এমন নিয়মের প্রশ্নই ওঠে না, এমন কি আমি এরূপ প্রস্তাবের কথাও জানি না যার নীতি মহীশূর প্রস্তাব লঙ্ঘন করে। আমরা অতীতে যেসকল বিবৃতি বার করেছি তাতে এই উল্লেখ আছে যে, কংগ্রেস দেশীয় রাজ্যগুলিতে হস্তক্ষেপ না করার নীতি অনুসরণ করতে ইচ্ছুক। নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি যদি হস্তক্ষেপ করতে ইচ্ছুক হয় তো, এই বিবৃতিগুলিও তাকে বাধা দিতে পারে না। আমি বুঝতে পারি নে আওতার বাইরে এই আইনের বুলিটি কি করে প্রযোজ্য হতে পারে।

আর একটা প্রশ্ন ওঠে—হস্তক্ষেপ অর্থ কি? প্রস্তাবে কোন দেশীয় রাজ্যের উল্লেখই কি হস্তক্ষেপ করা? ব্যক্তিস্বাধীনতার দাবি অথবা নির্যাতনের নিন্দা কি হস্তক্ষেপ করা? যদি তাই-ই হয়, কংগ্রেস স্বয়ং গত দু বছর ধরে বিশেষভাবে এবং স্পষ্টতই এই দোষে দোষী।

নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির মহীশূর প্রস্তাবটির শব্দ গ্রন্থন অতি খারাপ, এবং আমি তখনই কমিটি দ্বারা এটি কোনক্রমেই পাশ করাতে চাই নি। কিন্তু এ ব্যাপারে আমার অনুভূতির দাম খুবই কম। এক গণতন্ত্রী পরিষদের সভাপতি হিসেবেই আমাকে কাজ করতে হয়েছে। প্রস্তাবটি মহীশূরের নির্যাতনের নিন্দা-সূচক। এই নির্যাতনের প্রকৃতি যাই হোক না কেন, আমরা কি ভবিষ্যতে কোন দেশীয় রাজ্যে নির্যাতনের নিন্দা থেকে বিরত থাকব? যদি এই উৎপীড়নকে কংগ্রেসের প্রতি আক্রমণ, আমাদের ঝাণ্ডার অপমান বা আমাদের সংঘটনকে নিষিদ্ধ করাই হয়, তাহলেও কি আমরা নীরব হয়ে থাকব? ব্যাপারটা পরিষ্কার করে নিতে হবে, যাতে আমাদের অফিস আর সংঘটন স্পষ্ট বুঝতে পারে কোন্ পন্থা আমরা গ্রহণ করতে চাই।

আপনি বলেছেন, অন্ততঃ অপর পক্ষের বক্তব্য না শুনে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির এই প্রস্তাবটি পাশ করা উচিত হয় নি। আপনি কি মনে করেন আমাদের পক্ষে তদন্ত কমিটি নিযুক্ত করে দেশীয় রাজ্যগুলিতে পাঠানো সম্ভব? দেশীয় রাজ্যগুলি কি রাজী হবে? কয়েকবার দেশীয় রাজ্যগুলির কাছে এ প্রস্তাব করেছি—একটা কমিটি নয়, শুধুমাত্র একজন লোক গিয়ে দু পক্ষের কাছ থেকেই তদন্ত করবে। কিন্তু তারা এ প্রস্তাব একই ভাবে উপেক্ষা করেছে।

এই মহীশূরের ব্যাপারটি বহুদিন ধরেই চলছে। কর্ণাটক প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি এ ব্যাপারে কিছুটা হস্তক্ষেপও করেছেন। তাঁদের সম্পাদকের সঙ্গে মহীশূরের দেওয়ানের এক দীর্ঘক্ষণব্যাপী সাক্ষাৎকার হয়ে গেছে। আমি বার বার দেওয়ানকে লিখেছি এবং তাঁর কাছে নাম করে করে বহু ঘটনা পেশ করেছি। অবশেষে তিনি উত্তরও দিয়েছেন, কিন্তু আমার মতে তাতে রাজ্যের নীতির ঔচিত্য সমর্থিত হয় নি।

গত কয়েক মাস ধরেই মহীশূরের কংগ্রেসসেবীদের সংযত রেখেছি যাতে তাঁরা কোন হুকুম অমান্যের ব্যাপারে না থাকেন। সত্যই, কোন আদেশই অমান্য হয় নি, শুধু সম্প্রতি নরিমান যা করেছেন। কর্ণাটক প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি অবশেষে পরিস্থিতির পর্যালোচনা করে মহীশূরের নির্যাতন নীতির নিন্দা করেছেন এবং এ বিষয়ে কি করা কর্তব্য আমাদের কাছে তার আরো নির্দেশ চেয়েছেন। সুতরাং একথা বলা একরকম ঠিকই নয় যে, নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি কারো জবানবন্দী

না শুনে অথবা একতরফা নিন্দা করেছেন। যতগুলি সাধারণ উপায় আমাদের কাছে খোলা ছিল সেগুলি আমরা খাটিয়ে দেখেছি।

আমি এত সব আপনাকে এই জন্যই লিখছি যে, আমাদের নীতিটি কি সে সম্পর্কে আমার মনে স্পষ্ট ধারণা করে নিতে চাই। আমাদের অনুসৃত পন্থার জন্য আপনি আমাকে ও নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটিকে ভর্ৎসনা করেছেন। আমি তো এখনো বুঝতে পারছি নে, কেন বা কোথায় আমার ভুল হয়েছে। যতক্ষণ অবধি তা বুঝতে না পারি, ততক্ষণ আমার পক্ষে অন্যথা করা তো দুঃসাধ্য ব্যাপার।

আপনার স্নেহের
জওহরলাল

মহাত্মা গান্ধী
ওয়ার্ধা (সি. পি.)

২০০ গোবিন্দবল্লভ পন্থকে লিখিত

২৫শে নভেম্বর, ১৯৩৭

ব্যক্তিগত

প্রিয় পন্থজী,

আজ আমি আসাম যাচ্ছি। সম্ভবতঃ ডিসেম্বরের মাঝামাঝির আগে ফিরছি না। যাবার আগে আপনাকে চিঠি লিখে জানাতে চাই যে, সারা ভারত জুড়ে কংগ্রেসী মন্ত্রীসভাগুলি সম্পর্কে ঘটনাবলী যে মোড় নিয়েছে তাতে আমি অত্যন্ত দুঃখিত হয়েছি। ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের কাছে আমার যে চিঠিগুলি পাঠানো হয়েছিল, আপনার কাছেও তার একখানি নকল গেছে, তাতে আমি আমার মনের কথা ব্যক্ত করেছিলাম। সে মতের প্রকাশে সংযম ছিল, কিন্তু সেই সংযমের আড়ালে বিশ্বাসের তীব্রতাও ছিল। প্রয়োগিক ভাষায় বলতে গেলে, কংগ্রেসী মন্ত্রীসভাগুলি প্রতি-বিপ্লবী হতে চলেছে। এটা অবশ্য সচেতন সম্প্রসার নয়, কিন্তু পছন্দ করতে গেলে ঝোঁকটা এ দিকেই পড়ে। এছাড়াও সাধারণ ভাবধারা স্থিতিশীল বা অচল। আমাদের স্থিতিশীল হবার সাহস তো নেই—কারণ তার মানে তো এই যে, আমরা শুধুই পূর্ববর্তী সরকারগুলির ঐতিহ্য (একটু-আধটু ব্যতিক্রম-সহ) বহন করে নিয়ে চলেছি। বাস্তবিকই আমরা বেশিদিন অচল হয়ে থাকতে পারি নে, কারণ পৃথিবী তো অচল নয়। তাই পথ বেছে নেওয়াটা অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছে। আর আমার এই ভয় যে, পথনির্দেশ বেশীর ভাগ ভুলের দিকেই হয়।

আমি এ বিষয়ে সম্পূর্ণ নিশ্চিত যে, কংগ্রেসী মন্ত্রীসভার আগমনের ফলে আমরা মহাশক্তির অধিকারী হয়েছি। আংশিকভাবে দেখতে গেলে তাঁরা যে গুটিকয়েক প্রাথমিত নীতি গ্রহণ করেছেন নিঃসন্দেহে তারই ফলে হয়েছে। কিন্তু অতি ব্যাপক-ভাবে এই পরিবর্তন মনস্তাত্বিক, আর অবশ্যম্ভাবীও বটে। কিন্তু আমরা তো মনস্তত্ত্ব বা কয়েকটি সৎ কাজের খ্যাতির উপরে টিঁকে থাকতে পারি না। বেশ কয়েক মাস হ'ল আমরা কাজ চালিয়ে যাচ্ছি, আমাদের আরো বেশী ফল দেখাতে হবে। এখন যখন এগিয়ে যাবার সময় এসেছে, তখন পিছিয়ে যাবার একটা স্পষ্ট ঝোঁক দেখা যাচ্ছে। অবশ্য আমরা পিছিয়ে যেতে পারি নে, কেননা আন্দোলন এতই জোরদার যে, আমাদের পিছিয়ে যেতে দেবে না। কিন্তু এই প্রচেষ্টায় ঐ আন্দোলনকে অতি দুর্বল করে ফেলছি, আর বৃটিশ সরকার এত বছর ধরে যা করতে চেষ্টা করেছে, অবিকল তাই করেছি—বিভেদ সৃষ্টি করে কংগ্রেসকে বা কংগ্রেসের একটি অংশকে বস্তুতই সাম্রাজ্যবাদ ভাবাপন্ন নীতি গ্রহণ করাচ্ছি। এই যদি

অনিশ্চিত ঘটনার সম্ভাব্য ধারা হয়, তাহলে শাসন-ক্ষমতা যত তাড়াতাড়ি ছেড়ে দেওয়া যায়, ততই মঙ্গল। এ বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ পরিষ্কার বুঝি যে, ভিতরে থাকার চেয়ে বেরিয়ে আসাই আমাদের ভাল, যদি আমরা যেভাবে চলেছি তার চেয়ে দ্রুত না এগিয়ে যেতে পারি। বাস্তবিক বর্তমানে বিশেষ করে মাদ্রাজ আর বোম্বাইতে পিছিয়ে যাবার প্রশ্নটা আর নেই।

হয়ত আমার পরিপ্রেক্ষিতই ভুল, কিন্তু আমি তো শুধু নিজের মতো করেই ভাবতে আর কাজ করতে পারি।

এবং এর ফলাফল অতি গুরুতর, যা উপেক্ষা করা যায় না।

আপনার বিশ্বস্ত
জওহরলাল

২০৯ খালিক্-উজ্-জমানকে লিখিত

এলাহাবাদ
২৭শে জুন, ১৯৩৭

প্রিয় খালিক্,

গতকাল বিকেলে 'খিলাফৎ' সংবাদপত্রে বুন্দেলখণ্ড উপনির্বাচনী সম্পর্কে ২৫শে জুন তারিখের একটি বিবৃতি পড়লাম। এই বিবৃতিখানি তোমাকে নিয়ে ছয় কি সাতজন দ্বারা স্বাক্ষরিত। আমি অবাক হয়েই পড়লাম। এই জাতের দলিলে আমি তো তোমার নাম কখনো যুক্ত করতে পারতাম না। যে কোন অবস্থায় এটা বিশ্বাস করাই কঠিন হোত, কিন্তু গত এপ্রিলে আমাদের আলাপের পর আমার চোখকেই প্রায় বিশ্বাস করতে পারি নি। গত দু মাস অথবা তারও বেশী ভারত-বর্ষের সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর সঙ্গে আমার তেমন যোগ নেই। এর খানিকটা কারণ আমার অসুখ, আর খানিকটা আমার অনুপস্থিতি। কিন্তু ঘটনার ধারাতত্ত্বে তেমন একটা প্রভেদ ঘটায় না। তুমি যা করেছ খিলাফতে তার যে বিবরণী পেলাম তা এই তত্ত্বের মূলেই ঘা মেরেছে। আমাদের কি ধরণের কাজ করা উচিত, এ নিয়ে অতীতে আমাদের মতভেদ ঘটে থাকতে পারে, কিন্তু আমি সব সময়েই ভাবতাম আমাদের সাধারণ ভাবধারার ভিতরে ঐক্য আছে। এ যে আমারই ভুল তা বোঝা গেল। আমার কথা বলতে পারি, আমি অতীতে যেমন করেছি, ভবিষ্যতেও তেমনি করব—তত্ত্বের কথাই বেশি করে ভাবব—আমার কাজ থেকে যে ফল দেখা দিতে পারে তার কথা নয়। চিন্তা ও কাজের সেই ভিত্তি ছাড়া আমি তো জলে ভাসমান তৃণের সমান হব, যাকে ইতস্ততঃ ভাসিয়ে নিয়ে যায়, যার হাল নেই, দিকনির্ণয় যন্ত্র নেই। জীবন প্রায়ই আমার কাছে ভারী বোঝার মত ঠেকেছে, কিন্তু আমার সান্ত্বনা এই যে, কতগুলি নির্দিষ্ট তত্ত্বের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে চেষ্টা করেছি।

তুমি যা করেছ বা করেছ বলে বিবৃত হয়েছে, তাতে আমি গভীর দুঃখ পেয়েছি। এ বিষয়ে আমার কি মনোভাব সেটা তোমাকে জানাবার দায়িত্ব আমার আছে। ভেবেছিলাম, এবং মনে হয় ভাবার অধিকারও ছিল যে, আমাকে না জানিয়ে তুমি অমন কোন পন্থা গ্রহণ করবে না। তোমার প্রতিটি আশ্বাস আমার মনে গাঁথা ছিল এবং আমি তার দামও দিয়েছিলাম। এখন সে আশ্বাস আর নেই, এটা তো স্বাভাবিক যে আমি একটানা একটা আঘাত পাব।

এ চিঠিখানা সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত। রাজনীতির দিক থেকে আমার চিঠি লেখার কোনো কারণ নেই।

তোমার
জওহরলাল

[চৌধুরী খালিক-উজ্ জমান যুক্তপ্রদেশের একজন নেতৃস্থানীয় কংগ্রেসী ছিলেন। পরে তিনি মুসলিম লীগে যোগ দেন। দেশবিভাগের পরেই তিনি পাকিস্তানে চলে যান।]

২০২ খালিক্-উজ্-জমান কর্তৃক লিখিত

লখনউ
২৮শে নভেম্বর, ১৯৩৭

প্রিয় জওহর,

কয়েক দিন হ'ল ভিতরের কাগজপত্র-সহ তোমার চিঠি পেয়েছি। তোমার মনে পড়বে, গত মে মাসে যখন বুন্দেলখণ্ড নির্বাচনী লড়াই চলছিল, তখন মুসলিম গণ-সংযোগ আন্দোলনে যে বিপদ আশঙ্কা করেছিলাম, তা তোমাকে বিস্তারিত লিখে জানাই। এবং আমার মনে হয় বর্তমান এই পরিস্থিতি কংগ্রেসী নীতিরই ফল। এমন কি সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা এবং পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী চালু থাকার সময়েও মুসলিম আসনগুলিতে কংগ্রেসের প্রতিদ্বন্দ্বিতার দাবি কেউ অস্বীকার করতে পারে না। কিন্তু দেশের বৃহত্তর স্বার্থের দিক থেকে আমার মনে হয়, মুসলমানেরা যখন পৃথক নির্বাচকমণ্ডলীর সমর্থন করছেন, তখন তাঁদের নিজেদের রাজনীতির ক্ষেত্র থেকে প্রতিনিধি পাঠাতে দেওয়াটাই বাঞ্ছনীয়। দুর্ভাগ্যবশতঃ আমি তোমাকে এই মতে রাজী করাতে পারি নি। অপ্রিয় ঘটনাবলী এই নির্বাচনীগুলির সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত, এবং যতদিন এইগুলি চলবে, আমার আশঙ্কা হয়, বর্তমান অবস্থার কোনো সমাধান হবে না। কংগ্রেসী মুসলিম প্রার্থীকে এবং তার সমর্থক-দলকে তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী মুসলিম লীগওয়ালাদের মতই সৎ এবং ধার্মিক বলেই নিজেদের জাহির করতে হবে, এবং যুদ্ধমানদের সমস্ত ধর্মোন্মাদনার প্রকাশ দ্বারা নির্বাচকমণ্ডলীকে সঙ্গে সঙ্গে টেনে নিয়ে যেতে হবে। ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি, পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী থেকে কংগ্রেস যদি তার প্রার্থীকে জয়ী করাতে সমর্থও হয়, তাহলেও যতদিন পর্যন্ত সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার আংশিক পরিবর্তন না হয়, ততদিন পর্যন্ত এই ব্যাপারটি সম্পর্কে জোর করা কংগ্রেসের পক্ষে অন্যায়। সেদিন ডাঃ মুঞ্জে বিজনোর নির্বাচনীর পর তাঁর একটি বিবৃতিতে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছে বলে কংগ্রেসকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। আমি নিশ্চিত জানি, কংগ্রেস পৃথকনির্বাচনী প্রথায় মুসলিম নির্বাচনে এমন কোন অভিসন্ধি থেকে যোগ দিতে আসবে না; কিন্তু কংগ্রেস যদিও আপোসে ছাড়া এটি বদলাতে বা আংশিক পরিবর্তন করতে রাজী নয়, তবুও কংগ্রেসী নীতির অবশ্য ফল হ'ল বাঁটোয়ারা ধ্বংস। কংগ্রেস ও লীগের কর্মসূচীতে এই প্রভেদ ছাড়াও এই দুই সংঘটনের সদস্যদের মধ্যে বর্তমানে যে তিক্ততা দেখা দিয়েছে আমি তো তা নিবৃত্তির কোনো উপায় দেখছি নে। আর এই উপ-নির্বাচনীগুলিও চিরদিন চলতে পারে না। যখন সেগুলি চুকে যাবে, তখন মানুষ ঠাণ্ডা হয়ে কর্মসূচী আর সম্মুখে যে কাজ রয়েছে তার কথা ভাবতে বসবে। আমার আশা এই যে, বিভেদ অনেকখানি মিলিয়ে যাবে এবং ভুলে যাওয়াও হবে।

মুসলিম লীগ এখন স্বাধীনতার আদর্শের সঙ্গে একীভূত, সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংসকারী যেকোন আন্দোলনের সঙ্গে সহযোগিতা তার অবশ্য কর্তব্য। কংগ্রেস যখনি কোন সক্রিয় সংগ্রামের কার্যসূচী চালু করে দেবে, আমার আশা লীগও পিছিয়ে থাকবে না। বরং কংগ্রেসের সঙ্গে অতি ঘনিষ্ঠ সহযোগিতায় সে সংগ্রাম করবে। তেমনি, ব্যবস্থাপক সভার ভিতরের কাজেও লীগ ওয়ার্ধা কার্যসূচীর সম্পূর্ণ অনুমোদন জানিয়েছে এবং তার সভ্যরা তা মানতেও বাধ্য।

অপরের উপরে অবৈধ প্রভাব বিস্তার নিয়ে মওলানা শোকত আলী যে বিবৃতিটি দিয়েছেন, সেটি সম্পর্কে বিস্তারিত খবর দেবার মতো আমার এখন অবস্থা নয়। তবে একথা বলি, মাননীয় হাফিজ মহম্মদ ইব্রাহিমকে মন্ত্রীত্ব বজায় রেখে আসনে ইস্তাফা দিয়ে পুনঃনির্বাচনে দাঁড়াতে অনুমতি দেওয়া হয়েছে, কংগ্রেস সরকারের এ কাজটি একেবারে সংস্থান-বিরোধী না হলেও নিশ্চয়ই অত্যন্ত অনুচিত। গভর্নমেণ্ট অফ্ ইণ্ডিয়া য়্যাক্ট-এ গভর্নরকে এই ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে যে, তিনি বাইরে থেকে কোন ব্যক্তিকে এই শর্তে মন্ত্রী নিযুক্ত করতে পারবেন যে, নিয়োগের ছ মাসের মধ্যে তাঁকে ব্যবস্থাপক সভায় নিজের জন্য একটি আসন সংগ্রহ করে নিতে হবে। কিন্তু কোথাও কোন মন্ত্রীকে পদটি বজায় রেখে ব্যবস্থাপক সভার সভ্য নিযুক্ত হবার পর নিজের আসনটি ত্যাগ করতে অনুমতি দেওয়া হয় না। এছাড়া, তুমি চট্ করে এটা বুঝতে পারবে যে, আশী বৎসরের বিদেশী শাসন মুসলিম সম্প্রদায়ের সমস্ত বাধা দেবার শক্তি ধ্বংস করে দিয়েছে এবং ক্ষমতাকে ভয় ও ভক্তি করার অভ্যাস তার হয়েছে। যে কেউ মন্ত্রী হিসেবে নির্বাচনে দাঁড়ান, তিনিই মুসলিমদের এই দুর্বলতার সুযোগ নিতে বাধ্য হবেন। এই কার্যক্রমের বিরুদ্ধে আমি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমার প্রতিবাদ জানিয়েছিলাম, কিন্তু শুধু প্রাপ্তি-স্বীকার ছাড়া কোন উত্তর পাই নি। যাক গে, সে তো এখন অতীতের কথা। তুমি যে খবর চাও নবাব ইসমাইল খান তা দিতে পারবেন।

লীগ সদস্যদের দুর্বিনীত এবং আপত্তিজনক ব্যবহার এবং তাদের প্রচার পদ্ধতির কথাই বলি। আমার বিশ্বাস তোমাকে যা জানানো হয়েছে, ঘটনার উপর তার ভিত্তি আছে। এবং তা সত্যও হতে পারে। কিন্তু সে তো ছবির এক দিকমাত্র। কংগ্রেসী মুসলিম, অহ্‌রার আর জামিয়াৎরা যে কদর্য ভাষা আর গালাগাল রোজ দিচ্ছে এবং যে অমূলক প্রচার তারা করে বেড়াচ্ছে তাতে এদের কিছু কৃতিত্ব বাড়ছে না। উদাহরণ হিসেবে তোমাকে জানাতে পারি যে, মওলানা আতাউল্লা শা বুখারী তাঁর এক বক্তৃতায় লীগের প্রতিনিধিদের পূতিগন্ধময় শব বলে অভিহিত করেছেন। তেমনি কংগ্রেসী মুখপাত্র হিন্দুস্তানের দ্বারা লীগ সদস্যদের ভাণ্ড্ বা মাদারী বলাও দায়িত্বহীন সাংবাদিকতার চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত। অহ্‌রারদের দ্বারা লাহোরের এক মসজিদে লীগ-দরদীদের উপরে আক্রমণ থেকে এইটেই বোঝা যাবে যে, কংগ্রেসী সমর্থকদেব মধ্যেও হিংসার ঝোঁক রয়েছে। তারা দাবি করে, পৃথক রাজনীতিক সংঘটনের অস্তিত্বে তারা বিশ্বাস করে না, কিন্তু মুসলিম দলের লেবেলটি বোধহয় পৃথক গোষ্ঠীগত স্থায়ীত্বের জন্য মুসলিম দুর্বলতার মঞ্জুরী হিসেবে বজায় রাখে। তাই হিন্দু-মুসলিমের চেয়ে মুসলিমে মুসলিমেই তিক্ততা বেশি। আমি নিশ্চিত জানি, এই যে ক্রোধের আতিশয্য এবং দায়িত্বহীনতা সময়ে এগুলি লোপ পেয়ে যাবে, যখন পরস্পরের ভাবধারার ভুল বোঝাবুঝির কুয়াশা কেটে যাবে, তখন আমরা হিন্দুস্তানের আজাদীর জন্য কাঁধে কাঁধে মিলিয়ে কাজ করতে পারব। ইতিমধ্যে, এই দুটি সংঘটনের দায়িত্বশীল সভ্যদের তাঁদের উচ্ছৃংখল মানুষগুলিকে বুঝিয়ে এবং সত্যকারের নির্দেশ দিয়ে সংযত রাখার চেষ্টা করা উচিত।

তোমার

খালিক্

২০৩ মহাদেব দেশাই কর্তৃক লিখিত

মগনওয়াদী, ওয়ার্ধা
২রা ডিসেম্বর, ১৯৩৭

প্রিয় জওহর ভাই,

তোমার ২৭ তারিখের চিঠি পেয়েছি। তুমি যে আদৌ চিঠি লিখেছ এইটেই আমার কাছে আশ্চর্য, তার চেয়েও বড় আশ্চর্য এই যে, এতখানি লিখেছ। তুমি যা বলেছ, আমি তা বুঝি। আমি তোমার সঙ্গে তর্ক করতে চাইনি, কারণ আমার মনে হ'ল, তুমি তর্ক চাও নি, তোমার চিঠিতে যে কথা জোর দিয়ে বলেছ, তারই পরিপ্রেক্ষিতে শুধু বাপুর মতামত চেয়েছ।

বাপুর অবস্থার কোনো উন্নতি হয়নি, তাঁর কাছ থেকে আমরা সমস্ত চিঠিপত্র আটক রেখেছি। কিন্তু তবু আমি ঠিক করি যে, ডাক্তারের আদেশ অমান্য করেও বাপুর কাছে তোমার চিঠিখানা পড়ে শোনাতে হবে। তাঁকে পড়ে শোনানোয় তিনি খুশী হয়েছেন, যদি তাঁর পক্ষে উত্তর মুখে বলে দেওয়া আদৌ সম্ভব হোত, তিনি তাও করতেন। সে প্রশ্ন ওঠেই না। তিনি যখন মহীশূর-প্রস্তারকে বেআইনি লিখেছিলেন, তখন তাঁর কি মনে হয়েছিল, সেইটেই আমি নিজের কথায় বলতে চেষ্টা করব। ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকেও বাপু যে ঠিক এই কথাই বলেছিলেন, তা তোমার মনে আছে কি না জানি না। (তাঁর ঐ ধারণাই ছিল, জমনালালজীকে জিজ্ঞেস করায় তিনিও তাঁর কথায় সায় দিলেন।) তাঁর এই বিশ্বাস ছিল যে, প্রস্তাবটি তুলতে দেওয়া হবে না। যখন দেখলেন এটা পাশ হয়ে গেল, তিনি আঘাতই পেয়েছিলেন।

তোমার নিজের চিঠিতে তুমি স্বীকার করেছ যে, প্রস্তাবটির ভাষা খারাপ ছিল। আমার ধারণা তুমি বলবে, তাতেই এটা বে-আইনি হয়ে যায় না। বাপু তা যায় বলেই মনে করেন। এতে শুধু দেশীয় রাজ্যের চণ্ডনীতিরই প্রতিবাদ করা হয়নি, ব্রিটীশ ভারতের জনগণের কাছেও আহ্বান জানানো হয়েছে, যাতে তারা মহীশূরের জনগণকে যথাসম্ভব সাহায্য করে। যদি এটা লখনউ প্রস্তাবের ভাব ও ভাষার বিরুদ্ধে না যায় তো আর কি যাবে? বহু আলোচনা এবং চিন্তার পর লখনউ প্রস্তাবটি তৈরির সিদ্ধান্ত হয়। রাজেন্দ্রবাবু ১-৮-৩৫-এ যে নীতি ঘোষণা করেন এবং এ আই সি সি দ্বারা ১৭-১০-৩৫-এ যেটি গৃহীত হয়, এতে তারই প্রভাব দেখা যায়। এই মর্মে ঘোষণার পংক্তিটি এইরূপ ছিল:—ইহা বুঝিতে হইবে যে, দেশীয় রাজ্যগুলির বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাইবার দায় এবং দায়িত্ব অবশ্যই দেশীয় রাজ্যের জনগণের উপর অর্শিবে। কংগ্রেস দেশীয় রাজ্যগুলিতে নৈতিক এবং বন্ধুত্বের প্রভাব খাটাইতে পারেন—যেখানে সম্ভব হইবে, সেখানে তাহা অবশ্য খাটাইবেন। বর্তমান অবস্থায় কংগ্রেসের অন্য কিছু করিবার সামর্থ্য নাই, যদিও ভারতবাসী, ব্রিটিশ, দেশীয় নৃপতিগণ বা অপর যে কোন শক্তির অধীন হোক না কেন, ভৌগোলিক এবং ঐতিহাসিক দিক হইতে তাহারা এক এবং অভিন্ন। মতদ্বৈধের উগ্রতায় কংগ্রেসের সীমারেখা প্রায়ই মানুষ ভুলিয়া যায়। বাস্তবিক, অপর কোন নীতি সর্বজনহিতকর আদর্শকে হার মানাইয়া দিবে।

এই যে ঘোষণা, এটি তখন পর্যন্ত অনুসৃত নীতির পুনরাবৃত্তি মাত্র। 'দেশীয় রাজ্যগুলির অভ্যন্তরের স্বাধীনতা সংগ্রাম, স্বভাবতঃই দেশীয় রাজ্যগুলির জনগণ দ্বারা পরিচালিত হইতে হইবে'—লখনউ প্রস্তাব একথা অতি স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়ে ঐ ঘোষণাকে কংগ্রেসী কানুনের মর্যাদা দেয়। মহীশূর প্রস্তাবের যাঁরা

জন্মদাতা, তাঁরা কংগ্রেসের নিজের টেনে-দেওয়া সীমারেখাটি বিস্মৃত হয়েছেন এবং কংগ্রেসের বহুদিনের গৃহীত নীতির ভাবধারার বিরোধীতাই করেছেন।

আমি এবার তোমার অন্য প্রশ্নে আসছি। তুমি বলেছ, "এ আই সি সি প্রস্তাব দ্বারা সত্য এবং অহিংসা নীতি ভঙ্গ হয়েছে, বাপু তারও উল্লেখ করেছেন। এগুলি গুরুতর অভিযোগ এবং প্রমাণ-সাপেক্ষ" ইত্যাদি। এটা স্বাভাবিক যে, তুমি যখন একথা লিখছিলে, বাপুর নিবন্ধটি তোমার সম্মুখে ছিল না। তিনি বলেছেন, যে প্রস্তাব (মাসানির) এবং বক্তৃতাগুলি 'লক্ষ্য এড়িয়ে গেছে।' কি করে এড়িয়ে গেল তাও ব্যাখ্যা করেছেন এবং 'জওহরলাল নেহরু এ বিষয়ে তাঁর বিস্তারিত বিবৃতিতে কি বলেছেন তা পড়তে এবং মনে রাখতে বলেছেন।' তারপরে এই কথাটি আছে: 'আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, সমালোচকেরা তাঁদের কাজে সত্য এবং অহিংসা থেকে বিচ্যুত হয়েছেন।' এটা প্রস্তাবের থেকে বক্তৃতাগুলির বিষয়েই বেশি করে বলা হয়েছে। তোমাকেও কয়েকজন বক্তাকে টেনে তুলে তাদের তত্ত্ব এবং নীতির গণ্ডীর ভিতরে থাকতে বলতে হয়েছিল। শ্রীযুক্ত মাসানি বললেন, 'বহু রাজবন্দী মুক্ত হয়েছেন, বিধি-নিষেধ উঠে গেছে, কিন্তু কংগ্রেসী প্রদেশগুলিতে এখনও বহু বন্দী আছেন।' মন্ত্রীরা যে সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে শামিল হয়ে গেছেন, বা হক বা সিকান্দার হায়াৎ খানদের মত মন্দ হয়ে গেছেন, এই কি তার যথেষ্ট প্রমাণ? এটা কি সত্য বলা হয় যে, নির্যাতণের সমস্ত অস্ত্রাগার অটুট আছে, যখন কংগ্রেসের মন্ত্রীত্ব গ্রহণের দু মাসের মধ্যে মোপলা নির্যাতন আইন রদ হয়ে গেল? অন্যান্য বক্তৃতাগুলির আর উল্লেখ করব না।

মহীশূর প্রস্তাব সম্পর্কে বাপুজীর এই মত যে, যখন আমরা ঠিক করেই সেখানে গেছি এবং আইন অমান্য করেছি, তখন মহীশূর রাজ্যের নীতিকে জুলুম-দারী বলা অসত্য। 'ঘৃণিত জুলুমের নীতি' এবং 'যাহারা রাজ্যের ভিতর দিয়া যাইবে তাহাদের জন্য ছাপা হুকুমনামা তৈয়ারী রাখা'—এগুলি সত্য কথা নয়।

তোমার চিঠির বাকিটা সম্পর্কে বাপু তোমার বক্তব্যের খুবই তারিফ করেছেন। বাপুর কাছ থেকে আসছে বলেই সবকিছু মানতে হবে, এমন প্রশ্নই ওঠে না। কোনো বিষয়ে নিজের মতটাকে বিনীত ভাবে মেনে নেওয়ার মানে শৃঙ্খলা কখনোই নয়।

এর আগেই তোমার বিবৃতি সংবাদপত্রে বার করেছ কি না জানি না। যদি তা না করে থাক, তাহলে এই চিঠির পরিপ্রেক্ষিতে হয়তো আংশিক অদল-বদল করে নিতে পারবে। এই চিঠি বা এর অংশবিশেষ তুমি যদৃচ্ছা ব্যবহার করতে পার—যদিও এটা আমার চিঠি, বাপুর নয়। আর আমি এটা তাঁকে না দেখিয়েই ডাকে দিচ্ছি। তোমার যদি মনে হয়, বিবৃতিটি যা আছে, সেইভাবেই থাকা উচিত, তাহলে তুমি স্বচ্ছন্দে প্রকাশ করতে পার। তার মানে এই বলতে পার যে, যে-উত্তরটি পেয়েছ তাতে তোমার বিশ্বাস নেই, এবং তোমার মনের নির্দেশ অনুসারে কাজ করতে চাও।

আমাদের কয়েকজন মন্ত্রীর কাজে যে সত্য এবং অহিংসা ভঙ্গের প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে, সে সম্পর্কে খোলাখুলি এবং পুরোপুরি যাতে লেখো, বাপু তাই-ই চান, তাঁর শরীরের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে ভ্রূক্ষেপ না করেই তা চান। কেন না, এই যে বিচ্যুতি, যেখান থেকেই আসুক না কেন, একে নিন্দা করতে হবে। এবং আমাদের মন্ত্রীরা যদি সত্যই এই দোষে দোষী হন, তাহলে তাঁদের বহিষ্কৃত করে দেওয়াই উচিত হবে।

বাংলার ব্যাপার নিয়ে যা বলেছ, তিনি তা বোঝেন। বন্দীমুক্তি নিয়ে তোমার 'উদ্দাম মাতামাতি'র আশা করা দূরে থাক, তিনি যেভাবে বন্দী আর অন্তরীনদের

মুক্তির ব্যাপারে গভর্ণর আর মন্ত্রীদের সঙ্গে দেখা করেছেন, সেটায় তোমার সমর্থন আছে কি না বল, এইটাই তিনি শুধু জানতে চেয়েছিলেন।

তোমার স্নেহের
মহাদেব

২০৪ র‍্যাডলফ্ মেয়ার্স কর্তৃক লিখিত

C/o. দি টাইমস্ অফ্ ইণ্ডিয়া,
বোম্বে
৬ই ডিসেম্বর, ১৯৩৭

প্রিয় জওহরলাল নেহরু,

'ভাষা সম্পর্কে প্রশ্ন' আপনার এই পুস্তিকাখানি সবেমাত্র পড়লাম। এতে আপনি বুনিয়াদী ইংরাজী ভাষার (Basic English) উল্লেখ করেছেন। এই বুনিয়াদী ইংরাজী ভাষা সম্পর্কে আমার কৌতূহল সাধারণের চেয়ে ঢের বেশি। এবং আপনার উৎসাহ সত্ত্বেও আপনি যে তার উপরে সুবিচার করেন নি—এই ভেবেই মনে মনে এমন একটা কথা খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম যা আপনার বর্ণনার ত্রুটিটুকু এক কথায় বলে দিতে পারে। এই সময়ে আপনার আত্মজীবনীর একটি উদ্ধৃতি আমার সহায় হ'ল। হয়তো তার কারণ এই যে, এই উদ্ধৃতির লেখক অধ্যাপক জন ডিউই নিজেই বুনিয়াদী ইংরাজীর একজন ব্যগ্র সমর্থক। উদ্ধৃতিটি এইঃ—'আদর্শের পরিণতির জন্য যে কোনো কাজ করা হয়...তার সর্বব্যাপক এবং স্থায়ী মূল্যের জন্যই তা ধর্মের গুণসম্পন্ন হয়ে ওঠে।'

বুনিয়াদী ইংরাজী আমার কাছে তো একরকম ধর্মই। আংশিকভাবে তো তাই-ই বটে, কারণ দৃশ্যতঃ এটি আন্তর্জাতিক ভাবধারা, এক বিশ্বচেতনা সৃষ্টির জরুরী সমস্যার একমাত্র কার্যকরী সমাধানের নির্দেশ দেয়, আর তা সর্বসাধারণের (যদিও সাহায্যকারী) সংযোগের বাহন রূপেই দেয়। কারণ, অংশতঃ এ যেন এক ঈশ্বর-প্রেরিত যন্ত্র, যার দ্বারা মানুষ ইচ্ছে করলে কথার দ্বারা সৃষ্ট ইন্দ্রজালের সীমার বাইরে যেতে পারে, যা মানুষকে দাসত্বে বেঁধে রেখেছে, আর জনপ্রিয় এবং বিজ্ঞান-সম্মত ভাবধারার এমন সর্বনাশ ঘটিয়েছে, যা আপনি নিজেই আপনার বইয়ে উল্লেখ করেছেন।

এই যে আন্তর্জাতিক আর সমাজতাত্ত্বিক দিক, আপনি আপনার পুস্তিকায় এ দুটি দিকের একটিও স্পর্শ করেন নি। অবশ্য এটা আমি বুঝি যে, বুনিয়াদী ইংরাজী সম্পর্কে উল্লেখ আপনার যুক্তিতে প্রসঙ্গত এসে পড়েছে, কিন্তু একথা আমি অনুভব করি যে, যদি বুনিয়াদী ইংরাজীর প্রতি আরো সুবিচার করতেন, তাহলে এমন কি বুনিয়াদী ইংরাজীর ব্যাপক মানবিক উদ্দেশ্য ছাড়াও আপনি বুনিয়াদী হিন্দুস্থানীর ওকালতিটা জোরদার করে তুলতে এবং এর সম্ভাবনায় আরো বেশি উৎসাহ দেখাতে পারতেন। জানি না, বুনিয়াদী সম্পর্কে আপনার পড়াশুনো কতদূর। যদি না দেখে থাকেন, তাই আলাদাভাবে দুখানি ছোট ছোট বই পাঠাবার স্বাধীনতা গ্রহণ করছি। আমি যে দুটি দিকের উল্লেখ করেছি, এ দুখানিতে তাই নিয়েই বলা হয়েছে। ওগডেনের নিজের লেখা 'ডিব্যাবেলাইজেশন' আর রিচার্ডস্-এর 'বেসিক ইন টিচিং ঃ ঈস্ট য়্যাণ্ড ওয়েস্ট'—বই দুখানি পাঠাচ্ছি এই আশায় যে, আপনি সময় করে চোখ বুলিয়ে দেখবেন এবং সময়-মতো তাদের ভিতরের জিনিস কাজে লাগাবেন।

এই সবে নিশ্চয়ই আমাকে বেশ খানিকটা ছিটগ্রস্থ বলে মনে হবে। বাস্তবিক, আমি নিজেই অবাক হয়ে যাই যে, 'আর যুদ্ধ নয়' এমনিধারা আন্দোলন সম্পর্কে হতাশ এবং আমাদের উপরে যে ভয়াবহ বিপর্যয় দোদুল্যমান, তারই সম্মুখীন হয়ে

আমার আগে যেটুকু কাণ্ডজ্ঞান ছিল তাও হারাতে বসেছি কি না কে বলবে। যাহোক, মোটামুটি আমার এই বিশ্বাস যে, 'আদর্শ যতই দূরে থাক, বাধা যতই প্রচণ্ড হোক, আমরা এমন এক পর্যায়ে এসে গেছি, যখন সর্বসাধারণের মধ্যে এক ভাষার বিস্তার আইনজীবীদের পরিভাষায় মানুষের উন্নতির একটি অত্যাবশ্যকীয় শর্ত। এটি ছাড়া সর্বসাধারণের ভাগ্য এত শক্তিশালী হতে পারবে না, যাতে করে জাতীয় প্রতিদ্বন্দ্বীতাকে পরাস্ত করতে পারে। যিনি এটি নিকটে আনবার চেষ্টা করবেন, তিনি 'ইতিহাসের সঙ্গে তাল রেখে চলবেন'—এ তো এক মহান অনুভূতি।

যদি ঐতিহাসিক এবং তত্ত্বগত দিক থেকেও আমার বিশ্বাস না হয়, শ, ওয়েলস্, স্বেন হেডিন, হগবেন, ডিউই, ডবলিউ কে লিয়াও, হুক, ওকাকুরা, হাক্সলি, পার্সি নান, এলিয়ট স্মিথ, উইকহাম স্টীড এবং মাদাম লিটভিনফ—এমনি কয়েকজনের নাম এলোমেলোভাবে করা গেল, এমন মানুষরা দুনিয়া জুড়ে বুনিয়াদী ইংরাজীর যে প্রচণ্ড সমর্থন জানিয়েছেন, আমাকে তা স্থিরনিশ্চয় করে তুলবে। এঁরা নিশ্চয়ই ক্ষ্যাপা নন!

এ বছর যখন লণ্ডনে ছুটিতে ছিলাম, তখন দি টাইমস অফ ইণ্ডিয়ার (যার কর্মীদের মধ্যে আমিও একজন) ঝুনো পরিচালকদের দুবছরের প্রচেষ্টার পর বুনিয়াদীর প্রতি কৌতূহল জাগাতে সমর্থ হয়ে হয়তো আমার সাফল্যে আরো বেশি উৎসাহিত হয়েছিলাম। তারই একটা ফল হিসেবে এবং বুনিয়াদী ইংরাজীর আবিষ্কর্তা ওগডেনের সঙ্গে তাঁর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বিশেষ-পড়াশুনোর ছুটিটা কাটানোর দরুন আমরা বুনিয়াদী সম্পর্কে একখানা সস্তা বই শীঘ্রই প্রকাশ করতে যাচ্ছি, তাতে ভারতবর্ষের চাহিদার উল্লেখটা বিশেষ করে থাকবে। বর্তমানের বৃথাব্যয়িত, মাথা-ভারী ইংরেজী শিক্ষার পদ্ধতির বদলে সেটি হবে বুনিয়াদী ইংরাজীর ব্যাপক এবং প্রবল অভিযানেরই সূচনা।

এই প্রসঙ্গে আপনার পুস্তিকার একটি মন্তব্য বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে পারে। আপনি বলেছেন, "...এবং বুনিয়াদী ইংরাজীর শব্দভাণ্ডার বৈজ্ঞানিক, প্রয়োগিক এবং বাণিজ্যিক শব্দগুলি বাদ দিয়ে প্রায় ৯৮০টি শব্দে কমিয়ে আনা হয়েছে।" ওগডেন-এর বইয়ে সর্বত্রই যে সংখ্যা প্রদত্ত হয়েছে, সেটি ৮৫০, এমন কি ৫০টি আন্তর্জাতিক শব্দ যোগ করলেও মাত্র ৯০০টি দাঁড়ায়।... এ নিশ্চয়ই ভুল হয়ে গেছে। আশা করি, প্রয়োজন হলে আপনি সেটা স্পষ্ট করে বলার আমাদের অধিকার দেবেন। এই প্রসঙ্গে আফিস থেকে একখানি চিঠি এর সঙ্গে দেওয়া হ'ল।

বুক থেকে সবকিছু নামিয়ে দেবার পর আপনাকে বলার সুযোগটুকু নিচ্ছি,—বহুদিন থেকেই আপনাকে একথা লেখার ইচ্ছে ছিল যে, এক বছর আগে যখন আপনার জীবনস্মৃতি পড়ি, তখন আমার উপর তা কি গভীর ছাপ ফেলেছিল। প্রথমতঃ আমাদের মধ্যে এতটা মিল। ইংলণ্ডে জন্ম এবং লালিত-পালিত হয়েও আমি জাতে ইহুদী। এবং আমাদের নিজেদের নবজন্মের সংগ্রামে আমিও আপনার মতো অনেক সময় নিজেকে 'নিঃসঙ্গ এবং গৃহহীন' ভেবেছি। এর খানিকটা কারণ এই যে, প্যালেস্টাইনের যে অধিবাসীদের মধ্যে আমি অগ্রবর্তী হয়ে সাম্যবাদী মতে পাঁচ বছর বাস করেছিলাম, তারা বেশির ভাগই ছিল বিদেশী ইহুদী (আমি তো ইংরেজদের মধ্যে চিরদিনই ইহুদী, এবং ইহুদীদের মধ্যে ইংরেজ।) আর খানিকটা কারণ এই যে, আন্দোলনের ধর্মের দিকটার সঙ্গে নিজেকে আমি যুক্ত করতে পারিনি—আর সবার উপরে পারিনি ঐ 'বাছাই-করা জাতির' ধারণার সঙ্গে।

কিন্তু সেটা নগণ্য ব্যাপার। বইখানি পড়ে নেতাদের এবং জনগণের নৈতিক বীরত্ব এবং আত্মোৎসর্গের প্রতি প্রশংসা ছাড়াও যে প্রবল অনুভূতি আমার জেগেছিল

সেটি এই,—সমস্ত দারিদ্র্য এবং পিছিয়ে থাকা সত্ত্বেও ভারত তার অন্তরের এবং বাহিরের শ্রীবৃদ্ধির ভিতরে অদূর ভবিষ্যতে ভারসাম্য এবং ঐক্য প্রতিষ্ঠা করবে। এবং আপনার কথায়, দুর্ভাগ্যবশতঃ পাশ্চাত্য যা করতে পারেনি সভ্য জীবনধারণের সেই কলানৈপুণ্যে পৃথিবীর বাকি অংশের সে নেতৃত্ব গ্রহণ করবে।

মনে হয় আপনার সাধারণ কারাজীবনের বর্ণনা পড়েই, শুধুমাত্র ভয়াবহ অমানুষিকতাই নয়, মানুষের সংস্বভাবের স্থিতিশীল উপাদানের সর্বনাশা অপচয় সম্বন্ধেও আমার এই ধারণা প্রথম জন্মেছিল। আমি ভেবেছিলাম, কংগ্রেস নিজেরা যখন ক্ষমতা পেয়েছেন, তখন নিশ্চয়ই তাঁরা যে ব্যবস্থায় এমন সহ্য করেছেন, সে-ব্যবস্থা বদলাতে দেরী করবেন না। এই ব্যবস্থা তো কারাগার-সংস্কারকের দল পৃথিবী জুড়ে বছরের পর বছর ধরে বৃথাই নিন্দা করে এসেছেন। শিক্ষা, শ্রমিকের মঙ্গল, মাদকদ্রব্য নিষিদ্ধীকরণ এগুলি সম্পর্কেও একথা খাটে। আমার মনে হয়েছিল, প্রচলিত ভাবধারা এবং কার্যের বিরোধী হিসেবে যাঁরা লালিত, তাঁরা নিশ্চয়ই অন্য দেশের কেদারায়-আসীন তাত্ত্বিকদের চেয়ে পরিবর্তনের বৃহত্তর শক্তি হয়েই দেখা দেবেন।

আমি যা বলেছি, তা এক বছর আগেকার কথা। বোধহয় এই কয়েক মাসে কিছুই আমাকে তত উত্তেজিত করেনি, যত করেছে এই ভেবে যে, দেশের বেশির ভাগ জায়গায় এখন আপনাদের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তাই প্রথম কাজ, প্রথম উপলব্ধি আর সহানুভূতির কার্যকরী প্রকাশ হবে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায়, ব্যক্তিগত দুঃখভোগে লালিত-পালিত আদর্শে—সেগুলি হচ্ছে মন্ত্রীদের আত্মত্যাগের অধ্যাদেশ, বন্দী-মুক্তি, মাদকদ্রব্য নিষিদ্ধীকরণের পরীক্ষায়, দৃঢ়-সংস্কার, জনশিক্ষা ইত্যাদি।

ধ্বংসাত্মক সমালোচনার চেয়ে গঠনমূলক প্রচেষ্টা ঢের কঠিন, এটা আপনারা নিঃসন্দেহে দেখতে পাচ্ছেন। পথ দীর্ঘ, বাধাও বহু—এও বুঝতে পারছেন। কিন্তু আমি মনে করি যে, আপনারা যখন সরলতার সঙ্গে যাত্রা শুরু করেছেন, যখন সত্য এবং অহিংসাকে আদর্শ বলে গ্রহণ করেছেন, তখন আপনারা লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবেন—সে-লক্ষ্য সুখী এবং প্রকৃত সভ্য সমাজ। পাশ্চাত্যের আগেই, এবং বোধহয় তার বিরোধিতা সত্ত্বেও তা সম্ভব হবে।

মনে হয়, গান্ধীজী আর তাঁর ছোট নেংটিখানা আর ছাগদুগ্ধ এরই মধ্যে পৃথিবীকে অন্তর এবং বাহিরের ঐক্য সম্পর্কে কিছুটা অর্থ বুঝিয়ে দিয়েছে। আমার কাছে, যদিও এটাকে সারল্যের অতিশয্য বলেই মনে হয়, তবু ভারতের পক্ষে, আপনাদের 'উদ্দেশ্য' এবং 'লক্ষ্য' হিসেবে এই অন্তর্নিহিত ভাবধারা একটি প্রতীক-বিশেষ।

মনে হচ্ছে, চিঠিখানা কিছুটা এলোমেলো হ'ল। আমি এর ভিতরে অনেক কিছু মিশিয়ে ফেলেছি। এর ভিতরে যদি কোন সঙ্গতি থেকে থাকে, হয় তো এই ধারণার উপরে তার ভিত্তি যে, ভারত সমাজ-বিপ্লবের প্রসব-বেদনায় অধীর, শিক্ষা অবশ্যই তার অন্তর্ভুক্ত আর বুনিয়াদীর বিপ্লবী ভাবধারা সেই বিপ্লবে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করতেও পারে শুধু ইংরেজী শিক্ষারীতিই নয়, শিক্ষার সমস্ত মনস্তাত্ত্বিক আর পণ্ডিতী ধারাকেও বদলে দিতে পারে (রিচার্ডস্ দ্রষ্টব্য)।

আপনার
য়্যাডলফ্ মেয়ার্স

২০৫ মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক লিখিত

সেবাগ্রাম, ওয়ার্ধা
৭ই ডিসেম্বর, ১৯৩৭

প্রিয় জওহরলাল,

আমি মথুরা প্রস্তাব বা তোমার বক্তৃতা পড়িনি। ঐ দুটোই আমি পেতে চাই।

তোমার মৃদু অভিযোগ মহাদেবের চিঠিতে লক্ষ্য করেছি। আমি কি করব? আমি যেমনটি, তেমনটিই আমাকে গ্রহণ করতে হবে। জানি তুমি তা কর। আমার প্রতি তোমার ব্যবহার কত শিষ্ট তাও জানি।

যখন খুশি ক্রীপস্‌কে নিয়ে তুমি আসতে পার।

ভালবাসা নিয়ো
বাপু

২০৬ রাজেন্দ্রপ্রসাদ কর্তৃক লিখিত

পোঃ জিরাদই (সারন)
২৪শে ডিসেম্বর, ১৯৩৭

প্রিয় জওহরলালজী,

আপনার ২৯শে নভেম্বর, '৩৭ তারিখের চিঠি ঠিক সময়ে পেয়েছি, কিন্তু কংগ্রেসের পূর্ববর্তী প্রস্তাবগুলি তখন আমার কাছে না থাকায় সময়-মতো উত্তর দিতে পারিনি বলে দুঃখিত।

এ-আই-সি-সির বৈঠকে উপস্থিত ছিলাম না বলে, কোন্ বিষয়ে কার্যধারা সত্য এবং অহিংসা থেকে বিচ্যুত হয়েছে, বলবার আমার এক্তিয়ার নেই। কিন্তু আমার মনে হয়, মহাত্মা গান্ধীর উল্লেখে শ্রীমাসানির প্রস্তাবের ভাষার উপরে জোর না দিয়ে তার উপরে যে বক্তৃতাগুলি হয়, তার উপরেই বেশি জোর দেওয়া উচিত ছিল।

মহীশূর প্রস্তাব যে বেআইনি, এই বিবৃতিটি কংগ্রেসের পূর্বতন প্রস্তাবগুলি অনুসারেই বিবেচিত হওয়া উচিত। প্রস্তাবটিতে মহীশূর রাজ্যে ব্যক্তিস্বাধীনতার নিষ্ঠুর নির্যাতন আর দমন নীতির বিরুদ্ধে এ-আই-সি-সির জোরদার প্রতিবাদই প্রকাশ পেয়েছে, এবং মহীশূরের জনগণকে অভিনন্দন জানিয়ে, তাদের ন্যায়সংগত অহিংস সংগ্রামে সাফল্য কামনা করে ভারতের দেশীয় রাজ্যগুলি এবং ব্রিটিশ ভারতের জনগণের কাছে আবেদন করা হয়েছে, তাঁরা যেন মহীশূরের জনগণকে তাদের ব্যক্তিস্বাধীনতার দাবির সংগ্রামে সর্বাঙ্গীন সমর্থন এবং উৎসাহ দেন। এ-আই-সি-সি বা কংগ্রেসে কোন দেশীয় রাজ্যের বিশেষ কোন কার্যের বা নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদসূচক এবং দেশীয় রাজ্যগুলি এবং ব্রিটিশ ভারতের জনগণের কাছে তাদের সংগ্রামে সর্বাত্মক সমর্থন এবং উৎসাহ প্রদানের এমন আবেদনমূলক প্রস্তাব পূর্বে কখনো হয়েছে কি না আমার জানা নেই। এই দেশীয় রাজ্যের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করাই তার চিরাচরিত নীতি। কেবলমাত্র তিনটি কংগ্রেসী প্রস্তাব আছে, সেই অনুসারেই বিচার করে দেখতে হবে যে, সে-নীতি বাতিল হয়ে গেছে, না সংশোধিত হয়েছে। ১৯২৮ সালে কলকাতা কংগ্রেসে যে প্রস্তাবটি পাস হয়েছিল, তাতে দেশীয় রাজ্যসমূহের জনগণকে তাদের আইনসঙ্গত এবং শান্তিপূর্ণ সংগ্রামে সহানুভূতি এবং সমর্থনের নিশ্চিত আশ্বাস দেওয়া হয়। কংগ্রেসী এই নীতির পুনরাবৃত্তি হয়, অবশেষে ১৯৩৫ সালে ওয়ার্কিং কমিটির একটি বিবৃতিতে সেটি দেখা যায়, এবং '৩৫ সালের ১৭ই ও ১৮ই অক্টোবরের এ-আই-সি-সির মাদ্রাজের বৈঠকে সেটি গৃহীতও হয়। ঐ বিবৃতিতে দেশীয় রাজসমূহের জনগণকে তাদের বৈধ, এবং শান্তিপূর্ণ সংগ্রামে পুনঃ পুনঃ সহানুভূতি এবং সমর্থনের প্রতিশ্রুতি জানিয়ে এইগুলি কি ধরণের হবে তারও নির্দেশ দেওয়া হয়। 'যাহাই হউক, ইহা বুঝিতে হইবে যে, রাজ্যসমূহের অভ্যন্তরে সংগ্রামের যে দায়িত্ব এবং ভার তাহা অবশ্যই দেশীয় রাজ্যসমূহের জনগণের উপর অর্শিবে। কংগ্রেস নীতি এবং বন্ধুত্বের দিক হইতেই তাহার প্রভাব দেশীয় রাজ্যগুলির উপর বিস্তার করিতে পারে, যেখানে সম্ভব হইবে সেখানে সে তাহা করিতেও বাধ্য। এ-মত অবস্থায় কংগ্রেসের অন্য কোন

ক্ষমতা নাই, যদিও ভারতের সমগ্র জনগণ—তা ব্রিটিশ, ভারতীয় দেশীয় রাজ্যের রাজাগণ, বা অন্য যে কোন শক্তির অধীনে থাকুক না কেন, তাহারা ভৌগোলিক এবং ঐতিহাসিক দিক হইতে এক এবং অভিন্ন। তর্ক-বিতর্কের উত্তাপে প্রায়ই কংগ্রেসের এই সীমাবদ্ধতা মানুষ বিস্মৃত হয়। বাস্তবিকই অন্য যে-কোনো নীতি এই সার্বজনিক সংকল্পের পরিপন্থী হইবে। কলিকাতা অধিবেশনের প্রস্তাব এবং এ-আই-সি-সির এই বিবৃতিটিও ১৯৩৬ সালের লখনউ কংগ্রেসে পুনরায় সমর্থিত হয়। এবং কংগ্রেস থেকে এই 'নির্দেশই দেওয়া হয় যে দেশীয় রাজ্যগুলির অভ্যন্তরের স্বাধীনতা সংগ্রাম স্বভাবতই দেশীয় রাজ্যের জনগণ নিজেরাই চালাইবে।' আমার মনে পড়ে, শেষের বাক্যটিতে 'প্রধানত' এই কথাটি বসাবার সংশোধনী প্রস্তাবটি লখনউতে বাতিল হয়ে যায়। কলিকাতার এ-আই-সি-সি প্রস্তাবে শুধু মহীশূর রাজ্যের বিশেষ একটি নীতি এবং কার্যেরই প্রতিবাদ করা হয়নি, এতে দেশীয় রাজ্যসমূহ এবং ব্রিটিশ ভারতের জনগণের কাছে মহীশূরের জনগণকে সর্বাত্মক সমর্থন এবং উৎসাহের আবেদন জানান হয়েছে। অন্যভাবে বলতে গেলে, এটা নৈতিক এবং মৈত্রী-সূচক প্রভাব বিস্তারেরও বহুদূর ছাড়িয়ে গেছে। কংগ্রেসী সীমারেখা বিস্মৃত হয়েছে, এবং এমন নীতি গ্রহণ করা হয়েছে যা সর্বসাধারণের সংকল্প পরাস্ত করার জন্যই ঘোষিত হয়েছে। লখনউএর কংগ্রেসী প্রস্তাবে যে পূর্ববর্তী নীতির বিবৃতিকে সমর্থন করা হয়েছিল, এটি তার সঙ্গে খাপ খায়নি। অবশ্য, কংগ্রেসের নীতি পরিবর্তনের পথ খোলাই আছে, কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত কংগ্রেসী প্রস্তাবটি চালু আছে, ততক্ষণ পর্যন্ত আর একটি প্রস্তাব পাশ করা এ-আই-সি-সির আওতার বাইরে। এর অর্থ এই, কোন দেশীয় রাজ্যের আভ্যন্তরীন শাসন-ব্যবস্থায় প্রত্যক্ষভাবে বাধা-প্রধান এবং চলমান সংগ্রামে যোগদান। যদি এ-আই-সি-সি প্রস্তাব কার্যকরী করতে হয়, তাহলে ওয়ার্কিং কমিটি লোক, অর্থ এবং অন্যান্য দিক দিয়ে মহীশূরের জনগণকে সাহায্য করতে বাধ্য হবেন। আর যদি আবেদনে সাড়া দিতে হয়, তাহলে দেশীয় রাজ্যগুলির এবং ব্রিটিশ ভারতের জনগণেরও তাই করা উচিত। এমন সমর্থনের কথা কংগ্রেস কখনো ভাবে নি বা প্রতিশ্রুতিও দেন নি। এবং এ-আই-সি-সির কলিকাতা প্রস্তাব লখনউ কংগ্রেসের প্রস্তাবকে ছাড়িয়ে গেছে। মনে হয়, এই কারণে গান্ধীজী কলকাতা প্রস্তাবকে এ-আই-সি-সির আওতার বাইরে বলে মনে করেন।

আপনার
রাজেন্দ্র প্রসাদ

২০৭ এডওয়ার্ড টমসন কর্তৃক লিখিত

স্কার টপ
বোরস্ হীল, অক্সফোর্ড
২রা জানুয়ারী, ১৯৩৮

প্রিয় নেহরু,

আমি স্বীকার করি, মানুষের ব্যাপারটা প্রথমে আসবে। কিন্তু অন্যান্য জন্তুর ব্যাপারটাও আসবে বই কি। এদের জন্যও একযোগেই কিছু করা যায়। আরো একটা কথা, যদি কয়েকটা ধরনের জন্তু লোপ পেয়ে যায়, তাহলে যে ক্ষতি হবে, তার তো পূরণ হবে না, কিন্তু তাই হয়েছে। অতীত ভারতের একটি টুকরো তো অতল গহ্বরে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। এটা সবসময়েই আমার কাছে সবচেয়ে বড় ঔদ্ধত্য বলে মনে হয়েছে যে, মুষ্টিমেয় ক'জন ধনী শাসক মনে করে যে, আপনাদের এবং আপনাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের দেশের অবয়ব ধ্বংস করার তাদের অধিকার আছে।

আপনি এই ব্যাপারে কিছু সাহায্য করতে পারেন। প্রথমতঃ যদি প্রায়-লোপপ্রাপ্ত বলে কোন জন্তু বা পাখীকে রক্ষা করা হয়, তাহলে তাকে বিক্রির জন্য তুলে দেওয়া তো আইনত অপরাধ হওয়াই উচিত। আপনাদের এমন কতগুলি প্রায়-লোপপ্রাপ্ত পাখী আছে, যাদের মাংস প্রকাশ্যে বিক্রি হয়; গণ্ডারের শিং তো কলকাতার চীনারা এবং আরো কেউ কেউ পয়লা নম্বরের যৌন কামনার ওষুধ বলে মনে করে এবং বিক্রিও হয়। এমন হীন ব্যাপারে যে-জিনিসগুলি ব্যবহৃত হয়, সেগুলি লাভজনক ব্যবসা থেকে বাতিল করে দিলে তাতে সত্যিকারের কোন ক্ষতি হবে না।

সবচেয়ে বড় কথা হ'ল এমন এক ক্রমবর্ধমান জনমত সৃষ্টি করতে হবে, যাতে 'শিকারের' 'অহঙ্কারিক-মূল্য' ধ্বংস হয়ে যায়। তাহলে অমুক-তুসুক রাজা পাঁচশো বাঘ জবাই করেছেন (যেমন রেওয়ার রাজা) অথবা হাজার হাজার বালিহাঁস মেরেছেন বা কৃষ্ণকায় হরিণ গুলী করে মারার সময় ঘণ্টায় ত্রিশ মাইল জোরে গাড়ি ছুটিয়েছেন, একথা শুনে প্রশংসায় হাত তুলতে অস্বীকার করে ভারতীয়েরা আমাদের পাশ্চাত্যকে পথ দেখিয়ে দেবেন। এই ব্যাপারটার সম্ভ্রম ধ্বংস করুন, দক্ষিণ আফ্রিকায় জনমত তো তা এরই মধ্যে অনেকখানি করেছে (কানাডায়ও তা হয়েছে) এবং অহিংসার অনুভূতি জাগিয়ে তুলুন, এই ভাবধারা ছড়িয়ে দিন যে আপনাদের সুন্দর বন্য-জন্তুগুলি ভারতের—তার ঐ উত্তরাধিকারেরই অংশ-বিশেষ—অন্য কোন লোক তা ধ্বংস করার অধিকার নেই।

ভাল কথা, আপনার ওখানে বছরখানেক আগে টাইম য়্যাণ্ড টাইড পত্রিকাখানি দেখেছিলাম। আপনি যদি এখনো ওখানা নেন তো চলতি সংখ্যায় (১লা জানুয়ারী) বিকানীরের মহারাজা সম্পর্কে আমার প্রবন্ধটি আপনার কৌতূহল জাগাতে পারে।

কংগ্রেসী মন্ত্রীসভা মাসে মাত্র পাঁচশো টাকা বেতন নিচ্ছেন পড়ে আমি যার পর নাই আনন্দিত এবং উৎসাহিত হয়েছি। এবং যদিও জীবন এক দীর্ঘ মোহ-বিচ্যুতির মিছিল—শুনে বড়ই খারাপ লাগল, এই যে আত্মোৎসর্গ এর বেশির ভাগই ভূয়ো, কেননা তাঁরা বাকিটা 'ভাতা' হিসেবে নিচ্ছেন। যদি একথা সত্য হয়, সরকারী আক্রমণে যা হয়নি এতে কংগ্রেসের তা রচেয়ে বেশি ক্ষতি হবে। আশা করি আপনার কাছ থেকে শুনবো যে একথা মিথ্যা। এমন একজন ভারতীয় আমাকে একথা বলেছেন যিনি এ-ব্যাপারে ওয়াকিবহাল।

চিরদিনের আপনার
এডওয়ার্ড টমসন

২০৮ এস্ ওয়াজির হাসান কর্তৃক লিখিত

৩৮ ক্যানিং রোড, এলাহাবাদ
১১ ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৮

প্রিয় জওহরলালজী,

গত অক্টোবর মাসের মুসলিম লীগের লখনউ অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণে মিথ্যা ভাষণ, মিথ্যা বর্ণনা ও ধর্ম এবং সম্প্রদায় প্রণোদিত ঘৃণা প্রচার শুধু মুসলমান আর হিন্দুর ভিতরেই নয়, মুসলমানদের নিজেদের ভিতরে সূত্রপাত হয়েছে। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অধিকার আর ধর্ম-প্রণোদিত ঘৃণার আড়ালে এটা দিনের পর দিন চলছে এবং ক্রমাগত সত্যের অপলাপও বেশি করেই ঘটছে। আমি এই কয়েকটির বিশেষ করে উল্লেখ করতে পারি;

(১) যে কংগ্রেস একটি হিন্দু প্রতিষ্ঠান।

(২) যে সে স্বরাজ প্রতিষ্ঠা চায় না, চায় ভারতে হিন্দু রাজ্য প্রতিষ্ঠা।

(৩) যে কংগ্রেস এবং সাতটি প্রদেশে তার সরকার সংখ্যালঘুদের উপর অত্যাচার

চালাতে এবং তাদের পিষে ফেলতে চায়—বিশেষ করে মুসলমানদের তো বটেই।

(৪) যে মুসলীম লীগ ভারতের আট কোটী মানুষের মত এবং ভাবধারার প্রতিনিধি।

(৫) যে কংগ্রেসে সামান্য কয়েকজন মুসলমান আছে, ঐ কয়জন ইসলামের বেইমান।

আমি তীব্রভাবে অনুভব করি যে, এই প্রচারের প্রতিবাদ না করলে, এই মিথ্যাকে প্রকটিত করে না তুললে, এটা সত্য হিসেবেই চলে যাবে, এবং সমগ্র দেশের অর্থনীতিক এবং রাজনীতিক স্বাধীনতার সংগ্রামের ক্ষতি করবে।

উপরে যে অবরোহণীগুলি দেওয়া হয়েছে, তাদের সম্পর্কে আমার স্পষ্ট মত এই যে, কোন কেন্দ্রস্থলে মার্চের শেষদিকে বা এপ্রিলের শুরুতে যেসব মুসলমান জনগণ এবং শ্রেণীগুলি কংগ্রেসের কাছে অঙ্গীকারবদ্ধ এবং আর যাদের আমি কংগ্রেস-মনাও বলতে পারি, তাদের নিয়ে একটি মহতী সভা ডাকা এবং প্রয়োজনীয় প্রস্তাব-গুলি পাশ করা উচিত। এবং মুসলীম লীগের প্রচারের বিরোধীতা করে ঘোষণাও প্রয়োজন। মওলানা আবুল কালাম আজাদের এই সভার আহ্বায়ক হওয়া উচিত। আমি একথাও জানাই যে, কংগ্রেস এবং মুসলীম লীগের সভাপতিদের মধ্যে যে আপসের আলোচনা চলছে তাতে কোনরকম বাধা সৃষ্টি করা আমার উদ্দেশ্য নয়। বরং, এই প্রস্তাবিত সভার কার্যাবলী নিষ্পত্তির পথই অনেকখানি পরিষ্কার করে দেবে —যা মুসলীম লীগ আর কংগ্রেসী দুইদলেরই মুসলমানদের কাছে গ্রহণীয়ও হতে হবে। পরিশেষে আমি আপনাকে এই চিঠিখানির বিষয় হরিপুরায় আপনার সহযোগীদের সঙ্গে আলোচনা করে দ্রুত একটা সিদ্ধান্তে আসতে অনুরোধ করি। বোধহয়, একথাও উল্লেখ করা বাঞ্ছনীয় যে, এই চিঠিতে যে মত প্রকাশিত হয়েছে, বহু কংগ্রেসী মুসলমানই তা পোষণ করেন।

আপনার বিশ্বস্ত
এস্, ওয়াজির হাসান

[এস্ ওয়াজির হাসান বহুদিন নিখিল ভারত মুসলীম লীগের নেতৃস্থানীয় একজন সদস্য ছিলেন।]

২০৯ এম. এ. জিন্নাহ্ কর্তৃক লিখিত

১নং হেস্টিংস রোড
নিউ দিল্লী
১৭ই মার্চ, ১৯৩৮

প্রিয় পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু,

আপনার ৮ই মার্চ ১৯৩৮ সালের চিঠি পেয়েছি। আপনার ১৮ই জানুয়ারীর প্রথম চিঠিখানি থেকে জানতে পারি যে, আপনি হিন্দু-মুসলমান ঐক্য বিধানের জন্য মতভেদের সূত্রগুলি জানতে চান। উত্তরে আমি এই লিখেছিলাম চিঠিপত্রে এ-বিষয়ের সমাধান হতে পারে না। সংবাদপত্রে আলোচনাও তেমনিই অবাঞ্ছনীয়। আপনার ৪ঠা ফেব্রুয়ারীর জবাবে আমার কংগ্রেসী সমালোচনা ও বক্তব্য কি হবে তাই ধরে নিয়ে আপনি এক বিক্ষোভের তালিকা তৈরী করে ফেলেছেন। যে প্রশ্ন আমাদের মধ্যে এখুনি বিবেচিত হওয়া উচিত, সেইদিক থেকে এটা একরকম সঙ্গত নয় বলেই মনে হয়। আপনি ঐ একই লাইন ধরে ছিলেন, এবং এখনো আপনার মত এই যে, ঐ বিষয়গুলো যদিও বর্তমান বিষয়ের সংগে জড়িত নয়, তবুও তাদের আরো আলোচনা হওয়া দরকার। কিন্তু আমি তো আমার আগেকার চিঠিতে জানিয়েছি যে আমি তা করতে চাইনে।

যে-প্রশ্ন নিয়ে আমরা শুরু করেছিলাম, আমি যেমন বুঝেছি—সেটা হচ্ছে মুসলমানদের ধর্ম, সংস্কৃতি, ভাষা, ব্যক্তিগত আইন এবং জাতীয় জীবনে সরকারে এবং দেশ শাসনে রাজনীতিক দাবির ব্যাপার। মুসলিমদের সন্তুষ্ট এবং সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের ভিতরে নিরাপত্তা এবং প্রত্যয় সৃষ্টি করবে এমন বহু প্রস্তাব করা হয়েছে। আমি অবাক হয়ে গেছি যে আপনি বলেছেন—'কোন্ বিষয়গুলি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত—হয় আমি এগুলি বিলক্ষণ জানি, নয়তো এই সমস্যার জটিলতার সঙ্গে আমার ততটা পরিচয় নেই। যদি তাই-ই হয়, আমি জ্ঞান লাভ করতে চাই। যদি সংবাদ-পত্রে কি সভায় সদ্য কোন বিবৃতি করা হয়ে থাকে তা জানালে আমার বোঝার সুবিধে হবে এবং আমি কৃতজ্ঞ থাকব।' আপনি হয়ত চৌদ্দ দফার কথা শুনেছেন।

তারপর, আপনি যে বলেছেন, 'এ ছাড়াও গত কয়েক বছরে এমন অনেক কিছু ঘটেছে যাতে অবস্থা বদলে গেছে।' হাঁ, এ সম্পর্কে আমি একমত এবং এই নিয়ে খবরের কাগজে বহু প্রস্তাবও দেখা গেছে। যেমন, ৩৮ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারীর 'দি স্টেটস্-ম্যান' আপনি দেখবেন. সেখানে 'মুসলমানের চোখে' নামে একটি প্রবন্ধ বেরোয় (আপনার সুবিধের জন্য কপি ভিতরে দেওয়া হ'ল)। পরে ১৯৩৮ সালের ১লা মার্চের 'নিউ টাইমস'-এর একটি প্রবন্ধে আপনার সদ্য ঘোষণা সম্পর্কে লেখা হয়েছে। আমার মনে হয়, এটি কংগ্রেসের হরিপুরা অধিবেশনেই হয়, সেখানে আপনি এই বলেছেন বলে জানা গেছে যে, 'এই তথাকথিত সাম্প্রদায়িক সমস্যা আমি দূরবীনের সাহায্যে পরীক্ষা করেছি। যদি কিছু না-ই থাকে, কি আর দেখতে পাবেন।'
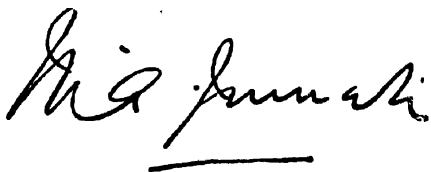
১৯৩৮ সালের ১লা মার্চের নিউ টাইমস্-এ এই প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়, তাতে বহু প্রস্তাবও করা হয় (আপনার সুবিধার জন্য ভিতরে কপি দেওয়া হ'ল)। আরো বলি. আপনি বোধহয় মিঃ য়্যানের সাক্ষাৎকারটিও দেখেছেন, যেখানে তিনি কংগ্রেসকে মুসলিম লীগের দাবির কয়েকটি দফা উল্লেখ করে হুঁশিয়ারী দিয়েছেন।

এখন, এটা বোধহয় আপনাকে দেখানো যথেষ্ট হবে যে, যতগুলি প্রস্তাব করা হয়েছে বা সম্ভবতঃ করা হবে. অথবা করার সম্ভাবনা আছে—সেগুলির বিশ্লেষণ দরকার। অবশেষে আমি মনে করি, যে কোন দল বা সম্প্রদায়েরই হন না কেন, খাঁটি জাতীয়তাবাদী নেতার কর্তব্য হচ্ছে এটিকে নিজের কাজ বলে মনে করে পরিস্থিতি বিচারের দ্বারা মুসলমান ও হিন্দুর মধ্যে একটি চুক্তি স্থাপন এবং এইভাবে সত্যিকারের সম্মেলিত ঐক্য প্রতিষ্ঠা। আমরা কোন্ সম্প্রদায়ের মানুষ এই কথা না ভেবে আপনার এবং আমার এইটেই উদ্বেগের বিষয় এবং কর্তব্য হওয়া সমীচীন। কিন্তু আপনি যদি আশা করে থাকেন যে, এই সব প্রস্তাবগুলি সংগ্রহ করে আপনার এবং আপনার সহকর্মীদের বিবেচনার জন্য আবেদনকারী হিসেবে পেশ করাই আমার উচিত, আমার ভয় হচ্ছে, আমি এটা পারব না, এই দফাগুলি নিয়ে আপনার সঙ্গে আরো পত্রালাপ চালানোর কারণেই তা পেরে উঠব না। যদি আপনি তবুও পিড়াপীড়ি করেন, যেমন আপনার চিঠিতে মনে হয় তা করেছেনও—যখন আপনি বলেছেন, 'সুষ্ঠুভাবে কাজ করবার আগে আমার মন স্পষ্টতা দাবি জানায়, অথবা কাজের নিরিখেই ভাবতে চায়। অস্পষ্টতা, অথবা আসল বিষয়গুলি এড়িয়ে গেলে সন্তোষজনক ফললাভ হবে না। এটা আমার কাছে অদ্ভুত ঠেকে যে, কোন বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা হবে, তা বারবার অনুরোধ সত্ত্বেও আমাকে বলা হয়নি।' এটা নির্ভুল বর্ণনা বা যথাযথ ছবি বলে মনেই হয় না। কিন্তু সেক্ষেত্রে আমি কংগ্রেসকে সরকারীভাবে এই মর্মে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করার কথা বলতে আপনাকে অনুরোধ করব এবং ব্যাপারটি নিখিল ভারত মুসলিম লীগের পরিষদে পেশ করব, কারণ আপনি নিজেই বলেছেন যে, আপনি কংগ্রেস সভাপতি নন এবং

"তাই একই ধরনের প্রতিনিধিত্বের ক্ষমতা নেই। এ বিষয়ে আমি যদি কিছুমাত্র সাহায্য করতে পারি, কংগ্রেসের জন্য তা করতে রাজী আছি এবং আপনার সঙ্গে সানন্দে আমি দেখা করব এবং ঐ বিষয়গুলির আলোচনাও করব।' আপনার সঙ্গে দেখা এবং আলোচনা সম্পর্কে একথা বোধহয় বলতে হবে না যে, আমি সুখীই হব।

ভবদীয়

M. A. Jinnah

২১০ মহাদেব দেশাই কর্তৃক লিখিত

১নং উডবার্ন পার্ক
কলিকাতা
২০শে মার্চ, ১৯৩৮

প্রিয় জওহরভাই,

খালি থেকে তোমার চিঠি পেয়ে খুশী হলাম। কি বলব, বাপু তোমার হার্দিকরকে লেখা জবাবটি পড়ে আনন্দিত হয়েছেন। তিনি যা বাদ রেখে গিছলেন, তুমি তা পূর্ণ করেছ দেখে তিনি খুবই খুশী। সমস্ত ব্যাপারটা যেভাবে লিখেছ, তাঁর খুবই ভাল লেগেছে। যদিও কোথাও কোথাও তিনি হয়ত ভিন্ন ধরণের ভাষাই ব্যবহার করতেন।

খালি সম্পর্কে বাপু বলেন যে, তোমার বর্ণনা এমন প্রলুব্ধ করে যাকে প্রতিরোধ করা যায় না। কিন্তু একথাও তিনি বলেন যে. প্রলোভনের প্রয়োজন ছিল না। তিনি প্রায়ই ওখানে যেতে চেয়েছেন, হাওয়া বদলের জন্য ততটা নয় যতটা রঞ্জিৎ পৃথিবীতে যে ক্ষুদে স্বর্গ নিয়ে এসেছেন তা দেখবেন বলে। তাঁর (রঞ্জিতের) পরীক্ষা-নিরীক্ষা সম্পর্কে তাঁর গভীর কৌতূহল—কাজ থেকে যখনি নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিতে পারবেন, সেখানে যাবার সাধ তাঁর আছে।

গতবারের চেয়ে এখন তিনি অনেক ভাল আছেন। কাজের চাপ আগেকার মতই সমান আছে, এবং ফলও কিছু সম্ভবত বোধহয় হবে না। কিন্তু গতবারের চেয়ে ভালভাবেই সইতে পেরেছেন।

ভালবাসা নিয়ো।

তোমার
মহাদেব

২১১ গোবিন্দবল্লভ পন্থ কর্তৃক লিখিত

লখনউ
২৩শে মার্চ, ১৯৩৮

প্রিয় জওহরলালজী,

আপনার এই অতি সহৃদয় পত্রখানির জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনি যে খালিতে ক'দিন কাটিয়ে আপনার কঠিন কাজের প্রচণ্ড এবং অবিরাম পেষণ থেকে কিছুটা বিশ্রাম পেয়েছেন এর জন্যে আমি আনন্দিত। আপনি বলেছেন. জায়গাটি মনোরম। এবং এখানে এই সুন্দর এবং শান্তিপূর্ণ পরিবেশে আপনি যে কিছুটা বিশ্রাম এবং নির্জনতা উপভোগ করতে পারছেন, এইজন্যই জায়গাটির প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞ থাকা

উচিত। ব্যক্তিগতভাবে খালির প্রতি কৃতজ্ঞ থাকার অন্য কারণ আছে, যে-অবসর সে আপনাকে দিয়েছে, তার কাছেই আপনার এই উপদেশপূর্ণ পত্রখানির জন্য আমি ঋণী।

নিজের কথা, নিজের ভাবধারা এবং বিভিন্ন সমস্যায় নিজের দৃষ্টিভঙ্গী সম্পর্কে যা বলেছেন, বিশেষ করে সেইগুলিরই আমি মূল্য দিই। সেগুলি যে একেবারে আমি জানিনে এমন নয়, কিন্তু চিঠিতে কয়েকটি মহা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে আপনার মনের ভাবনার একটি সুস্পষ্ট ছবি পেয়েছি। আপনি আমাদের সমাজ জীবনের কতগুলি দিকের উল্লেখ করেছেন, এবং যে কেউ একথা স্বীকার করবে যে, আমাদের অধিকাংশ মানুষেরই ব্যক্তিগত জীবন শোচনীয়ভাবে গদ্যময়, অনুর্বর এবং নিতান্তই দুঃখপূর্ণ। আপনি যেসব বিষয়ের উল্লেখ করেছেন, সেইগুলো নিয়ে আলোচনা এ চিঠিতে আমি করতে চাইনে, কেননা, তা করতে গেলে চিঠির যতখানি আকার হওয়া সম্ভব তা ছাড়িয়ে যাবে। আর আমি এখন আপনার উপরে দীর্ঘ একখানি পত্রাঘাত করতে অত্যন্ত অনিচ্ছুক। বরং পরে তা করতে পারি।

ইউরোপে অতর্কিত হিটলারী আক্রমণ আর আমাদের প্রদেশে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামায় আমার মন আচ্ছন্ন হয়ে আছে। এই ঘটনাগুলির গুরুত্ব ক্ষণিকের চেয়ে ঢের বেশি, এগুলির তুলনায় অন্যান্য সমস্যাগুলি তো ম্লান ছায়া মাত্র। অস্ট্রিয়াভুক্তি একটি পয়লা নম্বরের আন্তর্জাতিক তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা এবং এর প্রতিক্রিয়া সুদূরপ্রসারী হতে বাধ্য। সমগ্র রাজনীতিক পরিস্থিতি এখন টলমল এবং একদিকে সশস্ত্র, নির্মম একনায়কত্ব, অন্যদিকে ব্যক্তিগত এবং জাতিগত স্বাধীনতাসহ গণতন্ত্রের মধ্যে বাছাই করে নেবার সমস্যার সম্মুখীন এখন পৃথিবী। এই ঘটনা-গুলো যদিও ইউরোপে ঘটেছে, তবু আমাদের স্পর্শ না করে তো পারে না।

হিংসা এবং রক্তপাতসহ সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা এই প্রদেশে দেখা দিয়েছে, তাতে আমি অত্যন্ত ব্যথা আর দুঃখ পেয়েছি। এখন এলাহাবাদ আর বানারসের অবস্থা প্রায় স্বাভাবিক হয়ে এসেছে, কিন্তু সাম্প্রদায়িক উন্মত্ততা আবার যে কোন সময়ে বিস্ফূর্ত হয়ে পড়তে পারে। এলাহাবাদের দাঙ্গা সম্পর্কে আপনার তার পেয়েছি, এবং একখানা তারও পাঠিয়েছি। আপনি নিশ্চয়ই কাগজে হাঙ্গামার খবর পড়েছেন, এবং যখন শীঘ্রই এখানে আসছেন, আমি ও বিষয়ে আর বিস্তারিত লিখতে চাইনে। রাজনীতির আবরণে গত কয়েকমাস ধরে মুসলিম লীগ যে প্রচার করে বেড়াচ্ছে, সেইটেই এই পরিস্থিতির জন্য প্রধানতঃ দায়ী। ধর্মের নামে উন্মাদনা জাগিয়ে তোলা এত সহজ যে, যখন কোনো দল নিজের রাজনীতিক স্বার্থসিদ্ধির জন্য ততখানি নেমে আসতে পারে, তখন আর তার স্থায়ী শাসন-ব্যবস্থার প্রতি কোনো যুক্তিসঙ্গত বিক্ষোভ থাকতে পারে না।

আশা করি, কুশলেই আছেন।

আপনার স্নেহাবনত
জি. বি. পন্থ

২৯২ সরোজিনী নাইডু কর্তৃক লিখিত

দি গোল্ডেন থ্রেশহোল্ড
হায়দ্রাবাদ—দাক্ষিণাত্য
২৯শে মার্চ, ১৯৩৮

প্রিয় জওহর,

পুরাকালের স্তোত্রকারের (Palmist) মত পাহাড়ের দিকে চোখ তুলে আশা করি এই যোগাযোগে তুমি সান্ত্বনা, শক্তি আর অনুপ্রেরণা পেয়েছে। তুমি সেই যুব

স্তোত্রকারের মতই নদী থেকে পাঁচটি নুড়ি তুলে নিয়ে প্রতিটি গোলিয়াথকেই হত্যা করতে সমর্থ। তোমাকেও বহু বিশেষ গোলয়াথকে নিধন করতে হবে।

কলকাতায় যেতে পারছিনে বলে আমার বড়ই দুঃখ হচ্ছে এবং ঠকেও গেছি। এই একটিবার আমি ডাক্তারী অনুশাসনের বাধ্য হয়ে আছি, কিন্তু আমার সন্দেহ হয় যে, সবখানিই আমার গুণ নয়, এটা নিছক শারিরীক অক্ষমতা—বর্তমানে যার অন্যথা করা যায় না। তাই আমি সেটিতে শুয়ে আমার বাগানের পাখীদের গান শুনি। বুলবুলেরা কমলা গাছে বাসা বেঁধেছে, একটা নীল মাছরাঙ্গা তার মধ্যাহ্ন স্নান করতে আসে ঝরণায় আর মধুলোভী পাখীরা ক্লেমাটিস আর বিগোনিয়া ঝোপে ব্যস্ত। তুমি কি কখনো পারসী কবিতা 'পক্ষী সভার' অনুবাদ পড়েছ?

যখন অন্যান্য বিষয়ে ক্ষুদে মানুষটি তাঁর 'গান্ধী জাদু' চালাচ্ছেন, বল তো সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারার অগ্রগতিতে 'নেহরু-স্নায়ু'র কি প্রতিক্রিয়া ঘটছে। আমি ঐ বিরক্তিকর সমস্যার সঠিক অর্থটি জানার জন্য বড়ই উদ্বিগ্ন। বেবের সত্যিকারের বেবোচিত ঠাণ্ডা লেগেছে, যার একমাত্র তুলনা হয় এ সম্পর্কে তার বুঝতে না চাওয়ার বেবোচিত একগুঁয়েমীর সঙ্গে। যাহোক, সে একটু ভাল আছে। এখন সে এমন রঙে হাত চুবিয়ে বসে আছে, যা জোসেফের বহুবর্ণ কোটকেও হার মানায়। সে তার বিরাট পোশাকের আলমারীকে নতুন রূপ আর ছদ্ম আবরণ দিচ্ছে।

আমার স্বামী ১৪ই তারিখে 'কণ্টে রোসো' জাহাজে ভিয়েনায় যাচ্ছেন। বেব তাঁকে বিদায় দিতে বোম্বে যেতে পারে। সে হয়তো বেটির ওখানে উঠবে। ভাল কথা, বেটি আমার উপর চটেছে। তার কারণ, সে ভাবে রাজার রাজনীতিচর্চা আমি খুব-একটা আমল দিইনে! কি ছেলেমানুষ ভাব তো, আর রাজাও তাই—আহা বাছারা! যদি ওদের দুজনের একজনেরও একটু রসিকতাবোধ থাকত, তাহলে ওদের এবং আমার পক্ষে ভালই হোত।

এটা তোমার কুশল অনুসন্ধানের রীতির কথা মনে রেখেই পাঠ্য হিসেবে লেখা হয়েছিল কিন্তু এটা এক অপাঠ্য, অসংলগ্ন চিঠিতে দাঁড়িয়ে গেল! এই যে শতকরা একশো ভাগ স্বদেশী কাগজ, কারো দেশাত্মবোধের প্রমাণ দেওয়ার পক্ষে চমৎকার বটে, কিন্তু হায় এতে লেখা কি শক্ত!

ভালবাসা নিও।

তোমার স্নেহের
সরোজিনী

আমি সি. এল. ইউ.র টাকার জন্য বহু লোককে লিখেছি। এখনো কোন উত্তর আসেনি।

২৯৩ মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক লিখিত

সেবাগ্রাম
২৫শে এপ্রিল, ১৯৩৮

প্রিয় জওহরলাল,

মহাদেবের সীমান্ত প্রদেশ ভ্রমণ বিবরণের এটা একটা কপি। আমরা আশঙ্কাজনক খবর পেয়েছিলাম, এবং নিজে যেতে পারিনি বলে ওকে পাঠানো উচিত মনে হয়েছিল। সব সদস্যদের কাছেই এইগুলি বিলি করছি না। মওলানা আর সুভাষের কাছে নকল পাঠাচ্ছি। এই বিবরণীগুলি আমাকে ব্যথা দিয়েছে। মহাদেবের আরো অনেক কিছু বলবার আছে। অবশ্য, ভাইদের কাছেও একটি নকল পাঠাচ্ছি। আশা করি, তোমার ভাইদের উপর যে বিরাট প্রভাব আছে তা খাটানো

কর্তব্য বলেই মনে করব। আমি অবশ্য তারযোগেই খবর দিচ্ছি। এমনকি, কয়েকদিনের জন্য, আমি যে আঘাত পেয়েছি, তা সত্ত্বেও, ঐ প্রদেশে যেতে পারি, যদি খানসাহেব চান তবেই তা হবে। আমরা ভিতরে ভিতরে যেন দুর্বল হয়ে পড়ছি। আমাদের ইতিহাসের এই সংকট মুহূর্তে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে আমরা এক ভাবে জিনিসটা দেখতে পারছি না দেখে আমি ব্যথা পাচ্ছি। তোমাকে বলতে পারছিনে, তোমাকে আজকাল সঙ্গী না পেয়ে আমি কতখানি নিঃসঙ্গ বোধ করছি। জানি তুমি ভালবাসার জন্য অনেকখানি করবে। কিন্তু রাষ্ট্রের ব্যাপারে বুদ্ধিবৃত্তি যখন বিদ্রোহী হয়, তখন স্নেহের কাছে আত্মসমর্পণ তো চলে না। তোমার বিদ্রোহের জন্য তোমার প্রতি আমার শ্রদ্ধা আরো গভীর হয়েছে। কিন্তু তাতে তো শুধু নিঃসঙ্গতার দুঃখ তীব্র হয়েই উঠেছে। আমাকে থামতে হচ্ছে।

ভালবাসা নিয়ো।

বাপু

২১৪ মহাত্মা গান্ধীকে লিখিত

এলাহাবাদ
২৮ এপ্রিল, ১৯৩৮

প্রিয় বাপু,

আজ সকালে লখনউ থেকে এলাহাবাদে ফিরে আপনার চিঠি আর তার সঙ্গে মহাদেবের সীমান্ত ভ্রমণের বিবরণীর নকলখানা পেলাম। আমি এই বিবরণ পড়েছি, এবং খান সাহেব ও আবদুল গফফর খানকে লিখব। মহাদেব যা লিখেছে তাতে আমি অবাক হইনি। আমি নিজে যা দেখে এসেছিলাম, এ তারই স্বাভাবিক পরিণতি। যাহোক, আশা করেছিলাম, যে ঝোঁক তখন দেখা দিয়েছিল, তাকে কিছুটা বাধা দেওয়া যেতে পারত। আপনি ছাড়া যিনি এটা সাফল্যের সহিত করতে পারতেন তিনি মওলানা আবুল কালাম। আমার মনে হয়, তাঁর সীমান্ত প্রদেশে যাওয়া খুবই দরকার। ইতিমধ্যে আমি আশা করছি যে, খান-ভ্রাতারা মন্ত্রী সম্মেলন এবং ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে এসে যাবেন।

গত ছমাসএর মধ্যে কংগ্রেসী রাজনীতিতে যে ব্যাপার ঘটেছে, তাতে আমি বড়ই দুঃখিত হয়েছি। যে ব্যাপারটায় আমি আশংকিত সেটা হচ্ছে গান্ধী সেবাসংঘের নতুন রূপ। 'ট্যামানি হল' রাজনৈতিক প্রথার দিকে আমরা অতি দ্রুত এগিয়ে চলেছি, এবং এটাও দুঃখের ব্যাপার যে, এমন কি যে গান্ধী সেবাসংঘ অন্যের পক্ষে আদর্শস্বরূপ হতে পারত—এবং শুধুমাত্র যেনতেন প্রকারে ইলেকশন জয়ে ব্যগ্র পার্টি সংস্থা হতে অস্বীকার করতে পারত—সেও আজ সাধারণের পর্যায়ে নেমে এসেছে। আমি তীব্রভাবে অনুভব করি যে, কংগ্রেসী মন্ত্রিসভাগুলি অক্ষমভাবে কাজ করছে, তারা যা করতে পারত—তা করছে না। তারা বড় বেশি পুরানো শাসন-ব্যবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিচ্ছে এবং তার উচিত্য প্রমাণ করতে চাইছে। কিন্তু এসব খারাপ হলেও সহ্য করা হয়ত যেত। কিন্তু তার চেয়ে আরো খারাপ হচ্ছে, আমরা জনগণের হৃদয়ে যে উচ্চ আসন বহু পরিশ্রমে গড়ে তুলেছি তা আমরা হারাতে বসেছি। যাদের কোন আদর্শ নেই, যাদের কাজ দিনের পর দিন সুবিধাবাদ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, এমনি সাধারণ রাজনীতিজ্ঞদের পর্যায়ে আমরা নেমে যাচ্ছি।

খানিকটা, সমস্ত পৃথিবী জুড়ে যে সর্বব্যাপী অবনতি আর খানিকটা, যে পরিবর্তনশীল যুগে আমরা আছি এটা তারই ফল। তবুও এতে আমাদের ত্রুটিগুলি দেখিয়ে দেওয়া হচ্ছে আর সে দৃশ্য শোকাবহও বটে। যদি ঠিকভাবে চলেন, তাহলে

এই অবস্থাকে এ'টে উঠতে পারেন এমন সৎভাবাপন্ন মানুষ কংগ্রেসে যথেষ্টই আছেন। কিন্তু তাঁদের মন দলাদলিতে পূর্ণ, এবং অমুক ব্যক্তি বা তমুক দলকে পিষে ফেলবার কামনায় মত্ত। এটা স্পষ্টই বোঝা যায় যে, সৎ লোকের চেয়ে অসৎকেই পছন্দ, কেননা অসৎমানুষ পার্টির নীতি অনুসারে চলার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে। যখন এমনি হয়, তখন অবনতি তো দেখা দিতে বাধ্য।

কয়েক মাস ধরে আমার মনে হচ্ছে, ভারতের হালচাল অনুসারে আমি সফলভাবে কাজ করতে পারিনি। যেমন সব সময়ে কাজ চালিয়ে যাওয়া হয়, তেমনিভাবেই কাজ করেছি। নিজেকে স্থানচ্যুত এবং বেমানান বলেই মনে হয়েছে। এই কারণেই (অন্যান্য কারণও ছিল) আমি ইউরোপে যাব ঠিক করেছিলাম। মনে হয়েছিল, সেখানে আমি বেশি কাজ করতে পারব, আর যাই-ই হোক না কেন, আমার ক্লান্ত বিশ্রান্ত মনকে ঠাণ্ডা করে তোলা যাবে। আপনার সঙ্গে কোন ব্যাপারে দীর্ঘ আলোচনা আমার পক্ষে দুরূহ, কেননা আপনার শরীরের এই অবস্থায় আমি আপনাকে শ্রান্ত আর উদ্বিগ্ন করে তুলতে চাইনে। এও আমার মনে হয়েছে যে, এমনি ধারা আলোচনায় তেমন কোনো সুফল হবে না।

২রা জুন বোম্বাই থেকে সাগর পাড়ি দেব ঠিক করেছি, কতদিনের জন্য যাচ্ছি, জানি না। সম্ভবত সেপ্টেম্বরের শেষেই ফিরে আসব।

পয়লা মেতে এক সপ্তাহের জন্য আমি গাড়োয়ালে যাচ্ছি। সরূপও আমার সঙ্গে যাবে এবং আমরা দুজনে এরোপ্লেনে বদ্রিনাথ ও তুষার ক্ষেত্রের উপর উড়ে চলব। গাড়োয়াল থেকে ফিরে এসে মন্ত্রীদের সভা এবং ওয়ার্কিং কমিটির সভার জন্যে বোম্বাই যাব।

আপনার স্নেহের
জওহরলাল

মহাত্মা গান্ধী
জুহু (বম্বে)

২১৫ মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক লিখিত

পেশোয়ারের পথে ট্রেনে
৩০শে এপ্রিল, ১৯৩৮

প্রিয় জওহরলাল,

জিন্নার সঙ্গে সাড়ে তিন ঘণ্টা আলাপের যে ছোটখাটো একটা টোক্ রেখেছিলাম, তারই এখানি নকল। তুমি আর অন্যান্য সভ্যেরা হয়ত এই আলাপের ভিত্তিটা পছন্দ করবে না এমনও হতে পারে। ব্যক্তিগতভাবে আমি তো এর থেকে রেহাই-এর পথ দেখতে পাইনে। আমার এখন বাধা এইখানে যে, আমি তোমার মত দেশে ঘুরে বেড়াইনে, তার চেয়েও বড় বাধা এই যে, আমার অন্তরের নিরাশা আমাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। আমি চালিয়ে যাচ্ছি, কিন্তু এ চিন্তাও আমার পক্ষে বিষবৎ যে, মাত্র একমাস আগেও আমার যে আত্মবিশ্বাস ছিল, তা আমি হারিয়ে ফেলেছি। আশা করি, আমার জীবনে এ ক্ষণিকের অবস্থা। প্রস্তাবগুলিকে তাদের গুণানুসারে বিচার করতে তোমাকে সাহায্য করবে বলেই একথা উল্লেখ করলাম। আমার মনে হয় না যে, প্রথমটা নিয়ে কোন গোলমাল বাধবে। দ্বিতীয়টি তো তার সবকটি ফ্যাঁকড়া নিয়েই একেবারে অদ্ভুত ধরনের। যদি তোমার পছন্দ না হয়, সঙ্গে সঙ্গে বাতিল করে দিতে দ্বিধা করবে না। এ ব্যাপারে তোমাকেই নেতৃত্ব নিতে হবে।

এগারো তারিখে ফিরব আশা করি। সুভাষ আমার তারের জবাবে জানিয়েছে যে, সে জিন্নাহ্-এর সঙ্গে রীতিমাফিক কথাবার্তা চালাতে চায়। দশ তারিখে

বোম্বে আসবে বলে তারও করেছে। আমার ইচ্ছে, তুমিও শীঘ্রই সেখানে যাও। মওলানা সাহেবকেও এই মর্মে চিঠি লিখছি এবং এই চিঠিখানার একখানা নকলও পাঠাচ্ছি।

ভালবাসা নিয়ো।

বাপু

২১৬ মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক লিখিত

৭ই মে, ১৯৩৮

প্রিয় জওহরলাল,

গান্ধী সেবা সংঘের নতুন রূপে এমন কি আছে যাতে তুমি উদ্বিগ্ন হয়েছ? আমাকে স্বীকার করতে হচ্ছে যে, এর জন্যে দায়ী আমি। কিসে তুমি উদ্বিগ্ন সেকথা দ্বিধা না করে আমাকে স্পষ্ট বলবে, সেইটেই আমি চাই। যদি আমি ভুল করে থাকি, তাহলে যখনি তা আবিষ্কার করতে পারব, তখনি পিছু হটে আসব, তা তো তুমি জান।

আর সর্বাত্মক অবনতির কথায় আমি তোমার সঙ্গে একমত, যদিও দুর্বল স্থান সম্পর্কে আমাদের অমিল হতে পারে।

সাক্ষাৎ মতো আরো কথা হবে।

ভালবাসা নিয়ো।

বাপু

২১৭ মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক লিখিত

সেবাগ্রাম, ওয়ার্ধা
২৬শে মে, ১৯৩৮

প্রিয় জওহরলাল,

তুমি কি কাজের মানুষ আর চটপটে। গুরগাঁও জেলা কংগ্রেসের ব্যাপারে যে হাত দিতে পেরেছ, এতে আমি খুশী হয়েছি। আশা করি, তোমার পরামর্শ দুই পক্ষই মেনে নেবে—আর তাইত নেওয়া উচিত।

জিন্নার সঙ্গে আমার আলাপের যে টোক্ পাঠিয়েছিলাম, সেই সম্পর্কে আজ তোমার চিঠি পেয়েছি। মনে হচ্ছে, তাঁর সঙ্গে দ্বিতীয় বার আলাপ অবশ্যম্ভাবী। আশা করি, এতে কোন ক্ষতি হবে না। যদি সময় পাও তো, জাল-এর সঙ্গে দেখা হবার পর তার সম্পর্কে এক ছত্র লিখে জানিয়ো এই আমার ইচ্ছা। য়ুরোপ ভ্রমণে তুমি বিশ্রাম নেবে এই তো আমার কামনা—এখানে সব সময়ে যেমন কর, তেমনি ছুটোছুটি করে বেড়াবে না।

ভালবাসা নিয়ো।

বাপু

২১৮ গোবিন্দবল্লভ পন্থ কর্তৃক লিখিত

ব্রুকহীল হাউস
নইনিতাল
৩০শে মে, ১৯৩৮

প্রিয় জওহরলালজী,

আমার দুঃখ যে, আপনার যাত্রার পূর্বে ব্যক্তিগতভাবে আপনার সঙ্গে দেখা করে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাতে এবং কতগুলো ব্যাপারে কিছু বলতেও পারিনি। একুশ বা বাইশ তারিখে যখন আপনার সঙ্গে ছিলাম, তখন উপাধ্যায়ের সঙ্গে আপনার আলাপ থেকে জানতে পারি, আপনি সেই রাতেই সাড়ে দশটায় আজমগড় থেকে

রওনা হবেন। রাত প্রায় আটটার সময় আপনার ওখানে গেলাম. স্টেশনেও ছুটলাম, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ আপনার নাগাল মিলল না। আপনাকে বিদায় দিতে এলাহাবাদ যাবার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু আমার মেয়ের অসুখে তা হ'ল না। মেয়েটি খারাপ ধরনের টাইফয়েডে ভুগছে। হঠাৎ আমাকে নইনিতাল চলে আসতে হ'ল। এখন আপনি ভারত ছেড়ে চলেছেন, আমাদের কষ্ট আর সমস্যার পুনরাবৃত্তি করে আপনাকে বিরক্ত করতে চাইনে। আপনার সমুদ্রযাত্রা নির্বিঘ্ন এবং সুখকর হোক. য়ুরোপে সুখে কাটুক সময়, তাড়াতাড়ি ভারতে ফিরে আসুন—এই আমার কামনা। দেশ থেকে আপনার অনুপস্থিতি তো নিঃসন্দেহে আমাদের অসুবিধে বাড়িয়ে দেবে! এদেশে আর এমন কোন অসাধারণ ব্যক্তি নেই—বিপদের সম্মুখীন হয়ে যাঁর দিকে পরামর্শ আর ঠিক পথে পরিচালনার জন্য নির্ভরতার সঙ্গে ফিরে তাকানো যায় এবং যিনি দরকার হলে কোন ব্যাপারে সফল হস্তক্ষেপও করতে পারেন। যাহোক, আমি নিজে বুঝি যে, বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতির কথা ভাবলে, দেশের ব্যাপকতর স্বার্থের জন্যে আপনার য়ুরোপ ভ্রমণ প্রয়োজনই বটে। স্থায়ী ব্যবস্থা এখন টলটলায়মান, এক নতুন ব্যবস্থা এর থেকে দেখা দিতে বাধ্য এবং সেটি অন্যান্য দেশের মত ভারতকেও নিশ্চয়ই প্রভাবিত করবে। এই সংকট মুহূর্তে, বাইরের জগতের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক রাখা এক জরুরী ব্যাপার, এবং সমস্ত ভারতীয়দের মধ্যে আপনিই একাজের সবচেয়ে উপযুক্ত মানুষ। বোধহয় আমরা আমাদের স্থানীয় সমস্যা নিয়েই এমন তন্ময় যে ব্যাপকভাবে সমস্ত ব্যাপারগুলো ভাবতে পারছিনে, অথচ তাই তো ভাবা উচিত। দেশ জুড়ে এই যে একঘেয়ে নিস্তরঙ্গ বিতৃষ্ণা তা যেন 'ভাবনা আর জীবন-ধারার নতুন স্পন্দনকে ক্রমেই স্থান ছেড়ে দিচ্ছে। শহর এবং গ্রাম অঞ্চলে কিছুটা পরিমাণে সুস্থ এবং কাম্য কর্ম-প্রেরণাও দেখা যাচ্ছে। জনগণের সর্বত্র জাগরণ দেখা যাচ্ছে এবং সমস্যাগুলোও পরিষ্কার হয়ে আসছে। চিঠি তো এরই মধ্যে দীর্ঘ হয়ে পড়েছে, তাই এ বিষয়ে আর বাড়াবার প্রয়োজন নেই।

যিনি আমাদের পুনর্গঠনের কাজে সাহায্য করতে পারবেন এমন একজন যোগ্য বিশেষজ্ঞের জন্য আমি যে অনুরোধ করেছি, সেটা আশা করি মনে রাখবেন। যদি এমন কোনো লোকের দেখা পান. আমাকে অনুগ্রহ করে জানাবেন কি?

ইন্দুর সঙ্গে দেখা হলে অনুগ্রহ করে তাকে আমার ভালবাসা জানাবেন।

আপনার সর্বোত্তম কুশল কাম্য।

আপনার স্নেহধন্য
জি. বি. পন্থ

[১৯৩৮ সালের প্রথম দিকে আমি য়ুরোপে যাই। সমুদ্রপথে বোম্বাই থেকে জেনোয়ায় যাই। সেখান থেকে মার্সেই-এর দিকে রওনা হই। স্থলপথে আমি বার্সেলোনায় যাই. সেখানে ক'দিন কাটিয়েও আসি। তখন স্পেনের গৃহযুদ্ধের কাল। তারপরে যাই লণ্ডনে।]

২১৯ লর্ড লোথিয়ান কর্তৃক লিখিত

ব্লিকলিং হল
আইলশাম
২৪শে জুন, ১৯৩৮

প্রিয় মিঃ নেহরু,

আপনি যে বার্সেলোনায় ফ্রাঙ্কোর বোমা থেকে রেহাই পেয়ে ইংলণ্ডে এসে পৌঁছেছেন, তাতে খুশীই হয়েছি। ৯ই জুলাই-এ যে সপ্তাহ শেষ হবে, আমি তখন

আপনাকে এখানে আহ্বান করার জন্য উদগ্রীব হয়ে আছি। পার্টি বেশ ছোটই হবে। লেডী য়্যাস্টরকে আশা করছি, তিনি আপনার কৌতূহল জাগাবেন এবং আনন্দও দেবেন। জেনারেল আয়রনসাইড ইংলন্ডের সর্বশ্রেষ্ঠ যোদ্ধাদের একজন, তিনি আপনাকে পৃথিবীর সাধারণ এবং সামরিক অবস্থা সম্পর্কে মোটামুটি ওয়াকিবহাল করে দিতে পারবেন, অন্য কারো কাছ থেকে তা নাও পেতে পারেন। প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন মিঃ বল্ডইনের অতি ঘনিষ্ঠ পরামর্শদাতা ছিলেন মিঃ টমাস জোন্স্। নিজেও তিনি একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি। ইণ্ডিয়া হাউসের কর্তা স্যার ফিল্ড্লেটার স্টুয়ার্টকেও পাবার জন্য আধা মন করেছিলাম। তিনি লোকটি ভাল, কিন্তু আমার মনে হয় তিনি হয়ত একটু বেশি আমলা ভাবাপন্ন হয়ে উঠতে পারেন—বাকি আর কেউ তো তা নন! যাহোক, পার্টির আগে আপনার সঙ্গে দেখা করে তখন চূড়ান্ত ব্যবস্থা করা যাবে। আমার প্রধান উদ্দেশ্য হ'ল সুন্দর পরিবেশে আপনাকে নিরিবিলি সপ্তাহ-শেষ যাপনের বন্দোবস্ত করে দেওয়া—সেখানে আমরা কিছুটা আলাপ করতেও পারব।

ইতি
লোথিয়ান

পুঃ: আপনার কন্যা অন্যত্র ব্যাপৃত থাকবেন বলে দুঃখিত।

২২০ স্যার জর্জ সুস্টার কর্তৃক লিখিত

৩০ সেণ্ট জেমস্ প্লেস
লণ্ডন, এস. ডবলিউ. ১
৭ই জুলাই, ১৯৩৮

প্রিয় পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু,

আপনার মঙ্গলবার সন্ধ্যার বক্তৃতা নিয়ে আমি অনেক ভাবছি, বিশেষ করে তার অর্থনীতিক সমস্যাগুলি নিয়ে। আপনার দ্বান্দ্বিক ক্রোধকে (আমার বিশ্বাস ওটা 'দ্বান্দ্বিক' ছাড়া কিছুই নয়) ন্যায্য প্রতিপন্ন করতেই যেন আমার নিজস্ব মন্তব্য এইভাবে জাহির করেছি, তাই আমি দুঃখিত। কিন্তু আমি তীব্রভাবেই অনুভব করি যে, ভারতে যে অর্থনীতিক সমস্যাগুলি নিয়ে আপনাদের কাজ করতে হয়, সেগুলি ভিত্তিগত সমস্যা, এবং তাতে জটিলতাও যথেষ্ট। এবং শুধু ব্রিটিশ প্রভাবের অপসারণেই সে সমস্যাগুলির সমাধান হতে পারে না।

আমাকে আপনি যে উত্তর দিয়েছেন, তার থেকে এই সিদ্ধান্তেই আসা যায় যে, ব্রিটিশ সম্পর্কের চেয়ে ধনবাদী সমাজ-ব্যবস্থাই আপনার মতে সর্বনাশের প্রধান কারণ। এবং শেষোক্তের উপর আপনার আক্রমণ এই ধারণার বশবর্তী হয়েই করা হয়েছে যে, পূর্বোক্তটি এরই অবশ্য সহগামী। এতে এমন কঠিন সমস্যাগুলির উদ্ভব হয়েছে যা আপনার সঙ্গে খুবই আলোচনা করতে চাই। এই চিঠিতে তা নিয়ে বলার সাহস করব না, শুধু কয়েকটা সংক্ষিপ্ত মন্তব্যেই নিজেকে সীমাবদ্ধ করে রাখব।

ভারতের অর্থনীতিক অবস্থার জন্য যা প্রয়োজনীয় সে হচ্ছে জাতীয় ব্যাপক এবং আত্মিক প্রয়াস, যা ধনবাদী ব্যবস্থা এবং মুনাফার অনুসন্ধান যোগাতে পারে না —আপনার সঙ্গে আমি এ বিষয়ে নিশ্চয়ই একমত হব। ভারতের গ্রামে গ্রামে এবং অঞ্চলে অঞ্চলে জাতীয় নেতাদের দ্বারা অনুপ্রাণিত সমবায় প্রথার ওপর যে এর ভিত্তি হওয়া উচিত এইটেই আমি মনে করি। অন্যদিকে, আমার এও বিশ্বাস যে, আপনারা জাতীয় নেতারাই বর্তমানে প্রধান নাগরিক শিল্পকেন্দ্রগুলিতে যে শ্রমশিল্প নিয়ন্ত্রিত

হচ্ছে, তার প্রতি ধ্বংসাত্মক আক্রমণ না করে এই কাজের বেশির ভাগ ফলই পেতে পারেন।

আমার নিজের চিন্তা-পদ্ধতির ব্যাখ্যা হিসেবে আমি আপনাকে একখানা পুস্তিকা পাঠাচ্ছি। এতে একটি বক্তৃতা আছে, যেটি আমি সাড়ে তিন বছর আগে লন্ডনের রয়াল সোসাইটি অফ্ আর্টস-এ (ভারত থেকে ফিরে আসবার পর) দিয়েছিলাম। এটা অবশ্যই প্রাথমিক ব্যাপার, এবং এর থেকে যে খুব-একটা কিছু পাবেন সে আশাও করি না। কিন্তু আমার বিশ্বাস, আমি যা বলেছি তাতে এক কণা সত্য আপনি পাবেন, এবং যে পদ্ধতি এবং দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে দেখেছি, সেটিও আপনার কাছে দরদহীন বলে মনে হবে না। আপনি দেখতে পাবেন, আমি একথা বলতে সাহসী হয়েছি যে, এই বিষয়ে মিঃ গান্ধীর ভাবধারার অনেকখানির সঙ্গেই আমি একমত। যদি পড়বার সময় পান, এবং আমার সঙ্গে আরো আলাপ করতে চান, আমি খুব সম্মানিত হব।

আর একটা বিষয়ে আপনর সঙ্গে কথা বলবার সুযোগ পেতে আমি বড়ই ইচ্ছুক। গত মঙ্গলবার সন্ধ্যায় আপনাকে এই পরিকল্পনাটির কথা উল্লেখ করেছিলাম। আপনার সঙ্গে যে যুবকটির (মিঃ উইন্ট) পরিচয় করে দিয়েছি, তাকে কতগুলো বিষয়ে বিশেষ করে অনুসন্ধান করে দেখবার জন্য ভারতে পাঠাতে চাই। এমন কি, এখন যদি আমার সঙ্গে দেখা করার আপনার সময় না হয়, আশা করি ভারতে মিঃ উইন্টকে আপনার সঙ্গে দেখা করতে দেবেন। তাঁর মাধ্যমে এই অনুরোধ যখন করছি, তখন আমাদের কি ইচ্ছা তার বিস্তারিত ব্যাখ্যাই করব।

আশা করি, আপনি এটা বুঝেছেন যে, আমাদের অর্থনীতিক এবং রাজনীতিক ব্যাপারে মতানৈক্য সত্ত্বেও আপনাকে আমাদের লন্ডনের গৃহে পাওয়ার সুযোগ হলে আমি এবং আমার স্ত্রী দুজনে সত্যিই আনন্দিত হব; যদি অবশ্য আপনি খানিকটা সময় ব্যয় করতে পারেন, তবেই তা সম্ভব হবে। একটা কার্যকরী আভাস দিচ্ছি—আপনি কি নৈশ ভোজে (একেবারে পারিবারিক ব্যাপার) সোমবারে আসতে পারবেন?

ভবদীয়
জর্জ সুস্টার

পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু, অরমণ্ড হাউস

২২১ মাদাম সান-য়াৎ সেন কর্তৃক লিখিত

দি চায়না ডিফেন্স লীগ
সেন্ট্রাল কমিটি
হংকং
৭ই জুলাই, ১৯৩৮

প্রিয় মিঃ নেহরু,

মিঃ জন লিনিং এখান থেকে ভারতে রওনা হয়ে যাচ্ছেন, তাঁর সঙ্গে আপনার পরিচয় করিয়ে দিতে পারি কি? মিঃ লিনিং আমাদের সি. ডি লীগের একজন কার্যকরী সভ্য, এবং চীনে জাপ আক্রমণের তরঙ্গে যে পরিস্থিতি ঘটেছে সে সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা তাঁর আছে। চীনের প্রতি তাঁর বন্ধুত্ব যেমন গভীর, তেমনি খাঁটি, এবং সমস্ত বাধার সম্মুখীন হয়েও তিনি গণতন্ত্রের সমর্থকই থাকবেন।

আপনি যখন চীনের একজন মহান বন্ধু, তখন আমার নিশ্চয়ই মনে হয়,

আমাদের প্রতিরোধ অভিযান সম্পর্কে সব কথাই এমন একজনের কাছ থেকে জানতে চান, যিনি যুব শক্তির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত আছেন।

আপনারা যে সহানুভূতি এবং একাত্মতা প্রদর্শন করেছেন, তা জেনে আমরা কৃতজ্ঞ এবং অনুপ্রাণিত হয়েছি। এবং এই সুযোগে আমাদের প্রশংসা এবং বন্ধুত্ব জ্ঞাপন করতে চাই।

আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই।

আপনার ভগিনীভাবাপন্ন

Soong Ching Ling

২২২ হিউলেট জনসন কর্তৃক লিখিত

দি ডীনারী, ক্যান্টারবারী
১৬ই জুলাই, ১৯৩৮

প্রিয় মিঃ নেহরু,

কি আনন্দদানকারী এক গ্রন্থাগারই না আপনি আমাকে পাঠিয়েছেন! আমি এর জন্য অতি কৃতজ্ঞ। আমার প্রথম অবসর মুহূর্তেই পরম আগ্রহে লোভীর মত এটির ভিতরে ডুবে যাব।

আপনার আগমন সব সময়েই সুখস্মৃতি হয়ে থাকবে আর মিঃ গান্ধীর আগমনের পাশাপাশি তাকে ঠাঁই দেওয়াই উচিত হবে। যদি সাহস পাই তো বলি, আপনার নীতি যেমন তাঁর নীতির পরিপূরক, তেমনি এটিও তাঁর আগমনের পরিপূরক। আপনার পরবর্তী আগমনের ব্যগ্র প্রতীক্ষায় থাকব, আর সেটি আরো দীর্ঘস্থায়ী হোক, এই কামনাই করব। পরম শ্রদ্ধাসহ।

আপনার অতি বিশ্বস্ত
হিউলেট জনসন

২২৩ এডওয়ার্ড টমসন কর্তৃক লিখিত

বোরস্ হীল, অক্সফোর্ড
২০শে জুলাই, ১৯৩৮

প্রিয় জওহরলাল,

কোন কোন মানসিক অবস্থায়—আমি গর্বিত মানুষ (আশা করি, অহংকারী নই; সেটাতো একেবারে অন্য জিনিষ) আর গর্বের সুযুক্তিও থাকে বই কি। কিন্তু 'আমার বন্ধু এডওয়ার্ড টমসনকে' তোমার এই স্বাক্ষরিত বইখানি আমাকে যত গর্বিত করে তুলেছে, তত আর কিছুতেই করতে পারত না। জানি তুমি এমনি মানুষ, যে তার অল্প ভাষণকে প্রায় অমানুষিক পর্যায়ে নিয়ে গেছে; এবং তুমি যা বল, তার সবটুকুই ভাষায় প্রকাশ করা যায়।

তোমার সঙ্গে, তোমার সুন্দর মেয়েটি আর মিসেস রোবসনের সঙ্গে সাক্ষাৎকার তো আনন্দের বিষয়।

চির দিনের তোমারই
এডওয়ার্ড টমসন

২২৪ মিসেস পল রোবসন কর্তৃক লিখিত

লণ্ডন
শুক্রবার সন্ধ্যা
(?) জুলাই, ১৯৩৮

প্রিয় মিঃ নেহরু,

আজকের দুপুরের আনন্দদায়ক ভোজটির জন্য আপনাকে বহু ধন্যবাদ। আমার তো ভয় হচ্ছে, আমি আর পল আপনার ভক্ত হয়ে গেছি, এবং যে কয়েক মাধুর্যপূর্ণ ঘণ্টা নিজেরা একচেটে ভাবে পেয়েছিলাম, তাতে কি আনন্দ-চঞ্চলতাই না দেখা দিয়াছিল। আমাদের মত যাঁর মনের সমতা, যিনি আমাদের এই অদ্ভুত সমস্যা আর ঐতিহ্য সম্পর্কে ওয়াকিবহাল, তাঁর সঙ্গে আলোচনা করতে পারা তো আমোদ-প্রমোদের চেয়েও উপভোগ্য।

আমার প্রতিশ্রুতি-অনুসারে জাতীয় নিগ্রো কংগ্রেসের কার্যাবলী আপনাকে পাঠাচ্ছি। আর তার সঙ্গে আমার সামান্য প্রচেষ্টার ফলও পাঠানো গেল, এটি আট বছরেরও আগেকার লেখা। এখন বয়েস হয়েছে বলে এটা একটু সাদাসিদে বলে মনে হবে, কিন্তু এটি দিয়ে আমি যা করতে চেয়েছিলুম—আমেরিকার নিগ্রোদের ঐতিহ্যের যে নির্দেশ দেওয়া—তার কিছুটা এখনো সার্থক হচ্ছে। ইচ্ছে করেই আমার ব্যক্তিগত কাহিনী রচনা করেছিলাম, কারণ আমার মনে হয়েছিল অন্যরকম করে লিখলে জনগণ নিগ্রোজাতির ঐতিহ্য সম্পর্কে কৌতূহলী হয়ে উঠবে না। তার আশ্চর্য ফল পেয়েছি, তারা কৌতুহলী হয়েছিল, এখনো হচ্ছে—বই কিনছে, পড়ছে, এবং নিজেদের অজান্তেই কিছু কিছু প্রকৃত ঘটনাও জানতে পারছে!

পরবর্তী সোমবারে গোলাঞ্জদের ওখানে আমরা আপনার সঙ্গে নৈশভোজ করবো বলেই মনে হচ্ছে—আবার আপনার সঙ্গে দেখা হবার আশায় আছি।

আপনার
এস্‌লাণ্ডা গুড্‌ রোবসন

২২৫ মুস্তাফা এল্‌. নাহাস কর্তৃক লিখিত

[১৯৩৮ এর জুনের গোড়ায় জলপথে ইয়োরোপ যাত্রার সময় আমার জাহাজ সুয়েজে থামে। সেখানে পৌঁছবার পূর্ব মুহূর্তে, মিশরের ওয়াফ্‌দ্‌ দলের নায়ক নাহাস পাশার কাছ থেকে তাঁর সঙ্গে আলেকজান্দ্রিয়ায় সাক্ষাতের জন্য আমন্ত্রণ পাই। আমি তখনই সুয়েজ থেকে স্থলপথে কায়রো, আর সেখান থেকে বিমানে আলেকজান্দ্রিয়া যাত্রা স্থির করি। সেখানে নাহাস পাশা ও তাঁর সহকর্মীদের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়। তারপর আমি পোর্ট সৈয়দে গিয়ে কোন মতে আমার জাহাজ ধরি। জাহাজ ইতিমধ্যে সুয়েজ পেরিয়ে এসেছিল।

১৯৩৮ এর ডিসেম্বরে ইয়োরোপ থেকে ভারতে ফেরার পথে কিছুদিনের জন্য আমি মিশরে অবস্থান করি। সঙ্গে আমার কন্যা ইন্দিরা ছিল।]

সান স্টেফানো
২রা আগস্ট ১৯৩৮

প্রিয় জওহরলাল নেহরু,

জাহাজ এবং লণ্ডন থেকে লেখা আমার সহকর্মীবৃন্দ আর আমার প্রতি আপনার প্রীতিপূর্ণ চিঠি দুটি যথাসময়ে পেয়েছি।

আপনার আগমন আমাদের সকলের আর বিশেষ করে আমার পক্ষে যে কি গভীর আনন্দের বিষয় তা বলা বাহুল্য এবং এর স্মৃতি আমাদের কাছে অক্ষয় হয়ে থাকবে।

অল্পকালের জন্য হলেও আপনাকে আমাদের মধ্যে পাওয়া অতি সৌভাগ্যের বিষয়। এর ফলে আমাদের দুই দেশে যে পবিত্র উদ্দেশ্যের জন্য আমরা সংগ্রম করছি, সে সম্বন্ধে আমাদের মতামত আর ধারণার আদান প্রদান সম্ভব হয়েছে। শুধুমাত্র আমাদের সকলের স্বাধীনতা সংগ্রামের সংযোগ স্থাপনের জন্যে হলেও, আমাদের পুনরায় সাক্ষাৎ বিশেষ সুবিধাজনক হবে।

আপনাকে লিখতে যে এতদিন বিলম্ব হল তার কারণ—আমি আমাদের জাতীয় ওয়াফ্‌দ্‌ কংগ্রেসের অধিবেশনে দিন স্থির হওয়ার প্রতীক্ষায় ছিলাম, যাতে এই অধিবেশনে ব্যক্তিগত ভাবে আপনাকে এবং আপনাদের পার্টিকে মিশরে আগমনের জন্য নিমন্ত্রণ করতে পারি, আর তাছাড়া তখনো আমার ইয়োরোপ ভ্রমণের কর্মসূচী চূড়ান্তভাবে নির্ধারিত হয়নি।

ওয়াফ্‌দে এইমাত্র স্থির হল যে এই বৎসরের ২৪শে এবং ২৫শে নভেম্বর আমাদের কংগ্রেসের অধিবেশন হবে। এই সঙ্গে এই বৎসরের অধিবেশনটিকে এর স্থানীয় আবহাওয়ার বাইরে আরো বিস্তৃতভাবে একটি প্রাচ্যদেশীয় ছাপ দেওয়ার জন্য ভারতীয় কংগ্রেস ও নিকট-প্রাচ্যের নিপীড়িত জনগণের, যেমন প্যালেস্টাইন ও অন্যান্য আরব জাতির প্রতিনিধিদের আমন্ত্রণ করা স্থির হয়েছে। আমার সহকর্মী-বৃন্দ ও আমার নিজের পক্ষ থেকে ব্যক্তিগতভাবে আপনাকে এবং কংগ্রেসের প্রতিনিধি-দের সানন্দে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

বলা বাহুল্য যে আপনার সাদর আমন্ত্রণের উত্তরে ভারতে ওয়াফ্‌দ্‌ প্রতিনিধিদের একটি দল পাঠাতে পারলে সুখী হব।

আমার ইয়োরোপ যাত্রার কর্মসূচী এখন চূড়ান্তভাবে আমার স্ত্রীর সঙ্গে এইরূপ স্থির হল: ১১ই নভেম্বর আমরা "কাওসার" জাহাজে জেনোয়া যাত্রা করব; মণ্টিকাটিনি (ইটালী) চিকিৎসার জন্য প্রায় ১৫ থেকে ২০ দিন থাকব (হোটেল পাস্‌)। চিকিৎসার পর দিন বারো পাহাড়ে কর্টিন দ' আমোজোতে (ইটালী—হোটেল মিরামণ্টি) বিশ্রাম করব। তার পর পারী যাব সুইজারল্যাণ্ড হয়ে। এখানে আপনার সুবিধা হলে দু'দিন থাকতে পারি। ১১ই অক্টোবর পর্যন্ত আমরা পারীতে থাকব এবং ১২ই অক্টোবর মার্সাই থেকে "নীল্‌"এ উঠবো দেশে ফেরবার জন্যে।

ইয়োরোপ ভ্রমণকালে কোনখানে আবার আমাদের সাক্ষাৎ হওয়া সৌভাগ্যের বিষয় হবে। আর আমাদের দুজনের পক্ষে, সান স্টেফানোতে গত ১০ই জুন যে মনোগ্রাহী আলাপের শুরু হয়েছিল তা আবার চালিয়ে যাবার সুযোগ পাওয়া যাবে।

ভিন্ন একটি খামে আপনার প্রীতিপ্রদ আগমনের তিনটি ফটো পাঠালাম।

একান্ত আপনার
ম. নাহাস

২২৫ মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক লিখিত

সেবাগ্রাম, ওয়ার্ধা
৩১শে আগস্ট, ১৯৩৮

প্রিয় জওহরলাল,

আমার শক্তি সীমিত বলেই তোমার কাছে চিঠি লেখার সাধ চেপে রাখতে বাধ্য হয়েছি।

ইন্দু সম্পর্কে যে তার করেছিলাম, তোমার কাছ থেকে তার জবাবের আশায় বসে আছি।

ফেডারেশন সম্পর্কে তোমার হুঁশিয়ারী লক্ষ্য করেছি। এ খবর আমি ধর্তব্যের

মধ্যেই নিই না—তার মানে—এটা গুজব ছাড়া বুঝি কিছু নয়। কংগ্রেসের সম্মতি আগে না পেয়ে ওরা এটা ডাকবে না। আর তা ওরা পাবেও না।

তারপরে ইহুদীদের বিষয়। পুরোপুরি তোমার মতোই আমার অনুভূতি। আমি বিদেশী দ্রব্য বর্জন করেছি, বিদেশী সামর্থ্য তো করিনি। আমি নির্যাতিত ইহুদীদের জন্য তীব্র ভাবেই অনুভব করি। কার্যকরী প্রস্তাব হিসেবে আমি এই নির্দেশ দিই যে, তুমি সবচেয়ে যারা যোগ্য তাদের নামগুলি সংগ্রহ করে স্পষ্ট জানিয়ে দাও যে, আমাদের ভাগ্যের অংশীদার হবার জন্য তাদের তৈরী হতে হবে, আমাদের জীবন ধারণের মানও তাদের মেনে নিতে হবে। মহাদেবের কাছ থেকে বাকিটা জানতে পারবে।

ভালবাসা নিয়ো।

বাপু

২২৭ মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক লিখিত

(?) ১৯৩৮-৩৯

প্রিয় জওহরলাল,

তোমার চিঠি পেয়েছি। ভুল বোঝার সম্ভাবনা আছে তা জানি। এসব, এই কাণ্ডজ্ঞানহীন আর স্বার্থভরা সমালোচনা আমাকে কখনো প্রভাবিত করতে পারে নি। আমি জানি, আমরা যদি ভিতরে শক্ত থাকি, তাহলে সব ঠিক হয়ে যাবে। বাইরের ব্যাপারে তুমি আমার পরিচালক। তোমার চিঠি তাই আমার সহায়।

কুমারাপ্পার ব্যাপারে তুমি যথেষ্ট প্রতিবিধান করেছ। আশা করি, তুমি তার চিঠি দেখতে চাইবে। পড়ে ছিঁড়ে ফেললে চলবে। হাঁ, ওর মত কর্মী আমাদের খুব কমই আছে।

ভালবাসা নিয়ো।

বাপু

২২৮ এড্ওয়ার্ড টমসন কর্তৃক লিখিত

বোয়ার্স হীল, অক্সফোর্ড
২রা সেপ্টেম্বর, ১৯৩৮

প্রিয় জওহরলাল,

তোমার বোন আর মেয়ে অসুস্থ জেনে আমরা দুজনেই অতি দুঃখিত, আশা করি শীঘ্রই তাঁরা ভাল হয়ে উঠবেন।

তোমার লণ্ডনের ঠিকানা আয়ার্ল্যাণ্ডে না নিয়ে এসে যে কি বোকামিই করেছি: আমি প্রাগ্-এ আর একেবারে বাজে ঐ লণ্ডনের ঠিকানারও চিঠি লিখি! সে তো আমার উদ্ভট কল্পনারই আবিষ্কার।

এইমাত্র ফোনে কোর্ডাকে ধরতে পেরেছি। তিনি এরোপ্লেনে রবিবার ফ্রান্সে যাচ্ছেন, আর সোমবার সন্ধ্যেয় যাচ্ছেন আমেরিকায়। তাই তুমি যদি এখনো লণ্ডনে থেকে থাক, এবং এখন থেকে আরো কয়েক হপ্তা থাক, তবেই তাঁর সঙ্গে দেখা হবে, নচেৎ নয়। আর তাতে তিনি গভীর দুঃখই পাবেন।

এক পক্ষকালের মধ্যে তিনি ঠিকই আমেরিকা থেকে ফিরে আসছেন। তিনি বিশ্বস্তসূত্রে এই হুঁশিয়ারী পেয়েছেন যে, রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার দরুন দীর্ঘকাল সেখানে থাকাটা বিধেয় হবে না। বিদেশে যে আশাবাদ দেখা যাচ্ছে তার ভিত্তি কাঁচা। নুরেমবুর্গ সমাবেশ শেষ না হওয়া পর্যন্ত স্থির আবহাওয়া সৃষ্টি হবেনা। কোর্ডা আমাকে আগামী কাল বিকেলে আমেরিকা ভ্রমণ স্থগিত রাখার যে সামান্য সম্ভাবনা আছে, সে-সম্পর্কে খবর দেবেন। সেটা সম্ভব হতে পারে বই কি!

কিন্তু—তাই বলে তুমি আর তোমার সঙ্গীরা স্টুডিয়ো দেখবে না কেন? কোর্ডা যদি সোমবারে আমেরিকায় রওনা হয়েই যান, তাতে তো আধুনিক সভ্যতার এই পয়লা নম্বরের উপদ্রবটি কি করে চলে, তা দেখতে আসায় তোমার বাধা পাবার কারণ নেই।

আর তাই-ই যদি হয়—সপ্তাহের শেষে আসছ না কেন—তখন তো তোমার বোন সম্পূর্ণ সুস্থ হবেন, ইন্দিরাও আসতে পারবে? এই বুধ কি বৃহস্পতিবার—কি বল? আমার স্ত্রী আর আমি তোমাদের মধ্যাহ্ন ভোজ আর চা-পান করাতে, আর আমাদের নদীর বিস্তৃত সম্মুখভাগের আরব গ্রাম, সুদানীদের দুর্গ আর ভিক্টোরীয় যুগের রাজপ্রাসাদ প্রভৃতি দেখাতেও পারব। আশ্চর্য সে দৃশ্য, আর জোলটান কোর্ডার সঙ্গেও তোমার দেখা হবে—তিনি তো এই অনুষ্ঠানের কলাবিদ প্রতিভা।

যাহোক, কাল রাতে যখন ফোন করবে, কোর্ডা আমেরিকা ভ্রমণ স্থগিত রাখছেন কি না, তখন তোমাকে ঠিক-ঠিক বলতে পারব।

তোমার প্রাহা-র চিঠি বড়ই কৌতূহলী করে তোলে, গভীর আলোক-সম্পাত করে। আমি বহুদিন থেকেই জানি হার্টউড-এর য়্যালেন একটি অসহনীয় উপদ্রব-বিশেষ। লেবার পার্টিতে ওর ডাকনাম হচ্ছে ক্রীপিং জিসাস।

কোর্ডা আজ যদি চলেই যান, তাহলে সপ্তাহের শেষদিকে যেদিন তোমার সুবিধে হয়, সেইদিনই ঠিক কোরো। তোমার বোন আর মেয়ে দুজনেই আশা করা যায় বুধবার নাগাদ আরাম হয় যাবেন, তাঁদের নিশ্চিত দেখতে পারার সৌভাগ্যে আমি খুশীই হব।

চিঠিটা পড়ে দেখে মনে হচ্ছে, কোর্ডা যে বিশ্বস্তসূত্রে হুঁশিয়ারী পেয়েছেন, সেটা বোধহয় আমার বলা উচিত হয়নি। কিন্তু তোমাকে বলায় কোনো ক্ষতি নেই; তোমার নিজের অভিজ্ঞতা অনুসারে, তুমি ওঁকে ঐ একই হুঁশিয়ারী দিতে সক্ষম হতে।

তোমার

এড্‌ওয়ার্ড টমসন

প্যাডিংটন থেকে বেকনসফিল্ড/প্রিন্সেস রিসবরো রেলপথের ডেনহাম হচ্ছে স্টুডিয়োর স্টেশন। প্রতি আধ-ঘণ্টা অন্তর ট্রেন পাওয়া যায়; আমরা আজ সন্ধ্যায়ই ট্রেনের চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু স্টেশনের আফিস তখন বন্ধ হয়ে গেছে। যাহোক, যথেষ্ট ট্রেন আছে।

২২৯ জে. বি. কৃপালানি কর্তৃক লিখিত

স্বরাজ ভবন

এলাহাবাদ

৯ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩৮

প্রিয় জওহর,

তোমার কাছে গত সপ্তাহ তিনেক হবে, চিঠি লিখতে পারিনি বলে দুঃখিত। আমি এলাহাবাদে ছিলাম না। কাল ওয়ার্ধা হয়ে ফিরেছি, সেখানে রাষ্ট্রপতি, মওলানা সাহেব, বল্লভভাই আর রাজেন্দ্রবাবু কোন না কোন ব্যাপারে হাজির ছিলেন। আমি তাঁদের কাছে কৃষ্ণ মেননের কথা বলি। তোমাকে যা লিখেছিলাম, সে সম্পর্কে তাঁরা আমার সঙ্গে একমত। গ্ল্যাসগোর 'শান্তি ও সাম্রাজ্য সম্মেলনে' যাতে তিনি আমাদের প্রতিনিধিত্ব করতে পারেন সে সম্পর্কে তাঁরা আমাকে মেননকে লিখতেও বলেন। আমি সেইমত মেননকে লিখেছি। সুভাষ বলেছে, সে সম্মেলনে এক বাণী পাঠাবে। আশা করি, সে পাঠাবে।

ওয়াফ্‌দ্‌ পার্টির সম্মেলনে যোগ দেবার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করা সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্তই হয়নি। বিশ তারিখে যখন দিল্লীতে আমরা মিলিত হব, তখন কমিটির সম্মুখে আবার ব্যাপারটা হাজির করব। এবারে এ-আই-সি-সির বৈঠকও বসবে। জুলাই মাসে ওয়ার্কিং কমিটির গত বৈঠকে বাপু আমাদের যুদ্ধ এবং সামরিক শিক্ষা সম্পর্কে তাঁর মতামত জানান। এগুলি বৈঠকের শেষে তাড়াহুড়ো করে করা হয়। শুধু এই প্রশ্নের আলোচনার জন্য কয়েক দিন দেওয়া হোক, এই মর্মে প্রস্তাবও হয়। তাই এবারে এই ব্যাপারে দুদিন সময় দেওয়া হয়েছে। আমরা দিল্লীতে বিশ তারিখে যাব ঠিক করেছি, কারণ আমাদের যথাবিধি বৈঠক ২২শে তারিখ বসবে বলে ঘোষণা করা হয়েছে। এ-আই-সি-সির বৈঠক বসবে ২৪শে তারিখে।

বুদাপেস্ট থেকে য়ুরোপীয় পরিস্থিতি সম্পর্কে লেখা তোমার গত তিরিশে তারিখের চিঠিখানির নকল ওয়ার্কিং কমিটির সব সদস্যদের কাছে পাঠিয়েছি। আমরা এত শীঘ্র জড়ো হচ্ছি যে, কেবল মধ্য য়ুরোপের পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করবার জন্য বিশেষ বৈঠক ডাকা সম্ভব হ'ল না। আমার মনে হয়, এ প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধ, সমরসজ্জা এবং সামরিক শিক্ষা সম্পর্কে সাধারণতঃ আমাদের ধারণা কি, তাও আলোচনা করা হবে। তুমি তো জানো, কেন্দ্রীয় পরিষদ রংরুটের বিরুদ্ধে প্রচারের দণ্ডবিধান করে য়্যাণ্টি-রিক্রুটমেণ্ট বিল পাশ করেছে। মুসলিম লীগ সরকারের পক্ষেই ভোট দিয়েছে। তাই যুদ্ধ এবং তৎসম্বন্ধীয় প্রশ্ন সম্পর্কে আমাদের ধারণা নিয়ে পরবর্তী বৈঠকে পুরোপুরি আলোচনা হবে। আমার সাধ, তুমি যদি এখন এখানে থাকতে। ওয়ার্ধায় আমাদের কয়েকজন সহকর্মীও এই ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। বল্লভভাই বললেন, দিল্লীর বৈঠকের জন্য তুমি যদি ওড়াপথে সময় মতো ফিরে আস তো বেশ হয়। এইটেই সবাই অনুভব করছেন যে, এই সময় তুমি আমাদের ঘরোয়া রাজনীতিতে সাহায্য করবে।

বুদাপেস্ট থেকে লেখা তোমার ১লা তারিখের চিঠির একখানা নকল বাপুকে পাঠিয়েছি। তিনি ফেডারেশন সম্পর্কে ওখানকার বন্ধুবান্ধবদের কাছে যে গোপন চিঠি লিখছিলেন, এই প্রসঙ্গে তোমার তা মনে পড়তে পারে। ওয়ার্ধায় আমি আগাথা হ্যারিসনের বাপুকে লেখা একখানা চিঠি পড়ি। সে লিখেছে যে, বুলাভাই-এর মত ভুল বোঝা হয়েছে এবং তার ভুল অর্থ করা হয়েছে, এজন্য সে দুঃখিত। সে বলে, বুলাভাই লণ্ডনে এমন কিছুই বলেনি যা আমাদের প্রস্তাবে ব্যক্ত কংগ্রেসী ভাবধারার সঙ্গে খাপ খায় না। এই খবরের যদি কিছু মূল্য থাকে তাই তোমাকে জানাচ্ছি।

লণ্ডনে গতবারে বিভিন্ন ব্যক্তি এবং দলের সঙ্গে তোমার ব্যবহার দেখে আমি জানি বাপু খুবই খুশী। বিস্তারিত মতামত দেওয়া হয়নি, কিন্তু আন্তরিক প্রশংসা হয়েছে। অন্য কেউ এই রকম মত প্রকাশ করে নাই। আমার নিজের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে তোমাকে তো এরই মধ্যে জানিয়েছি। ফেডারেশন, গণসভা এবং স্বাধীনতা সম্পর্কে তুমি যে ভাবধারা গ্রহণ করেছ, আমার মনে হয় সবাই তা প্রশংসা করছে' আমার নিজের মতে লেবার পার্টি যে পরিকল্পনার আদুরা করেছে, বর্তমানে তার কার্যকরী মূল্য অতি কম। আর ভবিষ্যতে এর কি মূল্য হবে, তাও ইংলণ্ডের পার্টিগুলির রাজনীতির উপর নির্ভর করছে। কিন্তু এইসব আর সবকিছুই শেষ পর্যন্ত বিশ্ব পরিস্থিতির উপর নির্ভর করবে। এটা খুবই সম্ভব যে, বিশ্ব পরিস্থিতি খারাপ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইংলণ্ড হয়ত আমাদের অনেকখানি দিতে রাজী হবে কিন্তু তার সর্বাঙ্গীন রাজনীতি তেমনি সংরক্ষণশীল থাকতে পারে। বাইরের বিপদ দেশের অভ্যন্তরের অতি-চরম উদারনীতিক নীতিকে ক্ষতিকারক ভাবেই প্রভাবিত করে।

লেবার মেমোরেণ্ডাম যদি প্রকাশ হয়, তার প্রচার-মূল্য হবে খুবই বেশি। এতে অন্ততঃ এইটুকু বুঝিয়ে দেবে যে, কতগুলি দল, বর্তমানে যতই ছোট হোক, তারা আমাদেরই মত ভাবে যে, ভারত এবং ব্রিটেনের মধ্যে প্রীতির সম্পর্ক ছাড়া অন্য কোনো সম্পর্ক থাকা উচিত নয়, অথবা কিছুটা বাণিজ্য-চুক্তিও থাকতে পারে। ওখানকার মানুষ ভারতীয় স্বাধীনতার ধারণা সম্পর্কে ওয়াকিবহালও হবে।

অফিস সম্পর্কিত তোমার চিঠির সব উপদেশই পালন করা হয়েছে। লোহিয়া এখনো আছে, এবং তার কাজ করছে। আমি তাকে বলেছি, তোমার আসার আগে সে ছেড়ে যেতে পারবে না। আহ্‌মদ এই মাসের শুরুতেই ছেড়ে চলে গেছে। কিন্তু সে এখানেই গেঁড়ে বসেছে। আস্রাফ তার কাজ করছে।

আমি ওয়ার্ধায় আমাদের সহকর্মীদের কাছের চীন যাত্রী মেডিক্যাল মিশনে কোন রাজনীতিবিদকে যুক্ত করে দেওয়া সম্পর্কে তোমার প্রস্তাবটি পেশ করি। মিশন চলে যাবার পর তোমার এই সম্পর্কে চিঠিখানি আমার হাতে আসে। তাঁরা তাই বলেন যে, পরবর্তী বৈঠকেও এ ব্যাপারটা নিয়ে ভাবা যেতে পারে।

বিজয়লক্ষ্মী নিশ্চয়ই এখানে যা কিছু ঘটছে সে সম্বন্ধে তোমাকে জানিয়েছে। ইন্দিরা যে আবার স্বাভাবিক স্বাস্থ্য লাভ করেছে শুনে আমরা খুশী হয়েছি। আশা করি, বিজয়লক্ষ্মী এই হাওয়া বদলে আগের চেয়ে ভালই বোধ করছে। আমেদাবাদে ভারতীর কাছ থেকে শুনলাম, তুমিও নাকি পুরোপুরি সুস্থ নও। একটু বিশ্রাম চাও না কেন? সবাই জিজ্ঞেস করে, কবে তুমি দেশে ফিরবে। তুমি তো কিছুই লেখ না। লিখো।

সুচেতা আর আমি তোমাদের সবাইকে ভালবাসা জানাই।

তোমার স্নেহের
জিবৎ

২৩০ ক্রিস্টাইন এইচ স্টার্জিয়ন কর্তৃক লিখিত

কেয়ার্নগর্ম
কুরি, মিডলোথিয়ান
১৯শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩৮

প্রিয় ডক্টর নেহরু,

গত সপ্তাহের ম্যানচেস্টার গার্ডিয়ান সাপ্তাহিকে আপনার চমৎকার চিঠিখানির জন্য আপনাকে ধন্যবাদ জানাতে চাই।

আজকালকার এই বিপদের দিনে আমাদের মধ্যে অনেকেই যে চিন্তা করছি সেই কথাই ঐ চিঠিতে এমন মর্যাদা আর সরলতায় ব্যক্ত হয়েছে। আমার আশা, আমার মতই যারা আমাদের বর্তমান সরকারের নীতিবোধের অভাবে শিউরে উঠেছে, আঘাত পেয়েছে এবং মোহ-বিচ্যুত হয়েছে, তাদের কাছ থেকে আমার এই চিঠিখানির মত আরো চিঠি পাবেন।

আমরা বিশিষ্ট মানুষ নই, কিন্তু আমার মনে হয়, আমরাই এ দেশে সংখ্যা-গরিষ্ঠ—সরল, শান্তিপ্রিয়, মূলত ভদ্র মানুষ আমরা—আমাদের কথা শোনাবার জন্য সংস্থার আমাদের অভাব। হয়ত কোনো দিন, সমষ্টিগতভাবে আমাদের মধ্যে এমন গভীরভাবে সাড়া জাগবে যে, তখন আমাদের ইচ্ছাকে আমরা জাহির করতে পারব। সুমুখে দীর্ঘ, দুর্গম পথ—শিক্ষা, জ্ঞান আর সংস্কার সে পথ—এখন যা অসংখ্য শব্দায়মান মুক্তিকাম্ফীতি ছাড়া কিছুই নয়, তাইত সেই জোয়ারের ঢেউ হয়ে দেখা দেবে, যা বাধাকে ভাসিয়ে দিয়ে প্রগতির পথে নিয়ে যাবে। আমি আপনাকে জানাতে চাই যে আমরা এমন অনেকেই আছি, যারা বুদ্ধিবৃত্তি এবং আত্মিক দিক থেকে

আপনার সঙ্গী। এবং ম্যানচেষ্টার গার্ডিয়ানে আপনার লেখা চিঠির উত্তর-স্বরূপ প্রতিটি চিঠিতে শত শত হাজার হাজার অজানা মূক মানুষের কথা পাবেন, যাদের আপনি ভারতে সাহায্য করেছেন, যদিও তারা লেখেনা।

আবার আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আপনার স্বাধীন ভারত এবং গণতান্ত্রিক পৃথিবীর জন্য কাজ যেন সব দিক দিয়েই সফল হয়ে ওঠে।

আপনার বিশ্বস্ত
ক্রিস্টাইন এইচ্ স্টার্জিয়ন

২৩১ টি মেইস্কি কর্তৃক লিখিত

১০ই অক্টোবর, ১৯৩৮

প্রিয় নেহরু,

শুনে দুঃখিত হলাম যে আপনি এখন সোবিয়েৎ যুক্তরাষ্ট্রে আসতে পারবেন না, কারণ আমি তো বুঝি আপনি কতখানি এর জন্য আশা করেছিলেন। যাহোক, আমার আশা যে, বাধ্য হয়ে আসা স্থগিত রাখলেও ভবিষ্যতে কখনো হয়তো সুযোগ করে নিতে পারবেন।

জেনিভায় আপনার দেখা পেয়ে খুবই খুশী হয়েছিলাম, এবং আমাদের সেই সাক্ষাৎকারের সেই সর্বোত্তম স্মৃতি আমি সকল সময়েই রক্ষা করব।

এরই মধ্যে আপনার কন্যা এবং ভগিনী সম্পূর্ণ সুস্থ না হলেও আগেকার চেয়ে অনেক ভাল আছেন---আমি কি আমার এই কামনা প্রকাশ করতে পারি।

আমাকে বিশ্বাস করুন।

আপনার বিশ্বস্ত
টি মেইস্কী

২৩২ মুস্তাফা এল্ নাহাস কর্তৃক লিখিত

হেলিও,পোলিস্
১৭ই অক্টোবর ১৯৩৮

প্রিয় জওহরলাল নেহরু,

আপনার চিঠি দুটি পেয়েছি। আমার ও মাকরাম পাশার কায়রোয় পুনরাগমনের সময় জনগণের নির্ধারিত বিপুল সম্বর্ধনা সভায় আমাদের জীবনের প্রতি পুলিশের চর কর্তৃক ঘৃণ্য এবং পূর্বপরিকল্পিত গুপ্ত আক্রমণে সহানুভূতি প্রকাশের জন্য আপনাকে আমার ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

আঘাত ও গভীর ক্ষত সত্ত্বেও ঈশ্বর আমাদের প্রাণরক্ষা করেছেন। এখনো আমরা এর থেকে পরিপূর্ণ আরোগ্যলাভ করিনি।

মাকরাম পাশার কপালে একটি গভীর অস্ত্রোপচার করতে হয়েছে।

সুখের বিষয়, মাকরাম পাশার বা আমার কোন অস্থি ভগ্ন হয়নি।

জনসাধারণ অত্যন্ত উত্তেজিত।

আমাদের সহকর্মীদের মধ্যে কয়েকজন আপনার ভগ্নী আলেকজান্দ্রিয়ায় অবতীর্ণ হলে আনন্দে তাঁর সম্বর্ধনা করবেন এবং তাঁর সঙ্গে থেকে তাঁর সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য প্রয়োজনীয় বন্দোবস্ত করবেন।

আর আপনাকে ও আপনার কন্যাকে আমাদের সহকর্মীদের একটি দল আলেকজান্দ্রিয়ায় নিতে যাবেন আর সারা সপ্তাহের জন্য আপনাদের আমরা কায়রো ও মিশরে পাব।

সাম্রাজ্যবাদ আর সরকারী প্যালেস্টাইন সম্মেলন সম্বন্ধে আপনার সর্বপ্রকার ধারণার আমরা সম্পূর্ণ অংশ গ্রহণ করব।

একান্ত আপনার
মুস্তাফা এল্. নাহাস

সাবধানতা অবলম্বনের জন্য আপনার লণ্ডনের ঠিকানায় এই চিঠির একটি নকল পাঠালাম।

২৩৩ সুভাষচন্দ্র বসু কর্তৃক লিখিত

ট্রেনে
১৯শে অক্টোবর, ১৯৩৮

প্রিয় জওহর,

তুমি নিশ্চয়ই ভাবছ কি অদ্ভুত জীব আমি, তোমার সবগুলি চিঠিরই উত্তর দিইনি। যাহোক, আমি সেগুলি ঠিকই পেয়েছি। তোমার ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের কাছে লেখা চিঠি সবাই পড়েছেন। এখানকার অবস্থা সম্পর্কে তোমাকে কৃপালনি এবং অন্যান্য বন্ধুরা জানিয়েছেন। সমর সংকটের কালে তোমার বিবৃতিটি সময়োপযোগী হয়েছে, এবং আমাদের সাহায্যও করেছে।

এই কয় মাস কতখানি যে তোমার অভাব বোধ করছি, তুমি কল্পনাও করতে পারবে না। আমি অবশ্য এটা বুঝি যে, তোমার হাওয়া-বদলের খুবই দরকার ছিল। শুধু এই আমার দুঃখ যে. তুমি শরীরকে যথেষ্ট বিশ্রাম দাও নাই। মোটামুটি—এখানে ভাল করেই তোমার খবর বেরুচ্ছে—সেজন্য রয়টারকে ধন্যবাদ। ইউরোপে তোমার কাজ আর এখানে-ওখানে যাওয়া সম্পর্কে জনগণ জানতে পারছে, এবং তোমার বক্তৃতাগুলি অত্যন্ত কৌতূহলের সঙ্গে পড়ছে। তুমি যে ইউরোপ থাকাকালীন এমন মূল্যবান কাজ করতে পারছ, এর জন্য আমি খুবই খুশী—যদিও এখানে আমরা তোমার অভাব বড়ই বোধ করেছি।

তোমার না ফেরা পর্যন্ত কতগুলি সমস্যার সমাধান হবে না। হিন্দু-মুসলিম সমস্যাও আছে। মিঃ জিন্নাহ্ যুক্তিবিবর্জিত এবং আপোষবিরোধী। এ-আই-সি-সির ভিতরে দক্ষিণপন্থী এবং বামপন্থীর বিভেদ দেখা দিয়েছে। শেষোক্ত দল বৈঠক থেকে বেরিয়ে আসে, মহাত্মাজী তাতে আঘাত পেয়েছেন। তারপরে আছে আন্তর্জাতিক সমস্যা।

আশা করি. তুমি পরিকল্পনা কমিটির সভাপতিত্ব গ্রহণ করবে। যদি এটাকে সফল করতে হয় তো তোমাকে নিতেই হবে।

ভালবাসা নিয়ো।

তোমার স্নেহের
সুভাষ

পুঃ: বোম্বাই থেকে আগামী কাল কলকাতায় পৌঁছচ্ছি।

২৩৪ এড্ওয়ার্ড টমসন কর্তৃক লিখিত

বোয়ার্স হীল, অক্সফোর্ড
২১শে অক্টোবর, ১৯৩৮

প্রিয় জওহরলাল,

আমি দুঃখিত।

আমি এই সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছেছি যে, মোট কথা, আমি একজন সাধারণ ধাতের সংরক্ষণশীল মানুষ! সব কিছুই এমন গোলমেলে হয়ে আছে আর বামপন্থীরা তো প্যালেস্টাইন নিয়ে ক্ষেপে উঠেছে। ম্যানচেস্টার গার্ডিয়ান এত দিন ধরে তো

সবচেয়ে বিবেকবুদ্ধিহীন ইহুদী সমর্থক কাগজ হিসেবে চলে এসেছে; সম্পাদকীয়র পর সম্পাদকদীয় ছেপে নির্ধারণ করেছে যে কেবলমাত্র ইতালীয় প্রচারই আরবের এই অশান্তি ঘটাচ্ছে। আর জাতীয়তাবাদীদের বিরুদ্ধে আরো কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পীড়াপীড়ি করে লেখা আমেরিকানদের চিঠিগুলিকে অনেকখানি জায়গা দিচ্ছে। ওরা আমাকে একখানি চিঠি ফেরত পাঠিয়েছে, ছাপতে রাজী হয়নি। আশা করি, আজ নিউ স্টেটসম্যান যে চিঠিখানি ছেপেছে, এখানিই মূলত সেইখানিই বটে। দি নিউজ ক্রনিকলও চিঠি ছাপেনি, যদিও একেবারে ছাপতে অস্বীকার করে ফেরত না দেবার মত দয়া তার আছে। দুখানি চিঠিতেই ঐ ভয়ংকর ঘটনাটি ছিল, যা টাইম য়্যাণ্ড টাইড-এর সঙ্গে ব্যবস্থা করে আমাকে আজ ছাপাতে হয়েছে। (ওরা আমার প্রবন্ধ থেকে ওটি কেটে বাদ দেয়।) নিউজ ক্রনিকল এবং ডেইলি টেলিগ্রাফ একই ফোটো ছাপে, কিন্তু পূর্বোক্ত কাগজটি এর নাম দেয়—'আরব দস্যু' আর শেষোক্তটি বলে, 'আরব বন্দী'। টেলিগ্রাফ আমার লেখা একখানি চিঠিও ছেপেছে, যদিও ঐ ঘটনাটি বাদ দিয়েছে। আমার সারা জীবনে আমি তো আগে এমন কখনো জানি না যে, ইংলণ্ডে জনপ্রিয়তাহীন ব্যাপারে শুনানি পাওয়া অসম্ভব হয়ে উঠেছে। আমার তো কখনোই বিশ্বাসই হোত না যে, ইহুদীদের সংবাদপত্রের উপর প্রভাব আছে। ইহুদী আর আমেরিকানরা উভয়ে, লিবারাল আর লেবার কাগজগুলি আরবরা যাতে তাদের কথা শোনাতে না পারে, তাই নির্মমভাবে সব প্রচেষ্টা দাবিয়ে রেখেছে। আজকের টাইম য়্যাণ্ড টাইড-এর 'প্যালেস্তাইন প্রসঙ্গে' লেখা বিরক্তিকর বলেই আমার মনে হয়। নিউ স্টেটস্ম্যান আমার চিঠি আজ ছাপাতে সাহস পাবে কি না, সে সম্পর্কে আমার খুবই সন্দেহ আছে।

আমাদের নিজেদের মধ্যে বলি, লিণ্ডসে জিতবে বলে আমার মনে হয় না। দুজন বসে-যাওয়া নির্বাচনপ্রার্থীই নীচ ব্যবহার করেছে। লেবার প্রার্থিটী এমন ভাব দেখাচ্ছে যে তার উপরে দুর্ব্যবহার করা হয়েছে বলে লিবারাল প্রার্থীটির সঙ্গে এক বক্তৃতা-মঞ্চে দেখা দেবে না। শুনেছি, সে ডেলি হেরাল্ডে বিশ্বাসঘাতকতার উপরে এক চিঠি লিখেছে, আর ঐ হতভাগা কাগজটা লিণ্ডসের বিরুদ্ধে ব্যবহার করেছে। লিবারালপন্থীটি বসে-যাওয়া নিয়ে তার দলের মহত্ত্বের কথাই বলছে, আর সমস্ত হোমরাচোমরা লিবারলরা গিয়ে প্রকাশ্যে হগ-এর দিকে জুটেছে......... আমার মনে হয়, বক্তারা নিগৃহীত হচ্ছে। আমার কথা বলি, আমি যে কোন জায়গায়, যে কোনো সময়ে বার বার এবং কালবিলম্ব না করেই বক্তৃতা দিতে চেয়েছিলাম,— বিশেষ করে লিবারাল আর মেয়েদের কাছে তো বটেই। তার কারণ আমি একজন লিবারাল (যদি আমার কোন দল থেকে থাকে), এবং আমি সেই কুখ্যাত মধ্যাহ্ন ভোজেও হাজির ছিলাম, যেখানে লিণ্ডবার্গ আমাদের সরকারকে প্রথম ভয় দেখান (তিনি লয়েড জর্জ ও পরে মন্ত্রিসভাকেও জানান,) ঐ থেকে এবং অন্যান্য নানা সংবাদের উৎস থেকে সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর ভিতরের কাহিনী অনেকখানিই জানি এবং আমি দোদুল্য-মানদের প্রভাবিত করতেও পারতাম। জানি আমি তা পারতাম। আর যখন আমি ক্রুদ্ধ হয়ে উঠি, আমি তো এখন এত রেগে উঠেছি, আমার জীবনে তত ক্রুদ্ধ আমি কখনও হইনি। এখন আমি একজন সুবক্তা! কিন্তু ওরা তো দলের ঝানু বক্তাদেরই শুধু এই নির্বাচনী প্রতিযোগিতায় কাজে লাগাবে, অথচ সেখানে ফলাফল অ-দলীয় ভোটারদের উপরই নির্ভর করবে। আমার কাছ থেকে ওরা কেবলমাত্র চাঁদাই নিয়েছে, ওরা একটা ঘরোয়া বৈঠকেও আমাকে বলতে দেবে না। তাই আমরা দুজন ভূতপূর্ব নির্বাচনপ্রার্থীকেই পাচ্ছি, এদের বক্তৃতাগুলি অক্সফোর্ডে প্রতিটি লোকের মুখস্থ, অন্য দলীয় অত্যুগ্র কর্মীরাও সে-সম্পর্কে ওয়াকিবহাল।

আমার মত মানুষ এড়াতে না পারলে তবে সভায় বক্তৃতা দেয়। কিন্তু এবারে আমি প্রচন্ড অভিযান করতেই চেয়েছিলাম, আর লিন্ডবার্গ যে কথা বলেছিলেন, তার দু-একটা কথা বলতে চেয়েছিলাম, সেগুলি তো ইচ্ছা করেই চেপে রাখা হয়েছে। আরও কয়েকটা কথা বলারও ইচ্ছে ছিল। লিন্ডসের বিরুদ্ধে এখন কড়াধাতের অধ্যাপকেরা যে ধরণের আক্রমণ করছেন আমি তা আগেই বুঝতে পেরেছিলাম, এবং আগেভাগেই তাঁদের প্রতিদ্বন্দ্বীতা করতে চেয়েছিলাম।

জালিয়ানওয়ালাবাগের উপরে এখানে ঐ দুটি ক্ষমাহীন বিতর্কের পর ঠাকুর যেমনটি অনুভব করেছিলেন. আমি তেমনটিই করছি। আমার চারিদিকের দুনিয়াটার সব কিছুই খারাপ হয়ে গেছে, আর আমি হতাশ হয়ে পড়েছি। কিন্তু যদি আরবেরা লন্ডনে একটা সভা করে আর বক্তা চায়, আমি সেখানে বলব। আমাদের কাগজগুলো আমাকে যতটা করতে দিয়েছে. আমি তা করেছি। কিন্তু আমাদের নিজেদের পক্ষ, তার মধ্যে সবচেয়ে খারাপ হচ্ছে ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ান (ওটা সত্যিই ঘৃণার্হ এবং অনুদার পত্রিকা আর সব সময়েই তাই ছিল)—এরা সবাই বিবেকবুদ্ধিরহিত।

এর চেয়ে খুশ খবরের দিকে মোড় ফেরা যাক। 'দি ড্রাম'-এর সমালোচনাগুলি কোর্ডার মনে বেশ গেঁথে গেছে। গত মঙ্গলবারে তিনি আমাকে ফোনে ডেকে ডেনহামে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে বলেন। তিনি মরীয়া হয়ে উঠেছেন, সাবুর জন্য তাড়াতাড়ি একটি গল্প চাই। হাতী ঘোড়ার ব্যাপারেই সাবু ভাল, তার বেশি কিছু নয়। কিন্তু কোর্ডা তাকে লোচ্চাছোঁড়া হিসাবে দেখাতে চান, যদিও প্রচুর দুঃসাহসিক ব্যাপার থাকবে। বললেন, তিনি খাঁটি ভারতীয় জীবন ভারতীয় অভিনেতা দিয়ে দেখাতে চান—এবং এই বলে শেষ করলেন 'আমি ভারতের জন্য প্রচার করতে চাই; এ-ছবিতে ভারতের সৌন্দর্য দেখানো হবে, এবং সেখানে যে ভারতবাসী থাকবে, তারা আততায়ী আর বিশ্বাসঘাতক নয়, তুমি আমি যাদের ভালবাসি, শ্রদ্ধা করি এমন নরনারীই মিলবে।'......এ ব্যাপারে তোমার কি মত? ছবি তো সারা পৃথিবীতে চলে। আমাদের শত্রুরা তো প্রচারের আর সব বাহনগুলিই করতলগত করেছে—আমি তাদের উত্তর দিতে ইচ্ছুক। আমি একটি ছবি করব, যাতে ভারতীয় শ্রমিকরা যে বস্তিগুলি ও তাদের কারখানাগুলির অবস্থা কি--এইসব দেখানো হবে। এখন—তুমি আর নান কি এই নিয়ে ভেবে দেখবে—আমি এমনি দশা কলকাতায় পেতে পারি—দুর্গন্ধময় খাল আর বদ্ধজলাগুলি, সেখানে উপবাসী নরনারী থাকে—কিন্তু তোমাদের প্রয়াগ সঙ্গম, গঙ্গা আর যমুনাকে সমস্ত মহিমা নিয়ে ফিল্মে তোলার ব্যাপার কি হবে? অবিস্মরণীয়ভাবে সারা পৃথিবীকে দেখাতে হবে ভারতের দারিদ্র্য আর সৌন্দর্য—কি হবে বল তো? কোথায় আমি এটা তুলব—কলকাতায়, গোয়ালিয়রে (দৃশ্যের জন্য), এলাহাবাদে, না কানপুরে?

ভারতে যখন ছিলাম, আমার মনের তখনকার অসুস্থতা এই শেষ উপন্যাসে ছায়া ফেলেছে। বড়ই ক্লান্ত মানুষের লেখা, বড়ই ক্লান্তিকর বইখানি। এতে কাহিনী নেই বললেই হয়, আমাদের গোঁড়া সনাতনী থেকে শুরু করে ভারতীয় জাতীয়তাবাদী কাউকেই এ বই খুশি করতে পারবে না। প্রথমোক্তরা আরম্ভের পাতাগুলির জন্য জীবন্ত আমার ছাড়িয়ে নিতে চাইবে, আর শেষোক্তরা অন্যান্য পাতাগুলির জন্য আমাকে ঢিল মারত চাইবে। বইটা ভাল হয়নি, কিন্তু আমি তো প্রায় ফুরিয়ে এসেছি।

তোমার এবং তোমার কন্যার মঙ্গল হোক।

চিরদিনের তোমারই

এড্ওয়ার্ড

পুঃ এইচ এন ব্রেইলসফোর্ড নিছক দুষ্টবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ। গত রবিবারের

রেনল্ডস্-এ সে এমন দাবীও করেছে, চেক উদ্বাস্তুদের প্যালেস্টাইনে রাখা উচিত!!! টাইম য়্যাণ্ড টাইড-এ আমি যে তাকে সোজা প্রশ্ন করেছিলাম, তার উত্তর দেবার চেষ্টাও করেনি। প্যালেস্তাইন প্রশ্ন নিয়ে পড়েছি বলে টাইম য়্যাণ্ড টাইড খুশি নেই, কিন্তু শর্ত অনুসারে 'প্রসঙ্গত' পর্যায়ে এটি ছাপতে হয়েছে। তুমি কি গ্যারাট-এর 'স্বস্তিকার ছায়া' দেখেছ?

২৩৫ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক লিখিত

শান্তিনিকেতন, বাংলা
১৯শে নভেম্বর, ১৯৩৮

প্রিয় জওহরলাল,

এইমাত্র কাগজে তোমার দেশে প্রত্যাবর্তনের কথা পড়লাম। সারা দেশের স্বাগত ধ্বনির সঙ্গে ত্বরান্বিত হয়ে আমার স্বর মিলিয়ে দিচ্ছি।

তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎকারের জন্য আমি বড়ই উৎসুক, তোমার সূচীতে যদি শান্তিনিকেতন ভ্রমণের কথাটা রাখ, আমি সুখী হব।

এই সেদিন ভারতীয় শ্রমশিল্পের বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনা নিয়ে ডাঃ মেঘনাদ সাহার সঙ্গে দীর্ঘ এবং চমৎকার এক আলোচনা হ'ল। আমি এর গুরুত্ব সম্পর্কে স্থির-নিশ্চয়। তুমি কংগ্রেস পরিচালনার জন্য সুভাষ-গঠিত কমিটির সভাপতি হতে রাজী হয়েছে বলে, এ সম্পর্কে তোমার অভিমত জানতে চাই।

ইন্দিরাকে আমার কথা বোলো, তাকে আমার ভালবাসা জানিয়ো।

তোমার স্নেহার্থী
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৩৬ জয়প্রকাশ নারায়ণ কর্তৃক লিখিত

কালিকট্
২৩শে নভেম্বর, ১৯৩৮

প্রিয় ভাই,

তোমার দেশে আগমনের জাতীয় স্বাগত সম্ভাষণের সঙ্গে আমি আমারটি মিলিয়ে দিতে চাই। এলাহাবাদে ছুটে গিয়ে তোমার সঙ্গে দেখা করে তুমি য়ুরোপে যে ভয়াবহ ঘটনা দেখে এসেছ, আর তোমার যাবার পর এখানে যা ঘটেছে, সে সম্পর্কে আলোচনা করার সাধ ছিল। হয়তো সে-কামনা সপ্তাহ কয়েকের মধ্যে পূর্ণ করতে পারব, অবশ্য যদি তুমি অবিলম্বে কার্যসূচীর ঘূর্ণাময় আবর্তে না পড়। আমি এখন এখানে মালাবারে কুঁড়ে হয়ে বসে আমার এই অম্লশূলের জন্য বিশেষ আয়ুর্বেদ-সম্মত চিকিৎসা করাচ্ছি। ভাল বোধ করছি বটে, কিন্তু আরাম দেয়নি। প্রভাবতীও আমার সঙ্গে আছেন। কাগজে পড়ে আমাদের বড়ই আনন্দ হোল, ইউরোপ ভ্রমণের ফলে তোমার স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়েছে।

আশা করি, এই বিরাট ঘটনাবলীর ভিতরে থেকে আমি তোমার কাছে সোশালিস্ট বুক ক্লাবের ছোটখাটো ব্যাপারটা সম্পর্কে বলেছিলাম, সেটা ভুলে যাওনি। আমরা আমাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী কিছুটা এগোতে পেরেছি, সুভাষবাবুর সাহায্যে এর জন্য কলকাতায় প্রায় তিন হাজার টাকা তুলেও ফেলি। ক্লাবের আফিস এলাহাবাদে, আহ্‌মদ ম্যানেজিং ডাইরেক্টর হিসেবে এর ভারপ্রাপ্ত হয়েছে। ক্লাবটি অদলীয় ব্যাপার। তুমি ইউরোপ থেকে যে চিঠিখানি লিখেছ, তাতে এ সম্পর্কে আরো না জেনে তুমি স্থাপক-সদস্য হিসেবে ক্লাবে যোগ দিতে নিজের অক্ষমতা জানিয়েছ।

তুমি কোন দলের সঙ্গে নিজেকে সামিল করতেও অনিচ্ছা প্রকাশ করেছ। আমি যা আগে বলেছি, ক্লাবটি দলীয় ব্যাপার নয়, এবং সোশালিস্ট সাহিত্য ছাড়া অন্য কিছুর প্রতি এর আনুগত্য নেই। আর অন্যান্য ব্যাপারে, যদি তোমার সময় থাকে তো আহ্‌মদ তোমার সঙ্গে আমাদের পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করবে। এবং একথা বলার বোধহয় প্রয়োজন নেই যে, তুমি যে কোন নির্দেশ দেবে, আমরা তা খুশি হয়েই গ্রহণ করব। সুভাষবাবু এরই মধ্যে ক্লাবের স্থাপনকারী সদস্য হয়েছেন। এতে যোগদানে তুমি নারাজ হলে সেটি আমাদের পক্ষে মস্ত আঘাতই হবে। আমি স্বীকার করি, ক্লাব সামান্যভাবেই কাজ করবে, কিন্তু আমার তো মনে হয়, ভারতের সোশালিস্ট আন্দোলনের কাছ থেকে তার সাধ্যের বাইরে কিছু আশা করাই যুক্তিহীনতার ব্যাপার হবে। আমাকে যদি মাপ কর তো বলি, তুমি বড় ভাবে কাজ করতে স্বভাবতই অভ্যস্ত, ভারতীয় সোশালিস্টরা পুরাতন এবং বৃহত্তর প্রতিষ্ঠানগুলির তুলনায় অতি ক্ষুদ্র, শুধু এই কারণেই যদি তাদের প্রচেষ্টায় অসহযোগিতা কর, তাহলে সেটা তোমার পক্ষে অন্যায়ই হবে। যদি তুমি পুরোপুরি আমাদের সামিল না হতে পার, তবু সোশালিস্ট হিসেবে আমরা সামান্য যা করতে চাই সেটা যাতে ভাল করে করতে পারি অন্ততঃ সেই সাহায্যটুকু করবে—আমার মনে হয়—আমাদের এ আশা অসঙ্গত নয়।

তোমার চিঠিতে তুমি বলেছিলে, ভারতের রাজনীতি চিরাচরিত খাতে পড়েছে তোমার অনুপস্থিতিতে এখন তো আরো গভীরে তলিয়ে গেছে। আমি রাজনীতির নিনাদ থেকে দূরে থেকে অনুভব করছি যে, এমন সব ঘটনা ধীরে ধীরে ঘটছে, যাতে পদদলিত, কোটি কোটি মানুষের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান থেকে কংগ্রেসকে ভারতীয় কায়েমী স্বার্থের সেবিকা হিসেবে রূপান্তরিত করছে। গান্ধীবাদের বিকৃত রূপ এই পরিবর্তনকে সহজ করে তুলেছে, এবং এই নয়া কংগ্রেসকে তার উপযুক্ত জননেতৃত্বের অস্ত্রশস্ত্র যোগাচ্ছে। আমার মনে হয়, কংগ্রেসী নীতির ঝোঁকটা কোন দিকে সেটা ভাল করে পরীক্ষা করা দরকার, বিশেষ করে কংগ্রেসী প্রদেশগুলিতে তো বটেই—এবং কংগ্রেসের সামাজিক-অর্থনীতিক লক্ষ্য সম্পর্কেও আবার ব্যাখ্যা প্রয়োজন। শ্রমিক প্রতিষ্ঠানগুলির হাত-পা বেঁধে মালিকদের কাছে সঁপে দেওয়া হবে, মন্ত্রিসভা-গুলিকে এই কাজে লাগাতে যাঁরা চান না, ট্রেড ইউনিয়নের প্রতিনিধিত্বে চালিত মজুর আন্দোলনের প্রতি কংগ্রেসী সরকারগুলি ভাবভঙ্গী তাঁদের চোখ খুলে দেওয়ার কাজ করবে। ভারতীয় শ্রম-শিল্পকে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের অন্য প্রতি শব্দে রূপান্তরিত করা হয়েছে, আমরা এই প্রকৃত বিপদের আজ সম্মুখীন। তারপরে আছে কংগ্রেসী সংস্থাগুলির কাজ। এদের বেশির ভাগই গতায়ু, যেখানে চালু আছে, সেখানে হয় নির্বাচনী প্রতিযোগিতার যন্ত্রে পরিণত হয়েছে, নয় তো কাজের মূল্য না বুঝে কাজ করে, তা করবার জন্য যে প্রস্তুতি দরকার তাও তাদের নেই। আমার মনে হয়, কংগ্রেসকে লক্ষ্যে পৌঁছিবার জন্য পুরোপুরি তার তথাকথিত গঠনসূচীর উপর নির্ভর করতে দেবে কি না—এই প্রশ্নের উত্তর তোমাকে কথায় ততটা না হোক, কাজে দিতে হবে। যখন গান্ধীবাদী কংগ্রেস তার কাজের জন্য উপযুক্তভাবে তৈরি কি না, এই প্রশ্নের সম্মুখীন হয়, তার এই স্পষ্ট এবং সত্য উত্তর পাওয়া যায় যে, কেবলমাত্র গঠন সূচী সফল করে তুলতে পারলেই আমাদের লক্ষ্যে গিয়ে আমরা পৌঁছিতে পারি। কি করা দরকার তা তোমার দেশকে বলা উচিত, কি করে তা করতে হবে তাও দেখিয়ে দেওয়া উচিত। তুমি তো জানো, সোশালিস্ট আন্দোলন শ্রমিক এবং চাষী সংস্থাগুলির কর্মসূচী অগ্রভাগেই স্থাপন করেছে, তার সঙ্গে স্বেচ্ছাসেবক, যুব আর ছাত্র সংস্থাও যোগ করা যেতে পারে। শ্রমিক এবং চাষী সংস্থাকে কংগ্রেসের সাহায্যকারী অঙ্গ

হিসেবেই সৃষ্টি করা হয়েছে, প্রতিদ্বন্দ্বী সংস্থা হিসেবে নয়। তুমি বহুবার এই কর্মসূচী সম্পর্কে নিজের কথা স্পষ্ট করেই বলেছ। কিন্তু আমি মনে করি, এখন সময় এসেছে, তোমাকে আরো এগিয়ে আসতে হবে এবং একে রূপ দিতে ও উন্নত করতে হবে। সামাজিক স্বাধীনতার প্রতি এই যে নিশ্চিত প্রেরণা, যা এই দেশের বেশির ভাগ জনগণ এবং আমার মনে হয় অধিকাংশ কংগ্রেসী সদস্যদের ভিতরেও রয়েছে—তাকে রূপ দিতে এবং দৃঢ়ীভূত করতে হলে কি করা উচিত তা তোমার পক্ষে ভাবা প্রয়োজন হয়ে দাঁড়িয়েছে। দেশে সদ্য-সৃষ্ট সোশালিস্ট আন্দোলন ছাড়া এই প্রেরণার এখনো ব্যাপক প্রকাশ হয়নি। আমার বিবেচনায়—এই জন্যে ভিত্তিমূলক কাজ করা দরকার, আর তা তুমিই একমাত্র করতে পার—যদি তুমি এর জন্য একটু সময় দাও আর চিন্তা কর।

জাতীয় আন্দোলনের সমাজবাদী লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে দেওয়া এবং নতুন পথে চালনা করা সম্পর্কে এই পর্যন্তই থাক। শত্রুর বিরুদ্ধে পরবর্তী আক্রমণের (এইটেই কি শেষ অভিযান হবে না কি?) আরো গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটা এখনো রয়ে গেছে। আমাদের কি এ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা আছে? আমরা নিজেদের প্রস্তুতির জন্য কি করছি? কখন শুরু হবে অভিযান? বৃটিশরা আমাদের সময় বেছে দেবে, ততদিন পর্যন্ত কি আমরা বসে থাকব, স্বভাবতঃই তা তো তাদের সুবিধে মতই বাছাই হবে? আগেভাগে আক্রমণের পরিকল্পনা তৈরী বোধহয় সত্যাগ্রহের আঙ্গিকে নেই। আমরা শুধু এই পরিকল্পনাই করতে পারি যে, আমরা আরো বেশি করে সুতো কাটব, আর অমনি সব হৃদয়-আলোড়নকারী কাজ করব। কিন্তু তুমি কি এই নিয়ে খুশি থাকবে? ওয়ার্কিং কমিটিতে এমন অবিরাম লড়াইয়ের পর তুমি কংগ্রেসী সূচীতে যে সব জিনিস যোগ করে দিয়েছিলে, কার্যতঃ কংগ্রেস কমিটিগুলির গণতন্ত্রীকরণ, গণ-সংযোগ, মুসলিম-সংযোগ—দাস সংবিধানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ—সেসব এখন শিকেয় তোলা রয়েছে। অবশ্য, একটু রুপোলী রেখাও আছে—সেটি হচ্ছে দেশীয় রাজ্যগুলিতে জাগরণ—এবং এটা আশাপ্রদ যে তুমি এ বিষয়ে কিছুটা মনোযোগ দিতে ইচ্ছুক। কিন্তু অন্যান্য ব্যাপারগুলিতে তোমার আরো মনোযোগ দেওয়া দরকার।

২৩শে নভেম্বর আশা করি কালিকট ছাড়ব এবং ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে বিহারে পৌঁছব।

শ্রদ্ধাসহ

তোমার স্নেহের
জয়প্রকাশ

২৩৭ মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক লিখিত

সেবাগ্রাম
২৪শে নভেম্বর, ১৯৩৮

প্রিয় জওহরলাল,

তোমার চিঠি পেয়েছি। জানি, একবার কাজে লাগলে, তুমি আর তোমার সময়ের মালিক থাকবে না। আমি যা পাই, তাতেই খুশি হব।

এই পত্রখানি দূত মারফৎ গুরুদেবের কাছ থেকে এসেছে। আমার ব্যক্তিগত মত জানিয়ে উত্তর দিয়েছি যে, বাংলার দূষিত আবহাওয়া দূর করতে হলে সভাপতিত্বের কাজ থেকে তাঁকে মুক্ত রাখা প্রয়োজন। আমার সন্দেহ নেই যে গুরুদেব তোমাকে সোজাসুজি চিঠি লিখবেন, নয় তো তোমার সঙ্গে আলাপ করবেন। তুমি তোমার নিজের মত জানাবে।

আশা করি, এই ভ্রমণে ইন্দুর শরীর খারাপ হয়নি।
ভালবাসা নিয়ো।

বাপু

২৩৮ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক লিখিত

শান্তিনিকেতন, বাংলা
২৮শে নভেম্বর, ১৯৩৮

প্রিয় জওহরলাল,

বিশেষ কোন পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা বা কোন অনুরোধ করার জন্য তোমাকে এসে দেখা করতে বলিনি। আমি কেবল বাংলা সম্পর্কে তোমার মতামত জানতে চেয়েছিলাম, তার বর্তমান দশা তো আমাকে বিমূঢ় এবং হতাশ করছে। আমার প্রদেশটি চতুর, কিন্তু নীতিবোধের দিক দিয়ে অশিক্ষিত এবং প্রতিবেশীর প্রতি তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যকারী। তার খেয়ালীপনায় একটু বাধা পড়লে ভয়ংকর হিস্টিরিয়া দেখা দেয়। তার দুর্বলতার খবর আমি রাখি কিন্তু তার অধোগতির নিয়তিতে আমি তো মনকে নিরাসক্ত করে রাখতে পারিনে, বা তা নিশ্চেষ্ট হয়ে মেনে নিতেও পারিনে। কিন্তু আমার নিজের বিশেষ কাজে স্থির হয়ে বসতে আমি সম্পূর্ণ ইচ্ছুক এবং তোমাদের কংগ্রেসী সংস্থাকে যা সে উচিত মনে করে—তার (বাংলার) প্রতি তেমনি ব্যবহার করবার জন্য ছেড়ে দিচ্ছি। একজন সর্দার মজুর মানুষ হিসেবে আদর্শ না হতে পারে, কিন্তু মিস্ত্রী হিসেবে দক্ষ হলে ঢিল স্ক্রুপ আটো করা আর তাকে যে অংশগুলো বাধা দেবে সেগুলো করাত-কাটা করে বাতিল করে দেবার ব্যাপারে ব্যক্তিগত শক্তিতে আমি স্বয়ং বিশ্বাসী। যাহোক, আমি তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাই, আরো বেশি চাই তোমার কথা শুনতে, যদিও এতে কাজ কিছু নাও হতে পারে। আসল কথা এই যে, তোমার সঙ্গে দেখা করতে চাই, কিন্তু তোমার ব্যয় করার মতো সময় পাওয়া অবধি তা সবুর করতে পারে।

ইন্দিরার স্বাস্থ্যের গতিক দেখে আমি উদ্বিগ্ন। আশা করি শীতের ক'মাস ভারতবাস তার পক্ষে ভাল হবে।

তোমার প্রীতার্থী
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৩৯ অনিলকুমার চন্দ কর্তৃক লিখিত

শান্তিনিকেতন, বাংলা
২৮শে নভেম্বর, ১৯৩৮

প্রিয় পণ্ডিতজী,

আজ আবার গুরুদেব আপনাকে চিঠি লিখেছেন। এটা আমাকে লেখা আপনার চিঠির মোটামুটি জবাব বলা যায়, কিন্তু তাঁর চিঠিতে আপনি যে খুব বেশি কিছু জানতে পারবেন, আমি সে সম্পর্কে নিশ্চিত নই।

তিনি ডাক্তার সাহার যুক্তিযুক্ত পরিকল্পনা দ্বারা আকৃষ্ট, এবং কমিটির কাছ থেকে অনেক আশা করছেন। আপনি অন্য কাজ নেবার আগেই তিনি আপনার সঙ্গে কথা বলতে চান, পাছে ঘটনার তাগিদে আপনি পরিকল্পনা কমিটির কাজ থেকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। এইটেই তাঁর আপনার সঙ্গে দেখা করার ব্যাকুলতার প্রধান কারণ।

সামনের বছরে তিনি একজন 'আধুনিকবাদী' কংগ্রেসী রাষ্ট্রপতি চান, যাতে করে বিবরণী শেষ হলে অখিল ভারত কংগ্রেস দ্বারা সেটি সাগ্রহে স্বীকৃত হবে, শুধু-

মাত্র শিকেয় তোলা থাকবে না। তাঁর এবং আমাদের সকলের মতে—আপনি এবং সুভাষবাবু—মাত্র দুটি খাঁটি আধুনিকবাদী উচ্চ অধিনায়কদের মধ্যে আছেন। আপনি পরিকল্পনা কমিটির সভাপতি হওয়ায় আপনার সক্রিয় সহযোগিতা এরই মধ্যে পাওয়া গেছে, তাই তিনি সুভাষবাবুকে আবার রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত দেখতে চান। আশা করি—আমি আমার বিশ্বাস ভঙ্গ করছিনে—এবং আপনি হয়ত এরই মধ্যে জেনে গেছেন, বা শীঘ্রই নিশ্চিত জানতে পারবেন যে, তিনি এই সেদিন এ সম্পর্কে গান্ধিজীকে চিঠি লিখেছেন। এবং যদি আপনার দেখা পান, খুব সম্ভবতঃ সুভাষবাবুকে পুনঃ নির্বাচিত করায় সাহায্য চাইবেন। এইটে দোসরা নম্বর কারণ। কিন্তু এসব ছাড়াও, আপনার সঙ্গে তিনি শুধু সাক্ষাৎকারের আনন্দেই দেখা করতে চান, আপনার সঙ্গে আলাপ করাও তাঁর বাসনা। কারণ, আপনি তাঁর খুবই প্রিয়।

তিনি আমাকে বলেছেন, এখানে আসার জন্য আপনি যেন কোনক্রমেই আপনার কার্যসূচী ওলট-পালট করে না ফেলেন—কিন্তু আপনার তাড়াতাড়ি যখনি সুবিধে হবে তখনি আসবেন। আপনার আসায় তিনি আনন্দিত হবেন, কিন্তু আপনার নিজের কাজ ও কংগ্রেসের দাবিকে পয়লা আসন দিতে হবে।

ইন্দিরা কেমন আছে? একটু বিশ্রামের জন্য এখানে পাঠিয়ে দিন না? এর চেয়ে ভাল আর কি চাইব।

আন্তরিক শ্রদ্ধাসহ

আপনার
অনিল

২৪০ জুয়ান নেগ্রিন লোপেৎস্ কর্তৃক লিখিত

[১৯৩৮ এর গ্রীষ্মের প্রথম দিকে, রিপাব্লিকান গভর্ণমেণ্টের আমন্ত্রণে আমি সামান্য কিছুদিনের জন্য বার্সেলোনায় (স্পেনে) যাই। তখন সেখানে গৃহ-যুদ্ধ চলছে। ফিরে এসে মহাত্মা গান্ধীকে আমার যাওয়ার কথা লিখি, এবং আমার অনুরোধে তিনি রিপাব্লিকান সরকারের প্রধানমন্ত্রীকে একখানি চিঠি পাঠান, সেখানা আমি পাঠিয়ে দিই।]

জুয়ান নেগ্রিন লোপেৎস্

মন্ত্রীসভার সভাপতি এবং
জাতীয় রক্ষণ দপ্তরের মন্ত্রী

বার্সেলোনা, (স্পেন)
২৬শে নভেম্বর, ১৯৩৮

মিঃ জওহরলাল নেহরু
অরমণ্ড হাউস, সেণ্ট জেমস্ স্ট্রীট
লণ্ডন, এস, ডবলিউ—এক

প্রিয় মিঃ নেহরু,

এর পূর্বে আপনার ১১ই তারিখের স্বাগত সম্ভাষণপূর্ণ পত্রখানির উত্তর দিতে না পেরে আমি দুঃখিত। আমি আপনাকে এইটি, এবং আপনি মহাত্মার যে চিঠিখানি ভিতরে দিয়েছেন, তার জন্য ধন্যবাদ জানাই।

আমি তাঁর চিঠির উত্তর এই সঙ্গে পাঠাতে চাই, আপনি অনুগ্রহ করে তাঁকে পাঠিয়ে দেবেন, এই আমার ভিক্ষা।

এই দেশে অল্পকালের ভ্রমণে আপনার যে এত ভাল ধারণা সংগ্রহ করেছেন, এর

জন্য আমি আনন্দিত। আমাদের জনগণের প্রতি আপনি যে সহৃদয় সম্ভাষণ জ্ঞাপন এবং আমাদের সাফল্যের শুভ কামনা করছেন সেইজন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

আপনি তো নিজেই দেখেছেন, কি অসম বাধার বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রাম করতে হচ্ছে। শুধু গণ তন্ত্রের প্রকাশ্য শত্রুর বিরুদ্ধেই যুদ্ধ তা নয়, দুর্ভাগ্যবশত যাঁরা আমাদের বন্ধু বলে ভান করেন, তাঁদের দ্বারাও বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছি।

আপনার সহানুভূতির সদয়বাণী এবং প্রেরণার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ। আমাকে বিশ্বাস করুন।

আপনার অতি বিশ্বাসভাজন
জে. নেগ্রিন
প্রধান মন্ত্রী

২৪১ জুয়ান নেগ্রিন লোপেৎস্ কর্তৃক মহাত্মা গান্ধীকে লিখিত

মন্ত্রীসভার সভাপতি এবং জাতীয়
রক্ষা-দপ্তরের মন্ত্রী

জুয়ান নেগ্রিন লোপেৎস্
বার্সেলোনা
২৬শে নভেম্বর, ১৯৩৮

মহাত্মা গান্ধী
সেবাগ্রাম, ওয়ার্ধা, ভারতবর্ষ
প্রিয় সুহৃদ,

আমাদের প্রিয় বন্ধু নেহরুর মারফৎ প্রেরিত আপনার ৪ঠা তারিখের পত্র অত্যন্ত বিলম্বে পেয়েছি। এই জন্যই এর পূর্বে উত্তর দেবার সৌভাগ্য হয় নি, আশা করি আপনি তা ক্ষমা করবেন।

আমাদের প্রিয় জন্মভূমির স্বাধীনতার এই কঠোর সংগ্রামে আপনি আমাদের জনগণের প্রতি যে সহানুভূতি ও উৎসাহের সহৃদয় বাণী ব্যক্ত করেছেন, তার জন্যে আমার সবচেয়ে আন্তরিক ধন্যবাদ আপনাকে জানাতে চাই।

আপনাদের মত ব্যক্তি আমাদের দিকে এবং আমাদের সংগ্রামের ন্যায্য দাবী সম্বন্ধে পূর্ণমাত্রায় অবহিত, একথা জেনেও মহা সন্তোষ হয়। আপনার দেশবাসী যে স্পেনের ঘটনাবলী সহানুভূতিময় কৌতূহলভরে দেখছে একথা জেনেও আমি আনন্দিত। আপনার পত্রের এই সহৃদয় বাণী এবং শুভাকাঙ্ক্ষা আমাদের সরকার, বীর সেনাবাহিনী এবং আমাদের জনগণকে আমি সানন্দে জানাব।

তাদের পক্ষ থেকে পরম এবং আমার নিজের অতি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। প্রিয় মহাত্মা গান্ধী, বিশ্বাস করুন, আমি চিরদিনই আপনার অতি বিশ্বস্ত হয়ে থাকব।

জে. নেগ্রিন

২৪২ এড্ওয়ার্ড টম্সন কর্তৃক লিখিত

বোয়ার্স হীল, অক্সফোর্ড
২৮শে নভেম্বর, ১৯৩৮

প্রিয় জওহরলাল

ভিতরের চিঠিখানি একজন ব্রিটিশ আইনজীবীর লেখা : উন্নত চরিত্রের মানুষ তিনি, সাক্ষ্য বিষয়ক ব্যাপারেও ওয়াকিবহাল। আমি খোঁজখবর নিয়ে খুশী হয়েছি যে, তাঁর চিঠিখানি তথ্য হিসেবে মেনে নেওয়া যেতে পারে। কোন লিবারাল

বা লেবার পত্র-পত্রিকা এটি ছাপবে না, কোন লিবারাল বা লেবার পার্লামেণ্ট সদস্য এই সম্পর্কে প্রশ্নও তুলবেন না। আমাদের সব আন্তরিক বন্ধুরা যারা নির্যাতিতের দরদী তাঁরা সবাই ইহুদীবাদী, অন্য পক্ষের যে-কোনো ব্যাপারে তাঁরা চোখ বুজে থাকেন। মানচেস্টার গার্ডিয়ানও ইহুদী ব্যাপার ছাড়া আর কিছু ছাপে না। আরবরা এখন ভীষণ সংকটে পড়েছে, কারণ ইহুদীদের প্রতি নাৎসী নির্যাতনে, সবাই ইহুদী-বিরোধী হতে অনিচ্ছুক আর তারাও এই সুযোগ নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র থেকে (আমি বলতে ব্যথা পাচ্ছি যে, এমন কি রুজভেল্টও এক ভাষণ দিয়েছেন, যে প্যালেস্টাইনের দরজা ইহুদীদের কাছে খুলে দেওয়া হোক) চতুর্গুণ চাপ দেবার কথা বলছে এবং নিজেদের দাবী বাড়িয়ে তুলছে।

এর ট্রাজেডি এই যে, আমেরিকা আর আমাদের বামপন্থীদের চাপ না থাকলে এই সরকার খারাপ হলেও প্যালেস্টাইনের ভালই করত!

আমি এই চিঠি পাঠাচ্ছি, যার সত্যতা সম্পর্কে আমি সন্তুষ্ট। কোনো ইঙ্গিত দেওয়া আমার কাজ নয়, কিন্তু (১) জাতীয় কংগ্রেস এই বড়দিনে যদি আরব পক্ষ জোরে সমর্থন করতে পারে এবং স্পষ্টভাবে এখানে আমরা কিছু লোক যা বলছি, তা বলতে পারে যে, ভারত প্যালেস্টাইনে এই প্রতিপক্ষীয় সন্ত্রাসবাদে বিমুখ হয়ে আছে, তাহলে হয়ত এই নিদারুণভাবে নির্যাতিত ক্ষুদ্র জাতিকে সাহায্য করা হবে (প্যালেস্টাইনে তৃতীয় ডিগ্রী আর নির্যাতনের নানা উপায়ের কাহিনী শোনা যাচ্ছে, সেগুলি ভারতীয় পুলিশের বিরুদ্ধে বর্ণিত কাহিনীরই কথা স্পষ্টই মনে করিয়ে দেয়)। (২) মুসলিম লীগকে দিয়েও কি এমনি প্রস্তাব পাশ করাবার কোন উপায় আছে? আমাদের জনসাধারণ মুসলিম সহানুভূতি হারাবার ভয়ে বড়ই সন্ত্রস্ত। আমি দুখানি নকল চিঠির ভিতরে পাঠাচ্ছি, যাতে একখানি মুসলমানদের কাছে পাঠানো যায়। এখন ইক্‌বাল মৃত, আকবর হায়দারি ছাড়া অন্য কোনো বিশিষ্ট মুসলমানকে আমি চিনি না। কিন্তু তিনি কোন কিছু করবেন না।

ভাবছি, এ-চিঠি তোমার কাছে পেঁাছবে কিনা। সন্দেহ নিয়েই পাঠাচ্ছি। যদি পেঁাছয় তো জানিয়ো।

চোখে অস্ত্রোপচারের জন্য আমার স্ত্রী লণ্ডনে এসেছিলেন, কিন্তু অস্ত্রোপচার ভাল হয় নি। কসীনিকা সরে যায়, দ্বিতীয়বার অস্ত্রোপচার দরকার হয়ে পড়ে। খারাপ সময় যাচ্ছে তাঁর, বড় ব্যথা। এখনো নার্সিং হোমে আছেন, আস্তে আস্তে ভাল হচ্ছেন।

বড়দিন আর নূতন বছরের শুভ-কামনা সহ

তোমার চিরদিনের
এড্‌ওয়ার্ড টমসন ই. এফ. আই
(ভারত থেকে অবসরপ্রাপ্ত)

২৪৩ মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক লিখিত

সেবাগ্রাম, ওয়ার্ধা
৩০শে নভেম্বর, ১৯৩৮

প্রিয় জওহরলাল,

চীনা বন্ধুরা এসে পাঁচ মিনিটের জায়গায় প’য়ত্রিশ মিনিট নিয়ে নিলেন। অবশেষে, যতদূর সম্ভব ভদ্রভাবেই বলতে হ’ল যে, তাঁরা তাঁদের সময়ের সাতগুণ বেশি থেকেছেন।

এই তোমার বড় লাটের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের আগাথা কৃত বিবরণীর নকলখানা।

আমার বাণী এই ছিল যে, তিনি আমাকে যেন ইংরেজ বন্ধু বলেই মনে করেন, রাজনীতির সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক ছিল না।

আশা করি, সুভাষ সম্পর্কে গুরুদেবের চিঠিসহ আমার চিঠিখানি যথাসময়ে পেয়েছিলে।

আশা করি, কাজ করে করে নিজেকে মেরে ফেলছ না, এবং ইন্দু ভালই আছে।

স্বরূপ যে শক্ত কাজ করছে, তার থেকে তাকে রেহাই দেওয়া উচিত। তার ভাঙা শরীর আবার গড়ে তুলতে হবে।

ভালবাসা নিয়ো

বাপু

২৪৪ মুস্তাফা এল্ নাহাস কর্তৃক লিখিত

হেলিওপোলিস্

১২।১২।১৯৩৮

প্রিয় বন্ধু,

আপনার যাত্রার পূর্বে পোর্ট-সৈয়দ থেকে লেখা সুন্দর চিঠিখানি আমাকে গভীর-ভাবে স্পর্শ করেছে। যদি আমাদের মধ্যে অতি অল্পকাল অবস্থানের ফলে আপনি এক সুখময় স্মৃতি নিয়ে গিয়ে থাকেন, তবে বিশ্বাস করুন, আপনার সম্বন্ধে সবচেয়ে সুখস্মৃতি রক্ষাকারী বন্ধুদেরই কেবল রেখে গিয়েছেন।

আপনার মিশরে অবস্থানের বিবরণ সম্বলিত কতকগুলি পত্রিকা আপনাকে পাঠালাম। স্বদেশ প্রেমিক মিশরীয়রা আপনার সম্বন্ধে কি উচ্চ ধারণা পোষণ করেন আর যে সম্মানের চক্ষে আপনাকে দেখেন এতে তার চিহ্ন পাবেন।

বর্তমানে যে প্রশ্ন নিয়ে আমরা ব্যস্ত তার পরিস্ফুট রূপ দেবার চেষ্টা করছি। এতে আমার মনে হয়, আমাদের ব্যক্তিগত মতামতের স্বাধীনতা বজায় রেখেও, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রামের সাধারণ শর্তগুলি সম্বন্ধে পরস্পরের মধ্যে সংবাদ আদান-প্রদানের সহায়ক হবে। যতই আমরা অগ্রসর হচ্ছি ততই জগতের সাম্রাজ্যবাদ-প্রবণতার কুফলগুলি পরিস্ফুট হচ্ছে, যা দুঃখের বিষয় বর্তমান সংকট দুর্দশার অন্যতম মূল কারণ।

আপনার যে বইখানি পোর্ট-সৈয়দ থেকে ম. দিয়ালদাস আমার ঠিকানায় পাঠিয়েছেন, তার জন্য ধন্যবাদ। এটি পড়ে আপনার দুঃসাহসী জীবনের প্রতি আমার শ্রদ্ধা বৃদ্ধি পেল।

আশা করি অল্পদিনের মধ্যেই আমাদের ওয়াফ্দ্ কংগ্রেসের অধিবেশনের নির্দিষ্ট দিনটি আপনাকে জানাতে পারব। এই অধিবেশনে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলির আলোচনা হবে।

আমি দুঃখিত যে, আপনার ভগ্নীর শরীরের অবস্থার জন্য তাঁর আলেকজান্দ্রিয়া অবস্থানকালে আমাদের বন্ধুবর্গ তাঁকে গভীর শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের যে কর্তব্য স্থির করেছিলেন তার অতি সামান্য অংশই তাঁকে জ্ঞাপন করবার সৌভাগ্য তাঁদের হয়েছিল। আর প্রিয় বন্ধু, আপনি আমার আন্তরিক বন্ধুত্ব সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত থাকুন। আপনাকে সখ্য ও আপনার চমৎকার মেয়েটিকে আমাদের ভালবাসা জানাতে আমার স্ত্রী আমার সঙ্গে যোগ দিচ্ছেন।

আপনার বিশ্বস্ত

এম্ নাহাস

পুঃ আপনাদের যাত্রার দিনে তোলা কয়েকটি ফটোগ্রাফও এই সঙ্গে পাঠালাম।

এম্ এন্

২৪৫ কামিল এল চাড্রিচী কর্তৃক লিখিত

মিঃ জওহরলাল নেহরুকে লেখা কামিল এল চাড্রিচীর চিঠির অনুবাদ

বাগদাদ

১৩ই ডিসেম্বর, ১৯৩৮

প্রিয় মিঃ নেহরু,

বর্তমান সভ্যতার অন্যতম মহান আশীর্বাদ বোধহয় এই যে, যাঁদের সঙ্গে ব্যক্তিগত যোগাযোগ নেই, তাঁদের সঙ্গেও মানুষ ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব স্থাপন করতে পারে।

আপনার দেশ সেই সুদূর অতীতকাল থেকেই সত্যই মহান, প্রকৃতি তাকে অফুরন্ত সম্পদ দান করেছেন। যদিও আজ যেমন তার বুদ্ধিবৃত্তির বীজে দেশের পক্ষে উপযুক্ত মানুষের পূর্ণ বিকাশ ঘটেছে, সভ্যতার ঊষাকাল থেকে এমন মহত্ব তো তার দেখা যায়নি। বিশেষ করে আমার এবং আমার দেশের ভ্রাতাগণের কল্পনা সার্থক করে আপনার মতো যে অপূর্ব ব্যক্তিত্ব প্রাচ্যের দিগন্তে উদয় হয়েছে—সে সম্পর্কে তো একথা প্রযোজ্যই বটে!

যতদিন ভারত অবিরাম ধীমান মানুষ প্রসব করবে, পৃথিবীকে মানবজাতির ইতিহাসের অপূর্ব আহূতির উদাহরণ যোগাবে, ততদিন তো আমি ভারতের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে দুঃখবাদী হব না।

আপনাদের এই সংগ্রাম আমরা সর্বান্তকরণে তারিফ করি এবং সামান্যভাবেও এর অংশ গ্রহণ করবার সুযোগ পেতে আমাদের বাসনা, কারণ আমরা তো একই দশায় আছি। সাম্রাজ্যবাদ এবং শোষণের বিরুদ্ধে অভিযানের যথার্থ প্রয়াস তো পৃথক পৃথক অংশে ভাগ করে দেখা উচিত নয়। বরং ভৌগলিক সীমানা বা রাজনীতিক বাধা তাকে দাবিয়ে রাখতে পারে না।

আরব দুনিয়ার এই অংশে আমরা যারা আছি, তারা নিশ্চিতভাবে জানাই যে, আপনাদের মহান সংগ্রাম সম্পর্কে জ্ঞান আমাদের বড়ই কম। মিঃ ইউসুফ মেহেরালীর ভিতরে আমাদের দেশে অত্যন্ত অল্প দিন থাকা ছাড়া অন্য কোন ত্রুটি আমরা দেখতে পাই নি, তিনি আমাকে আপনাদের ন্যায়সংগত দাবীর সংবাদ দিয়ে খুশী করেন। আপনাদের আন্দোলনের সঙ্গে আমরা যোগাযোগ খুবই রাখতে চাই, তার সঙ্গে পরিচিতও হতে চাই। ব্যক্তিগতভাবে আমরা আপনার এবং আপনারই মত অন্যান্য বিশিষ্ট ভারতীয়ের সঙ্গে পরিচিত হতে চাই। আপনি কি ইরাক ভ্রমণের কথা কখনো ভাবেন না, যে দেশটা আপনার কাছেই, যেমন কিছুদিন পূর্বে মিশর ভ্রমণে এসেছিলেন? আমি যদি বলি, আরব দুনিয়ার এই অংশ সম্পর্কে আপনার কিছু জানা উচিত, আমার মনে হয় না, আপনি আমার কথার বিরোধিতা করবেন; আবার তেমনি সমানভাবেই আপনাদের বিরাট দেশ, তার জাতীয় এবং মানবতাবাদী প্রচেষ্টা সম্পর্কে যতটা পারা যায় জানাও আমাদের কর্তব্য।

আমি নিশ্চয় আশা করি মিঃ মেহেরালীর সংক্ষিপ্ত ভ্রমণে আপনার এবং আপনাদের আন্দোলনের সঙ্গে যোগাযোগের সূত্রপাত সূচিত করেছে, এবং আমরা তো মহা কৌতূহলে আন্দোলনের ধারা অনুসরণ করছি।

আপনাদের সাফল্যের জন্য আমার শুভ-কামনা গ্রহণ করতে বলে আমি পত্রখানি শেষ করব।

আপনার বিশ্বস্ত
কামিল এল চাড্রিচী
সম্পাদক
দি পিপল্‌স্ রিফর্ম পার্টি

২৪৬ এস্‌. রাধাকৃষ্ণ কর্তৃক লিখিত

লণ্ডন
৩০শে ডিসেম্বর, ১৯৩৮

প্রিয় মিঃ নেহরু,

ভারতে আপনার দেখা পাই নি বলে দুঃখিত। দু-একটা কথা আপনাকে বলতে চেয়েছিলাম।

(১) আপনি তো জানেন, গান্ধীজীর সত্তর বছর পূর্ণ হচ্ছে, এবং আমি একখানা বই বার করবার প্রস্তাব করছি। শুধু সম্ভাষণ নয়, এতে তাঁর জীবনী এবং কাজ সম্পর্কে পৃথিবীর সবচেয়ে মহান ভাবুক এবং নেতাদের প্রবন্ধ এবং মন্তব্য থাকবে, এবং সেখানি তাঁর পরবর্তী জন্মদিনে তাঁকে উপহার দেওয়া হবে। অক্সফোর্ডে পৌঁছেই যাঁদের কাছে আমন্ত্রণ পাঠানো হয়েছে, আমি তাঁদের তালিকা আপনাকে পাঠাচ্ছি। আপনি যে-কোনো নাম তালিকায় যোগ করে দিয়ে আমাকে জানাতে পারেন। আপনার কি মনে হয় দেশীয় রাজ্যের কোন রাজাকে আমরা বলতে পারি? আমি এবিষয়ে চিন্তিত। আমাকে দক্ষিণ আফ্রিকায় যেতে হবে, স্মাটস্‌ আর রাম রাওকে ঈস্টারের ছুটিতে সে-বন্দোবস্ত করতে বলেছি।

দক্ষিণ ক্যালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৩৯ সালের ১৯শে সেপ্টেম্বর থেকে ৮ই ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়ের জন্য আমি নিযুক্ত আছি, কিন্তু এই গান্ধী উপহারের জন্য আমাকে তা স্থগিত রাখতে হবে। সভা প্রভৃতির ব্যবস্থার জন্য আপনার উপর নির্ভর করে আছি। উপলক্ষ্য অনুযায়ী যাতে বইখানি যোগ্য হয়, তার জন্য আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করব। ওয়ার্ধায় পিয়ারীলালের সঙ্গে কথা বলেছি, তিনি বলেন, এতে আপত্তি উঠতে পারে না। হিন্দু পঞ্জিকা মতে আমরা বইখানি বার করব।

অবশ্য, আপনাকে হাজার খানেক শব্দ লিখতে হবে, এবং ১৯৩৯ সালের মার্চের শেষে আপনার লেখাটি আমার পেলেই চলবে।

(২) গান্ধীজীর কাছ থেকেই সংগ্রহ করেছিলাম যে, ভারত শাসন আইনে যে ফেডারেশনের মনস্থ করা হয়েছে, তাতে তাঁর প্রধান আপত্তি এই যে, সামন্ততান্ত্রিক দেশীয় নরপতিবৃন্দ আর গণতান্ত্রিক প্রদেশগুলি নিয়ে এক বেখাপ্পা শাসনযন্ত্র স্থাপিত হবে। দেশীয় রাজারা ফেডারেশনে যোগ দেওয়ার আগে দায়িত্বশীল সরকার স্থাপন করুন, তিনি এই কথায়ই জোর দিচ্ছেন। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, যদি দেশীয় রাজন্যবর্গের প্রতিনিধিদের বেশির ভাগ ($\frac{1}{2}+১$) জনসভা দ্বারা নির্বাচিত হন, তাহলে তাঁর আপত্তি আছে কি না। তিনি তা পছন্দ করেন না। আপনি কি মনে করেন?

অবশ্য ব্রিটিশ সরকারকে একথা স্পষ্ট করেই বলতে হবে যে, কংগ্রেস যখন এর বর্তমান রূপের বিরোধী, তখন ভারতবাসীর উপর তাঁদের ফেডারেশন চাপাবার কোনো অভিসন্ধিই নেই।

১৪ই জানুয়ারী পর্যন্ত আমি ইম্পিরিয়াল হোটেলে থাকব, অক্সফোর্ডে যখন যাব সেখানে আমার ঠিকানা হবে ১৫ বার্ডওয়েল রোড।

আপনার অতি বিশ্বস্ত
রাধাকৃষ্ণ

সভায় সভাপতিত্ব করতে ঠাকুরকে আমাদের চাই।

২৪৭ স্যার স্টাফোর্ড ক্রীপস্ কর্তৃক লিখিত

লণ্ডন
৩রা ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৯

প্রিয় মিঃ নেহরু,

আপনার দীর্ঘ এবং সুন্দর চিঠিখানি পেয়ে কি যে খুশী হলাম আপনাকে বলে বোঝাতে পারব না। আমার মনে হয়েছে, আমরা উভয়েই এত ব্যস্ত বলে আমাদের যোগাযোগ নষ্ট হবার ভয় আছে। এবং ভারতের পরিস্থিতি সম্পর্কে আপনার বিবরণ আমার পক্ষে সবচেয়ে মূল্যবান, যদিও এই মুহূর্তে, আপনি বোধহয় সংবাদপত্রে দেখেছেন, আমি দেশের সমস্যা আর লেবার পার্টির আভ্যন্তরীণ সংগ্রামে এমন ডুবে গেছি যে, ভারতীয় এবং ঔপনিবেশিক ব্যাপারে খুব-একটা মন দেওয়া শক্ত হয়ে উঠেছে।

যাহোক, লণ্ডনে ভারতের স্বাধীনতা দিবসের সভায় বলতে পেরে আমি খুশী হয়েছি।

এখানে অবস্থা উত্তরোত্তর সংকটাপন্ন হয়ে উঠছে, এবং লেবার পার্টির জাতীয় সরকারের দিকে ঝুঁকে পড়বার ক্রমবর্ধমান ইচ্ছা দেখা যাচ্ছে। আমি এরই বিরুদ্ধে লড়াই চালাচ্ছি এবং অন্যান্য বিরোধী দলগুলির সম্মেলনে একটি অন্যতর সমাবেশ সৃষ্টি করার আমি পক্ষে। আমি কি করছি বিস্তারিত বলার দরকার নেই, কেননা আপনি ট্রিবিউনেই সবকিছু পাবেন, কিন্তু এটা নিঃসন্দেহ যে দেশে যথেষ্ট সমর্থন মিলছে। যদিও আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে একথা বলতে পারব না, আমার আশা যে, কয়েক মাসের মধ্যেই সত্যই কিছু একটা করে ফেলতে পারব।

বেশি লিখতে পারছি নে বলে ক্ষমা চাইছি, এর কারণ, আমি এখন ভীষণ ব্যস্ত।

আপনার বিশ্বস্ত
আর. স্টাফোর্ড ক্রীপ্স্

২৪৮ মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক লিখিত

সেবাগ্রাম, ওয়ার্ধা
৩রা ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৯

প্রিয় জওহরলাল,

নির্বাচনে যেভাবে লড়াই হ'ল, তারপরে আমি অনুভব করি যে, আসন্ন কংগ্রেস অধিবেশনে অনুপস্থিত থেকে দেশের সেবা করব। তাছাড়া, আমার স্বাস্থ্যও বড় ভাল নয়। আমাকে তুমি সাহায্য করবে বলে মনে করি। দয়া করে আমাকে যোগ দেবার জন্য পীড়াপীড়ি কোরো না।

আশা করি খালিতে বিশ্রাম করে তুমি আর ইন্দু ভালই আছ। ইন্দুর আমার কাছে চিঠি লেখা উচিত।

ভালবাসা নিও।

বাপু

২৪৯ সুভাষচন্দ্র বসুকে লিখিত

ব্যক্তিগত এবং গোপনীয়

এলাহাবাদ
৪ঠা ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৮

প্রিয় সুভাষ,

শান্তিনিকেতনে আমাদের ঘণ্টাখানেক বা তারও বেশি আলাপ হয়েছিল, আমার ভয় হচ্ছে ব্যাপারটা পরিষ্কার করে নিতে আমরা পারি নি। বাস্তবিকই

পারি নি, কেননা বহু সংশয় আছে আর এও জানি না ব্যাপারগুলি কি রূপ নেবে। আমাদের এইগুলির সম্প্রসারণের জন্য অপেক্ষা করতে হচ্ছে, আবার একই সঙ্গে এই সম্প্রসারণ আমাদের উপর, বিশেষ করে তোমার উপর নির্ভর করছে।

আমি যা তোমাকে বলেছিলাম, তোমার নির্বাচন প্রতিদ্বন্দ্বিতা কিছু মঙ্গল এবং কিছু ক্ষতি করেছে। আমি মঙ্গল দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু এর পরে যে অনিষ্ট আসবে সেই আমার ভয়। আমি এখনো মনে করি, খতিয়ে দেখলে এই বিশেষ বিরোধ এইভাবে না ঘটলেই ভাল হোত। কিন্তু সে তো এখন অতীতের কথা, আমাদের ভবিষ্যতের সম্মুখীন হতে হবে। এই ভবিষ্যতকে আমাদের ব্যাপক যুক্তি দিয়ে দেখতে হবে, ব্যক্তিত্বের নিরিখে দেখলে চলবে না। ব্যাপারগুলো আমরা যেমনটি আশা করেছিলাম, তেমনি রূপ নেয় নি বলে আমাদের কারো পক্ষেই বিরক্ত হওয়াটা সঙ্গত হবে না। যা কিছুই ঘটুক, আমাদের আদর্শের জন্য নিজেদের শ্রেষ্ঠ যা কিছু তা দান করতে হবে। এটা মেনে নিলেও ঠিক পথ খুঁজে পাওয়া সহজ নয় এবং আমার মন ভবিষ্যৎ সম্পর্কে উদ্বিগ্ন।

প্রথমেই আমাদের পরস্পরের মতামত যতটা সম্ভব পুরোপুরিই বুঝতে হবে। এটা যদি করা যায়, তাহলে প্রস্তাব গঠন করা তো অতি সহজ। কিন্তু অপর জনের উদ্দেশ্য কি, এ সম্পর্কে যদি আমাদের মন বিরোধ আর সন্দেহে পূর্ণ থাকে, তাহলে ভবিষ্যৎকে রূপ দেওয়া তো সহজ ব্যাপার নয়। এই গত কয়েক বছরে আমি গান্ধীজী, বল্লভভাই এবং তাঁর মতাবলম্বীদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে এসেছি। আমাদের মধ্যে বারংবার এবং দীর্ঘ আলোচনাও হয়েছে, আমরা পরস্পরকে যদিও দৃঢ় প্রত্যয় করাতে পারি নি, কিন্তু বেশ খানিকটা প্রভাবিত করেছি, আর আমার মনে হয়, পরস্পরকে আমরা অনেকখানি চিনতে পেরেছি। অনেক দিন আগে, ১৯৩৩ সালে, জেল থেকে খালাস পেয়েই আমি পুণায় গান্ধীজীকে দেখতে যাই, তিনি তখন প্রায়োপবেশনের ধকল থেকে সুস্থ হয়ে উঠছেন। আমাদের সংগ্রামের নানাদিক নিয়ে তখন দীর্ঘ আলাপ চলে, এবং পরে চিঠিপত্রেরও আদান-প্রদান হয়, যা পরে প্রকাশিত হয়েছে। ঐ পত্রগুলি এবং আলাপ-আলোচনায় আমাদের স্বভাবগত এবং মূলগত পার্থক্য প্রকাশিত হয়, আবার আমাদের মধ্যে বহু ঐক্যও দেখা যায়। তারপর থেকে গোপনে এবং ওয়ার্কিং কমিটিতে প্রায়ই আলাপ-আলোচনা চলেছে। কয়েকবারই আমার রাষ্ট্রপতি-পদ, এমন কি ওয়ার্কিং কমিটি ত্যাগ করবার উপক্রম হয়। কিন্তু এই ভেবে আমি বিরত হই যে, যখন ঐক্যই মূলতঃ দরকার, তখন এটা সংকটকেই তরান্বিত করবে। হয়তো আমার ভুল হয়েছিল।

এখন এই সংকট এমনভাবে এসে দেখা দিয়েছে যাকে দুর্ভাগ্যই বলা যায়। আমার নিজের কার্যপদ্ধতি স্থির করবার আগে তুমি কংগ্রেসকে কি তৈরী করতে, আর কি করাতে চাও—সে সম্পর্কে আমার কিছু ধারণা থাকা উচিত। আমি তো এ ব্যাপারে একেবারে অকূল পাথারে পড়েছি। বামপন্থী আর দক্ষিণপন্থী, ফেডারেশন প্রভৃতি নিয়ে বহু কথা হয়েছে, যতদূর মনে পড়ে যদিও তোমার রাষ্ট্রপতি থাকাকালীন ওয়ার্কিং কমিটিতে এই প্রশ্নগুলি-সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি নিয়ে কোন আলোচনা আমাদের হয় নি। জানি না, কাকে তুমি বামপন্থী আর কাকে দক্ষিণপন্থী বল। রাষ্ট্রপতি-পদের জন্য প্রতিযোগিতা করার সময়ে, যেভাবে তোমার বিবৃতিতে এই শব্দগুলি ব্যবহার করেছ, তাতে এই মনে হয়েছিল যে, গান্ধীজী আর ওয়ার্কিং কমিটিতে যাঁরা তাঁর গোষ্ঠীভুক্ত বলে বিবেচিত হন, তাঁরাই দক্ষিণপন্থী নেতৃবৃন্দ। তাঁদের বিরুদ্ধবাদীরা যাই হোন না কেন, তাঁরাই বামপন্থী। এটা আমার কাছে পুরোপুরিই ভুল বর্ণনা বলে মনে হয়। আমার

মনে হয় যে, তথাকথিত বামপন্থীদের অনেকেই তথাকথিত দক্ষিণপন্থীদের চেয়ে বেশী দক্ষিণ মতাবলম্বী। তীব্র ভাষা, সমালোচনার ক্ষমতা এবং পুরাতন কংগ্রেসী, নেতৃত্বকে আক্রমণেই রাজনীতিতে বামপন্থার পরীক্ষা হয় না। আমার মনে হয়, অদূর ভবিষ্যতে আমাদের একটি প্রধান বিপদ এই হবে যে, যোগ্য এবং দায়িত্বশীল পদে এমন মানুষেরা গিয়ে বসবে, যাদের কোন দায়িত্বজ্ঞান নেই বা যারা পরিস্থিতির সঠিক তাৎপর্য বুঝতে পারে না, আর উন্নত ধরণের বুদ্ধিবৃত্তির জন্যও তারা খ্যাত নয়। তারা যে পরিস্থিতির সৃষ্টি করবে, তাতে মহা প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হতে বাধ্য। আর তখন প্রকৃত বামপন্থীরা ভেসে যাবেন। চীনের উদাহরণ আমাদের সম্মুখে রয়েছে। যদি পারি তো আমি চাই না ভারত ঐ দুর্ভাগ্যের পথে চলুক।

আমার মনে হয়, বাম আর দক্ষিণ এই দুটি কথার ব্যবহারই সাধারণতঃ একেবারে ভুল এবং বিভ্রান্তকারী। এই শব্দগুলির বদলে যদি আমরা নীতির কথা বলতাম, বোধহয় তাই-ই ঢের ভালই হোত। তুমি কোন্ নীতির পক্ষে? ফেডারেশন-বিরোধী—বহুৎ আচ্ছা। আমার মনে হয়, ওয়ার্কিং কমিটির অধিকাংশ সদস্যই এই পক্ষে, এবং এই ব্যাপারে তাঁদের দুর্বলতা সম্পর্কে ইঙ্গিত করা তো শোভন নয়। ওয়ার্কিং কমিটিতে এই বিষয় নিয়ে পূর্ণ আলোচনা করা কি তোমার পক্ষে এর চেয়ে ভাল হোত না? এমন কি, এ বিষয়ে একটা প্রস্তাবও আনতে পারতে, তারপরে লক্ষ্য করতে তার প্রতিক্রিয়া। এটা ঠিকই যে, সহকর্মীদের সঙ্গে প্রথমে পুরোপুরি বিষয়টার আলোচনা না করে তাঁদের সবশুদ্ধু পিছনে হঠার জন্য দায়ী করা কচিৎ শোভন বলেই মনে হয়। তুমি যে ফেডারেশনের মন্ত্রীসভাগুলির এরই মধ্যে বিভেদের এক অদ্ভুত অভিযোগ করেছিলে, সে সম্পর্কে আমি যা বলেছিলাম, তার আর পুনরাবৃত্তি করতে চাইনে। অধিকাংশ লোকই এটা অবশ্যম্ভাবী ভেবে নিয়েছে যে, তোমার ওয়ার্কিং কমিটির সহকর্মীরাই দোষী!

তোমার মনে আছে, তোমার এবং ওয়ার্কিং কমিটির কাছে য়ুরোপ থেকে আমি দীর্ঘ সব বিবরণী পাঠিয়েছিলাম। আমাদের ফেডারেশন সম্পর্কে মত কি হওয়া উচিত সে সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছিলাম, আর নির্দেশ চেয়েছিলাম। তুমি কোন নির্দেশ পাঠাও নি, এমন কি প্রাপ্তিস্বীকারও কর নি। গান্ধীজী আমার প্রস্তাবের প্রণালী সম্বন্ধে একমত, আমি শুনেছি ওয়ার্কিং কমিটির অধিকাংশ সদস্যও তাই। আমি এখনো জানি না তোমার প্রতিক্রিয়া কি। কিন্তু আমাকে খবর দেওয়া ছাড়াও, তোমার পক্ষে এই বিষয় নিয়ে ওয়ার্কিং কমিটিতে তন্নতন্ন আলোচনা এবং এক না এক ভাবে সিদ্ধান্ত করার কি ঐটেই সুযোগ ছিল না? কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ এটি এবং অন্যান্য ব্যাপারে ওয়ার্কিং কমিটিতে তুমি পুরোদুরি নিষ্ক্রিয়ভাব নিয়ে বসে আছ, যদিও কখনো কখনো বাইরে তোমার মতামত তুমি প্রকাশ করেছ। তার ফলে, তুমি পরিচালনাকারী রাষ্ট্রপতির চেয়ে সভাপাল হিসেবেই কাজ করেছ বেশি।

গত বছরের মধ্যে এ আই সি সি কার্যালয়ের যথেষ্টই অবনতি হয়েছে। তুমি তো ওটি দেখও নি, তোমার কাছে প্রেরিত চিঠি এবং তারগুলিরও কচিৎ কখনো জবাব পাওয়া যায়। তার ফলে বহু অফিস-সংক্রান্ত কাজ অনির্দিষ্টকালের জন্য পড়ে আছে। ঠিক এই মুহূর্তে, যখন আমাদের প্রতিষ্ঠানের প্রতি সবচেয়ে বেশি দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন, তখন প্রধান দপ্তর আনাড়ীর মতোই কাজ করছে।

আমাদের দেশীয় রাজ্যগুলির সমস্যা আছে, হিন্দু-মুসলিম সমস্যা আছে, আর আছে কিষাণ আর মজদুর সমস্যা। এইগুলি সম্পর্কে বহু মত এবং বহু বিরোধ আছে। তোমার কি এ সম্পর্কে কোন নির্দিষ্ট মত আছে যা তোমার সহকর্মীদের

সঙ্গে মেলে না? বম্বে ট্রেড ডিসপিউট বিলের কথাই ধর। এত কতগুলি বিধান সম্পর্কে আমি একমত নই। আমি যদি এখানে থাকতাম, তাহলে সেগুলি পরিবর্তনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করতাম। তুমিও কি বিরোধী মতাবলম্বী নও, যদি তাই-ই হয়, সেগুলি বদলাবার জন্য চেষ্টা করেছিলে কি? বাংলা নিয়ে অনেকগুলি প্রদেশে, যে সাধারণ কৃষি পরিস্থিতি দেখা যায়, জানি না সে সম্পর্কে তোমার নির্দিষ্ট মত কি।

প্রাদেশিক কংগ্রেস সরকারগুলি দ্রুতবেগে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংকটের দিকে এগিয়ে চলেছে, এবং দেশীয় রাজ্যের আন্দোলনের প্রসার খুব সম্ভব মহা সংকটের পথে নিয়ে যাবে, আর তাতে প্রাদেশিক সরকারগুলি সহ আমরা সকলেই জড়িয়ে পড়ব। আমাদের কোন পথ গ্রহণ করতে হবে ভাবছ কি? বাংলায় তোমার যুক্ত মন্ত্রীসভা গঠনের ইচ্ছা, গঠনতান্ত্রিকতার পথে যাবার বিরুদ্ধে তোমার প্রতিবাদের সঙ্গে একরকম খাপই খায় না। সাধারণভাবে, এটা দক্ষিণপন্থী নীতি বলেই মনে হবে, পরিস্থিতি যখন দ্রুত ঘোরালো হয়ে উঠছে, তখন তো আরো হবে।

তারপরে আছে পররাষ্ট্র নীতি, তুমি তো জানো, এদিকে আমি যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে থাকি, বিশেষত আজকের এই অবস্থায়। আমি যতদূর জানি, তুমিও তাই দিয়ে থাক। কিন্তু আমি সঠিক জানি না, কোন্ নীতি তুমি গ্রহণ করবে বলে ঠিক করেছ। আমি গান্ধীজীর মত সাধারণ ভাবে জানি, তাঁর সঙ্গে সম্পূর্ণ একমতও নই, যদিও আন্তর্জাতিক সংকটের দুই কি তিন বছর আমরা একসঙ্গেই চলেছি এবং চলতেও পেরেছি। তিনিও আমার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত না হয়েও আমারটা প্রায়ই মেনেও নিয়েছেন।

এইগুলি এবং আরো অনেক প্রশ্ন আমার মনে উদয় হয়েছে, এবং আমি জানি, আরো অনেকে এই সব প্রশ্ন দ্বারা বিচলিত, তোমাকে নির্বাচনী প্রতিযোগিতায় যাঁরা ভোট দিয়েছেন, তাঁরাও এর মধ্যে আছেন। এটা খুবই সম্ভব যে, এঁদের মধ্যে অনেকেই কংগ্রেসে উত্থাপিত প্রশ্নের উপরে সম্পূর্ণ আলাদাভাবে ভোটও দিতে পারেন, আর তাতে নতুন পরিস্থিতিরও উদ্ভব হতে পারে।

ওয়ার্কিং কমিটি গঠনের ব্যাপারে এক গাদা সমস্যার উদ্ভব হবে। সর্বশেষ সমস্যা হবে এই কমিটি গঠন, যেটি এ আই সি সি'র এবং সাধারণভাবে কংগ্রেসের বিশ্বাস অর্জন করতে পারবে। এই অবস্থায় সেটি খুবই শক্ত। এমন একটি কমিটি থাকা বাঞ্ছনীয় নয়, যার স্থায়িত্ব নির্ভর করে সেইসব লোকের নীরব সম্মতির উপর যাদের দায়িত্বশীল মনে করা যায় না এবং যাদের প্রাধান্যের প্রধান যোগ্যতা হচ্ছে দক্ষিণপন্থীদের সমালোচনা করা। এমন কমিটি কারোই বিশ্বাসভাজন হবে না—সে বাম বা দক্ষিণপন্থী যাই-ই হোক না কেন। হয় সে কমিটিকে বাতিল করা হবে, নয় তো সে তুচ্ছতায় মিলিয়ে যাবে।

এটা খুব সম্ভব যে, দেশীয় রাজ্যগুলিতে সংগ্রামের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে বল্লভভাই, এমন কি গান্ধীজীও এতে আরো বেশি করে জড়িয়ে পড়বেন। ভারতীয় রাজনীতির মঞ্চে এইটিই কেন্দ্র স্থান অধিকার করবে, এবং অন্যদের দ্বারা গঠিত ওয়ার্কিং কমিটি নিষ্ফলভাবেই কাজ করে তার গুরুত্ব হারিয়ে ফেলবে। গত দশকে বা তারও আগে থেকে ওয়ার্কিং কমিটি ভারতে এবং এমন কি বাইরেও অতি উচ্চ আসন অধিকার করে আছে। এর সিদ্ধান্তগুলির কিছু অর্থ ছিল, এক কথায় শক্তি ছিল। সে বড় বেশি চিৎকার করে নি, কিন্তু যা বলত, তার আড়ালে ছিল শক্তি আর কাজের পরিচয়। আমার তো ভয় হয়, আমাদের তথাকথিত বামপন্থীদের অনেকেই আর কিছুর চেয়ে কড়া ভাষা ব্যবহারেই বেশি বিশ্বাসী। নরীম্যানের মত জনসেবক

আমার কোনো প্রশংসাই পাবে না। আর এই ধরণের বহু কর্মী চারিদিকেই দেখা যাচ্ছে।

আমরা একটা বিশ্রী ফাঁদে পড়েছি এবং এই মুহূর্তে তার থেকে বেরিয়ে আসার স্পষ্ট উপায় আমি দেখি নে। আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করতে রাজী, কিন্তু ব্যাখ্যা এবং নেতৃত্ব তোমার কাছ থেকেই আসতে হবে, তখনি অন্যদের পক্ষে তারা নিজেরা যোগ্য কি অযোগ্য তা স্থির করা সম্ভব হবে। অবস্থাটির সবগুলি লক্ষণ পর্যালোচনা করে, উপরে উল্লেখিত নানা সমস্যা খতিয়ে দেখে তাদের উপর একটি বিস্তারিত মন্তব্য লেখার জন্য তাই তোমার কাছে প্রস্তাব করব। এটি প্রকাশের প্রয়োজন নেই, কিন্তু যাদের সহযোগিতার জন্য তুমি আহ্বান করছ তাদের এটি দেখানোই উচিত হবে। এমনি ধারা মন্তব্যই হবে আলোচনার ভিত্তি এবং এই আলোচনাই বর্তমানের কানাগলি থেকে পথ পেতে সাহায্য করবে। কথাই যথেষ্ট নয়, কথা তো অস্পষ্ট আর প্রায়ই বিপথে নিয়ে যায়, এরই মধ্যে অস্পষ্টতা তো ঢের পেয়েছি। ব্রিটিশ সরকারকে তোমার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানাবার প্রস্তাবটা আরো বিশদ করে যাতে জানাও তাই-ই আমার ইচ্ছে। ঠিক কি ভাবে এ ব্যাপারে এগোতে চাও, তারপরেই বা কি করবে? আমি তো তোমাকে বলেছি, আমি তোমার এই ভাবধারা আদৌ পছন্দ করি না কিন্তু যদি তুমি বিশদভাবে বর্ণনা কর, তাহলে হয়ত আগের চেয়ে ভাল করে আমার পক্ষে বোঝা সম্ভব হতে পারে।

সংবাদপত্রে তোমার বিবৃতি আমি দেখেছি। সেটা এতই অস্পষ্ট যে তোমার অবস্থা কি সেটা আমার পক্ষে বোঝাই দায়। তাই পূর্ণ বিশ্লেষণের জন্য আমার এই অনুরোধ।

জনগণের কার্যে আদর্শ এবং নীতি জড়িত থাকে। আর সেগুলিতে থাকে পরস্পরকে বোঝাবুঝি এবং সহকর্মীর প্রতি বিশ্বাস। যদি বিশ্বাস এবং বোঝাবুঝির অভাব ঘটে, তাহলে সহজভাবে সহযোগিতায় সুবিধা করা শক্ত। আমার যত বয়স বাড়ছে, আমি তত সহকর্মীদের মধ্যে এই বোঝাবুঝি আর বিশ্বাসের প্রতি ক্রমেই বেশি গুরুত্ব দিচ্ছি। সবচেয়ে চমৎকার আদর্শ দিয়ে আমার কি হবে, যদি না সংশ্লিষ্ট মানুষের উপর আস্থা থাকে? বহু প্রদেশে দলাদলি এর উদাহরণ, সাধারণতঃ যাঁরা স্পষ্টবাদী এবং সম্মানভাজন মানুষ, তাঁদের মধ্যেই আমরা চরম তিক্ততা এবং প্রায়ই একেবারে বিবেকবর্জিত ভাব দেখতে পাই। এ জাতের রাজনীতি আমি হজম করতে পারি নে, আমি এসব থেকে বহুদিন নিজেকে সম্পূর্ণভাবে দূরে সরিয়ে রেখেছি। আমি কোন গোষ্ঠী বা দ্বিতীয় মানুষের সমর্থন ছাড়াই ব্যক্তিগত-ভাবে কাজ করছি, যদিও আমি বহু লোকের বিশ্বাসভাজন হতে পেরে যথেষ্টই সুখী। আমার মনে হয়, এই প্রাদেশিক অবনতি এখন অখিল ভারতীয় স্তরে স্থানান্তরিত বা প্রসারিত হচ্ছে। আমার কাছে এটা সবচেয়ে বেশি দুশ্চিন্তার বিষয়।

তা হলে এই কথায়ই আমরা ফিরে আসছি : রাজনীতিক সমস্যার আড়ালে রয়েছে মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা এবং এইগুলির ব্যবস্থা করাই বেশি শক্ত। পরস্পরের কাছে পূর্ণ সরলতাই হচ্ছে এর একমাত্র উপায়, এবং আমি তাই আশা করি যে, আমরা সবাই পুরোপুরি সরল হব।

তুমি এই চিঠির জবাব এখনি দেবে তা আশা করি নে। কয়েক দিন সময় লাগবে বই কি। কিন্তু আমি চাই তুমি আমাকে প্রাপ্তি স্বীকার করে খবর দেবে।

তোমার প্রীতার্থী

জওহর

২৫০ বল্লভভাই প্যাটেল কর্তৃক লিখিত

বোম্বাই
৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৯

প্রিয় জওহর,

যুক্ত-বিবৃতিতে তোমার স্বাক্ষর বা স্বাধীন বিবৃতি প্রকাশের অনুরোধের উত্তর-স্বরূপ বার্দৌলিতে তোমার শেষ চিঠি পেয়েছি। বাপুর কথা মতোই তোমাকে এই প্রস্তাব করেছিলাম। তোমার জবাব আমি তাঁকে দেখাই, এ সম্পর্কে আমার মত কি জানিয়ে তিনি তোমাকে চিঠি লিখতে বলেন। চিঠিখানা দেখে তিনি নিজেই অসন্তুষ্ট হয়েছেন, কিন্তু তোমাকে এ নিয়ে বিরক্ত করা সঙ্গত হবে বলে মনে করি নে। তাঁরই কথায় যুক্ত-বিবৃতিও প্রকাশিত হয়েছে। বস্তুত আমিই তাঁকে বলি, এতে করে আমার বিরুদ্ধে গালাগাল দেবার আর একটা ছুতো পাওয়া যাবে। কিন্তু তিনি পীড়াপীড়ি করায় আমি তাঁর কথা মেনে নিই। মওলানা শেষ মুহূর্তে প্রত্যাহার করেন।

আমরা যে হেরে গেছি, তাতে আমি খুশী। একটি সমপ্রকৃতি ওয়ার্কিং কমিটি ছাড়া কোন ফলপ্রসূ কাজ সম্ভব নয় এবং আমি সবসময়েই এমনি সুযোগেরই প্রার্থনা করেছি।

যারা নিজেদের বামপন্থী বলে দাবি করে, এই স্বার্থসিদ্ধির জন্য তারা যে পদ্ধতি গ্রহণ করেছে, সেইটেই আমি সবচেয়ে ঘৃণা করি। তার চেয়েও বেশি করেছেন রাষ্ট্রপতি, তিনি আমাদের ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে ষড়যন্ত্র এবং অস্থায়ী-ভাবে এক ফেডারেশন মন্ত্রীসভা গঠনেরও অপরাধে অভিযুক্ত করেছেন। আমাদের শত্রুরাও আমাদের সাধুতার তারিফ করে থাকে, কিন্তু আমাদের রাষ্ট্রপতি করেন না। যাই-ই হোক, আমাদের কি কর্তব্য সে সম্পর্কে আর আমাদের সন্দেহ নেই এবং আমি সুভাষকে লিখেছি যে, তাঁর সুবিধামতোই আমরা বেরিয়ে যেতে প্রস্তুত আছি। গতকাল জীবৎকে সেই চিঠিখানির যে নকলটি পাঠিয়েছি, সেটি সে তোমাকে দেখাবে।

তোমার মন জানি না, কিন্তু আশা করি যে, আমরা যা করব ঠিক করেছি, তাতে তুমি অন্ততঃ আমাদের দোষী করবে না।

মনে হয় আমার বরাতটাই গাল খাওয়ার। বাংলার কাগজগুলি তো ভীষণ খাপ্পা, তারা নরীম্যান আর খের-এর ব্যাপারের জন্য আমাকেই দোষী করছে, যদিও এই ব্যাপারে আমার সহকর্মীরাও যুক্তভাবেই দায়ী। বস্তুত, ডাঃ খের-এর ব্যাপারে সুভাষ গোড়া থেকে শেষ অবধি হাজির ছিল, এবং সে-ই সব ব্যাপারটার ব্যবস্থা করেছে।

বরোদায়ও আমি ঝড় তুলে দিয়েছি এবং মহারাষ্ট্রের কাগজগুলো একেবারে বিষে ভরা—ওরা আমার রক্ত চায়।

রাজকোটের ব্যাপারে সারা কাথিয়াবাড় জ্বলে উঠেছে। এক প্রচণ্ড জনজাগরণ দেখা যাছে, এবং রাজারাও অবিলম্বে বশ্যতাস্বীকার করত, যদি না রেসিডেন্ট-সাহেবরা স্ক্রুপ না আঁটো করে কষতেন।

আশা করি তুমি ভাল আছ।

তোমার

২৫১ সুভাষচন্দ্র বসু কর্তৃক লিখিত

চউরাম, গয়া জিলা
১০ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৯

প্রিয় জওহর,

কলকাতায় বসেই তোমার দীর্ঘ চিঠিখানি পাই। তুমি আমার ত্রুটিগুলির উল্লেখ করেছ। সেগুলি সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন হয়েও একথা বলতে পারি যে, কাহিনীর আর একটা দিকও আছে। অধিকন্তু, আমাকে যে বাধাগুলির বিরুদ্ধে লড়তে হয়েছে, সেগুলি কারো ভোলা উচিত নয়। এই চিঠিতে সে সম্পর্কে কিছুই বলতে চাই নে—তার খানিকটা কারণ এই যে, তাতে মতদ্বৈধের সৃষ্টি করবে, আর খানিকটা এই যে, তাতে অন্য লোকের উপর কটাক্ষ করতে হবে। এখন আসল বিষয় হচ্ছে, ত্রিপুরী কংগ্রেসের কার্যসূচী। ১২ তারিখে জয়প্রকাশ তোমার সঙ্গে দেখা করে কার্যসূচী সম্পর্কে আমার মত জানাবে। আমারও ঐ সময়ে তোমার সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু তা পারব বলে মনে হয় না। যাহোক, এই মাসের বিশ তারিখে তোমার সঙ্গে এলাহাবাদে দেখা করতে চেষ্টা করব।

রাজকোট প্রভৃতি সম্পর্কে তোমার বিবৃতি দেখেছি। চমৎকার বিবৃতি, কিন্তু আমার মনে হয়েছে, একটি ত্রুটি আছে। ব্রিটিশ সরকার দেশীয় রাজাদের মাধ্যমে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে লড়াই করতে চায়, কিন্তু আমরা নিশ্চয়ই তাদের ফাঁদে গিয়ে ধরা দেব না। দেশীয় রাজাদের সঙ্গে রাজ্যগুলির সমস্যা নিয়ে যখন লড়াই চালাব, তখনি স্বরাজের প্রস্তাব নিয়েও সোজাসুজি ব্রিটিশ সরকারকে যুদ্ধে আহ্বান করতে হবে। তোমার বিবৃতিতে সেই ভাবধারাটি আমি পাই নি। স্বরাজের কাজ ফেলে দিয়ে শুধু দেশীয় রাজ্যের সমস্যা নিয়ে যদি ব্রিটিশ সরকার আর দেশীয় রাজাদের বিরুদ্ধে লড়াই চালাতে শুরু করি, তাহলে আমার মনে হয়, আসল লড়াই থেকে সরে গিয়ে বিপথে চালিত হবার দায়িত্বে পড়ছি। দেখা হলে আরো কথা হবে।

তোমার প্রীতার্থী
সুভাষ

২৫২ ওয়াই. টি. উ কর্তৃক লিখিত

জাতীয় কমিটি
চীনের খৃস্টান যুবসংঘ
১৬ মিউজিয়াম রোড, সাংহাই
২৬শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৯

প্রিয় মিঃ নেহরু,

আপনার সঙ্গে বার্দোলীতে সাক্ষাতের পর আমি নিরাপদে এবং অক্লেশে দেশে ফিরে এসেছি। বার্দোলীতে আপনার ব্যস্ততার সময় আপনি যে আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ মঞ্জুর করেন এবং জাহাজে আমাকে যে বাণী পাঠান, তার জন্যে আবার আপনাকে আমার শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। এই বাণীটি এবং মিঃ চাই-এর কাছেও যেটি পাঠিয়েছিলেন, সেগুলি চীনা ভাষায় অনূদিত হয়ে সিঙ্গাপুর, হংকং ও সাংহাই-এর চীনা ও বিদেশী সংবাদপত্রগুলিতে প্রকাশিত হয়।

আপনার আত্মচরিত অনুবাদ করা সম্পর্কে আমাদের মধ্যে যে কথা হয়, সেটি পাকা করবার জন্যই চিঠি লিখছি। আমরা খুব শীঘ্রই এটিতে হাত দেব। আমার ধারণা হয়েছিল, আপনি এই সংবাদটি আপনার প্রকাশকদের কাছে পাঠাতে চান। আমি বার্দোলিতে আপনাকে বলেছি, চীন আন্তর্জাতিক গ্রন্থস্বত্ব পরিকল্পনায়

যোগদান করে নি, সব সময়েই সে গ্রন্থকার এবং প্রকাশকদের সঙ্গে পরামর্শ না করেই অনুবাদ করে আসছে। যাহোক, আমাদের সংঘের প্রকাশালয় অন্ততঃ গ্রন্থকারদের সংবাদ দানের প্রথা চালু রেখেছে, এবং অনূদিত গ্রন্থগুলির কপি যখনি সম্ভব হচ্ছে তখনি শিষ্টাচার হিসেবে পাঠাচ্ছে।

জনপ্রিয় দামে বিক্রি করবার মত আকারের জন্য আমাদের হয়ত অনুবাদ একটু সংক্ষিপ্ত করতে হতে পারে, কিন্তু আপনার এতে যদি কোন আপত্তি থাকে তবে তা চাই না।

আমাদের নিশ্চিত বিশ্বাস যে, যেমন গত কয়েক বছর আগে অনূদিত হয়ে মিঃ গান্ধীর আত্মচরিত চীনা পাঠকের কাছে যে মহান প্রেরণা হিসেবে দেখা দিয়েছিল, আপনার গ্রন্থখানিও তেমনই দেবে।

আন্তরিক শ্রদ্ধাসহ

আপনার অতি বিশ্বস্ত
ওয়াই. টি. উ
প্রধান সম্পাদক

২৫৩ শরৎচন্দ্র বসুকে লিখিত

এলাহাবাদ
২৪শে মার্চ, ১৯৩৯

প্রিয় শরৎ,

আজ সকালে গান্ধীজী মওলানা আজাদের সঙ্গে দেখা করতে এখানে এসে পৌঁছেছেন, তিনি তাঁর কাছে লেখা তোমার ২১শে মার্চের চিঠিখানি আমাকে দেখালেন। আমি দুঃখ এবং বিস্ময়ের সঙ্গেই এখানি পড়েছি। আমরা সবাই জানি, নীতি ও কর্মসূচী নিয়ে কংগ্রেসের নেতৃস্থানীয়দের মধ্যে মতভেদ আছে, এবং আমরা আমাদের নিজের নিজের মত প্রায়ই প্রকাশ করেও একসঙ্গে চলতে সফল হয়েছি। সাধারণভাবে বলতে গেলে গান্ধীজীর কর্মসূচী কংগ্রেস দ্বারা অনুসৃত এবং তাঁর নেতৃত্ব স্বীকৃত। ব্যক্তিগতভাবে আমি এই মতভেদে কোনো ক্ষতি দেখতে পাই নে, অবশ্য যদি সাধারণ যোগসূত্রটি থাকে এবং আমরা একযোগে কাজ করতে পারি। এগুলি আমাদের আন্দোলনে জীবনেরই চিহ্ন। কিন্তু তোমার চিঠিতে নীতি বা কর্মসূচীর প্রশ্নের উল্লেখ নেই বললেই হয়। ব্যক্তিগত কারণ নিয়েই এটি লেখা, আর বিশেষ ক'জন ব্যক্তির বিরুদ্ধে সাংঘাতিক অভিযোগও আছে। এতে যুক্তিকে অনেকখানি খাটো করা হয়েছে, এবং এটাও স্পষ্ট যে, যদি এমনি মত কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী অপরের বিরুদ্ধে পোষণ করে, তাহলে সর্বসাধারণের কাজে পারস্পরিক সহযোগিতা অসম্ভব হয়ে ওঠে। জানি না, তোমার এই চিঠি এ বিষয়ে সুভাষের মতের কতখানি প্রতিনিধিত্ব করছে। যা-ই হোক, এটা স্পষ্ট যে, তুমি যে ব্যক্তিগত প্রশ্নগুলি তুলেছ, সেগুলি পরিষ্কার করা না হলে—যে কোন কার্যকরী সহযোগিতার পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াবে।

তোমার চিঠি ব্যক্তিগত কারণকে তীব্র করে তুলেছে। কিন্তু কারণ তো আগেও ছিল তা তুমি জান। ত্রিপুরীতে তাই তো প্রাধান্য পায়। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনী প্রতিযোগিতার দু-তিন দিন পরে যখন সুভাষের সঙ্গে দেখা করি, তখনি এর গুরুত্ব অনুভব করে তাকে তা সাফ করে ফেলতে অনুরোধ করি। তার পরে পরেই, ৪ঠা ফেব্রুয়ারী আমি তাকে একখানি দীর্ঘ চিঠি লিখি, রাজনীতিক যে কারণ রয়েছে তাতে সে যতটুকু সংশ্লিষ্ট, সেটা পরিষ্কার করে জানাতে বলি, কেননা, বাম আর দক্ষিণ-পন্থা নিয়ে বড় বেশি বাজে কথা হয়ে গেছে, পরিস্থিতির উপরে কোনো

আলোকসম্পাতই করে নি। আমি আরো ব্যক্তিগত দিকেরও উল্লেখ করি। আমি এই কথা লিখি :

জনসাধারণের কাজে তত্ত্ব আর নীতি থাকে। পরস্পরের বোঝাবুঝি এবং সহকর্মীদের প্রতি আস্থার কথাও তাতে আছে। যদি এই উপলব্ধি আর আস্থার অভাব হয়, তখন ভাল কর্মে সহযোগিতা করা খুবই শক্ত হয়ে দাঁড়ায়। আমার বয়েস হয়েছে, আমি এখন সহকর্মীদের মধ্যে বিশ্বাস এবং বোঝাবুঝির উপর ক্রমেই বেশি গুরুত্ব দিচ্ছি। আমার যদি মানুষটির প্রতিই বিশ্বাস না থাকে, তাহলে কি করব, সবচেয়ে সেরা তত্ত্ব নিয়ে? বহু প্রদেশের দলাদলি এই উদাহরণই দেয়, এবং যারা এমনি সৎ এবং স্পষ্টবাদী, তাদের মধ্যে চরম তিক্ততা আর প্রায়ই বিবেকের অভাব দেখতে পাই। এ ধরণের রাজনীতি আমার হজম হয় না, এবং এই বহু বছর ধরে আমি একেবারে তার থেকে দূরে সরে আছি। আমি ব্যক্তিগতভাবে, গোষ্ঠী বা দ্বিতীয় কোন লোকের সমর্থন ছাড়াই কাজ করছি, যদিও বহুজনের বিশ্বাসভাজন হয়ে আমি যথেষ্টই সুখী। আমি অনুভব করি যে, এই প্রাদেশিক অবনতি সর্বভারতীয় স্তরে বদলী হচ্ছে বা ছড়িয়ে পড়েছে। এটা আমার পক্ষে অত্যন্ত ভাবনার বিষয়।

'তাহলে আমরা এখানে ফিরে আসছি : এই রাজনীতিক সমস্যার আড়ালে মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা আছে, এবং এইগুলির তদ্বির করা ঢের বেশি শক্ত। পরস্পরের প্রতি পরিপূর্ণ সরলতাই এইগুলি করার একমাত্র পথ, অতএব আমি আশা করি, আমরা সবাই পুরোপুরি দিলখোলা হব।'

দুর্ভাগ্যবশতঃ সুভাষের রাজনীতিক বা ব্যক্তিগত কারণের প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা করার সময় বা ইচ্ছা ছিল না। ওয়ার্ধায় যখন গান্ধীজীর সঙ্গে দেখা করতে যায়, তখন আমি তাকে ব্যক্তিগত দিকটিতে সরল হতে অনুরোধ করি, কেননা সে বিবৃতিতে যে অভিযোগ করেছিল সেগুলি গুরুত্বপূর্ণ, এবং সেই অবস্থায় তা ফেলে রাখাও যায় না। তার পরবর্তী ব্যাখ্যায়ও বিষয়টির আদৌ উন্নতি হয় নি। সে এই নিয়ে গান্ধীজীর সঙ্গে আলাপ করবে এই প্রতিশ্রুতি দেয়, কিন্তু পরে এমন হয় যে, বিষয়টার সে উল্লেখই করে নি।

আমি যেমন ভয় করেছিলাম, বিষয়টা কংগ্রেসে ওঠে, এবং অন্যান্য প্রস্তাবগুলির আলোচনাকে প্রভাবিত করে। আমার নিজের এ সম্বন্ধে ধারণা সম্পূর্ণ আমার নিজেরই—আমি কোনো পক্ষের কারো মতই সম্পূর্ণভাবে মানতে পারি নি। তাই বিষয় নির্বাচনী সমিতি বা প্রকাশ্য কংগ্রেসে আমি আলোচনা থেকে বিরত ছিলাম। কিন্তু, তবুও, আমি তীব্র ভাবেই অনুভব করেছিলাম যে, রাষ্ট্রপতি বিবৃতিতে যে অভিযোগ করেছেন, তাতে তাঁর সহকর্মীদের প্রতি অন্যায় করা হয়েছে, এবং তা প্রত্যাহার করাই উচিত। প্রকাশ্য কংগ্রেসে আমার বাধা প্রদানের উদ্দেশ্য অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির নিছক মুখপাত্র হিসাবে কাজ করা এবং যে প্রণালী অনুসৃত হ'ল তা ইংরেজীতে ব্যাখ্যা করে দেওয়া ছাড়া আর কিছুই ছিল না। কোন কারণবশতঃ কয়েকটি ডেলিগেট আমাকে একেবারেই কথা বলতে দিতে চান নি, যদিও আমি কি বলতে যাচ্ছিলাম, তাঁরা তা জানতেন না। তুমি তো দেখেছিলে, সুনিয়ন্ত্রিত-ভাবেই বাধা সৃষ্টি হয়েছিল। আমি অনুভব করেছিলাম যে, আমার সরে যাওয়া বা কয়েকজন ডেলিগেটের বাধার কাছে বশ্যতাস্বীকার উচিত হবে না, যখন প্রায় একলক্ষ ডেলিগেট আর দর্শক, অতি শান্ত হয়ে সুশৃঙ্খলা বজায় রেখে বসে আছেন, এবং আমার কথা তাঁরা শুনতে চান। তাই আমি দেড়ঘণ্টা ধরে বলে যাই। আমাকে স্বীকার করতে হবে যে, কয়েক সেকেণ্ডের জন্য আমি রেগে উঠি, তখন

আমি তোমাকে বলি, এটা গুণ্ডামি আর ফ্যাসিবাদী ব্যবহার। আমি তোমাকেই একথা বলেছিলাম, দর্শকদের নয়—যদিও মাইক্রোফোনে আমার উক্তির কোন কোন শব্দ ছড়িয়ে পড়তেও পারে। আমি যে ক্রুদ্ধ হয়েছিলাম, তার জন্যে দুঃখিত, কিন্তু তুমি নিশ্চয়ই বুঝবে যে, আমার উপর দিয়ে যথেষ্টই ধকল যাচ্ছিল।

এটা একটু বিস্তারিতই ব্যাখ্যা করেছি, কেননা ব্যাপারটার সঙ্গে আমি ব্যক্তিগতভাবে জড়িত। তুমি আর যে বিষয়গুলির কথা বলেছ, সেগুলি আমার অনেকখানিই জানা নেই। কিন্তু তুমি যে অভিযোগ করেছ, সেগুলি এতই বিস্ময়কর যে, সেগুলি সত্য বলে আমি বিশ্বাস করতেও পারি নে। আমার বিশ্বাস কংগ্রেসের অধিবেশনের সময় ব্যাপক প্রচারকার্য চলেছিল এবং সবরকম কথাও তখন বলা হয়ে থাকবে। এসব ব্যাপারে আমার বীতরাগ, তাই বহু দূরেই সরে ছিলাম। সর্বপ্রথমে ইউ পি পি সি সি'র একটা বৈঠকে যোগ দেওয়া ছাড়া এমন কি ডেলিগেটদের তাঁবুতেও যাই নি। যাহোক তোমার অভিযোগ পুরানো ওয়ার্কিং কমিটির কয়েকজন নেতৃস্থানীয় সদস্যের বিরুদ্ধে। আমি এর বিন্দুবিসর্গও জানি নে। আমি নিশ্চিত, তুমিও আমার সঙ্গে একমত হবে যে এইসব অভিযোগ নির্দিষ্ট প্রমাণ ছাড়া ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে হালকাভাবে আনা যায় না। সুভাষের অসুখটা ভাণ, একথা কারো পক্ষে বলা অসম্ভব, আমার জানিত কোন সহকর্মীই এ সম্পর্কে আভাস অবধি দেন নি। বস্তুত, আমরা সকলেই এ ব্যাপারে মহা উদ্বিগ্ন ছিলাম।

বুলাভাই দেশাই যেকথা বলেছেন বলে ধরে নেওয়া হয়েছে, তার উত্তর তিনিই দেবেন। আমাকে অবশ্য বলতেই হবে যে, এ ব্যাপারে তুমি ভুল করেছ--তিনি যে এমন কথা বলেছেন, আমি ভাবতেই পারি নে।

অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির ব্যবহার বা বিনির্দেশ নিয়ে আমার বলার কথা নয়। কিন্তু এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত, তুমিও আর একবার বিবেচনা করে একমত হবে যে, তাঁর অত্যন্ত সংকটময় অবস্থা, এবং তিনি কার্যাবলী মর্যাদাবোধের সহিত এবং ন্যায়সঙ্গতভাবেই করেছেন। 'জাতীয় দাবী' প্রস্তাবের সংশোধনী প্রস্তাব আনবার তোমাকে অনুমতি দিয়ে তিনি হয়তো একটি বিষয়েই আটক রাখতে পারতেন, কিন্তু যেমন ঘটেছে তাতে তুমিও কংগ্রেসের সম্মুখে তোমার মত প্রকাশ করার পূর্ণ সুযোগ পেয়েছিলে। ভোট গ্রহণের সময় প্রস্তাবের বিরোধিতা শুধু মাত্র তুমিই করেছিলে। আমি কি বলতে পারি যে, আমি এতে কতখানি অবাক হয়েছি, কেননা আমি ধারণাই করতে পারি না যে, বামপন্থী বলে নিজেকে যিনি মনে করেন, এমন একজন কংগ্রেসী এর প্রতিবাদ করতে পারেন।

ত্রিপুরীতে থাকাকালীন ডেলিগেট শিবির থেকে সব ধরণের খবর আর গুজব আমার কানে এসে পৌছয়, তার মধ্যে কতগুলি খুবই খারাপ। কিন্তু প্রমাণ বিনা আমি সেগুলি বিশ্বাস করতে নারাজ হই। তোমার অনুসন্ধানের একটি বিষয় হচ্ছে, বাংলায় ডেলিগেটদের ডেলিগেট টিকেট দেওয়া। দায়িত্বশীল লোকেরাই বলেছেন, এবং এ আই সি সি অফিসও কিছুটা সমর্থন করেছে যে, বহুসংখ্যক টিকিট এমন মানুষদের নামে দেওয়া হয়েছিল, যাঁরা ত্রিপুরীতে আসেন নি। আরো বলা হয় যে, কংগ্রেস অধিবেশনে ডেলিগেট আনার জন্য বহু টাকা ব্যয় করা হয়।

তুমি এবং অন্যান্যরা নানা অভিযোগ এনেছ, সেগুলির কিছু তদন্ত হওয়া কাম্য বলেই মনে করি। এই ধরণের অভিযোগ অস্পষ্টভাবে আনা বিধেয় নয়, এবং অনেকে বিশ্বাস করে বলেই সেগুলো সত্য বলে প্রমাণিত হয় না। আমরা আমাদের গণজীবনকে এমনি করে পরস্পরের প্রতি অভিযোগের স্তরে নেমে আসতে দিতে পারি নে।

তুমি কংগ্রেসী মন্ত্রীদের কথা উল্লেখ করেছ। তাঁদের কাজের আমি খুব প্রশংসাবাদী নই। কিন্তু আমি অবাক হয়ে গেছি যে, ত্রিপুরীতে তাঁরা যে যোগ দিয়েছিলেন, তাতেই তোমার আপত্তি। তাঁরা মন্ত্রী বলে কি কংগ্রেসে যোগদানে বিরত হতে হবে? এ এক অভিনব প্রস্তাব, এবং আমার মতে ভুলও বটে। আমি যতদূর জানি, তাঁরা ব্যক্তিগতভাবেই যোগ দিয়েছিলেন, এবং তাঁদের সম্পূর্ণ অধিকারও ছিল বই কি। তুমি তাদের 'বস্তুবাদী প্রভাব' বলতে কি মানে করছ? আমার মনে হয়, এটা পরিষ্কার হওয়া দরকার, কারণ এর যে অদ্ভুত অর্থ সূচিত হয় সেগুলি পুরোপুরি অসঙ্গত। আমি এও বুঝি নে যে, কংগ্রেসের কাজে মন্ত্রীদের অংশ গ্রহণের অর্থ কংগ্রেসে তাঁদের প্রাধান্যলাভ হয়ে উঠবে কেন? তাঁরা এর থেকে অনেক তফাতেই আছেন।

আমি আশা করেছিলাম যে, সাম্প্রতিক এই অভ্যন্তরীণ এবং বাহিরের সংকটের দিনে, কংগ্রেসীদের মধ্যে বেশি করে সহযোগিতা সম্ভব হবে, ত্রিপুরী এবং তার পূর্বেই সেই লক্ষ্য নিয়েই খেটেছি। আমার কাছে স্পষ্টই মনে হয়েছে যে, বামপন্থীদের কোন কাজ বা কর্মপন্থার প্রকৃত প্রাথমিক ভূমিকা হচ্ছে সফলভাবে আমাদের কাজ করা কর্তব্য। যদি আমরা তা না করি, তাহলে সবগুলি কার্য-সূচীই বৃথা হবে এবং কিছুই এগোবে না। কিন্তু, এই যে কাজ না করা এটা ধীরে ধীরে অথচ নিশ্চিতভাবে আমাদের মধ্যে দেখা দিচ্ছে। এই কারণেই আমি দিল্লীতে সুভাষকে এই প্রস্তাব করে তার করি যে, ত্রিপুরী প্রস্তাব অনুসারে ওয়ার্কিং কমিটি তাড়াতাড়ি গঠন করা দরকার। আমি আরো প্রস্তাব করি যে, আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি বিচারের জন্য আই সি সি বৈঠকও বসানো চলতে পারে।

ত্রিপুরী প্রস্তাবে কংগ্রেসী রাষ্ট্রপতি এবং গান্ধীজীর ভিতরে সহযোগিতা সূচনা করে, এবং এই নীতি মোটামুটি একটানা চলবে তা'ও বলা হয়। তোমার চিঠির এই বোধহয় অর্থ যে তা সম্ভব নয়। এটা সুভাষেরও মত কিনা আমি জানি না। যদি তার মত এই-ই হয়, তাহলে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, একটা অচল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে যা শুধু এ আই সি সি দ্বারাই দূরীভূত হতে পারে, যত শীঘ্র এ আই সি সি বৈঠক বসে ততই মঙ্গল।

আমি পূর্বের মতোই তীব্রভাবে অনুভব করি যে, যে নীতি এবং কর্মপন্থা অনুসৃত হবে সে সম্পর্কে আমাদের মনে স্পষ্ট ধারণা থাকা সর্বতোভাবে দরকার। বিশেষ করে তথাকথিত বামপন্থীদের স্পষ্ট হতে হবে। বামপন্থীর পক্ষে অস্পষ্ট হওয়া, এবং দুঃসাহসিকতার দিকে নিজেকে ভেসে যেতে দেওয়ায় বিপদ আছে। আমি সুভাষকে তার অবস্থা খুলে বলতে লিখেছি, তোমাকেও সেই প্রস্তাব করছি। আমি বহু মানুষকে দেখি, তারা নিজেদের বামপন্থী বলে, অথচ যে উপায় এবং নীতি গ্রহণের প্রস্তাব করে তা খুবই দক্ষিণপন্থী এবং নরমপন্থী। যেমন বাংলায় সম্মেলিত মন্ত্রীসভার প্রশ্নই ধর। কোন একটা বিশেষ অবস্থায় সেকথা ভাবা যেতে পারে বটে, কিন্তু এখন এটা নিশ্চিতই দক্ষিণপন্থী নীতি। আমি বুঝি নে, কেন তোমরা এই সন্দেহজনক পরিস্থিতিতে বাংলায় সম্মেলিত মন্ত্রীসভা চাও, অথচ অন্যত্র যে কংগ্রেসী মন্ত্রীসভাগুলি তাদের ত্রুটি যাই-ই থাক না কেন অনেক ভাল অবস্থায় কাজ করছে, তাদের সম্পর্কে কেন তোমাদের আপত্তি।

ওয়ার্কিং কমিটির কয়েকজন প্রবীণ সদস্যের ত্রিপুরীতে বাধা প্রদানের তুমি উল্লেখ করেছ। যদি কোন ব্যক্তি বা দলকে কংগ্রেসে প্রস্তাব পেশ করতে দিতে তোমার আপত্তি না থাকে, জানি না, তুমি এদ্বারা কি বলতে চাও। এছাড়া, আর কি বাধা সৃষ্টি হয়েছিল, আমি তো জানি না।

তুমি তোমার চিঠিতে যে ভাষা ব্যবহার করেছ, তা তীব্র এবং তিক্ত। আমি অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গেই তা পড়েছি, এবং পড়ে এর কোন সঙ্গত কারণ খুঁজে পাই নি। সবচেয়ে আমার দুঃখ এই যে, সমস্ত রাজনীতিক তত্ত্বগুলি দ্বারা ব্যক্তিগত বিচারবুদ্ধি আচ্ছন্ন হয়ে গেছে। যদি কংগ্রেসীদের মধ্যে বিবাদ হতেই হয়, আমি অন্তরের সঙ্গে আশা করি যে, সেটা উঁচু স্তরে রক্ষিত হবে এবং নীতি ও আদর্শেই সীমাবদ্ধ থাকা উচিত

সুভাষকে এই চিঠির একখানি নকল পাঠাচ্ছি। গান্ধীজীও এটি দেখেছেন।

তোমার বিশ্বস্ত

জওহরলাল নেহরু

শ্রীশরৎচন্দ্র বসু

কলিকাতা

২৫৪ সুভাষচন্দ্র বসু কর্তৃক লিখিত

জিয়ালগোরা—পোঃ

জিলা মানভূম, বিহার

২৮শে মার্চ, ১৯৩৯

প্রিয় জওহর,

দেখছি, গত কিছু দিন থেকেই আমার উপর তোমার বীতরাগ প্রচণ্ড হয়ে উঠেছে। আমি এই জন্যেই একথা বলছি যে, আমার বিরুদ্ধে যে কোন সম্ভাব্য যুক্তিই সোৎসাহে তোমাকে গ্রহণ করতে দেখি, আমার স্বপক্ষে যা বলার থাকে, তা তুমি উপেক্ষাই কর। আমার রাজনৈতিক বিরুদ্ধবাদীরা আমার বিরুদ্ধে জোর দিয়ে যা বলে, তুমি তাতেই সায় দাও, অথচ তাঁদের বিরুদ্ধে যা বলা যেতে পারে সে সম্পর্কে তুমি প্রায় অন্ধ। এতে যে কি ঘটে, আমি উপরের কথার উদাহরণ দিতে চেষ্টা করব।

আমার প্রতি কেন যে তোমার বীতরাগ প্রচণ্ড হয়ে উঠেছে সেটা আমার কাছে এখনো রহস্য হয়েই আছে। আমার দিক থেকে বলি, ১৯৩৭ সালে অন্তরীন হতে বেরিয়ে আসার পর থেকে আমি তোমার প্রতি ব্যক্তিগতভাবে এবং গণজীবনে পরম শ্রদ্ধা এবং বিবেচনার সঙ্গেই ব্যবহার করেছি। রাজনীতিক দিক থেকে আমি তোমাকে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা এবং নেতার মতই দেখেছি, এবং প্রায়ই তোমার পরামর্শও চেয়েছি। গত বছর তুমি যখন য়ুরোপ থেকে এলে, তুমি আমাদের কিভাবে নেতৃত্ব দেবে সেই সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে আমি এলাহাবাদে যাই। সাধারণতঃ, এইভাবে যখনি তোমার কাছে গেছি, তোমার জবাবগুলি অস্পষ্ট এবং নির্দিষ্ট পন্থার কথা এড়িয়ে গেছে। উদাহরণ স্বরূপ বলি, গত বছরে তুমি যখন য়ুরোপ থেকে ফিরলে, তুমি গান্ধীজীর সঙ্গে পরামর্শ করে আমাকে জানাবে এই কথা বলে আমাকে থামিয়ে দিলে। গান্ধীজীর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের পর যখন ওয়ার্ধায় আমাদের দেখা হ'ল, তুমি আমাকে নির্দিষ্ট কিছু জানালে না। পরে, তুমি ওয়ার্কিং কমিটির সুমুখে এমন কতগুলি প্রস্তাব পেশ করলে, যেগুলিতে নূতনত্ব এবং দেশকে নেতৃত্ব দেওয়ার মতো কিছুই ছিল না।

গত রাষ্ট্রপতি নির্বাচনী প্রতিযোগিতার পর তিক্ততাময় বিতর্ক শুরু হয় এবং তাতে অনেক কিছুই বলা হয়—তার কতগুলি আমার পক্ষে, কতগুলি বিরুদ্ধে। তোমার উক্তি এবং বিবৃতিগুলিতে প্রতিটি যুক্তিই আমার বিরুদ্ধে আঁটো করে কষা হয়। দিল্লীর এক বক্তৃতায়, তুমি একথা বলেছ বলেই শোনা যায় যে, আমার দ্বারা বা আমার জন্যে ভোট-ভিক্ষা করা হয় এটা তুমি অপছন্দ কর। জানিনা, তোমার মনে সত্যিই কি ছিল, কিন্তু স্বচ্ছন্দে ভুলেই গেলে যে, ডাঃ পট্টভির নির্বাচনী আবেদন সংবাদপত্রে প্রকাশিত

হবার পরেই আমার নির্বাচনী আবেদন খানি প্রকাশিত হয়। আর যদি ভোট-ভিক্ষার কথা বল, তুমি সচেতন বা অচেতনভাবেই একথা বিস্মৃত হয়, ভোট-ভিক্ষা অন্য পক্ষে অনেক বেশি করেই করা হয়েছে, এবং ডঃ পট্টভির ভোট সংগ্রহের জন্য কংগ্রেসী মন্ত্রি-সভাগুলির যান্ত্রিক সাহায্য পূর্ণভাবে গ্রহণ করা হয়েছে। অপর পক্ষের সুনিয়ন্ত্রিত সংস্থা (গান্ধী সেবাসংঘ, কংগ্রেসী মন্ত্রিসভাগুলি, হয়ত চরখা সংঘ এবং এ আই ভি আই এও) ছিল, সেগুলি সঙ্গে সঙ্গেই চালু করে দেওয়া হয়। অধিকন্তু, আমার বিরুদ্ধে ছিলেন বড় বড় নেতারা এবং তুমি নিজেও আমার বিরুদ্ধে ছিলে, আর ছিল মহাত্মা গান্ধীর নাম আর তাঁর মর্যাদার পুরোপুরি ওজন। প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিগুলিরও অধিকাংশই ছিল তাঁদের হাতে। তাদের বিরুদ্ধে আমার কি ছিল—এক নিঃসঙ্গ মানুষ ছাড়া আর কি? আমি যেমন ব্যক্তিগতভাবে জানি—তুমি তেমনি জান কি—যে, বহু ক্ষেত্রে ডঃ পট্টভির জন্য ভোট-ভিক্ষা হয় নি, হয়েছে গান্ধীজী এবং গান্ধী-বাদের জন্য—যদিও বহু মানুষ এই গুপ্ত অভিসন্ধিভরা প্রচারে ভুলতে রাজী হন নি। তবুও তুমি প্রকাশ্য সভায় দাঁড়িয়ে যেটার ভিত্তি সম্পূর্ণ মিথ্যা তারই উপরে তুমি আমাকে হারাতে চেষ্টা করেছ।

এবারে আমার পদত্যাগের কথায় আসা যাক। বারো জন সদস্য পদত্যাগ করেন। তাঁরা সোজাসুজি ভদ্র ভাষায় চিঠি লেখেন--তাতে তাঁদের অবস্থা স্পষ্টভাবেই বলেন। আমার অসুস্থতার কথা ভেবে, তাঁরা একটিও নির্দয় কথা আমার সম্পর্কে ব্যবহার করেন নি, যদিও তাঁরা ইচ্ছা করলে আমার বিরূপ সমালোচনাই করতে পারতেন। কিন্তু তোমার বিবৃতিটি—কি যে তার বর্ণনা দেব? আমি তীব্র ভাষা ব্যবহার করব না, সরল সহজভাবেই বলব যে, এটা তোমার পক্ষে অযোগ্যই হয়েছে (আমি শুনেছি, তুমি তোমার বিবৃতিটি সকলের পদত্যাগ পত্রের মধ্যে অনেকখানি ঢোকাতে চেয়েছিলে, কিন্তু এতে কেউ রাজী হননি)। তোমার বিবৃতি পড়ে মানুষ ভেবেছে, অপর বারোজন যেমন করেছেন, তুমিও তেমনি পদত্যাগ করেছ, কিন্তু এখন পর্যন্ত জনসাধারণের কাছে তোমার অবস্থাটা রহস্যজনক হয়েই আছে। যখনি কোন সংকট আসে, প্রায়ই কোন দিকে কি করবে তুমি ভেবে উঠতে পার না—এর ফল এই হয় যে, জনসাধারণ মনে করে যেন তুমি দুই নৌকোয় পা দিয়ে চলেছ।

তোমার ২২শে ফেব্রুয়ারীর বিবৃতির কথায় ফিরে আসা যাক। তোমার ধারণা আছে যে, তুমি যা বল আর কর তাতে তুমি চরম যুক্তিবাদী এবং একনিষ্ঠ। কিন্তু তুমি বিভিন্ন ব্যাপার উপলক্ষে যে যুক্তির উপরে নির্ভর কর, তাতে অন্য মানুষ প্রায়ই বিভ্রান্ত এবং উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে। কয়েকটি উদাহরণই ধর: তোমার ২২শে ফেব্রুয়ারীর বিবৃতিতে তুমি বল যে, তুমি আমার পুনর্নির্বাচনীর বিরোধী এবং কয়েকটি যুক্তিও দেখাও। সেখানে যে যুক্তি দেখাও, তার সঙ্গে তোমার আলমোড়ায় প্রদত্ত ২৬শে জানুয়ারীর বিবৃতির যুক্তিগুলির তুলনা করে দেখ। তুমি পরিষ্কার তোমার যুক্তি পালটে ফেলেছ। তারপরে আবার আমার কয়েকজন বান্ধবের বন্ধু বলেন, তুমি তাঁদের আগেই বলেছিলে যে, আমি যদি বামপন্থী প্রার্থী হিসাবে দাঁড়াই তো তোমার কোনো আপত্তি নেই।

তোমার আলমোড়া-বিবৃতিতে তুমি এই বলে শেষ করেছ যে, আমাদের ব্যক্তির কথা ভুলে গিয়ে তত্ত্ব এবং উদ্দেশ্যের কথাই স্মরণ রাখা উচিত। এটা তোমার কখনো মনে হয়নি যে, শুধু বিশেষ ব্যক্তিদের সম্পর্কে হলেই আমরা যাতে ব্যক্তির কথা ভুলে যাই, তুমি তাই চাও। যখন সুভাষ বসুর পুনঃ নির্বাচনীতে দাঁড়াবার ব্যাপার হয়, তখন ব্যক্তিদের তুমি নস্যাৎ করে দিয়ে তত্ত্বকেই মহান করে তোল। আর যখন মওলানা আজাদ-এর পুনঃ নির্বাচনীতে দাঁড়াবার কথা হয়, তখন এক দীর্ঘ স্তব

লিখতেও তুমি দ্বিধা কর না। যখন সুভাষ বসু বনাম সর্দার প্যাটেল এবং অন্যান্যের ব্যাপার হয়, তখন সুভাষ বোসকে ব্যক্তিগত ব্যাপারগুলি প্রথমেই খোলাখুলি বলতে হবে। শরৎ বোস যখন ত্রিপুরীতে কয়েকটা বিষয়ে (যাঁরা মহাত্মা গান্ধীর গোঁড়া ভক্ত তাঁদের ব্যবহার সম্বন্ধেই বলা হয়) অভিযোগ করেন, তোমার মতে যখন তাঁর তত্ত্ব আর কর্মসূচীতেই সীমাবদ্ধ থাকা উচিত ছিল তখন তিনি ব্যক্তিগত প্রশ্নে নেমে এসেছেন। আমি স্বীকার করি যে, আমার এই দুর্বল মস্তিষ্কে তোমার পারম্পর্য-বোধ আমি বুঝতে পারিনে।

এখন আমি ব্যক্তিগত প্রশ্নে আসছি, যেগুলি আমার ব্যাপারে তোমার চোখে অত্যন্ত বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলেই ঠেকছে। তুমি অভিযোগ করেছ যে, আমার বিবৃতিতে আমার সহকর্মীদের প্রতি আমি অবিচার করেছি। নিশ্চয়ই তুমি তাঁদের মধ্যে নেই—এবং আমি যদি কোনো অভিযোগ করতাম, তাহলে সেও অন্যান্যদের বিরুদ্ধেই হোত। তাই তুমি নিজের স্বপক্ষে বলনি, বলেছ অন্যের উকিল হিসেবে। উকিল সাধারণতঃ তাঁর মক্কেলের চেয়ে মুখরই হন। তাই একথা জেনে তুমি অবাক হবে, যখন আমি সর্দার প্যাটেলের সঙ্গে (রাজেনবাবু এবং মওলানার সঙ্গেও) ত্রিপুরীতে এই প্রশ্ন নিয়ে আলাপ করি, তিনি আমাকে এই বিস্ময়কর সংবাদ দেন যে, আমার বিরুদ্ধে তাঁর প্রধান পরিতাপ বা অভিযোগ গত জানুয়ারীর ওয়ার্কিং কমিটির বার্দোলী বৈঠকের সময়ের আগে থেকেই ছিল। যখন আমি তীব্র প্রত্যুত্তর দিলাম যে, জনসাধারণের মধ্যে এই ব্যাপক মনোভাব ছিল যে, আমার বিরুদ্ধে ক্ষোভ বা অভিযোগ আমার 'নির্বাচনী বিবৃতি'র সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, তিনি তখন বললেন যে সেটা অতিরিক্ত অভিযোগ। তাহলে দেখা যাচ্ছে, তোমার মক্কেলরা এই 'অপবাদের ব্যাপারে' ততখানি গুরুত্ব দেয় নি, যতখানি তুমি তাদের উকিল হিসেবে দিয়েছিলে। ত্রিপুরীতে, সর্দার প্যাটেল এবং অন্যান্যেরা এ আই সি সি বৈঠকে গেলেন, কিন্তু বৈঠকের পরে আর ফিরে এলেন না, যদিও তাঁরা ফিরে আসারই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। তাই আমিও তাঁদের উল্লিখিত ওয়ার্কিং কমিটির বার্দোলী বৈঠকের আগে সঠিক কি ঘটনা ঘটেছিল, সে সম্বন্ধে তদন্ত করার ব্যাপারে আর এগুতে পারি নি। কিন্তু আমার ভাই শরতের সর্দার প্যাটেলের সঙ্গে এই বিষয়ে কথা হয়; শেষোক্ত ব্যক্তিটি তাঁকে বলেন যে, ১৯৩৮ সালের এ আই সি সির দিল্লী বৈঠকে—যখন সোশালিস্টরা বাহির হয়ে যান—তখন আমার ব্যবহার সম্পর্কেই তাঁর প্রধান ক্ষোভ ছিল। এই অভিযোগ আমার ভাই এবং আমার কাছে চূড়ান্ত বিস্ময় রূপেই দেখা দেয়, কিন্তু ঘটনাক্রমে এইটেই বোঝা যায় যে, 'অপবাদের ব্যাপারটায়' তুমি যে গুরুত্ব দিয়েছ, সর্দার প্যাটেল এবং অন্যান্যদের মনে তা ছিল না। বস্তুত আমি যখন ত্রিপুরীতে ছিলাম, তখন কয়েকজন ডেলিগেট (আমার সমর্থক তাঁরা নন, একথা তোমাকে বলতে পারি) আমাকে বলেন যে, 'অপবাদের ব্যাপার'টা—তোমার বিবৃতি এবং বক্তৃতায় বিবাদ আবার না পেকে ওঠা পর্যন্ত সত্যই সবাই বিস্মৃত হয়ে গিয়েছিল। এই সঙ্গে আমি একথাও বলতে পারি যে, রাষ্ট্রপতি নির্বাচনী প্রতিযোগিতার পর থেকে ওয়ার্কিং কমিটির বারোজন সদস্য একযোগে যা পারেন নি, জনসাধারণের কাছে তাদের চেয়ে বেশি তুমি আমাকে হেয় প্রতিপন্ন করেছ। অবশ্য, আমি যদি অমনি দুরাত্মাই হই, তাহলে জনসাধারণের কাছে আমার স্বরূপ প্রকাশ করে দেওয়া শুধু তোমার দাবিই নয়, তোমার কর্তব্যও বটে। কিন্তু হয়ত এটা তোমার মনে হবে যে, যে-শয়তান তুমি নিজে শুদ্ধ বড় বড় নেতা, মহাত্মা গান্ধী এবং সাত-আটটি প্রাদেশিক মন্ত্রিসভার বিরোধিতা সত্ত্বেও রাষ্ট্রপতিরূপে পুনর্নির্বাচিত হয়েছে, তার উদ্ধার পাবার উপযুক্ত কিছুটা গুণও আছে। সে তার রাষ্ট্রপতি থাকার বছরে দেশের জন্য এমন কিছু কাজ

করেছে, যার জন্য তার পিছনে কোন সংস্থা না থাকলেও প্রচণ্ড বাধার বিরুদ্ধে এত ভোট পেতে সক্ষম হয়েছে।

তোমার ২২শে ফেব্রুয়ারীর বিবৃতিতে তুমি আরো বলেছ, 'আমি কংগ্রেস রাষ্ট্রপতিকে এই প্রস্তাব করি যে, এইটিই প্রথম এবং সবচেয়ে দরকারী, এবং এটি বিবেচিত হওয়া উচিত, কিন্তু এ সম্পর্কে কোন চেষ্টাই এখন পর্যন্ত হয়নি।' এই কথা ক'টা লেখার সময় একথা কি একবারও মনে হয়নি যে, এই ভুল বোঝাবুঝি দূর করার জন্য সর্দার প্যাটেল এবং অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে দেখা করার আমার প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছিল, এবং সেটা করবার সময় ছিল ২২শে ফেব্রুয়ারীর ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকেই? অথবা তুমি কি মনে করলে যে, আমি ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক এড়িয়ে গেছি? এটা সত্য যে, আমি 'অপবাদের ব্যাপার' নিয়ে মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে ১৫ই ফেব্রুয়ারী আলোচনা করিনি, যদিও তিনি একবার এ বিষয়ে উল্লেখ করেছিলেন। কিন্তু তখন আমি তোমার নিজের মত অনুসারে—ব্যক্তিগত ব্যাপারের চেয়ে তত্ত্ব এবং কার্যসূচীর প্রতিই বেশি গুরুত্ব আরোপ করছিলাম। তবুও, তোমাকে একথা বলতে পারি যে, মহাত্মা গান্ধী যখন বলেন যে, সর্দার প্যাটেল এবং অন্যান্যরা একই কমিটিতে আমার সঙ্গে সহযোগিতা করবেন না, আমি তাঁকে বলি যে, আমি তাঁদের সঙ্গে ২২শে ফেব্রুয়ারী যখন দেখা হবে, তখন এ বিষয়ে আলাপ করে তাঁদের সহ-যোগিতা লাভ করতে চেষ্টা করব। তুমিও হয়ত আমার সঙ্গে একমত হবে যে, যদি কোন অপবাদের ব্যাপার থেকেই থাকে, তা মহাত্মা গান্ধীর সম্বন্ধে উল্লেখ করা হয়নি, উল্লিখিত হয়েছে ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের সম্বন্ধে, এবং শেষোক্তদের সঙ্গেই এ বিষয়ে আলাপ করা উচিত ছিল।

উপরোক্ত বিবৃতিতে তুমি আমাকে লিখিত ভাবে সঠিক বিশ্লেষণ করতে বলেছ যে, আমি বাম আর দক্ষিণ—এই দুটি শব্দে কি বুঝি। এমন প্রশ্ন যে তোমার মত মানুষ করতেই পারে না, এই-ই আমার ভাবা উচিত ছিল। তুমি কি হরিপুরায় অখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির কাছে আচার্য কৃপালনী এবং তোমার পেশ করা বিবরণীর কথা ভুলে গেছ? তুমি কি তোমার বিবরণীতে বলনি যে, দক্ষিণপন্থীরা বামপন্থীদের দাবিয়ে রাখতে চেষ্টা করছে। তোমার যদি দরকার মত বাম আর দক্ষিণ শব্দ দুটি ব্যবহার করার অনুমতি থেকে থাকে, তাহলে তেমনি অন্যেরই বা তা থাকবে না কেন?

তুমি আমার বিরুদ্ধে আরো অভিযোগ করেছ যে, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক ব্যাপারে আমার নীতির আমি ব্যাখ্যা করিনি। আমি মনে করি, ঠিক হোক আর ভুলই হোক, আমার একটা নীতি আছে। ত্রিপুরীতে আমার সংক্ষিপ্ত রাষ্ট্রপতির ভাষণে আমি সুস্পষ্টভাবেই তার ইঙ্গিত দিই। আমার মত সামান্য লোকের মতে, ভারত এবং বাহিরের পরিস্থিতি বিচার করে—আমাদের সম্মুখে একমাত্র সমস্যা—একমাত্র কর্তব্য হচ্ছে ব্রিটিশ সরকারকে স্বরাজের ব্যাপার নিয়ে চাপ দেওয়া। এর সঙ্গে, দেশীয় রাজ্যগুলির আন্দোলনকে সারা দেশে একই সঙ্গে ছড়িয়ে দেবার ব্যাপক পরিকল্পনাও আমাদের দরকার। মনে হয়, আমার এই ধারণার স্পষ্ট ইঙ্গিত ত্রিপুরীর আগেই যখন আমাদের শান্তিনিকেতনে ও পরে আনন্দ ভবনে দেখা হয়, তখন দিই। আমি এই মাত্র যা লিখেছি সেটা অন্তত নির্দিষ্ট নীতি বলে ধরা যায়। আমি কি এখন জিজ্ঞেস করতে পারি তোমার নীতিটি কি? সদ্য প্রাপ্ত এক চিঠিতে তুমি ত্রিপুরী কংগ্রেসে গৃহীত জাতীয় দাবীর প্রস্তাবটির উল্লেখ করেছ, তুমি একে মস্ত কিছু বলেই মনে কর বলে ধারণা হচ্ছে। আমি দুঃখিত যে, অমন সুন্দরভাবে তৈরী অস্পষ্ট প্রস্তাব, যার ভিতরে অনেক সাধু মামুলি বুলি আছে, তা আমাকে

স্পর্শ করে না। এটি তো আমাদের কোন পথই দেখায় না। যদি স্বরাজের জন্য আমরা ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে লড়াই করতেই চাই, আর যদি সময়টিও ঠিক বলে মনে করি, তাহলে এস স্পষ্টভাবেই সেকথা বলি আর সেই কাজ নিয়ে এগিয়ে যাই। তুমি আমাকে একাধিকবার বলেছ, চূড়ান্ত ঘোষণার কথাটা তোমার মনে সায় দেয় না। গত বিশ বছর ধরে মহাত্মা গান্ধী ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত ঘোষণা করে আসছেন। এই চূড়ান্ত ঘোষণা এবং প্রয়োজন হলে একযোগে যুদ্ধের প্রস্তুতি দ্বারাই তিনি ব্রিটিশ সরকারের কাছ থেকে এতখানি আদায় করতে সক্ষম হয়েছেন। সত্যিই যদি তুমি বিশ্বাস করে থাক যে, আমাদের জাতীয় দাবি নিয়ে জোর করার সময় এসেছে, তুমি চূড়ান্ত ঘোষণা ছাড়া, অন্য কি ভাবে আর এগুতে পার? এই সেদিন মহাত্মা গান্ধী রাজকোটের ব্যাপারে চূড়ান্ত ঘোষণা জারী করেছেন। আমি প্রস্তাব করছি বলেই কি তুমি চূড়ান্ত ঘোষণার বিরুদ্ধে আপত্তি করছ? যদি তাই-ই হয়, তাহলে হেঁয়ালী না করে স্পষ্ট বল।

মোট কথা, আমাদের আভ্যন্তরীন রাজনীতি সম্পর্কে তোমার নীতি কি আমি বুঝি না। তোমার একটা বিবৃতি থেকেই পড়েছি বলে মনে পড়ছে যে, তোমার মতে রাজকোট এবং জয়পুরের ব্যাপার অন্যান্য রাজনীতিক প্রশ্নগুলিকে আচ্ছন্ন করে ফেলবে। তোমার মতো একজন বিখ্যাত নেতার কাছ থেকে এমন মন্তব্য পেয়ে আমি স্তম্ভিত হয়েছিলাম। অন্য কোন প্রশ্ন কি করে স্বরাজের প্রধান বিষয়টিকে ঢেকে দেবে, সে তো আমার ধারণার বাইরে। রাজকোট তো এই বিরাট দেশে একটি ক্ষুদ্র বিন্দুমাত্র। জয়পুরের আয়তন রাজকোটের চেয়ে কিছুটা বড় বটে, কিন্তু এমন কি জয়পুরের ব্যাপারটাও ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে আমাদের প্রধান সংগ্রামের তুলনায় ডাঁশের কামড় ছাড়া কিছুই নয়। অধিকন্তু, ছশো বা তার চেয়েও বেশি দেশীয় রাজ্য ভারতে আছে একথা আমরা ভুলতে পারিনে। আমরা বর্তমান এই টুকরো-টাকরা, তালি-মারা আর খুবলে-খাওয়া নীতি গ্রহণ করে যদি অন্য দেশীয় রাজ্যগুলির গণ-সংগ্রাম থামিয়ে দিই, তাহলে ব্যক্তি-স্বাধীনতা অর্জন এবং দেশীয় রাজ্যগুলিতে দায়িত্বশীল সরকার বসাতে আমাদের আড়াইশো বছর লেগে যাবে। তারপরে আমরা স্বরাজের কথা ভাবব।

আন্তর্জাতিক ব্যাপারে, তোমার নীতি হয়ত এর চেয়েও বেশি অস্পষ্ট। কিছুদিন আগে তুমি যখন ওয়ার্কিং কমিটির সম্মুখে ভারতে ইহুদীদের আশ্রয় দিতে চেয়ে এক প্রস্তাব পেশ কর, তখন আমি স্তম্ভিত হয়ে যাই। ওয়ার্কিং কমিটি (হয়ত মহাত্মা গান্ধীর সম্মতি নিয়েই) যখন সেটা নাকচ করে দেন, তুমি মর্মাহত হয়ে পড়। পররাষ্ট্র নীতি বাস্তবতার বিষয়, বেশির ভাগই জাতির স্বার্থের দিকে দৃষ্টি রেখে তা নির্ধারিত হয়। উদাহরণ-স্বরূপ সোবিয়েৎ রাশিয়াকেই ধর। আভ্যন্তরীন রাজ-নীতিতে যতই সাম্যবাদ থাকুক, তার পররাষ্ট্র নীতিতে সে কখনোই ভাবালুতাকে প্রাধান্য দেয় না। তাই সে তার স্বার্থের অনুকূল হবে বলেই ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হতে দ্বিধা করেনি। ফরাসী-সোবিয়েৎ চুক্তি, এবং চেকোশ্লাভাক-সোবিয়েৎ চুক্তি এবিষয়ে উদাহরণ স্বরূপ। এমন কি আজও, সোবিয়েৎ রাশিয়া ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে চুক্তি-আবদ্ধ হতে ব্যগ্র। এখন বল তো তোমার পররাষ্ট্র নীতি কি? গেঁজলা-ওঠা ভাবাবেগ এবং সাধু ধরতাই বুলি দিয়ে পররাষ্ট্র নীতি তৈরি হয় না। সব সময়েই পরাজিত আদর্শের ওকালতি করে লাভ নেই; আর একদিকে জার্মানী আর ইতালীকে নিন্দা করে, অন্যদিকে ব্রিটিশ এবং ফরাসী সাম্রাজ্যবাদকে সৎস্বভাবের সার্টিফিকেট দিয়েও কাজ হয় না।

কিছুদিন থেকেই আমি এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট প্রতি জনকে—তার মধ্যে মহাত্মা গান্ধী

এবং তুমিও আছ, জোর দিয়ে বলছি যে, ভারতের সুবিধার জন্য আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিকে কাজে লাগাতে হবে—এবং সেই উদ্দেশ্যেই ব্রিটিশ সরকারকে আমাদের জাতীয় দাবি চূড়ান্ত ঘোষণার আকারে উপহার দিতে হবে; কিন্তু আমি তোমার বা মহাত্মাজীর উপর কোনো প্রভাবই বিস্তার করতে পারিনি। যদিও ভারতীয় জনসাধারণের একটি বড় ভাগ আমার এই মত গ্রহণ করে, এবং গ্রেট ব্রিটেনের ভারতীয় ছাত্রেরা আমার নীতির অনুমোদন করে বহু-স্বাক্ষর সম্বলিত একখানি দলিল পাঠায়। আজ ত্রিপুরী প্রস্তাবের বাধা সত্ত্বেও কেন আমি তৎক্ষণাৎ ওয়ার্কিং কমিটি নিযুক্ত করিনি বলে যখন তোমার খুঁত ধরাই উচিত, তখন আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি হঠাৎ তোমার চোখে অতিরিক্ত গুরুত্ব নিয়েই দেখা দিচ্ছে। জিজ্ঞেস করতে পারি কি, য়ুরোপে আজ কি এমন ঘটেছে, যা আশা করা যায়নি? বসন্তকালে য়ুরোপে যে সংকট দেখা দেবে, তা কি আন্তর্জাতিক রাজনীতির প্রতিটি ছাত্র জানত না? আমি যখন ব্রিটিশ সরকারকে চূড়ান্ত জবাব দেবার কথা বলি, তখন কি তার বার বার উল্লেখ করিনি?

তোমার বিবৃতির আর একটি অংশ ধরা যাক। তুমি বলছ, 'ওয়ার্কিং কমিটির সাময়িকভাবে লোপ পেয়েছে, এবং রাষ্ট্রপতি হয়ত তাঁর ইচ্ছামতো স্বাধীনভাবে তাঁর প্রস্তাবগুলি তৈরি করে কংগ্রেসের সম্মুখে পেশ করতে পারছেন। তাঁর ইচ্ছানুসারে, এমন কি নিয়মিত কাজগুলি সম্পন্নের ব্যাপারেও কোন বৈঠক বসেনি।' আমি তো অবাক হয়ে গেছি, এমন অর্ধ সত্য বা একে কি সম্পূর্ণ অসত্য বলব—তুমি কি করে এ সম্পর্কে দোষী হলে? ওয়ার্কিং কমিটির বারো জন সদস্য হঠাৎ আকস্মিকভাবেই তাঁদের পদত্যাগপত্র আমর মুখের উপর ছুঁড়ে মারলেন, আর এখনো তুমি এই তাদের দোষী না করে আমাকে দোষী করছ, এই কল্পিত ভিত্তির উপরে বিশ্বাস করে যে আমি প্রস্তাবগুলি তৈরী করবার বিষয়ে মুক্ত হস্ত চাই। তারপরে, কখন আমি তোমাকে বাঁধাধরা কাজ করতে বাধা দিয়েছি? এমন কি কংগ্রেসে প্রস্তাব গঠনের প্রধান ব্যাপারে, ত্রিপুরী কংগ্রেস অবধি যদিও আমি ওয়ার্কিং কমিটি স্থগিত রাখার প্রস্তাব করি, তবুও আমি কি সর্দার প্যাটেলকে আমার কাছে অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে পরামর্শ করে তাঁদের মতামত তারযোগে পাঠাতে বলি নি? তোমার যদি এই সম্পর্কে সন্দেহ থেকে থাকে, সর্দারের কাছে আমার প্রেরিত তারখানার দিকে একবার দয়া করে চেয়ে দেখো। আমার তারটি এই ছিল—

সর্দার প্যাটেল, ওয়ার্ধা।

অনুগ্রহ করে মহাত্মাজীকে প্রেরিত আমার তারখানি দেখবেন। দুঃখের সঙ্গেই অনুভব করছি যে, কংগ্রেস অধিবেশন অবধি ওয়ার্কিং কমিটি স্থগিত রাখতে হবে। অনুগ্রহ করে সহকর্মীদের সঙ্গে পরামর্শ করে মতামত তারযোগে জানান—সুভাষ।

ত্রিপুরী অধিবেশন শেষ হবার সাতদিন পরে তুমি আমাকে এই মর্মে তার পাঠাও যে, কংগ্রেসের ব্যাপারে যে, অচল দশা দেখা দিয়েছে, তার জন্যে দায়ী আমি। তোমার সমস্তখানি সুবিচার বুদ্ধি থাকা সত্ত্বেও এটা তোমার মনে হ'ল না যে, ত্রিপুরী কংগ্রেস যখন পণ্ডিত পন্থ-এর প্রস্তাব পাশ করেন, তখন তাঁরা সম্পূর্ণভাবেই জানতেন যে আমি ভীষণভাবে অসুস্থ, আর মহাত্মা গান্ধীও ত্রিপুরীতে আসেন নি, এবং আমাদের পক্ষে অদূর ভবিষ্যতেও দেখা হওয়া শক্ত। এটাও তোমার মনে হয়নি যে, আমার হাত থেকে ওয়ার্কিং কমিটি নিযুক্ত করার ক্ষমতা সংবিধান-বিরোধী এবং বেআইনীভাবে কেড়ে নিয়ে এই অচল অবস্থার জন্য কংগ্রেস নিজেই দায়ী হয়েছে। পণ্ডিত পন্থের প্রস্তাব দ্বারা যদি সংবিধান বিশ্রীভাবে না ভঙ্গ করা হোত, তাহলে আমি ১৯৩৯ সালের ১৩ই জুন ওয়ার্কিং কমিটি নিযুক্ত করতাম। কংগ্রেস

শেষ হবার মাত্র সাতদিন পরেই তুমি আমার বিরুদ্ধে গণবিক্ষোভ আন্দোলন শুরু কর, যদিও তুমি আমার স্বাস্থ্যের অবস্থা বেশ জানতে, এবং আমার কাছে প্রেরিত তোমার তার আমার হাতে পেঁছবার আগেই খবরের কাগজে বের হয়। কিন্তু ত্রিপুরীর আগে যখন পূর্ণ পক্ষকাল ধরে কংগ্রেসের কাজ বারোজন ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যের পদত্যাগের জন্য বন্ধ হয়ে যায়, তখন কি তুমি প্রতিবাদ-স্বরূপ একটি কথাও বলেছিলে? আমাকে কি একটি সহানুভূতির কথাও জানিয়েছিলে? তোমার সদ্য-লেখা এক চিঠিতে তুমি বলেছ, তুমি নিজের মতই কথা বল ও কাজ কর, অন্য কারো প্রতিনিধিত্ব কর বলে যেন ধরা না হয়। আমাদের পক্ষে এখন এই দুর্ভাগ্য যে, তুমি অপরের কাছে দক্ষিণপন্থীদের সমর্থনকারী বলে প্রতীয়মান হচ্ছ, একথা তোমার কখনো মনে হয়নি। তোমার ২৬শে মার্চ তারিখের শেষ চিঠি-খানির কথাই ধর। তুমি সেখানে বল—আমি আজ সংবাদপত্রে তোমার বিবৃতি পড়েছি। আমার ভয় হয়, এমন বিতর্কমূলক বিবৃতি বড় বেশি সাহায্য করবে না।'

যখন আমি নানা দিক থেকে অন্যায় ভাবে আক্রান্ত—লোকে যে বলে, কোমরবন্ধের নীচেই আঘাতপ্রাপ্ত (হীনভাবে আক্রান্ত), তুমি তো প্রতিবাদের একটি কথাও বলছ না—একটু সহানুভূতিও জানাচ্ছ না। কিন্তু যখনি স্বপক্ষ সমর্থনে আমি কিছু বলছি—তোমার প্রতিক্রিয়া হচ্ছে এই—'অমন বিতর্কমূলক বিবৃতিতে বেশি কিছু এগোবে না।' আমার রাজনীতিক প্রতিদ্বন্দ্বীরা যেসব বিতর্কমূলক বিবৃতি লিখেছেন সে সম্পর্কে কি তুমি এই একই কথা বলেছ? হয়ত তুমি সেগুলি সানন্দে চোখে মুখে গিলছ।

আবার তোমার ২২শে ফেব্রুয়ারীর বিবৃতিতে বলেছ, স্থানীয় কংগ্রেসের বিবাদ-গুলি চিরাচরিত ছক-মাফিক না বিচার করে সোজাসুজি উপর থেকে বিচারের ঝোঁক দেখা যাচ্ছে, যাতে করে এই ফল দাঁড়াচ্ছে যে, বিশেষ কোনো গোষ্ঠী বা দলগুলির সুবিধে করে দেওয়া হচ্ছে, তাতে গোলযোগ বাড়ছে এবং কংগ্রেসের কাজে ক্ষতিও হচ্ছে। ...আমার দেখে দুঃখ হয় যে আমাদের সংস্থার ঠিক ভিতরেই এমন সব নতুন প্রণালী প্রচলিত হচ্ছে, যাতে স্থানীয় সংঘাত আরো উচ্চতর স্থানেই ছড়িয়ে পড়তে দিচ্ছে।

আমি এমন অভিযোগ পড়ে ব্যথিত ও বিস্মিত হয়েছি, কারণ তুমি তো সবগুলি তথ্য অনুন্ধান করে দেখতে চেষ্টাও করনি। অন্ততঃ এইটুকু তো করতে পারতে—আমি যেসব জিনিস জানি আমাকে তো জিজ্ঞেস করতে পারতে। জানি না, তুমি যখন এই চিঠি লেখ, তোমার মনে সত্যই কি ছিল। একজন বন্ধু ইঙ্গিত করলেন যে, তুমি দিল্লী প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির ব্যাপারটা ভাবছিলে। যদি তাই-ই হয়, তোমাকে স্পষ্টই জানাই যে, দিল্লী সম্পর্কে যা করেছি, আমার পক্ষে সেইটেই ঠিক কাজ হয়েছে।

এই সম্পর্কে তোমাকে বলি, উপর থেকে বাধা দেবার ব্যাপারে কোন কংগ্রেসী রাষ্ট্রপতিই তোমাকে হার মানাতে পারবেন না। হয়ত রাষ্ট্রপতি হিসেবে তুমি যা করেছ, তা ভুলে গেছ, হয়তো বা নিজের দিকে বিষয়মুখ হয়ে দেখা শক্ত। ২২শে ফেব্রুয়ারীতে তুমি অভিযোগ করেছ, যে আমি উপর থেকে বাধা দেই। তুমি কি ভুলে গেলে যে, ৪ঠা ফেব্রুয়ারী তুমি আমাকে একখানা চিঠি লেখ, সেখানে তুমি আমাকে জোর দাবীহীন, নিষ্ক্রিয় কংগ্রেস সভাপতি বলে অভিযোগ করেছ। তুমি লিখলে—'ফলে তুমি কংগ্রেস সভাপতির চেয়ে একজন বক্তা রূপেই বেশি কাজ করেছ।' তোমার সবচেয়ে আপত্তিকর অভিযোগ এই যে, আমি দলগত ভাবে কাজ করছিলাম, এবং বিশেষ কোন দল বা গোষ্ঠীর পক্ষপাতীত্ব করছিলাম। সংবাদপত্রে এমন গুরুতর অভিযোগ ছুঁড়ে মারার আগে উপযুক্ত অনুসন্ধান করার ধৈর্যটুকুও কি

কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের সরকারী প্রধানের কাছে (আমার কাছে ব্যক্তিগতভাবে যদি নাই থেকে থাকে) ছিল না?

যদি নির্বাচনী দ্বন্দ্বকে কেউ গোটা হিসেবে দেখে, তাহলে তার মনে হতে পারে যে, প্রতিযোগিতা শেষ হবার পরে এই ব্যাপারটা সবাই বিস্মৃত হয়ে যাবে, বিরোধ চাপা পড়বে, মুষ্টিযুদ্ধের পরে যেমন হয়, মুষ্টিযোদ্ধারা হাসিমুখে পরস্পরের করমর্দন করে। কিন্তু সত্য এবং অহিংসা থাকা সত্ত্বেও, সেটা ঘটেনি। খেলোয়াড়ী মনোবৃত্তি নিয়ে ফলাফল গ্রহণ করা হয়নি, আমার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ পোষণ করা হয়েছে এবং প্রতিশোধোম্মত্ততা চালু হয়েছে। ওয়ার্কিং কমিটির অন্যান্য সদস্যদের পক্ষ হয়ে তুমি লগুড় ধারণ করেছ এবং তোমার সে দাবিও আছে বই কি। কিন্তু কখনো কি তোমার খেয়াল হয়নি যে, আমার পক্ষেও কিছু বলা যেতে পারত? ওয়ার্কিং কমিটির অন্যান্য সদস্যেরা যে আমার অনুপস্থিতিতে এবং আমার আড়ালে পট্টভিকে রাষ্ট্রপতিত্বের জন্য দাঁড় করাবার সিদ্ধান্ত করেন, তাতে কি কিছুই অন্যায় হয়নি? সর্দার প্যাটেল এবং অন্যান্যদের কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য হিসাবে কংগ্রেস ডেলিগেটদের কাছে ডঃ পট্টভির নির্বাচন-প্রার্থনা সমর্থনের জন্য আবেদন জানানো কি কোন অন্যায় হয়নি? সর্দার প্যাটেল যে নির্বাচনী ব্যাপারে মহাত্মা গান্ধীর নাম এবং ক্ষমতার পূর্ণ ব্যবহার করেন, তাতেও কি কোন অন্যায় হয়নি? সর্দার প্যাটেল যে বলেন, আমার পুনর্নির্বাচন দেশের পক্ষে ক্ষতিকর হবে—তাতেও কি কোন অন্যায় হয়নি? ভোট-ভিক্ষার ব্যাপারে যে, কংগ্রেসী মন্ত্রিসভাগুলিকে বিভিন্ন প্রদেশে ব্যবহার করা হয়েছে, তাতেও কি কোন অন্যায় হয়নি?

তথাকথিত 'অপবাদের' ব্যাপারে, আমার যা বলার আছে এরই মধ্যে সংবাদপত্রের বিবৃতিতে এবং ত্রিপুরীতে বিষয়-নির্বাচনী কমিটির সম্মুখে যে মন্তব্য পেশ করেছি তাতে বলেছি। তুমি কি ভুলে গেছ যে, যখন লর্ড লোথিয়ান ভারত সফর করে বেড়াচ্ছিলেন, তিনি প্রকাশ্যেই মন্তব্য করেন যে, সব কংগ্রেসী নেতারাই ফেডারাল পরিকল্পনার ব্যাপারে পণ্ডিত নেহরুর সঙ্গে একমত নন? এই মন্তব্য কিসের সূচক, কি তার তাৎপর্য?

তোমার ২২শে ফেব্রুয়ারীর বিবৃতিতে তুমি সর্বোচ্চ পদে অধিষ্ঠিতদের মধ্যে পারস্পরিক সন্দেহের আবহাওয়া এবং বিশ্বাসের অভাবের অভিযোগ করেছ। আমি কি তোমাকে বলতে পারি যে, রাষ্ট্রপতি নির্বাচনী অবধি, ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের মধ্যে সন্দেহ এবং বিশ্বাসের অভাব, তোমার চেয়ে আমার আমলে অনেক কম ছিল? তারই ফলে আমাদের কখনো পদত্যাগ করবার উপক্রম হয়নি, যেমন তোমারই মতে, তুমি একাধিক বার তা করেছ। আমি যতদূর জানি, গোলমালটা শুরু হয়েছে নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বীতায় আমার সাফল্যের পর থেকে। যদি আমি পরাস্ত হতাম, তাহলে খুব সম্ভবতঃ জনসাধারণ এই 'অপবাদের' ব্যাপারটা শুনত না।

একথা জাহির করা তোমার অভ্যাস যে, তুমি নিজে একা, এবং কারো প্রতিনিধিত্ব কর না, কোনো দলেও তুমি নেই। প্রায়ই এমন ভাবে কথাটা বল যেন তুমি এর জন্য হয় গর্বিত, নয়তো সুখী। আবার একই সঙ্গে তুমি নিজেকে সোশালিস্ট বলে অভিহিত কর—কখনো বা পুরোদস্তুর সোশালিস্টই বল। তোমার নিজের ধারণা অনুসারে সমাজবাদী কি করে ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদী হয় আমি তো বুঝি নে। একটি তো আর একটির বিরোধী। সমাজবাদ কি করে তোমার ধরনের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের ভিতর দিয়ে দেখা দেয়, সেও আমার কাছে এক রহস্য। কোন দলের নয় এই লেবেল নিয়ে মানুষ সবগুলি দলের প্রিয় হতে পারে, কিন্তু তার মূল্য কি? যদি কেউ কতগুলি নির্দিষ্ট ধারণা আর তত্ত্বে বিশ্বাসী হয়, তাহলে তাকে বাস্তবে রূপান্তরিত

করবার চেষ্টাই করা উচিত, এবং দল বা সংস্থার মাধ্যমেই তা কেবলমাত্র পারা যায়। দল ছাড়া কোন দেশে সমাজবাদ স্থাপিত বা তার অগ্রগতি হয়েছে, আমি তো শুনিনি। এমন কি মহাত্মা গান্ধীরও দল আছে।

আর একটা মত তুমি প্রায়ই আওড়াও, সেই সম্পর্কেই কিছু বলবার ইচ্ছে আছে—আমি জাতীয় ঐক্যের কথাই বলছি। আমি সর্বান্তঃকরণে এর পক্ষে, আমার বিশ্বাস সারা দেশও তাই। কিন্তু সুস্পষ্ট গণ্ডী তার আছে। আমাদের যে ঐক্যের জন্য চেষ্টা করতে হবে, বা যাকে স্থায়ী রাখতে হবে, সেটি হবে কাজের ঐক্য, নিষ্ক্রিয়তার ঐক্য নয়। সব ক্ষেত্রেই বিভেদটা খারাপ নয়। কখনো কখনো প্রগতির জন্য বিভেদের প্রয়োজন হয়। ১৯০৩ সালে যখন রাশিয়ার সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টি বলশেভিক আর মেনশেভিক দলে বিভক্ত হয়ে যায়, লেনিন স্বস্তির নিঃশ্বাসই ফেলেছিলেন। মেনশেভিকদের পাষাণ-সমান ভার থেকে তিনি মুক্ত হয়ে এই অনুভব কর্ছিরলেন যে, যাহোক, দ্রুত উন্নতির পথ খুলে গেল। ভারতে যখন 'নরমপন্থীরা' কংগ্রেস থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে নিলেন, প্রগতিবাদী কেউ এই বিভেদে দুঃখ করেন নি। পরে, যখন বহু কংগ্রেসী ১৯২০ সালে কংগ্রেস ছেড়ে দেন, বাকি যাঁরা রইলেন, 'তাঁরা তাঁদের এই ত্যাগে শোক করেন নি। এমনিধারা বিভেদ সত্যই প্রগতির সহায়। কিছুদিন হলো, আমরা ঐক্যকে এক অন্ধ সংস্কার করে তুলেছি। এতে গুপ্ত বিপদ নিহিত আছে। দুর্বলতার আড়াল-আবডাল বা প্রকৃত প্রগতি-বিরোধী কোন সমঝোতার অজুহাত হিসেবেও এটি ব্যবহৃত হতে পারে। তোমার নিজের দৃষ্টান্তই ধর। তুমি গান্ধী-আরউইন চুক্তির বিরোধী ছিলে—কিন্তু ঐক্যের ওজুহাতে তুমি এর কাছে আত্মসমর্পণ করলে। আবার, প্রদেশগুলিতে মন্ত্রীত্ব গ্রহণের তুমি বিরোধী ছিলে কিন্তু যখন মন্ত্রীত্ব গ্রহণের সিদ্ধান্ত হ'ল, হয়তো ঐ একই ওজুহাতে তুমি আত্মসমর্পণ করলে। তর্কের খাতিরেই ধর, কোন কারণে কংগ্রেসের অধিকাংশ সভ্যই ফেডারাল পরিকল্পনা অনুসারে কাজ করতে রাজী হলেন, তখন ফেডারেশন-বিরোধীরা তাদের তীব্র বিবেকের বিরুদ্ধে মতবাদ সত্ত্বেও, ঐ একই ঐক্যের ওজুহাতে তাঁদের রাজনীতিক বিবেক বিরোধী ফেডারাল পরিকল্পনা মেনে নেবার জন্য প্রলুব্ধ হয়ে উঠলেন।

বিপ্লব আন্দোলনে ঐক্য তো লক্ষ্য নয়, উপায় মাত্র। এটা যতক্ষণ প্রগতিকে এগিয়ে দেয়, ততক্ষণই তা কাম্য। যে-মুহূর্তে এটি প্রগতিকে বাধা দিতে চায়, সেই মুহূর্তেই সে মন্দ হয়ে দেখা দেয়। আমি কি জিজ্ঞেস করতে পারি, কংগ্রেস যদি সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে ফেডারাল পরিকল্পনা মেনে নেয়, তুমি কি করবে? তুমি কি সেই সিদ্ধান্ত অনুসারেই চলবে, না এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে?

এলাহাবাদ থেকে তোমার ৪ঠা ফেব্রুয়ারীর লেখা চিঠিখানি এই জন্যেই কৌতূহল জাগায় যে, এতে দেখা যায় তখনো তুমি আমার উপরে বিরূপ হওনি, যেমন পরে হয়েছ। যেমন, তুমি চিঠিতে বল, 'যেমন আমি তোমাকে বলি, তোমার প্রতিদ্বন্দ্বীতা-মূলক নির্বাচন কিছু মঙ্গল ও কিছু ক্ষতি করেছে। পরে, তোমার এই মত দেখা যায় যে, আমার পুনঃনির্বাচন অবিচ্ছিন্ন অমঙ্গল। আবারও তুমি লেখ, 'ভবিষ্যৎকে আমাদের ব্যাপকভাবে দেখতে হবে, ব্যক্তিগতভাবে দেখলে চলবে না। যেমনটি আশা করা গিয়েছিল, তেমনটি হয়নি বলে আমাদের মধ্যে কারোই ফুঁসে ওঠা ভাল নয়। যা-ই হোক না কেন, আমাদের সবচেয়ে যা ভাল তারই উদ্দেশ্যের জন্য উৎসর্গ করতে হবে।' এটা স্পষ্ট যে, তুমি 'অপবাদে'র ব্যাপারে পরে যতখানি গুরুত্ব দিয়েছ, আগে ততখানি দাওনি। শুধু তাই-ই নয়; আমি যেমন আগেই বলেছি যে, 'অপবাদের' ব্যাপারে পরে যে আন্দোলনের উসকানি দেওয়া হয়, সেটার বেশির ভাগই তোমার তৈরি। এই সম্পর্কে তোমার হয়ত মনে পড়তে পারে যে, যখন

শান্তি নিকেতনে আমাদের দেখা হয়, আমি তোমাকে বলি যে, যদি আমাদের প্রচেষ্টা সত্ত্বেও ওয়ার্কিং কমিটির অন্যান্য সভ্যদের সহযোগিতা বজায় রাখতে অসমর্থ হই, কংগ্রেস চালাবার দায়িত্বে অবহেলা করা আমাদের উচিত হবে না। তুমি তখন আমার সঙ্গে একমত হয়েছিলে। পরে, কি কারণে জানি না, তুমি সশরীরে অপর পক্ষে গিয়ে যোগ দিলে। অবশ্য, তা করবার তোমার সম্পূর্ণ অধিকার আছে, কিন্তু তোমার সমাজবাদ আর বামপন্থার কি হ'ল?

তোমার ৪ঠা ফেব্রুয়ারীর চিঠিতে তুমি একাধিকবার অভিযোগ করেছ যে, ফেডারেশনের মত জীবন্ত প্রশ্নগুলি আমার রাষ্ট্রপতি থাকা-কালীন আলোচিত হয়নি। তুমি নিজে যখন প্রায় ছ'মাস দেশের বাইরে ছিলে, তখন এমনি অভিযোগ করা তো অদ্ভুত ব্যাপার। তুমি কি জান যে, যখন বুলাভাই দেশাই-এর লণ্ডনে প্রদত্ত বলে ধরে নেওয়া বক্তৃতার ব্যাপারে ঝড় ওঠে, তখন আমি ওয়ার্কিং কমিটির কাছে এই প্রস্তাব করি যে, ফেডারেশনের বিরুদ্ধে আমাদের প্রস্তাবের আবার পুনরাবৃত্তি এবং ফেডারেশন-বিরোধী প্রচার দেশে করা উচিত—আমার প্রস্তাবটি অপ্রয়োজনীয় বলে বিবেচিত হয়? পরে যখন সেপ্টেম্বরে দিল্লীতে ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক বসে, অবশেষে ফেডারেশনের নিন্দা করে একটি প্রস্তাব নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি কর্তৃক গৃহীত হয়, তুমি কি সেকথা জান?

চিঠিতে আর একটি অভিযোগ তুমি করেছ যে, আমি ওয়ার্কিং কমিটিতে সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় ভাব নিয়েছিলাম, এর ফলে পরিচালক সভাপতির চেয়ে সভাপাল হিসেবেই আমি বেশি কাজ করেছি। এমন মন্তব্য একটু নির্মমই হয়েছে। এটা কি ভুল বলা হবে যে, যেমন সব সময়েই হয়, তুমি ওয়ার্কিং কমিটির বেশির ভাগ সময় একচেটে দখল করে বসেছিলে? ওয়ার্কিং কমিটিতে তোমার মত এমন বাক্যবাগীশ যদি আর একজন সদস্য থাকতেন, আমার তো মনে হয় না যে আমরা কাজ শেষ করতে পারতাম। তাছাড়া তোমার ভাবভঙ্গীই এমন ছিল যে তুমি পারলে রাষ্ট্রপতির প্রায় সমস্ত কাজ বুঝি দখল করেই বসতে। তোমাকে ঠেলে তুলে দিয়ে আমি অবশ্য ব্যাপারটার সমধান করতে পারতাম, কিন্তু তাতে আমাদের মধ্যে প্রকাশ্য বিবাদেরই সৃষ্টি হোত। নির্মম সত্য যদি বলতে হয় তো বলি, তুমি কখনো কখনো ওয়ার্কিং কমিটিতে আদুরে গোপালের মত ব্যবহার করতে এবং প্রায়ই রেগে উঠতে। তোমার এই 'স্নায়ুসবলতা' এবং লাফানো-ঝাঁপানো সত্ত্বেও কি ফল পেলে? তুমি সাধারণতঃ ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঠিক থাকতে পার, শেষে তো এলিয়ে পড়। সর্দার প্যাটেল এবং অন্যান্যদের তোমার সঙ্গে ব্যবহার করার এক চমৎকার কৌশল ছিল। ওঁরা তোমাকে শুধু বক্‌বক্ করতে দেবেন, শেষে ওঁরা তোমাকে ওঁদের প্রস্তাবের খসড়া করতে বলে শেষ করবেন। একবার প্রস্তাবের খসড়া করতে দিলেই, প্রস্তাবটি যারই হোক না কেন, তুমি তো খুশী। আমি তো খুব কমই দেখেছি, তুমি শেষ অবধি নিজের যুক্তি আঁকড়ে ধরে আছ।

আমার বিরুদ্ধে আর একটি অদ্ভুত অভিযোগ হ'ল, এ আই সি সি দপ্তরের গত এক বছরের মধ্যে অনেকখানি অবনতি ঘটেছে। জানি না, রাষ্ট্রপতির কর্তব্য সম্পর্কে তুমি কি ভাব। আমার মতে, তিনি মহিমান্বিত কেরাণী বা সেক্রেটারীর চেয়ে ঢের উপরেই হবেন। রাষ্ট্রপতি হিসেবে তোমার সেক্রেটারীর কাজ জবর-দখল করার অভ্যাস ছিল বটে, কিন্তু অন্যান্য রাষ্ট্রপতিরা যে তাই-ই করবেন এমন তো কোন কারণ নেই। এ ছাড়াও, আমার বড় মুস্কিল এই যে, এ আই সি সি দপ্তর দূরে অবস্থিত, এবং সাধারণ সম্পাদকটি আমার বাছাই-করা মানুষ নন। এটা বলা অতিরঞ্জন হবে না যে, সম্পাদক যেভাবে সভাপতির প্রতি বিশ্বস্ত হন, সাধারণ সম্পাদক সেভাবে আমার প্রতি বিশ্বস্ত নন (আমি ইচ্ছে করেই খুব হাল্কা করে ব্যাপারটা বলছি)।

বস্তুত, কৃপালনীজীকে আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমার উপরে চাপানো হয়েছে। তোমার হয়ত মনে আছে, আমি এ আই সি সি দপ্তরের একটা অংশ কলকাতায় স্থানান্তরিত করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলাম, যাতে আমি ঠিকভাবে তার কাজ দেখতে পারি। তোমরা সবাই তাতে বাধা দিলে, এখন তুমি ঘুরে দাঁড়িয়ে এ আই সি সি দপ্তরের ত্রুটি নিয়ে আমাকে দোষী করছ! তোমার অভিযোগ-মতো এ আই সি সি দপ্তরের যদি সত্যই অবনতি হয়ে থাকে, তার জন্য দায়ী সাধারণ সম্পাদক, আমি নই। তুমি শুধু আমার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ আনতে পার যে, আমার সভাপতি থাকা-কালীন, সাধারণ সম্পাদকের কাজে কম বাধা দেওয়া হয়েছে, আর শেষোক্ত ব্যক্তিটি আগের চেয়ে কার্যত বেশি ক্ষমতাই উপভোগ করেছেন। ফলে, এ আই সি সি দপ্তরের যদি সত্যই অবনতি ঘটে থাকে, তার জন্য দায়ী সাধারণ সম্পাদক স্বয়ং, আমি নিজে নই।

তুমি তথ্য না জেনে অভিযোগ করেছ যে, বর্তমানে যে-আকারে বোম্বাই ট্রেড ডিসপ্যুট বিলটি পাশ হয়েছে, আমি তাকে বাধা দেবার জন্য আমার যথাসাধ্য করি নি, আমি এতে অবাক হয়ে গেছি। আসলে, তুমি কিছুদিন হ'ল তথ্য জানবার চেষ্টা না করে কখনো-কখনো বা প্রকাশ্যে আমার বিরুদ্ধে অভিযোগের কলাবিদ্যায় উন্নতিই করেছ। এই সম্পর্কে আমি কি করেছি তা যদি জানতে চাও তো, স্বয়ং সর্দার প্যাটেলকে জিজ্ঞেস করাই সবচেয়ে ভাল। এই প্রসঙ্গে তার সঙ্গে বিচ্ছেদ করিনি মাত্র, যদি এইটাই অপরাধ হয়, আমি দোষী স্বীকার করে নিচ্ছি। ভাল কথা, তুমি কি জান যে, বোম্বাই সি এস পি এই বিলটিকে বর্তমান আকারেই সমর্থন করে? এখন তোমার কথায় আসছি। আমি কি জিজ্ঞেস করতে পারি, বিলটির বিরুদ্ধে বাধা দেবার ব্যাপারে তুমি কি করেছিলে? তুমি যখন বোম্বাইতে ফিরে এলে, আমার বিশ্বাস তখনো তোমার কিছু করার সময় ছিল। বহু ট্রেড ইউনিয়ন-কর্মীও তোমার কাছে আসেন, তাঁদের তুমি কিছুটা আশাও দাও। আমার চেয়ে তোমার অবস্থা ভাল, আমি যতটা না পারি, তার চেয়ে ঢের বেশি তুমি গান্ধীজীকে প্রভাবিত করতে পার। তুমি যদি চেষ্টা করতে, আমি যে ব্যাপারে ব্যর্থ হয়েছি, তুমি হয়তো সফলই হতে। তুমি কি তা করেছিলে?

একটি ব্যাপারে তুমি প্রায়ই আমাকে ঠুকে থাক—সেটা সম্মেলিত মন্ত্রিসভা সম্পর্কে ধারণা। মতসর্বস্ব রাজনীতিজ্ঞ হিসেবে তুমি একেবারে সিদ্ধান্ত করে বসে আছ যে সম্মেলিত মন্ত্রীসভা হচ্ছে দক্ষিণপন্থীতার চাল। এই ব্যাপারে শেষ রায় দেবার আগে তুমি কি দয়া করে একটা জিনিস করবে? পক্ষকালের জন্য তুমি কি আসাম প্রদেশ ঘুরে এসে আমাকে বলবে যে, বর্তমানে সম্মেলিত মন্ত্রীসভা কি প্রগতিবাদী না প্রতিক্রিয়াশীল প্রতিষ্ঠান? এলাহাবাদে বসে থেকে বাস্তবের সঙ্গে যার সম্পর্ক নেই, এমন জ্ঞানের কথা বলে লাভ কি? সাদুল্লা মন্ত্রীসভার পতনের পর আমি যখন আসামে যাই, সেখানে এমন একজন কংগ্রেসী দেখিনি, যিনি সম্মেলিত মন্ত্রীসভার জন্য জোর দিয়ে বলেননি। কথাটা এই যে প্রদেশটা প্রতিক্রিয়াশীল মন্ত্রীসভার চাপে তখন গভীর আর্তনাদ করছিল। ব্যাপার তখন মন্দ হতে মন্দতর হচ্ছে এবং দুর্নীতি প্রতিদিনই বাড়ছে। যখন নূতন মন্ত্রীসভা কার্যভার গ্রহণ করলেন, তখন আসামের কংগ্রেসমনা জনগণ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে আবার বিশ্বাস আর আশা ফিরে পেলেন। যদি কার্যভার গ্রহণের নীতি সারা দেশের জন্য তুমি বাতিল করে দাও, আসাম এবং বাংলার কংগ্রেসসেবকদের সঙ্গে আমিও তাকে স্বাগত জানাব। কিন্তু কংগ্রেসী দল যদি সাতটি প্রদেশে কার্যভার গ্রহণ করেন, তখন বাকিগুলিতে সম্মেলিত মন্ত্রীসভাই হওয়া উচিত। নানা বাধা সত্ত্বেও আসামে সম্মেলিত মন্ত্রীসভার কার্যভার

গ্রহণের যে উন্নতি হয়েছে তা যদি তুমি কেবলমাত্র জানতে, তাহলে তোমার মত সম্পূর্ণ বদলে যেত।

আমার ভয় হয়, বাংলা সম্পর্কে তুমি কিছুই জান না। তোমার সভাপতি হবার দুবছরের মধ্যে তুমি প্রদেশটি ভ্রমণ করতেও কখনো চাওনি, যদিও যে ভয়ংকর নির্যাতনের ভিতর দিয়ে সে গেছে, তার জন্যেই অন্যান্য প্রদেশের চেয়ে তার উপরেই তোমার বেশি মনোযোগ দেওয়া উচিত ছিল। হক মন্ত্রীসভা কার্যভার নেবার পর প্রদেশটিতে কি ঘটেছে, তুমি কি কখনো জানবার চেষ্টা করেছ? যদি তা করতে, তাহলে মতসর্বস্ব রাজনীতিজ্ঞের মত কথা বলতে না। তখন আমার সঙ্গে একমত হতে যে, যদি প্রদেশটিকে বাঁচাতে হয় তাহলে হক্-মন্ত্রীসভাকে চলে যেতেই হবে, এবং বর্তমান এই অবস্থায় সবচেয়ে ভাল সরকারই আমাদের বসানো উচিত আর সেটি হবে সম্মেলিত মন্ত্রীসভা। কিন্তু একথা যখন বলছি, তখন এও তার সঙ্গে যোগ করে দিতে হবে যে, সম্মেলিত মন্ত্রীসভার প্রস্তাবটি এইজন্যই উঠেছে, কারণ পূর্ণ স্বরাজের সক্রিয় সংগ্রাম আজ বন্ধ। আগামী কাল এই সংগ্রাম শুরু করে দাও, সম্মেলিত মন্ত্রীসভার যত কথা হাওয়ায় মিলিয়ে যাবে।

এখন আমি তোমার দিল্লী থেকে প্রেরিত ২০শে মার্চের তারের কথা উল্লেখ করব। তুমি তাতে বলেছ 'আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি আর সংকটজনক জাতীয় সমস্যার জন্য ওয়ার্কিং কমিটি গড়া, দপ্তরের ব্যবস্থা একান্ত প্রয়োজনীয়' ইত্যাদি। যে কেউ শীঘ্রই ওয়ার্কিং কমিটি গঠনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে পারে—কিন্তু তোমার তারে যেটা আমাকে ব্যথা দিয়েছে, সেটা হচ্ছে আমার মুস্কিলের প্রতি তোমার একেবারে দরদের অভাব। তুমি নিজেই পুরোপুরি জানতে যে, যদি পন্থের প্রস্তাব না করা হোত, এবং পাশ না হোত, ওয়ার্কিং কমিটি ১৬ই মার্চই ঘোষণা করা হোত। যখন ঐ প্রস্তাব পাশ হয়, কংগ্রেস পুরোপুরিই জানতেন যে আমি সাংঘাতিকভাবে পীড়িত—মহাত্মা গান্ধীও ত্রিপুরীতে আসেন নি, এবং অদূর ভবিষ্যতে আমাদের দেখা হওয়াও শক্ত। আমি এটা বুঝি যে, ওয়ার্কিং কমিটি নিযুক্ত না করে যদি একমাস কেটে যেত, লোকরা স্বভাবতঃই অস্থির হয়ে উঠত। কিন্তু ত্রিপুরী কংগ্রেস শেষ হবার ঠিক এক সপ্তাহ পরেই, আবার আগের মতই, যেমন 'অপবাদের' ব্যাপারে হয়েছিল, তেমনি তুমিই আমার বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করে দিলে। মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে দেখা না করে কি ওয়ার্কিং কমিটি গড়া সহজ ছিল? আমি কি করে মহাত্মাজীর সঙ্গে দেখা করতাম? তুমি কি ভুলে গেলে যে, গত বছর ওয়ার্কিং কমিটি হরিপুরা কংগ্রেসের প্রায় ছয় সপ্তাহ পরে বসে? তুমি কি মনে কর জনগণ আর সংবাদপত্রের একটি ভাগ তোমার তার সংবাদপত্রে বার হবার পর যে আন্দোলন শুরু করে, তা সম্পূর্ণরূপে প্রকৃত ব্যাপার? ওয়ার্কিং কমিটি নিযুক্ত করার ব্যাপারে ইচ্ছে করেই বিরত থেকে আমি কি সচেতনভাবেই কংগ্রেসের ব্যাপারে এই অচল অবস্থার সৃষ্টি করেছিলাম? যদি আমার বিরুদ্ধে আন্দোলন একেবারেই বিধেয় না হয়, তাহলে আমি যখন শয্যাশায়ী ছিলাম তখন কি জননেতা হিসেবে আমার স্বপক্ষে একটা কথা বলার কথাও অনুভব করনি?

আমি আগেই তোমার অভিযোগের উল্লেখ করেছি যে, এ আই সি সির আমার সভাপতিত্বে অবনতি ঘটেছে। এই সম্পর্কে একটা কথা বলব। এটা কি তোমার মনে হয়নি যে, আমাকে নিন্দা করবার চেষ্টা করে, সাধারণ সম্পাদককে ছাড়াও তুমি সমস্ত দপ্তরকেও নিন্দা করেছ?

তোমার তারে তুমি 'সংকটজনক জাতীয় সমস্যার' উল্লেখ করেছ, যার জন্যে তুমি শীঘ্রই ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করাতে চাও. যদিও তুমি নিজে বলেছ—তুমি কমিটিতে

থাকতে চাও না। এই 'সংকটজনক জাতীয় সমস্যাগুলি' কি বল তো? আগের এক চিঠিতে তুমি লিখেছ যে, সবচেয়ে গুরুতর সমস্যা হচ্ছে রাজকোট আর জয়পুরের পরিস্থিতি। মহাত্মাজী নিজেই যখন এ ব্যাপারে হাত দিয়েছেন, তখন এগুলো তো এক হিসাবে ওয়ার্কিং কমিটি এবং এ আই সি সির আওতার বাইরে।

তাছাড়া আবার তোমার তারে তুমি আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির উল্লেখ করেছ। তোমার এই উল্লেখের পরে খবরের কাগজে লক্ষ্য করেছি যে, যাদের আদৌ আন্তর্জাতিক জ্ঞান নেই, বা আন্তর্জাতিক ব্যাপার বুঝতেও চায় না, এবং ভারতের সুবিধার জন্য তাকে কাজে লাগাবারও ইচ্ছে নেই—এমন কয়েকজন লোক হঠাৎ বোহেমিয়া এবং শ্লোভাকিয়ার ভাগ্য নিয়ে চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। এটা স্পষ্টই যে, আমাকে পেটাবার জন্য এইটেই সুবিধে মতো লাঠি বটে। গত দুই মাসে য়ুরোপে এমন আশাতীত কিছু ঘটেনি। সদ্যসদ্য চেকোশ্লোভাকিয়ায় যা ঘটেছে, সেটা তো মিউনিক চুক্তিরই উপসংহার। বস্তুত, আমি কংগ্রেসী বন্ধুদের গত ছ'মাস ধরে য়ুরোপ থেকে প্রাপ্ত সংবাদের উপর ভিত্তি করেই বলে আসছি যে, বসন্তকালে য়ুরোপে সংকট দেখা দেবে, আর সেটা গ্রীষ্ম অবধি থাকবেও, তাই আমাদের দিক থেকে জোরদার নীতি গ্রহণের জন্য চাপ দিচ্ছিলাম, যাতে পূর্ণ স্বরাজের দাবিতে একটা চূড়ান্ত দাবী ব্রিটিশ সরকারকে দেওয়া হয়। আমার মনে আছে, একবার কিছুদিন আগে (শান্তি নিকেতনে অথবা এলাহাবাদে) যখন তোমার কাছে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির কথা বলি এবং সেটা আমাদের জাতীয় দাবী পেশ করার পক্ষে যুক্তি হিসেবে ব্যবহার করতে বলি, তোমার এই নিরুত্তাপ জবাব পাওয়া যায় যে, আন্তর্জাতিক টানা-পোড়েন কয়েক বছর ধরে চলবে। হঠাৎ তুমি আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে উৎসাহিত হয়ে উঠেছ মনে হচ্ছে! কিন্তু আমাকে একথা বলতেই হবে, তোমার বা গান্ধীদলের দিক থেকে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিকে আমাদের উপকারে লাগাবার সদিচ্ছার কোন লক্ষণই দেখা যায় নি। তোমার তারে একথাও আছে যে, আন্তর্জাতিক সংকটে এ আই সি সির শীঘ্রই একটি বৈঠকের প্রয়োজন। কোন্ উদ্দেশ্যে বল তো? কোন কার্যকরী ফলবিহীন দীর্ঘ-বাক্য সম্বলিত এক প্রস্তাব গ্রহণ? অথবা তুমি কি তোমার মত বদলে এ আই সি সিকে বলবে যে, আমরা এখন পূর্ণ স্বরাজের দিকে এগিয়ে চলব এবং ব্রিটিশ সরকারকে চূড়ান্ত জবাবের আকারে আমাদের জাতীয় দাবি উপহার দেব? না। আমি অনুভব করি যে, হয় আমরা আন্তর্জাতিক রাজনীতি ব্যগ্রভাবেই গ্রহণ করে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিকে আমাদের কাজে লাগাব—নয় তো আদৌ ও সম্বন্ধে কথা বলব না। যদি কাজ করতেই না চাই, ও সম্পর্কে বাহ্যিক জাঁক দেখিয়ে লাভ নেই।

আমি শুনেছি, যখন তুমি দিল্লীতে ছিলে, তুমি এই মর্মে মহাত্মাজীর কাছে একটি খবর নিয়ে যাও যে, মওলানা আজাদ-এর সঙ্গে দেখা করতে তাঁর এলাহাবাদ যাওয়া উচিত। এ খবর সম্পূর্ণ ভুলও হতে পারে। কিন্তু যদি তা না হয়—তুমি কি তাঁর কাছে এই কথাই বলেছিলে যে, তিনি ধানবাদেও একবার যেতে পারেন? ২৪শে মার্চ আমার সেক্রেটারী যখন মহাত্মা গান্ধী ডাক্তারের নিষেধে ধানবাদে আসতে পারবেন না বলে সংবাদপত্রের বিবরণের প্রতিবাদ করার জন্য তোমাকে ফোন করেন, তাঁর যে ধানবাদে আসা উচিত এই মর্মে তুমি কোন ইচ্ছাই প্রকাশ করনি, যদিও তুমি বড়ই উদ্বিগ্ন যে, গান্ধীজীর ইচ্ছা অনুসারে আমি ওয়ার্কিং কমিটি গঠনের ঘোষণা করি। টেলিফোনে তুমি বল যে, ধানবাদ তাঁর সূচীতে নেই। মহাত্মাজীকে ধানবাদে পীড়াপীড়ি করে আনা তোমার পক্ষে কি খুবই শক্ত হোত? তুমি কি চেষ্টা করেছিলে? তুমি বলতে পার যে, রাজকোটের ব্যাপারে তাঁকে দিল্লী ফিরে যেতে

হোত। কিন্তু তিনি তো বড়লাটের সঙ্গে এরই মধ্যে দেখা সেরে ফেলেছেন। স্যার মরিস গয়ার-এর সঙ্গে দেখা করার ব্যাপার তো সর্দার প্যাটেলের, মহাত্মাজীর তো নয়।

রাজকোটের ব্যাপার সম্বন্ধে আমি কয়েকটি কথা বলতে চাই। মহাত্মাজী যে নিষ্পত্তির শর্তগুলিতে অনশন ভঙ্গ করেন, তুমি সেগুলিকে বড় বেশি কিছু বলেই ভাব। মহাত্মাজীর জীবন যে বাঁচল তাতে এমন ভারতবাসী নেই যে সুখী হয়নি, স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেনি। কিন্তু নিষ্পত্তির শর্তগুলি যখন কেউ ন্যায়শাস্ত্রের নিস্পৃহ চোখে বিশ্লেষণ করে দেখে, তাহলে কি দেখতে পায়? প্রথমতঃ, স্যার মরিস গয়ার, যিনি ফেডারাল পরিকল্পনার অংশ-বিশেষ, তিনিই মধ্যস্থ বা সালিশ বলে বিবেচিত। তার মানে কি পরিকল্পনাটিকে (ফেডারাল) যা আছে সেই ভাবেই গ্রহণ করা নয়? দ্বিতীয়তঃ স্যার মরিস আমাদের লোক বা স্বাধীন এজেণ্ট নন। তিনি সোজাসুজি সরকারের লোক। ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে যে কোনো সংঘাতে আমরা যদি একজন হাইকোর্ট বা দায়রা জজকে মধ্যস্থ বা সালিশ হিসেবে মেনে নিই, তাহলে ব্রিটিশ সরকার তো অতি আনন্দেই সম্মত হবেন। উদাহরণস্বরূপ বিনা বিচারে আটক রাজবন্দীদের ব্যাপারে, সরকার সব সময়ে গর্ব করে বলেন যে, এই সম্পর্কে উপযুক্ত দলিলগুলি দুজন হাইকোর্ট আর দায়রা জজের কাছে পেশ করা হয়েছে, কিন্তু আমরা সেটা সন্তোষজনক নিষ্পত্তি হিসেবে কখনো মানি না। কিন্তু রাজকোটের ব্যাপারে এই নিয়মের ব্যত্যয় হ'ল কেন?

এ সম্পর্কে আর একটি প্রশ্ন আছে, সেটি আমি বুঝতে পারিনে, সে ব্যাপারে তুমিই আমাকে বুঝিয়ে দিতে পারবে। মহাত্মা গান্ধী বড়লাটের সঙ্গে দেখা করতে যান, এবং দেখাও যথা সময়ে হয়। তাহলে তিনি ওখানে এখনো অপেক্ষা করছেন কেন? সর্দার প্যাটেলেরই অপেক্ষা করবার কথা, যদি স্যার মরিস গয়ার তাঁকে চান। বড়লাটের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের পরেও মহাত্মাজী যদি দিল্লীতেই থেকে যান, তাতে কি পরোক্ষভাবে ব্রিটিশ সরকারেরই মর্যাদা বাড়ে না? ২৪শে মার্চের চিঠিতে তুমি বলেছ যে, মহাত্মা গান্ধী কয়েকদিনের জন্য সম্পূর্ণভাব দিল্লীতে স্থিতু হয়ে বসেছেন, তিনি আদৌ নড়তে পারবেন না। আমি তো ভেবেছিলাম, গান্ধীজীর দিল্লীতে বসে থাকার চেয়ে আরো অনেক দরকারী কাজ আছে। বিভেদ, অচল অবস্থা ইত্যাদি যেসব বিষয় নিয়ে তুমি এত নালিশ কর সেগুলি অবিলম্বে ইতি করে দেওয়া যায়, যদি মহাত্মাজী একটু নিজে চেষ্টা করেন। কিন্তু এ ব্যাপারে তুমি নীরব, আমার জন্যেই যত দোষ পুঁজি করা রয়েছে।

২৩শে মার্চের চিঠিতে তুমি বলেছ, 'আমি পরে অন্য লোকের মুখে অস্পষ্ট আলাপে শুনেছি যে, এ আই সি সির একটি বৈঠক বসা উচিত। সঠিক জানিনা, কারা এইভাবে চিন্তা করছেন, পরিস্থিতির আরো বিশ্লেষণসূচক ছাড়া এই বৈঠক বসাবার উদ্দেশ্য কি? খবর দ্রুত ধায় এবং দূরে ছড়িয়ে পড়ে, আমি এই খবর পাই যে, এ আই সি সির কয়েকজন পরিষদ সদস্য (কেন্দ্রীয়) তাড়াতাড়ি বৈঠক বসাবার জন্য এ আই সি সির সদস্যদের স্বাক্ষরিত একটি অধিযাচন পত্র (Requisition) যোগাড়ের চেষ্টায় আছেন— যেন এ আই সি সির বৈঠক ডাকা আমি এড়াতে চাইছি, এবং ইচ্ছে করেই কংগ্রেসের কাজে অচল অবস্থা সৃষ্টি করেছি। তুমি কি এরকম কথা দিল্লী বা অন্য কোথাও শোননি? যদি শুনে থাক তো—তোমার কি এই প্রস্তাব বিধেয় এবং সম্মানজনক মনে হয়?

ঐ একই চিঠিতে (২৩শে মার্চ তারিখের) তুমি জাতীয় দাবিমূলক প্রস্তাব এবং শরৎ-এর তার বিরোধিতা করার কথা বলেছ। শরতের কি দৃষ্টিভঙ্গী, শরৎ

সম্ভবতঃ সে সম্পর্কে তোমাকে লিখে জানাবে। কিন্তু এমন বলা ঠিক নয় যে, তার বিরোধিতা ছাড়া প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। আমি কয়েকজন লোকের কাছে শুনেছি যে, তাঁরা প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন, কিন্তু এতে মূলতঃ কোন ভুল ছিল বলে নয়, এতে কোন কার্যকরী অর্থ ছিল না। এটা ছিল সেই সব নির্দোষ প্রস্তাবগুলির মত যা প্রতি কংগ্রেসের শেষে প্রস্তাবিত, সমর্থিত ও গৃহীত হয় সর্বসম্মতিক্রমে। সত্যই, আমি বুঝতে পারিনে এই প্রস্তাব নিয়ে কি করে তুমি এত উৎসাহিত হতে পার? কি কার্যকরী নেতৃত্ব এটি দিচ্ছে?

এই প্রসঙ্গে আমি মন্তব্য না করে পারিনে যে, এই গত কয়েক বছর ধরে কংগ্রেসের প্রস্তাবগুলি প্রায়ই শব্দ আড়ম্বরপূর্ণ এবং দীর্ঘ বাক্যাবলী সম্বলিত হয়। প্রস্তাবের থেকে এদের 'গবেষণা' বা 'প্রবন্ধ'ই বলা যায়। আগে আমাদের প্রস্তাব হোত সংক্ষিপ্ত, যুক্তিসংগত এবং কার্যকরী। আমার আশংকা হয়, আমাদের এই প্রস্তাবগুলিকে নতুন আকার ও চেহারা দেওয়ায় তোমার হাত আছে। আমার কথা বলতে গেলে, আমি দীর্ঘ দীর্ঘ 'গবেষণা প্রবন্ধের' চেয়ে কার্যকরী প্রস্তাবই চাই।

তোমার চিঠিতে একাধিকবার তুমি আজকার কংগ্রেসে 'দুঃসাহসিকতার দিকে ঝোঁক'-এর কথা উল্লেখ করেছ। তুমি এদ্বারা সঠিক কি বলতে চাও? আমার মনে হয় যে, বিশেষ কয়েকজন ব্যক্তি সম্পর্কেই তোমার এই মত। কংগ্রেসে নতুন নরনারী এসে প্রধান হয়ে উঠুক—তুমি কি তার বিরুদ্ধে? তোমার কি ইচ্ছা যে, কংগ্রেসের সর্বোচ্চ নেতৃত্ব কয়েকজন ব্যক্তিরই একচেটে হয়ে থাকা উচিত? যদি আমার স্মৃতি আমাকে প্রতারণা না করে, ইউ পি প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির পরিষদ একদা এই নিয়মই করেছিলেন যে, কোন কোন নির্দিষ্ট কংগ্রেসী সংস্থায়, একই ব্যক্তি তিন বছরের বেশি কার্যনির্বাহক সদস্য হয়ে থাকতে পারবে না। স্পষ্টতঃই, এই নিয়ম অধীনস্থ সংস্থার প্রতি প্রযোজ্য ছিল এবং উচ্চতর সংস্থার একই লোক একই পদ যুগ যুগ ধরে থাকবে। তুমি যাই-ই বলনা কেন, বলতে গেলে একদিক থেকে আমরা সকলেই 'দুঃসাহসিক', কারণ জীবনই এক দীর্ঘ দুঃসাহসিক অভিযান। আমি মনে করেছিলাম যে, যাঁরা নিজেদের প্রগতিশীল বলে ভাবেন, তাঁরা কংগ্রেসী সংস্থার সর্বত্র নবীনদের স্বাগত জানাবেন।

তোমার এটা ভাববার কোন কারণ নেই (আমি তোমার ২৪শে মার্চের চিঠির উল্লেখ করছি) যে, শরৎ-এর চিঠি আমার পক্ষ থেকে লিখিত হয়েছিল। তাঁর নিজস্ব একটি ব্যক্তিত্ব আছে। এখান থেকে কলকাতায় ফিরে, লেখবার অনুরোধ জানিয়ে গান্ধীজীর তার সে পায়। গান্ধীজী যদি ওভাবে তার না করতেন, সে আদৌ লিখত কিনা আমার সন্দেহ আছে। যাহোক, আমাকে বলতেই হবে যে, তার মহাত্মাজীকে লেখা চিঠিতে এমন কয়েকটা বিষয় আছে, যাতে আমার অনুভূতি প্রতিধ্বনিত।

তোমার শরৎকে লেখা চিঠি সম্পর্কে আমার কয়েকটি মন্তব্য আছে। তোমার চিঠি থেকে আমি ধরে নেব যে, ত্রিপুরীতে সে যে আবহাওয়া ইত্যাদির কথা বলেছিল, সেটা তোমাকে বিস্মিত করেছে। আমিও এতে বিস্মিত। আমি যদিও স্বচ্ছন্দে চলাফেরা করতে পারিনি, স্বাধীন উৎস থেকে জায়গাটির নীতিবিগর্হিত আবহাওয়ার খবর পেয়েছিলাম। সেটা অনুভব না করে, না শুনে তুমি সেখানে ঘুরে বেড়াতে পারলে কি করে?—এটাই আমাকে অবাক করে দিচ্ছে।

দ্বিতীয়ত, তুমি মন্তব্য করেছ যে, ত্রিপুরীতে ব্যক্তিগত প্রশ্নগুলি অন্যান্য প্রশ্নগুলির বিবেচনাকে প্রভাবিত রেখেছিল। তুমি ঠিকই বলেছ। শুধু একটা কথাই যোগ করে দাওনি যে, যদিও বিষয় নির্বাচনী কমিটিতে বা কংগ্রেসের প্রকাশ্য অধিবেশনে এ বিষয়ে তুমি বলনি—কিন্তু এই ব্যক্তিগত প্রশ্নগুলির উপর জোর দিয়ে

তাদের জনসাধারণের চোখে বড় করে দেখাতে অপর যে-কোনো ব্যক্তির চেয়ে তুমি বেশিই করেছিলে।

শরৎ-এর কাছে চিঠিতে লিখেছ—'সুভাষের অসুখ যে ভান মাত্র এটা কারো পক্ষে বলা অসম্ভব, এবং আমার কোনো সহকর্মী আমার জ্ঞানত এর ইঙ্গিতও করেন নি।' যখন ত্রিপুরীর আগে ও পরে ঐ মর্মে এক সুপরিকল্পিত অভিযান সর্বত্র আমার রাজনীতিক প্রতিদ্বন্দ্বীরা চালান, তখন তুমি নিশ্চয়ই পুরোপুরি কামলগ্রস্থ হয়েছ বলে এমন মন্তব্য করতে পারছ। এও আর একটি প্রমাণ যে, গত কিছুদিন হ'ল, তুমি আমার প্রতি বিরূপ হয়ে উঠেছ (এই চিঠির শুরু দ্রষ্টব্য)। শরৎ যে ত্রিপুরীর আবহাওয়া ইত্যাদির কথা বলেছে, আমি তো তাতে আদৌ কোন অতিরঞ্জন দেখতে পাইনে।

তুমি ত্রিপুরীতে শোনা কতগুলি বিশ্রী বিবরণের কথা উল্লেখ করেছ। যে বিবরণগুলি শুধু আমাদের বিরুদ্ধে যায়, শুধু সেইগুলিই তোমার মনে দাগ কেটেছে, সেটা তো তোমার পক্ষে অদ্ভুত এবং অশোভনও বটে। তোমাকে কয়েকটি উদাহরণ দিই। ডেলিগেট টিকিট দেওয়া সম্পর্কে বাংলাই একমাত্র প্রদেশ নয় যার বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়—একথা কি তুমি জান? জান কি যে ঠিক এমনি অভিযোগ অন্ধ্র প্রদেশের বিরুদ্ধেও করা হয়? কিন্তু তুমি শুধু বাংলার নামই উল্লেখ করেছ। তুমি কি আরো জান যে, যখন বাংলা প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি দ্বারা আসলগুলি হারিয়ে যাবার ভিত্তিতে প্রতিরূপ রসিদগুলি দেওয়া হয়, তখন বি পি সি সি দপ্তর এ আই সি সি দপ্তরকে এই বিষয়ে জানান এবং শেষোক্তকে ডেলিগেট টিকিট দেবার ব্যাপারে সতর্ক হতে বলেন? তুমি কি অনুসন্ধান করে দেখবার চেষ্টা করেছ যে, এই ত্রুটির জন্য দায়ী কে? —বি পি সি সি দপ্তর, না এ আই সি সি দপ্তর?

আরো বলি, ডেলিগেট আনার জন্য বহু টাকা ব্যয় করার কথা তুমি উল্লেখ করেছ। তুমি কি জান না যে, কোন্ পক্ষে ধনবাদী আর পয়সাওলা লোক আছে? তুমি কি শুনেছ যে, লরি-ভর্তি পাঞ্জাবী ডেলিগেটদের লাহোর থেকে আনা হয়েছিল? কার আদেশে তাদের আনা হয়েছিল? হয়ত ডাঃ কিচলু এবিষয়ে আলোকপাত করতে পারেন। পাঞ্জাব থেকে আগত একজন খ্যাতনাম্নী মহিলা কংগ্রেসকর্মী পাঁচ দিন আগে এখানে দেখা করতে এসে আমাকে বলেন যে, সর্দার প্যাটেলের পরামর্শে তাঁদের আনা হয়।

আমি এটা জানি না, তবে তোমার অপক্ষপাতের ভাব থাকা দরকার।

ত্রিপুরীতে কংগ্রেসী মন্ত্রীদের অংশ গ্রহণ সম্পর্কে আমি দুটি মন্তব্য করব। বহুসংখ্যক এ আই সি সি সদস্য এই মর্মে অনুরোধ জানান যে, ব্যালট প্রথায় ভোট প্রদত্ত হওয়া উচিত। কেন জিজ্ঞেস করতে তাঁরা বলেন যে, যদি কংগ্রেসী মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে তাঁরা প্রকাশ্যে ভোট দেন, তাহলে তাঁরা বিপদে পড়বেন। এর মানে কি? দ্বিতীয়তঃ, আমি মন্ত্রীদের এই দলগতভাবে ভোট-ভিক্ষার বিরোধী। তাদের ঐ কাজ করবার আইনগত অধিকার নিঃসন্দেহে আছে—কিন্তু এর এই ফল হবে যে, প্রতি প্রদেশে কংগ্রেসী বিধান সভার দলে বিভেদ সৃষ্টি হবে। যদি সকল কংগ্রেসী এম, এল, এ এবং এম, এল, সির নিজ নিজ প্রদেশে অবিভক্ত সমর্থন না পান তাহলে মন্ত্রীরা কাজ চালাবেন কি করে?

তুমি কি এ বিষয়ে একমত নও যে, ত্রিপুরী কংগ্রেসে (বিষয় নির্বাচনী কমিটি সমেত) পুরাতন প্রহরীরা জনসাধারণের চোখে নিষ্ক্রিয় ভূমিকাই গ্রহণ করেছেন, এবং মন্ত্রীরাই প্রধান হয়ে দেখা দিয়েছেন? শরৎ এই মন্তব্য করে কি ভুল করেছে?

লোকে যে বলে, কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দেওয়া—তুমি তেমনি শরৎ-এর কাছে তোমার চিঠিতে বলেছ, 'ত্রিপুরী প্রস্তাবে কংগ্রেস সভাপতি এবং গান্ধীজীর মধ্যে সহযোগিতার সূচনা করে।'

তুমি ঐ চিঠিতে দাবী জানাও যে, ত্রিপুরীর আগে ও ত্রিপুরীতে তুমি কংগ্রেসী-দের মধ্যে সহযোগিতা সৃষ্টির জন্য মেহনৎ করছিলে। আমি কি তোমাকে এই অপ্রীতিকর সত্য বলতে পারি যে, অন্যরা কিন্তু এ সম্পর্কে ভিন্ন মতই পোষণ করেন। অন্যদের মতে ত্রিপুরীতে কংগ্রেসসেবীতে কংগ্রেসসেবীতে যে ব্যবধান সৃষ্টি হয় তার দায়িত্ব থেকে তুমি মুক্তি পেতে পার না।

এখন তোমাকে তোমার নীতি ও কর্মপন্থা সম্পর্কে ব্যাখ্যা করবার আমন্ত্রণ জানানই আমার উচিত—তবে তা ব্যাপক অস্পষ্টতায় নয়, বিস্তারিত বাস্তবতায়। আমি আরো জানতে চাই যে তুমি কি—সমাজবাদী, না, বামপন্থী, অথবা মধ্যপন্থী, না দক্ষিণপন্থী—গান্ধীপন্থী না আর কিছু?

শরৎকে লেখা তোমার চিঠিতে দুটি চমৎকার কথা আছে। 'ব্যক্তিগত লাভালাভে সমস্ত রাজনীতিক প্রশ্নগুলি আচ্ছন্ন হয়ে গেছে—এতেই আমার দুঃখ সবচেয়ে বেশী। যদি কংগ্রেসীদের মধ্যে সংঘাত বাধেই, আমি ব্যগ্রভাবেই আশা করব, সেটা উচ্চতর স্তরে এবং নীতি এবং তত্ত্বগত বিষয়ে আবদ্ধ থাকবে।' তুমি তোমার নিজের নীতি অনুসারে যদি শুধু চলতে পারতে, তাহলে আমাদের কংগ্রেসী রাজনীতি কত অন্য ধরনের না হোত?

যখন তুমি বল যে, ত্রিপুরীতে কি বাধা ছিল তুমি বুঝতে পার না, তখন তোমার এই 'সরলতা' দেখে তারিফ না করে পারি না। আসলে ত্রিপুরী কংগ্রেসে একটি মাত্র প্রস্তাবই পাশ হয়—সেটি পন্থের প্রস্তাব—আর সেটি হীনতা এবং প্রতিশোধ স্পৃহায় ভরা। সত্য এবং অহিংসার প্রচারকের দল সভাপতি নির্বাচনী প্রতিযোগিতার পর পৃথিবীকে জানান যে, তাঁরা সংখ্যাগুরু দলকে বাধা দেবেন না, এবং বাধা না দেবার মন নিয়ে তারা ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যপদ ত্যাগ করেন। ত্রিপুরীতে তাঁরা বাধা দেওয়া ছাড়া কিছুই করেন নি। তাদের সে-অধিকার আছে বই কি—কিন্তু কাজে যা করেন নি, মুখে তার স্বীকৃতি দিলেন কেন?

এই অস্বাভাবিক রকমের দীর্ঘ চিঠি শেষ করবার আগে আরো কয়েকটি বিষয়ের উল্লেখ করব।

ত্রিপুরীতে বাংলার ডেলিগেটদের টিকেট দেওয়ার ব্যাপারে গোলমালের কথা তুমি উল্লেখ করেছ। এই সেদিন কাগজে পড়লাম যে, কলকাতায় এক সভায়, একজন এ আই সি সি সদস্য বলেন যে, তিনি যুক্ত প্রদেশের কয়েকজন ডেলিগেটের কাছে শুনতে পান যে, যুক্ত প্রদেশ সম্পর্কেও এমনি গোলযোগ হয়েছিল।

তোমার কি মনে হয় না যে, পন্থের প্রস্তাবের আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে মহাত্মাকে আমার বিরুদ্ধে দাঁড় করানো? তুমি কি এই উদ্দেশ্যকে সৎ বলে মনে কর, যখন আমার এবং মহাত্মাজীর মধ্যে কোন বিচ্ছেদই হয়নি, অন্ততঃ আমার দিক থেকে তো হয়নি বটেই? যদি পুরাতন প্রহরীরা আমার বিরুদ্ধে লড়তে চেয়েছিলেন, তাঁরা তা সোজাসুজি করেন নি কেন? মহাত্মা গান্ধীকে আমাদের মধ্যে নিয়ে এলেন কেন? এটা চমৎকার কৌশল সন্দেহ নেই, কিন্তু প্রশ্নটা হচ্ছে এই চালটা কি সত্য আর অহিংসার সঙ্গে খাপ খায়?

আমি আগেই তোমাকে জিজ্ঞেস করেছি যে, তুমি কি মনে কর যে সর্দার প্যাটেলের পক্ষে আমার পুনঃনির্বাচন দেশের পক্ষে অনিষ্টকর হবে বলে তিনি যে ঘোষণা করেছিলেন সেটা ঠিক হয়েছে। তাঁর মন্তব্য যে প্রত্যাহার করা উচিত, এবিষয়ে

তুমি একটি কথাও কখনো বলনি—তাতে করে পরোক্ষভাবে তাঁর অভিযোগ সমর্থনই করেছ। এই মর্মে মহাত্মাজীর মন্তব্য যে, যাই-ই হোক আমি দেশের শত্রু নই—এই সম্পর্কে তুমি কি মনে কর জানতে আমার সাধ যায়। তুমি কি মনে কর, এমন মন্তব্য ন্যায়সঙ্গত হয়েছে? যদি তা না হয়, তাহলে কি তুমি মহাত্মাজীকে আমার হয়ে কিছু বলেছিলে?

পন্থের প্রস্তাবে যে মহাত্মাজীর পূর্ণ সমর্থন আছে, আমরা যখন ত্রিপুরীতে ছিলাম, তখন দৈনিক কাগজে প্রকাশ করে কয়েকজন লোক যে চাতুরী খেলেছে সে সম্পর্কে তুমি কি মনে কর?

এবার বল, পন্থের প্রস্তাব সম্পর্কে তোমার মত কি? ত্রিপুরীতে একটা গুজব রটেছিল যে, এইটির রচয়িতার মধ্যে তুমি একজন। তা কি সত্য? যদিও ভোট-প্রদানের সময় তুমি নিরপেক্ষ ছিলে, তবু তুমি কি এই প্রস্তাবটি সমর্থন কর? এ সম্পর্কে তোমার ভাষ্যটি কি? তোমার মতে এটি কি অনাস্থা-জ্ঞাপক প্রস্তাব?

আমার চিঠি এত দীর্ঘ হয়ে পড়েছে বলে আমি দুঃখিত। নিশ্চয়ই তোমার ধৈর্যচ্যুতি ঘটাবে। কিন্তু অনেক জিনিস বলার ছিল—তাই সেগুলি এড়িয়ে যেতে পারলাম না।

সম্ভবতঃ, তোমাকে আবার চিঠি লিখতে হবে, অথবা খবরের কাগজে একটি বিবৃতি প্রকাশ করতে হবে। অসমর্থিত সংবাদ পেলাম, তুমি নাকি কয়েকটি প্রবন্ধে আমার সভাপতিত্ব নিয়ে বিরূপ সমালোচনাই করছ? তোমার প্রবন্ধগুলি দেখলে আমি এ বিষয়ে কিছু বলতে পারব, এবং আমাদের উভয়ের কাজেরও তুলনা করতে পারব—বিশেষ করে এই তুলনাই করা যাবে, বামপন্থার প্রগতি তুমি দুবছরে, আর আমি এক বছরে কতদূর এগিয়ে দিয়েছি।

যদি কটু ভাষা ব্যবহার করে থাকি, বা কোথাও তোমার মনে আঘাত দিয়ে থাকি, দয়া করে আমাকে ক্ষমা কর। তুমি নিজেই বল যে, খোলাখুলি বলার মত আর কিছুই নেই—আমি দিলখোলা হতেই চেষ্টা করেছি—হয়ত নির্মমভাবেই দিলখোলা হয়ে উঠেছি।

নিয়মিত ভাবেই কিন্তু ধীরে ধীরে আমার স্বাস্থ্যের উন্নতি হচ্ছে। আশা করি—তুমি ভাল।

তোমার স্নেহার্থী
সুভাষ

২৫৫ শ্রীসুভাষচন্দ্র বসুর নিকট প্রেরিত

এলাহাবাদ
৩রা এপ্রিল, ১৯৩৯

ব্যক্তিগত এবং গোপনীয়

প্রিয় সুভাষ,

তোমার ২৮শে মার্চের দীর্ঘ চিঠি এইমাত্র এসে আমার কাছে পৌঁছেছে, এবং আমি তাড়াতাড়ি উত্তর দিতে বসেছি। তুমি যে আমাকে পুরোপুরি এবং খোলাখুলি লিখেছ আর আমার এবং নানা ঘটনা সম্পর্কে তুমি কি মনে কর সেটাও যে আমাকে পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিয়েছ, তার জন্যে কি যে খুশি হয়েছি তা আমার প্রথমেই বলা উচিত। সরলতা অনেক সময়ে যথেষ্টই আঘাত দেয়, কিন্তু এটা প্রায় সব সময়েই কাম্য। বিশেষ করে এক সঙ্গে যাদের কাজ করতে হবে তাদের মধ্যে তো বটেই। অন্যের সাহায্যে এটা নিজেকে প্রকৃত পরিপ্রেক্ষিতায় দেখতে সাহায্য করে। এই দিক

দিয়ে তোমার চিঠিখানি খুবই সহায় হয়েছে, এবং আমি এখানির জন্য কৃতজ্ঞ।

সাতাশখানি টাইপ-করা কাগজের তা-এ লেখা, বহু ঘটনা এবং নানা নীতি ও কর্মসূচীর উল্লেখে ভরা চিঠির উত্তর দেওয়া সহজ ব্যাপার নয়। আমার তাই শঙ্কা হয় যে, আমার উত্তর যতখানি পূর্ণ এবং বিস্তারিত হওয়া উচিত ছিল, তা হবে না। ঠিকভাবে এই বিষয়গুলির উত্তর দিতে চেষ্টা করলে একখানা বই বা অমনি কিছু লিখতে হয়।

তোমার চিঠি মূলতঃ আমার ব্যবহারের বিরুদ্ধে অভিযোগ, আমার ত্রুটির তদন্ত মাত্র। তুমি নিজেই উপলব্ধি করতে পার যে, এমন অভিযোগের জবাব দেওয়া শক্ত এবং বিভ্রান্তিকর কাজ। আর ত্রুটিগুলির সম্বন্ধে বলতে গেলে, অন্ততঃ এর অনেক-গুলির সম্পর্কেই আমার বলার কথা খুব কমই আছে। এগুলি আছে এই দুর্ভাগ্য উপলব্ধি করেই আমি দোষ স্বীকার করছি। ১৯৩৭ সালে অন্তরীণ হতে মুক্ত হবার পর থেকে, তুমি ব্যক্তিগত এবং গণ জীবনে পরম শ্রদ্ধা ও বিবেচনা সহ আমার সঙ্গে ব্যবহার করেছ—আমি কি একথা বলতে পারি যে তোমার মন্তব্যের এই সত্যতা পরিপূর্ণভাবেই আমি তারিফ করি। আমি এর জন্য তোমার কাছে কৃতজ্ঞ। ব্যক্তিগতভাবে তোমার প্রতি আমার সব সময়েই শ্রদ্ধা ছিল, এখনও আছে, যদিও কখনো কখনো তুমি যা করেছ অথবা যেভাবে করেছ, আমি পছন্দ করতে পারিনি। আমার মনে হয়, কিছুটা আমরা মানসিক ভাবে আলাদা ধাতুর মানুষ, জীবন এবং তার সমস্যার প্রতি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীও এক নয়।

আমি এখন তোমার চিঠি নিয়েই বলব, একটির পর একটি প্যারা তুলে ধরব।

গত নভেম্বরে য়ুরোপ থেকে ফেরার পর এলাহাবাদে তুমি যখন দেখা কর, তখন আমি কি বলেছিলাম, ভুলে গেছি। করাচী থেকে কলকাতা যাবার পথে তুমি সামান্য কিছুক্ষণের জন্য এখানে নেমেছিলে। তোমাকে স্পষ্ট উত্তর দেবার আগে আমি তো কল্পনা করতেও পারিনে যে, গান্ধীজীকে কি কথা বলেছিলাম। প্রশ্নটা কি ছিল তাও আমি মনে করতে পারছিনে। কিন্তু সম্ভবতঃ আমি যা বোঝাতে চেয়েছিলাম সেটা এই যে, আমার নিজের ভবিষ্যৎ কর্মধারা গান্ধীজীর নানা বিষয়ে প্রতিক্রিয়ার উপর নির্ভর করবে। আমি হরিপুরার আগে ও পরে তোমাকে যা বলেছিলাম, তা তোমার মনে থাকবে। সদস্য হিসেবে ওয়ার্কিং কমিটির সঙ্গে সহযোগিতা করার ব্যাপারে আমি তখন মহা বিরত এবং আমি সদস্যপদ ছেড়ে দিতেই চাইছিলাম। এর কারণ এই যে, আমি ক্রমাগতই বেশি করে অনুভব করছিলাম যে, সেখানে কোন কাজের মতো কাজ আমি করছিনে। আরো কারণ এই যে, তিনি যাকে 'সমসত্ত্ব' কমিটি বলেন, সেই সম্পর্কেই গান্ধীজী ভাবছিলেন, এবং আমি নিজেকে তার অংশ-বিশেষ বলে মনে করতে পারিনি। তখন নিঃশব্দে এর থেকে বেরিয়ে আসা এবং বাইরে থেকে সহযোগিতা করার পথই আমার সম্মুখে ছিল, অথবা ছিল গান্ধীজী এবং তাঁর দলকে দ্বন্দ্বে আহ্বান করা। ভাবলাম, ভারতের স্বার্থের পক্ষে, তার উদ্দেশ্যের পক্ষে, তোমার বা আমার এই নিশ্চিত বিভেদ সৃষ্টি ক্ষতিকরই হবে। যে কোন প্রকারে ঐক্য বজায় রাখা উচিত—এটা অবশ্যই বাজে কথা। সময়ে সময়ে ঐক্য ক্ষতিকর এবং অনিষ্টকারীও হতে পারে, তাহলে তার শেষ হওয়াই ভাল। তখনকার অবস্থার উপরে সবই নির্ভর করে, এবং আমার তখন দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছিল যে, গান্ধীজী এবং তাঁর দলকে ঠেলে বাইরে ফেলে দিলে বা সেই চেষ্টা করলে এই সংকট মুহূর্তে আমরাই অনেকখানি দুর্বল হয়ে পড়ব। আমি এই ঘটনার অনিশ্চয়তার মুখোমুখী দাঁড়াবার জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। আর সেই সঙ্গে যেসব ব্যাপার ঘটেছিল, তার অনেকগুলিই পছন্দ করিনি এবং কতগুলি ব্যাপারে, যেমন—দেশীয় রাজ্য এবং

মন্ত্রীসভাগুলি সম্পর্কে গান্ধীজীর সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গীরও আমি অনুমোদন করিনি।

আমি য়ুরোপে গিয়েছিলাম, যখন ফিরে এলাম, তখন আবার সেই পুরানো সমস্যার সম্মুখীন হলাম। তখনি তুমি আমার সঙ্গে দেখা কর, সম্ভবতঃ আমার মনের কথা তোমাকে বলি। আমার নিজের মন তখন পরিষ্কার, কিন্তু আমার কাজ তখন গান্ধীজীর পরিস্থিতি সম্পর্কে প্রতিক্রিয়ার উপর নির্ভর করছিল। তিনি যদি তখনো 'সমসত্ব' ভাবধারা আঁকড়ে ধরে থাকতেন, তাহলে আমি বেরিয়ে আসতাম। তা যদি না হোত, তাহলে ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য হিসেবে আমি সহযোগিতা করতে চেষ্টা করতাম। একটা কিছু করে কংগ্রেসকে এই প্রশ্নের উপরে বিভক্ত করে দিতে আমি প্রস্তুত ছিলাম না। ভারতের এবং বাইরের বর্ধমান সংকটে আমি তখন ভরপুর, এবং এও অনুভব করছিলাম, কয়েক মাসের মধ্যেই আমরা এক বিরাট সংগ্রামের সম্মুখীন হতে পারি। গান্ধীজীর সক্রিয় সহযোগিতা এবং নেতৃত্ব ছাড়া সে-সংগ্রাম সম্ভবতঃ ফলপ্রসূ হবে না।

আমার সংগ্রামের ধারণা ফেডারেশনের ভিত্তিতে ছিল না। আমি চেয়েছিলাম কংগ্রেস ফেডারেশনকে প্রায় অচল প্রশ্ন হিসেবেই দেখুক, এবং স্বরাজ এবং গণসভার দাবিতে সংঘবদ্ধ হোক। বিশ্ব-সংকটের যোগ রেখে একে উপস্থাপিত করা হোক। আমি ভেবেছিলাম যে, ফেডারেশনের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের উপর এমনি বেশী রকমের নির্ধারিত চাপে প্রশ্নটি জীবন্ত রাখার পক্ষে সহায় হবে বটে, কিন্তু আরো মূলগত স্তরে আমাদের ভাবনায় ও পরে কাজে বাধা সৃষ্টি করবে। যখন ইংলণ্ডে ছিলাম তখন তুমি এই মর্মে এক বিবৃতি প্রকাশ কর যে, তুমি ফেডারেশনের বিরুদ্ধে শেষ অবধি লড়াই করবে, যদি কংগ্রেস তা মেনেও নেয়, তবুও তুমি লড়াই চালাবে। তোমার এই বিবৃতিটির ঠিক বিপরীত ফলই ইংলণ্ডে দেখা দেয়। সবাই বললে, যখন কংগ্রেস সভাপতি ফেডারেশনের প্রশ্নে পদত্যাগের কথাই ভাবছেন, তখন কংগ্রেস নিশ্চয়ই ওটা গ্রহণ করার জন্য উদ্যত হয়েছে। আমি তো অসহায় হয়ে পড়ি, সহজে এই তর্কে এঁটে উঠতে পারি নি।

এই ভিত্তিতে আমি দুটি প্রস্তাব তৈরি করি। জোরটা আলাদাভাবে দেওয়া ছাড়া এদের ভিতরে অসাধারণ কিছুই ছিল না। তুমি তো জান, ওয়ার্কিং কমিটির জন্য আমাদের প্রস্তাবগুলি এমনভাবে তৈরি করতে হয় যাতে অন্যান্য সদস্যরা তাতে সায় দেন। যাতে একজনকে সুখী করা যায় এমন কিছুর খসড়া করা ঢের সোজা, কিন্তু তাতে অন্যদের সম্মতি থাকে না। ডবলিউ, সির সুমুখে এই প্রস্তাবগুলি পেশ করা সম্পর্কে আমার এই বিশ্বাসই ছিল যে, এতে করে পরবর্তী কংগ্রেসে ব্যাপক এবং সুদূর-প্রসারী প্রস্তাবগুলির জন্য বুনিয়াদ এবং দেশের মন তৈরি হবে। যাহোক, আমার প্রস্তাবগুলিতে কেউ রাজী হলেন না, এবং আমাকে এই কথা বলা হ'ল যে, কংগ্রেসের সময়ে সেগুলি বিবেচিত হবে।

ওয়ার্কিং কমিটির এই বৈঠকে আমি ইহুদীদের সম্পর্কে একটি প্রস্তাব পেশ করি। তোমার মনে পড়বে, তারই আগে জার্মাণীতে ইহুদীদের বিরুদ্ধে ভীষণ নিয়ন্ত্রিত হত্যাকাণ্ড চলে এবং পৃথিবী তখন সেই কথা নিয়েই মুখর। আমি অনুভব করি যে এ সম্পর্কে আমাদের মত প্রকাশ অবশ্যই প্রয়োজনীয়। তুমি বল যে, 'আমি যখন প্রস্তাবটি করি, তখন অবাক হয়েছিলে...যে ভারতকে ইহুদীদের আশ্রয়স্থল করতে চাই'। আমি জেনে অবাক হয়ে গেছি যে, তুমি তখন এমন তীব্রভাবেই এ সম্পর্কে অনুভব করেছিলে। কিন্তু আমার যতদূর মনে পড়ে, তখন তুমি স্পষ্ট করে তোমার মত প্রকাশ করনি। কিন্তু আমার প্রস্তাবটিকে ভারতে ইহুদীদের আশ্রয়স্থল প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াস বলে রূপ দেওয়া কি উচিত? আমার সুমুখে পুরানো

খসড়াখানা রয়েছে। এতে এই বলা হচ্ছে, 'দক্ষ এবং বিশেষজ্ঞ হিসাবে সেই সব ইহুদী উদ্বাস্তুদের নিযুক্ত করবার পক্ষে কমিটির কোন আপত্তির কারণ নেই—যারা ভারতের নতুন পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পারবেন এবং ভারতীয় জীবন-ধারণের মান মেনে নেবেন...' ইহুদীদের সাহায্য প্রদানের দিক থেকে আমি প্রশ্নটি বিচার করে দেখিনি, যদিও সে-সাহায্য দেশের ক্ষতি না করে যেখানে সম্ভব কাম্যই বটে, আমাদের বিজ্ঞান, শিল্প প্রভৃতির জন্য অতি অল্প বেতনে পয়লা নম্বরের মানুষ পেতে পারি, নিজেদের সাহায্য পাবার এই দিক থেকেই ভেবেছিলাম। নাৎসী অধিকারের পরে বহু দেশই ভাল মানুষ বাছাই করে নেবার জন্য বিশেষ মিশন-গুলি ভিয়েনায় পাঠায়। এইসব বিশেষজ্ঞদের দ্বারা তুরস্কের মহা উপকার হয়েছে। আমার মনে হয়েছিল ঠিক-ঠিক যন্ত্রবিদ এবং বিশেষজ্ঞ পাবার এইটেই হচ্ছে আদর্শ সুযোগ। তাঁরা যে এখানে অল্প বেতনে আসবেন, এতে অন্যদের বেতন কমাতেও আমাদের সাহায্য করবে। তাঁরা কিছুকালের জন্য আসবেন, চিরদিনের জন্য বসবাস করবেন না। শুধু অল্পসংখ্যকই আসবেন, যাঁরা আমাদের সত্যই কাজে লাগবেন এবং আমাদের জীবন-ধারণের মান এবং রাজনীতিক দৃষ্টিভঙ্গী মেনে নেবেন। যাহোক, এই প্রস্তাবটিও সম্মতি পেল না, কাজেই বাতিল করতে হ'ল।

কংগ্রেস রাষ্ট্রপতি নির্বাচনীর পরে আমি দিল্লীতে যে বক্তৃতা দিই, তুমি তার উল্লেখ করেছ। আমি দুঃখিত যে, আমি তোমার উল্লেখিত সংবাদপত্রের বিবরণী দেখিনি, যদিও একজন আমাকে পরে একথা বলেন। বস্তুত, আমি তোমার বা তোমার নির্বাচনী সম্পর্কে আদৌ কিছুই বলিনি। আমি দিল্লী এবং পাঞ্জাবের কংগ্রেসী গোলযোগ এবং বিবাদের উল্লেখ করে বলি যে, এইজন্য দপ্তরের ভার নেওয়া আর ভোট-সংগ্রহের ইচ্ছাটাই প্রবল হয়ে উঠেছে। আমি এর নিন্দা করি। হয়তো সাংবাদিকটির তোমার নির্বাচনীর কথা মনে পড়ছিল, তাই আমি যা বলি তিনি তা বিকৃত করে ফেলেন। সভায় যাঁরা ছিলেন, তাঁদের কাছে আমি জিজ্ঞেস করি, আমি যা বলেছিলাম সে সম্পর্কে আমার নিজের ধারণায়ই তাঁরা সায় দেন।

তুমি সম্পূর্ণ ঠিকই বলেছ তোমার জন্য যেমন হয়েছিল, তেমনি ডাঃ পট্টভির জন্য ভোট-সংগ্রহ যথেষ্টই হয়। নির্বাচনী প্রতিযোগিতায় ভোট-সংগ্রহে আমি তো আপত্তি দেখিনে। কংগ্রেসী মন্ত্রীসভাগুলির কলকাঠি পট্টভির ভোট-সংগ্রহে ব্যবহৃত হয়েছে—একথা বলতে তুমি কি অর্থ করছ, আমি সঠিক জানি না। জানি না এই জন্যে কি কলকাঠি ছিল, এবং তোমার স্বপক্ষেই একটি ব্যক্তিগত উদাহরণ ছাড়া যুক্তপ্রদেশে একে কাজ করতে সত্যিই দেখিনি। আমাদের মন্ত্রীরা কিভাবে ভোট দিয়েছেন আমার ধারণা নেই, কিন্তু এটাই আমার ধারণা হয় যে, অর্ধেকের চেয়ে বেশি ডাঃ পট্টভির পক্ষে ভোট দেয়নি। এবং আমার যতদূর জানা, তার কমও হতে পারে। একজন মন্ত্রী ভোট দিতে অস্বীকার করেন; একজন সক্রিয়ভাবে এবং প্রকাশ্যে তোমার জন্য ভোট সংগ্রহ করেন, এবং এইটেই সাধারণের মত যে, তিনি তোমার জন্য বহু ভোট সংগ্রহ করেন।

প্রকাশ্য সভায় তোমাকে হেয় করেছি বলে তুমি আপত্তি তুলে সম্পূর্ণভাবেই ঠিক করেছ। সেটা তো সবচেয়ে অসঙ্গতই হোত। কিন্তু আসলে দিল্লীতে বা অন্য কোথাও আমি অমন কাজ করিনি।

যখন ওয়ার্কিং কমিটির বারো জন সদস্য পদত্যাগ করেন, তখন আমি যে বিবৃতি প্রকাশ করেছিলাম, এবার সেই বিবৃতির কথায় আসছি। ওয়ার্কিং কমিটির অন্যান্য সদস্যারা যে মত গ্রহণ করেছিলেন, আমি তার চেয়ে অনেক কম চরম পন্থা গ্রহণের কথা সাহস করে পেশ করি, তখন দুদিন ধরে দীর্ঘ তর্ক-বিতর্ক চলে। এই বৈঠকের

আগে, যখন শ্নতে পেলাম যে, পদত্যাগের সম্ভাবনা আছে, আমি তাতে বাধা দিতেই চেষ্টা করি। আবারও চেষ্টা করি। কিন্তু নানা কারণে আগের চেয়েও অবস্থাটা ঘোরালো হয়ে ওঠে। তোমার রাষ্ট্রপতির ভাষণে তুমি যে কয়েকজন সদস্যের উপর কটাক্ষপাত করেছ, সে সম্পর্কে আমি তীব্রভাবেই অন্ভব করি। একথা বার বার তোমাকে বলেছিলাম। যখন তুমি গান্ধীজীর সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছিলে, আমি তোমাকে বিশেষ করে বোঝাতে চেয়েছিলাম যে, রাজনীতিক প্রশ্নগ্লি নিয়ে আলোচনা করার আগে এইটিই প্রথম পরিষ্কার করে নিতে হবে। জয়প্রকাশও আমার সঙ্গে একমত ছিল। যখন সন্দেহ আর অবিশ্বাসের দেওয়াল দ্জনের মধ্যে খাড়া হয়ে থাকে, তখন কোনো রাজনীতিক আলোচনা চলতে পারে না। তুমি তোমার বিবৃতিতে যা বলেছ, সেটা সম্প্র্ণ অন্যায় কথা। ভিতরের একজন হয়ে এবং কংগ্রেস সভাপতির দায়িত্বপ্র্ণ পদে প্রতিষ্ঠিত থেকে কোন ব্যক্তির পক্ষে কাগজে গ্জব আর বাজারে কথা বার বার বলা স্পষ্টতঃই ভাল নয়। তিনি যে জানেন, এটা ধরেই নেওয়া হয়, তাঁর কাছ থেকে এমন কি একটু আভাসও অন্যদের মনে দৃঢ় বিশ্বাসের সৃষ্টি করে। তুমি কোন নাম উল্লেখ কর নাই একথা সত্য, কিন্তু তোমার বিবৃতিগ্লির প্রতিটি পাঠক অবশ্যই এই সিদ্ধান্তে এসে পে'ছিবে যে, ওয়ার্কিং কমিটির কোন কোন সদস্যকে এতে উল্লেখ করা হয়েছে। কোন মান্ষকে যদি ইঙ্গিত করা হয় যে, সে প্রকাশ্যে যে বিষয়ের স্বপক্ষে, গোপনে তার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে; এমন কি ফেডারেশনে পারস্পরিক মন্ত্রীত্ব বিতরণেরও ব্যবস্থা করেছে—এর চেয়ে বড় অপমান তো আর তাকে করা যায় না। এটা একটা উদ্ভট বিবৃতি এবং মর্মস্থলে আঘাত হেনেছে।

এমনি ধারা বিবৃতি গান্ধীজী এবং তোমার মধ্যে কোনো সহযোগিতার পক্ষে এক কার্যকরী অন্তরায়, কেন না, অন্যরা তো একরকম গান্ধীজীরই প্রতিনিধিত্ব করছেন। তোমার এবং গান্ধীজীর মধ্যে সহযোগিতা হওয়া উচিত—এ সম্পর্কে ব্যগ্র ছিলাম এবং এর বিকল্প অত্যন্ত ক্ষতিকর আমার মনে হয়েছিল। তাই এই অন্তরায় দ্র করার জন্য আমি তোমাকে পীড়াপীড়ি করি, এবং গান্ধীজীর সঙ্গে খোলাখ্লি কথা বলতে বলি। আমার মনে হয়, তুমি তা করতে রাজী হয়েছিলে। পরে জয়প্রকাশ এবং গান্ধীজীর কাছ থেকে জেনে বিস্মিত হয়েছিলাম যে, তুমি এ বিষয়ের উল্লেখ অবধি করনি। আমাকে স্বীকার করতেই হবে যে, এতে আমি ভয়ানক ঘাবড়ে যাই, এবং আমার মনে হয় যে, তোমার সঙ্গে একযোগে কাজ করা কত শক্ত।

গান্ধীজী আরো আমাদের বলেন য়ে, তাঁর সঙ্গে তোমার সাক্ষাৎকার থেকে এই মনে হয়েছিল যে, তুমি তাঁর সহযোগিতার জন্য ব্যগ্র ছিলে না, যদিও তুমি তাঁকে কথায় কথায় এই কথাই জিজ্ঞেস করেছিলে। এই মনে হয়েছিল, যাদের তুমি এইজন্যে এরই মধ্যে বেছে রেখেছ, এমনি নানা লোক নিয়ে ওয়ার্কিং কমিটি গঠনের কথাই তুমি ভাবছিলে। তুমি অবশ্য এ ব্যাপারে সম্প্র্ণ অধিকারী, কিন্তু এসব থেকে এই-ই বোঝায় যে, তুমি গান্ধীজী আর তাঁর দলের সঙ্গে সহযোগিতার চেয়ে অন্য কথাই ভাবছিলে।

পাঞ্জাব নির্বাচনী, দিল্লী নির্বাচনী এবং অন্ধের নেলোর সম্পর্কে যে কর্মপন্থা তুমি গ্রহণ করেছিলে, তাতে আমি ভয় পাই। কর্মপন্থায় তত ভয় নয়, যত তা গ্রহণের পদ্ধতিতে। এ আই সি সি দপ্তরে উল্লেখ না করে তুমি সোজাস্জিভাবে কর্মপন্থা গ্রহণ কর, বা অন্ধের ব্যাপারে পি সি সিকেও জানাও নি। পাঞ্জাবে আই সি সি কার্যালয়ের পক্ষ থেকে যে তদন্ত চলছিল, তা থামিয়ে দেবার জন্য তার পাঠাও।

দিল্লীতে তুমি পি সি সিকে আগেই না জানিয়ে কর্মপন্থা গ্রহণ কর। ব্যক্তিগত ভাবে আমি মনে করি যে, তোমার দিল্লী সিদ্ধান্ত ভুল, কিন্তু সেটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নয়। আমি অনুভব করেছিলাম যে, তুমি প্রত্যক্ষভাবে ব্যক্তি এবং দলগুলি দ্বারা নিজেকে প্রভাবিত হতে দিচ্ছ, এবং অ-ব্যক্তিগত ও রুটিন-মাফিক এগোনোটা বাতিল করে দিচ্ছ—অথচ দপ্তরের তো সেই নীতিই গ্রহণ করা কর্তব্য। এই পদ্ধতি আমার কাছে বিপদসংকুল বলেই মনে হয়।

তুমি বল যে 'উপর থেকে বাধা দেবার অভ্যাসে, কোন কংগ্রেস সভাপতিই আমাকে হারাতে পারবেন না'। আমি বুঝি যে, আমি একজন বাধা-দেওয়ারই মানুষ, কিন্তু এ আই সি সির কাজের কথায়ই বলি, কখনো এ আই সি সি দপ্তরকে কাজে বাধা দিয়েছি বলে তো মনে পড়ে না, যদিও প্রায়ই তাকে প্রভাবিত করতে চেষ্টা করেছি। আমার ইচ্ছাকৃত নীতি ছিল (এই মর্মে বিজ্ঞপ্তিও বের হয়েছিল) বাধা না দেওয়া, এমন কি প্রাদেশিক ব্যাপারেও এ আই সি সি দপ্তরকে বাধা দিতে না দেওয়া—অন্য কোনো উপায় না থাকলে তখন আলাদা কথা।

যখন এমনি নানা অবস্থার প্রসার আমাকে বিব্রত করে তুলছিল, তখন তোমার গান্ধীজী এবং বল্লভভাইকে প্রেরিত তার দুখানি এল। এবং এটাই ভাষ্য করা হ'ল যে, তুমি ওয়ার্কিং কমিটিতে আদৌ আমাদের যোগদান চাও না, এমন কি ধরা-বাঁধা কাজ করতে দিতে চাও না। তুমি বল, তুমি এমন বিধি-নিষেধের কথা বোঝাতে চাওনি, কিন্তু তারগুলি নিশ্চয়ই এই ভাষ্যের পক্ষে প্রশস্ত ছিল। তুমি কি বোঝাতে চাও, তা জানার জন্য সেই মর্মে আরো তদন্তের জন্য তোমাকে লেখা যেত বটে, কিন্তু এটা কাম্য নয় বলেই মনে হয়; কেন না, তুমি তখন-তখনি যা করতে চাওনি, তোমাকে চাপ দিয়ে সেটা আমাদের করবার অনুমতি দেওয়াই এর মানে হোত।

এই সব থেকে এইটেই পরিষ্কার হয়ে গেল যে, তোমার পছন্দ-মাফিক বন্ধু নিয়ে তুমি একটি পন্থা গ্রহণ করতে ইচ্ছুক, এবং ওয়ার্কিং কমিটির পুরাতন সদস্যরা সে ব্যাপারে প্রতিবন্ধক-স্বরূপ—এবং তেমন বিশেষ বাঞ্ছিতও নয়। তাই পদত্যাগ করাটাই তাঁদের পক্ষে সম্পূর্ণরূপে অবধারিত হয়ে উঠল; তা না করলে তোমার প্রতি, দেশের প্রতি এবং তাঁদের নিজেদের প্রতিও অন্যায় করা হোত। আর তা হোত গণতান্ত্রিক কার্যধারা-বিরোধী। আমি তো বুঝিনে তাঁরা কি করে থাকতেন, বা তাঁদের পদত্যাগ কি করে অচল অবস্থার সৃষ্টি করত। পদত্যাগ না করলে এক অচলতার সৃষ্টি হোত, তাতে করে তোমার বিধেয় নীতি গ্রহণ করতে বাধা জন্মাত।

তুমি ঠিকই দেখিয়ে দিয়েছ যে, আমি নির্বোধের নীতি গ্রহণ করি। আমি ঠিক পদত্যাগ করিনি, কিন্তু এমনভাবে কাজ করি, যাতে মনে হোত আমি তাই-ই করেছি। এর কারণ এই ছিল যে, আমার সহকর্মীদের গোটা দৃষ্টিভঙ্গীরই আমি সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলাম। আমি তীব্রভাবেই অনুভব করি যে, ঘটনাচক্রে আমি তোমার সঙ্গে সহযোগিতা করতে পারছিনে, কিন্তু এও আমি সমান ভাবেই মনে করি যে, অন্যদের সঙ্গে আমার একরকম বিচ্ছেদই হয়ে গেল। আসলে, শেষোক্ত অনুভূতিই বেশি জোরদার হয়ে উঠল। তার কারণ এই যে, একটি দীর্ঘ পরিচ্ছেদের অবসান এতে বোঝাল। ন্যাশনাল হেরাল্ডে আমার লেখা প্রথম দফা প্রবন্ধগুলি যদি তুমি পড়, আমার মনের ভাবধারা কি ছিল, তার কিছু আভাষ হয়ত পাবে।

আমার ২২শে ফেব্রুয়ারীর বিবৃতি সাধারণ পদত্যাগের পত্রের মধ্যে থাকার প্রশ্নই ওঠে না। আমার বিবৃতি স্পষ্টই ব্যক্তিগত, অন্যভাবে তাকে দেখা চলে না। পদত্যাগে যোগ দেবার জন্য আমাকে জোর চাপ দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু আমি অস্বীকার করি।

এমন কি তোমার কাছে পাঠানোর পরে ছাড়া তাঁদের পদত্যাগ পত্র দেখিও নি।

আমি কি আর একটু বুঝিয়ে বলব যে, এই গত দুমাস বা ঐ সময় থেকে আমার মন কিসে এত বেশি বিব্রত হয়ে উঠেছে? তোমার পুনঃনির্বাচনীতে দাঁড়ানোর বিপক্ষে আমি দুটি বড় কারণেই ছিলাম; তার মানে, এমনি অবস্থায় গান্ধীজীর সঙ্গে বিচ্ছেদ হবে, আর আমি সেটা চাইও নি (এটা যে কেন হবেই, তা বলার দরকার নেই। আমি মনে করেছিলাম, এটা হবেই)। আমি মনে করি যে, এতে প্রকৃত বামপন্থীদের উপরে আরো আঘাত হানা হবে। বামপন্থী এমন শক্তিশালী নয় যে, নিজের বোঝা নিজে বইতে পারবে, যখন কংগ্রেসে প্রকৃত প্রতিযোগিতা দেখা দেবে, তখন তাকে হারতে হবে, এবং তার বিরুদ্ধে শুরু হবে প্রতিক্রিয়া। আমি এটা সম্ভাব্য ভেবেছিলাম যে, পট্টভীর বিরুদ্ধে তুমি নির্বাচনী প্রতিযোগিতায় জিতে যাবে, কিন্তু আমার খুবই সন্দেহ ছিল যে, যাকে গান্ধীবাদ বলা হয় তার সঙ্গে প্রত্যক্ষ যুদ্ধে তোমরা কি কংগ্রেসকে নিজেদের পক্ষে নিয়ে নিতে পারবে। যদি বা দৈবাৎ তোমরা কংগ্রেসে সংখ্যাগুরু হও, গান্ধীজী ছাড়া দেশে এটি যথেষ্ট শক্তিশালী প্রতিনিধিত্ব করতে এবং সফল হতে পারবে না—সংগ্রামের প্রস্তুতি তো আরো শক্তই হবে। দেশে তো বিভেদের কত রকম ঝোঁকই আছে, সেগুলিকে দমন না করে, আমরা তাকে আরো বাড়িয়েই দেব। এসবের মানে তো যখন সবলতা প্রয়োজন, তখন জাতীয় আন্দোলনকে দুর্বল করে দেওয়া হবে।

তোমার পুনঃ নির্বাচনীর বিরুদ্ধে এই দুটিই ছিল আমার প্রধান যুক্তি। তোমার কয়েকটি বোম্বাই-এর বন্ধু যা বলেছেন, সেটি সম্পূর্ণ সত্য নয়। আমি যা বলি তা এই যে, যদি তুমি কতগুলি বিশেষ বামপন্থী তত্ত্ব এবং নীতির জন্য দাঁড়াতে, তাহলে তোমার পুনঃ নির্বাচনীতে দাঁড়াবার কিছুটা যুক্তি থাকত, তাহলে নির্বাচনী তখন ভাবধারা এবং নীতির দিক দিয়ে শিক্ষামূলকই হোত। কিন্তু মোটামুটি ব্যক্তিগত ভিত্তিতে নির্বাচনীর এই গুণটিও নেই। যাই-ই হোক উপরে প্রদত্ত এই কারণ দুটির জন্যই তোমার নির্বাচনী প্রতিযোগিতায় দাঁড়ানো আমি কাম্য বলে মনে করিনি।

আমার ২৬শে জানুয়ারী আর ২২শে ফেব্রুয়ারীর বিবৃতিগুলি অবশ্যই আলাদা, কিন্তু তাতে যে দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন বোঝায় তা মনে করিনে। প্রথম বিবৃতিটি তোমার নির্বাচনীর আগেই বের হয়, এবং আমি কোন পক্ষ গ্রহণ যতটা সম্ভব পারি এড়াতেই চাই। আমাকে ডঃ পট্টভীর পক্ষ হয়ে আবেদন জানাতে বলা হয়েছিল। এতে আমি তাতে রাজী হইনি। আমার বিবৃতি তাই ইচ্ছে করেই একটু নরম করে দেওয়া হয়। পরে কিছু অতিরিক্ত তথ্য আমার নজরে আসে। তোমার নির্বাচনী বিবৃতি আমি দেখি, এবং তার পরে নানা ঘটনা ঘটে, তার উল্লেখ উপরেই করেছি। এও দেখি যে, তুমি ঘনিষ্ঠভাবে কতগুলি অদ্ভুত ধরণের ব্যক্তির সাহচর্যে এসেছ, যারা তোমাকে বাহ্যত যথেষ্ট প্রভাবিত করছে। এই লোকগুলির মধ্যে কেউ কেউ ব্যক্তিগতভাবে কাম্য, কিন্তু তারা আমার মতে কোন বামপন্থী বা সুনিয়ন্ত্রিত মতবাদের প্রতিনিধিত্ব করেন না। তাই আমি তাদের রাজনীতির প্রযুক্তি বা অর্থের দিক দিয়েই দুঃসাহসী বলি।

দুঃসাহসিক মন ব্যক্তি অথবা জাতির পক্ষে অবশ্যই অতি কাম্য বস্তু, কিন্তু রাজনীতিক দ্বন্দ্বে এই শব্দটির একটি বিশেষ অর্থ আছে, সেটি যে ব্যক্তির সম্পর্কে প্রযুক্ত হয়, কোনক্রমেই তা অসম্মানজনক নয়। আমি এই দুঃসাহসিকতার ঝোঁক আদৌ পছন্দ করিনি এবং আমাদের উদ্দেশ্যের পক্ষে অনিষ্টকর বলেই মনে করেছি। অস্পষ্ট বামপন্থী জিগীরের সঙ্গে স্পষ্ট বামপন্থী ভাবধারা বা তত্ত্বের কোন যোগাযোগ নেই

—এটা এই কয়েক বছর য়ুরোপে খুব দেখা যাচ্ছে। এতে করে ফ্যাসিবাদের অগ্রগতি হয়েছে, এবং জনগণের একটি বৃহৎ ভাগ বিপথে চালিত হয়েছে। এই ব্যাপার ভারতে ঘটার সম্ভাবনায় আমার মন আচ্ছন্ন, এবং এতে আমি উদ্বিগ্নও হয়ে উঠেছি। আন্তর্জাতিক ব্যাপারে আমার থেকে তোমার মত ভিন্ন, এবং তুমি আমাদের নাৎসী জার্মানী বা ফ্যাসিবাদী ইতালীর নিন্দার সমস্তটুকু অনুমোদন কর না, এই তথ্য আমার উদ্বিগ্নতা আরো বাড়িয়ে তুলেছে। এবং সমগ্রভাবে সমস্ত ছবিটা দেখে তুমি আমাদের দৃষ্টত কোন দিকে নিয়ে যেতে চাও, আমি তো আদৌ কল্পনা করতে পারিনি।

এই দিক বা তোমার মতবাদ সম্পর্কে আমি নিশ্চিন্ত নই, কিন্তু তার সাধারণ ইঙ্গিত আমাকে উদ্বিগ্ন করে তুলেছে। তাই আমি তোমাকে ফেব্রুয়ারীর প্রথম দিকে চিঠিতে এই সম্পর্কে পরিষ্কার করে একটি মন্তব্য লিখতে বলেছিলাম। তা লেখার তোমার সময় হয়নি, তারপরে তো তুমি অসুখে পড়। আমার মুশকিল রয়েই গেল, আর আমাকে তা উদ্বিগ্ন করে তুলতে লাগল। আমার ২২শে ফেব্রুয়ারীর বিবৃতিতে তুমি এই সবের ছায়া দেখতে পাবে, তারপরেই পাবে ন্যাশনাল হেরাল্ডের প্রবন্ধে। ভিন্ন ভিন্ন ধরনের মানুষ; যাদের মতের দৃঢ় কোন ঐক্য নেই, কিন্তু শুধু বিরোধীতায়ই তারা ঐক্যসূত্রে গাঁথা, এমন মানুষদের নিয়ে ওয়ার্কিং কমিটি গড়ার সম্ভাবনা প্রীতিকর নয়। আমি তো বুঝতে পারিনি, কি করে আমি তাতে যোগ দেব। পুরানো ওয়ার্কিং কমিটি নিয়ে আমার যথেষ্টই হাঙ্গামা গেছে, তবুও, মতের পার্থক্য সত্ত্বেও আমরা পরস্পরকে বুঝতাম, এবং বছরের পর বছর একসঙ্গে তাল রেখে চলেও এসেছি। আমার তেমন অবস্থায় থাকার ইচ্ছা ছিল না; তার চেয়েও কম কাম্য ছিল একটি ছোট শাসন-পরিষদের সঙ্গে সাহচর্য—যার কয়েকজন সদস্য আর আমার মধ্যে এমন কি সাধারণ উপলব্ধির সূত্রটুকুও নেই।

আর একটি ব্যক্তিগত ব্যাপার আমি সম্পূর্ণ খোলাখুলিভাবেই উল্লেখ করতে চাই। আমি সব সময়েই অনুভব করতাম যে, তুমি পুনঃ নির্বাচনীর জন্য বড়ই ব্যগ্র। রাজনীতিগতভাবে এতে কোন দোষই ছিল না, সম্পূর্ণরূপে পুনঃনির্বাচনীর আকাঙ্ক্ষা করার দাবি তোমার ছিল, এবং তার জন্য কাজ করতে পারতে। কিন্তু এইটেই আমাকে দুঃখ দিয়েছে, কেন না আমি ভেবেছিলাম, তোমার এমন মর্যাদা যে তুমি এসবের ঊর্ধ্বেই থাকবে। এও ভেবেছিলাম, তুমি অন্যভাবে কাজ করলেই নীতি এবং দলগুলিকে বেশী প্রভাবিত করতে পারবে।

বল্লভভাই তোমার সম্পর্কে যা বলেন তা মনে করিয়ে দিয়ে তুমি দেখিয়ে দিচ্ছ যে, কেন আমি এই জন্যে তাঁর সমালোচনা করিনি। নানা জাতীয় যেসব বিবৃতি নির্বাচনীর সময় প্রকাশিত হয়েছিল, সেগুলি সম্পর্কে এই বলতে হয় যে, আমি আদৌ সেগুলি পছন্দ করিনি। আমার মনে হয়, এগুলির একটাও না বেরুনো উচিত ছিল। কিন্তু স্মৃতি থেকে বলতে হলে, তাদের মধ্যে এমন কিছু বিশেষ ছিল বলে মনে পড়ছে না, যার প্রকাশে, আমার হস্তক্ষেপ করার প্রয়োজন ছিল। তোমার নির্বাচনী দেশের লক্ষ্যের পক্ষে ক্ষতিকারকই হবে—বল্লভভাই-এর এই বাক্যটি শরতের কাছে এক ব্যক্তিগত তারে ব্যবহৃত হয়। সাধারণ বিবৃতিতেই বলা হোক আর ব্যক্তিগত চিঠি বা তারেই বলা হোক—আমার মনে হয় এদের মধ্যে প্রভেদ আছেই। তোমার ভাইকে যে এই খবরটি পাঠানো হয়েছিল তাও তাৎপর্যপূর্ণ। এটা মন্তব্য হিসেবে তীব্র, কিন্তু অশ্রদ্ধা করার কোন অভিসন্ধি নেই। যদি বল্লভভাই দৃঢ়বিশ্বাসীই হন যে, ভারতের মঙ্গলের জন্য গান্ধীজীর নেতৃত্ব প্রয়োজন, এবং তোমার পুনঃনির্বাচন হলে ভারতবর্ষ তাঁর নেতৃত্ব হারাবে, তিনি তা ভাবতে এবং বলতেও পারেন। আবার তেমনি আমরা

যতই গান্ধীজীকে শ্রদ্ধা করি না কেন, আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে, তাঁর নেতৃত্ব দেশের পক্ষে বিপজ্জনক এবং অনিষ্টকর।

আমি তোমাকে লিখি, তোমার পুনঃনির্বাচনী কিছু ক্ষতি এবং কিছু মঙ্গল করেছে। এখনো আমি সেই মতই পোষণ করি, যদিও ক্ষতি হয়ত মঙ্গলকে ওজনে হারিয়ে দিতে পারে। এই অর্থে একথা বলছি যে, আমাদের দল ছিন্নবিচ্ছিন্ন হতে চলেছে। মঙ্গল এই যে, আমাদের কয়েকজন পুরানো নেতার আত্মতুষ্টি নাড়া খেয়েছে। আমার এবিষয়ে সন্দেহ নেই যে, তোমার পক্ষে ভোটের বেশির ভাগই এই আত্মতুষ্টির বিরুদ্ধে ভোট প্রদান, এবং কিছুটা যে-প্রণালী অনুসৃত হয়ে আসছিল তার বিরুদ্ধেও বটে। এটা আমি বার বার গান্ধীজী এবং অন্যান্যকে জোর দিয়েই দেখিয়ে দিয়েছি এবং এদিকে নজর দিতেও অনুরোধ করেছি। এই প্রতিবাদে সারবস্তু ছিল বলেই রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ভোট-প্রদানে তাই-ই আকার গ্রহণ করেছে।

তুমি আমাকে মনে করিয়ে দিচ্ছ যে, একদিকে যেমন তোমার উপর থেকে বাধা-প্রদান সম্পর্কে আমি আপত্তি করি, আবার ৪ঠা ফেব্রুয়ারীর চিঠিতে তোমাকে লিখি, তুমি সভাপতি হিসেবে বড়ই নিষ্ক্রিয় এবং নিজের মতামত জাহিরে অপারগ। একথা সত্য। যে বাধার কথা বলেছি, সেটা তার ঠিক আগে, এবং বেশির ভাগ পুনঃনির্বাচনীর পরেই এসেছিল। আগের আমলের কথা এতে বলা হয়নি। যখন তোমার মত জাহির করার ব্যাপারে অপারগতার কথা বলেছি, তখন গত বছরে ওয়ার্কিং কমিটিতে তোমার প্রতিন্যাসের কথাই আমার মনে হচ্ছিল। আশা করেছিলাম, তুমি আরো শক্তিশালী নেতৃত্বই দেবে, যদিও বিভেদ আমি চাই নি। সভাপতি হিসেবে প্রাদেশিক ব্যাপারে তুমি বাধা দাও—এও আমি চাইনি।

তুমি উল্লেখ করেছ যে, কয়েকজন ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য তোমার অনুপস্থিতিতে, বৈঠক বসিয়ে তোমার আড়ালে ডঃ পট্টভীকে সভাপতিত্বের জন্য দাঁড় করাবার সিদ্ধান্ত করে। আমার মনে হয়, বল্লভভাই-এর এ সম্পর্কে বিবৃতিতে কিছুটা ভুল বোঝার ব্যাপার ঘটেছে। সেটা পরিষ্কার করবার সুযোগ দিয়েছ বলে আমি খুশী। আমি যতদূর জানি, এমন কোনো বৈঠক বসেনি। বার্দোলীতে যা হয়েছিল তা এই—মওলানা আজাদ যাতে দাঁড়াতে রাজী হন তাই গান্ধীজী, আমি ও অন্যান্যরা চাপ দিয়েছিলাম। তিনি কিন্তু দাঁড়াতে অনিচ্ছুক ছিলেন। যেদিন আমি বার্দোলি থেকে চলে আসি (তুমি চলে যাবার পরের দিন) গান্ধীজীর এবং অন্যান্যদের কাছে বিদায় নিতে যাই। গান্ধীজীর কুটীরের বারান্দায় আমরা কেউ কেউ দাঁড়িয়েছিলাম। মওলানা আর বল্লভভাই ছাড়া আর কে ছিলেন ভুলে গেছি। মওলানা আবার বলেন যে, তিনি এই দায়িত্ব কাঁধে নিতে ইতস্ততঃ করছেন। তখন বল্লভভাই বলেন, শেষ পর্যন্ত মওলানা যদি অস্বীকারই করেন, ডঃ পট্টভীকে দাঁড়াতে বলতে হবে। এই কাজের জন্য ডঃ পট্টভীর নাম আমার মনে হয়নি, তাই প্রতিবাদ না করে আবার বলি যে, মওলানাকে রাজী করাতে হবে। তার পরেই আমি বার্দোলি থেকে চলে আসি। এলাহাবাদে পেঁছে আমি তার পাই, তাতে জানানো হয় যে মওলানা রাজী হয়েছেন। আমি সোজা আলমোড়া চলে যাই আর রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের আগের দিন অবধি সেখানেই থাকি।

'অপবাদের' প্রস্তাব সম্পর্কে তথ্যগুলি এই:—আমি মনে করতাম যে, তোমার এবং গান্ধীজীর একযোগে কাজ করা অসম্ভব, যদি না বিষয়টা পরিষ্কার হয়। তাই তোমাকে একাধিক বার ব্যাপারটা পরিষ্কার করে ফেলতে চাপ দেওয়া ছাড়া আমার এবিষয়ে আর কোনো আকর্ষণ ছিল না। গান্ধীজী, রাজেন্দ্রবাবু বা সর্দার প্যাটেল এ সম্বন্ধে কি ভাবেন, সেটা তাঁরাই বলবেন। তাঁদের নির্দিষ্ট মনোভাব থেকে আমার মনে

হয়েছে যে, তাঁরা এর প্রতি বিরাট গুরুত্ব আরোপ করেছেন। যখন ত্রিপুরীতে গিয়ে আমরা পেঁছিই, তখনো আমাকে আবার একথা বলা হয়। আমার নিজের নির্দিষ্ট অভিমত এই যে, বিষয়টি তোমার বা রাজেন্দ্রবাবুর, অথবা উভয়ের সংক্ষিপ্ত বিবৃতিতে এ আই সি সিকে জানানো যেতে পারত এবং এ বিষয়ে কোন প্রস্তাব আনতে দেওয়াও উচিত হয়নি। অন্যেরা এ বিষয়ে রাজী হন নাই। একটি প্রস্তাব আসে যে, এ আই সি সির জন্য একটি প্রস্তাবের খসড়া করা উচিত। আমার মনে হয়, কংগ্রেসকে এড়িয়ে যাবার এতে উদ্দেশ্য ছিল না, বরং বিষয় নির্বাচনী কমিটি বসবার আগে আবহাওয়াটা পরিষ্কার করবার উদ্দেশ্যই ছিল। পূর্বের মত আমাকেই প্রস্তাবের খসড়া করতে বলা হয়। আমি বলি যে, যতদূর পারি তাঁদের মতের আমি প্রতিনিধিত্ব করতে চেষ্টা করব, যদিও আমি এতে সায় দিই না। এ আই সি সির জন্য আমি একটি সংক্ষিপ্ত প্রস্তাবের খসড়া করি, তাতে পুরানো ওয়ার্কিং কমিটির এবং গান্ধীজীর নেতৃত্ব ও নীতির প্রতি আস্থা জ্ঞাপন করা হয়। এতে আরো বলা হয় যে, এই নীতি কখনো ভাঙা উচিত হবে না। এতে 'অপবাদের' বা গান্ধীজীর ইচ্ছা অনুসারে ওয়ার্কিং কমিটি গঠনের কোনো উল্লেখ ছিল না। এই প্রস্তাব অনুমোদিত হয়নি, পরে একটা দীর্ঘতর সংশোধিত প্রস্তাব রাজেন্দ্রবাবু সম্ভবত অন্যদের সঙ্গে পরামর্শ করেই উপস্থাপিত করেন (গোবিন্দবল্লভ পন্থ তখনো এসে পেঁছন নি)। আমার এই প্রস্তাবটি ভাল লাগেনি, এবং সেকথাও বলি। আমি বলি যে, 'অপবাদের' ধারাটি যেভাবে লেখা হয়েছে সেটা দৃষ্টত আপত্তিকর নয়, কিন্তু আমার কাছে তবুও তা অবাঞ্ছিত বলে মনে হয়, এতে ক্রোধেরই উদ্রেক করবে, বিশেষ করে তুমি যখন অসুস্থ তখন তো বটেই। আমাকে বলা হয় যে, প্রস্তাবে এই বিষয়ের উল্লেখে খুবই বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়, কেন না যাঁদের সম্মান নষ্ট হয়েছে, তাঁদের অবস্থাটা এমনি ধারা পরিষ্কার না হলে, তাঁদের পক্ষে সহযোগিতা করা অসম্ভব। এইটি করা এবং গান্ধীজীর নীতি-মাফিক চলাই অতি আবশ্যক। এও যোগ করা হয় যে, উল্লেখটি যতদূর সম্ভব নরম এবং নৈর্বক্তিক হয়েছে। তার বেশি তাঁরা কিছু করতে পারেন না।

তারপরে আমার বলার কথা খুব কমই ছিল। আমি তাঁদের স্পষ্ট জানিয়ে দিই যে, কতগুলি দিক থেকে এই প্রস্তাবটিকে আমি লক্ষ্মীছাড়া বলেই মনে করি, কিন্তু এটি যখন তাঁদের সম্মানের ব্যাপার, এর সঙ্গে আমার আর কোন সম্বন্ধ নেই। আমি এ আলোচনায় যোগ দেব না।

তারপরে কি ঘটে জানি না। এ আই সি সি বৈঠকে দেখি, গোবিন্দবল্লভ পন্থ এটি উত্থাপন করতে যাচ্ছেন, তুমিও সেখানে হাজির ছিলে। তারপরে প্রস্তাবটি যখন বিষয়-নির্বাচনী কমিটিতে দেওয়া হ'ল, আমি প্রস্তাবকারীদের কয়েকজনের সঙ্গে দেখা করে কিছু পরিবর্তন চলতে পারে এই ইঙ্গিত করি। আমি এটাও দেখিয়ে দিই যে, মূল প্রস্তাবটি এ আই সি সির জন্যই মোটামুটি একটি পরিচ্ছেদের এবং মতদ্বৈধের উপসংহার হিসেবে করা হয়। কিন্তু যখন এটা কংগ্রেসে পেশ হতে যাচ্ছে, তখন অন্য ভাবেই তার বিচার করা উচিত। আবার আমাকে বলা হ'ল যে, এটা সম্মানের প্রশ্ন, এটা পরিষ্কার না হলে, তাঁরা সহযোগিতার কথা ভাববেন কি করে। তোমার মনে থাকবে কংগ্রেসের আগে তাঁরা তোমাকে বলেছিলেন যে, তোমার সঙ্গে সহযোগিতা করতে পারবেন না। এই প্রস্তাবটিকে তাঁরা সম্ভাব্য সেতু হিসেবে দেখলেন, যাতে করে তোমার সঙ্গে সহযোগিতার চেষ্টা চলতে পারে। এ ছাড়া আর কোন সেতু ছিল না।

আর একবার খুব দৃঢ় প্রচেষ্টা করি, যাতে প্রকাশ্য অধিবেশনের আগে, যখন তুমি অসুস্থ হয়ে শয্যাশায়ী, তখন প্রস্তাবটি পরিবর্তিত হয়, আমি ব্যর্থ হই, যদিও

এটি এ আই সি সিতে উল্লেখ করার জন্য মিঃ য়্যানে যে প্রস্তাব করেন সেটা মানতে সবাই রাজী হয়ে যান। মিঃ য়্যানে বোধ হয় ভেবেছিলেন, এবং সেই মতোই আমাদের মনোভাব দেখান যে, তাঁর প্রস্তাবটি বাংলার বহু বন্ধু দ্বারাই অনুমোদিত। এমন কি আমরাও এইরকম একটা ভাব পাই (তা ভুলও হতে পারে) যে, তুমিও এই প্রস্তাবটি অনুমোদন কর। তারপরে কি ঘটে তুমি জান।

পরদিন বিষয়-নির্বাচনী কমিটির মণ্ডপে যে কংগ্রেস অধিবেশন বসে, তাতে যখন গোবিন্দবল্লভ পন্থ প্রস্তাবটি উত্থাপন করছিলেন, সুরেশ মজুমদার আমার কাছে এসে এই প্রস্তাব করেন যে, প্রস্তাবটি এ আই সি সির হাতে দেওয়া হোক। তার মানে তিনি মিঃ য়্যানের প্রস্তাবটিকে আবার জাগিয়ে তুললেন। তিনি বললেন যে, গতরাত্রে ভুল বোঝার ব্যাপার হয়েছিল, এখন এই প্রস্তাবটিতে সবাই সম্মতি দেবেন। আমি বললাম যে, আমি এ ব্যাপারে অক্ষম, বিশেষ করে এই অবস্থায় যখন পন্থ সত্যই এটা উত্থাপন করছেন। আমি নানাভাবে আগে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি, তিনি তার চেয়ে সংশ্লিষ্ট দলগুলির কাছে গেলে ভাল হয়। তিনি পরে কি করেন আমি জানি না।

ত্রিপুরীর দৃশ্যাবলীর আড়ালে এবং ডেলিগেট-শিবিরে কি ঘটছিল, হয়ত সে বিষয়ে আমার চেয়ে তোমার জ্ঞান ঢের বেশি। আমি আমার কুটীর থেকে বিশেষ কোন কাজ ছাড়া বের হইনি. অতিথিও খুব কম আপ্যায়ন করেছি। আমিও খানিকটা সময় মিশরীয় ডেলিগেটদের নিয়েই ব্যস্ত ছিলাম।

তুমি আমার 'মক্কেলদের' কথা উল্লেখ করেছ। আমার আশংকা হয় যে, এই 'মক্কেলরা' আমার ওকালতিতে বিশেষ খুশি হবেন না, আর আমিও তাঁদের কাছে খুবই অপ্রিয় হয়ে গেছি। এই ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট প্রায় সবাইকেই অসন্তুষ্ট করা—এ এক আশ্চর্য কৃতিত্ব বটে।

এই 'অপবাদ'-মূলক প্রস্তাব সংবিধান-বিরহিত বা বেআইনী কি না, সে-সিদ্ধান্তের ভার তোমার উপর। এ-প্রশ্নে আমার মত দেওয়ার খুব একটা যুক্তি নেই। আমি কার্যত চাই—কংগ্রেসের কাজ যাতে চালু থাকে, এবং আজ যে অচল অবস্থার ধারণা সৃষ্টি হয়েছে, সেটা দূর হয়। আমি তোমার বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে আন্দোলন শুরু করেছি, এটা যে তুমি ভাবতে পার—এতেই আমি অবাক হয়ে গেছি। গান্ধীজীর সঙ্গে আলাপের পর, আমি বড়ই উদ্বিগ্ন হই, এবং পরিস্থিতিটি নিয়ে বহুক্ষণ চিন্তাও করি। আমার দুর্ভাগ্য যে, যতটা হওয়া উচিত, আন্তর্জাতিক ঘটনায় তার চেয়ে বেশি প্রভাবিত হয়ে পড়ি। এক অতি ভয়ংকর সংকট ইউরোপে দেখা দিয়েছে, তার ফলে যুদ্ধও হতে পারে। আমি ভাবলাম, ঘটনাবলীর জন্য আমাদের নিষ্ক্রিয়ভাবে বসে থাকা উচিত নয়। গান্ধীজীর কাছে শরতের তার থেকে এই-ই মনে হয় যে, সে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসছে না। ঘটনা যখন মার্চ করে চলছিল, কিছুই করা হ'ল না। তাই আমি তার পাঠাব ঠিক করি, আমি পরে এটি গান্ধীজী ও আরো দু-একজনকে দেখাই। কোন খবরের কাগজওয়ালাকে দিইনি, দেখাইও নি। আসল কথা হচ্ছে, গান্ধীজীর সঙ্গে তখন যে দু-একজন ছিলেন, তাঁদের ছাড়া আর কারো কাছে এমন কি উল্লেখও করিনি। এখনো আমি কাউকে দেখাই নি। সম্ভবতঃ কেউ এ সম্বন্ধে সেকেণ্ড হ্যাণ্ড খবর পেয়ে সংবাদপত্রকে দেয়।

তুমি কি এটা মনে কর না যে, ত্রিপুরীর আগে ওয়ার্কিং কমিটির বারো জন সদস্যদের পদত্যাগের সঙ্গে এবং কংগ্রেস অধিবেশনের পরের অবস্থার তুলনাটা যুক্তি-সঙ্গত নয়? তাঁদের পদত্যাগে এই অচল অবস্থার সৃষ্টি হয়নি বা হওয়া উচিত ছিল না। তাঁরা পদত্যাগ না করে কাজ করবার জন্য পীড়াপীড়ি করলেই বরং অচল অবস্থার সৃষ্টি হতে পারত। তাঁদের পদত্যাগের প্রতিবাদ করা তো দূরের কথা, আমার মনে

হয়, ব্যক্তিগত এবং সমষ্টিগত ভিত্তিতে তাঁদের কাছে আর অন্য পথ খোলা ছিল না।

আমি যখন দিল্লী থেকে তারখানি পাঠাই, জানতাম তুমি সেখানে আসতে পারবে না। আমি তোমাকে এই আভাস দিতে চেয়েছিলাম যে, গান্ধীজী তোমার সঙ্গে দেখা করতে ধানবাদ যেতেও পারেন। আমার মনে হয়, তুমি আমন্ত্রণ করলে তিনি যেতেনও। স্বভাবতঃই তিনি বিনা-আমন্ত্রণে যেতে একটু বা দ্বিধা অনুভবই করেন। ত্রিপুরী প্রস্তাব সিদ্ধ, কি অসিদ্ধ, সে অধিকার তোমার উপরেই ন্যস্ত। তোমার কি প্রতিক্রিয়া হবে, না জানতে পারলে তিনি তো কোন কিছু করতে পারতেন না। সম্ভবতঃ তুমি ভেবেছিলে, তিনি ধানবাদে আসতে পারবেন না। যখন তোমার সেক্রেটারী এখানে আমাকে ফোন করলেন, তিনি তখন দিল্লী যাবার পথে সত্যই স্টেশনে যাচ্ছিলেন। যদি অদূর ভবিষ্যতে ব্যক্তিগত সাক্ষাৎ শক্তই হয়, আমার মনে হয়েছিল যে, তোমরা পরস্পরের মধ্যে চিঠিপত্র আদান-প্রদান করে ব্যাপারটা পরিষ্কার করে নিতে পারবে। আমি দিল্লী থেকে তোমাকে অপ্রতিভ করা বা তোমার বিরুদ্ধে আন্দোলনের জন্য তোমাকে তার করেছিলাম—এ-ইঙ্গিত দিয়ে তুমি আমার প্রতি খুবই অবিচার করেছ।

আমি নিজের সম্বন্ধে একথা বলতে পারি যে, গয়ার-এর দানের জন্য গান্ধীজীর দিল্লী বসে থাকার ধারণাটা আদৌ আমার পছন্দ নয়। তাঁর অনশন বা গয়ার সম্বন্ধে উল্লেখও আমার মনঃপূত নয়। নিষ্পত্তির যে শর্তাবলীতে গান্ধীজীর অনশন শেষ হ'ল, সেগুলি সম্পর্কেও আমার খুব-একটা উঁচু ধারণা নেই। তিনি যে অনশন ভঙ্গ করলেন, এতেই আমি আনন্দ প্রকাশ করি। তার চেয়ে বেশি কিছু নয়।

চিঠিখানি বড় বেশি দীর্ঘ হয়ে গেল, তোমার চিঠি পেয়েই আমি প্রায় এক নাগাড়ে অনেকক্ষণ বসে লিখে ফেলেছি। তবু এমন অন্য অনেক বিষয় তুমি উল্লেখ করেছ, যেগুলো সম্পর্কে আমি কিছু বলতে পারতাম। আমার নিজের ত্রুটির তুমি যে উল্লেখ করেছ, সেগুলি আমার পক্ষে আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। আমি সেগুলি স্বীকার করি এবং দুঃখও প্রকাশ করি। তুমি ঠিকই বলেছ যে, রাষ্ট্রপতিরূপে আমি সেক্রেটারী বা মহিমময় কেরানী হিসেবে প্রায়ই কাজ করেছি। বহুদিন থেকেই আমি নিজের সেক্রেটারী এবং কেরানীগিরি করবার অভ্যাস করে নিয়েছি, এবং আমার আশংকা হয়, এতে আমি অন্যের সংরক্ষিত এলাকায় হস্তক্ষেপই করি। এটাও সত্য যে, আমার জন্যই কংগ্রেসী প্রস্তাবগুলি দীর্ঘ, শব্দ আড়ম্বরে পূর্ণ এবং গবেষণা প্রবন্ধের মত হয়েই দেখা দেয়। আমার ভয় হয়, ওয়ার্কিং কমিটিতেও আমি বড় বেশি বক্‌বক্‌ করি আর যেরকম ব্যবহার করা উচিত, তেমনটি করি না।

আমি তোমার বাম এবং দক্ষিণ শব্দ দুটির ব্যবহারে আপত্তি করি, কারণ আমার মনে হয়, তুমি সেগুলি অস্পষ্ট এবং এলোমেলো ভাবেই ব্যবহার কর। বাম ও দক্ষিণ নামে দুটি বস্তু অবশ্যই আছে। কংগ্রেসে আর দেশেও সেটা আছে। কিন্তু ঠিকভাবে এই কথাগুলি ব্যবহার না করলে তারা হয়তো গোলযোগ সৃষ্টি করতে পারত এবং করেও।

আমার মনে পড়ে না আমি একথা বলি যে, রাজকোট আর জয়পুর অন্য সব প্রশ্নকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। আমি সম্ভবতঃ এই বলি যে, রাজকোট বহু ব্যাপারে এখন প্রাধান্য লাভ করেছে, আমি তার দ্বারা গান্ধীজীর অনশন এবং তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আরো নানা ব্যাপারই বুঝিয়েছিলাম।

বোম্বে ট্রেড ডিসপ্যুট বিল-এর কথা বলি। এটি আইন হয়ে গেলে এবং বোম্বেতে গুলী চলার পর ভারতে এসে পৌঁছই। আমি এটা তথ্য হিসেবে উল্লেখ করছি, এড়াবার জন্যে নয়।

যুক্ত প্রাদেশিক কংগ্রেসে আমাদের একটা নিয়ম আছে, প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি থেকে গ্রাম কমিটি পর্যন্ত কোন কমিটিতেই কেউ দুবছর একাধিকক্রমে সভাপতি থাকতে পারবেন না।

তুমি ত্রিপুরীতে নানা প্রদেশ থেকে ডেলিগেট আনার ব্যাপারে দুর্নীতির উল্লেখ করেছ। আমার প্রদেশ সম্পর্কে যতদূর জানি, এমন ধরণের কিছু করা হয়েছিল বলেই মনে হয়, যদিও আমি নিশ্চিত নই। হয়তো, অন্যত্রও এমনি হয়ে থাকবে। আমি কি অন্যান্য প্রদেশগুলি সম্পর্কে একটা তদন্ত চালাবার কথা বলতে পারি। এতে করে আমাদের সংস্থার মধ্যে অবসৃতি সৃষ্ট হবে।

পন্থ-এর প্রস্তাবের আমি কি ভাষ্য করি—সেকথা জানতে চেয়েছ। আমি তো একে অনাস্থা প্রস্তাব বলে মনে করিনে, কিন্তু তোমার রায়ের প্রতি পূর্ণ আস্থার অভাব এতে নিশ্চয়ই সূচিত হয়েছিল। এটা নিশ্চিত গান্ধীজীর প্রতি আস্থা-জ্ঞাপকই ছিল।

আমি কি সমাজবাদী বা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী? এই দুটি কথার কি আবশ্যক বিরোধিতাই আছে? আমরা কি সবাই এমনি পূর্ণ মানুষ যে, একটা শব্দ বা বাক্য-ব্যঞ্জনায় আমরা সঠিকভাবে নিজেদের প্রকাশ করতে পারি? আমার মনে হয়, এগুলোর যাই-ই মানে হোক না কেন, আমি স্বভাবে এবং শিক্ষায় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী —এবং বুদ্ধিবৃত্তির দিক দিয়ে আমি সমাজবাদী এতে যে অর্থই থাক না কেন। আশা করি, সমাজবাদ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে হত্যা করে না বা দাবিয়ে রাখে না। বাস্তবিকই আমি এর প্রতি এই জন্যই অনুরাগী; কারণ এটি বহুসংখ্যক ব্যক্তিকে অর্থনীতিক এবং সাংস্কৃতিক দাসত্ব বন্ধন থেকে মুক্তি দেবে। কিন্তু আমি নিজে আলোচ্য হিসাবে একঘেয়ে মানুষ, বিশেষ করে এমন অনুচিত দীর্ঘ চিঠির উপসংহারে তো বটেই। আমি যে একজন অসন্তোষভাজন মানুষ, নিজের আর পৃথিবীর উপরে যার অসন্তোষ, এবং যে তুচ্ছ দুনিয়ায় সে থাকে, তাকে সেই দুনিয়া বিশেষ পছন্দ করে না, এস এই কথা দিয়েই এই প্রসঙ্গে ইতি করি।

আমি তো এখন এই ভোর রাতে জাতীয় বা আন্তর্জাতিক ব্যাপারে আমার মতামত লিখতে সাহসী হচ্ছি না। আমি সাধারণতঃ এগুলো সম্পর্কে নীরব নই। তুমি তো লক্ষ্য করেছ, আমি অনেক বক্‌বক্ করি, আর লিখি তার চেয়েও বেশি। বর্তমানে এই প্রসঙ্গ এইখানেই শেষ করব। কিন্তু এই কথাও যোগ করে দিতে ইচ্ছে করি যে, আমি যেমন প্রায়ই হারানো আদর্শের পক্ষেই ওকালতি করি, জার্মানী এবং ইতালীর মত দেশকে নিন্দাও করে থাকি, আমার মনে হয় না, যে আমি কখনো ব্রিটিশ এবং ফরাসী সাম্রাজ্যবাদকে সচ্চরিত্রতার সার্টিফিকেট দিয়েছি।

আমি দু-এক দিন আগে তোমাকে ন্যাশনাল হেরাল্ডে ত্রিপুরীর আগে লেখা প্রবন্ধাবলীর কিছু কিছু পাঠিয়েছি। একটা হারিয়ে যায়, একবার আলাদা করে পুরো সেটটাই পাঠাচ্ছি। ফ্রি প্রেস জার্ণাল বা অন্য কোন কাগজের জন্য কোন প্রবন্ধ লিখি নি।

তোমার স্নেহভাজন
জওহর

শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু, কংগ্রেস রাষ্ট্রপতি
পোঃ জিয়ালগোরা, জিঃ মানভূম

২৫৬ মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক লিখিত

নিউ দিল্লী
৩০শে মার্চ, ১৯৩৯

প্রিয় জওহরলাল,

আমি তোমার দুখানি চিঠি পেয়েছি। দুখানিই ভাল।

চিঠিপত্রগুলির নকল পাঠাচ্ছি। যুক্ত প্রদেশের ঘটনাগুলি আমাকে উদ্বিগ্ন করে তুলেছে। আমার সমাধান হচ্ছে, হয় তোমার প্রধানমন্ত্রী হওয়া, নয় তো মন্ত্রীসভা ভেঙে দেওয়া উচিত। এই উচ্ছৃংখল লোকগুলির উপরে তোমাকে অবশ্যই কর্তৃত্ব করতে হবে।

যেসব সোশালিস্টরা এখানে এসেছিলেন, তাঁদের সঙ্গে তিন দিন ধরে খোলাখুলি-ভাবে আলাপ হয়েছে। নরেন্দ্র দেব সে খবর তোমাকে দিবেন। তিনি যদি স্বেচ্ছায় না দেন, তুমি তাঁকে দেওয়াবে।

ভালবাসা নিয়ো।

বাপু

২৫৭ সুভাষচন্দ্র বসু কর্তৃক মহাত্মা গান্ধীকে লিখিত

জিয়ালগোরা পোঃ
জেলা মানভূম, বিহার
মার্চ ২৫, ১৯৩৯

শ্রদ্ধেয় মহাত্মাজী,

আমার বিরুদ্ধে কংগ্রেসের কাজকর্মে অচলাবস্থা সৃষ্টির অভিযোগ যাঁরা এনেছেন তাঁদের উত্তরে আজ (শনিবার,২৫ শে) আমি যে বিবৃতিটি প্রকাশ করেছি, আশা করি সেটি আপনি দেখে থাকবেন। আমাদের সামনে বর্তমানে সবচেয়ে জরুরী সমস্যা হল; একটি নতুন ওয়ার্কিং কমিটি গড়ে তোলা; আর এ-সম্পর্কে কোন উপযুক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হতে গেলে বৃহত্তর তাৎপর্যমণ্ডিত কয়েকটি পূর্বতন সমস্যার কথা চিন্তা করতে হবে। যাই হোক, আমি প্রথমোক্ত সমস্যাটিকেই সর্বাগ্রে গ্রহণ করছি।

এই প্রসঙ্গে আপনি যদি নিম্নোক্ত বিষয়গুলি সম্পর্কে আপনার মতামত আমাকে দয়া করে জানান তাহলে আমি কৃতজ্ঞ থাকব :

(১) ওয়ার্কিং কমিটি গঠন সম্পর্কে আপনার বর্তমান ধারণা কী? এটি প্রধানত সমসত্ত্বমূলক হওয়া উচিত, না কংগ্রেসের মধ্যে যে সব বিভিন্ন দল (বা গোষ্ঠী) রয়েছে তাদের থেকে এতে সদস্য গ্রহণ করা উচিত—যা হলে সামগ্রিক ভাবে যতদূর সম্ভব এটি সারা কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের যথাযথ প্রতিনিধিত্ব দাবি করতে পারবে।

(২) কমিটির গঠন সমসত্ত্বমূলক হক, এই মত এখনও আপনি যদি দৃঢ়ভাবে সমর্থন করেন, তাহলে স্পষ্টতই একই কমিটিতে একদিকে আমার মত লোক ও অন্যদিকে সর্দার প্যাটেল ও অন্যান্যরা একত্র থাকতে পারেন না, (এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন বোধ করছি যে ওয়ার্কিং কমিটির রূপ সমসত্ত্বমূলক হক, এ রকম ধারণার বিরোধিতা আমি বরাবরই করে এসেছি।)

(৩) ওয়ার্কিং কমিটিতে বিভিন্ন দলের (বা গোষ্ঠীর) প্রতিনিধি থাকা উচিত বলে যদি আপনি মনে করেন তাহলে তাদের সংখ্যাগত প্রতিনিধিত্ব কী রকম হওয়া উচিত?

আমার মতে কংগ্রেসের মধ্যে প্রধানত দুটি দল বা ব্লক বর্তমান। সম্ভবত

তাদের সংখ্যা মোটামুটি সমান। সভাপতি-নির্বাচনে আমরাই সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেছিলাম। ত্রিপুরীতে ঠিক তার উল্টোটি ঘটল। অবশ্য তার কারণ, কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দলের মনোভাব। কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দল নিরপেক্ষতা অবলম্বন না করলে সমস্ত বিঘ্ন সত্ত্বেও (পরবর্তী কোন পত্রে বা সাক্ষাতে আমি সেগুলি উল্লেখ করব) প্রকাশ্য অধিবেশনে আমরা সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে পারতাম।

(৪) যদি আমি সাত জন সদস্যের নাম প্রস্তাব করি আর আপনি যদি সর্দার প্যাটেলকে অপর সাত জনের নাম প্রস্তাব করতে অনুরোধ করেন, তাহলে আমার মনে হয় উভয় পক্ষের গ্রহণযোগ্য একটি নামের তালিকা প্রস্তুত করা সম্ভব হতে পারে।

(৫) তাছাড়া, যদি আমায় সভাপতি পদে অধিষ্ঠিত থাকতে হয় এবং যথাযথভাবে কার্য পরিচালনা করতে হয়, তাহলে সাধারণ সম্পাদক আমার মনোনীত ব্যক্তি হওয়া প্রয়োজন।

(৬) কোষাধ্যক্ষের নাম সর্দার প্যাটেল প্রস্তাব করতে পারেন।

এখন পণ্ডিত পন্থের প্রস্তাবের দুটি মুখ্য তাৎপর্যের উল্লেখ করছি। (পৃথক একটি পত্রে বিষয়টি সম্পর্কে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করব) প্রথমত, প্রস্তাবটিকে কি আপনি আমার বিরুদ্ধে অনাস্থাজ্ঞাপক বলে মনে করেন এবং আপনি কি চান যে এটিকে সেভাবে মেনে নিয়ে আমি পদত্যাগ করি?

দ্বিতীয়তঃ, পণ্ডিত পন্থের প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার পর সভাপতির ঠিক অবস্থাটি কি? কংগ্রেসের গঠনতন্ত্রে ১৫শ ধারা অনুসারে সভাপতিকে ওয়ার্কিং কমিটি নিয়োগ সম্পর্কে কতকগুলি ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে এবং গঠনতন্ত্রের সেই ধারাটি অদ্যাপি অপরিবর্তিত আছে। এই সঙ্গে এটিও স্মর্তব্য যে, পণ্ডিত পন্থের প্রস্তাবে বলা হয়েছে, যে আপনার অভিপ্রায় অনুযায়ী আমার দ্বারা ওয়ার্কিং কমিটি গঠিত হবে। ফলশ্রুতি? এর মধ্যে আমি কি আদৌ গণ্য? আপনি কি সম্পূর্ণ ভাবে আপনার পছন্দ ও ইচ্ছানুযায়ী একটি তালিকা প্রস্তুত করে দেবেন আর আপনার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করাই হবে আমার কর্ম? এর অর্থ হবে কংগ্রেসের গঠনতন্ত্রের ১৫শ ধারাটি পরিবর্তন না করে সেটি অকার্যকর করে দেওয়া।

এই প্রসঙ্গে, একথাও আমি বলতে বাধ্য যে পণ্ডিত পন্থের প্রস্তাবের উপরোক্ত অংশটি স্পষ্টতই গঠনতন্ত্রের সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন এবং তার এক্তিয়ার বহির্ভূত। বস্তুতপক্ষে খুব দেরিতে পেশ করার জন্য পণ্ডিত পন্থের মূল প্রস্তাবটিই বিধিবহির্ভূত এবং আমি আমার অধিকার বলে সেটিকে সেইভাবেই সরাসরি নাকচ করে দিতে পারতাম। যে রকম অধিকারসম্মত ভাবে মওলানা আজাদ প্রকাশ্য অধিবেশনে জাতীয় দাবি সম্পর্কে শ্রীশরৎচন্দ্র বসুর সংশোধনী প্রস্তাবটি নাকচ করে দিয়েছিলেন। তাছাড়া নিছক গঠনতন্ত্রের দিক দিয়ে দেখলে, পণ্ডিত পন্থের প্রস্তাবটি আলোচনার্থ অনুমতি দেবার পরও প্রস্তাবটির শেষ ধারায় যেখানে ওয়ার্কিং কমিটির গঠন সম্পর্কে বলা হয়েছে, সেই অংশটুকুও আমি বিধিবহির্ভূত বলে বাতিল করে দিতে পারতাম, কারণ তা গঠনতন্ত্রের ১৫শ ধারার বিরোধী। কিন্তু গঠনতন্ত্রের খুঁটিনাটি ব্যাপারে অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ করা আমার স্বভাব বিরুদ্ধ (এবং স্বভাবে আমি গণতান্ত্রিক)। তাছাড়া যখন ভোটের রায় আমার বিরুদ্ধে যাওয়ার সম্ভাবনা তখন গঠনতন্ত্রের পক্ষপুটে আশ্রয় গ্রহণ করা আমার কাছে খুব পৌরুষের পরিচায়ক বলে মনে হয়নি।

এই চিঠিটি শেষ করবার আগে আমি আর একটি বিষয়ের উল্লেখ করব। সমস্ত

বাধা বিপত্তি ও অসুবিধা অগ্রাহ্য করে যদি আমি সভাপতি পদে অধিষ্ঠিত থাকি তাহলে আপনি আমায় কী ভাবে কাজ চালাতে বলেন? আমার মনে আছে গত বার মাসে আপনি আমায় মাঝে মাঝে (বোধহয় প্রায়ই) এই মর্মে উপদেশ দিয়েছেন যে আপনি চান না যে আমি সাক্ষিগোপাল-সভাপতি হয়ে বসে থাকি। আপনি বলেছিলেন যে আপনি খুশী হবেন যদি আমি আমার প্রভাব প্রকাশ করি। ওয়ার্ধায় ১৫ই ফেব্রুয়ারি ১৯৩৯ তারিখে আমি যখন লক্ষ্য করলাম আমার প্রস্তাবিত কর্মসূচীতে আপনার সম্মতি নেই, তখন আমি বলেছিলাম আপনাকে যে আমার সামনে দুটি পথ খোলা আছে—হয় আমায় আত্মবিলোপ করতে হবে আর নাহলে আমার সাধু বিশ্বাসের উপর নির্ভর করতে হবে। আমার যদি ঠিক ঠিক স্মরণ থাকে, আপনি আমায় উত্তরে বলেছিলেন যে যদি আমি স্বেচ্ছায় আপনার মতাবলম্বী না হই, তাহলে আমার আত্মবিলোপ আত্মদমনের নামান্তর হবে, আর আত্মদমন কখনই আপনি অনুমোদন করতে পারেন না। সভাপতি হিসেবে যদি আমায় কাজ চালিয়ে যেতেই হয় তাহলে আমি যেন সাক্ষিগোপাল হয়ে না থাকি—গত বৎসরের মত এখনও কি আপনি আমায় এই উপদেশই দেবেন?

আমি যা বললাম তা থেকে বোঝা যাবে যে আমি ধরে নিচ্ছি যে সভাপতি নির্বাচন ও তারপর বিশেষত ত্রিপুরীতে যা কিছু হয়েছে তা সত্ত্বেও এখনও কংগ্রেসের সমস্ত দল (বা গোষ্ঠী) গুলির একসঙ্গে কাজ করে যাওয়া সম্ভব।

আমার পরবর্তী চিঠিতে আমি সাধারণ সমস্যাগুলি নিয়ে আলোচনা করব; আজকের সংবাদপত্রে প্রদত্ত বিবৃতিতে যেগুলির কিছু কিছু আমি উল্লেখ করেছি।

আমি একটু একটু করে সেরে উঠছি। দ্রুত আরোগ্য লাভের প্রধান প্রতিবন্ধক হয়েছে অনিদ্রা।

আশা করি গুরুতর কার্যভার সত্ত্বেও আপনার স্বাস্থ্য ভাল হয়ে উঠছে।

প্রণাম জানাই।

স্নেহবদ্ধ
সুভাষ

২৫৮ মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক সুভাষচন্দ্র বসুকে লিখিত

নয়া দিল্লী
মার্চ ৩০, ১৯৩৯

কল্যাণীয় সুভাষ,

তোমার ২৫ তারিখের চিঠির উত্তর দিতে বিলম্ব হল, কারণ এর মধ্যে আমি আমার তারের জবাব আশা করছিলাম তোমার কাছ থেকে। সুনীলের তার গত রাত্রে পেয়েছি। প্রভাতী প্রার্থনার পূর্বেই এই উত্তর লেখবার জন্যে একটু সময় করে নিয়েছি।

তুমি যখন ভাবছ যে পণ্ডিত পন্থের প্রস্তাব বিধি বহির্ভূত এবং ওয়ার্কিং কমিটি গঠন সম্পর্কিত অংশটি গঠনতন্ত্রবিরোধী ও তার এক্তিয়ার-বহির্ভূত, তখন তোমার পথ ত খুব স্পষ্ট। কমিটি সম্পর্কে তোমার ইচ্ছা বন্ধন-মুক্ত হওয়া উচিত।

সুতরাং এ বিষয়ে তুমি যে সব প্রশ্ন করেছ আমার দিক থেকে সেগুলির উত্তর দেওয়ার কোনই দরকার নেই।

ফেব্রুয়ারিতে আমাদের দেখা হওয়ার পর থেকেই আমার মত ক্রমেই দৃঢ়তর হয়েছে যে আমাদের মতান্তর আছে এবং তা মূলগত ব্যাপার নিয়ে—আমরা তা মেনেও নিয়েছিলাম। যদি ধরে নেওয়া যায় যে নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির

অধিকাংশের সমর্থন তুমি পেয়েছ, তাহলে ওয়ার্কিং কমিটিতে শুধু তেমন লোকেদেরই নেওয়া উচিত যাঁরা তোমার নীতিতে বিশ্বাসী।

হ্যাঁ—গত ফেব্রুয়ারিতে সেবাগ্রামে তোমার সঙ্গে দেখা হওয়ার সময় যে মত আমি প্রকাশ করেছিলাম তার প্রতি নিষ্ঠা আজও আমার অবিচল। আত্মদমনে তোমাকে সহায়তার অপরাধে অপরাধী হতে আমি অনিচ্ছুক। স্বেচ্ছাকৃত বিলুপ্তি অবশ্য স্বতন্ত্র বস্তু। দেশের স্বার্থে যে প্রত্যয়ে তুমি প্রতিষ্ঠিত তা বর্জন করা আত্মদমনের নামান্তর মাত্র। কাজেই যদি সভাপতি হিসেবে তোমায় কাজ চালিয়ে যেতে হয় তাহলে তোমার হাত খোলা থাকা চাইই। দেশের যা পরিস্থিতি তাতে কোন মধ্যপথ উন্মুক্ত নেই।

গান্ধীপন্থীদের (ভুল শব্দটি যদি ব্যবহার করতেই হয়) কথা যদি বল, তাঁরা তোমার প্রতিবন্ধক হবেন না। যেখানে তাঁরা পারবেন, তোমায় সাহায্য করবেন, যেখানে না পারবেন বিরত থাকবেন। তাঁরা যদি সংখ্যালঘুই হন তাহলে কোন অসুবিধেই হবে না। কিন্তু যদি তাঁরা সংখ্যাগুরু হন তাহলে তাঁরা নিজেদের নিবৃত্ত রাখতে নাও পারেন।

অবশ্য আমায় যা চিন্তিত করেছে তা হল কংগ্রেসের নির্বাচকমণ্ডলীর অন্তর্নিহিত গলদ যার ফলে সংখ্যাগুরু, সংখ্যালঘু দুইই কিছুটা অর্থহীন হয়ে পড়ে। এই গলদ যতদিন দূর করতে পারা না যাচ্ছে ততদিন অবশ্য এই ত্রুটিযুক্ত যন্ত্রটি নিয়েই যতদূর সম্ভব কাজ চালিয়ে যেতে হবে। অন্য যে বিষয়টি আমায় দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করেছে তা হল আমাদের পারস্পরিক অবিশ্বাস। কর্মীরাই একে অন্যকে অবিশ্বাস করলে কোন যৌথ কর্মোদ্যম অসম্ভব হয়ে ওঠে।

আমার ত মনে হয় তোমার চিঠির মধ্যে আর এমন কোন বিষয় নেই যার উত্তর দেওয়া দরকার।

তুমি যা কিছু কর না কেন, ঈশ্বর যেন তোমায় পথ প্রদর্শন করেন। ডাক্তারদের কথা ঠিক মত শুনে তাড়াতাড়ি ভাল হয়ে ওঠ। ভালবাসা রইল।

বাপু

আমার কথা যদি বল আমাদের পত্রাবলী প্রকাশিত করার প্রয়োজন নেই। তবে তুমি যদি অন্য রকম মনে কর, এদের প্রকাশে আমার অনুমতি থাকল।

২৫৯ শরৎচন্দ্র বসু কর্তৃক লিখিত

কলিকাতা
এপ্রিল ৪, ১৯৩৯

প্রিয় জওহরলাল,

আপনার ২৪ তারিখের দীর্ঘ পত্রের জন্য ধন্যবাদ। যদিও গান্ধীজীকে লেখা আমার ২১ তারিখের চিঠিটির প্রায় সবটুকু সম্পর্কেই আপনার মতান্তর বর্তমান, তবু এতে অন্য এক জনের দৃষ্টিকোণটি আমি দেখতে পেয়েছি বলে আপনার চিঠিটি পড়ে আমি আনন্দই পেয়েছি। আর তার উত্তর দিতে বিলম্ব হল বলে আমি অত্যন্ত দুঃখিত। আমার অসুস্থতাই এই বিলম্বের কারণ, দুর্ভাগ্যবশতঃ এখনও তা থেকে মুক্ত নই।

ঠিকই বলেছেন আপনি যে আমার চিঠিতে নীতি বা কার্যসূচী নয়, ব্যক্তিগত প্রশ্ন নিয়েই আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু তা আমার অভিপ্রায়বিরুদ্ধ ছিল না। আর নীতি ও ব্যক্তির মধ্যে পার্থক্য দর্শনে আমি অক্ষম বা এই দুইয়ের আপেক্ষিক মূল্যায়ণে আমি অসমর্থ এমনও নয়। সত্যি বলতে, সম্ভব হলে, আপনারই মত আমি নীতি ও কার্যসূচীর স্তরেই আলোচনাকে আবদ্ধ রাখতে চাইতাম। দুর্ভাগ্য-

বশত, রাজনীতির ক্ষেত্রে সব সময় শুদ্ধ-তত্ত্বের অমৃত পান করে কালাতিপাত করা যায় না। আর নীতি ও কর্মসূচীর মধ্যে বর্তমান আলোচনাকে আবদ্ধ রাখা আরও দুঃসাধ্য, এই কারণে যে গোড়া থেকেই সভাপতি-নির্বাচনের ব্যাপারটি প্রধানত, (সম্পূর্ণত বলা চলে), ব্যক্তি-কেন্দ্রিক রূপ পেয়েছে।

আপনি নিজেও বলেছেন যে আমি উত্থাপন করার পূর্বেও বিষয়টিতে ব্যক্তিত্বের প্রশ্ন বিজড়িত ছিল এবং ত্রিপুরীতে অন্যান্য বিষয়ের আলোচনাতেও তার প্রভাব পড়েছিল। আপনার সঙ্গে এবিষয়ে আমি একমত। বস্তুত, আমি আর একটু এগিয়ে বলতে চাই যে অন্য বিষয়গুলির প্রতি আমাদের দৃষ্টি আদৌ পড়েনি। এই জন্যই 'ব্যক্তি'গত বিষয়গুলি সম্পর্কে যা-কিছু বলবার ছিল সব নিঃশেষে প্রকাশ করে আমি সম্ভব হলে এই পরিস্থিতি অতিক্রম করতে সাহায্য করার জন্য মহাত্মাজীর কাছে আবেদন জানিয়েছিলাম। সত্যিকারের বাধা যেখানে ব্যক্তির প্রতি বিপক্ষতা সেক্ষেত্রে নীতিগত প্রশ্ন তুলে আসল ব্যাপার এড়িয়ে গিয়ে ত কোন লাভ নেই। আর একথাও বলা দরকার যে, যে বিপক্ষতার কথা বলা হল তার উৎস সুভাষের কোন কাজ নয়—পুরাতন ওয়ার্কিং কমিটির কয়েকজন সদস্যের মনোভাব ও কার্যকলাপ।

এই ব্যক্তিগত মতান্তরের উদ্ভব সম্পর্কে যে বিবরণ আপনি দিয়েছেন তাতে যে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারটি বাদ পড়েছে এইবার সে সম্পর্কে কিছু বলছি। আপনি ধরে নিয়েছেন যে সুভাষ তার কয়েকজন প্রাক্তন সহকর্মী সম্পর্কে যা নাকি বলেছে তার থেকেই এর সূত্রপাত। এটা ঠিক নয়। আপনার বিবরণে এই কাহিনীর আদি এবং সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ পর্বটিই উপেক্ষিত হয়েছে। ভুল বোঝাবুঝির এই অধ্যায়টির সূচনা বারদৌলিতে। সেখানে একটি বিশিষ্ট গোষ্ঠীর বৈঠক বসে। বৈঠকের উদ্দেশ্য ছিল পরবর্তী বৎসরের জন্য কংগ্রেসের সভাপতিত্বের প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করা। তাঁরা কয়েকটি সিদ্ধান্ত করেন এবং একটি কর্মসূচীও গ্রহণ করেন। সভাপতি এবং ওয়ার্কিং কমিটির অন্যান্য সদস্যরা এসবের কিছুই জানতেন না। এই বিচিত্র এবং গুপ্ত কার্যকলাপের মর্ম অনুধাবনে আমি অক্ষম। সহকর্মীদের যে পারস্পরিক বিশ্বাস ও সমঝোতার প্রয়োজন প্রসঙ্গে আপনি পঞ্চমুখ, এর মধ্যে তার কতটুকু আপনি দেখতে পান আমি বলতে পারি না। কংগ্রেস এবং তার সভাপতি সম্পর্কিত এরকম একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে, সভাপতির বক্তব্য থাকতে পারে এবং তা শোনার দরকার এমন একটি ব্যাপারে সভাপতির প্রতি যথোচিত আস্থা ও বিশ্বাস প্রদর্শন না করার কী সমর্থন আপনি দেখতে পান জানি না। অবশ্য সভাপতির প্রতি ব্যক্তিগত বিরূপতা, বা তাঁর সম্পর্কে সারল্য-বর্জনের ইচ্ছাই যদি এইসব কার্যকলাপের সমর্থন বলে বিবেচিত হয় সে-কথা স্বতন্ত্র।

আমি যতদূর জানি সুভাষের পক্ষ থেকে এইরকম আচরণের কিছুমাত্র সুযোগ দেওয়া হয়নি। তার সভাপতিত্বকালে সে অকপটভাবে পূর্ণমাত্রায় একদিকে গান্ধীজী ও অপরদিকে ওয়ার্কিং কমিটিতে তার সহকর্মীদের সঙ্গে সহযোগিতা করে এসেছে। জানুয়ারীতে ওয়ার্কিং কমিটির বারদৌলি বৈঠকের পূর্ব পর্যন্ত সহকর্মীদের সঙ্গে তার এতটুকু ভুল বোঝাবুঝি ছিল না। এমন কি নির্বাচনের পরেও গান্ধীজীর সঙ্গে সহযোগিতার ব্যাপারে তার সংকল্প অটুট ছিল। সেক্ষেত্রে আমরা সকলে যখন বারদৌলিতে ছিলাম তখন সুভাষের সঙ্গে সভাপতি নির্বাচনের প্রশ্নটি নিয়ে আলোচনা করে একটা মীমাংসায় উপনীত হতে বাধা ছিল কোথায়? ত্রিপুরীতে আমি প্রথম জানলাম যে গত সেপ্টেম্বরে রাষ্ট্রীয় সমিতির দিল্লী অধিবেশন পরিচালনা সম্পর্কে কেউ কেউ কিছু আপত্তি জানিয়েছিলেন। এই

অধিবেশনে সুভাষ নাকি কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দলের কয়েকজন সদস্যকে পৌর-স্বাধীনতা সম্পর্কিত প্রস্তাবটি সম্পর্কে সুদীর্ঘ আলোচনার অবকাশ দিয়েছিল এবং এতেই নাকি সুভাষ সম্পর্কে তাঁদের বিশ্বাস শিথিল হয়। দিল্লী অধিবেশনের পর ওয়ার্ধা ও বারদৌলিতে মিলিত হওয়ার সময়ও কিন্তু এই অনুযোগের কিছুমাত্র আভাসও আমরা পাইনি। সত্যি বলতে, আগামী বৎসরের সভাপতি নির্বাচনের জন্য বারদৌলিতে অনুষ্ঠিত এই গুপ্ত বৈঠকটির ও তাদের সোজা পথ অবলম্বনের অভাবের কথা যতই ভাবছি ততই আমার মনে হচ্ছে এটি একটি ঘৃণ্য দলের দ্বারা অনুষ্ঠিত, যারা নিজেদের ষড়যন্ত্র করে চেয়েছিল রাজা তৈরী করবার ক্ষমতা এবং এদের উদ্দেশ্য সমস্ত ক্ষমতা করায়ত্ত করে কংগ্রেসকে তাদের মত প্রকাশের একটি যন্ত্রে পরিণত করা।

আমি আপনার কাছে স্পষ্টই বলছি যে পুরাতন ওয়ার্কিং কমিটির কয়েকজন সদস্যের সঙ্গে সহকর্মী হিসাবে একযোগে কাজ করার সম্ভাবনা সম্পর্কে আমি নিরাশ হয়ে পড়েছি। আমি স্বেচ্ছায় বা সহজে এমন হইনি। আমার ভূতপূর্ব সহকর্মীরাই ধাপে ধাপে আমায় নৈরাশ্যের দিকে এগিয়ে দিয়েছেন। সভাপতির অজ্ঞাতসারে তাঁরা বারদৌলিতে বৈঠক বসিয়েছেন এবং সভাপতিত্ব সম্পর্কে একটি সিদ্ধান্তও গ্রহণ করেছেন, এই সংবাদে আমি অত্যন্ত আঘাত পেয়েছিলাম। সেই আঘাতেই তাঁদের সদিচ্ছা ও আনুগত্য সম্পর্কে আমার বিশ্বাসে ফাটল ধরে। এর পর এল সভাপতি-নির্বাচন সম্পর্কিত বিবৃতি ও পত্রাবলী। কিন্তু ত্রিপুরীতে যা দেখলাম ও বুঝলাম তার তুলনায় আগের ব্যাপারগুলিও কিছু নয়। যে অনুদারতা, অসন্তোষ, এমন কি কোন কোন ব্যাপারে ঈর্ষাপরায়ণতার সামিল যে মনোভাব দেখলাম সেখানে, তাতে হতবাক হলাম। কয়েকজন ব্যক্তি সম্পর্কে আমি যা বলেছি তার সঙ্গে একমত হওয়ার বাধা যে আপনার দিক থেকে থাকবে এতে আমার বিস্ময়-বোধের কোন কারণ নেই। অন্যদের সম্পর্কে, বিশেষত সহকর্মীদের সম্পর্কে এরকম কথা কেউ বিশ্বাস করে না। আর আপনার ত কথাই নেই। নিশ্চয়ই যাঁদের সঙ্গে আপনি একযোগে চলার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তাঁদের সম্পর্কে অনুচিত কোন ধারণা পোষণ করতে আপনার স্বভাব ও শিক্ষা নিশ্চয়ই আপনাকে বাধা দেবে। ইটন ও হ্যারোতে মূল্যবোধের যে পদ্ধতি বা আচরণের যে মান স্বীকৃত, দুনিয়ার সর্বত্র যে তা অনুসৃত না হতেও পারে এমনতর বিশ্বাস যে সহজসাধ্য নয় বর্তমান ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের সদস্যদের দেখেও কি সেটা বোঝা যায় না? হিটলার এবং মুসোলিনি সম্পর্কে তাঁরা সৎ-ধারণাই পোষণ করেন কিন্তু যখন দেখা যায় উক্ত ডিক্‌টেটারদ্বয় ক্রিকেট (উভয়ার্থে), ওল্ড স্কুল টাই প্রভৃতির মর্মগ্রহণে অক্ষম, তখন তাঁরা রীতিমত দুঃখ অনুভব না করে পারেন না। তাছাড়া আপনি হচ্ছেন ব্যক্তি-স্বাতন্ত্রবাদী। আপনি নিজেই বলেছেন যে কোন গোষ্ঠী, এমন কি কোন সহায়ক ছাড়াই আপনি ব্যক্তিগতভাবে কাজ করে যেতে পারেন। যে ধরনের রাজনীতির প্রতি আপনার অনীহা বর্তমান তার অস্তিত্ব সম্পর্কে আপনি উদাসীন থাকতে পারেন। মুশকিল হচ্ছে, এমন সৌভাগ্য সকলের অদৃষ্টে ঘটে না। যে হতভাগ্যদের রাজনীতির বদ্ধ ও তপ্ত কর্মশালায় প্রবেশ করতে হয় তার মালিন্য ও অপ্রিয় আবহাওয়া মেনে নিতেই হয় তাদের। আর এরই প্রভাবে বিরক্তি প্রকাশেও মাঝে মাঝে বাধ্য হয় তারা। বলা বাহুল্য, যে ভাষায় তা এরা করে থাকে তা ব্যবহার করার প্রয়োজন ঘটে না তাঁদের যাঁরা এই উষ্ণ পরিমণ্ডল থেকে দূরে অবস্থান করেন। এবং ওই রকম বিরক্তি প্রকাশের অর্থ উপলব্ধিও তাঁদের পক্ষে সহজসাধ্য হয় না।

যে সব অভিযোগ আমি উপস্থাপন করলাম এর সমর্থনে রয়েছে ঘটনাবলীর প্রতি আমার নিজের সাভিনিবেশ লক্ষ্য এবং এমন কয়েকজন ব্যক্তির সাক্ষ্য যাঁদের বিবৃতির যথার্থ্য সম্পর্কে আমি নিঃসন্দেহ। নিছক কানাঘুষা বা গুজবের উপর নির্ভর করে আমি একটি কথাও বলিনি। তা করলে অভিযোগের ফিরিস্তি সুদীর্ঘ হত। প্রয়োজন উপস্থিত হলে এ সম্পর্কে সত্যাসত্য নির্ণয়ের ভার যাঁরা নেবেন তাঁদের হাতে সাক্ষ্যপ্রমাণাদি তুলে দিতে আমি দ্বিধা করব না। সাধারণভাবে আমি এখনই বলতে চাই যে সুভাষের সম্পর্কে তার কয়েকজন প্রাক্তন সহকর্মীর মনোভাব এত উগ্র এবং এত স্পষ্ট যে আমার মনে হয় না তা প্রমাণের জন্য বিস্তারিত সাক্ষ্য-প্রমাণের কিছুমাত্র প্রয়োজন হবে—আইন সম্পর্কিত কার্য-প্রণালীতে যেমনটি হয়ে থাকে। আপনি যদি আমার অভিযোগের সত্য নির্ধারণে (যথার্থ সত্যের কথা বলছি, বৈধতামূলক সত্য নয়) উৎসাহী হন তাহলে কয়েকটি মহলে কিছু কিছু জিজ্ঞাসাবাদ দ্বারাই আপনি তা করতে পারবেন। এবং আমি আশা করি আপনি এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হবেন যে আমি যা লিখেছি তার মূলে সত্য ঘটনা বর্তমান। সম্প্রতি এ সম্পর্কে যে অস্বীকৃতি ঘোষিত হয়েছে তা অবগত হয়েও আপনাকে একথা বলছি। বস্তুতপক্ষে ত্রিপুরীতে তাঁদের ভূমিকার চেয়েও তাঁদের এই অস্বীকৃতি আমায় আরও বেশী বিস্মিত করেছে। কংগ্রেসের উর্ধতন মহলে 'সত্য ও অহিংসা' বলতে কী বোঝায় তা এখন বিলক্ষণ উপলব্ধি করছি। আমার আশঙ্কা, কংগ্রেসী মন্ত্রীদের সম্পর্কে আমার মন্তব্য আপনি সঠিক অনুধাবন করতে পারেন নি। কংগ্রেসের কার্যক্রমে তাঁদের অংশ গ্রহণে আমার কোন আপত্তি নেই। কিন্তু ব্যক্তি ও তাঁর পদমর্যাদাকে পৃথক করে দেখা ত সম্ভব নয়। কাজেই আলোচনা ক্ষেত্রে—বিশেষত সুভাষের নির্বাচনে যে বিতর্কমূলক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে সেক্ষেত্রে মন্ত্রীদের উপস্থিতি বা যোগদানের পরিণাম সম্পর্কে অবহিত থাকতেই হবে আমাদের। প্রাদেশিক সরকারগুলির সদস্য হিসেবে তাঁরা প্রভূত ক্ষমতার ও প্রভাবের অধিকারী (আনুকূল্য বা অনুগ্রহবিতরণ যেগুলির অন্যতম)। এখন উপরোক্ত ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে এই ব্যাপারে সরকার-বহির্ভূত কংগ্রেস সদস্যদের কোন তুলনাই সম্ভব নয়। বাস্তব বিচারে কংগ্রেসের 'বে-সরকারী' সদস্যরা স্পষ্টই 'সরকারী' সদস্যদের তুলনায় একটু অসুবিধাজনক স্থানে আছেন। এমন কি 'সরকারী' সদস্যরা কোনরূপ চেষ্টা ব্যতিরেকে শুধু পদমর্যাদাগুণে প্রভাব বিস্তারে সমর্থ। অবশ্য এমন হবে না এটাই আশা করা অন্যায়। অধিকন্তু মন্ত্রীরা যদি স্থিতাবস্থা বজায় রাখায় আগ্রহী হন তাহলে তাঁদের প্রভাব ও কণ্ঠস্বর কংগ্রেসের দ্রুত অগ্রগমনের অন্তরায় না হয়ে পারে না। সরকার পরিচালনায় অংশ গ্রহণের প্রস্তাব কংগ্রেস কর্তৃক গৃহীত হওয়া পর থেকেই বিভিন্ন প্রদেশের ঘটনাবলী সম্পর্কে ওয়াকিফহাল মহল এই বিপদের সম্ভাবনা সম্পর্কে সচেতন। এই সম্ভাবনার দিকে দৃষ্টিপাত না করে তার অস্তিত্ব স্বীকার করা অর্থহীন। তাছাড়া, আপনি অবশ্যই অবগত আছেন যে ত্রিপুরী অধিবেশনে মন্ত্রীরা বিষয়-নির্বাচনী পরিষদ ও প্রকাশ্য অধিবেশনেই তাঁদের কার্যকলাপ সীমায়িত রাখেন নি। প্রতিনিধিদের ক্যাম্পগুলি পর্যন্ত তাঁদের প্রচারাভিযানের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। নিছক বিধিসম্মত দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁদের আচরণের বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করছি। প্রদেশ কংগ্রেস কর্তৃক নির্বাচিত প্রতিনিধিদের অধিকাংশ সুভাষের অনুকূলে ভোট দিয়েছিলেন। মনে রাখতে হবে শেষোক্ত নির্বাচনে মূল বিষয় ছিল সুভাষ ও পুরাতন ওয়ার্কিং কমিটির কয়েকজন সদস্যের মধ্যে মতভেদ। কংগ্রেসী মন্ত্রীরা স্ব স্ব প্রদেশে সুভাষ-বিরোধী প্রচার করবার পরেও এমনটি হতে পেরেছিল। কিন্তু মন্ত্রীরা এই রায়কে চূড়ান্ত বলে

মেনে নিতে রাজী হলেন না। এবং এই রায় পাল্টে দেবার প্রয়াস শুরু হল। তাঁদের আশংকা ছিল—সভাপতি নির্বাচনের রায় বজায় থাকার অর্থ দলের সংসদীয় কর্মসূচীর পরিবর্তন। শেষ পর্যন্ত তাঁদের চেষ্টা সফল হল। এখন প্রশ্ন এই, নির্বাচকমণ্ডলীর রায় মেনে নেওয়ার পথে বাধা ছিল কোথায়? উত্তর স্পষ্ট: পুরাতন ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের প্রতি তাঁদের অধিকতর আনুগত্য। তাহলে দেখা যাচ্ছে কয়েকজন ব্যক্তি স্বাধীন নির্বাচনের রায় মেনে নিতে ত পারেনই নি, উপরন্তু তাকে অকার্যকর করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছেন এবং শেষ পর্যন্ত সফলও হয়েছেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তাঁরা কখনই সফলকাম হতেন না যদি না তাঁদের পেছনে থাকত প্রাদেশিক সরকারের ক্ষমতা ও মর্যাদা। মন্ত্রীরা যে কংগ্রেসের স্বাধীন ও গণতান্ত্রিক সিদ্ধান্তসমূহ পদদলিত করতে পারেন একথা বিশ্বাস করা এখনও যদি আপনার পক্ষে কষ্টকর হয়, তাহলে আর আমার বলবার কিছু নেই।

কংগ্রেসের আভ্যন্তর ঐক্যরক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আমিও আপনারই মত সজাগ। কিন্তু আমাদের জিজ্ঞাস্য—কী ভাবে এই ঐক্য আনয়ন করা সম্ভব—একজন ব্যক্তির সপক্ষে পদত্যাগ করে অর্থাৎ "নেতা-নীতি" মেনে নিয়ে? অথবা স্বার্থ-বুদ্ধির দ্বারা সংযুক্ত একটি গোষ্ঠীর হাতে স্থায়িভাবে সমস্ত ক্ষমতা তুলে দিয়ে? না দেশের মধ্যে সমস্ত মতের অনুবর্তীদের জন্য স্থান করে দিয়ে এবং সর্বসম্মত একটি কার্যক্রম গ্রহণ করে? নাকি একটি দ্বি-দলীয় প্রথা প্রবর্তন করে, যাতে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল কার্যপরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করবেন আর সংখ্যালঘু দল থাকবেন বিরোধী দলে। এই প্রশ্নগুলির উত্তর দিতে হবে। নীতি ও কার্যক্রম স্থির করার আগেই আমাদের পরিষ্কারভাবে ভেবে নিতে হবে কী ভাবে আমরা কংগ্রেসকে চালাব। বিধিসম্মত ঐতিহ্যের অভাবে, ক্ষমতার দ্বন্দ্বে কোলাহলে বিভেদ দেখা দেবেই। যথার্থ ঐক্য স্থাপন না করেই যদি একপক্ষকে তাদের অভিযোগ বিস্মৃত হওয়ার বিধান দেওয়া হয় তাতেও বিশেষ ফলোদয় হবে বলে মনে হয় না। বিশেষত অপরপক্ষ যখন তাঁদের নিজস্ব অসন্তোষ ভুলে যেতে অক্ষম এবং তা দূর করতে বদ্ধপরিকর বলেই মনে হচ্ছে। মনে হয় আপনি একথাটা বুঝতে পারছেন না যে পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্থ যে জাতীয় প্রস্তাব এনেছিলেন তা অনৈক্য আনয়ন করতে এবং কংগ্রেসের অন্তর্গত বিভিন্ন দলগুলির মধ্যে ভবিষ্যৎ সহযোগিতার সম্ভাবনা ক্ষুণ্ণ করতেই সাহায্য করবে। ওই প্রস্তাবটির বিরুদ্ধে দেশব্যাপী প্রতিক্রিয়ার পরিণামও বোধহয় আপনি অনুভব করতে পারছেন না। প্রস্তাবটি কংগ্রেসের আভ্যন্তর ঐক্যের উপর প্রচণ্ড আঘাত হেনেছে। যার পরিণামে হয় সমস্ত প্রগতিপন্থীদের কংগ্রেস ত্যাগ করে বেরিয়ে আসতে হবে, এবং সমস্ত ক্ষমতা গিয়ে পড়বে একটি ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর হাতে এবং ফলত শেষ পর্যন্ত কংগ্রেসের প্রাণবত্তা নষ্ট হয়ে যাবে। আর না হলে কংগ্রেসের মধ্যে নিদারুণ অন্তর্দ্বন্দ্ব নিরন্তর চলতেই থাকবে।

পুরাতন ওয়ার্কিং কমিটির কতিপয় সদস্য কোন বাধা সৃষ্টি করেননি, একথা আপনি কেন বা কেমন করে বলছেন তা আমি বুঝতে পারছি না। কারণ স্পষ্টতই শুরু থেকেই বাধা দেওয়া হয়েছে। আমি এই বাধা দানের বিভিন্ন স্তরগুলি দেখাতে চেষ্টা করব।

সভাপতি-নির্বাচনের ফল প্রকাশিত হবার পর যদি এমনই মনে করা হয়ে থাকে যে এই নির্বাচনের দ্বারা পুরাতন ওয়ার্কিং কমিটির নীতি ও কার্য অননুমোদিত হয়েছে, তাহলে ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের কর্তব্য ছিল সে রায় অনুগতভাবে মেনে নেওয়া এবং সভাপতিকে বিধিসম্মত ভাবে কার্যপরিচালনার পথ উন্মুক্ত করে

দেওয়া। কিন্তু ব্যক্তিগত ভাবে আমি এ-মত সমর্থন করি না এবং অনেকে আমার মত মানেন। সভাপতি নির্বাচনের ফলকে আমি মনে করি উক্ত পদের দুই প্রার্থীর দাবির মধ্যে একজনের অনুকূলে নির্বাচকমণ্ডলীর অধিকাংশের রায়। এই দুই ব্যক্তি হচ্ছেন সুভাষ ও ডঃ পট্টভি সীতারামাইয়া। দ্বিতীয়ত, আমি মনে করি এর দ্বারা সভাপতি নির্বাচনের যে প্রথা অনুসৃত হয়ে আসছিল তার প্রতি প্রতিবাদ জানান হয়েছে। অর্থাৎ যে বিষয়ের বিচার তাঁদেরই করা উচিত সেটি একটি ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর দ্বারাই স্থিরীকৃত হয়, এটা নির্বাচকমণ্ডলী চাননি। এবং একটি গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব স্বাধীন মত প্রকাশের ন্যায্য অধিকার তাঁরা চেয়েছেন।

তাই যদি হয় তাহলে সভাপতি নির্বাচনের পর সবচেয়ে যুক্তিযুক্ত এবং সরল পথ ছিল একটি সাধারণ নীতি ও কর্মপন্থা স্থির করে নেওয়া। মহাত্মাজীর মাধ্যমে এটি করা খুবই সম্ভাব্য ছিল, কারণ তাঁর উপদেশ উপেক্ষিত হওয়ার বা তাঁর প্রভাব অস্বীকার করার কোন প্রশ্নই ওঠে না। সুভাষের নির্বাচনের সঙ্গে কংগ্রেসে মহাত্মাজীর মর্যাদার কোনই সম্পর্ক নেই। কিন্তু সে পথে না গিয়ে মীমাংসায় উপনীত হবার জন্য পদত্যাগ করে পুরাতন ওয়ার্কিং কমিটি এক অচলাবস্থার সৃষ্টি করলেন। আর তা করে তাঁরা বাধা সৃষ্টিই করেছিলেন বলতে হয়। পরবর্তী কার্যক্রম সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণ করেছে যে ক্ষমতাত্যাগের কোন ইচ্ছাই তাঁদের ছিল না। দেশকে তাঁরা বোঝাতে চেয়েছিলেন যে যেহেতু তাঁদের মনোনীত ব্যক্তিকে সভাপতি হিসাবে নির্বাচন করা হয়নি সেহেতু তাঁদের কংগ্রেসের কার্যে সহযোগিতা বন্ধ করতে হতে পারে। এমন কি এর পেছনে এমন ইঙ্গিতও ছিল যে প্রয়োজন-বোধে কংগ্রেস-শাসিত প্রদেশগুলির সরকারগুলিও পদত্যাগ করতে পারে। শেষোক্ত ব্যাপারটির সঙ্গে স্পষ্টভাবে পুরাতন ওয়ার্কিং কমিটির বা তার সদস্যদের কারও নাম উচ্চারিত হয়েছে, একথা আমি বলছি না কিন্তু সংবাদপত্রে এই মর্মে প্রচারের কোন প্রতিবাদ যে করা হয়নি তা থেকেই বোঝা যায় যে ঈপ্সিত পথেই জনমত গড়ে উঠেছিল।

ত্রিপুরীতে যা ঘটেছিল তা হচ্ছে বাধাদানের দ্বিতীয় স্তর। আপনি বলেছেন যে, কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে কংগ্রেসের সমক্ষে প্রস্তাব উত্থাপনের অর্থ বাধাদান নয়। আপনার মন্তব্যটি বোধহয় অতি-সরলীকরণ। আপনি যা লিখেছেন তা থেকে মনে হয় প্রস্তাবগুলি নিরালম্ব, তাদের না আছে কোন পটভূমি, না আছে মূল বা ইতিহাস। উদ্যোক্তাদের কার্যক্রমের আভাস প্রকাশ করা ছাড়া প্রস্তাব উত্থাপনেব অন্য কী উদ্দেশ্য থাকতে পারে? এবং এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে বোঝা যাবে যে পণ্ডিত পন্থের প্রস্তাবটির পিছনে নিম্নোক্তরূপ কার্যক্রম বিদ্যমান। এটির উদ্দেশ্য ছিল সভাপতির কার্যের স্বাধীনতা হরণ করে তাঁকে নিরস্ত্র করা এবং এইভাবে সভাপতি-নির্বাচনের ফল অকার্যকর করা। সভাপতিকে পদচ্যুত করার প্রয়াসের সঙ্গে এর বিশেষ কোন পার্থক্য নেই, আর এমনও নয় যে সেরকম পরিকল্পনা প্রথমেই ভেবে দেখা হয়নি। তবে বোঝা গিয়েছিল যে সে পথ সহজগম্য হবে না।

আনুষ্ঠানিক ভাবে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করে তার সাহায্যে সভাপতিকে ওয়ার্কিং কমিটি মনোনয়নের ক্ষমতা পরিত্যাগ করতে বাধ্য করা, এই ব্যাপারটি অত্যন্ত চমকপ্রদ কারণ এতাবৎকাল অনুসৃত নীতির সঙ্গে এর কোনই মিল নেই। এরকম প্রয়াস অনর্থক আরও এইজন্য যে গান্ধীজীর সঙ্গে পরামর্শ না করে ওয়ার্কিং কমিটি গঠনের চেষ্টা বা চিন্তা সুভাষ করেননি। যদি এই মর্মে একটি সুস্পষ্ট নির্দেশের প্রয়োজন হয়েই থাকে তবে সে-প্রয়োজন শুধু এই বৎসরই আছে তা নয়।

কংগ্রেসে গান্ধীযুগের সূচনা থেকে, অর্থাৎ ১৯২১ থেকেই সে প্রয়োজন থেকে গেছে।

এর অন্তর্নিহিত কপটতার জন্য প্রস্তাবটি আমার আরও অরুচিকর মনে হয়েছে। এর উদ্দেশ্য ছিল পুরাতন ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের অনুকূলে একটি আস্থা-জ্ঞাপক ভোট আদায় করে নেওয়া, এবং তাঁদের ফিরিয়ে আনা। বিষয়টি আরও ঘোরাল করে তোলা হল একই সঙ্গে মহাত্মাজীর সপক্ষে আস্থাজ্ঞাপক ভোট চেয়ে। ভাবটা দেখান হল এমন যাতে মনে হয় পুরাতন ওয়ার্কিং কমিটির পদত্যাগকারী সদস্যদের প্রতি আস্থা না রাখলে মহাত্মাজীর প্রতি আস্থার অস্তিত্ব থাকে না। আমি এ-ও বলব যে মহাত্মাজীর নিজের বিবৃতি দুটি সম্পূর্ণ পৃথক ও ব্যক্তিগত বিষয়ের মিশ্রণ সহজ করে দিয়েছে। কিন্তু আমার মনে হয় একথা বললে অন্যায় হবে না যে যদি পুরাতন ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যরা গান্ধীজীর নামের আড়ালে আত্মগোপন না করে নিজেরা সরাসরি এগিয়ে আসতেন তাহলে তাঁরা অধিকতর সৎসাহস ও অকপটতার পরিচয় দিতেন। মহাত্মাজীর স্থান আমাদের রাজনৈতিক সব বিতর্কের ঊর্ধ্বে এবং তাঁকে স্বস্থানে স্বমহিমায় থাকতে দেওয়াই কর্তব্য ছিল।

আপনার পত্রের আরও কয়েকটি বিষয় পরিষ্কার করে নেওয়া দরকার। বাংলার প্রতিনিধিদের ডুপ্লিকেট টিকিট ইস্যু করা সম্পর্কে আপনি যা বলেছেন সে সম্পর্কে অনুসন্ধান করে আমি যা পেয়েছি বলছি। বাংলার অনেক প্রতিনিধি ত্রিপুরী পৌঁছে দেখেন যে তাঁরা তাঁদের কার্ড আনতে ভুলে গিয়েছেন। এজন্যই তাঁরা ডুপ্লিকেট কার্ড পাওয়ার জন্য যথারীতি আবেদন করেন। তাঁদের যেসব বন্ধু তখনও গিয়ে পৌঁছাননি তাঁদের তরফেও তাঁরা আবেদন জানিয়ে রাখেন। তাঁদের আশঙ্কা ছিল না হলে তাঁদের বন্ধুদের ডুপ্লিকেট কার্ড পেতে অনেক দেরি হয়ে যাবে। অবস্থা অবগত হয়ে নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির হাত থেকে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতি ব্যাপারটির ভার গ্রহণ করেন। বলা বাহুল্য, বাংলার প্রতিনিধিদের ব্যক্তিগত-ভাবে তাঁরা জানতেন, কাজেই নির্ভুল ও দ্রুতভাবে সমস্যাটির সমাধানের ক্ষমতাও তাঁদের ছিল। কিন্তু প্রাদেশিক সমিতির এই সহযোগিতার প্রস্তাব নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতি প্রত্যাখ্যান করেন। ফলে এই হল যে যেসব প্রতিনিধি বন্ধুদের সঙ্গে পরামর্শ করার আগেই সরাসরি নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির কাছে আবেদন জানিয়েছিলেন শুধু তাঁরাই পেলেন ডুপ্লিকেট টিকেট। এই অবস্থায় প্রাদেশিক কর্তৃপক্ষ আবার ব্যাপারটিতে হস্তক্ষেপ করে মাত্র ছয়টি ছাড়া সবগুলি আবেদন সম্পর্কেই বিধিসম্মত ব্যবস্থা অবলম্বন করলেন। শুধু তাই নয়, প্রাদেশিক সমিতির অনুরোধেই নিখিল ভারত ও প্রাদেশিক, দুই সমিতিরই একজন করে প্রতিনিধি মিলিতভাবে অধিবেশন মণ্ডপে প্রবেশকালে বাংলার প্রত্যেক প্রতিনিধির প্রবেশপত্র পরীক্ষা করে দেখেন। বলা বাহুল্য, এর উদ্দেশ্য ছিল বাংলার প্রতিনিধি হিসেবে কোন অনধিকারী যাতে অধিবেশন মণ্ডপে প্রবেশ করতে না পারে সে সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হওয়া। যাই হোক প্রবেশপত্র পরীক্ষা কালে একজনও অনধিকারী ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটেনি। ডুপ্লিকেট কার্ড দেওয়ার ব্যাপারে কোন গোলমাল থাকলে মণ্ডপের প্রবেশ পথে এই পরীক্ষায় তা ধরা পড়ত। কজেই এ ব্যাপারে কোন ভুলচুক যদি গোড়ায় হয়েই থাকে সেটি বড় করে দেখা ঠিক নয়। অন্ধ্রের প্রতিনিধিদের ব্যাপারে একটা বড় রকমের গোলমালের খবর পেয়েছিলাম; জানি না সেক্ষেত্রে প্রবেশপথে পরীক্ষার কোন ব্যবস্থা করা হয়েছিল কিনা। হয়ত আপনারা এ-সম্পর্কে কিছু খোঁজখবর নিয়ে থাকবেন।

প্রতিনিধিদের টাকা খরচ করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে বলে আপনি যা লিখেছেন সেটি আমার কাছে নতুন খবর। জানতে পারি কি কার দ্বারা, কখন এবং কোথায়

তা হয়েছে? এককালে যখন "নো-চেঞ্জার" আর "প্রো-চেঞ্জার"দের মধ্যে দ্বন্দ্ব ছিল, তখন নাকি এই ধরনের কথা শোনা যত যে দুই দলই নিজেদের সমর্থকদের উপস্থিতি সম্পর্ক নিঃসন্দেহ হওয়ার জন্য তাদের যাতায়াতের খরচপত্র দিয়ে দিতেন। অবশ্য এর সত্যমিথ্যা জানবার কোন চেষ্টাই আমি কোনদিন করিনি। আপনার চিঠিতেই আমি প্রথম জানলাম যে অতীতের ওই দৃষ্টান্ত এইবার অনুসৃত হয়েছে।

আপনি লিখেছেন যে জাতীয় দাবি সম্পর্কিত যে প্রস্তাবটি আপনি এনেছিলেন আমি তার প্রতিকূলতা করায় আপনি নাকি বিস্ময়বোধ করেছিলেন। যদি প্রস্তাবটি সম্পর্কে আমার সংশোধনী প্রস্তাবটি আমায় তুলতে দেওয়া হত তাহলে অবশ্যই মূল প্রস্তাবটির বিরোধিতা আমায় করতে হত না। কিন্তু যেহেতু আমায় সে-সুযোগ দেওয়া হয়নি সেহেতু আমি বাধ্য হয়েছিলাম প্রস্তাবটি সম্পর্কে আমার প্রতিবাদ বিধিসঙ্গত ভাবে জানাতে। আমার মনোভাবের সপক্ষে যে যুক্তি ছিল তা আমি স্পষ্ট করেই বলেছিলাম আমার বক্তৃতায়। দুর্বল, আকর্ষণহীন এই দাবি আমাদের পক্ষে কিছুমাত্র ফলপ্রদ হত না। এমন প্রস্তাব বছরের পর বছর গৃহীত হয়ে আসছে কিন্তু তার ফলে আমাদের শত্রুপক্ষও ভীত হয়নি, জনগণও অনুপ্রেরিত হয়নি। এমন হওয়ার কারণ, এই সব দাবি স্বীকৃত না হলে কী করা হবে সে সম্পর্কে কোন স্পষ্ট ও বলিষ্ঠ কার্যক্রম আমাদের ছিল না। আর সময়-সীমা নির্ধারিত করে দেওয়ার প্রতিবাদ করতে গিয়ে আপনি যা বলেছেন তা থেকে মনে হয় বুঝিবা কংগ্রেসের দীর্ঘ ইতিহাসে এমনতর সময়-সীমা নির্দেশ করে দেওয়া অভিনব ব্যাপার। আমাদের দাবি মেনে নেওয়ার ব্যাপারে সময়-সীমার কথা বলা যদি নিরর্থক বাগাড়ম্বরই হয় তবে অনুমান করি, আমার চেয়ে মহত্তর ব্যক্তিরা অতীতে যখন এমন কথা বলেছেন তাঁদের কথাকেও ওই বাগাড়ম্বরের পর্যায়েই ফেলা উচিত হবে। হিটলারী-পন্থায় যদি সুযোগ পেলেই প্রচণ্ড আঘাত হানার কথা সময়-সীমা প্রস্তাবে বলা হত, এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে সেরকম আঘাত হানার শক্তি যদি থাকত আপনাদের তাহলে অবশ্য আপনি তার বিরোধিতা করতে পারতেন। কিন্তু সামরিক অভ্যুত্থান আকস্মিক হয়ে থাকে, তার জন্য আগে থেকে নোটিশ দেওয়ার কোন রেওয়াজ নেই। কিন্তু তা বোধহয় সত্য ও অহিংসা-নীতির বিরোধী। সত্যানুসরণ করেই আমরা শত্রুকে জানিয়ে দিতে চাই যে আমরা প্রস্তুত। যে আঘাত আমরা তাদের দেব তার প্রতি অন্তত আকস্মিকতার অভিযোগ তারা যেন আনতে না পারে। আকস্মিকতা রণনীতির ক্ষেত্রে মূল্যবান কিন্তু সত্যাগ্রহের ক্ষেত্রে বোধহয় নয়।

কিন্তু এসব কথাই হয়ত অপ্রাসঙ্গিক। সময়-সীমার ব্যাপারে কংগ্রেসের দক্ষিণ-পন্থী মহলের আপত্তির কারণ নিজেদের শক্তি-সম্পর্কে নয় দুর্বলতা সম্পর্কে তাঁদের সচেতনতা। দক্ষিণপন্থীরা বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছেন ভারতের জনগণের প্রতি। তাঁদের প্রতিরোধ করবার ক্ষমতায় ও স্বচেষ্টায় প্রতিরোধ সংগঠনের শক্তিতে আজ তাঁরা আস্থাহীন। তাই তাঁরা এমন সময়-সীমা চান না যা অতিক্রান্ত হলে কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হতে তাঁরা বাধ্য হবেন। বর্তমান পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে আমি এই অভিমতে উপনীত হয়েছি। আমার সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ নির্ভুল নাও হতে পারে।

বর্তমানে অনুসরণীয় নীতি ও কার্যক্রম সম্পর্কে আমার অভিমত আমি নিখিল রাষ্ট্রীয় সমিতির কার্যালয়ে প্রস্তাবাকারে প্রেরণ করেছি। জলপাইগুড়িতে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনে সভাপতির ভাষণে আমি তার আভাসও দিয়েছিলাম। দুর্ভাগ্যবশত ত্রিপুরীতে কতকগুলি ব্যক্তিগত ব্যাপারই প্রাধান্য লাভ করল। বাংলায় কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠন সম্পর্কে আমার মত আমি ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে

নিবেদন করেছি। প্রশাসনিক কার্যে যোগদান নিশ্চিতভাবে দক্ষিণপন্থী কার্য। কিন্তু যখন একবার কংগ্রেস তা করবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে, তখন আমার মতে, তথাকথিত কংগ্রেসী ও অ-কংগ্রেসী প্রদেশগুলির মধ্যে কোন পার্থক্য করা অনুচিত। অবশ্য শেষোক্ত ক্ষেত্রে কংগ্রেসের কার্যক্রম অবশ্যই গৃহীত হওয়া প্রয়োজন। শেষ পর্যন্ত একথা ত মানতেই হবে যে কংগ্রেস যেসব প্রদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেছে, তা করেছে একটি আপাতিক কারণে। সে কারণ হল সেই প্রদেশগুলিতে হিন্দুরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। গত দুই বৎসরের অভিজ্ঞতায় আশা করি আপনি নিশ্চিত বুঝেছেন যে কংগ্রেসী মন্ত্রীরা ভারত শাসন আইনের অবসান ঘটাবার অথবা তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবার কোন ইচ্ছাই প্রকাশ করেননি।

গান্ধীজীকে আমি যে চিঠি দিয়েছিলাম তাতে সভাপতি ও গান্ধীজীর মধ্যে সহযোগিতার অবসানের ইঙ্গিত আছে বলে আপনি মনে করেছেন। আপনার অনুমান অভ্রান্ত নয়। আমি আগেই বলেছি, গান্ধীজীর স্থান ও মর্যাদা ও পুরাতন ওয়ার্কিং কমিটির কয়েকজন সদস্যের স্থান ও মর্যাদা—এই দুইকে আমি কখনই অভিন্ন বলে মনে করি না। এ-সম্পর্কে আমি অনেক কথা ইতিমধ্যেই বলেছি। আর কিছু বলার প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না।

এই চিঠিটি শেষ করবার আগে আর একটি ভ্রম আমার সংশোধন করে দিতে হচ্ছে। প্রায়ই দেখি, ধরে নেওয়া হয়, আমি যা লিখি সুভাষও বুঝিবা তার সঙ্গে একমত। তা কিন্তু ঠিক নয়। কারণ প্রতি ব্যাপারেই সুভাষের সঙ্গে পরামর্শ আমি করি না বা করতে পারি না। সুভাষও তা পারে না। গান্ধীজীকে লেখা আমার সাম্প্রতিক পত্রের একটি প্রতিলিপি অবশ্য আমি সুভাষকে পাঠিয়েছি। তাকে জানাতে বলেছি যে কোন কোন বিষয়ে তার সঙ্গে আমার মতের মিল বা অমিল রয়েছে। মোট কথা, সুভাষ আমাকে তার পক্ষ থেকে কোন আমমোক্তারনামা দেয়নি।

আশা করি আপনি ভাল আছেন। গত দু-তিন সপ্তাহ ধরে আমার স্বাস্থ্য ভাল যাচ্ছে না। ভাবছি ইস্টারের অবকাশে কোন শৈলাবাসে গিয়ে কয়েকটা দিন বিশ্রাম নেব।

ভবদীয়
শরৎচন্দ্র বসু

২৬০ সুভাষচন্দ্র বসু কর্তৃক লিখিত

জিয়ালগোরা পোঃ
জেলা মানভূম, বিহার
এপ্রিল ১৫, ১৯৩৯

প্রিয় জওহর,

মহাত্মাজীর সঙ্গে আমার যে পত্রালাপ হয়েছে তিনি তার প্রতিলিপি অন্যান্যদের মত তোমার কাছে পাঠিয়েছেন কিনা জানি না। যদি তুমি তা না পেয়ে থাক সেজন্য সর্বশেষ পরিস্থিতি তোমাকে জানাচ্ছি। তোমার মতামত ও আমার ভবিষ্যৎ কর্মক্রম সম্পর্কে তোমার উপদেশ পেলে খুশী হব।

মহাত্মাজী একটি সমসত্ত্বমূলক ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করার পক্ষে। তিনি চান আমি প্রথমে কমিটির সদস্যদের তালিকা প্রকাশ করি এবং তারপর আমার কার্যসূচী ঘোষণা করি। তারপর রায়ের জন্য নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির সম্মুখীন হই।

আমি মহাত্মাজীক বার বার জানিয়েছি একাধিক কারণে আমি এরকম কমিটি গঠন করতে পারি না। তাছাড়া আমার নিজস্ব কর্মসূচী প্রণয়ন ও ঘোষণার দায়িত্ব

কংগ্রেস আমায় দেয়নি। একটি বিশেষ পদ্ধতিতে (পন্থের প্রস্তাবানুযায়ী) আমায় ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করতে শুধু বলা হয়েছে।

কয়েকটি বিকল্প প্রস্তাব দিয়ে আমি এই বলে শেষ করেছি যে সব কিছু ব্যর্থ হলে ওয়ার্কিং কমিটি গঠনের দায়িত্ব তাঁরই গ্রহণ করা কর্তব্য—কারণ সমসত্ত্বমূলক ওয়ার্কিং কমিটি গঠনের যে প্রস্তাব তিনি দিয়েছেন তা গ্রহণ করতে আমি অক্ষম। শেষ দুটি চিঠিতে আমি এ কথাই বলেছি জোর দিয়ে যে তাঁরই গ্রহণ করা উচিত এই দায়িত্ব।

আমি জানি না মহাত্মাজী স্বয়ং ওয়ার্কিং কমিটি ঘোষণা করবেন কিনা। যদি করেন তাহলে এই অচলাবস্থার অবসান ঘটবে। কিন্তু যদি তিনি তা না করেন? সেক্ষেত্রে বিষয়টি যাবে নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির সামনে। এরকম পরিস্থিতিতে তাঁরাই বা কি করবেন আমি জানি না।

আমার ধারণা পত্রালাপের মাধ্যমে কোন মীমাংসায় উপনীত হওয়া যাবে না। আমি মহাত্মাজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে কোন একটা মীমাংসায় পেঁাছাবার শেষ চেষ্টা করব। কিন্তু রাজকোটের ব্যাপারে গান্ধীজীর গতিবিধি এখন অনিশ্চিত। এমন কি রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশনে তিনি কলকাতা আসবেন কিনা তারও কিছু ঠিক নেই। অবশ্য তিনি একটি তারবার্তায় আমায় জানিয়েছেন যে তিনি আসবার "প্রাণপণ প্রয়াস" পাবেন।

এখন গান্ধীজী যদি ওয়ার্কিং কমিটি গঠন না করেন, সেক্ষেত্রে আমি গান্ধীজীর সাক্ষাৎ সাপেক্ষে রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশন স্থগিত রাখব? এই মুলতুবী কি রাষ্ট্রীয় সমিতির সদস্যদের সমর্থন পাবে? নাকি আমার বিরুদ্ধে দীর্ঘসূত্রতার অভিযোগ উত্থাপিত হবে? অনেকেই মনে করেন যে আমাদের সাক্ষাৎকার ও মীমাংসার শেষ চেষ্টা না হওয়া পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশন না হওয়াই ভাল। যদি মহাত্মাজী ২৭ তারিখের পূর্বে—ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক যখন বসার কথা—কলকাতায় পেঁাছতে না পারেন তবেই অধিবেশন স্থগিত রাখার দরকার হবে। এখন এই অধিবেশন সম্পর্কে তোমার মত কী?

মহাত্মাজী যদি ইতিমধ্যেই আমাদের পত্রাবলী তোমাকে পাঠিয়ে না থাকেন তাহলে আমি তা পাঠিয়ে দিতে পারি।

আর একটি কথা। কয়েক ঘণ্টার জন্যে এখানে আসা কি তোমার পক্ষে সম্ভব হবে? তাহলে আমাদের মধ্যে কথাবার্তা হতে পারে এবং কি ভাবে অগ্রসর হওয়া যায় সে সম্পর্কে তোমার পরামর্শ আমি পেতে পারি।

চিঠিটা সংক্ষেপে ও খুব তাড়াতাড়ি লিখে এক বন্ধু মারফৎ পাঠাচ্ছি। আমি জানি না সর্বশেষ পরিস্থিতি সঠিক জানাতে পারলাম কি না—আশা করি পেরেছি।

যদি তুমি আসবার মত সময় করে উঠতে পার, তাহলে সময় বাঁচাবার জন্য তুমি তুফান এক্সপ্রেস (এইট ডাউন) ধরতে পার। বিকাল ৪-৩০ মিনিটে সেটি ধানবাদ পেঁাছায়। তুমি বম্বে মেলে ফিরে যেতে পার। মধ্যরাত্রে সেটি ধানবাদে আসে। ধানবাদ থেকে জামাডোবার দূরত্ব ৯ মাইল। স্টেশনে তোমার জন্য গাড়ি থাকবে।

প্রীতিবদ্ধ
সুভাষ

২৬১ জওহরলাল নেহর্ কর্তৃক মহাত্মা গান্ধীকে লিখিত

এলাহাবাদ
এপ্রিল ১৭, ১৯৩৯

শ্রদ্ধেয় বাপ্জী,

স্ভাষের সঙ্গে আপনার যে-সব পত্র-বিনিময় হয়েছে তার সম্দায় প্রতিলিপি প্যারেলালজী আমায় পাঠাচ্ছেন। আমার আশঙ্কা হচ্ছে এই পত্রালাপ এখন একটি অচলবাস্থায় পেঁাছেছে। এই অবস্থার অবসান ঘটবে কেমন করে ব্ঝতে পারছি না। দ্র্ভাগ্যক্রমে আমি নিজে দ্টি পক্ষের কোনটির সঙ্গেই প্রোপ্রি একমত নই। এই জন্যেই আমি চেয়েছিলাম চুপ করে থাকতে। চেয়েছিলাম কাউকে কিছ্ না-লিখতে এবং না-বলতে। কিন্তু এমন অসহায়ভাবে ভেসে চলাটাও কিছ্ ভাল নয়। সমস্যাগ্লি জর্রী এবং ফলাফল, ভেবে দেখলে, দ্ঃখকর।

আপনি যদি খ্ব বড় রকমের দায়িত্ব গ্রহণ না করেন, তাহলে যে কোনদিনই আমরা এ অবস্থা অতিক্রম করতে পারব বলে আমার ত মনে হয় না। আপনাকেই নেতৃত্ব নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে। ঘটনাস্রোতকে নীরবে দেখে যাওয়া ঠিক হবে না। স্ভাষের কিছ্ কিছ্ দোষত্রটি থাকতে পারে, কিন্তু তাঁর মন সংবেদনশীল, বন্ধ্তাপ্র্ণ মনাভাবের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন তাঁর পক্ষে অসম্ভব। আমার দ্ঢ় বিশ্বাস, আপনি যদি মনঃস্থির করে তা করতে পারেন তাহলে এই অচলাবস্থার অবসান আপনি ঘটাতে পারবেন।

রাজকোটের গ্র্ত্ব আমি ব্ঝতে পারছি। কিন্তু আমার মনে হয় কংগ্রেসের সমস্যা তার চেয়ে অনেক বেশী গ্র্ত্বপ্র্ণ এবং তাকে কেন্দ্র করেই আপনার বর্তমান কার্যক্রম স্থির করা উচিত। আমি আশা করি আমার এই কথায় আপনি সায় দেবেন। কাজেই আমি অন্রোধ করব আপনাকে যে, কিছ্কালের জন্য রাজকোটের কাজ ম্লতুবী রেখে কংগ্রেসের দিকেই আপনি মনোযোগ দিন। রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশনে আপনার অন্পস্থিতির সম্ভাবনাই উদ্বেগজনক। তার সরল অর্থ হচ্ছে এই যে, অবস্থার আরও অবনতি ঘটবে এবং সমগ্র কংগ্রেস টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে পড়বে। রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশনের প্বেই এর একটা নিষ্পত্তি হয়ে যাওয়া দরকার। বিষয়টি রাষ্ট্রীয় সমিতির হাতে দিলে আরও জট পড়া ছাড়া কিছ্ হবে না। আমি চাই স্ভাষের সঙ্গে আপনার সাক্ষাৎ ঘটুক। সরাসরি সমস্যা সমাধানের সম্ভাবনা ছাড়াও সাধারণ ভাবে এই সাক্ষাৎকারের বহ্ স্ফল দেখা দেবেই।

ওয়ার্কিং কমিটি গঠনের ফলে যে বিলম্ব ঘটেছে তা ভাল নয়। কিন্তু শ্ধ্ বিবাদ করবার জন্যেই যদি আমরা মিলিত হই তাহলে সেটা হবে আরও খারাপ। রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশন দ্-এক সপ্তাহ স্থগিত রাখলে (এমনিতে ব্যাপারটা যদিও আমি অপছন্দ করি) যদি আপনার স্বিধে হয় এবং মীমাংসায় উপনীত হওয়ার সহায়ক হয় তাহলে তা স্থগিত রাখা চলতে পারে।

আমি এইমাত্র স্ভাষের কাছ থেকে একটি চিঠি পেলাম। সে অন্রোধ করেছে তার সঙ্গে দেখা করে বিষয়টি নিয়ে কিছ্ক্ষণ আলোচনা করতে। কিন্তু আমার ত মনে হয় না যে, আমাদের আলাপ-আলোচনায় কোন স্নির্দিষ্ট ফল পাওয়া যাবে। কোন পক্ষের ম্খপাত্র ত নই আমি, কাজেই মীমাংসার স্ত্র আমার হাতে নেই। তব্ তাকে 'না' বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। দ্-এক দিনের মধ্যে আমি তার সঙ্গে দেখা করতে যাব বলে স্থির করেছি। তাকে যে আমি কী বলব সে-সম্পর্কে স্পষ্ট কোন ধারণা নেই আমার মনে। এখনকার মত আমার এই মনে

হচ্ছে যে আমি তাকে একটি পরামর্শই দিতে পারি। তা হোল ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের নামের তালিকা প্রস্তাব করার ভারটি সে যেন সম্পূর্ণভাবে আপনার উপর ছেড়ে দেন। সে অবশ্য তার কিছু কিছু মতামত আপনাকে জানাতে পারে। কিন্তু তা পারবেন একথা স্পষ্টভাবে জেনে নিয়ে যে, তা গ্রহণ অথবা বর্জনের পূর্ণ অধিকার আপনার থাকবে। আর কার্যক্রম নির্ধারিত হবে ত্রিপুরী কংগ্রেসের প্রস্তাবাবলী অনুসারে, যার অন্যতম অর্থ, অতীত কার্যক্রমের সঙ্গে কোন বিচ্ছেদ ঘটান হবে না।

এখন সুভাষ যদি এই প্রস্তাব মেনে নেয়, তাহলে দায়িত্ব আপনার এবং আপনি তা এড়িয়ে যেতে পারবেন না। আমি এখনও মনে করি, (দিল্লীতেও একথাই ভেবেছিলাম আমি) যে সুভাষকে সভাপতি হিসেবে গ্রহণ করা আপনার পক্ষে সঙ্গত। তাকে অপসারণের প্রয়াস আমার বরাবরই মনে হয়েছে অতিমাত্রায় ভ্রান্ত-পথ। আর ওয়ার্কিং কমিটির কথা যদি বলা হয়, তার ভার আপনার। একই ধরনের মতাবলম্বীদের নিয়ে এই কমিটি গড়ে তোলার আদর্শটি যদি সংকীর্ণভাবে ব্যাখ্যা করা হয় তাহলে তেমন ভাবে গড়া কমিটি শান্তি অথবা দক্ষতা কোনোটিই অর্জন করতে পারবেন বলে ত মনে হয় না। অবশ্য মতের ব্যাপারে কোন রকমের ঐক্য নিশ্চয়ই থাকবে। তা নাইলে আমরা ত কাজ করতেই পারব না। ওয়ার্কিং কমিটিতে কয়েকজন ব্যক্তির থাকা বা না-থাকা নীতি-নির্ধারণের ব্যাপারে কোন বড় রকমের পরিবর্তন সম্ভব বলে আমি মনে করি না। অবশ্য কোন ব্যক্তির আন্তরিকতা বা বিশ্বস্ততা সম্পর্কে কেউ যদি সন্দিহান হন সেকথা আলাদা। কিন্তু এই মতৈক্যের মধ্যে রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর ঐক্যকে ধরলে চলবে না। রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী যাই হক না কেন যদি তাঁদের কর্মক্ষেত্র অভিন্ন হয় তাহলেই হল। মোট কথা এই কথাটা আমাদের কিছুতেই ভোলা উচিত নয় যে একমতাবলম্বী একটি ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করলেই সারা কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান সঙ্গে সঙ্গে একমতাবলম্বী হয়ে উঠবে না। শেষোক্ত ব্যাপারটি তখনই সম্ভব যখন একমতাবলম্বী শব্দটি আমরা ব্যাপক ও উদার অর্থে গ্রহণ করব।

বিগত কয়েক মাস যাবৎ কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ অবস্থা দেখে আপনি বিচলিত হয়েছেন এবং দুর্নীতি ইত্যাদির নিন্দা করেছেন। আমার ত মনে হয় মতনির্বিশেষে প্রতিটি শুভবুদ্ধিসম্পন্ন কংগ্রেসকর্মী এ সমস্যার সমাধানে আগ্রহী। কংগ্রেসের বাইরে নানা রকমের উপাদান কাজ করে চলেছে, এদের উপর আমার বরাবরই নজর আছে এবং আমি স্বীকার করছি যে নানা ঘটনার গতি এবং নতুন নতুন শক্তির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে আমি উদ্বেগ পোষণ করছি। আমি শুধু সাম্প্রদায়িক প্রশ্নের কথাই বলছি না। আরও অনেক গভীরতর ও দূরপ্রসারী শক্তি কাজ করে চলেছে। যদি এই সন্ধিক্ষণে কংগ্রেস দুর্বল ও বহুধাবিভক্ত হয়ে যায় তার ফল মারাত্মক হয়ে দেখা দেবে। আমাদের একসঙ্গে কাজ করে যেতেই হবে। ঐক্য অটুট রাখতেই হবে। তাই, আপনাকে আমার এই অনুরোধ যে, আপনি মনঃস্থির করে এই ব্যাপারটি মিটিয়ে দিন, যদিও সমাধানের সে-পন্থায় আমরা সকলেই খুশী হতে নাও পারি। একমাত্র এভাবেই আমরা আমাদের ঈপ্সিত গন্তব্যের দিকে এগিয়ে চলতে পারি। না হলে আমরা অনড় হয়ে পড়ে থাকব।

নিজের সম্পর্কে একটি কথা। আমার দুর্ভাগ্য আমি বড় বেশি রকমের ব্যক্তিবাদী। আমি লক্ষ্য করছিলাম ইদানীং ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকগুলিতে আমি স্বস্তিবোধ করিনি, সম্ভবত সহকর্মীদেরও বিরক্তিভাজন হয়েছি। কিন্তু কোন পক্ষে সদিচ্ছার কিছুমাত্র অভাব ছিল না। তাই আমার মনে হয়েছে এতে থাকা আমার

পক্ষে ঠিক হবে না। আরও গুরুতর কিছু কারণ বিদ্যমান থাকায় আমার মনে হয়েছে যে সুভাষ যদি অন্যরকমের কমিটি গড়ে তাতে থাকা আমার পক্ষে আরও শক্ত হবে। আমার এই ধারণা ও অনুভূতি এখনও অপরিবর্তিত রয়েছে। কিন্তু এখন যে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে তার অবসানকল্পে কমিটিতে আমার উপস্থিতি যদি সহায়ক বলে মনে করা হয়, সেক্ষেত্রে কাজ করতে অসম্মত হতে পারি না। এমনতর সম্ভাবনা সম্পর্কে উৎফুল্ল নই আমি। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে যদি তেমন দায়িত্ব দেওয়াই হয় আমায়—তা আমি এড়িয়ে যেতে পারি না।

স্নেহবদ্ধ
জওহরলাল

মহাত্মা গান্ধী
রাজকোট

২৬২ আবুল কালাম আজ কর্তৃক লিখিত

কলিকাতা
এপ্রিল ১৭, ১৯৩৯

প্রিয়বরেষু

জওহর, এলাহাবাদে যে দুর্ঘটনায় পড়েছিলাম তার কথা যখন ভাবি তখন মনে হয় ব্যাপারটা এখানে না ঘটে যদি কলকাতাতেই ঘটত? এখানে যে সেবা-শুশ্রূষা আমি পেয়েছি তার বেশী কী-ই বা পেতাম সেখানে? সত্যি বলতে কি, আপনার দরদী মনের যে স্পর্শ পেলাম তার চেয়ে বেশী কি পেতাম আত্মীয়-স্বজনদের কাছে? জানি না হৃদয়ের কৃতজ্ঞতার ডালি কেমন করে উজাড় করে দেব আপনার কাছে। আমার হৃদয়ের পাত্রটি কানায় কানায় ভরে উঠেছে আপনার প্রীতির করুণাধারায়।

অনেক জিনিস আছে এমনিতে যা সাধারণ বলে মনে হয়, কিন্তু হৃদয়ের গভীরে যারা একটি স্থায়ী চিহ্ন রেখে যায়। এলাহাবাদ থেকে আসার পথে (পথ ত ছিল একটিমাত্র রাত্রির) আমার সুখসাচ্ছন্দ্যের খুঁটিনাটি ব্যাপারেও যে কতটা দৃষ্টি ছিল আপনার! কত কী যে দিয়েছেন আমার সঙ্গে। এখানে এসে দেখছি ডালাটিতে ওডিকোলোনের একটি মস্ত শিশিও রয়েছে!

সুভাষ গান্ধীজীকে যে চিঠিগুলি দিয়েছেন সেগুলি আপনি দেখেছেন কিনা জানি না। ব্যাপারটা সত্যিই দুঃখের যে সুভাষবাবু ত্রিপুরীর আগে যেখানে ছিলেন এখনও ঠিক সেইখানেই রয়ে গিয়েছেন আর ত্রিপুরী-প্রস্তাবগুলি মেনে নিয়ে তদনুসারে কাজ করে এই অবস্থার উন্নতি তিনি ঘটাবেন—এমন সম্ভাবনাও বড় কম। একদিকে পন্থ-প্রস্তাবকে তিনি গঠনতন্ত্র-বিরোধী ও বিধিবহির্ভূত বলছেন, অন্যদিকে তিনি চান যে গান্ধীজী কয়েকটি শর্ত মেনে নিন। এইসঙ্গে তিনি এমনতর মত প্রকাশ করতেও দ্বিধা করছেন না যে, সমাজতন্ত্রী দল নিরপেক্ষ না থাকলে পন্থ-প্রস্তাব পাস হতেই পারত না।

যাই হক, কংগ্রেস সুভাষবাবুর সঙ্গে চলবে না। সমস্ত ব্যাপারটি একটি অচলাবস্থায় উপনীত হবে। কাজেই আমাদের ভবিষ্যৎ কার্যক্রম স্থির করে নিতে হবে।

আমার মতে সুভাষবাবুর ব্যাপারটা দক্ষিণ-বামের দ্বন্দ্ব নয়, একমতাবলম্বী বা ভিন্নমতাবলম্বীদের নিয়ে ওয়ার্কিং কমিটি গঠনে প্রশ্নও নয়। এটি একান্তভাবে সুভাষবাবু ও তাঁর কয়েকজন সমর্থকদের ব্যাপার। এই গ্রন্থি কিভাবে মোচন করা হবে তাতে কিছু যায়-আসে না। আমাদের প্রত্যেকটি প্রশ্ন পৃথকভাবে ও গভীর-

ভাবে বিবেচনা করে দেখতে হবে। তবেই আমরা সমাধানে উপনীত হতে পারব।
আমি আশা করি আমার শেষ চিঠিটি আপনি পেয়েছেন আর সুলতান আহমদ সম্পর্কে লখনউ-তে ফোন করেছেন। ইতি—

A. K. Azad

২৬৩ সুভাষচন্দ্র বসু কর্তৃক লিখিত

জিলগোরা পোঃ
এপ্রিল ২০, ১৯৩৯

প্রিয় জওহর,

আজ আমি মহাত্মাজীকে দুটি টেলিগ্রাম পাঠিয়েছি, একই দিনে তাঁকে পাঠানো চিঠিতে তার একটির বক্তব্য পুনরাবৃত্তি হয়েছে। আমার চিঠি ও টেলিগ্রামের প্রতিলিপি আমি এই সঙ্গে পাঠাচ্ছি।

টেলিগ্রামটিতে (আমাদের পত্রালাপ এখন প্রকাশ না-করার কথা যাতে আছে) তোমার নাম ব্যবহার করেছি। আশা করি তোমার আপত্তির কিছু নেই তাতে।

গান্ধীজীর জ্বরের খবরে আমি উদ্বিগ্ন হলাম। আশা করি শিগ্‌গিরই তা সেরে যাবে। কিন্তু ভগবান না-করুন, তাঁর জ্বর যদি এর মধ্যে না ছাড়ে তাহলে আমি কী করব? এ ব্যাপারে তোমার পরামর্শ প্রত্যাশা করি। এখন তাঁর শরীর এত দুর্বল জেনে উদ্বেগ বোধ করছি। তুমি এ বিষয়ে অনুগ্রহ করে কিছু লিখবে আমায়। আমি আগামীকাল—একুশে, কলকাতা যাচ্ছি।

প্রীতিবদ্ধ
সুভাষ

২৬৪ সুভাষচন্দ্র বসু কর্তৃক মহাত্মা গান্ধীকে লিখিত

জিলগোরা পোঃ
জেলা মানভূম, বিহার
এপ্রিল ২০, ১৯৩৯

শ্রদ্ধেয় মহাত্মাজী,

আজ আমি আপনাকে নীচের টেলিগ্রামটি পাঠিয়েছি :

"মহাত্মা গান্ধী, রাজকোট।

আপনার অসুস্থতার সংবাদে অত্যন্ত উদ্বেগ বোধ করছি। দ্রুত আরোগ্য প্রার্থনা করি। আমি ও জওহরলালজী আশা করি যে আমাদের সাক্ষাৎকার ফলপ্রদ হবে এবং আমাদের সাধারণ লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাওয়ার জন্যে সমস্ত কংগ্রেসকর্মীর সহযোগিতা লাভ করা সম্ভব হবে। কলকাতায় শিগগিরই ত আমাদের দেখা হচ্ছে, তাই মনে হয় তার আগে আমাদের পত্রালাপ প্রকাশ করা বোধহয় ঠিক হবে না। প্রণাম—সুভাষ।"

গত তিন সপ্তাহ যাবৎ আমাদের মধ্যে সুদীর্ঘ পত্রালাপ হয়েছে। পত্র মারফৎ এই আলাপে ওয়ার্কিং কমিটি গঠন সম্পর্কে কোন ফলোদয় হয়নি। তবু এর দ্বারা আমরা পরস্পরের মতামত স্পষ্ট ভাবে ব্যক্ত করতে পেরেছি, এটাই আপাতত মূল্যবান। কিন্তু সবচেয়ে জরুরী সমস্যাটির একটা নিষ্পত্তি হয়ে যাওয়া দরকার, কারণ একটি ওয়ার্কিং কমিটি ছাড়া আমাদের পক্ষে আর কাজ চালিয়ে যাওয়া মুশকিল। দেশের আভ্যন্তরীন অবস্থা ও বর্তমান আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি যা

দাঁড়িয়েছে তাতে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে কংগ্রেসকর্মীদের ভেদাভেদ দূর করে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে এবং একটি সংযুক্ত ফ্রন্ট গড়ে তুলতে হবে। আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি যে দ্রুত খারাপের দিকে যাচ্ছে তা ত আপনি দেখতেই পাচ্ছেন। ব্রিটিশ পার্লামেন্টে যে সংশোধনী বিলটি উপস্থাপন করা হয়েছে তা থেকে স্পষ্টই বুঝতে পারা যাচ্ছে যে, বর্তমানে প্রদেশগুলির যেটুকু ক্ষমতা আছে যুদ্ধকালীন অবস্থায় তাও কেড়ে নেওয়া হবে। যেটুকু বিবরণ পাওয়া যাচ্ছে তা থেকেই স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে এক অভূতপূর্ব সংকটের দিন আজ সমাগতপ্রায়। সেই সংকটের সম্মুখীন হয়ে তার সঙ্গে সাফল্যের সঙ্গে যুঝতে গেলে আমাদের ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে সুশৃংখল ও ঐক্যবদ্ধভাবে দাঁড়াতে হবে। আপনি যদি এগিয়ে এসে নেতৃত্ব গ্রহণ করেন তবেই তা সম্ভব হতে পারে। সেক্ষেত্রে আপনি দেখবেন আমরা সকলে সাধ্যমত পারস্পরিক সহযোগিতা করব এবং আপনাকে অনুসরণ করব। আর তখন এটাও দেখবেন যে দুর্নীতি দূর ও হিংসাত্মক কার্যকলাপ ও মনোভাব রোধের ব্যাপারেও আমরা একটি সাধারণ কর্মক্ষেত্র খুঁজে পাব। যদিও এটাও উল্লেখ করা দরকার যে এই দুর্নীতির পরিমাণ ও হিংসাত্মক মনোভাবের মাত্রা সম্পর্কে আমাদের মধ্যে মতভেদ বিদ্যমান। আর কার্যক্রম সম্পর্কে বলা যায় যে নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতিই তার রূপরেখা নির্ধারণ করে দেবেন—অবশ্য প্রত্যেকেই তাঁর নিজস্ব মতামত সমিতির সামনে রাখার অধিকারী। কার্যক্রম সম্পর্কে আমার ধারণা হল এই যে, আসন্ন সংকটের কথা মনে রেখে আমাদের কার্যক্রম নির্ধারণ করতে হবে, আর ত'হলেই আমরা দেখব আমাদের মধ্যে এই ব্যাপারে কোন বড় রকমের মতপার্থক্য থাকতেই পারবে না।

নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশন বসার আগে আমাদের যে সাক্ষাৎকার ঘটবে আমি তার জন্যে উদগ্রীব হয়ে আছি। বাংলা এবং অন্যান্য প্রদেশে ক্রমেই এই মত দ্রুত দানা বাঁধছে যে, পারস্পরিক বোঝাপড়ার দ্বারা ওয়ার্কিং কমিটি গঠনের সমস্যাটির সমাধান করতে হবে, তত্ত্বগত মতভেদ বা বিগত ভুলবোঝা ও মতান্তর যেন এর অন্তরায় না হয়। পন্থ-প্রস্তাব অনুসারে ওয়ার্কিং কমিটি গঠনের দায়িত্ব আপনারই, এবং আপনি দেখবেন যে যখন আপনি সে দায়িত্ব পালন করতে এগিয়ে আসবেন, তখন, আমরা সকলেই আপনার সঙ্গে সাধ্যমত সহযোগিতা নিশ্চয়ই করব।

জওহর গতকাল এসেছিল এখানে। বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে তার সঙ্গে আমার সুদীর্ঘ আলোচনা হয়েছে। আমাদের মতৈক্য লক্ষ্য করে আমি খুশী হয়েছি।

আমার মনে হয় কলকাতা যাওয়ার পথে কলকাতার কাছাকাছি কোথাও নেমে ও একদিনের জন্যে থেমে—নিরিবিলিতে দুজনে মিলে একটু আলাপ করে নিলে ভাল হয়। আপনি যদি নাগপুরের পথে আসেন তাহলে মেদিনীপুর (খড়্গপুরের কাছে) হবে সবচেয়ে ভাল জায়গা। আর যদি চেওকি দিয়ে আসেন তাহলে বর্ধমানের কাছাকাছি কোন জায়গা আমাদের ঠিক করে নিতে হবে। এই ব্যাপারে আপনাকে একটি টেলিগ্রাম পাঠিয়েছি এবং তার উত্তর আশা করছি। এটা না হলে কলকাতাতেই দেখা করব আমরা। আমি জওহরকে আমাদের আলোচনায় যোগ দিতে অনুরোধ করেছি, সে সম্মত হয়েছে।

আপনার জ্বরের খবরে আমি চিন্তিত। প্রার্থনা করি শীঘ্রই তা দূর হক।

সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই।

স্নেহবদ্ধ
সুভাষ

২৬৫ সুভাষচন্দ্র বসু কর্তৃক মহাত্মা গান্ধীকে লিখিত

এপ্রিল ২০, ১৯৩৯

মহাত্মা গান্ধী, রাজকোট

সাতাশে কলকাতা আসছেন জেনে খুব আনন্দিত। আপনি যেখানে খুশি থাকবেন, কোন আপত্তি নেই তাতে। তবে আমার মনে হয় আপনার ব্যক্তিগত স্বাচ্ছন্দ্য ও সাধারণের সুবিধার জন্য নগরের উপকণ্ঠে কোন বাগানবাড়িতে থাকলেই ভাল হয়। এ ব্যাপারে সতীশবাবুর সঙ্গে পরামর্শ করে আবার তার পাঠাব কলকাতা থেকে। জওহরলালজী কাল এখানে ছিলেন। দুজনেই মনে করি যে আপনি যদি কলকাতার কাছাকাছি কোথাও একদিনের জন্যে থামেন, তাহলে আমরা দুজনেই আপনার সঙ্গে কিছু ব্যক্তিগত কথাবার্তা বলে নিতে পারি। এতে আপনার সম্মতি থাকলে তার করে জানাবেন কোন পথে আপনি আসছেন। তাহলে সুবিধে মত কোন জায়গায় আপনার নামবার ব্যবস্থা করব। একুশে কলকাতা যাচ্ছি।

সুভাষ

২৬৬ লেডী অ্যাস্টর কর্তৃক লিখিত

প্রিয় পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু,

গত গ্রীষ্মে আপনার সঙ্গে গাইদিলিউ নামের সেই নাগা মেয়েটির ব্যাপার নিয়ে যে কথা হয়েছিল তা হয়ত আপনার মনে আছে। ১৯৩০ সনে কয়েকজন মণিপুর-ভ্রমণকারীদের হত্যাপরাধে ১৯৩৩ সনে মেয়েটিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। এই ব্যাপারটি নিয়ে ইণ্ডিয়া অফিসের সঙ্গে আমার বেশ কিছু পত্রালাপ হয়েছে। তার ফলে তাঁরা এ সম্পর্কে অনেক খুঁটিনাটি সংবাদ সংগ্রহ করে আমায় সে সব জানিয়েছেন। সংক্ষেপে বলতে গেলে ব্যাপারটা এই রকমঃ জাদোনাং বলে একটি লোক নিজেকে অবতারগোছের বলে জাহির করে, গাইদিলিউ ছিল তার উত্তরসাধিকার মত। হত্যাকাণ্ডগুলি সংঘটিত হয়েছিল ওই জাদোনাং-এর ইষ্টদেবতার উদ্দেশে নিবেদিত বলি হিসেবে। এই সম্প্রদায়ের খপ্পরে পড়ে কুকি নামের পুরো একটি গোষ্ঠী লোপাট হওয়ার আশঙ্কা নাকি দেখা দিয়েছিল। গাইদিলিউয়ের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছিল, তবে তার বয়স এবং তার উপর জাদোনাংয়ের প্রভাবের কথা বিবেচনা করে আদালত তার মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা কার্যকর করবার বিপক্ষে মত প্রকাশ করেন।

প্রকাশ যে নাগাদের মধ্যে ওই আন্দোলন এখন বন্ধ হয়নি, এবং মেয়েটিকে মুক্তি দিলে তা নাকি আবার জোরদার হওয়ার সম্ভাবনা। মেয়েটিকে 'মণিপুর রাজ্য ও আসাম প্রদেশের শান্তির পক্ষে বিলক্ষণ বিপদের কারণ বলে' মনে করা হচ্ছে।

ভারতসচিব এই ব্যাপারটির উপর গুরুত্ব আরোপ করে জানাচ্ছেন যে গাইদিলিউয়ের দণ্ডের ব্যাপারটি সম্রাটের প্রতিনিধির এক্তিয়ারভুক্ত, এবং যেহেতু ব্যাপারটি সম্রাটের প্রতিনিধির এক্তিয়ারভুক্ত, এবং যেহেতু ব্যাপারটি মণিপুর রাজ্যের এবং ব্রিটিশ এলাকার বাইরে, অতএব এ ব্যাপারে মহামান্য সম্রাট বাহাদুরের বিশেষ ক্ষমতার প্রয়োগ সম্পর্কে তিনি (ভারতসচিব) সম্মান প্রদর্শনে বাধ্য।

আমার আবেদনে আমি জানতে চেয়েছিলাম যে এই রকম অল্পবয়স্কা মেয়ের পক্ষে সাধারণ কারাদণ্ডের চেয়ে কোন রকমের সংশোধন ও গঠনমূলক রীতির প্রয়োগ বেশী ভাল হত কিনা? উত্তরে আমায় জানান হয়েছে যে আসাম জেলে 'বোরস্টাল' রীতির একটি সরলীকৃত রূপ নাকি প্রবর্তিত হয়েছে এবং তাতে মেয়েটি কিছুটা শিক্ষাদীক্ষার সুযোগ পাবে। আমাকে আরও আশা দেওয়া হয়েছে গাইদিলিউ সম্পর্কে আমার প্রস্তাবগুলি মহামান্য সম্রাটের প্রতিনিধির বিবেচনার জন্যে সুপারিশ

করা হবে। আশা করি, আমার প্রয়াসের কিছু শুভ ফল দেখা দেবেই। যদিও ব্যাপারটায় এত সময় লাগল বলে আমি দুঃখিত।

আশা করি আপনার কন্যা ও ভগ্নী এখন ভাল আছেন।

ভবদীয়
নানসি অ্যাস্টর

২৬৭ মাও সে-তুং কর্তৃক লিখিত

জে নেহরু, এস্কোয়ার,
আনন্দ ভবন এলাহাবাদ, ইউ পি.

মে ২৪, ১৯৩৯
ইয়েনান, শেনসি

প্রিয় বন্ধু,
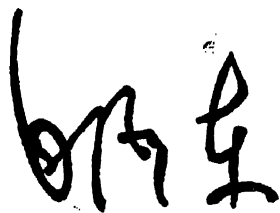
ডাঃ এম অটলের নেতৃত্বে যে মেডিকেল ইউনিটটি এসেছেন তাঁদের অভ্যর্থনা জানাতে পেরে, এবং জাপানী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে চীনের জনগণের উদ্দেশে প্রেরিত ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের শুভেচ্ছা ও উৎসাহের বাণী পেয়ে আমরা আনন্দিত।

আপনাকে জানাতে চাই যে ভারতীয় মেডিকেল ইউনিট তাঁদের কাজ সুরু করে দিয়েছেন এবং সমগ্র অষ্টম রুট আর্মি তাঁদের স্বাগত সংবর্ধনা জানিয়েছেন। তাঁরা যেভাবে হাসিমুখে ও স্বেচ্ছায় আমাদের দুঃখকষ্টের ভাগ নিচ্ছেন, তা তাঁদের সংস্পর্শে যাঁরাই এসেছেন তাঁদের সকলের হৃদয়ে গভীর রেখাপাত করেছে।

এই সুযোগে মহান ভারতীয় জনগণ ও ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস—যাঁরা এই মেডিকেল ইউনিট ও অন্যান্য সাহায্য পাঠিয়েছেন আমাদের—তাঁদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। আশা করি, ভবিষ্যতও ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ও ভারতের জনসাধারণের অবিচ্ছিন্ন সাহায্য আমরা লাভ করব এবং এই ভাবে এক যোগে জাপানী সাম্রাজ্যবাদীদের বিতাড়নে সমর্থ হব।

শেষোক্ত হলেও অন্যূন, আপনাকে আমাদের ধন্যবাদ, শুভেচ্ছা ও আন্তরিক প্রীতি নিবেদন করি।

আপনার

২৬৮ বল্লভভাই প্যাটেল কর্তৃক লিখিত

বোম্বাই
জুলাই ৩, ১৯৩৯

প্রিয় জওহর,

১লা তারিখে সার্ এস. বাপুর সঙ্গে দেখা করে তাঁর আঞ্চলিক পরিকল্পনার (জোনাল স্কীম) কথা বলেছিলেন। বাপু তাঁকে বলেই দিয়েছেন যে এ ব্যাপারে তাঁর (বাপুর) সঙ্গে কথা বলার কোন দরকার নেই। বাপু এ ব্যাপারে রাজেন্দ্রবাবুর কাছ থেকে যে বার্তা পেয়েছেন তার উল্লেখ করে বলেন যে সার্ এস এবং মুসলিম লীগে তাঁর অন্যান্য যে সব বন্ধুরা আছেন তাঁরা ইচ্ছে করলে ব্যাপারটি নিয়ে রাজেন্দ্রবাবু ও কংগ্রেসের অন্যান্য বন্ধুদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করতে পারেন। তবে এটাও স্পষ্ট করে নেওয়া দরকার যে আলাপের ব্যাপারে কোন পক্ষ থেকে কোন রকমের শর্ত আরোপ করা হবে না। তিনি আজ রাত্রে আবার আসছেন। তার ফল কিছুই হবে না।

বাপ্ু তাঁর সীমান্ত যাত্রা স্থগিত রেখেছেন। কারণ বাদশা খান তাঁকে তার করে জানিয়েছেন যে ৫ই জুলাই তারিখে তাঁর যাত্রা সুরু করা দরকার।

বাপুর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের যে বিবরণ হরিজন পত্রে প্রকাশিত হয়েছে সেটি সম্পর্কে আগের দিন বাপুর সঙ্গে কথা বলবার সময় আপনি একটু উত্তেজিত হয়েছিলেন। আপনাকে ওই রকম ক্রুদ্ধ হতে দেখে আমরা সকলেই দুঃখিত হয়েছিলাম এবং আমাদের মনে হয়েছিল যে আপনি বাপুর প্রতি আদৌ সুবিচার করতে পারেননি। আমার ত মনে হয় যে এমনতর ঘটনা আর দু-একটা ঘটলে বাপু তাঁর বর্তমান কর্মক্ষেত্র (জনসেবা ও রাজনীতি) থেকে অবসর গ্রহণ করার সিদ্ধান্তে পেঁছিতে বাধ্য হবেন। তাঁর বয়স হয়েছে একাত্তর, তাঁর আগের দৈহিক শক্তিও আর নেই। আপনাকে উত্তেজিত দেখলে তিনি আঘাত পান। আমার মনে হয় না যে তিনি আপনাকে যতটা ভালবাসেন ততটা আর কাউকেই বাসেন, তাই, তিনি যখন দেখেন যে তাঁর কোন কাজে আপনি অসুখী হয়েছেন, তখন গভীর ভাবে তা নিয়ে ভাবতে বসে মুহ্যমান হয়ে পড়েন। সেদিন সন্ধ্যার পর থেকেই তিনি অবসর গ্রহণের কথা ভাবছেন। আর তাঁর সঙ্গে পেরিন ও ভারুচার আলাপ ও রাজেনবাবুকে লেখা খুরশেদ-এর চিঠি তাঁর সেই ভাবনার আগুনে আরও ইন্ধন যুগিয়েছে।

আমি তাঁকে বোঝাতে চেষ্টা করছি যে হঠাৎ তাঁর পক্ষে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা ঠিক হবে না। কিন্তু আপনি তাঁকে চেনেন। আমি জানিনা আমি তাঁকে বোঝাতে পারব কিনা।

আমার মনে হয়েছে ব্যাপারটি আপনাকে জানিয়ে রাখা দরকার। আপনি যদি উচিত মনে করেন তাহলে চিঠি লিখে তাঁকে জানাবেন যে এ ব্যাপারে আপনার সঙ্গে ভাল রকম আলোচনা না করে তিনি যেন সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করেন।

প্রীতি সম্ভাষণান্তে—

বল্লভভাই

২৬৯ মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক লিখিত

সেবাগ্রাম, ওয়ার্ধা
জুলাই ২৯, ১৯৩৯

প্রিয় জওহরলাল,

ধামাইদের নেতৃত্বের ভার নিজে না নিয়ে তোমার উপর দিলাম। আমার মনে হয়, আমার দিক থেকে কোনরকম হস্তক্ষেপ ছাড়াই এই গুরুদায়িত্ব পালন করা উচিত তোমার। দেশীয় রাজ্যগুলি যেন দেশের অন্যান্য অঞ্চল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে রয়েছে এবং কংগ্রেসের বাণী যেন ঠিকমত সাড়া জাগাচ্ছে না সেখানে। এই জন্যেই স্টেটস কনফারেন্স-এর উদ্যোগ আয়োজন। আমি ইতিমধ্যেই হরিজনে এই মত প্রকাশ করেছি যে—রাজ্যগুলির কোন সংগঠন বা মণ্ডল তোমার কমিটির সঙ্গে যোগাযোগ না রেখে কোন কাজ যেন না করে। আমাকে যদি কোন কাজ করতেই হয়, তা আমি করব তোমার মাধ্যমে, মানে, যদি কোন বিষয় আমার কাছে পাঠাও তবে। ওয়ার্কিং কমিটির সম্পর্কে যেমন মতামত প্রকাশ করে থাকি, এক্ষেত্রেও তা করব। গোয়ালিয়রের জনসাধারণের উদ্দেশে এই মর্মেই গতকাল কিছু বলে পাঠিয়েছি। সুষ্ঠুভাবে কাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্যে তোমাদের কমিটির সামান্য পুনর্গঠন দরকার।

শেষ পর্যন্ত কাশ্মীর যাওয়া হয়ে উঠল না আমার। আমি রাজ্য সরকারের অতিথি হয়ে সেখানে থাকি, এটা শেখ আবদুল্লা ও তাঁর বন্ধুরা পছন্দ করবেন না।

আমার অভিজ্ঞতা থেকে মনে হয়েছিল যে রাজ্য সরকারের আমন্ত্রণ গ্রহণ করা উচিত হবে। আমি ধরেই নিয়েছিলাম শেখ আবদুল্লার সম্মতি পাব এ ব্যাপারে। কিন্তু দেখছি আমারই ভুল হয়েছিল। অগত্যা রাজ্য সরকারের আতিথ্য প্রত্যাখ্যান করে শেখের আমন্ত্রণ গ্রহণ করলাম। রাজ্যসরকার এতে অস্বস্তি বোধ করলেন। কাজেই কাশ্মীর যাত্রার কার্যক্রমই দিতে হল বাতিল করে। দু দফা বোকামি করলাম আর কি—তোমাকে ছাড়া একাই যেতে পারব এমন দুঃসাহস করেছিলাম আর রাজ্য-সরকারের আতিথ্য গ্রহণের আগে শেখ আবদুল্লার অনুমতি গ্রহণ করিনি। আমি ভেবেছিলাম যে রাজ্যসরকারের আমন্ত্রণ গ্রহণ করে জনগণের সেবা করবারই সুযোগ পাব। আমি স্বীকার করছি শেখ এবং তাঁর বন্ধুবর্গের যতটুকু পরিচয় পেয়েছি তাতে খুশী হতে পারিনি আমি। আমাদের সকলেরই মনে হয়েছে যে তাঁদের মনোভাব অত্যন্ত অযৌক্তিক। খান সাহেব তাঁদের অনেক চেষ্টা করেছিলেন বোঝাবার। তাতে কোন ফল হয়নি।

তোমার সিংহল ভ্রমণ গৌরবময় হয়েছে। এর প্রত্যক্ষ ফল কী হল তা নিয়ে আমার কোন চিন্তা নেই। সালে তায়েবজী আমায় বলছেন তোমায় ব্রহ্মদেশে পাঠানোর জন্যে, আর অ্যান্ড্রুজ এই প্রসঙ্গে দক্ষিণ এসিয়ার কথা বলছিলেন। সিংহলে কংগ্রেসের একটি প্রতিনিধিদল পাঠানোর চিন্তা হঠাৎ আমার মাথায় এসেছিল, কিন্তু অন্য দুটির প্রস্তাব পেলেও কেন জানিনা, তেমন উৎসাহ বোধ করছি না। যাই হোক, দেখা হলে কথা হবে এ বিষয়ে। আশা করি তুমি বেশ তাজা আছ আর কৃষ্ণা নিশ্চয়ই খুব আনন্দ উপভোগ করছে।

ভালবাসা
বাপু

২৭০ মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক লিখিত

সেবাগ্রাম, ওয়ার্ধা
আগস্ট ১৯, ১৯৩৯

প্রিয় জওহরলাল,

ভাবছিলাম, অন্য সময়ের অভাবে ওয়ার্কিং কমিটির সমক্ষেই প্ল্যানিং কমিটি সম্পর্কে কিছু বলব কিনা তোমায়। আজ সকালে তোমার সঙ্গে তাঁর কথাবার্তার পর শঙ্করলাল এসেছিলেন এখানে। সঙ্গে এনেছিলেন তাঁকে এই বিষয়ে লেখা কৃপালনির একটি চিঠির প্রতিলিপি। কৃপালনি এ ব্যাপারে যেসব আপত্তির কথা তুলেছেন তাতে আমার সায় আছে। সত্যি বলতে কমিটির কার্যকলাপের উপযোগিতা বুঝে উঠতে পারিনি আমি কোন দিন। আর এর কাজকর্মের বিবরণ ওয়ার্কিং কমিটিকে ঠিকমত জানানো হয় কিনা তাও জানিনা। এর অসংখ্য সাব-কমিটিগুলির অস্তিত্বের সার্থকতা বুঝতে আমি অক্ষম। আমার মনে হচ্ছে প্রভূত অর্থ এবং প্রচুর সময় এমন একটি কর্মে ব্যয়িত হচ্ছে যার ফল একেবারেই কিছু হবে না, কিংবা খুব সামান্য কিছু হবে। এই হল আমার সন্দেহ। এ ব্যাপারে তোমার কাছ থেকে কিঞ্চিৎ আলোক চাই। আমি জানি তোমার মন রয়েছে চীনে। তোমার মনোভাব যদি শাহের জানা থাকে তাহলে না হয় তাঁর কাছ থেকে তা জানার চেষ্টা করব। আর না হয় আমি প্রতীক্ষা করে থাকব। তোমার মহান পরিক্রমা শেষ করে তুমি ফিরে এস। ঈশ্বর তোমায় সতত রক্ষা করুন এবং নির্বিঘ্নে মাতৃভূমিতে ফিরিয়ে আনুন।

ভালবাসা
বাপু

২৭১ আব্দুল কালাম আজাদ কর্তৃক লিখিত

কলিকাতা
আগস্ট ১৭, ১৯৩৯

প্রিয়বরেষু,

জওহরলাল, আপনার পত্রের জন্য ধন্যবাদ। এলাহাবাদের ঠিকানায় পর পর দুটি চিঠি দিয়েছি, আশা করি সেগুলি আপনার সমীপে উপস্থিত হতে পেরেছে।

রাজেন্দ্রবাবু কমিটির সমক্ষে আমার পত্রটি উপস্থাপন করেছিলেন কিনা আমার জানা নেই। তিনি এবং বল্লভভাই আমায় খুব অনুরোধ করেছিলেন যে, যদি আমি উপস্থিত থাকতে না পারি, তাহলে, আমি যেন আমার মতামত বিস্তৃতভাবে একটি পত্রের মাধ্যমে পেশ করি। এবং সেজন্যই বিস্তারিত ভাবে আমার মতামত লিপিবদ্ধ করেছিলাম। আমার মত ছিল : সুভাষবাবুর মনোভাব বা মত ঠিক নয়, এবং ওয়ার্কিং কমিটির কর্তব্য তাঁদের মত দ্বিধাহীনচিত্তে সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করা। কিন্তু আমি এও বলেছিলাম যে এই ব্যাপারে খুব বেশী কড়াকড়ি দেখানোটা ঠিক হবে না। আমি প্রস্তাব করেছিলাম যে যুক্তপ্রদেশে আপনি যে প্রস্তাব উত্থাপন ও গ্রহণ করেছিলেন সেটির অনুসরণে একটি প্রস্তাব ওয়ার্কিং কমিটি গ্রহণ করুন এবং বাকী ব্যাপারটি সভাপতির হাতে ছেড়ে দিন। সভাপতি তাঁদের সঙ্গে পত্রালাপ করতে পারবেন, এবং কমিটি কর্তৃক গৃহীত প্রস্তাব সম্পর্কে মতৈক্য উপনীত হলে সভাপতি পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করবেন। এবং এতেও সভাপতি সম্মত না হলে সদস্যদের বর্তমান পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া যেতে পারবে। অবশ্য আগামীবার তাঁদের নির্বাচনে কোন বাধা থাকবে না।

আমি ফোনে কথা বলে আপনাকে কষ্ট দিয়েছিলাম, কারণ আমার ধারণা ছিল এই ব্যাপারটি নিয়ে আলোচনায় আপনি যোগ দেবেন। কিন্তু এখন বুঝছি আপনি সম্পূর্ণভাবে নিজেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিলেন, এবং আপনার সম্মতির অনুপস্থিতিতেই এই ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল।

ভবদীয়
এ. কে. আজাদ

২৭২ মাদাম সান ইয়াৎ-সেন কর্তৃক লিখিত

দি চায়না ডিফেন্স লীগ
সেন্ট্রাল কমিটি
হংকং
সেপ্টেম্বর ১৫, ১৯৩৯

প্রিয় বন্ধু,

এই কয়েকটি লাইন লিখছি শুধু এই কথাটি জানাতে যে আপনার চীন পরিক্রমাকালে আমি আপনাকে স্বাগত সংবর্ধনা জানাতে পারিনি বলে সত্যিই খুব দুঃখ বোধ করছি। ডাঃ মুখার্জির কাছ থেকে সম্প্রতি জানলাম যে আমার বার্তা চুংকিং-এ পৌছয়নি আপনার কাছে। আমি ভাবছিলাম একদিন না হয় বিমানযোগে গিয়ে দেখা করে আসব আপনার সঙ্গে, ঠিক এমন সময় জানলাম আপনি স্বদেশাভিমুখে প্রত্যাবর্তন করেছেন। যাই হোক, আমি বিশ্বাস করি অদূরভবিষ্যতে আমাদের দেখা হবেই। আমি চেয়ে আছি সেই সুদিনের প্রত্যাশায় যেদিন মুক্ত ও স্বাধীন চীনে আপনাকে স্বাগত জানাতে পারব!

ইউরোপ থেকে যেসব সাহায্যের প্রতিশ্রুতি আমরা পেয়েছি তার সুযোগ ত এখন গ্রহণ করতে পারছি না, তাই আপনাদের দেশ থেকে কিরকম সাহায্য আশা

করতে পারি তা নিয়ে এবং মেডিকাল রিলিফের কাজ নিয়ে ডাঃ মুখার্জির সঙ্গে সুদীর্ঘ আলোচনা হল। আমি জানি এই আলাপের পূর্ণ বিবরণ এবং ভারতে চায়না ডিফেন্স লীগের একটি শাখা স্থাপন সম্পর্কে যে প্রস্তাব আমি জানিয়েছি তা তিনি নিশ্চয়ই জানাবেন আপনাকে। বর্তমানের জটিল পরিস্থিতির জন্যে হয়ত আমাদের সংঘ সরিয়ে নিয়ে যেতে হবে কুনমিন কিংবা কুইলিনে। যে-কোন পরিবর্তনের সংবাদ আপনাকে জানানো হবে।

আপনি যে কাজের নেতৃত্ব করছেন তার অগ্রগতি সম্পর্কে ওয়াকিফহাল থাকতে চেষ্টা করি। আমার সহানুভূতিপূর্ণ দৃষ্টি সব সময় রয়েছে আপনাদের আদর্শের ও লক্ষ্যের প্রতি। সেই লক্ষ্যে উপনীত হতে চীনও যে চায়।

আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। ইতি॥

সুং চিং লিং

২৭৩ মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক লিখিত

সেবাগ্রাম, ওয়ার্ধা
সেপ্টেম্বর ১৮, ১৯৩৯

প্রিয় জওহরলাল,

চিয়াং কাই-শেককে লেখা আমার চিঠিটি পাঠালাম এই সঙ্গে। চিঠিটা আমি যা চেয়েছিলাম তার চেয়ে কিছু বড়ই হয়ে পড়ল। বোধহয় মূল চিঠিটির সঙ্গে একটি একটি টাইপ করা কপি পাঠালে ভাল হবে।

মহাদেব গতকাল মাদ্রাজে গিয়েছেন।

ভালবাসা
বাপু

২৭৪ জওহরলাল নেহরু কর্তৃক কৃষ্ণ কৃপালানিকে লিখিত

আনন্দভবন,
এলাহাবাদ, সেপ্টেম্বর ২৯, ১৯৩৯

প্রিয়বরেষু

কৃষ্ণ, তোমার পঁচিশে সেপ্টেম্বরের চিঠিটি সদ্য এসে পেঁাছেছে। কর্মভারে পিষ্ট এই মানুষটির প্রতি তুমি কিন্তু মোটেই সুবিচার করোনি। জরুরী হলেও এই বিষয়টি সম্পর্কে এই মুহূর্তে কিছু বলার ব্যাপারটা তোমার কাছে ক্ষমা চেয়ে এড়িয়ে যেতাম। কিন্তু তোমাকে লেখা অধ্যাপক সাহার পত্রটি পড়ে দেখলাম তাতে এমন অনেক কথা আছে যা ঠিক নয়। এখন যদি চুপ করে থাকি তাহলে আরও ভুল বোঝার কারণ ঘটবে। তিনি বারবার আমার কথা উল্লেখ করেছেন এবং আমার সম্পর্কে এমন অনেক উক্তি করেছেন যা থেকে আমি পরিকল্পনা কমিশনের কাছে যা বলেছি সে সম্পর্কে একটি পুরোপুরি ভুল ধারণা গড়ে ওঠা খুবই সম্ভব।

বিষয়টি সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ আলোচনার অবকাশ আমার নেই। এ সম্পর্কে অধ্যাপক সাহা এবং অন্যদের মনে যে ভুল ধারণা স্থান পেয়েছে তা দূর করবার চেষ্টা করব।

পরিকল্পনা কমিশনের বৈঠকে কোন সময়েই গান্ধীজীর নীতিগুলি নিয়ে আলোচনা হয়নি। অবশ্য বিভিন্ন সময়ে গৃহীত প্রস্তাবগুলির মাধ্যমে কংগ্রেসের যে নীতি প্রকাশিত হয়েছে, আমরা তার আলোচনা করেছিলাম এবং এইভাবে, অপ্রত্যক্ষভাবে গান্ধীজীর সেইসব নীতি উল্লেখ করেছি, যেগুলির দ্বারা গত কুড়ি বৎসর যাবৎ কংগ্রেস প্রভাবিত হয়ে আসছে। কিন্তু আলোচনার কোন স্তরেই আমি

এমন কোন কথা বলিনি যে গান্ধীজীর মত আমি শ্রীকুমারাপ্পা বা অন্য কারো চেয়ে বেশী বুঝি। আমি মনে করি যে এই ক্ষেত্রে অন্তত শ্রীকুমারাপ্পা গান্ধীজীর পক্ষে কথা বলার দাবি অনেক বেশী রাখেন আমার চেয়ে। তিনি কয়েক বৎসর যাবৎ গান্ধীজীর সঙ্গে গ্রামোদ্যোগের কাজে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত আছেন, কাজেই ওই বিষয়ে এবং কুটিরশিল্প সম্পর্কে গান্ধীজীর মত ব্যক্ত করার পূর্ণ অধিকার তাঁর আছে।

পরিকল্পনা কমিটিতে আমি যা বলেছিলাম তার মর্ম এই যে, কংগ্রেস কখনই বৃহৎশিল্পের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেনি, কিন্তু একাধিক কারণে (আমি নিজে সেগুলির যৌক্তিকতা স্বীকার করি) কুটির শিল্পের উপর অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করেছে। আমি ব্যক্তিগতভাবে বৃহৎশিল্পের পক্ষে। কিন্তু তবুও রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণে আমি খাদি ও গ্রামোদ্যোগ আন্দোলন আন্তরিকভাবে সমর্থন করে এসেছি। আমার মনে এই দুইয়ের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য নিয়ে দ্বন্দ্ব ছিল না কখনই, যদিও দুটিরই বেড়ে ওঠার কয়েকটি দিক নিয়ে চিন্তাগত দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছে বইকি মাঝে মাঝে। এই ব্যাপারে গান্ধীজীর মতের প্রতিনিধিত্ব হয়ত খুব বেশী দূর করতে পারব না আমি, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে এই দুইয়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংঘর্ষ এতাবৎকালের মধ্যে ঘটেনি।

আমার মনে হয়, কতকগুলি প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ শিল্প স্পষ্টতই বৃহৎশিল্প হিসেবেই গড়ে উঠবে যেমন, প্রতিরক্ষা সম্পর্কিত শিল্প। আর কতকগুলি আছে যা বৃহৎ কিংবা ক্ষুদ্র বা কুটিরশিল্পের মাধ্যমে সংগঠিত হতে পারে। শেষের গুলিকে নিয়ে মতপার্থক্য হতে পারে। এবং এই মতপার্থক্যের পিছনে রয়েছে দৃষ্টিভঙ্গী ও তত্ত্বগত পার্থক্য। শ্রীকুমারাপ্পা শেষোক্ত পার্থক্যের উপর খুবই জোর দিয়েছেন শুনেছি। তাঁর বক্তব্য হল,—একালে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার অন্তর্গত বৃহৎশিল্পসমূহ হিংসার ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে এবং তাতে পরিবেশনের সমস্যাটি সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষিত। এই পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে আমি একমত। এখন তাঁর মতে কুটিরশিল্পের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পরিবেশনের ব্যাপারটি সুচারুভাবে সম্পন্ন হবে এবং তাতে হিংসার পরিমাণ অনেক কম। এখানেও তাঁর কথায় আমার সায় থাকলেও তার মাত্রা খুব বেশী নয়। হিংসা, একচেটিয়া অধিকার ও অল্প কিছু লোকের হাতে সম্পদের সমাহরণের মূলে আছে বর্তমান অর্থনৈতিক কাঠামো। বৃহৎশিল্প যে অবিচার ও হিংসার জন্য দায়ী—একথা ঠিক নয়। দায়ী—বৃহৎশিল্পের অপব্যবহারকারী ধনিক ও অর্থবিনিয়োগকারীরা। একথা সত্য যে বৃহৎযন্ত্র মানুষের গঠনমূলক ও ধ্বংসমূলক উভয় প্রকার শক্তিই বহুগুণ বাড়িয়ে তোলে, এবং তার ফলে ভাল মন্দ উভয়েরই সম্ভাবনা যায় বেড়ে। আমি মনে করি ধনতন্ত্রের অর্থনৈতিক কাঠামো বদল করলে বৃহৎযন্ত্রের অপব্যবহার এবং তার ফলে উদ্ভূত হিংসা—দুইকেই বর্জন করা সম্ভব। ব্যক্তিগত মালিকানা ও সামাজিক সমাহরণ, প্রতিযোগিতামূলক হিংসাকে উৎসাহ যোগায়। সমাজতান্ত্রিক সমাজে বৃহৎযন্ত্রের কুফল রোধ করা ও সুফল ভোগ করা সম্ভব।

বৃহৎশিল্প ও বৃহৎযন্ত্রের মধ্যে কিছু বিপদের সম্ভাবনা সর্বদাই বিদ্যমান, একথা, আমার মনে হয়, মিথ্যা নয়। শক্তিকে কেন্দ্রীভূত করার যে প্রবৃত্তি আছেই, তার সম্পূর্ণ উচ্ছেদ সম্ভব না হতেও পারে। কিন্তু পৃথিবীতে কোন দেশ বা জাতি বৃহৎশিল্পের সহায়তা বাদ দিয়ে প্রগতির পথে চলতে পারে—এ আমি ভাবতেও পারি না। এ যদিও বা সম্ভব হয় তো তা হবে উৎপাদনের পরিমাণ খুব কম করে এনে অর্থাৎ জীবনযাত্রার মান খুব নিচু করে দিয়ে। কোন দেশ যদি শিল্পায়ন পরিহার করে তবে শিল্পসমৃদ্ধ অন্য দেশগুলির কাছে তার রাষ্ট্রীক

ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অবলুপ্তির সম্ভাবনা সব সময়েই থাকবে। কারণ তারা তো শোষণ করবেই সেই দেশটিকে, সুযোগ নেবে তার দুর্বলতার। ব্যাপক ও বিস্তৃতভাবে কুটিরশিল্প গড়ে তোলার জন্য দরকার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শক্তি। আর এই রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শক্তি তেমন কোন দেশের করায়ত্ত হতেই পারে না যে নাকি তার সমগ্র উদ্যম কুটিরশিল্পের ক্ষেত্রেই নিবদ্ধ রেখেছে। ফলে হবে এই যে, তার পরম কাঙ্খিত কুটিরশিল্পের অগ্রগতিও হয়ে উঠবে অসম্ভব।

আমি তাই মনে করি যে বৃহৎযন্ত্রের প্রবর্তন ও প্রসারে উৎসাহ দিয়ে শিল্পায়নের দিকে এগিয়ে যাওয়াই ভারতের কাম্য হওয়া উচিত। তা অবশ্যম্ভাবীও বটে। কিন্তু এই শিল্পায়নের মাত্রা ও গুরুত্ব যতই বেশী হক না কেন তার ফলে ভারতে ব্যাপকভাবে কুটিরশিল্প গড়ে তোলার প্রয়োজন ফুরিয়ে যাবে না—এই প্রত্যয়েও আমি অটল। আর সেই কুটিরশিল্প স্বাধীনভাবে কাজ করে যাবে, কারও ভার হয়ে থাকবে না। আমি জানিনা আগামী দু-এক পুরুষের মধ্যে বিজ্ঞান কোন্ কোন্ বস্তু অর্জনে সমর্থ হবে, কিন্তু যতদূর বুঝছি তাতে মনে হয় বৃহৎশিল্প গড়ে ওঠার পরেও (যাতে উৎসাহ দিতেই হবে); কুটিরশিল্পের একটি স্বতন্ত্র ও গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন থেকেই যাবে। কাজেই আসল সমস্যা হচ্ছে, এ দুয়ের সমন্বয় ও সহযোগিতা। পরিকল্পনার মাধ্যমে রাষ্ট্র এর মীমাংসা করবে। বর্তমানে যে বিশৃঙ্খল ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা বিদ্যমান তার দ্বারা এর সুসমাধান সম্ভব নয়।

বিষয়টি সম্পর্কে আমার মত সংক্ষেপে ব্যক্ত করলাম। অন্য কারো মতের ব্যাখ্যা আমার পক্ষে দেওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু কুটিরশিল্পের সপক্ষে যাঁরা কথা বলেন তাঁদের সঙ্গে সহযোগিতা আমি সহজেই করতে পারি, যদিও তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গী আমি মেনে নিতে অক্ষম।

দুঃখের বিষয় আমরা বর্তমানে সমাজতান্ত্রিক অবস্থার মধ্যে নেই। আমরা আছি একটি অন্তর্বর্তিকালীন অবস্থায় যখন ধনতান্ত্রিক কাঠামোয় ফাটল ধরেছে। এর ফলে বহুবিধ সমস্যা দেখা দিয়েছে। যাই হোক, এটা কিন্তু স্পষ্ট যে আজকেও কংগ্রেসের নীতিই গৃহীত হবে, তার মানে, মূল শিল্প ও জনকল্যাণকর সংস্থাগুলি (যেমন যানবাহন) রাষ্ট্রের অধিকার ও নিয়ন্ত্রণে থাকবে। এখন প্রধান শিল্প বলতে যদি অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ শিল্প বোঝাই, তাহলে আমরা মোটামুটি কিছুটা সমাজতান্ত্রিকরণ লাভ করব। এই নীতির পরিপূরক হিসেবে আমি চাইব যে, যেসব বৃহৎশিল্পের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের মধ্যে দ্বন্দ্বের সম্ভাবনা থাকবে, সেই সব শিল্প সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্রীয় উদ্যমের আওতায় আনতে হবে। তাহলে এক্ষেত্রে রাষ্ট্র যে নীতি গ্রহণ করবে তা বাস্তবে রূপায়িত করতে পারবে। নীতি ও তার রূপায়ণে সংগতি আনা সম্ভব হবে।

গত বিশ বৎসর যাবৎ কংগ্রেসের নীতি সম্পর্কে অভিজ্ঞতা থেকে আমি দৃঢ়তার সঙ্গে বলতে পারি যে, এই সব নীতি অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে সুফলপ্রদ হয়েছে। একথা সত্য যে কংগ্রেস ধরে নিয়েছিল যে বৃহৎশিল্পগুলি স্বাধীনভাবে কোন রকম সাহায্য ছাড়াই নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে, কাজেই কুটিরশিল্পের দিকেই দৃষ্টি নিবদ্ধ করা উচিত। এই পরিপ্রেক্ষিত থেকেই বিষয়টির বিচার করতে হবে। আমাদের সংগঠন ছিল একটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠানমাত্র এবং রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক কাঠামো ছিল আমাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে। এ অবস্থায় বৃহৎশিল্পকে উৎসাহ দানের অর্থ ছিল ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগত কায়েমী স্বার্থকেই উৎসাহ দেওয়া। এর মধ্যে বিদেশী কায়েমী স্বার্থও আছে। আমাদের লক্ষ্য ছিল শুধু নিষ্ক্রিয় ও বেকার মানুষদের কাজ যুগিয়ে উৎপাদন বৃদ্ধিই নয়, অসংখ্য মানুষের অবসরকেও কাজে

জাগানো। ভারতীয় জনসমাজের মধ্যে আত্মবিশ্বাসের ভাব জাগিয়ে তোলা। কংগ্রেস এই ব্যাপারে অনেকটা সাফল্য অর্জন করেছে।

বিশুদ্ধ তত্ত্বের সাহায্যে নিরালম্ব ভাবে শূন্যে রেখে বিষয়টির বিচার করা চলে না। দেশের বাস্তব অবস্থা ও জীবন্ত তথ্যের সঙ্গে একে মিলিয়ে নিতে হবে। মানবিক উপাদানগুলিকে আমরা কখনই উপেক্ষা করতে পারি না। আজকের চীনে কুটিরশিল্পের প্রতি বিশেষ কোন প্রবণতা নেই, কিন্তু ঘটনার চাপে চৈনিকরা অসামান্য দ্রুততা ও তৎপরতার সঙ্গে গ্রামশিল্প ও সমবায় সংস্থাগুলি গড়ে তুলতে বাধ্য হয়েছেন। আমাদের গ্রামোদ্যোগ আন্দোলন সম্পর্কে চীনের আগ্রহের পরিচয় দেখে এলাম। হয়ত কয়েকজন চৈনিক বিশেষজ্ঞ ভারতের গ্রামোদ্যোগ আন্দোলন সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্য আসতেও পারেন এদেশে।

অধ্যাপক সাহা বলেছেন, কুটিরশিল্পগুলিকে সনাতন প্রথা আঁকড়ে থাকলে চলবে না। কেউ কি বলছে তাদের তা আঁকড়ে থাকতে? আধুনিকতম বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সুযোগ নিতে হবে। কিন্তু একথা বলার সময় মনে রাখা দরকার, এখনই কোন্ কোন্ জিনিস সাধারণ গ্রামবাসী পেতে পারে ও নিতে পারে। তার নাগালের বা সামর্থ্যের বাইরে কিছু বললে ত বাস্তববুদ্ধির পরিচয় দেওয়া হবে না। কাজেই যদি সস্তায় সহজে কোন শক্তি ব্যবহার করা যায়, তা করতে হবে। হাল আমলের কুটিরশিল্পের যন্ত্রপাতি যদি খুব দামী হয় বা সহজে তা মেরামতের সুযোগ না থাকে তা দিয়ে বর্তমান অবস্থায় গ্রামবাসী কতটুকু বা উপকৃত হবে? চরকার মত প্রাচীন ও সাধারণ যন্ত্র কাজে লাগে শুধু এই কারণে যে তাতে কিছু-না থেকে কিছু হয় আর অবসর সময়ে তা চালানো যায়। যে গ্রামবাসী চরকা চালায় তাকে সম্ভব হলে কিছু ভাল যন্ত্র নিশ্চয়ই দেওয়া উচিত।

জাপানের যে দৃষ্টান্ত অধ্যাপক সাহা দেখিয়েছেন তা খুব উপযোগী বলে মনে হয় না। সেখানে ত ঠিক কুটিরশিল্প নেই, যা আছে তাকে বলা চলে বিকেন্দ্রীভূত শিল্পসমূহ। পূর্ণাঙ্গ বৃহৎশিল্পের পক্ষে তা কতটা কাম্য তাতে সন্দেহ আছে।

মনে হয়, অধ্যাপক সাহা ধরেই নিয়েছেন যে, ভারতে এমন কিছু লোক আছেন যাঁরা এদেশের অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ শিল্প বিদেশী শোষকদের করায়ত্ত থাকার তাৎপর্য সম্পর্কে অবহিত নন। এজন্য তিনি দোষ দিয়েছেন আমাদের নেতাদের। যেন তাঁদের সম্মতি নিয়েই ঘটছে ব্যাপারটা! আমাদের দেশের শিল্পে বিদেশী কায়েমী স্বার্থের সম্প্রসারণ কোন ভারতীয়ই পছন্দ করেন না, এবং তা রোধ করার নিরবচ্ছিন্ন প্রয়াস বিদ্যমান। অধ্যাপক সাহা যখন বলেন যে, কংগ্রেসী মন্ত্রীরা বড় বড় শিল্পপতিদের (বিদেশীয়রাও আছেন এর মধ্যে) হাতের পুতুল—তখন তিনি তথ্য সম্পর্কে অনভিজ্ঞতারই পরিচয় দেন। মানতেই হয় মন্ত্রীরা যেমনটি চান ঠিক তেমন ভাবেই কাজ করতে পারেন না তাঁরা। পরিবেশের সঙ্গে, ঘটনাবলীর সঙ্গে মানিয়ে চলতে হয় তাঁদের। আজকের যে কোন সরকারই কিছু পরিমাণে ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যে আবদ্ধ। কিন্তু যদি বলা যায় যে মুঘল বাদশাহ্‌দের মতো আমাদের নেতারা বিদেশী বণিকের মানদণ্ডকে রাজদণ্ডে রূপায়িত করার কাজে সাহায্য করছেন তাহলে ভারতের আধুনিককালের ঐতিহাসিক ঘটনাবলী ও সমগ্র রাষ্ট্রীক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক তথ্যাবলী সম্পর্কে সুবিবেচনার অভাবের পরিচয়ই দেওয়া হয়।

বিষয়টি বিরাট। যে দুএকটি দিকের কথা বিশেষভাবে মনে এল সে সম্পর্কেই বললাম। বিষয়টি পূর্ণাঙ্গ আলোচনা ও গভীর চিন্তার উপযোগী। কিন্তু দুঃখের

বিষয় যে মনোভাব নিয়ে অধ্যাপক সাহার পত্রটি রচিত তা বৈজ্ঞানিকও নয়, পক্ষপাতহীনও নয়।

ভবদীয়
জওহরলাল নেহরু

শ্রীকৃষ্ণ কৃপালানি
শান্তিনিকেতন, বাংলা

২৭৫ স্যার্ স্টাফোর্ড ক্রীপ্‌স্ কর্তৃক লিখিত

হাউস অব কমন্স
অক্টোবর ১১, ১৯৩৯

প্রিয়বরেষু,

নেহরু, আপনার দিক থেকে ব্যবস্থা পাকাপাকি হওয়ার অপেক্ষা করছিলাম। সেই জন্যেই এর মধ্যে আর আপনাকে চিঠি দিইনি। ইতিমধ্যে আমি এদিকে যতটুকু পারি তা করবার চেষ্টা করেছি। জেটল্যান্ডের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁকে পরিস্থিতির গুরুত্ব উপলব্ধি করানোর প্রয়াস পেয়েছি। স্বপ্রবৃত্ত হয়ে কিছু কিছু প্রস্তাবও করেছি। কৃষ্ণের সঙ্গে কথা বলে মনে হল সেগুলি সম্পর্কে সাধারণভাবে আপনার অনুমোদন আছে। সেগুলি তিনি [জেটল্যান্ড] ভাইসরয়কে কেব্‌ল করে জানাবেন বলেছিলেন, আমি আশা করি তিনি তা করেও ছিলেন কিন্তু সেটা হল আপনার সঙ্গে ভাইসরয়ের প্রথম সাক্ষাৎকারের আগের দিনের ঘটনা। আমার ত মনে হয় কংগ্রেসের কাজের সপক্ষে আমরা বেশ ভাল রকমের প্রচার করতে পেরেছি। পরিস্থিতির কথা বিবেচনা করলে এই প্রচারকার্যকে বিস্ময়কর রকমের ভাল বলা চলতে পারে। কিন্তু স্বভাবতই, এটা মনে করা ঠিক হবে না যে সাধারণ জনমতের উপর বৈপ্লবিক রকমের প্রভাব বিস্তার করা সম্ভব। আমি মন্ত্রিসভার সমীপে কয়েকটি প্রতিবেদন পাঠিয়েছি। তাতে বর্তমান আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি ও যুদ্ধ-সম্পর্কিত ঘটনাবলীর বিশ্লেষণ করেছি। এই প্রসঙ্গে 'গণতন্ত্র ও স্বাধীনতা'-র কথা বলে সে সুযোগে এই নীতি আমাদের ভারতবর্ষ সম্পর্কিত মনোভাবে কতটা প্রকাশ পাচ্ছে সে প্রশ্ন তুলেছি। কাজেই আমি নিশ্চয় করে বলতে পারি যে মন্ত্রিসভা বিষয়টি সম্পর্কে সচেতন, যদিও ঘটনাবলীর দ্রুত অগ্রগতি, তার বাস্তব অবস্থা ও তাৎপর্য সম্পর্কে তাঁরা কতটা অবহিত তা আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয়। শ্রমিক দল—আপনি জানেন নিশ্চয়ই যে আমি আর এই দলের সদস্য নই—এ ব্যাপারে অত্যন্ত সাহায্যমূলক নীতি গ্রহণ করেছেন এবং সরকারের উপর চাপ দিচ্ছেন। হয়ত আর কয়েক দিনের মধ্যেই বিষয়টি হাউস অব কমন্সের সম্মুখে উপস্থাপন করা সম্ভব হবে। প্রচারকে জোরদার করার এও একটা উপায়।

কিন্তু এসব সত্ত্বেও আমি বুঝছি সম্ভাব্য যতটুকু তার বাইরে কিছু আশা করা আশাতীতের কোঠায় পড়বে। এই সরকার একটি অর্থহীন ভঙ্গীর চেয়ে বেশী কিছু করবেন না,—এইটুকুই আশা করা চলতে পারে। উইনস্টন চার্চিলের অন্তর্ভুক্তির ফলে ভারতের স্বাধীনতাকাঙ্খী সহৃদদের তালিকায় তো আর একটি নাম যোগ হয়নি। যদিও একটা সুবিধে এই যে, তিনি বাস্তব দৃষ্টিকোণ থেকে ঘটনাবলী বিচার করে থাকেন। রাশিয়ার পরিস্থিতি সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী তাঁকে স্বতন্ত্র একটি মর্যাদা দিয়েছে।

আপনার ও কংগ্রেসের উদ্দেশে এই সাবধান-বাণী উচ্চারণ করা নিষ্প্রয়োজন যে তাঁদের দাবির উত্তরে, সত্যকার কাজ হবে না এমন কিছু তাঁরা যেন কিছুতেই গ্রহণ না-করেন। কাজ চাই, তবেই বোঝা যাবে তার পিছনে ফাঁকা বুলি নেই।

তবেই কথায় আসবে বিশ্বাস। কংগ্রেসকে দাবির ব্যাপারে পর্বতের মত অচল অটল থাকতে হবে। আর তার ফলে ব্রিটিশ ও ভারতীয় উভয় জাতির জনসাধারণের কল্যাণ হবে। বলা বাহুল্য, আমি গৌণ কোন বিষয়ের উল্লেখ করছি না। আমি জানি, স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের মুখ্য দাবি একবার স্বীকৃত হলে, গৌণ ব্যাপারগুলির ব্যাপারে আপসে আপনার আগ্রহের অভাব হবে না।

এখন দাবির ব্যাপারে দৃঢ় না হলে কোনদিনই এমন কোন মীমাংসায় উপনীত হওয়া যাবে না যা আমাদের দুই জাতিকে যুক্ত করবে। এবং তা না হলে আমার আশঙ্কা—বোধহয় আপনারও—একপক্ষে হিংসামূলক কর্মপদ্ধতি ও অপরপক্ষে দমননীতির আকারে পুঞ্জীভূত বিদ্বেষ ও হিংসা প্রকাশ পাবে।

ইউরোপের অবস্থা সম্পর্কে যা মনে হয় সে সম্বন্ধে দু-একটি কথা বলি। 'দি ট্রিবিউন'-এ প্রকাশিত আমার প্রবন্ধগুলি আপনি হয়ত দেখে থাকবেন। তা থেকে আপনি বুঝবেন আমার মনের গতি কোন দিকে। যদিও এই প্রসঙ্গে বর্তমানে সেন্সার সম্পর্কিত কড়াকড়ির কথা মনে রাখতে হবে। কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আমার মতামতের আর কোন পরিবর্তনই হয়নি এর মধ্যে। কিন্তু বুঝতে পারছেন অনেক কথা যত খোলাখুলি বলতে ইচ্ছে করে, ততটা বলা যায় না। আমি যতক্ষণ বর্তমান যুদ্ধকে সমর্থন করছি ততক্ষণ এমন কিছু বলতে পারি না, জার্মান বেতার যা উদ্ধৃত করে এই দেশের বিরুদ্ধে অপপ্রচার করবার সুযোগ পায়!!

এটা খুবই স্পষ্ট যে জার্মানি ও রাশিয়ার নব-রূপায়ণের ফলে অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে। ফরাসী সরকার কর্তৃক একটি সুবৃহৎ রাজনৈতিক দলের বিরুদ্ধে দমননীতি অবলম্বন, ইতালির কার্যকলাপ, ভারত সম্পর্কে আমাদের সরকারের মনোভাব, ঔপনিবেশিক সমস্যাবলী—এসবই প্রমাণ করছে, দালাদিয়ের গতকাল যা বলেছেন, যে, এ যুদ্ধ আদর্শের লড়াই নয়। তাঁর একথা একটি দুঃখদায়ক ও মারাত্মক সত্যের স্বীকৃতি। কিছু লোক আছেন অবশ্য যাঁরা এখনও মনে করেন যে আমরা লড়ছি স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের জন্য। কিন্তু এখন পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে আগের মত বর্তমান যুদ্ধও, আদর্শের অছিলায় সাম্রাজ্যবাদের প্রাণরক্ষার্থে সংগ্রাম। সন্দেহ নেই, এ লড়াই মরণপণ লড়াই। আর যদি দেখা যায়—যা মোটেই অসম্ভব নয়—রাশিয়া, আমাদের ও জার্মানির—উভয়েরই বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে তবে অবস্থা খুবই খারাপ হবে। অবশ্য এসব থেকে আরও বোঝা উচিত যে ভারতের জনগণের সঙ্গে একটা সুমীমাংসার জন্যে সর্বশক্তি নিয়োগ করা কর্তব্য।

যুদ্ধের লক্ষ্য সম্পর্কে ব্রিটিশ সরকার এতাবৎকাল যা করেছেন তার চেয়ে সুস্পষ্ট ও পরিষ্কার ভাবে ঘোষণা যদি না করেন, এবং এযাবৎ উক্ত শূন্যগর্ভ প্রতিশ্রুতি-গুলিকে সত্যিই যদি কার্যে রূপায়িত না করেন তাহলে, এদেশে জনমতের মধ্যে গভীর ও বিস্তৃত পার্থক্য রয়েই যাবে। দমননীতির দ্বারা তা প্রকটতর হবে মাত্র। তার কিছু কিছু চিহ্ন এখনই চোখে পড়ে।

দুর্ভাগ্যের বিষয়, গত কয়েক বছরের ঘটনাবলী বর্তমান সরকারের প্রতিষ্ঠার ভিত্তি দৃঢ়তর করে তুলেছে, এবং বর্তমানে সরকার-পরিবর্তনের কোন সম্ভাবনাই নেই। কিন্তু একমাত্র সেই পরিবর্তনের দ্বারাই কাঙ্খিত লক্ষ্যে উপনীত হওয়া সম্ভব।

এই ঘোর কালো মেঘের একটি রূপালী পাড় অবশ্য আছে। অনেক লোকই—তাঁদের মধ্যে অতিশয় গোঁড়া সংরক্ষণশীল টোরিরাও আছেন—ভাবতে শুরু করেছেন যে আমাদের এই জীর্ণ সভ্যতার অন্তকাল আসন্ন। তাঁরা প্রস্তুত হচ্ছেন নতুন এক সভ্যতার ভিত্তিপত্তনে যোগ দেওয়ার জন্য, যাতে কোন কায়েমী স্বার্থ—এমনকি তাঁদের নিজেদেরও

থাকবে না। ব্যাপারটি নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ। এ'রা জানতে উৎসুক যে কিসের জন্যে লড়ছি আমরা। বর্তমানে ঘোষিত উদ্দেশ্যগুলির জন্যেই শুধু যদি যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া হয় তবে ভারতের মত এখানেও অসন্তোষ ধূমায়িত হয়ে উঠবে। এই কথাটাই সরকারকে বোঝাবার জন্যে আমি প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি, এবং আমার বিশ্বাস, এমনকি মন্ত্রিসভার মধ্যেও কিছুটা জাগরণের ভাব দেখা যাচ্ছে। মুশকিল হচ্ছে, চিরকাল যা হয়েছে, পুরোপুরি জেগে উঠতে খুবই দেরি হয়ে পড়বে। আর এই কারণের জন্যেও আমি চাই কংগ্রেস তার ঘোষণা সম্পর্কে পর্বতোপম দৃঢ়তা অবলম্বন করবে। তাতে সরকারকে এই কথাটা বোঝাতে আমাদের সুবিধে হবে যে, কাজ করতেই হবে এবার, ওঁরা [ভারতীয় জনগণ ও কংগ্রেস] অস্পষ্ট প্রতিশ্রুতিতে সন্তুষ্ট থাকতে নারাজ। ওই ধরনের প্রতিশ্রুতির উপর বিশ্বাস আর নেই তাঁদের।

আপনার ও কংগ্রেসের উদ্দেশে আমার শুভেচ্ছা নিবেদন করি। দীর্ঘ আলাপের সুযোগ যদি পাওয়া যেত!

আপনার
স্টাফোর্ড ক্রীপ্‌স

২৭৬ রজার বলড্‌উইন কর্তৃক লিখিত

নিউ ইয়র্ক সিটি
অক্টোবর ১২, ১৯৩৯

প্রিয় জওহরলাল,

আপনার 'গ্লিমপ্‌সেস অব ওয়র্ল্ড হিস্‌টরি' বইটি উপহার পেয়ে কৃতজ্ঞতা বোধ করছি। বইটির গঠনসজ্জা ভারি পরিপাটি আর তেমনই চমৎকার এর পাণ্ডিত্যপূর্ণ তথ্যসংগ্রহ আর সুচারু পরিবেষণ পদ্ধতি।

ভাবতে বিস্ময় লাগে, কারার নির্জনতায় এই তথ্যের স্তূপ আপনি যোগাড় করলেনই বা কেমন করে আর এমন সুন্দর করে সাজাতেই বা পারলেন কী করে! আমি হলে ত বিপন্ন বোধ করতাম এই সুপ্রচুর তথ্যের সামনে দাঁড়ালে—আর তা সাজিয়ে তোলা তো মনে হত একটি সারা জীবনের কাজ বলে। যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কে আপনার মতামত অভিনিবেশ সহকারে পড়েছি। সুন্দর হয়েছে এক বৎসর পূর্বে পৃথিবী যে সংকটের কিনারায় গিয়ে পড়েছিল তার বর্ণনা।

আশঙ্কা কি সম্পূর্ণ বিদূরিত হয়েছে? ইতিহাসের এক বিধ্বংসকর রূপান্তরের মধ্যে রয়েছি আমরা। এত যে ঝুঁকি একি বয়ে আনছে বিশ্বরাষ্ট্র, অস্ত্র-বর্জন, অবাধ বাণিজ্য ও স্থায়ী শান্তির উপযোগী পরিবেশ—না, নূতন স্বৈরাচারের সম্ভাবনা? আমি স্বভাবে আশাবাদী। কিন্তু যা দিনকাল আশাবাদ জিইয়ে রাখা কি সোজা কথা! কাগজপত্তর থেকে জানছি যে ভারতেরও খুব সুদিন যাচ্ছে না। কংগ্রেসের কাজকর্ম, তার আভ্যন্তরিক মতভেদ এই সব সম্পর্কে বেশ বিস্তারিত খবরই পাওয়া যায় এখানকার সংবাদপত্রগুলিতে। আপনার বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কার্যাবলীর সংবাদও পেয়ে থাকি।

সপ্রশংস শ্রদ্ধা জানাই,

আপনার বিশ্বস্ত বন্ধু
রজার বলড্‌উইন

২৭৭ রঘুনন্দন শরণ কর্তৃক লিখিত

দিল্লী
অক্টোবর ১৪, ১৯৩৯

ব্যক্তিগত ও গোপনীয়
প্রিয় পণ্ডিতজী,

আপনি দিল্লী থেকে যাওয়ার দিন দুই পরে একদিন নবাবজাদার কাছ থেকে ফোনে আহ্বান পেয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাই। যদিও আমাদের মধ্যে সুস্পষ্টভাবে কোন বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়নি কিন্তু এটা বোঝা গেল যে মিস্টার জিন্নার সঙ্গে আপনার আলোচনার কোন ফল হবে বলে আপনি মনে করেন কিনা—তা জানতে তিনি আগ্রহান্বিত। এও মনে হল যে তিনি আন্তরিকভাবে হিন্দু-মুসলমান সমস্যার মীমাংসা প্রার্থনা করেন।

এর কিছু পরেই সুভাষ দিল্লীতে আসেন। এসে পেৌঁছানো'র কিছু পরেই তিনি ফোন করে আমায় দেখা করতে বলেন। আমি যথাশীঘ্র সম্ভব তাঁর সে আদেশ পালন করি এবং আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎকারের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ তাঁকে জানাই। কেন জানিনা তাঁর ভুল-ধারণা হয়েছে যে 'স্টেট্সম্যান'-এ প্রকাশিত রিপোর্টটির প্রকাশের পিছনে উস্কানি ছিল। আমি অবশ্য বললাম তাঁকে যে এরকম ধারণা ঠিক নয়। ভাইসরয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের আগে তিনি মিস্টার জিন্নার সঙ্গে দেখা করতে পারেননি। তা করবার সময়ও অবশ্য তাঁর ছিল না। এখানে উল্লেখ করা দরকার যে মিস্টার জিন্না তাঁকে অনুরোধ করেছিলেন ভাইসরয়ের প্রাসাদে যাওয়ার আগে তাঁর ওখান থেকে হয়ে যেতে। কাজেই বিকালের দিকে তাঁদের সাক্ষাৎকার ঘটে। রাত্রে লালা শঙ্করলাল বলেন আমায়, হাইকমাণ্ডের অবিশ্বাসই মীমাংসার অন্তরায় এবং সুভাষের উপর সব ভার অর্পণ করলে আর কোন অসুবিধেই থাকবে না। একথা বিশ্বাস করা আমার পক্ষে সহজ হয়নি। তাই পরদিন সকালে সুভাষের সঙ্গে দেখা করি। রাত্রে লালা শঙ্কর লাল যা বলেছিলেন সুভাষও প্রায় সেই কথাই বললেন। এতে তাঁর কাছ থেকে জানতে চাই যে, মিঃ জিন্না আপনার সহকর্মীদের মতো আপনাকেও সমান অবিশ্বাস করেন কিনা। এই প্রশ্নে তিনি প্রথমটা একটু বিব্রত হয়ে পড়েন। পরে বলেন যে যদি আপনি প্রথমে ব্যক্তিগত ভাবে মিঃ জিন্নার সঙ্গে আলাপ করে আপনার সিদ্ধান্ত সম্পর্কে সহকর্মীদের সম্মতি সংগ্রহ করতে পারেন তাহলে মিঃ জিন্নার সঙ্গে পরবর্তী আলোচনার পথ প্রশস্ত হতে পারে। মিঃ জিন্না, তাঁর মতে, মূর্তিমান অহংকার। আর জিন্না সাহেবের সঙ্গে কী ভাবে চলা উচিত তা শুধু জিন্নাই জানেন। আমি তাতে এই কথা বলেছিলাম যে আপনি [নেহরুজী] যদি মিঃ জিন্নার সঙ্গে পরে আলাপ করেন তখন তাঁর [সুভাষবাবুর] সহযোগিতা ও পরামর্শ অবশ্যই পাওয়া যাবে ও গৃহীত হবে। এতে তিনি বলেন যে, কংগ্রেসে তাঁর কোন মূল্য নেই, তাই তাঁর আশংকা এ ব্যাপারে বেশী কিছু করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। আমি বলেছিলাম এ অনুমান যথার্থ নয়। যাই হোক তিনি আমায় মিঃ জিন্নার সঙ্গে তাঁর আলোচনার পর তাঁর সঙ্গে একবার দেখা করতে বলেন। আমি তা করেছিলাম। তিনি আমায় বলেন মিঃ জিন্না সানন্দে আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ ও আলোচনা করতে প্রস্তুত, অবশ্য তার আগে তিনি জেনে নিতে চান যে ওয়ার্কিং কমিটি তাঁদের পক্ষে এই আলোচনা চালানোর দায়িত্ব আপনাকে অর্পণ করেছেন।

সত্যি বলতে কি, সুভাষ আমায় যা-কিছু বলেছিলেন তা আমি বিশ্বাস করিনি। না-করার যথেষ্ট কারণ আছে। উভয়পক্ষের সাধারণ বন্ধুরা বলেছেন যে [আপনার

সঙ্গে] আলোচনার দ্বারা মিঃ জিন্না গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন এবং তিনি আশা করেছিলেন আলোচনা আবার শুরু করা হবে। একথার সত্যতা যাচাই করার জন্যে আমি নবাবজাদার সঙ্গে আবার দেখা করেছিলাম। খুব আন্তরিকতার সঙ্গে তিনি কথাবার্তা বললেন। তিনি শুরু করলেন এই মন্তব্য দিয়ে যে আমাদের নেতারা এই শুভক্ষণের পূর্ণ সদ্ব্যবহার যদি করতেন তাহলে স্বাধীনতা অর্জনের এই সুযোগ অবহেলিত হত না। সাম্প্রদায়িক ভেদ সত্যিই কিছু অনতিক্রম্য নয়। আমি বললাম আমায় এবং আমার মনে হয় শুভবুদ্ধিসম্পন্ন প্রতিটি মানুষের—সায় আছে তাঁর কথায়। আমি জানতে চাইলাম যে আপনার সঙ্গে মিঃ জিন্নার আলোচনা অত সুন্দরভাবে শুরু হয়েও শেষ পর্যন্ত যুক্তিসঙ্গত পরিণামে পেঁছিতে পারল না কেন? তিনি একটু বিস্মিত হয়ে বললেন যে, মিঃ জিন্না আলোচনার মূল ভিত্তিগুলি সম্পর্কে তাঁর মত জানিয়েছিলেন আপনাকে এবং তারপর তিনি ধরেই নিয়েছিলেন পরবর্তী কার্যক্রম আপনিই ঠিক করে নেবেন। আপনিই জানাবেন যে তাঁর দেওয়া সূত্র মেনে নিয়ে আপনি পরবর্তী আলোচনা করবেন কিনা। তিনি আরও বললেন যে মিঃ জিন্নার বর্তমান মনোভাব খুবই ধীর ও বন্ধুত্বপূর্ণ, মতানৈক্য তিনি যতদূর সম্ভব এড়িয়ে চলতে চান। তিনি একথাও বললেন যে আলোচনা করার জন্যে আপনিই সবচেয়ে যোগ্য ও কাম্য ব্যক্তি। নবাবজাদা এও জানালেন যে বর্তমান কার্যক্রম অনুসারে মিঃ জিন্না আরও কয়েকদিন আছেন দিল্লীতে। আর এ সম্পর্কে যদি কিছু করতেই হয় তবে সরকার পক্ষ থেকে কোন ঘোষণার পূর্বেই তা করা বাঞ্ছনীয়। আপনি যদি মনে করেন মিঃ জিন্নার সঙ্গে দেখা করে কোন কাজ হবে তাহলে আমায় তা জানাবেন। আমি উপদেশানুসারে কাজ করতে প্রস্তুত।

আপনি জেনে হয়ত কৌতূহলী হবেন যে সুভাষবাবু মুফতি কিফায়েৎউল্লা ও জমায়েত-উল-উলেমার অন্যান্য নেতৃবৃন্দের সঙ্গে দেখা করেছেন। তিনি ফরওয়ার্ড ব্লকের প্রতি তাঁদের সমর্থন প্রার্থনা করেছেন। তিনি স্পষ্ট বলেছেন যে, কংগ্রেস যে সিদ্ধান্তই গ্রহণ করুন না কেন তাঁরা ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে কোন আপসের সপক্ষে থাকবেন না। এই সরকারের সঙ্গে তাঁরা লড়তে চান। মুফতি সাহেব তাঁকে পরামর্শ দিয়েছেন ধৈর্য ধারণ করতে এবং কংগ্রেস কী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তা দেখার জন্যে অপেক্ষা করতে। হঠ করে কিছু করা ঠিক হবে না। জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলি ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করবে এটাই কাম্য। সুভাষবাবু কিছুটা হতাশ হয়েই ফিরেছেন।

আশা করি ভাল আছেন।

শ্রদ্ধাপূর্ণ নমস্কার জানাই। ইতি।

নন্দন

২৭৮ রঘুনন্দন শরণ কর্তৃক লিখিত

দিল্লী

অক্টোবর ১৭, ১৯৩৯

শ্রদ্ধেয় পণ্ডিতজী,

আপনার চিঠি পেয়েই আমি নবাবজাদার সঙ্গে যোগাযোগ করি। তিনি আমায় ফোন করে জানান যে মিঃ জিন্না ব্যাপারটি নিয়ে আমার সঙ্গে একটু কথা বলতে চান। আমি যাই তাঁর কাছে। ফিরে এসেই এই চিঠি লিখতে বসেছি।

তিনি যথেষ্ট সৌজন্যের সঙ্গে আমায় অভ্যর্থনা করেন। ১৯২২-এর স্মৃতিকথা দিয়ে তিনি আলাপ শুরু করেন। সেই সময় আমি প্রায়ই যেতাম তাঁর বাড়িতে। দেখা সাক্ষাৎ হত তাঁর সঙ্গে। তাঁর স্ত্রীর সঙ্গেও। তিনি খুব সহৃদয়তার সঙ্গে

বলছিলেন সেই সব দিনের কথা। খোশ মেজাজে ছিলেন মনে হল। রসিকতাও করলেন একটু আধটু।

তিনি আমায় অনেক করে বললেন আপনাকে এই কথা মনে করিয়ে দিতে যে, আপনি যেন কিছুতেই মিথ্যাপ্রচার বা কানাঘুষায় কর্ণপাত না করেন। অনেক কথায় তিনি যা বললেন তার মর্ম এই যে, সুভাষ এবং তাঁর মত কথাবার্তা যাঁরা বলেন তাঁদের একটি কথাও যেন বিশ্বাস না করা হয়। তিনি বললেন যে, তিনি ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের বিশ্বাস করেন না,—এমন কথা তিনি কাউকে বলতে পারেন—এটা একেবারেই অচিন্তনীয়। বরং তিনি তাঁদের অনেককেই শ্রদ্ধার চোখে দেখে থাকেন। আপনার কথা উল্লেখ করে বললেন যে আপনি তাঁর বিশেষ প্রীতির পাত্র এবং আপনার চারিত্র এবং সততা গভীর শ্রদ্ধার যোগ্য ইত্যাদি। তারপর তিনি বললেন যে, হিন্দু-মুসলমান সমস্যা সম্পর্কে তাঁর দিক থেকে যা-কিছু বলার সে সবই তিনি বলেছেন। এখন পরবর্তী কার্যক্রম আপনাকেই ঠিক করতে হবে। তিনি নাকি আপনাকে স্পষ্ট অনুরোধ করেছিলেন আপনার সহকর্মীদের সঙ্গে কথাবার্তার পর আবার আলোচনা আরম্ভ করার জন্য। ভাইসরয়ের সঙ্গে তাঁর আলাপের প্রসঙ্গেও তিনি নাকি বলেছিলেন যে দরকার হলে ওই সাক্ষাৎকারের পর তিনি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে। তিনি আশা করেছিলেন, সহকর্মীদের সঙ্গে আপনার আলোচনার পর হিন্দু-মুসলমান সমস্যা নিয়ে আবার আলোচনা হবে আপনাদের মধ্যে। বিষয়টির নিষ্পত্তি যে বন্ধুত্বপূর্ণ আলোচনার মাধ্যমে হতে পারল না, এটা সত্যিই একটা ট্রাজেডি—বললেন তিনি! আমাদের পার্থক্য বেশী নয় সত্যিই। আমাদের পরস্পরের মধ্যে যতটা ব্যবধান আছে বলে আমরা কল্পনা করছি, প্রকৃতপক্ষে তার চেয়ে অনেক কাছাকাছি আছি আমরা। যদিও আমরা তা বুঝছি না। —বললেন একথা। তিনি বললেন আপনার সঙ্গে আবার আলাপ-আলোচনার প্রস্তাবকে তিনি সাগ্রহ-স্বাগত জানাবেন। এখানে তিনি বাইশ তারিখ পর্যন্ত থাকবেনই। ওই তারিখেই তিনি ওয়ার্কিং কমিটির [মুসলিম লীগের] বৈঠক আহ্বান করেছেন। তারপর তিনি কোথায় যাবেন বা থাকবেন এখনও তার কিছু ঠিক নেই।

একজন সংবাদপত্র-প্রতিনিধি তাঁর কাছে এসেছিলেন। ভাইসরয়ের ঘোষণার—বলা উচিত—আগামীকাল প্রকাশিতব্য ভাইসরয়ের বক্তব্যের—অগ্রিম সংবাদ নিয়ে এসেছিলেন তিনি। মনে হল মিঃ জিন্না তার মর্ম জেনে অত্যন্ত বিরক্ত ও হতাশ হয়েছেন। আমি সন্ধেবেলায় ওই ঘোষণাটি জেনেছিলাম এবং আমি নিজেও হতাশ হয়েছি ব্যাপারটিতে। আমার ধারণা এর ফলে মিঃ জিন্নার মনোভাব আরও ভাল হতে পারে। ওই ঘোষণাটি যা আশা করা গিয়েছিল তার চেয়েও খারাপ। এর চেয়ে প্রতিক্রিয়াশীল ও হীন আর কিছু হতেই পারে না। আমি তো ভাবছি তল্পিতল্পা গুটিয়ে জেলের দিকেই পা বাড়াই।

আমার মত আমি পেশ করছি এইখানে। বোঝাপড়ার সময় এসেছে। মিঃ জিন্না ঠিক মেজাজে আছেন। তাঁকে চিঠি লিখে তাঁর সঙ্গে দেখা করুন না কেন? এটা তো সত্যি যে, আপনারা দুজনে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হবেন দুটি প্রতিষ্ঠানই তা মেনে নেবে!

আশা করি সুস্থ ও সবল আছেন। শ্রদ্ধা রইল। ইতি।

নন্দন

পুনশ্চ। আমি বলতে ভুলে গিয়েছি যে, আমি দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের কথা উল্লেখ করে এসেছি। মুসলিম লীগ যেন কংগ্রেসের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি

সমর্থন করে। আর আমরা দুই জাতি—হিন্দু ও মুসলমান—এ তত্ত্ব যেন বর্জন করে। তিনি এ বিষয়ে স্পষ্ট কোন উত্তর দেননি। তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভাবেই সম্মতি বা অসম্মতি কোনটাই জানাননি। আলোচনার বিষয় ও পদ্ধতি দুটোই কিন্তু ক্রমেই মধুরতর হয়ে উঠেছিল। তাঁর মত বোঝাবার জন্যে তিনি যে ভাবে আমার সঙ্গে কথা বলেছিলেন তা যদি অন্যেরা বিশ্বাস করতেন তাহলে মনে হয় তাঁর সঙ্গে মীমাংসায় উপনীত হওয়ায় কোন বাধাই থাকত না। আমার একথা বলতে এতটুকু দ্বিধা নেই যে, লীগের অন্যান্য কোন নেতা শ্রেষ্ঠত্বে কোন দিক দিয়েই তাঁর ধারে কাছেও পেঁছন না। আমি অনুভব করছিলাম আমি এমন একজনের সঙ্গে কথা বলছিলাম যাঁর ভিতর সত্যিই কিছু 'বস্তু' আছে। তাঁর সম্পর্কে আমার ধারণা এই যে, যদিও আমরা সব বিষয়ে একমত নই, তাহলেও তাঁকে বিশ্বাস করা যায়, তাঁর উপর নির্ভর করা যায়।

পত্রবাহক এই চিঠির উত্তরের জন্য অপেক্ষা করবেন। যদি আপনি মিঃ জিন্নাকে কিছু লিখতে চান ত আপনি পত্রবাহক মারফৎ পাঠাতে পারেন। মিঃ জিন্নার হাতে সেটি যাতে এখনই পেঁছয় আমি নিজে তার ভার নেব।

শ্রদ্ধা জানাই। নন্দন

২৭৯ জওহরলাল নেহরু কর্তৃক লিখিত

লখনউ

অক্টোবর ১৮, ১৯৩৯

ব্যক্তিগত

প্রিয়বরেষু জিন্না,

গতকাল আপনার সঙ্গে নন্দনের যে সাক্ষাৎকার ও কথাবার্তা হয়েছিল তিনি তার কথা আমায় পত্র মারফৎ জানিয়েছেন। আমাদের মধ্যে যে একটু ভুল বোঝাবুঝি হয়ে গিয়েছে সেজন্যে আমি সত্যিই খুব দুঃখিত। আপনি ভেবেছিলেন আমি বুঝি দিল্লীতে আবার দেখা করব আপনার সঙ্গে। আর আমার ধারণা হয়েছিল আপনি ফোনে কথা বলবেন আমার সঙ্গে। সত্যি বলতে আমি আপনার সঙ্গে আবার দেখা হওয়ার জন্যে অপেক্ষা করছিলাম আর ভাবছিলাম আপনার তরফ থেকে কোন আহ্বান বা বাণী এই বুঝি এল। অবশ্য এটা ভাইসরয়ের সঙ্গে সেই কথাবার্তার প্রসঙ্গে। আমাদের অন্য আলাপটি দীর্ঘ হলেও, সাধারণ ধরনের হয়েছিল। আমি আর একবার সুযোগ খুঁজছিলাম বিষয়টি নিয়ে বিশেষভাবে ও বিস্তৃতভাবে আলোচনা করার।

আমি সানন্দে আবার দেখা করব আপনার সঙ্গে। আমার সময় থাকলে আমি এখনই দিল্লী গিয়ে আপনার সঙ্গে দেখা করতাম। কিন্তু হয়েছে কি, কাল যাচ্ছি এলাহাবাদ, সব ঠিকঠাক হয়ে গিয়েছে। সেখানে কয়েক ঘণ্টা মাত্র কাটিয়ে যেতে হবে ওয়ার্ধায়। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে। আপনিও তো মনে হয় আগামী কয়েকটি দিন খুবই ব্যস্ত থাকবেন। ভাইসরয়ের ঘোষণা প্রকাশ পেলেই ঘটনাবলীর গতি দ্রুততর হয়ে উঠবে। তাই, আগে থেকে কার্যক্রমের কথা বলা যায় না। যাই হোক, ওয়ার্ধা বৈঠকের পর, আপনার সঙ্গে দেখা করার জন্যে আমি খুব চেষ্টা করব; বোম্বাই অথবা দিল্লী, যেখানে আপনার সুবিধা। আপনি যদি বোম্বাই যান তাহলে আমি ওয়ার্ধা থেকে চলে যাব সেখানে। আর না হয় দিল্লীই যাব।

হিন্দু-মুসলমান সমস্যাটির সমাধান এতদিন বন্ধুতার পথে হয়নি—এটা যে

একটা ট্রাজেডি, এ ব্যাপারে আমি আপনার সঙ্গে একমত। এই জন্যে আমি খুব দুঃখবোধ করি। লজ্জাও অনুভব করি একথা ভেবে যে ঠিক এই সমস্যার সমাধানের ব্যাপারে আমি উল্লেখযোগ্য কোন কাজ করতে পারিনি। আপনার কাছে অকপটে স্বীকার করছি যে এই ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসও আমি ফেলেছি হারিয়ে। যদিও এমনিতে আত্মপ্রত্যয় যে আমার নেই এমন নয়। কিন্তু গত দু তিন বছরের ঘটনাবলী প্রভাবিত করেছে আমাকে। আমার মন থাকে অন্য স্তরে, আমার আগ্রহ সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয়ে। আর তাই, যদিও আমি বিষয়টি নিয়ে অনেক ভেবেছি, এর জটিল গ্রন্থিগুলি কোথায় কোথায় রয়েছে তাও বুঝি, তবু আমার অন্তরের সঙ্গে এর কোথাও কোন যোগ নেই, এই ব্যাপারে নিজেকে যেন কেমন বিদেশী-বিদেশী বলে মনে হয়। তাই এই ব্যাপারে কথা বলায় আমার এত দ্বিধা।

কিন্তু তার মানে এই নয় যে সমস্যাটির সমাধানে সহায়তা করতে আমি অনিচ্ছুক। আমার যতটুকু সাধ্য তা আমি করব, করতে চাই। আপনার শুভেচ্ছা, এবং মুসলিম লীগে আপনার যে প্রশ্নাতীত প্রভাব তা আমার সপক্ষে থাকলে এর সমাধান যতটা কঠিন বলে মনে করা হয়, ততটা কঠিন নাও হতে পারে। আমি বলছি আপনাকে, ওয়ার্কিং কমিটির প্রত্যেকটি সদস্যই এর সুসমাধান কামনা করেন। এ ব্যাপারে যে এতদিনেও আমরা কোন সমাধানে উপনীত হতে পারলাম না, এটা আমাদের সকলের পক্ষে একটা বিস্ময় ও দুঃখের কথা। কারণ, শেষ পর্যন্ত, মতানৈক্যের কারণগুলি মিটিয়ে নেওয়া উচিত ছিল। সম্ভবও ছিল।

সেজন্যে ওয়ার্ধা বৈঠকের পর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আপনার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে আমি চেষ্টা করব। আপনি কি অনুগ্রহ করে আমার আপনার কর্মসূচী জানাবেন? আমাদের দেখা হলে আমি সানন্দে বিষয়টির প্রত্যেকটি দিক নিয়ে আলোচনা করব। কিন্তু আমার মনে হয় পরবর্তী পর্যায়ে কংগ্রেস ও লীগের নির্বাচিত কয়েকজন প্রতিনিধির মধ্যে দেখাসাক্ষাৎ ও আলাপ-আলোচনা হলে ভাল হবে বলে মনে হয়।

বর্তমান মুহূর্তে যেসব ঘটনাবলী দ্রুত ঘটে চলেছে তার প্রতি আমার দৃষ্টি নিবদ্ধ। জানিনা কয়েক সপ্তাহ পরে তারা কোথায় পৌঁছে দেবে আমাদের। ভাইসরয়ের ঘোষণা আমাদের বিস্মিত করেছে। আমাদের সকলের উদ্দেশে এ এক সাম্রাজ্যবাদী চ্যালেঞ্জ। আমি যতদূর দেখতে পাচ্ছি তাতে মনে হচ্ছে কংগ্রেসের সামনে একটিমাত্র পথই খোলা আছে। তা হল এটিকে পুরোপুরি প্রত্যাখ্যান করা। কিন্তু তার সুদূরপ্রসারী প্রতিক্রিয়া অবশ্যম্ভাবী। আমাদের উপর তো বটেই, অন্যদের 'পরেও। আমি জানিনা আপনি এবং মুসলিম লীগে আপনার যেসব বন্ধুরা আছেন তাঁরা কি ঠিক করবেন। কিন্তু আমার একান্ত বিশ্বাস এই যে, ভাইসরয়ের বিজ্ঞপ্তির বক্তব্য সম্পর্কে তীব্র আপত্তি প্রকাশ করবেন আপনারা। তাঁর নির্দেশিত পন্থায় সহযোগিতা করতে অস্বীকার করবেন। আমি তীব্রভাবে অনুভব করছি ভারতবাসী হিসেবে আমাদের আত্মসম্মান ও মর্যাদাকে অপমান করা হয়েছে। তারা ভেবেছে আমরা বুঝি তাদের কৃপাপাত্র, তাদের বশংবদ অনুচর, হুজুরদের হুকুমের প্রত্যাশী।

লখনউ-এর 'ন্যাশনাল হেরাল্ড' আপনি পড়েন কিনা আমি জানিনা। আজ সকালে তাতে আমার একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। আর একটি আগামীকাল প্রকাশিত হবে। প্রবন্ধ দুটিতে সংযত ভাষায় ভাইসরয়ের ঘোষণা সম্পর্কে আমার মনের প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পেয়েছে। সে দুটি এই সঙ্গে পাঠালাম।

আগামীকাল, বৃহস্পতিবার ১৯শে অক্টোবর, আপনাকে ফোন করার চেষ্টা

করব। আমার ভবিষ্যৎ কর্মসূচী হচ্ছে ২০শে অক্টোবর এলাহাবাদ, ২১শে ওয়ার্ধা ইত্যাদি।

দিল্লীতে আপনার সঙ্গে দেখা করে খুব খুশী হয়েছিলাম—কথাটি আর একবার মনে করতে ভাল লাগল।

ভবদীয়
জওহরলাল নেহরু

এম· এ· জিন্না এস্কোয়ার, নয়া দিল্লী

২৮০ মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক লিখিত

সেবাগ্রাম, ওয়ার্ধা
অক্টোবর ২৬, ১৯৩৯

প্রিয় জওহরলাল,

লক্ষ্য করছি, আমার প্রতি তোমার প্রীতি ও শ্রদ্ধা যদিচ অক্ষয়, তথাপি, ক্রমবর্ধমান পরস্পরের দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য। ইতিহাসের জটিলতম সন্ধিক্ষণ সম্ভবত সমুপস্থিত। যেসব গুরুতর প্রশ্ন আমাদের অভিনিবেশ দাবি করছে সেগুলি সম্পর্কে অচলপ্রতিষ্ঠ মতামত আছে আমার। মতামত আছে তোমারও। এবং সে মত সুদৃঢ়। উভয়ের মতামতের পার্থক্য বিদ্যমান। এই পার্থক্য উভয়ের প্রকাশভঙ্গীর মধ্যেও পরিলক্ষিত। আমি যেসব মতামত দৃঢ়তার সঙ্গে পোষণ করি অন্যদের [ওয়ার্কিং কমিটির অন্যান্য সদস্যদের] সমর্থন তাতে আছে কিনা তা আমার অজ্ঞাত। আমি রয়েছি এইস্থানে। জনতার সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ নেই আমার, যোগ নেই কংগ্রেসকর্মীদের সঙ্গেও। আমার মন বলছে, যদি তোমাদের সকলকে সঙ্গে না পাই তবে নেতৃত্ব গ্রহণ করব না আমি। ওয়ার্কিং কমিটির মধ্যে মতানৈক্য আমার অকাম্য। আমি চাই, তুমি এগিয়ে এস, ভার নাও, গ্রহণ কর নেতৃত্ব, দেশকে তোমার সঙ্গে এগিয়ে নিয়ে চল। আমাকে ছেড়ে দাও, আমার স্বীয় মত অকুণ্ঠিত কণ্ঠে ব্যক্ত করবার জন্যে। আর তোমরা যদি চাও, আমি বেছে নেব পরিপূর্ণতম নৈঃশব্দ, অটুট মৌন। এতটুকু দ্বিধা, সামান্যতম সংশয় নেই আমার যে এই নির্দেশ আমি পারব মেনে নিতে, পালন করতে। যদি চাও, আসতে পারো সমস্ত বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করার জন্যে।

ভালবাসা
বাপু

২৮১ মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক লিখিত

রেলওয়ে স্টেশন
দিল্লী
নভেম্বর ৪, ১৯৩৯

প্রিয় জওহরলাল,

তুমি চলে যাওয়ার ঠিক পরেই, কৃপালনি আমায় বললেন যে যুক্ত প্রদেশে নাকি আইন অমান্যের জন্যে তোড়জোড় চলছে। তিনি আরও বললেন যে বেনামী ইস্তাহার আর প্রচারপত্রে [টেলিগ্রাফের] তার কাটবার, রেল লাইন তুলে ফেলার কথা বলা হয়েছে জনতার উদ্দেশে। বর্তমান পরিস্থিতিতে আইন অমান্যের উপযুক্ত পরিবেশ আছে বলে আমার মনে হয় না। আর জনতা যদি শাসনভার স্বহস্তে নিতে চায় তাহলে এই আন্দোলনের দায়িত্ব আমি পরিত্যাগ করব। এই সপ্তাহের হরিজন পড়ে দেখতে বলি তোমায়। এই সম্পর্কে আমার মতামত বলা হয়েছে তাতে। এই ব্যাপার নিয়েই তোমার সঙ্গে আলোচনার অভিপ্রায় ছিল আমার। ইতিহাসের এই

সম্মিলনে আমাদের মধ্যে কোন ভুলবোঝাবুঝি কিছুতেই থাকা চলবে না। আর, সম্ভব হলে, মতের ব্যাপারেও একমন হলেই ভাল।

ভালবাসা
বাপু

২৮২ চু চিয়া-হুয়া কর্তৃক লিখিত

কুওমিনটাঙ কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষৎ
চুংকিং
নভেম্বর ১১, ১৯৩৯

শ্রীজওহরলাল নেহরু
স্বরাজভবন, এলাহাবাদ, ভারতবর্ষ

প্রিয় মিঃ নেহরু,

ভারতে নিরাপদে উপনীত হওয়ার সংবাদ জানিয়ে আপনি আমায় যে টেলিগ্রাম প্রেরণ করেছিলেন সেটি পেয়ে আমি খুশী হয়েছিলাম। যুদ্ধকালীন এই পরিস্থিতিতে আপনার এই স্মরণীয় আগমন চৈনিক জনগণের হৃদয়ে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে।

চীন-ভারত সম্পর্কের উন্নতিকল্পে আপনার যেসব মত এই সফরের সময় আমায় বলেছিলেন তা যেমন সুচিন্তিত তেমনই ব্যাপক। চীন-ভারত সহযোগিতা সম্পর্কে একটি খসড়া প্রস্তাব রচনার সময় আমি আপনার সেই সমস্ত মত এবং জেনারেল চিয়াং কাই-শেকের কিছু কিছু নির্দেশ অন্তর্ভুক্ত করেছি। প্রস্তাবের ধারাগুলি গৃহীত হয়েছে এবং পৃথকভাবে সেগুলির প্রত্যেকটি কার্যে পরিণত করা হবে। মূল কথাগুলি এই রকম—

এক ॥ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মধ্যে অধ্যাপক বিনিময় এবং চেয়ার স্থাপন।
দুই ॥ উভয় দেশ কর্তৃক অপর দেশে পড়াশোনার জন্যে ছাত্র নির্বাচন ও প্রেরণ।
তিন ॥ গ্রন্থ ও পত্রপত্রিকা বিনিময়। চৈনিক ও হিন্দুস্থানীতে অনুবাদ।
চার ॥ কেন্দ্রীয় সংবাদসরবরাহ প্রতিষ্ঠানের একটি শাখা কলকাতায় এবং একটি উপশাখা বোম্বাইয়ে স্থাপন করা এবং উভয় দেশের মধ্যে সংবাদ বিনিময়।
পাঁচ ॥ পরস্পরের মধ্যে ভ্রমণকারী ও পর্যবেক্ষক দল প্রেরণ করা। বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের প্রেরণ ও বন্ধুত্বপূর্ণ সংযোগ সাধন। এই সম্পর্কে নিম্নোক্ত কাজগুলি করা যেতে পারে। প্রথমে চীনের দিক থেকেই শুরু করা চলতে পারে :

(১) বৌদ্ধযাত্রীদের একটি দল সংগঠন ও ভারতে প্রেরণ।
(২) বয়নশিল্প, তুলা ব্যবসায়ের সমবায় সংস্থাসমূহ ও অন্যান্য শিল্প-গুলির অবস্থা পর্যবেক্ষণ করার জন্যে একটি বিশেষজ্ঞদল প্রেরণ। তাঁরা ভারতের শিল্প ও কৃষি বিষয়ের বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে মেলামেশা ও আলাপ-আলোচনা করতে পারবেন।
(৩) বৈজ্ঞানিক বিষয়ের অনুষ্ঠান ও তথ্য সংগ্রহের জন্য একটি দল পাঠানো।

এছাড়া নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির বাৎসরিক অধিবেশন যখন আরম্ভ হবে তখন, সেই মহান অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্যে আমরা বিশিষ্ট কোন ব্যক্তিকে প্রেরণ করব।

আমার গভীরতম শ্রদ্ধা গ্রহণ করুন,

ভবদীয়
চু চিয়া-হুয়া

২৮৩ মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক লিখিত

সেবাগ্রাম, ওয়ার্ধা
নভেম্বর ১৪, ১৯৩৯

প্রিয় জওহরলাল,

তোমার চিঠি আসছে নিয়মিত। রাজেনবাবুকে লেখা তোমার চিঠি দেখেছি। সেটি দেখার আগেই বিষয়টি সম্পর্কে হরিজনে একটি মন্তব্য লিখেছি। তার একটি প্রতিলিপি তোমার কাছে পেঁছবে সেটি ছাপা হওয়ার আগেই।

এলাহাবাদে আমায় যদি তোমার দীর্ঘকালের জন্যে দরকার হয় তাহলে আমায় রেখে দেবে।

লণ্ডনে আমাদের বিবৃতি যেভাবে সম্পাদনা করে প্রকাশ করা হয়েছে সে সম্পর্কে আমার কিছুমাত্র শিরঃপীড়া নেই। সময় পেলে নিউজ ক্রনিকল্-এর জন্য একটি ছোট্ট বাণী লিখে ফেলব। ওই কাগজের সঙ্গে এই ব্যাপারে একটা ব্যবস্থা হয়েই রয়েছে।

দেখা হলে আরও।

ভালবাসা
বাপু

মহাদেব এইমাত্র আমায় মনে করিয়ে দিলেন যে, তোমার জীবনের অর্ধশত বৎসর পূর্ণ হল। আশা করি, এই রকম শক্তি, সরলতা আর বলিষ্ঠ সততা নিয়েই অবশিষ্ট অর্ধশতাব্দ কাটিয়ে দেবে তুমি।

২৮৪ মহাদেব দেশাই কর্তৃক লিখিত

সেবাগ্রাম, ওয়ার্ধা
নভেম্বর ১৪, ১৯৩৯

প্রিয় জওহর ভাই,

সতের বছর আগে লখনউ ডিস্ট্রিক্ট জেলের ব্যারাকের মধ্যে আপনি আপনার জন্মতিথি পালন করেছিলেন। আমি জানিনা সেদিন আপনিও আপনার আজকের যশের উচ্চচূড়া দেখতে পেয়েছিলেন কিনা। আত্মিক ও বুদ্ধিগত উন্নতির কোন মাত্রা নির্ণয় করা যদি সম্ভব হত তাহলে দেখা যেত এ ব্যাপারে আপনার অগ্রগতি পাটিগাণিতিক নয়, রীতিমত জ্যামিতিক। আশা করি আপনার জীবনের বাকী পঞ্চাশ বছরও এই গতি অব্যাহত থাক। আর সেই সঙ্গে অক্ষয় হোক আপনার চরিত্রের 'মানবিক' দিকগুলি, যার জন্যে, আপনার স্থান অনেক উপরে হওয়া সত্ত্বেও, আমাদের মত সাধারণ মানুষও আপনাকে আপন বলে ভাবতে পারে।

"কী বাজে বকেন" আপনি বলে উঠবেন ধৈর্য হারিয়ে। তা হোক। তবু সমগ্র জাতির পক্ষে পুণ্য এই দিনটিতে আমার যা আন্তরিক অনুভূতি, এ শুধু তারই প্রকাশ।

প্রীতিবদ্ধ
মহাদেব

২৮৫ সরোজিনী নাইডু কর্তৃক লিখিত

হায়দরাবাদ, দক্ষিণাপথ
দীপাবলী, ১৯৩৯

আমার স্নেহের জওহর,

ইতিহাস হয়ে গেল তোমার জীবনের প্রথম অর্ধ শতাব্দী। আজ তা স্বমহিমায় প্রকাশ পাচ্ছে নিটোল একটি কাহিনীর মতো, নিখুঁত একটি গানের মতো। আগামী অর্ধ শতাব্দী রূপায়িত করুক তোমার ধ্যান, বাস্তব করে তুলুক তোমার স্বপ্নকে। বহন করে আনুক তোমার সাধনার সিদ্ধি। মানুষের ইতিহাস অমরতা দিক তোমার নামকে মানবমুক্তির একজন প্রধান সেনাপতি হিসাবে।

শোনো জওহর, আমি কি তোমার জন্য প্রার্থনা করব সাধারণে যা চায় তাই? আমি কি চাইব তোমার ব্যক্তিগত সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য? চাইব তোমার কর্মহীন পূর্ণ অবকাশ? এই ত চায় সাধারণ মানুষ। কিন্তু না, এসব কিছু নয়। তোমার ভাগ্যদেবতা তোমার জন্যে পূর্বনির্দিষ্ট ব্যবস্থা করে রেখেছেন। তাই তোমার প্রাপ্য। সে কী জানো? দুঃখ, যাতনা, ত্যাগ আর সংঘাত। হ্যাঁ—এই তো তোমার উদ্দেশে বিধাতার দান। কিন্তু তোমার মধ্যে আছে সেই জাদু, যার স্পর্শে এসব কিছু রূপায়িত হবে আশীর্বাদে। এর চরম পরিণামে রয়েছে একটি মহৎ জয়।...বহু জনতার মাঝে তুমি অপূর্ব একা, ভালবাসবে তোমায় সবাই কিন্তু বুঝবে আর কজন...

তোমার দূরাভিসারী আত্মা গিয়ে পেঁছোক তার পরম লক্ষ্যে, মহান পরিপূর্ণতায়, সৌন্দর্যের শিখরে।

তোমার জন্যে তোমার কবি-ভগ্নীর, তোমার সহ-সাধিকার এই প্রার্থনা।

সরোজিনী নাইডু

১৭ই যাব আগ্রায় আর ১৯শে সকালে পবিত্র প্রয়াগ তীর্থে!!

২৮৬ জওহরলাল নেহরু কর্তৃক আসফ আলিকে লিখিত

এলাহাবাদ
নভেম্বর ১৬, ১৯৩৯

প্রিয়বরেষু,

আসফ আলি, আপনার ১৪ তারিখের চিঠি। যুদ্ধের ঘটনাবলী সম্পর্কে আগেভাগে কিছু অনুমান করা সহজ নয়। কিন্তু একটি জিনিস আমার অবশ্যম্ভাবী বলে মনে হয়। কোন রকম জোট—সোভিয়েট-বিরোধী বা অন্য ধরনের—দীর্ঘস্থায়ী হবে না। আর ভারতবর্ষে যুদ্ধ-পূর্ব অবস্থার মধ্যে ফিরে যাওয়ার কোন প্রশ্নই ওঠে না। পুরনো অবস্থায় বা শর্তে কংগ্রেস আর শাসনভার গ্রহণ করবে না প্রদেশগুলিতে।

জিন্নার সঙ্গে সাম্প্রদায়িক প্রশ্ন নিয়ে আলোচনার ফল আপনি কী আন্দাজ করছেন তা আমি জানি না। আমি বলেছি জিন্নাকে যে তাঁর বক্তব্য শোনার জন্যে আমি প্রস্তুত। আমার তো মনে হয় না যে, আমাদের ও জিন্নার মধ্যে কোন সাম্প্রদায়িক বাধা আছে। বাধা অবশ্য আছে, কিন্তু তা মূলত রাজনৈতিক। যে ধরনের কর্মপন্থায় কংগ্রেস অভ্যস্ত তার সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারেন না জিন্না। কাজেই সংযুক্ত রাজনৈতিক কার্যক্রম গ্রহণ করার ভূমিকা হিসেবে সাম্প্রদায়িক প্রশ্নের মীমাংসার কথা যাঁরা বলেন সমস্যার মূল সম্পর্কে তাঁরা অবহিত নন। আমি বলছি না যে হিন্দু ও মুসলমানরা যুক্তভাবে কোন কর্মোদ্যম গ্রহণ করতে

পারে না। তা তারা পারে এবং পারতে হবে। কিন্তু বর্তমানে এটা কোন সাম্প্রদায়িক প্রশ্নের উপর নির্ভরশীল নয়।

ভবদীয়
জওহরলাল নেহরু

২৮৭ এডওয়ার্ড টমসন কর্তৃক লিখিত

ডিসেম্বর ৩, ১৯৩৯
আইলসবেরী, বাকস

প্রিয় জওহরলাল,

আপনি আমায় একটু ভুল বুঝেছেন। 'কাউন্সিল'-এ একটা কাজ পাওয়াকে আমি কখনই 'সুযোগ' বলে মনে করিনি। আপনি জানেন নিশ্চয়ই যে কোন আসন অথবা উপাধির প্রতি আমার বিন্দুমাত্র মোহ নেই। বর্তমানে সৈন্যবাহিনীতে যে হাস্যোদ্দীপক অসমতা রয়েছে সেগুলি দূর করার সুযোগের কথাই আমি বলেছিলাম।

আমার এখনও এই বিশ্বাস যে সৈন্যবাহিনীর মধ্যে এই সব ভারসাম্যহীনতা যতদিন না ঠিক করা হচ্ছে ততদিন স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে ভারত তার দাবিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পারবে না। এ ছাড়া এখনও আমি আমার সেই পুরনো এবং হাস্যকর স্বপ্ন আঁকড়ে আছি যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য একদিন রূপায়িত হবে একটি বিশ্ব-যুক্তরাষ্ট্রে—যাতে প্রতিটি জাতি সমান মর্যাদার আসন লাভ করবে। আমি জানি আপনি হেসে উড়িয়ে দেবেন আমার কল্পনা। কিন্তু আপনি আর আমি একই রাষ্ট্রের নাগরিক—একথাটা ভাবতে আমার ভাল লাগে।

কিন্তু এসব হল আপনার এবং আমার মধ্যে ছোটখাট ব্যাপার। এখন কাজের কথায় আসা যাক—

আমি ইন্দুর সঙ্গে দেখা করেছি। তাকে ভালো মনে হচ্ছিল, এবং সে সত্যিই ভালো আছে। একটু শীর্ণ দেখাচ্ছিল অবশ্য তাকে। আর সত্যি বলতে, আমরা যাকে বলি 'ডেলিকেট' তার অবস্থা এখন তাই। খুব সাবধানে আর যত্নে এখন থাকতে হবে তাকে। বোধহয় ভিতরে-ভিতরে বেচারী একটু চিন্তিত। কৈশোর-প্রান্তের এই দিনগুলি পার হয়ে গেলেই বোধহয় সে একটু শক্তি ও স্বাস্থ্য অর্জন করবে। যাই হোক সে আগের চেয়ে ভালো আছে। আমরা চেয়েছিলাম সে আসুক আমাদের সঙ্গে, কিন্তু সে বলল যে, ১৫ই ডিসেম্বর সে সুইটজারলণ্ড যাচ্ছে... কিছু যদি হয়—ধরুন জার্মানি যদি আক্রমণ করে সুইটজারলণ্ড—যাই হোক আমরা তাকে দেখব। আপনি তার জন্য কিছুমাত্র চিন্তিত হবেন না।

এখানে ফেরবার পর থেকেই আমার দিনগুলো হয়ে উঠেছে অস্থির আর সুদীর্ঘ। ফিরে এসেই একটি ভাইকে দেখলাম মৃত্যুশয্যায়। ডাক্তার বললেন, 'সত্যি বলতে, ওকে বাঁচাবার চেষ্টা করছি না আমি, সেটা হবে চরম নিষ্ঠুরতা'। একই কথা বললেন আরও কয়েকজন চিকিৎসক। বোঝা গেল কোন আশা নেই। শুধু, আশ্চর্য তার ইচ্ছাশক্তি! কিছুতেই সে রাজী নয় মৃত্যুর কাছে হার মানতে, আর তাই বোধহয় সে বেঁচে আছে। যদিও ডাক্তারদের বিশ্বাস করি না আমি, আর যদিও এই ব্যাপারে কিছুই করবার নেই আমার, তবু কেবলই মনে হয়, ও যদি সেরে উঠতো। ও বয়েসে ছোট আমার চেয়ে। আর ভারি চমৎকার মানুষ।

কোন কাজই করে উঠতে পারছি না আমি। আর কাজও অফুরন্ত। দিন তিনেক

আগে আমার স্ত্রী গিয়েছিলেন আমার জায়গায় [আমার ভাইকে দেখাশোনার জন্যে] আজ রাত্রে ফিরে আসছেন তিনি।

শুনুন! কিন্তু আপনার চেয়ে বয়স ও বুদ্ধিতে প্রবীণতর ব্যক্তিদের কথা শোনার অভ্যাস কি আছে আপনার? নেই বোধহয়। আমি সরোজিনীর কাছে শুনেছি, সভাপতির মঞ্চে আপনার আচরণের কাহিনী! প্যাণ্ডেলের মধ্যে কে যেন কী একটা কুবাক্য বলেছিল। ব্যস। ঝাঁপিয়ে পড়লেন তার উপর। তাকে তুর্কিনাচন নাচিয়ে ছেড়েছিলেন। এ বিদ্যে আয়ত্ত করলেন কোথায়? বোধহয় হ্যারোতে, তাই না? যাই হোক, আপনার সম্ভাবিত হামলা থেকে বেশ নিরাপদ দূরত্বে আছি। ('আমি কিন্তু চটে যাচ্ছি!!') যা বলছিলাম, অনুগ্রহ করে শুনবেন দুটো কথা। কয়েক মিনিট মাত্র লাগবে।

রোহ্‌ডস (Rhodes) রিপোর্টের ব্যাপারে ভূতের মতো খাটছি দিবারাত্তির। এতে আপনার প্রসঙ্গ যেটুকু আছে তা দেখিয়েছি ইন্দিরাকে। গতকাল গিয়েছিলাম অক্‌সফোর্ড। হবু আই সি এস-দের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে। আজ দৌড়েছিলাম রোহ্‌ডস ট্রাস্ট-এর সেক্রেটারি লর্ড এলটন সমীপে। গতকালের একটি আলোচনায় লায়নেল কার্টিস উপস্থিত ছিলেন। দুটি ব্যাপার—(১) রোহ্‌ডস ট্রাস্ট ভারতবর্ষে কিছু টাকা খরচ করতে চান। ভারতে পিলগ্রিম ট্রাস্ট ধরনের কিছু শুরু করা যায় কিনা ভাবছি। পিলগ্রিম ট্রাস্টের কথা জানেন তো আপনি? চমৎকার দক্ষতার সঙ্গে সেটি পরিচালিত। সত্যিকারের কিছু কাজের কাজ এঁরা করেন—অল্পকাল-স্থায়ী দাতব্যকর্ম নয়, সত্যিকারের সৃজনশীল উদ্যমে সহায়তা। যেসব ভারতীয় বাস্তব অর্থনীতি নিয়ে গবেষণা করছেন—কোন ফলের চাষ বা ইক্ষু চাষ বৃদ্ধির জন্য হাতেকলমে কাজ করছেন—বা বুনিয়াদি শিক্ষার ক্ষেত্রে যাঁরা রয়েছেন বা অনুন্নত শ্রেণীর উন্নতিকল্পে যাঁরা কাজ করছেন, তাঁদের উপকারে আসে এমন কিছু চাই আমি। (২) রোহ্‌ডস ট্রাস্ট [অক্‌সফোর্ড] ইউনিভারসিটিকে চাপ দিচ্ছেন তাঁদের একটি পুরাতন প্রস্তাব অনুমোদন করার জন্য। এটিও আমারই পেশ করা একটি পুরনো রিপোর্টের ফল। এর উদ্দেশ্য হল ভারতের সাহিত্য বা ইতিহাস সম্পর্কে বক্তৃতাদানের জন্যে কোন ভারতীয় জ্ঞানীকে আমন্ত্রণ জানানো। বলুন তো উপযুক্ত ব্যক্তি কে? এমন একজন, ভারতের সুনাম যিনি অম্লান রাখতে পারবেন, অনানুষ্ঠানিকভাবে মেলামেশা করতে পাববেন, দবকার হলে অক্লান্তভাবে কথা বলতে পারবেন এন্তার লোকের সঙ্গে—ইউনিভারসিটির ভিতরে তো বটেই, তার বাইরেও।

নিন, বেশ ভালো করে কানঝাড়া দিয়ে নিন একবার। তৎপর অভিনিবেশ সহকারে আমার বক্তব্য শ্রবণ করুন। খুব সীরিয়াস কিন্তু আমি। এই বিশ্ববিদ্যালয় যদি কোন ব্যক্তিকে রোহ্‌ডস-স্মৃতি বক্তা হিসাবে আহ্বান জানান তবে বুঝতে হবে সেই ব্যক্তিকে খুব উচ্চ সম্মান প্রদর্শন করা হল। বক্তাকে কোন একটি কলেজের কমন রুমের 'সদস্য' করে নেওয়া হয়: সাধারণত 'অল সোলস'-এর। সম্ভবত সেটাই সবচেয়ে ভালো (অবশ্য আপনি যদি আসেন, তবে আমি চাইব, আপনি আসুন আমার কলেজ 'ওরিয়েল'-এ), সেখানে আমাদের রাজনীতিবিদদের সঙ্গে তাঁর দেখাসাক্ষাৎ হয়। তিনি আসেন সামার টার্মে, ইচ্ছে মতো তিনটি, কি চারটি, আর না-হয় গুটিপাঁচেক বক্তৃতা দেন। ইউনিভারসিটিতে হৈ চৈ পড়ে যায় তাঁকে নিয়ে। উদ্বোধনী ভাষণ নিয়ে যা ধুম পড়ে তাকে রীতিমত একখানা কাণ্ডই বলা যায়। বক্তাকে হতে হবে বিদেশী, অস্যার্থ, তাঁকে এই দ্বীপপুঞ্জের বাইরে থেকে আসতে হবে। ব্যক্তিটিকে হতেই হবে পহেলা বর্গের মানুষ। এর আগে এসেছেন আইনস্টাইন, স্মাট্‌স, ফ্লেক্‌সনর। কয়েক বছর আগে ইকবাল ও শাস্ত্রীকে আনবার

চেষ্টা করা হয়েছিল। যে কোন রাজনীতিজ্ঞের পক্ষে এই আহ্বান লাভ করা বোধহয় ভাগ্যের কথাই। আমরা এমন কাউকে পছন্দ করব, তিনি স্বেচ্ছায়, অনানুষ্ঠানিক-ভাবে আন্ডারগ্রাজুয়েটদের সঙ্গে আলাপ করতে ইচ্ছুক। আপনি তো জানেন ব্যাপারটা—কোন ক্ষুদ্র কক্ষে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলের সঙ্গে উপবেশনপূর্বক কিঞ্চিৎ বাক্যালাপ। কিন্তু উক্ত কর্মে নিয়োগ একটি মহতী কাণ্ড বলে মনে করা হয়। বক্তা মহাশয় তাঁর অভিপ্রায়ানুসারে বিষয় নির্বাচনপূর্বক তৎসম্পর্কে ভাষণ প্রদান করতে পারেন। কিন্তু আমরা এমন কোন ব্যক্তিকে বক্তা হিসেবে লাভ করতে ইচ্ছুক যাঁর বক্তব্যে কিছু সার বস্তু থাকবে। এবং বিশ্ববিদ্যালয় বক্তৃতাগুলি গ্রন্থাকারে প্রকাশ করতে ইচ্ছুক। এখন কানে কানে বলছি (কথাটি আমার এবং আপনার মধ্যেই আবদ্ধ), রোহ্ডস ট্রাস্টিরা যে ব্যক্তিকে আমন্ত্রণ জানাতে যাচ্ছেন তাঁর নাম—জওহরলাল নেহরু। ভারতবর্ষকে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে ঘোষণার অধিকার (বলা বাহুল্য আমি ট্রাস্টি নই, আমি ক্ষুদ্রব্যক্তি, অত বড় পদমর্যাদালাভের অনধিকারী, কিন্তু ট্রাস্টি মহোদয়গণ এই অধমের নিবেদন কিঞ্চিৎ মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করে থাকেন—এই পর্যন্ত)—যা বলছিলাম ভারতবর্ষকে স্বাধীন বলতে পারি না আমরা। কিন্তু অন্য কিছু করতে তো পারি। আমরা বেছে নিতে পারি মানুষের মতো একজন মানুষ, তাঁকে বলতে পারি, অনুমতি দিন আমাদের, অনুমতি দিয়ে আমাদের ধন্য করুন, গৌরবান্বিত করুন,—সারা ইংরেজীভাষী দুনিয়ার কাছে ঘোষণা করি—সর্ববিধ মানদণ্ডের বিচারে আপনাকে প্রথম সারির মানুষ বলে মান্য করি আমরা, বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে আমরা আপনাকে কাছের মানুষ, সহজ মানুষ হিসেবে জানতে চাই, পেতে চাই—আপনি সে সুযোগ দিন আমাদের, অনুগ্রহ করে। ইকবাল ও শাস্ত্রী কেমন যেন ভীতচিত্তে পরিহার করেছিলেন এই আমন্ত্রণ (অন্তত আমার তাই ধারণা, দোহাই কথাটা যেন চাউর না হয়, আমিই এই ব্যাপারে পত্রালাপ পরিচালনা করেছিলাম) আপনি যেন কিছুতেই তা না করেন। দয়া করে বিষয়টা একবার ভেবে দেখবেন। ভারতের মর্যাদার প্রশ্নটি এই উন্মত্ত পৃথিবীর জটিল সমস্যাসূত্রের সঙ্গে গ্রথিত হয়ে আছে। প্রলয়ের মুখে দাঁড়িয়েছে সেই পৃথিবী। সময় এলে নতুন করে গড়তে হবে তাকে। সে দিন দূরে নেই। বিচক্ষণ রাজনীতিজ্ঞের মতো এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করুন আপনি। আপনার সৃজনশীল চিন্তা ও অভিজ্ঞতা নববিধানের যে রূপটি জাগিয়ে তুলেছে আপনার চিত্তে—তার কিছু পরিচয় দিতে পারেন আপনি আমাদের কাছে। আপনি শোনাতে পারেন (অবশ্য আপনার ইচ্ছে যদি হয় তবেই) আপনার বিচিত্র আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতার কিছু কিছু কথা। আমাদের দৃষ্টির ও হৃদয়ের, আমাদের দ্বৈপিক মনোভাবের ঘেরাটোপ থেকে আমাদের উদ্ধার করতে পারেন আপনি। আপনি আপনার নিজের জাতিকে বিশ্বের মানচিত্রে স্থাপন করতে পারেন (আপনি একবার বলেছিলেন যে আপনি খুব ভাল রাষ্ট্রদূত। কথাটা সত্যি)। ইংলণ্ডের এই সুন্দর গ্রীষ্মঋতুতে আপনি আমাদের তরুণদের (বিশ্বে যারা অতুলনীয়) সঙ্গে কথাবার্তা বলতে পারবেন। যেসব অসংখ্য ব্যক্তি কখনও কোন ভারতীয় দেখেনি (কয়েকজন ছাত্রকে ছাড়া) তাদের চিত্তে ভারতবর্ষ সম্পর্কে এক নতুন ভাবধারা বইয়ে দিতে পারবেন। মেলামেশা করতে পারবেন (মানে না করে উপায় থাকবে না) এদেশের রাজনীতিজ্ঞদের সঙ্গে, তাঁরা ওই সময় সব হাজির থাকবেন অক্সফোর্ডে। আপনি পারবেন সেই মহান ব্রত পালন করতে রবীন্দ্রনাথ যা শুরু করেছিলেন কিন্তু গ্রন্থাকারে প্রভূত জোলো নীরস বস্তু পরিবেশন করার ফলে আর যা করতে পারেননি। কাজটি একান্তভাবে অ-রাজনৈতিক। এর একশ মাইলের মধ্যে ইণ্ডিয়া অফিসের নাক গলাবার অধিকার

নেই। এই কাজে আপনাকে আহ্বান জানানো হচ্ছে—এ আমন্ত্রণ গ্রহণ করুন। নিতান্ত আকস্মিকভাবে এ আহ্বান যাচ্ছে আপনার কাছে, যার অর্থ এ হচ্ছে দৈব-প্রেরিত এক সুযোগ। আপনার ভাগ্যচক্রের গ্রহাধিপতির 'তিনি কোন দুষ্টগ্রহও হতে পারেন অবশ্য' নির্দেশ। কিছু গোলমাল হবে না, নিশ্চিন্ত থাকুন। ইউনিভারসিটির শ্রোতাদের বলে রাখব আগে থেকে যে তাঁরা যেন শ্রদ্ধালু চিত্তে একাগ্রতা সহকারে আপনার কথামৃত শ্রবণ করেন। এ আদেশের অন্যথা হলে শ্রীমৎ বক্তার শ্রীহস্তে তাঁদের নিপীড়ন অবশ্যম্ভাবী। শুনিয়ে রাখব সরোজিনী নাইডুর কাছে শোনা সেই কাহিনী। আপনি যদি না আসেন তাহলে (এটাও ব্যক্তিগত ও গোপনীয়) আমি সপ্রুর কথা ভেবে রেখেছি। অবশ্য বক্তৃতা ও মেলামেশার কাজ তিনি সুচারুভাবে সম্পাদন করতে পারবেন ঠিকই, কিন্তু আমাদের যেসব রাজনীতিজ্ঞ চক্ষুকর্ণ দুইটি ডানায় ঢেকে রেখেছেন তেনাদের চিত্তদুয়ার মুক্ত করে সাধুবুদ্ধি বহির্গতা করা—সে কি সপ্রুর কর্ম? এই কারণেই আপাতত সপ্রুর নাম তাকে তোলা থাক। ভাল কথা, এই উপদেশ গ্রহণ করলে আপনি প্রায় মাসদেড়েক থাকতে পারবেন ভারতবর্ষের বাইরে। তার মানে— হ্যাঁ, দেখা করতে পারবেন ইন্দিরার সঙ্গে।

রোহ্ডস ট্রাস্ট চান আমি দক্ষিণ আফ্রিকা যাই এবং সেখানে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ও অন্যত্র, ভারতের ইতিহাস, রাজনীতি ও সংস্কৃতি সম্পর্কে বক্তৃতা করে বেড়াই। এর কারণ, আমি তাঁদের বুঝিয়েছি যে দক্ষিণ আফ্রিকার কাণ্ডকারখানায় ভারতীয় জনমত অতিমাত্রায় ক্ষুব্ধ। আমি বুড়ো মানুষ, ক্লান্ত হয়েছি, দেহপিঞ্জর জীর্ণ হয়েছে, বুদ্ধিশুদ্ধিও আসছে কমে। তথাপি ভারতের সেবা যদি হয়, আমি যাব। তবে আমি বড্ড ডরাই দক্ষিণ আফ্রিকা জায়গাটিকে। অমন অরাজক স্থান বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে কুত্রাপি নাস্তি। কিন্তু উপায় কী? আমি সেবকমাত্র (আর যা বয়েস, তাতে অন্য কিছু হওয়াও তো ছাই চলে না) সুতরাং যথানিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি। আর আপনি যদি আসেন অক্সফোর্ডে তবে আর একটি কর্ম করার আশা রাখি। সেটি হচ্ছে, বিদ্বজ্জনসমক্ষে ভারতের সপক্ষে, এই ক্ষীণকণ্ঠে কিঞ্চিৎ নিবেদন। আহা, আমিও তো চলনসই রকরে রাষ্ট্রদূতই বটি।

গাই উইণ্ট এখন আপনার ওখানে। আচ্ছা। আপনার সঙ্গে ওর সম্পর্কে কথা বলবার সময় কিঞ্চিৎ রাগতভাবেই বলেছিলাম। যাই হোক আমি দুঃখিত সেজন্যে। হয়েছে কি, ব্যক্তিটি সরলপ্রকৃতির নয়, আর কেমন যেন রহস্যময়। আর ওর গলার আওয়াজটাও কেমন যেন লাগে আমার কানে। সব মিলিয়েও আমার মনে প্রসন্নভাব জাগায় না। যাই হোক ও লোক ভালোই। ভালোভাবে ব্যবহার করবেন ওর সঙ্গে। আমার হয়ে প্রায়শ্চিত্ত না হয় আপনিই করলেন।

আমি এখানের দুটি পত্রিকার জন্যে [ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়েন ও টাইম অ্যান্ড টাইড] দুটি প্রবন্ধ লিখেছি, মেলা রাজনীতিজ্ঞের সঙ্গে এমন কি পার্লামেণ্টের একটি ঘরোয়া বৈঠকেও আলাপ করেছি। এক কথায় সুবাধ্য এবং কল্যাণকৃৎ ভূতের মতো খেটেছি। অতএব আমার প্রতি কিঞ্চিৎ কৃপাপরবশ হবেন। আমার উদ্দেশ্য মহৎ, যদিচ আমার উদ্যমের প্রকাশ থেকে আমায় বুদ্ধু ঠাওর'নো চলতে পারে (অপিচ ওটিই ইংলণ্ডদেশীয় ব্যক্তিবর্গের কুল লক্ষণ)। সে যাই হোক—কোন কাজই করে ওঠা বা করিয়ে নেওয়া বড় সহজ কর্ম নয়।

আমার দুটি বই পাঠালাম আপনাকে। এতে নিশ্চয়ই কুপিত হবেন আপনি। কিন্তু আপনি চেয়েছিলেন এগুলি...। দোহাই, আমার দেশ সম্পর্কে হতাশ হবেন না। আমরা কেউ কেউ ভারতের জন্যে সদিচ্ছার সঙ্গে আপ্রাণ খাটছি। এবং আমাদের

বহুবিধ দোষ সত্ত্বেও আমরা অনেক জাতের চেয়ে অনেক ভালো। ঠিক এই সময়ে এমন অনেক কিছু আছে এদেশে যা সত্যিই সুন্দর।

আপনার

এ. ট.

সবাই আমার কাছ থেকে ভারত সম্পর্কে সত্য কথা শুনতে চায়। অনবরত ফোন এবং ডাক যোগে তাগাদা পাচ্ছি। ডাকছেন ম্যাঞ্চেস্টার চেম্বার অব কমার্স, কেম্ব্রিজ ইউনিভারসিটি, হাউস অব কমন্স, নানান বিদগ্ধ সভা। কী কুকর্মই না করেছিলাম এখন ভারতবর্ষে গিয়ে। এই বুধবারই আবার যাচ্ছি পার্লামেন্টের সদস্যদের একটি সভায়।

তিনটি প্রবন্ধ লিখেছিলাম ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়েনে। কোথায় যে গেল সেগুলো খুজে পাচ্ছি না। আমার অনুমান আগাথা হ্যারিসন অথবা মেনন সেগুলি আপনাকে আর নয় তো গান্ধীকে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

এ. ট.

২৮৮ জওহরলাল নেহরু কর্তৃক মহাদেব দেশাইকে লিখিত

ডিসেম্বর ৯, ১৯৩৯

প্রিয় মহাদেব,

তোমার ৫ই তারিখের চিঠি। জাকির হোসেন বাপুকে যে প্রস্তাব জানিয়েছেন আমি কিছুতেই তাতে সায় দিতে পারি না। কথাটা মুসলীম লীগকে একভাবে স্বীকার করে নেওয়ার নয়। এর তাৎপর্য সুদূরপ্রসারী এবং এর অর্থ কংগ্রেসের যাবতীয় মূল নীতিগুলি বিসর্জন দেওয়া। অর্থাৎ কংগ্রেসের ধ্বংস।

জিন্নার নয়া বিবৃতি তুমি দেখে থাকবে। রাজনৈতিক মিথ্যাচার এবং অসৌজন্যেরও একটা সীমা আছে। বিবৃতিটিতে সে সীমাও লঙ্ঘন করা হয়েছে। এখন আমার পক্ষে জিন্নার সঙ্গে দেখা করাও অসম্ভব। অথচ মাত্র দুদিন আগে তাঁকে লিখেছি যে আমি বোম্বাই যাচ্ছি এবং তাঁর সঙ্গে দেখা করবার আশা রাখি। গতকাল থেকে ব্যাপারটি নিয়ে অনেক কথা ভেবেছি এবং ঠিক করেছি, তাঁকে আর একটি চিঠি দেব। আমার চিঠির একটি প্রতিলিপি পাঠালাম বাপুর কাছে।

স্টাফোর্ড ক্রীপস এখানে আছেন। দিল্লী ও লাহোর যাওয়ার জন্যে তিনি আগামী কাল রওনা হচ্ছেন। সেখান থেকে তিনি বোম্বাই ও ওয়ার্ধা যাবেন। ঠিক আছে তিনি ১৭ই সকালে ওয়ার্ধা পৌঁছবেন। দিনটি রবিবার। দিন দুই-তিন থাকবেন সেখানে। সত্যি বলতে তারিখগুলি আমার মনঃপূত নয়, কারণ ওর মধ্যে বাপুর মৌন-দিবস এবং ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকের দিন পড়ছে। ভাল হত যদি তিনি ১৮ই ও ১৯শে যেতেন। ক্রীপসেরই সুবিধে হত তাতে।

হেইলি, সুস্তার, ফাইণ্ডলেটার, স্টিওয়ার্ট ও জেটলণ্ডের সঙ্গে ক্রীপসের সুদীর্ঘ আলোচনা হয়েছে। আমার ধারণা হালিফাক্সের সঙ্গেও তাঁর দেখা হয়েছে। তাঁদের সমক্ষে তিনি একটি প্রস্তাব নিবেদন করেছিলেন এবং যদিও কেউই সেটি সম্পর্কে সুস্পষ্ট সম্মতি প্রদান করেনি কিন্তু সকলেই সহানুভূতির সঙ্গে তাঁর বক্তব্য শ্রবণ করেছেন। প্রস্তাবটিকে অবশ্য স্বাগত জানাবার মত বিষয় আছে, কিন্তু দু-তিনটি মারাত্মক গলদও রয়েছে। তার একটি প্রতিলিপি না হয় পরে পাঠাব—তোমার আর বাপুর জন্যে। কিন্তু আমি চাই এটি তোমরা গোপন রাখবে।

আমি আপাতত এটুকু বলতে পারি সে ক্রীপস অত্যন্ত অপকট ও তাঁর যোগ্যতা প্রশ্নাতীত, কিন্তু সব সময় বোধহয় আস্থা রাখা যায় না তাঁর বিচারবুদ্ধির উপর।

সম্ভবত ১৩ই বোম্বাই যাচ্ছি।

তোমার প্রীতিবদ্ধ
জওহরলাল

শ্রীমহাদেব দেশাই
সেবাগ্রাম

২৮৯ জওহরলাল নেহরু কর্তৃক এম, এ জিন্নাকে লিখিত

এলাহাবাদ
ডিসেম্বর ৯, ১৯৩৯

প্রিয়বরেষু জিন্না,

দু' দিন আগে লেখা একটি চিঠিতে জানিয়েছিলাম আপনাকে যে আমি বোম্বাই যাওয়ার ইচ্ছা রাখি এবং সেখানে আপনার সঙ্গে দেখা হওয়ার আশাও আমার আছে। গতকাল সকলের কাগজে দেখলাম আপনার বিবৃতি। ২২শে ডিসেম্বর তারিখটিকে আপনি মুক্তিদিবস নামে অভিহিত করেছেন; নির্দেশ দিয়েছেন ওই দিন কৃতজ্ঞতা নিবেদনের জন্যেও। কেন? না, অবশেষে ওই দিনটিতে প্রদেশের কংগ্রেস সরকারগুলি পদত্যাগ করছেন! আমি একাধিকবার মনোযোগ সহকারে আপনার বিবৃতিটি পড়েছি এবং চব্বিশটি ঘণ্টা ভেবেছি তা নিয়ে। এই চিঠিতে আমি কোন তথ্য, ধারণা বা সিদ্ধান্ত নিয়ে তর্ক তুলতে অনিচ্ছুক। আপনি জানেন এই সম্পর্কে আমার মতামত আন্তরিকতার সঙ্গে সত্যসন্ধানের আকাঙ্খা থেকেই উদ্ভূত। হতে পারে আমি ভুল করেছি। কিন্তু আরও আলো চেয়েছিলাম আমি, এবং সে আলো আসেনি।

কিন্তু গতকাল থেকে যা আমায় অত্যন্ত পীড়িত করেছে তা হচ্ছে এই উপলব্ধি যে, আমাদের পরস্পরের মূল্যবোধের ও আমাদের জীবনের এবং রাজনৈতিক লক্ষ্যের মধ্যে ব্যবধান এমন দুরতিক্রম্য। আমাদের আলাপের সময় আমার আশা হয়েছিল যে এই ব্যবধান হয়ত সত্যিই বেশী নয়, এখন দেখা যাচ্ছে তা দুরস্ত। এ অবস্থায় আসন্ন সমস্যা সম্পর্কে পরস্পরের মধ্যে আলোচনা করে কী লাভ? আলোচনা ফলপ্রদ হওয়ার জন্যে থাকা দরকার, তার কোন সাধারণ ভিত্তিভূমি, অথবা কোন সাধারণ লক্ষ্য। বিষয়টির উল্লেখ করা উচিত মনে হল আপনার জন্যে এবং আমার নিজের জন্যেও।

আপনি বিজনোর থেকে পাওয়া একটি চিঠি আমায় দেখিয়েছিলেন দিল্লীতে। ভালই করেছিলেন দেখিয়ে। আমি খোঁজ নিয়ে জেনেছি প্রকৃত তথ্যের যে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছিল চিঠিতে তা আদৌ সত্য নয়। অমন হওয়ার কারণ যদি জানতে চান তাহলে বিজনোর থেকেই তা সংগ্রহ করে পাঠাতে পারি আপনার কাছে। এ উদ্দেশ্যে দিল্লীতে যে চিঠিটা আমায় দেখিয়েছিলেন আপনি, তার একটি প্রতিলিপি আবশ্যক।

ভবদীয়
জওহরলাল নেহরু

এম. এ. জিন্না এস্কোয়ার.

২৯০ এম. এ. জিন্না কর্তৃক লিখিত

বোম্বাই
ডিসেম্বর ১৩, ১৯৩৯

প্রিয় জওহরলাল,

আপনার ৯ই ডিসেম্বরের চিঠি পেলাম। কাগজে দেখছি আপনি কেবলই এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় যাচ্ছেন, তাই ভেবে পাচ্ছিলাম না কোন্ ঠিকানায় উত্তর দেব আপনার চিঠির। সম্প্রতি জানলাম ১৪ই আপনি বোম্বাই পৌঁছচ্ছেন। তাই আপনার বোম্বাইয়ের ঠিকানাতেই চিঠি লিখছি। আমি আপনার সঙ্গে একমত যে, "আলোচনা ফলপ্রদ হওয়ার জন্যে থাকা দরকার, তার কোন সাধারণ ভিত্তিভূমি, অথবা কোন সাধারণ লক্ষ্য।" ঠিক এই কারণেই গত অক্টোবর মাসে আলোচনা সময় বলেছিলাম আপনাকে এবং মিস্টার গান্ধীকে : প্রথমত, কংগ্রেস যতদিন না মুসলীম লীগকে ভারতবর্ষের মুসলমানদের ন্যায়সঙ্গত ও প্রতিনিধিত্বমূলক সংগঠন হিসেবে মেনে নিচ্ছেন, ততদিন হিন্দু-মুসলমান প্রশ্নের মীমাংসার জন্য আলোচনা নিরর্থক। অল ইণ্ডিয়া মুসলীম লীগ ওয়ার্কিং কমিটি এই শর্ত জ্ঞাপন করেছিলেন। দ্বিতীয়ত, সংখ্যালঘু-সমস্যা সম্পর্কে কোনপ্রকার মীমাংসায় উপনীত না হওয়া পর্যন্ত, কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি কর্তৃক গৃহীত ও ১০ই অক্টোবর ১৯৩৯ তারিখে অল ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত দাবির প্রতি, আমরা সায় জানাতে পারি না। আর ওই দাবির প্রস্তাবটি এমনিতেও ধোঁয়াটে, অস্পষ্ট এবং অবাস্তব। ভাইসরয়ের ঘোষণায় মুসলীম লীগ সন্তুষ্ট নয়। আমরা যদি আপসে হিন্দু-মুসলমান সমস্যার সমাধান করে নিতে পারি, তাহলে, আমরা এমন একটি সুবিধাজনক অবস্থায় পৌঁছতে পারব যখন আমাদের দাবি সম্পর্কে একটি মিলিত ফরমুলা গ্রহণ করতে পারব এবং তা আমাদের অনুকূলে গৃহীত হওয়ার জন্য হিজ ম্যাজেস্টিজ গবর্নমেণ্টের কাছে পেশ করতে পারব। আমার প্রথম বা দ্বিতীয় কোন শর্তটিই মিস্টার গান্ধী বা আপনার কাছে গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়নি। যাই হোক, আপনি অনুগ্রহ করে এই ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন যে আপনি আবার আমার সঙ্গে দেখা করবেন। আমি জানিয়েছিলাম যে পুনরায় আপনার দর্শনলাভ করলে আমি আনন্দিতই হব। ১লা ডিসেম্বর আপনি যখন আপনার বোম্বাই আগমনের ও আমার সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছে জানিয়ে চিঠি লিখলেন তখন, আমি জানিয়েছিলাম আপনাকে যে, ডিসেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহে এখানেই থাকব আমি এবং খুশীই হব আপনার দেখা পেলে। এখনও এই কথাই বলতে পারি আমি যে, আপনি যদি বিষয়টি নিয়ে অধিকতর আলোচনায় ইচ্ছুক হন তাহলে, আমি সানন্দে আপনার অবকাশের প্রতীক্ষায় থাকব।

বিজনোরের ঘটনার যে উল্লেখ আপনি করেছেন সেটি সম্পর্কে একটি আইন-বিভাগীয় তদন্ত হওয়া প্রয়োজন—আশা করি আপনি আমার সঙ্গে একমত হবেন এই ব্যাপারে। এবং এই সম্পর্কে আমাদের একসঙ্গে করার মতো কিছু নেই, কারণ আমার সুদৃঢ় অভিমত এই যে, শাসনতন্ত্রের রূপায়ণ এবং কংগ্রেস সরকারের বিরুদ্ধে আমাদের সমস্ত অভিযোগ একটি রাজকীয় কমিশন কর্তৃক পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিবেচিত হওয়ার যোগ্য।

ভবদীয়
এম. এ. জিন্না

পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু
বোম্বাই

২৯১ জওহরলাল নেহর, কর্তৃক এম, এ, জিন্নাকে লিখিত

বোম্বাই

ডিসেম্বর ১৪, ১৯৩৯

প্রিয়বরেষু জিন্না,

আপনার ১৩ই ডিসেম্বরের পত্রের জন্য ধন্যবাদ। আজ দ্বিপ্রহরে পৌঁছেই সেটি পেলাম। আপনি 'মুক্তি ও কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপন দিবস' উপলক্ষ্যে মুসলিমদের আনন্দানুষ্ঠানের যে বিস্তৃত নির্দেশ দিয়েছিলেন, কাগজে সেটি পড়বার এবং সে-সম্পর্কে যথেষ্ট চিন্তা করবার পরই আপনাকে চিঠি লিখেছিলাম। বিবৃতিটি আমায় অত্যন্ত পীড়া দিয়েছিল এবং জনগণের সমস্যাবলী সম্পর্কে আমাদের মতের ও দৃষ্টিভঙ্গীর ব্যবধান সম্পর্কে সজাগ করে দিয়েছিল। এবং মৌলিক ব্যাপারে এই গুরুত্বপূর্ণ মতভেদের পর আমাদের আলোচনার সাধারণ ভিত্তি কী হতে পারে তা আমি ভেবে পাইনি। আমার অসুবিধের কথা আমি জানিয়েছিলাম আপনাকে। সেই অসুবিধা অদ্যাপি বিদ্যমান।

আলোচনার সাধারণ ভিত্তি সন্ধানের পূর্বেই আপনি পত্রমারফৎ দুটি শর্ত উপস্থিত করেছেন এবং দুটির উপরই জোর দিয়েছেন। প্রথমটি হচ্ছে এই যে, কংগ্রেসকে মেনে নিতে হবে যে মুসলীম লীগ ভারতীয় মুসলমানদের ন্যায়সঙ্গত ও প্রতিনিধিত্ব-মূলক সংগঠন। কংগ্রেস বরাবরই লীগকে মুসলীমদের একটি গুরুত্বপূর্ণ ও প্রভাবশালী সংগঠন হিসেবে স্বীকার করে এসেছে। আর সেই জন্যেই আমাদের মধ্যে কোন মতভেদ যদি থাকে তা মীমাংসা করে নেওয়ার জন্যে আমরা আগ্রহী। কিন্তু বোঝা যাচ্ছে আপনার শর্তে আপনি আরও বেশী কিছু চাইছেন। যা চাইছেন তার অর্থ লীগ-বহির্ভূত মুসলমানদের সঙ্গে আমাদের বিচ্ছেদ এবং তাঁদের সংগঠন-গুলিকে অস্বীকার করা। আপনি জানেন, কংগ্রেসের মধ্যেই অনেক মুসলীম আছেন, তাঁদের মধ্যে আমাদের ঘনিষ্ঠতম সহকর্মীরাও কেউ কেউ আছেন। এছাড়া রয়েছে অন্যান্য মুসলীম সংগঠনসমূহ যেমন,—জমায়ত-উল-উলেমা, অল ইণ্ডিয়া শিয়া কনফারেন্স, মজলিশ-ই-অহ্‌রর, অল ইণ্ডিয়া মোমিন কনফারেন্স ইত্যাদি। এছাড়া আছে অনেক মজদুর ও কিষাণ ইউনিয়নসমূহ, অনেক মুসলীম আছেন সেগুলির সদস্য হিসেবে। এইসব সংগঠনগুলির অনেকগুলির সঙ্গে আমাদের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর মিল রয়েছে। তাঁদের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করতে বা তাঁদের ত্যাগ করতে পারি না আমরা।

আপনি ঠিকই বলেছেন যে, কংগ্রেস সব সময় ভারতবর্ষের সকলের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে না। নিশ্চয়ই পারে না। যাঁদের সঙ্গে আমাদের মতের মিল নেই—তাঁরা হিন্দু বা মুসলমান যাই হোন না কেন—তাঁদের প্রতিনিধিত্ব করি না আমরা। শেষ পর্যন্ত, কংগ্রেস তার সদস্য ও সমর্থকদের প্রতিষ্ঠান। মুসলীম লীগও তাই। সব সংগঠনই তার সদস্য ও সমর্থকদেরই সংগঠন। কিন্তু পার্থক্য আছে, এবং সে পার্থক্য গুরুত্বপূর্ণ। কংগ্রেসের গঠনতন্ত্র তার দুয়ার সকলের জন্য অবারিত করে রেখেছেন। অবশ্য বলা বাহুল্য, যাঁরা এতে আসবেন তাঁরা এর আদর্শ ও কর্মপন্থা অনুমোদন করবেন। আর মুসলীম লীগ শুধু মুসলমানদের। কাজেই দেখা যাচ্ছে কংগ্রেসের ভিত্তি উদার জাতীয়তাবোধের উপর। তার অস্তিত্বের অবসান না ঘটলে তার ভিত্তি বদলাবে না, বদলাতে পারে না। আপনি জানেন, হিন্দু মহাসভার মধ্যে এমন অনেক হিন্দু আছেন যাঁদের ধারণা কংগ্রেস হিন্দুদের প্রতিনিধিত্ব করতে

পারে না। এছাড়া আছেন কিছু কিছু শিখ ও অন্যান্যেরা যাঁদের ধারণা সাম্প্রদায়িক ব্যাপারে তাঁদের মতামত অবশ্য শ্রোতব্য।

সুতরাং, সকলকে বাদ দিয়ে মুসলীম লীগকে মুসলমানদের একমাত্র প্রতিনিধিত্ব-মূলক সংগঠন হিসেবে স্বীকার করে নিক কংগ্রেস, এই যদি আপনার কাম্য হয়, তবে তা মেনে নিতে আমরা সীমাহীনরূপে অক্ষম। কংগ্রেসের পক্ষ থেকেও যদি আমরা ওই রকম কোন দাবি জানাই তা হবে একই রকমের অসঙ্গত, তা কংগ্রেস সংগঠন হিসেবে যতই বৃহৎ হোক না কেন। এবং বাস্তব অবস্থার সঙ্গে সে দাবির এই রকমই পার্থক্য দেখা যাবে। কিন্তু এখনও এইটুকুই আমি বলব যে সাধারণ স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়গুলি সম্পর্কে বিচার করতে বসলে দুটি সংগঠনের এই প্রকৃতিগত পার্থক্য বড় হয়ে উঠতে নাও পারে।

আপনার দ্বিতীয় বক্তব্য এই যে, কংগ্রেস ব্রিটিশ গবর্মেণ্টের কাছ থেকে যে ঘোষণার জন্যে দাবি জানিয়েছে, মুসলীম লীগ সে দাবির প্রতি সমর্থন জানাতে নারাজ। এটা জেনে আমি সত্যিই খুব দুঃখ পেয়েছি। কারণ এতে একথাই প্রমাণিত হল যে, সাম্প্রদায়িক প্রশ্ন ছাড়াও রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও আমরা সম্পূর্ণ পৃথক মতামত পোষণ করি। কংগ্রেসের দাবি হল,—যুদ্ধের লক্ষ্য, ভারতের স্বাধীনতা এবং বাইরের কোনরূপ প্রভাব ব্যতীত ভারতবাসীদের নিজেদের শাসনতন্ত্র রচনার অধিকার সম্পর্কে—একটি সুস্পষ্ট ঘোষণার। এতে যদি মুসলীম লীগের আপত্তি থাকে তবে তা থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে, আমাদের রাজনৈতিক লক্ষ্য সম্পূর্ণ পৃথক। কংগ্রেসের দাবি নতুন নয়। কংগ্রেস-গঠনতন্ত্রের প্রথম ধারাতেই এর উল্লেখ আছে, এবং বিগত বহু বর্ষ যাবৎ কংগ্রেসের যাবতীয় কর্মপন্থা এটিকে কেন্দ্র করেই নির্ধারণ করা হয়ে আসছে। এ দাবি কংগ্রেস কেমন করে পরিত্যাগ করা দূরে থাক, সামান্য পরিবর্তন করতে পারে, তা আমি ভেবেই পাই না। ব্যক্তিগতভাবে বলতে পারি, একে বদলাবার যে কোন উদ্যম সর্বশক্তি দিয়ে প্রতিরোধ করব আমি। কিন্তু এটা ব্যক্তিগত ব্যাপার নয়। নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি এই প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন, সারা ভারতবর্ষ জুড়ে হাজার হাজার সভায় লক্ষ লক্ষ লোক এর প্রতি সমর্থন জানিয়েছেন। একে অস্বীকার করতে আমি অসমর্থ।

অতএব দেখা গেল, রাজনৈতিক দিক দিয়ে আমাদের সাধারণ কোন ভিত্তি নেই এবং আমাদের লক্ষ্য সম্পূর্ণ ভিন্ন। আমাদের মধ্যে কোন আলোচনার এবং তাতে কোন সুফল অর্জনের আশা তিরোহিত হওয়ার পক্ষে এই-ই যথেষ্ট। আর যে কারণে আগের চিঠিটি লিখেছিলাম আপনাকে তা এখনও বিদ্যমান। আমি আপনার দ্বারা নির্দেশিত 'মুক্তিদিবসের' অনুষ্ঠানের সম্ভাবনার কথা বলছি। এর গুরুত্বপূর্ণ ও সুদূরপ্রসারী প্রতিক্রিয়া (যেগুলি কী তা আমি এখন বলতে চাই না) অবশ্যম্ভাবী। আমরা কেউই তার প্রভাবকে এড়িয়ে যেতে পারব না। সাম্প্রদায়িক সমস্যার প্রতি এই মনোভাবের সঙ্গে তার মীমাংসার আগ্রহ প্রকাশের মধ্যে কোন সঙ্গতি থাকা অসম্ভব।

কাজেই, আমার মনে হচ্ছে, এই স্তরে, এই অবস্থায় এবং এই পশ্চাদ্‌ভূমিতে আমার সাক্ষাৎকারের দ্বারা কোন উদ্দেশ্য সাধিত হবে না। অবশ্য এই কথা আপনাকে দিতে পারি যে কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে সাম্প্রদায়িক ও অন্যান্য সমস্যা নিয়ে খোলাখুলি আলোচনার সপক্ষে আমরা সর্বদাই প্রস্তুত।

বিজনোরের ঘটনা সম্পর্কে আপনার মত আমি লক্ষ্য করলাম। একতরফা যেসব অভিযোগ তোলা হয়েছে তার সত্যাসত্য নির্ধারণ ও নিষ্পত্তি যে হয়নি এটা খুব দুঃখের কথা। অভিযোগ উত্থাপন করা যে খুব সোজা, আর সত্যমিথ্যা নির্ধারণ

না করে সেই অভিযোগ সম্পর্কে বিশ্বাস আঁকড়ে পড়ে থাকা ঠিক নয়—এটা আশা করি আপনি স্বীকার করবেন।

ভবদীয়
জওহরলাল নেহরু

এম· এ· জিন্না, এস্কোয়ার
বোম্বাই

২৯২ এম. এ. জিন্না কর্তৃক লিখিত

বোম্বাই
ডিসেম্বর ১৫, ১৯৩৯

প্রিয় জওহর,

আপনার ১৪ই ডিসেম্বরের চিঠি পেলাম। আপনি আমার দ্বিতীয় বক্তব্যটি ঠিকমত বুঝতে পারেননি দেখে দুঃখিত হলাম। ব্রিটিশ সরকারের কাছ থেকে একটি ঘোষণার দাবি, মুসলীম লীগ সমর্থন করবে না—একথা বলিনি আমি। আমি যা বলেছি তা হচ্ছে এই যে, যে ঘোষণার দাবি ওয়ার্কিং কমিটি কতৃক গৃহীত ও ১০ই অক্টোবর ১৯৩৯ তারিখে অল ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে, সেই দাবি সম্পর্কে মুসলীম লীগ সায় জানাতে পারে না। কেন পারে না, সে কথা আমি আমার চিঠিতে স্পষ্টভাবেই বলেছিলাম।

যদি, কংগ্রেস এই প্রস্তাটির কোন রকম পরিবর্তন না করে এবং আপনি বলছেন, যে পরিবর্তনের যে কোন উদ্যম আপনি সর্বশক্তি দিয়ে প্রতিরোধ করবেন—এবং যদি, মুসলীম লীগকে ভারতবর্ষের মুসলমানদের ন্যায়সম্মত প্রতিনিধিমূলক সংগঠন হিসেবে মেনে নিতে আপনারা অসমর্থ হন,—সে অবস্থায় আমি কী করব বলে আপনি আশা রাখেন বা ইচ্ছা করেন, তা কি আমি জানতে পারি।

ভবদীয়
এম. এ. জিন্না

২৯৩ জওহরলাল নেহরু কর্তৃক এম, এ জিন্নাকে লিখিত

বোম্বাই
ডিসেম্বর, ১৬, ১৯৩৯

প্রিয়বরেষু জিন্না,

আপনার ১৫ই ডিসেম্বরের পত্রের জন্য ধন্যবাদ।

যে পার্থক্যের কথা আপনি উল্লেখ করেছেন তা আমি উপলব্ধি করি। অবশ্যই মুসলীম লীগ ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ থেকে কোন ঘোষণার বিরোধী করতে পারে না। প্রশ্ন উঠতে পারে সেই ঘোষণার রূপ ও বিষয়বস্তু সম্পর্কে। কংগ্রেস যা চেয়েছে তা হল, যুদ্ধের লক্ষ্য সম্পর্কে স্পষ্ট উল্লেখ, ভারতবর্ষের স্বাধীনতার দাবির স্বীকৃতি এবং ভারতীয় জনগণ কর্তৃক শাসনতন্ত্র রচনার অধিকার। বলা বাহুল্য, শেষোক্ত অধিকার স্বাধীনতার অঙ্গীভূত। এ সব মূল নীতিগুলি এসেছে আমাদের স্বাধীনতার লক্ষ্য থেকে। মুসলীম লীগের ঘোষিত লক্ষ্যও তাই। কাজেই এ ব্যাপারে কোন মত-পার্থক্য থাকতে পারে না। অবশ্য এই নীতিগুলির প্রয়োগ এবং রূপায়ণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার এবং খুব ভেবেচিন্তেই তা করতে হবে। কিন্তু মূল দাবিগুলির কথায় বলা যায় যে সেগুলি ভারতীয় জাতীয়তাবাদের সারাৎসার। সেগুলি ত্যাগ করার অর্থ প্রকৃতপক্ষে আমাদের স্বাধীনতার দাবিকে নষ্ট করে ফেলা।

গত এগার বৎসর যাবৎ কংগ্রেসে বার বার তার নীতি ঘোষণা করে এসেছে। বর্তমান ঘোষণা সেই নীতি থেকেই উৎসারিত। এই নীতিটির রূপদানের কাজে ব্যক্তিগতভাবে আমার একটি অংশ ছিল এবং আমি এটির প্রতি যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করে থাকি। আপনি নিশ্চয়ই বুঝবেন দীর্ঘকাল ধরে প্রতিষ্ঠিত এই রকম মূল নীতি পরিবর্তন করা অকাম্য তো বটেই এবং অসম্ভবও। নীতিগুলি মূলত রাজনৈতিক এবং আমার দৃঢ় অভিমত এই যে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-দাবি থেকে শুধু এই ধরনের নীতিই উৎসারিত হতে পারে। খুটিনাটি সম্পর্কে বিচার-বিবেচনা ও আলাপ-আলোচনা নিশ্চয়ই করা যাবে, এগুলির প্রযোগ পারস্পরিক সহযোগ ও সম্মতিসাপেক্ষ, এবং বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে বিভিন্ন গোষ্ঠী ও সংখ্যালঘুদের স্বার্থ যেন সযত্নে রক্ষিত হয়। কিন্তু ঘোষণার মূল ভিত্তিকে চ্যালেঞ্জ করে বসার অর্থ রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী ও নীতির ব্যাপারে খুব বড় রকমের বিভেদের পরিচয় দেওয়া। এর সঙ্গে হিন্দু-মুসলমান প্রশ্নের কোন যোগ নেই। এইজন্যেই আমি বলেছিলাম যে আমাদের রাজনৈতিক লক্ষ্যের ব্যাপারে আমাদের কোন মিল নেই।

আমি আবার বলছি, আমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যিনি মুসলীম লীগের অধিকার, প্রভাব ও গুরুত্ব কম করে দেখেন বা তা চ্যালেঞ্জ করতে চান। এই জন্যেই আজ যে সব সমস্যা আমাদের সামনে দেখা দিয়েছে সেগুলি সম্পর্কে আমরা [লীগের সঙ্গে] আলোচনা করতে এবং সন্তোষজনক মীমাংসায় উপনীত হতে আগ্রহী। কিন্তু দুঃখের বিষয়, নানারকমের শর্তের নামে এত বাধা-বিপত্তি এসে হাজির হয় যে অপর কিছু দূরে থাক, সমস্যাগুলি নিয়ে কোন আলোচনা শুরু হতেই পাবে না। আমি বলেছি আপনাকে, যে এই শর্ত উপস্থিত করার প্রতিক্রিয়া সুদূরপ্রসারী হতে বাধ্য। আমি বুঝতে পারি না কেন অগ্রগতির এবং আলোচনার পথে এসব বাধা আনা হয়। এইসব বাধা হটিযে দিয়ে মূল সমস্যাটির মোকাবিলা করা আমার তো কিছু অসম্ভব বলে মনে হয় না। কিন্তু বাধাগুলি রেখেই দেওয়া হচ্ছে, জোটানো হচ্ছে আরও নতুন নতুন বাধা। তাই তো বাধ্য হচ্ছি ভাবতে যে, রাজনৈতিক দৃষ্টি এবং লক্ষ্যেই রয়েছে আসল তফাৎ।

ঠিক এই সময়ে, ২২শে ডিসেম্বর তারিখে সমগ্র ভারতে [লীগ কর্তৃক] যে অনুষ্ঠানের নির্দেশ হওয়া হয়েছে তা আর একটি মানসিক বাধা সৃষ্টি করবে এবং পারস্পরিক মেলামেশা ও আলোচনার পথ, খুব সাফল্যের সঙ্গে রুদ্ধ করতে পারবে। এই ব্যাপারটিতে আমি অত্যন্ত দুঃখবোধ করেছি এবং একান্তভাবে চেয়েছি যে এই বাধাটি আপনি অপসারণ করবেন। কারণ এটি বেখে দেওযাব অর্থ অশুভ বুদ্ধির বিস্তার কামনা ছাড়া আর কিছু হতে পারে না। আমি এখনও আশা রাখি, এই নির্দেশ আপনি প্রত্যাহার করে নেবেন।

নিজেব দিক থেকে কথা দিতে পারি আপনাকে, মীমাংসার জন্যে আমার যতটুকু সাধ্য তা করতে আমি কুণ্ঠিত হব না। কিন্তু তার জন্যে অন্তরের সততা ও লক্ষ্যের প্রতি একাগ্রতা পরিত্যাগ করতে পারে না কেউ। আর তা করলে কোন লাভও হয় না। আমার রাজনৈতিক মতামত সুদৃঢ়। তার প্রেরণাতেই আমি এতদিন কাজ করে এসেছি। আমি তা কোন সময়েই পরিত্যাগ করতে পারব না। আর তা কিছুতেই ছাড়তে পারি না এখন—সারা পৃথিবী যখন এক মহাসংকটের সম্মুখীন।

ভবদীয়

জওহরলাল নেহরু

২৯৪ মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক লিখিত

ডিসেম্বর ২৮, ১৯৩৯
সেবাগ্রাম, ওয়ার্ধা

প্রিয় জওহরলাল,

তোমার চিঠি পেয়েছি। চৌনিক পত্রটি রক্ষা করব।

মুক্তি দিবস পূর্ণপৃষ্ঠাব্যাপী প্রচার পেয়েছে টাইমস অব ইণ্ডিয়ায়। কিন্তু সত্যি বলতে কোথাও তা তেমন সাড়া পায়নি।

ফজলুল হকের অভিযোগ পড়েছ? কিছু কি বলার বা করার নেই এ ব্যাপারে?

কুমারাপ্পার যে চিঠিগুলি সম্পর্কে তুমি তীব্র আপত্তি প্রকাশ করেছ, সেগুলি আমাকে তুমি পাঠাওনি। তিনি এখানে আছেন। তাঁকে আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি বললেন সম্প্রতি তিনি কোন কিছু পাঠাননি তোমার কাছে। তোমার কাছে কিছু থাকলে পাঠিও আমায়।

ভালবাসা
বাপু

২৯৫ জওহরলাল নেহরু কর্তৃক এডওয়ার্ড টমসনকে লিখিত

এলাহাবাদ, জানুয়ারি ৫, ১৯৪০

প্রিয় এডওয়ার্ড,

তোমার ভাইয়ের মৃত্যু সংবাদ আমার কাছে পৌঁছেছে। তোমার কাছে ব্যাপারটি কী, তা আমি জানি। জানি বলেই দুঃখ পেয়েছি। তোমার গত চিঠিতে তুমি জানিয়েছিলে তাঁর অসুখের কথা। আশা যে কত কম তাও বলেছিলে। এই দুঃসংবাদের জন্যেই আমি দ্বিধাগ্রস্ত হয়েছি তোমাকে কিছু লিখতে।

গতকালের ডাকে তোমার পাঠানো বই দুটি পেয়েছি। 'জন আরনিসন' আর তোমার কাব্যসঞ্চয়ন---'কালেকটেড পোয়েমস'। খুব খুসী হয়েছি বই দুটি–বিশেষ করে কবিতার বইটি পেয়ে। অন্যক্ষেত্রে যতই বিচরণ কর না কেন, আসলে তুমি কবিই।

এছাড়া সংবাদপত্রে প্রকাশিত তোমার কিছু কিছু লেখা পড়েছিলাম। ভালই লাগল সেগুলি। এখানকার পরিস্থিতি তুমি যা দেখে গেছ প্রায় সেই রকমই আছে। বিশেষ কোন পরিবর্তন হয়নি। অবশ্য ঘটনা যে কিছু ঘটেনি এমন নয়। জিন্নার 'মুক্তিদিবসের' কথা শুনেছেন নিশ্চয়ই। কোন রকম যুক্তিতে কর্ণপাত করবেন না তিনি। কিন্তু এবারে একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলেছেন তিনি। মুসলীম মহলে অনেকেই তাঁর এ কাজে প্রসন্ন নন।

লের্জা থেকে ইন্দিরার চিঠি পেয়েছি। সে ভালো আছে আর জায়গাটাও তার ভালোই লেগেছে। ডাক্তার তাকে বলেছেন যে মাস তিনেকের মধ্যেই তার স্বাস্থ্য এমন ফিরিয়ে দেবেন যে তাকে দেখলে মনে হবে যেন লক্ষ্মী-প্রতিমা। সে তো ভারি খুশী।

তুমি যে ফৌজী সমস্যার উল্লেখ করেছ তা অবশ্য রয়েছে। কিন্তু আমার যেন মনে হল তুমি একটু অনাবশ্যক গুরুত্ব দিয়েছ ব্যাপারটি সম্পর্কে। ভারতীয় ফৌজের শতকরা প্রায় বাহান্ন ভাগই আসে পাঞ্জাব থেকে, আর সারা ভারতবর্ষে মুসলীম হার হোল শতকরা বত্রিশ। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য সমানাধিকার ও সমমর্যাদার ভিত্তিতে একটি জাতিপুঞ্জে পরিণত হবে কিনা (তুমি যাকে বলেছ বিশ্বযুক্তরাষ্ট্র) তা আমি জানি না। কিন্তু তোমার পুরনো স্বপ্ন বাস্তবে রূপায়িত

হতে দেখলে আমি সুখী হব। তোমার প্রস্তাবানুসারে পিলগ্রিম ট্রাস্ট ভারতবর্ষ সম্পর্কে আগ্রহী হয়ে কিছু করলে ভালই হয়। আর তোমার দ্বিতীয় প্রস্তাব—যাতে কোন ভারতীয় সুধী কর্তৃক ভারতবর্ষের ইতিহাস বা সাহিত্য সম্পর্কে একটি বক্তৃতামালার কথা বলা হয়েছে, এবং আমার কাছে একজনের নাম চাওয়া হয়েছে—সে সম্পর্কে চট করে কিছু বলা মুশকিল। তবে একজনের নাম এখনই আমার মনে আসছে—ডাঃ তারা চন্দ্। তুমি তাঁর কথা জান কিনা জানি না। কয়েক বৎসর পূর্বে তিনি অক্সফোর্ডে ছিলেন, এবং কোন ঐতিহাসিক বিষয়ে ডক্টরেট লাভ করেন। এখন তিনি এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করছেন। তিনি ভারতবর্ষের ইতিহাসের মুঘল যুগ সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ। হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতি এবং ইসলাম কি ভাবে পরস্পরের উপর প্রভাব বিস্তার করে একটি সমন্বয়ের প্রয়াস পেয়েছে, এই বিষয়ে বিশেষভাবে পড়াশোনা ও গবেষণা করেছেন তিনি। কয়েক বৎসর পূর্বে তিনি বিষয়টি সম্পর্কে একটি গবেষণামূলক প্রবন্ধ পাঠ করেছিলেন হিস্টরিকাল সোসাইটিতে। ভাল হয়েছিল প্রবন্ধটি।

অবশ্য অধ্যাপকদের সঙ্গে পরিচয় খুব বেশী নেই আমার। অনেক উপযুক্ত ও যোগ্য ব্যক্তি নিশ্চয়ই আছেন তাঁদের মধ্যে।

রোহ্‌ডস মেমোরিয়াল লেকচার সম্পর্কে তোমার বক্তব্য আমি যথোচিত অভিনিবেশের সঙ্গে শ্রবণ করেছি। তোমার উপদেশ গ্রহণ করলাম। চট করে না বলছি না। তুমি যে সম্মান ও মর্যাদার কথা বলেছ তাও শুনলাম মন দিয়েই। ও দুটি বস্তু কারই বা ঈপ্সিত নয়। কিন্তু যদিচ তুমি বিশ্বাস করবে কিনা জানি না, আমার আকাঙ্খা সত্যিই কিছু বেশী নয় এবং নূতন ক্ষেত্রে প্রবেশের উদ্যম আমার তেমন নেই। যাই হোক, আমি মন খোলা রাখলাম; ঘটনাচক্র চলুক তার নিজের গতিতেই। আর মাসকয়েক পরে আমরা যে কী করব তা এখন বলা সহজ নয়। অনেক কারণে আমি ইংলণ্ডে যেতে ইচ্ছে করি কিংবা আমেরিকায়। আমার সব সময় মনে হয় যে ভারতবর্ষের কাজ বাইরে থেকেই বোধহয় করতে পারব আরও ভাল ভাবে। এখানে কেমন যেন মানিয়ে নিতে পারি না নিজেকে, এ অনুভূতি আমার নিত্যসঙ্গী, তার ফলে অস্বস্তি বোধ করি বইকি।

দুটি ছবি পাঠালাম। এরা এলাহাবাদের কথা মনে করিয়ে দেবে তোমাকে।

অ্যালেন লেন চাইছেন, আমি ভারতবর্ষের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে 'পেঙ্গুইনে' কিছু লিখি। কিন্তু ওই ধরনের কাজ সত্যিই বলতে, ঠিক আমার নয়। এ সম্পর্কে কী করব কিছু ঠিক করে উঠতে পারিনি। সময় কোথায় লেখার।

তোমাদের
জওহরলাল নেহরু

ডঃ এডওয়ার্ড টমসন
স্যান্ডর্স ক্লোজ, ব্লেডলো,
অ্যালসবেরী, ইংলণ্ড

২৯৬ জওহরলাল নেহরু কর্তৃক জে. হোমস স্মিথকে লিখিত

মীরাট
জানুয়ারি ১০, ১৯৪০

প্রিয় মিঃ হোমস স্মিথ,

পয়লা জানুয়ারি এলাহাবাদ ছেড়ে আসার কিছু পূর্বে আপনার চিঠিটি পেয়েছিলাম। খুব আনন্দের সঙ্গে এই চিঠির উত্তর লিখছি। আশা করি আমেরিকায়

বন্ধুদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করার ও আপনার সেখানকার সহকর্মীদের কাছে আমাদের কথা পৌঁছিয়ে দেওয়ার কাজে—এই পত্রটি হয়ত কিঞ্চিৎ সহায়তা করবে।

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতি আপনার উৎসাহপূর্ণ সহানুভূতি আমার অন্তর স্পর্শ করেছে। বিষয়টির সমর্থনে যুক্তরাষ্ট্রে আপনি যে কিছু করতে চাইছেন, এটিও আনন্দের কথা। আর এই কাজ করবার জন্যে লালবাগ আশ্রমের সংশ্রব ত্যাগ করতেও দ্বিধা করেননি আপনি। আমি আশা করি, আমেরিকায় আমাদের যেসব বন্ধু ও শুভানুধ্যায়ীরা আছেন তাঁদের উদ্দেশে আমাদের অভিনন্দন আপনি বহন করে নিয়ে যাবেন। আমরা অবশ্যই উপলব্ধি করি যে ভারতের মাটিতেই আমাদের সংগ্রাম ও জয়লাভ করতে হবে আমাদের স্বাধীনতার জন্যে। কিন্তু তাহলেও আমেরিকার জনগণের শুভেচ্ছা ও মতামতের প্রতি আমরা যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করে থাকি। আজকের পৃথিবীতে সবচেয়ে শক্তিশালী গণতন্ত্রের প্রতিনিধি তাঁরা, এবং আমার সন্দেহ নেই ভবিষ্যৎ বিশ্বের রূপায়ণে তাঁদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নির্দিষ্ট হয়ে আছে। ভারতে আমরাও স্বাধীন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য কৃতসংকল্প, আর তাই স্বভাবতই প্রেরণা ও আদর্শের জন্য আমেরিকার প্রতি আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ। আমার মনে হয় যে, চীন ও ভারতকে বাদ দিয়ে বিশ্বসমস্যার সঠিক সমাধান স্পষ্টতই অসম্ভব। এবং এই দুই জাতিকে পূর্ণ মর্যাদা দিতে হবে স্বাধীন জাতি হিসাবে মেনে নিয়ে। আর সেই জন্যেই আমরা আমাদের স্বাধীনতার দাবি জানাচ্ছি। কিন্তু একথাও বলেছি আমরা যে বিশ্বে নববিধানের প্রবর্তনের জন্যে কাজ করে যেতে আমরা প্রস্তুত। তার জন্যে সর্ববিধ সহযোগিতা করতে রাজী আছি আমরা। একাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হওয়ার জন্য প্রয়োজন শান্তি, মুক্তি ও গণতন্ত্রের ভিত্তিভূমি। আর এই জন্যেই ভারতে ও চীনে স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়া এত দরকার। তা না হলে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাগুলির সমাধান হবে না কোনদিনই, চলতেই থাকবে এই অসাম্য ও সংঘাত। চীন ও ভারতের প্রচণ্ড শক্তি -যার কিছুটা প্রকাশিত, অনেকটাই সম্ভাবনারূপে অপ্রকট,-বিশ্বের ঘটনাবলীর উপর সক্রিয় হতে বাধ্য।

বর্তমানে আমাদের সর্বশক্তি স্বাধীনতা-সংগ্রামে নিয়োজিত। কিন্তু কোন্ পরিপ্রেক্ষিত থেকে আমরা সবকিছু করছি তা বললাম। আর তা করতে গেলে আমেরিকার কথা ভাবতেই হয় আমাদের।

ইউরোপীয় যুদ্ধ সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীর কথা আপনি জানেন। ফ্যাসিস্ত ও নাৎসী মতবাদের বিরুদ্ধে আমরা চিরদিনই। এবং সব রকম আক্রমণের নিন্দা করে এসেছি আমরা। আমরা যদি নিশ্চিতভাবে জানতাম যে, এই যুদ্ধের একপক্ষে স্বাধীনতা, অপরপক্ষে নাৎসীবাদ, তাহলে বিনা দ্বিধায় আমরা স্বাধীনতার সপক্ষে দাড়াতাম। কিন্তু ব্রিটিশ সরকারকে যখন আমরা যুদ্ধের উদ্দেশ্য স্পষ্ট করে ঘোষণা করতে বললাম আর ভারতের সঙ্গে স্বাধীনজাতিসুলভ আচরণের প্রস্তাব করলাম তখন অসৌজন্যের সঙ্গে তা প্রত্যাখ্যান করা হল। পরিষ্কার বোঝা গেল, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ রক্ষাকল্পেই এই যুদ্ধ। এই উদ্দেশ্যে আমরা আমাদের জনশক্তি ও প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার করতে দিতে পারি না। আমরা যেমন নাৎসীবাদের বিপক্ষে, তেমনই সাম্রাজ্যবাদেরও বিরুদ্ধে। কাজেই দেখা যাচ্ছে, বর্তমানে, এযুদ্ধ দুই দল বিবদমান সাম্রাজ্যবাদীদের মধ্যে নিবদ্ধ। এর কোন পক্ষের প্রতিই আমাদের কোন পক্ষপাত থাকতে পারে না। যতক্ষণ না স্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হচ্ছে যে, এই যুদ্ধের লক্ষ্য স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র, ততক্ষণ আমরা নিরপেক্ষ থাকতে বাধ্য। ভারতবর্ষের প্রতি আচরণের দ্বারাই তা

স্পষ্ট হবে। আমাদের দাবি খুব সরল, যদিও তার সঙ্গে কয়েকটি মূল প্রশ্ন জড়িত। আমরা চাই—ভারতবর্ষের স্বাধীনতা, এবং কোনরকম বহিঃশক্তির হস্তক্ষেপ ব্যতীত একটি গণ-পরিষদের মাধ্যমে ভারতের জনসাধারণ কর্তৃক নিজেদের শাসনতন্ত্র গঠনের অধিকারের স্বীকৃতি। আমরা মনে করি, এ প্রস্তাব কার্যে রূপায়িত হলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের, তৎসহ সকল সাম্রাজ্যবাদের কাঠামোর গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী—এবং এর দ্বারা সাধারণভাবে সাম্রাজ্যবাদের অবসান ঘটবে।

আমরা যে ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে এই নীতি গ্রহণ করেছি, সে সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট ও পরিচ্ছন্ন ধারণা, মার্কিন জনসাধারণের থাকুক—এটি আমাদের আন্তরিক কামনা। কারণ তা থাকলে, তার থেকে উৎসারিত হবেই শুভেচ্ছা ও সহানুভূতির ধারা। আমাদের আদর্শ ও লক্ষ্যের প্রতি তাঁদের আস্থা থাকা খুবই দরকার।

আমার ইচ্ছা, এই বাণীই আপনি বহন করে নিয়ে যান আমাদের আমেরিকান বন্ধুদের উদ্দেশে। আপনি জানেন, ভারতের বর্তমান পরিস্থিতি অত্যন্ত অনিশ্চিত। যে কোন সময়েই গুরুত্বপূর্ণ নানা ঘটনা ঘটবার সম্ভাবনা। কিন্তু ভালমন্দ যাই হোক না কেন, এই আদর্শ আমরা কিছুতেই পরিত্যাগ করব না, সব সময় চেষ্টা করব এই লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার, এই আদর্শকে বাস্তবে রূপায়িত করার জন্যে।

সংখ্যালঘু-সমস্যা আমাদের স্বাধীনতার পথে একটি বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সত্যি বলতে এরকম হওয়ার কোন কারণ নেই। ভারতীয় ঐক্য, স্বাধীনতা এবং গণতন্ত্রের সীমানার মধ্যে সংখ্যালঘুদের স্বার্থরক্ষার সর্ববিধ প্রতিশ্রুতি দিতে আমরা প্রস্তুত।

আপনার ও আপনার সহকর্মীদের উদ্দেশে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা নিবেদন করছি।

ভবদীয়
জওহরলাল নেহরু

মিঃ জে. হোমস স্মিথ
আশ্রম, লালবাগ, লখনউ

২৯৭ জওহরলাল নেহরু কর্তৃক মহাত্মা গান্ধীকে লিখিত

জানুয়ারি ২৪, ১৯৪০

প্রিয় বাপু,

যুদ্ধ সম্পর্কে মলোটভের বক্তৃতার কথা আপনি আমায় জিজ্ঞাসা করেছিলেন সেবাগ্রামে। উত্তরে আমি কিছু বলেছিলাম তা প্রায় অস্পষ্ট। মলোটভের বক্তৃতার পর অনেক কিছুই ঘটেছে এবং পরিস্থিতি খুব সঙ্গীন হয়েছে। আমার মনে কিছুমাত্র সন্দেহ নেই যে, ফিনল্যাণ্ডের সঙ্গে যে ব্যবহার রাশিয়া করেছে, সেটা রাশিয়ার পক্ষে খুব বড় রকমের একটা ভুল এবং এই ভুলের মাশুল তাদের দিতে হবে। আমাদের যা ভাবিয়ে তুলেছে তা হল এই যে, ইঙ্গ-ফরাসী-জার্মান দ্বন্দ্বের অন্তরালে চলছে সাম্রাজ্যবাদ ও নাৎসীবাদের সংহতি-সাধন, যার উদ্দেশ্য রাশিয়ার সঙ্গে লড়াই করা। আগের চেয়েও এখন ব্যাপারটা স্পষ্টতর যে, এই যুদ্ধের উভয়পক্ষই সাম্রাজ্যবাদী আকাঙ্খা লালন করছে। চমৎকার সব বচনামৃত বিতরণ করছেন ধুরন্ধর রাজনৈতিক নেতারা। ১৯১৪তেও একই কর্ম করেছিলেন তাঁরা। এই সব উক্তিতে ও ধার্মিক ঘোষণায় যেন আমরা বিভ্রান্ত না হই। ভারতবর্ষে আমাদের অবস্থা এবং ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে আমাদের আলোচনার সঙ্গে এর গভীর যোগাযোগ বিদ্যমান। এই সরকারের উদ্দেশ্য হল যুদ্ধের জন্যে আমাদের সদিচ্ছা সংগ্রহ করা। ভারতবর্ষের কথা সম্পূর্ণ বাদ দিলেও, বর্তমান অবস্থায় এই সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে আমাদের নৈতিক

সমর্থন দানের কোন সঙ্গত কারণ আমি তো দেখছি না। অবশ্য ব্রিটেন যদি তার মনোভাবের কোন বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটায় এবং ভারতের স্বাধীনতার দাবি মেনে নেয়, তাহলে বুঝতে হবে তার সাম্রাজ্যবাদই পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছে। কিন্তু যা সম্ভবপর বলে মনে হচ্ছে তা হল এই যে, এই সাম্রাজ্যবাদ যথাপূর্বং তথা পরং রয়ে যাবে, তার স্বার্থেই চালানো হবে যুদ্ধ, যদিচ ঘটনার চাপে হয়ত ভারতবর্ষ সম্পর্কে অস্পষ্ট রকমের কোন ঘোষণা করা হতে পারে। সেই সঙ্গে এই কথাও বলা হবে যে, ওই সব ঘোষণা বাস্তবে রূপায়িত হবে এখন নয়, যুদ্ধ শেষ হলে তারপর। ওদের শর্তে রাজী হওয়ার অর্থ হবে এই যে, আমরা চাই আর না-চাই, সর্ববিধভাবে সাম্রাজ্যবাদী দুরভিসন্ধিপূর্ণ কার্যক্রম অনুমোদন করতেই হবে আমাদের। বলা বাহুল্য অবস্থাটা হবে খুবই বিপজ্জনক। কাজেই, আমার মনে হচ্ছে, আমাদের খুব সতর্কতা ও বিচক্ষণতার সঙ্গে চলতে হবে এবং পরিষ্কার ভাবে দেখতে হবে, আমরা যেন কিছুতেই যুদ্ধের সাম্রাজ্যবাদী লক্ষ্য সমর্থন না করি।

যে কথা আগে বলছিলাম। অবস্থাটা শীঘ্রই আরও বেশী জটিল হয়ে পড়বে, যদি ইতালীর সঙ্গে তাদের ষড়যন্ত্র সার্থক হয় এবং পশ্চিমী শক্তিগুলি যদি রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। তারা এটাকে কমুনিজমের বিরুদ্ধে জেহাদ বলে দাবি করবে এবং এর দ্বারা নিজেদের সাম্রাজ্য বজায় রাখার চেষ্টা তো করবেই, সেই সঙ্গে আরও চাইবে সোভিয়েট রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে ভেঙে ফেলতে। সব দিক দিয়ে দেখলে তা হবে একটা বড় রকমের শোচনীয় ঘটনা। রাশিয়ার নীতির সঙ্গে আমাদের মতৈক্য আছে কিনা সেকথা এ প্রসঙ্গে অবান্তর। আপনাকে অনুরোধ, একথা মনে রেখে এবং এই দৃষ্টিকোণ থেকেই ভারতবর্ষের ঘটনাবলী বিবেচ্য।

আপনি নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন যে, আপনার প্রবন্ধগুলির দু-একটি আশাবাদী কথা থেকে এবং আনন্দ-ভবনে যুক্তপ্রদেশের গভর্নরের আগমনের মতো ছোটখাট ঘটনা থেকে, সর্বত্র এই ধারণার সঞ্চার হয়েছে যে ব্রিটেনের সঙ্গে কোন একটা বোঝাপড়া বুঝি হতে চলেছে এবং কংগ্রেসী মন্ত্রীরা বোধহয় শীঘ্রই আবার শাসনভার গ্রহণ করতে চলেছেন। এই ধারণা থেকে মুনাফা লুটছেন জিন্না সাহেব, কৌতুক করছেন আমাদের স্বাধীনতার রূপ নিয়ে। মুসলিম লীগ সুযোগ পাচ্ছে আর একটু মাথা তোলবার। আর সংবাদপত্রের সম্পাদকেরা যথারীতি ভুল করে চলেছেন। এর ফলে ভারতবর্ষে এবং ইংলণ্ডেও জনসাধারণের মনে ভ্রান্ত ধারণার প্রসার ঘটছে। এতে মীমাংসার সম্ভাবনাও যাচ্ছে কমে। যা হবে তা হচ্ছে এই যে, ভাইসরয় আবার বলবেন তাঁকে ভুল বোঝানো হয়েছিল। আজই দেখলাম 'পাইওনিয়র' হেডিং দিয়েছেন—"ভাইসরয় বলছেন—কংগ্রেসী মন্ত্রীদের পদত্যাগের সংবাদ ধাপ্পাবাজী..." ইত্যাদি ইত্যাদি। নেপথ্যে কী ঘটছে?—সর্বত্র এই প্রশ্ন! সবাই আকস্মিকভাবে খুব বড় রকমের একটা কিছু ঘটবার অপেক্ষায় রয়েছে।

তথ্য ও প্রকৃত অবস্থার সঙ্গে এর যে কোন যোগ নেই, তাই নয় শুধু, কোন রকম মানসিক বা অন্যবিধ প্রস্তুতির এ এক অন্তরায়।

ব্যক্তিগতভাবে আমার মনে হয়, মীমাংসার কোন আশাই এখন নেই। ব্রিটিশ সরকার যে তা চাইছেন না এমন নয়। কিন্তু আমাদের ন্যূনতম দাবিও তাঁরা খুব বেশী মনে করেন, এবং তা মানতে তাঁরা নারাজ। বর্তমানে ব্রিটিশ সরকার চূড়ান্ত প্রতিক্রিয়াশীল এবং সাম্রাজ্যবাদী। এবং বর্তমান স্তরে তাঁদের কাছ থেকে কিছু আশা করার কোন অর্থ হয় না। কোন রকম ভ্রান্ত আশাকে প্রশ্রয় দিলে নিজেদেরই

দুর্বল করা হবে। আমার মত হচ্ছে অন্যদিকে চাপ দেওয়া, যাতে অপরপক্ষ বাস্তব অবস্থা সম্বন্ধে সচেতন হয় এবং তার সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে নিতে বাধ্য হয়।

স্নেহবদ্ধ

মহাত্মা গান্ধী জওহরলাল

২৯৮ জওহরলাল নেহরু কর্তৃক মহাত্মা গান্ধীকে লিখিত

এলাহাবাদ, ফেব্রুয়ারি ৪, ১৯৪০

ব্যক্তিগত

প্রিয় বাপু,

আগামীকাল আপনি দিল্লী পৌছচ্ছেন এবং মনে তো হচ্ছে যে, সেখানে সপ্তাহখানেক বা তার একটু বেশী থাকবেন। আমি জানি না এর মধ্যে কিছু ঘটবে কিনা এবং আপনি আমাদের কাউকে ডেকে পাঠাবেন কিনা। ব্যক্তিগতভাবে, এমনতর কিছু হওয়ার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা আছে বলে আমি মনে করি না, কারণ সরকার তাঁদের মনোভাব কিছুমাত্র বদলাবেন বলে মনে হয় না। যাই হোক, আমি আপনাকে জানিয়ে রাখতে চাই যে, আগামী দুই সপ্তাহের মধ্যে দিল্লী যাওয়ার চিন্তা করাও আমার পক্ষে শক্ত। এই সময়টা আমি খুবই ব্যস্ত থাকব। আজ রাত্রে দিন দুইয়ের জন্যে লখনউ যাচ্ছি। ৭ই একদিনের জন্যে এলাহাবাদ আসব। ৮ই সকালে যাত্রা করব বোম্বাইয়ের উদ্দেশে। সেখানে প্ল্যানিং কমিটির জরুরী বৈঠকে আমাকে যোগ দিতে হবে। কয়েকটি বিষয় আলোচনার জন্যে আমি এই কমিটি আহ্বান করেছি। আমি না গেলে সমস্তটা বিশৃংখল ও বাজে হয়ে যাবে। ৯ই সকাল থেকে ১২ই রাত্রি পর্যন্ত বোম্বাইয়েই থাকছি। তারপর লখনউ। ১৪ই, ১৫ই ও ১৬ই লখনউ থাকব। প্রদেশ কংগ্রেসের বৈঠক ও প্রতিনিধি সম্মেলন। পরের দুটি দিন গোরখপুর। বড় রকমের জনসমাবেশ আশা করা হচ্ছে সেখানে। সংক্ষেপে এই হল আমার আগামী দুই সপ্তাহের কর্মসূচী।

বিগত একমাসের ঘটনাবলী আমার এই বিশ্বাসকে দৃঢ়তর করেছে যে, ব্রিটিশ সরকার কিছুতেই আমাদের দাবি মেনে নেবেন না। সত্যি বলতে, এমন অনেক কিছু ঘটেছে যা থেকে মনে হয় যে তাঁরা তাঁদের নিকৃষ্ট সাম্রাজ্যবাদী নীতি অনুসরণে কৃতসংকল্প। আপনি নিশ্চয়ই লক্ষ্য করে থাকবেন যে ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট ভারত-শাসন-আইনের সংশোধন করে একটি বিল পাস করেছেন। এর দ্বারা প্রাদেশিক সরকারগুলির কর নির্ধারণের ক্ষমতা খর্ব করা হয়েছে। মনে হয় যুক্তপ্রদেশে সম্পত্তি-কর সম্পর্কে যে আইন করা হয়েছিল এটি তার সম্পর্কে এবং ফলে তা বাতিল হয়েছে। প্রাদেশিক বিধানসভার ক্ষমতা হরণের কুমতলব ছাড়াও যে সময়ে ও পদ্ধতিতে তা করা হল সে সব কিছু থেকে ব্রিটিশ সরকারের সাম্রাজ্যবাদী মনোভাবেরই পরিচয় পাওয়া যায়, এবং এও প্রমাণিত হয় যে সেই মনোভাবের কিছুমাত্র পরিবর্তন হয়নি।

সম্প্রতি লণ্ডনে রয়াল সেণ্ট্রাল এশিয়ান সোসাইটি একটি সামাজিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন, সে সম্বন্ধে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে কিনা জানি না। লর্ড জেটল্যাণ্ড তাতে সভাপতিত্ব করেন এবং মন্ত্রিসভার কয়েকজন সদস্য সেখানে উপস্থিত ছিলেন। এই অনুষ্ঠানের প্রতীয়মান উদ্দেশ্য ছিল লণ্ডনে মুসলিম ধর্ম ও সংস্কৃতির একটি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা; আর প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল প্যান-ইসলামবাদকে উৎসাহ প্রদান এবং ভারতের অন্যান্য দেশের মুসলমানদের মনোভাবকে যুদ্ধের অনুকূলে কাজে লাগানো। কী ভাবে যে যুদ্ধ

পাকা রকমের সাম্রাজ্যবাদী চেহারা নিচ্ছে এবং ঘটনাবলীর পুনরাবৃত্তি ঘটছে তা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়।

এই সব কিছুর সঙ্গে এমনতর ধারণা কিছুতেই করা যায় না যে, ইংলণ্ড তার অধীন দেশগুলির মুক্তির আয়োজন করছে। আবার আমরা আপনাকে পুরোভাগে রেখে মিছিল করে যাচ্ছি ভাইসরয়ের সমীপে—এরকম কোন চিত্র আমার কল্পনা করতেও খারাপ লাগে। সেই পুরনো পালা, সেই পুরনো পশ্চাদ্‌ভূমি, সেই পুরনো লক্ষ্য, অভিনেতারাও বদলাননি এবং পরিণতিও বলা বাহুল্য অপরিবর্তিতই থাকবে।

এ ছাড়া আছে অপ্রত্যক্ষ এবং অকাম্য কিছু ফলাফল। সারা দেশ জুড়ে এই যে সম্ভাব্য মীমাংসার আশা এর তো কোন ভিত্তি নেই। এই আবহাওয়া দৌর্বল্য ও নৈরাশ্য সঞ্চার করবে। কারণ যে কোন মূল্যে সংঘর্ষ এড়িয়ে যাওয়ার উদগ্র কামনা এবং হৃত ক্ষমতা ফিরে পাওয়ার বাসনা ব্যক্তিগতভাবে অনেকেরই মনে রয়েছে। সংঘাত সাধারণত কাম্য নয় সত্য কিন্তু তা এড়িয়ে যাওয়ার জন্যে যে কোন মূল্য দেওয়া যায় না। অনেক সময় এই এড়িয়ে যাওয়াটাই সবচেয়ে ক্ষয় ও ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়ায়। এড়িয়ে গিয়েই সর্বাধিক মূল্য দিয়ে ফেলা হয়। এই মুহূর্তে অবশ্য কোন সংঘাত আসন্ন নয়। এখন দেখা দরকার, আমরা যেখানে রয়েছি সেখানেই যেন মর্যাদার সঙ্গে থাকতে পারি এবং এক চুলও হঠে না যাই। কোন রকম দৌর্বল্য যেন প্রশ্রয় না পায়। আমার আশঙ্কা, ইংলণ্ডে (এবং ভারতবর্ষেও) এমন একটা ধারণার সৃষ্টি হয়েছে যে, কোন অবস্থাতেই আমরা সংঘাতের মধ্যে গিয়ে পড়তে চাইব না, এবং যে কোন শর্তে মীমাংসা স্বীকার করে নেব। এই ধরনের ধারণা আত্মবিশ্বাসহীন। আমি লক্ষ্য করেছি গত এক পক্ষকালের মধ্যে অনুষ্ঠিত কংগ্রেস প্রতিনিধি-নির্বাচনের পিছনেও এই মনোভাব সক্রিয় ছিল। যে সব লোক সংঘাতে সম্ভাবনায় আড়ালে চলে গিয়েছিল, তারাই ঠেলাঠেলি করে পুরোভাগে আবার এগিয়ে আসছে। পদমর্যাদা এবং ক্ষমতালাভের প্রত্যাশায় প্রলুব্ধ হওয়ার জন্যেই তাদের এই লম্ফঝম্প। কিছুকাল যাবৎ অবাঞ্ছিত ব্যক্তিদের কংগ্রেসে অনুপ্রবেশে বাধা দেওয়া হচ্ছিল। তা এখন কিয়ৎপরিমাণে ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে। ব্যর্থতার মূলে আছে আবহাওয়ার এই পরিবর্তন, যা থেকে তাদের ধারণা হয়েছে একটা মিটমাট বুঝি হল বলে।

ব্রিটিশ সরকারের চালচলনও আমাদের প্রতিকূলে। যদিচ তাঁরা খুব মোলায়েম ভাষা ব্যবহার করছেন। বলা বাহুল্য, যুদ্ধের সপক্ষে আমাদের সমর্থন তাঁদের দরকার, আর সেজন্যে একটা মীমাংসা তাঁরাও চান। কিন্তু তার জন্যে সামান্য পরিমাণ ক্ষমতা ত্যাগ করতে, বা সাম্রাজ্যবাদী নীতির সামান্যতম পরিবর্তন করতে তাঁরা নারাজ। সাম্প্রদায়িক সমস্যা নিয়ে তাদের পুরনো ষড়যন্ত্র তাঁরা চালিয়ে যাচ্ছেন এবং চালিয়ে যাবেন। যদিচ কংগ্রেসকে সান্ত্বনাদানের ছলে মুসলিম লীগকে দু-একটা কড়া কথা শোনাবেন তাঁরা। এক কথায় ওঁদের মতলব হল বর্তমান অবস্থা পুরোপুরি বজায় রেখে আমাদের দলে টানা। এ উদ্দেশ্য এপথে সিদ্ধ হল তো হয়েই গেল। আর তা না হলে, ভারতীয় নেতাদের সঙ্গে মাঝে মাঝে আলাপ চালাও, সমস্যাটাকে জীইয়ে রাখো, এমনতর একটা ভাবের সৃষ্টি করো যা থেকে লোকে মনে করে একটা বোঝাপড়া এই বুঝি হল বলে। এই ভাবে ধোঁকা দাও ভারতীয় তথা বিশ্বের জনমতকে। ওঁদের দিক থেকে এই দ্বিতীয় পদ্ধতিটির আরও একটা বাড়তি সুবিধে রয়েছে। এর দ্বারা আমাদের শক্তির খানিকটা অপচয় ঘটানো যাবে, কিছুটা নিচু করে আনা যাবে আমাদের কণ্ঠস্বর, কাজেই শেষ পর্যন্ত সংঘাত যদি আসেই তো আমরা আবিষ্কার করব যে তার উপযুক্ত পরিবেশ আর

নেই তখন। ইংলণ্ডের সরকারী মহলের ধারণা এই যে, তাঁদের এই আলোচনা আর মুলতুবি নীতির ভারি সুফল ফলেছে এই দেশে। কংগ্রেসী মন্ত্রীরা যখন পদত্যাগ করেছিলেন তখন পরিস্থিতি ওঁদের পক্ষে খুবই সংকটজনক হয়ে উঠেছিল। এখন সব ঠিকঠাক। আবহাওয়া পরিষ্কার। আর কোন ভয় নেই।

যদিও আমরা কোন সংঘাত সৃষ্টি করতে এবং কোন সম্মানজনক মীমাংসার পথ রোধ করতে চাই না এবং মীমাংসার পথ রোধ করা কখনই আপনার নীতি নয়; কিন্তু এ কথাটাও আমরা খুব স্পষ্ট রাখতে চাই যে, আমাদের পূর্ব-প্রদত্ত শর্ত ছাড়া অন্য কোনরকম মীমাংসা হবে না, হতে পারবে না। এমনকি যুদ্ধের ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে সে শর্তেরও পরিবর্তন করতে পারি আমরা। একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। এক সময় আমরা জানতে চেয়েছিলাম, এই যুদ্ধের লক্ষ্য সাম্রাজ্যবাদী কিনা। আমরা এখন আর তা জানতে চাই না। আমাদের সঙ্গে ব্রিটিশ সরকারের আচরণ এবং তাঁদের পরবর্তী কালের পররাষ্ট্রনীতি থেকে সুস্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে পুরো মাত্রায় সাম্রাজ্যবাদী অভিসন্ধি নিয়েই তাঁরা লড়ছেন। কাজেই এ যুদ্ধ যে সাম্রাজ্যবাদী, এই তথ্যটি স্বীকার করেই আমাদের চলতে হবে, তা ওঁরা যতই উল্টো কথা বলুন না কেন। যুদ্ধ ও ব্রিটিশ নীতি দিনের পর দিন ক্রমাগত অধিকতর দূষিত হয়ে উঠছে। ভারতবর্ষ এই সাম্রাজ্যবাদী অভিযানের সঙ্গে জড়িয়ে পড়বে, এমন কথা ভাবতেও আমার ঘৃণা হয়। কারণ তার ফলে ভারতবর্ষের বাস্তব ক্ষতি তো হবেই, আত্মিক ক্ষতি হবে তার চেয়েও বেশী। এ দিকটি আমার মনে হয়, খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

কাজেই বিশ্বের, ব্রিটিশ সরকারের এবং ভারতীয় জনগণের সমক্ষে আমাদের নিজেদের দিকের কথা স্পষ্ট করে বুঝিয়ে বলা খুবই জরুরী বলে মনে হয়। এই আপোষ সম্পর্কে বড্ড বেশী ভুল ধারণা রয়ে গিয়েছে। এবং এই ভুল ধারণা বজায় থাকাটা আমাদের স্বার্থের পক্ষে সমূহ ক্ষতিকারক এবং বৃটিশ সরকারের পক্ষে চরম সুবিধাপ্রদ। ওঁরা আমাদের সম্পদ যুদ্ধের কাজে তো লাগাবেনই, এমন কি ভান করবেন যেন আমাদের সদিচ্ছাও রয়েছে ওঁদের দিকেই। আমাদের তরফ থেকে ব্রিটিশ সরকার বা ভাইসরয়ের কাছে কোন আবেদনে এই ভুল ধারণা আরও বাড়বে এবং ব্রিটিশ সরকার সুমীমাংসার পথ থেকে আরও সরে যাবেন।

রাজাগোপালাচারীর সাম্প্রতিক কয়েকটি ভাষণে আমি ব্যথিত হয়েছি। তাতে ডোমিনিয়ান স্টেট্যাস মেনে নেওয়ার অনুকূলে বাড়াবাড়ি রকমের উৎসাহ দেখানো হয়েছে। কংগ্রেস বহুকণ্ঠে বহু এবং পরস্পরবিরোধী কথা বললে তো মুশকিল। ফলে গোলমাল এবং অস্বস্তি বাড়লে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। অন্ততপক্ষে স্বাধীনতার প্রশ্নে একমত প্রকাশ করা বাঞ্ছনীয়।

আজ আপনাকে দুটি দীর্ঘ পত্রাঘাত করলাম। সেজন্যে আপনি নিশ্চয়ই ক্ষমা করবেন আমায়।

স্নেহবদ্ধ
জওহরলাল নেহরু

মহাত্মা গান্ধী
নয়াদিল্লী

২৯৯ জওহরলাল নেহরু কর্তৃক আবুল কালাম আজাদকে লিখিত

এলাহাবাদ
ফেব্রুয়ারি ২২, ১৯৪০

প্রিয়বরেষু মওলানা,

আপনার বিবেচনার জন্যে কয়েকটি কথা উপস্থাপিত করা গেল। গতকাল স্টেশনে আলোচনার অবকাশ ছিল না।

১। যুদ্ধের শুরু থেকেই ব্রিটিশ সরকারের নীতি-সমূহ প্রমাণ করছে যে তাঁরা চিন্তাপূর্বক এবং সুপরিকল্পিত ভাবে সাম্রাজ্যবাদী পন্থা অনুসরণ করছেন। যুদ্ধের পূর্বে চেম্বারলেন-সরকার অত্যন্ত প্রতিক্রিয়াশীল নীতি অনুসরণ করে কয়েকটি ক্ষেত্রে নাৎসী ও ফাসিস্ত শক্তিগুলিকে উৎসাহিত করেছিলেন এবং ইউরোপে গণতন্ত্রকে ধ্বংস করেছিলেন। আবিসিনিয়া, স্পেন, অস্ট্রিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া ও আলবানিয়া তার দৃষ্টান্ত। মাঞ্চুরিয়ার ক্ষেত্রেও তাঁরা ওই নীতিই অবলম্বন করেছিলেন। চেম্বারলেন-সরকারের মতো প্রতিক্রিয়াশীল ও সাম্রাজ্যবাদী সরকার বিগত একশত বৎসরের মধ্যে ইংলণ্ডে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়নি।

অবশ্য শেষ পর্যন্ত যখন নিজেদের সাম্রাজ্য বিপন্ন হল তখন গণতন্ত্রের ধুয়ো তুলে তার আড়ালে যুদ্ধ আরম্ভ করলেন তাঁরা! রাতারাতি গণতন্ত্রের পূজারী হয়ে উঠলেন তাঁরা, এটা মেনে নেওয়া সহজ নয়। পরবর্তীকালের ঘটনাবলী থেকে প্রমাণিত হয় যে, তাঁদের পুরাতন নীতি কিছুমাত্র পরিবর্তন হয়ইনি, বরং আরও নিষ্ঠার সঙ্গে তা অনুসৃত হচ্ছে। অবশ্য এখন তাঁরা চান হিটলারের অপসারণ, কারণ তিনি ওঁদের সাম্রাজ্যের পক্ষে বিপদ হয়ে উঠেছেন। পুরাতন নীতিটি ছিল ইওরোপ, দূর প্রাচ্যে, এমন কি আমেরিকার প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলিকে উৎসাহ দান এবং রাশিয়াকে দুর্বল করার প্রয়াস। রাশিয়ার প্রতি ওঁদের এহেন দৃষ্টির কারণ, রাশিয়া ওই সব প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলির প্রতি চ্যালেঞ্জ স্বরূপ এবং সে সাম্রাজ্য-বাদের বিপক্ষে। একদিকে নাৎসী শক্তির বৃদ্ধিতে আতঙ্কিত হয়ে মাঝে মাঝে সাহায্যের জন্য রাশিয়ার দ্বারস্থ হতে হয় ওঁদের, আবার অন্যদিকে গণতন্ত্রের প্রসার ও রাশিয়ার প্রতি তাঁদের বিরূপতার জন্যে রাশিয়ার সঙ্গে সহযোগিতা করাও সম্ভব নয় তাঁদের পক্ষে। কাজেই শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাঁরা হিটলার ও মুসোলিনী সম্পর্কে তোষণনীতি অবলম্বন করে ওই দুজনের শক্তি বৃদ্ধি করতে সাহায্য করেছেন। ওঁদের মতলব ছিল হিটলারকে রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত করা এবং এইভাবে ওঁদের দুই প্রবল শত্রুকেই দুর্বল করা। অন্য কোন কারণে তাঁরা জার্মানী ও ইতালীর সমৃদ্ধি চাননি।

এই ভাবেই তাঁরা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। এমন সময় রাশিয়া বুঝতে পারল যে, পরিস্থিতি তার পক্ষে খুবই বিপজ্জনক। ব্রিটিশ নীতিকে তারা সন্দেহের চোখে দেখল। উল্টো চাল তারা দিল নাৎসী জার্মানীর সঙ্গে বোঝাপড়া করে নিয়ে। ব্রিটিশের চাল এখানকার মতো ভেস্তে গেল।

অবশ্য ব্রিটেনের সোভিয়েট-বিরোধী মৌলিক নীতি বজায় রাখা হল। লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, এখনও ব্রিটিশ সরকার যতটা সোভিয়েট-বিরোধী ততটা জার্মান-বিরোধী নয়। যদিও জার্মানীর সঙ্গে ব্রিটেন যুদ্ধরত। এঁরা এমন চেষ্টাও করেছেন যার দ্বারা জার্মানীতে আভ্যন্তর-পরিবর্তন ঘটানো যায়। হিটলার সৈন্য-বিভাগের নেতাদের হাতে ক্ষমতা অর্পণ করলে এঁরা তাদের সঙ্গে শান্তি স্থাপন করে নেবেন। এরপর ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্মানী ও অন্যান্য দেশ মিলে রাশিয়া আক্রমণ করতে পারে। অবশ্য ঘটনার ধারা এই পরিকল্পনানুযায়ী বইবে কিনা বলা শক্ত। কিন্তু কথাটা হচ্ছে, নানাবিধ ঘোষণা সত্ত্বেও যুদ্ধ শুরু হওয়ার পরও ব্রিটিশ নীতি প্রতিক্রিয়াশীল ও সাম্রাজ্যবাদীই থেকে গিয়েছে।

২। রাশিয়া অনেক ভুল করেছে, বিশেষ করে, আমার মনে হয়, নীতি এবং উপযোগিতা উভয় দিক দিয়ে বিচার করলে তাদের ফিনল্যাণ্ড আক্রমণ একটি বড় রকমের ভুল। একথা সত্যি যে, ইংলণ্ড ফিনল্যাণ্ডকে রাশিয়ার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের একটি কেন্দ্র করে তুলছিল এবং রাশিয়ার বিরুদ্ধে ফিনল্যাণ্ডকে ঘাটি হিসেবে ব্যবহার

করার মতলবও তাদের ছিল। ওখানে যুদ্ধের সরঞ্জামও জড়ো করা হচ্ছিল। রাশিয়া ভীত হয়ে তাদের ব্যবস্থা বানচাল করার জন্যে ফিনল্যান্ড আক্রমণ করে বসে। এর দ্বারা তারা ইংলন্ড ও ফ্রান্সের ফাঁদেই পা দিয়েছে বলা যায় এবং সারা বিশ্বের প্রগতিপন্থী জনমতকে বিক্ষুব্ধ করেছে। এর ফলে ইংলন্ড সুযোগ পেয়েছে গণতন্ত্রের ধবজাধারীর ভূমিকা গ্রহণ করার এবং এইভাবে নিজেদের বিগত কয়েক বছরের কুকর্ম ধামাচাপা দেওয়ার। যে লীগ অব নেশানস নাৎসী ফাসিস্ত আক্রমণ সম্পর্কে একটি কথাও উচ্চারণ করেননি, তাঁরাই হঠাৎ ঘুম ভেঙে জেগে উঠে রাশিয়ার নিন্দা করছেন। আমার মনে কোন সন্দেহ নেই যে, রাশিয়ার সাম্প্রতিক নীতি ভ্রান্ত এবং নিন্দার্হ। কিন্তু একথাও ভুললে চলবে না যে রাশিয়ার ভ্রান্তনীতি গড়ে ওঠার পিছনে আছে, রাশিয়াকে ঘিরে ফেলার জন্যে ব্রিটিশ সরকারের ক্রমাগত অপপ্রয়াস। এ ছাড়া আমাদের এটাও লক্ষ্য করতে হবে যে, ব্রিটিশ সরকার ফিনল্যান্ডের পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে নিজেদের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থরক্ষা ও রাশিয়ায় যুদ্ধের বিস্তৃতি ঘটাতে চাইছে। আমাদের পক্ষে এতে বিপদ আছে। কারণ ইংলন্ড এবং রাশিয়ার মধ্যে যুদ্ধ বাধলে আমাদের সীমান্ত দ্বন্দ্বের আওতায় আসবে। কাজেই আমাদের নিজেদের নীতি পরিস্কার থাকা দরকার। রাশিয়ার অনেক কাজের সমালোচনা আমরা করব এবং সেগুলি আমরা অনুমোদন করব না কিন্তু তার সুযোগে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে তার স্বার্থসিদ্ধি করতে দেওয়াটা সমূহ বিপদের কারণ হবে।

আমার মনে হয়, যুদ্ধের ফলে রাশিয়া যদি দুর্বল কিংবা পঙ্গু হয়ে পড়ে, তাহলে সেটা হবে একটা ট্রাজেডি। কারণ তার অর্থ হবে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সবচেয়ে বড় শক্তির অপসারণ। এ ছাড়াও, যা-কিছু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে শক্তিশালী করে তোলে তাই আমাদের পক্ষে বিপদের কারণ। কাজেই রাশিয়ার বিষয়ে ব্রিটিশ নীতি সম্পর্কে আমাদের সজাগ থাকতে হবে এবং স্পষ্টভাবে জানিয়ে রাখতে হবে যে, আমরা ও নীতির বিরোধী, এবং কোন অবস্থাতেই আমরা রাশিয়ার বিরোধী কার্যকলাপ সমর্থন করব না। আমার মনে হয়, আমাদের তরফ থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত মতামতের কিছুটা প্রভাব থাকবেই। ব্রিটেন যদি ধরে নেয় যে, সে যাই করুক না কেন, ভারতবর্ষ তা বড় বেশী আপত্তি না করে মেনে নেবে, তাহলে, তার ফল হবে এই যে, রাশিয়া যুদ্ধে লিপ্ত হবে এবং যুদ্ধের আগুন ছড়িয়ে পড়বে আমাদের সীমান্তে। অপর পক্ষে, ইংলন্ড যদি বোঝে যে, রাশিয়ার উপর ইংলন্ডের কোন রকম হামলা বা ওই ধরনের কোন নীতির সাধ্যমত প্রতিবাদ করবে ভারতবর্ষ, তাহলে, অন্যান্য অঞ্চলে যুদ্ধের বিস্তার ঘটাতে দ্বিধা করবে ইংলন্ড। আপাতত পরবর্তী কার্যক্রম স্থির করার ব্যাপারে ইংলন্ড কিছু ভেবে উঠতে পারেনি। তারা রাশিয়া আক্রমণ করতে চায়, কিন্তু ফলাফল সম্পর্কে তাদের আশঙ্কা রয়েছে। তারা যদি মনে করে যে ভারতে কোন গোলমাল হবে না, তাহলে তারা রাশিয়া আক্রমণ করে বসবে। না হলে আপাতত হাত গুটিয়ে রাখবে। কাজেই এই ব্যাপারে আমাদের মতামতের দাম আছে এবং তা স্পষ্ট এবং দৃঢ়ভাবে ঘোষিত হওয়া প্রয়োজন।

৩। ইংলন্ড এবং ফ্রান্সে যা ঘটছে তা থেকে প্রমাণ পাওয়া যাবে যে ওই দুটি দেশ কী পরিমাণ প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে উঠছে। ফ্রান্সে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ফৌজী একনায়কত্ব, এবং সব রকমের নাগরিক অধিকার বা স্বাধীনতা সেখানে লুপ্ত। পার্লামেন্টের বহুসংখ্যক সদস্যকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাঁদের একমাত্র অপরাধ তাঁরা বর্তমান সরকারের সঙ্গে একমত নন। একই কারণে অনেকগুলি পৌর-প্রতিষ্ঠানের স্বাধীন অস্তিত্ব লোপ করা হয়েছে। ইংলন্ডে অবশ্য ব্যাপারটা এতদূর

গড়ায়নি কিন্তু ভাব-গতিক একই রকমের। ফলত, মুখে গণতন্ত্রের বুলি আওড়ালেও ফ্রান্স এবং ইংলণ্ড দু জায়গার সরকারই ক্রমেই ফাসিস্ত হয়ে পড়ছেন। যুদ্ধের লক্ষ্য সম্পর্কে স্পষ্ট কিছু বলতে তাঁরা নারাজ, অথচ তাঁদের কার্যকলাপে বোঝা যাচ্ছে ১৯১৪তে তাঁরা যা করেছিলেন এখনও সেই কর্মই করছেন ঃ নিজের সাম্রাজ্য বিস্তার, প্রতিদ্বন্দ্বী সাম্রাজ্যগুলিকে দুর্বল করা, এবং নিজেদের সাম্রাজ্যের ভিতরের ও বাইরের প্রগতিপন্থী শক্তিগুলিকে দুর্বল করার অপপ্রয়াস। গত সেপ্টেম্বরে কংগ্রেস যে প্রশ্নের উত্তর চেয়েছিল ব্রিটিশ সরকারের কাছে, তার জবাব পাওয়া যাবে সাম্প্রতিক ব্রিটিশ ও ফরাসী নীতির মাধ্যমে। জবাব এই ঃ তাঁরা সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে এবং তা বজায় রাখার জন্যেই তাঁরা সংগ্রাম করছেন। আমরা ফাসিবাদ এবং নাৎসীবাদের নিন্দা করি। হিটলার যুদ্ধে জিতলে খুবই খারাপ হবে। আমরা তা চাই না। অপরপক্ষে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিজয়ের অর্থ চেম্বারলেনবাদের প্রসার ও শক্তিসংগ্রহ। তার ফলও একই রকম অকল্যাণকর, এবং তার ফলে যুদ্ধ লেগেই থাকবে। কাজেই এরকম কোন বিজয়ে সাহায্য করাটা আমাদের পক্ষে কি জাতীয়, কি আন্তর্জাতিক উভয় দিক দিয়েই বোকামি হবে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বজায় রাখার জন্যে এই সাম্রাজ্যবাদের সমর্থনে আমরা থাকব না।

৪। আপনি নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন যে, প্যান-ইসলামবাদের পুনর্জন্ম ঘটছে। তা শুধু এখানকার মুসলীম লীগ বা অন্য প্রতিষ্ঠানের জন্যে নয়। এর প্রসারের মূলে আছে ব্রিটিশ সরকারের স্বার্থ ও উৎসাহ। ১৯১৪ এবং তারপর প্যান-ইসলামবাদ ছিল সাম্রাজ্যবাদবিরোধী শক্তি। এর জন্যে ব্রিটেনের সমরপ্রস্তুতি কিছু পরিমাণে খর্ব হয়েছিল এবং ভারতে খিলাফৎ আন্দোলনের পটভূমি প্রস্তুত হয়েছিল। বর্তমানে সেই ভাব ধারাকেই কাজে লাগানো হচ্ছে ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থে। এর ফলে, ভারতবর্ষে জাতীয় ফ্রণ্টে কিছুটা ভাঙন ধরানো সম্ভব হবে এবং নিকট প্রাচ্যে মুসলীম জনমতকে ইংলণ্ডের অনুকূলে আনা যাবে। তুর্কী মিত্রশক্তির সঙ্গে থাকায় এ ব্যাপারে ব্রিটিশ নীতি জোরদার হচ্ছে। মুসলীম দেশগুলিতে ব্রিটিশ প্রচারের কী ফল হয়েছে আমি জানি না। কিন্তু প্যান-ইসলামবাদের এই নতুন অধ্যায়টির সাম্রাজ্যবাদী চরিত্রের প্রতি আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই।

৫। এসব থেকে বোঝা যাবে যে আমাদের আভ্যন্তর সমস্যাগুলি—তা সে সাম্প্রদায়িক সমস্যাই হোক বা বৃহত্তর স্বাধীনতার প্রশ্নটিই হোক—যুদ্ধসম্পর্কিত ঘটনাবলী ও ব্রিটিশ বৈদেশিক নীতির সঙ্গে কী ভাবে জড়িত। ভারতবর্ষকে এই সব কিছু থেকে বিচ্ছিন্ন ও স্বতন্ত্র করে দেখলে ভুল করা হবে। সাম্প্রদায়িক সমস্যার জটিল গ্রন্থিগুলি বর্তমান ব্রিটিশ সরকারের মনোভাবের ফল। মুসলীম লীগ বা সেকেন্দর হায়াৎ যুক্তির পথে এলেও এর সমাধান সহজ হবে না। অবশ্য নিজেদের সাম্রাজ্যকে সুদৃঢ় ও যুদ্ধের অনুকূলে সমর্থন সংগ্রহের জন্যে ব্রিটিশ সরকার ভারতবর্ষের সমস্যার এক ধরনের সমাধান চাইবেন। ব্রিটিশ নীতির অনুকূলে চালিত সেকেন্দর হায়াৎও তাই-ই চাইছেন। কিন্তু মূলত এই নীতির উদ্দেশ্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে দৃঢ়তর করে তোলা। অপরপক্ষে আমাদের নীতির লক্ষ্য ওই সাম্রাজ্যবাদকে দুর্বল করে তোলা। এই হচ্ছে মৌলিক পার্থক্য, যা মীমাংসার অন্তরায়। কাজেই যতদিন না ব্রিটিশ সরকার সাম্রাজ্যবাদী নীতি বর্জন না করছেন, ততদিন ভাইসরয় বা মুসলীম লীগের সঙ্গে হাজার আলাপ-আলোচনাতেও কোন সুফল দেখা দেবে না। এই বর্জনই দাবি করা হয়েছিল ওয়ার্কিং কমিটির ১৪ই সেপ্টেম্বরের বিবৃতিতে। তা করা দূরে থাক, সেই সাম্রাজ্যবাদী নীতিকে দৃঢ়তরভাবে আঁকড়ে পড়ে আছেন ব্রিটিশ সরকার। ভারতবর্ষের মতামত এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ, কারণ

আমেরিকা ও অন্যান্য নিরপেক্ষ দেশগুলির উপর তার প্রভাব রয়েছে। আমেরিকা বর্তমানে তীব্রভাবে হিটলার-বিরোধী, এবং সেই অর্থে ব্রিটিশ-সমর্থক। কিন্তু সেই সঙ্গে সে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরোধী এবং সেই জন্যেই ব্রিটেনের পক্ষে যোগদানে তার দ্বিধা রয়েছে। ইংরেজরা যদি আমেরিকাকে বোঝাতে পারে যে, তারা ভারতবর্ষের সঙ্গে একটা মীমাংসায় উপনীত হয়েছে, সেটা তাদের সঙ্গে একটা খুব বড় রকমের লাভ হবে।

৬। গত কয়েকমাস ধরে ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে মীমাংসা সম্পর্কে এত বিভ্রান্তিকর কথা রটিত হয়েছে যে তার ফলে বহির্বিশ্বে এবং আমাদের জনসাধারণের মধ্যে একটা ভুল ধারণার সৃষ্টি হয়েছে। এবং কী যে হবে কেউ বলতে পারে না। আমার তো মনে হয়, এখনই আমাদের পক্ষে স্পষ্ট করে বলা দরকার যে, সাম্রাজ্যবাদী কাঠামোর মধ্যে কোন মীমাংসা সম্ভব নয় এবং যত শিগগির সে চেষ্টা ছেড়ে দেওয়া যায় ততই ভাল। এ সম্পর্কে একটা চূড়ান্ত ঘোষণার খুব দরকার হয়ে পড়েছে।

৭। বিগত কয়েকমাস যাবৎ ভারতে ব্রিটিশ শাসন স্বৈরাচারের মূর্তি গ্রহণ করেছে। বাইরের লোকেরা বুঝতে পারছেন না, ভারত কেমন করে এটা মেনে নিতে পারছে। শুধু যে বিধিসম্মত প্রাদেশিক সরকারগুলির উচ্ছেদ ঘটানো হয়েছে তাই নয়, পার্লামেণ্টে আইন করে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের সীমা ও অধিকার সংকুচিত করা হয়েছে। ভাইসরয়ের সুমধুর বচনামৃতের চেয়ে এই সব কার্যকলাপ অনেক বেশী মনোযোগ আকর্ষণ করে। সাধারণ অবস্থায় শাসনতন্ত্রের নিয়মানুগ কার্যকলাপ রোধ করা হলেই হৈ চৈ পড়ে যেত। কিন্তু এত বড় ব্যাপার আমরা নীরবে সয়ে গেলাম। [ভারত শাসন আইনে] সংশোধনমূলক আইনগুলি সম্পর্কেও আমরা নীরব। অবশ্য শাসনতন্ত্রের সংস্কারে ব্রিটিশ নীতির যে রূপটি প্রকটিত হল সে সম্পর্কেই আমাদের যা কিছু ঔৎসুক্য। এই সব কিছু থেকে প্রকাশ যে আমাদের সঙ্গে ব্রিটিশ সরকারের কোনই মিল নাই। ব্রিটেন যথাপূর্ব তার সাম্রাজ্যবাদী নীতি অনুসরণ করে চলেছে।

৮। আমি গতকাল বলেছিলাম আপনাকে যে, বর্তমান প্রাদেশিক বিধানমণ্ডলীর মধ্য থেকে গণপরিষদ গঠন করায় সম্মত হওয়াটা বিপদজনক হবে বলে আমার মনে হয়। কারণ তা হলে গত চার বৎসর যাবৎ আমরা প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচনের যে দাবি করে আসছি সেটি উপেক্ষা করা হয়। এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের কাঠামোর মধ্যেই গণপরিষদ গড়তে সম্মত হতে হয়। তার মানে দাঁড়াবে যে সামান্য অদল-বদলের পর আমরা ১৯৩৫এর ভারত শাসন আইনের কাঠামোর মধ্যেই কাজ করব। কিন্তু গণপরিষদকে সফল করে তুলতে হলে তাকে, ওই আইন এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের আওতার বাইরে রাখতে হবে। গণপরিষদ কর্তৃক আমাদের শাসনতন্ত্র রচিত হওয়ার পরই আমরা ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক নির্ধারণ করব। তার আগে নয়। প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে ভোটগ্রহণের ব্যাপারে কোন নীতিগত সমস্যা দেখা দিলে একটা মাধ্যমিক বা অপ্রত্যক্ষ নির্বাচনের দ্বারা সে সমস্যার সমাধান করা যাবে। কথাটা হচ্ছে, গণপরিষদকে হতে হবে ভারতবর্ষের জনগণের মুখপাত্র আর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ও পার্লামেণ্টের আওতার বাইরে থেকে কাজ করতে হবে। তা না হলে এটা হবে ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট দ্বারা পাশ করা আইনের একটা অংশ।

৯। বর্তমানে নিয়োগ, নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি সম্পর্কে যে সব নিয়মাবলী রয়েছে [সেগুলি অপরিবর্তিত থাকলে] এবং সাধারণভাবে বর্তমান অবস্থায় আর আমরা প্রাদেশিক সরকার গঠনের পথে ফিরে যাব না—একথাও, আমার মনে হয়, স্পষ্ট করে

বলা দরকার। পন্থজী যে ব্যাপারটির উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন তাতে আমি আনন্দিত। সরকারের কাঠামো আগাগোড়া বদলানো দরকার।

এই দীর্ঘ পত্রের জন্য আপনি আমায় ক্ষমা করবেন, এই আশা রাখি। আরও অনেক কথা বন্দী হয়ে আছে আমার মনে। কিন্তু আপাতত তারা সেখানেই থাক।

প্রীতিবদ্ধ

জওহরলাল

মওলানা আবুল কালাম আজাদ
১৯এ বালিগঞ্জ সারকুলার রোড
কলিকাতা

৩০০ আবুল কালাম আজাদ কর্তৃক লিখিত

কলিকাতা
মার্চ ২৭, ১৯৪০

প্রিয় জওহরলাল,

পনের তারিখে সকালবেলা আপনি যখন আমার ভাষণের ইংরেজী তর্জমাটি আমার হাতে দিলেন তখন ট্রেনের মধ্যে তাড়াতাড়ি সেটির উপর স্থানে স্থানে চোখ বুলিয়েছিলাম মাত্র। এখন অবকাশ পেয়ে ধীরে ধীরে সবটুকু পড়ে ফেললাম। একটু উচ্ছ্বাসী হয়েই না হয় বলি, আপনার উচ্চাঙ্গের বুদ্ধিবৃত্তি ও অনন্যসাধারণ গুণাবলীর প্রতি আমার স্বতোৎসারিত অভিনন্দন গ্রহণ করুন। আর এতদিন আমি যা ভাবতাম তার চেয়ে অনেক বেশী দখল আছে আপনার ইংরেজী ভাষার উপর। আমি জোর করে বলতে পারি, এরকম কোন কাজ বেশ কিছুদিন সময় নিয়েও আর কেউ এত ভাল ভাবে করতে পারতেন কিনা সন্দেহ। আর আপনি তা অবলীলাক্রমে সুসম্পন্ন করেছেন মাত্র কয়েকটি ঘণ্টার মধ্যে।

সত্যি বলতে, অনুবাদের কাজ মূল রচনার চেয়েও শক্ত। মূল রচনার বক্তব্য বজায় রেখে মূলের লেখকের রচনাশৈলীটিও অনুবাদে সঞ্চারিত করে দেওয়া বড় সহজ কথা নয়। উভয় ভাষার উপর একই প্রকার কর্তৃত্ব থাকলে তবেই কেউ করতে পারেন এই কাজ। আমাকে যা বিশেষভাবে বিস্মিত করেছে তা হলো এই যে মূল বিষয়ের কিছুমাত্র হানি তো হয়ইনি অনুবাদের মধ্যমে, তার চেয়েও যা বড় কথা, আমার উর্দুর সাহিত্য-সৌরভটুকু বিনিঃশ্বেসে অনুবাদে গৃহীত হয়েছে। এবং এ কাজে আপনি এমন সাফল্য অর্জন করেছেন যে পাঠক যদি মনে করেন যে মূল রচনাটি ইংরেজীতে লেখা এবং উর্দুতে নয়, তাতে আমি অন্তত বিস্মিত হব না।

আপনার আর একটি বৈশিষ্ট্য হল, চিন্তার সামগ্রিক রূপটিকে উপলব্ধি করবার ক্ষমতা, তার ফলে খুটিনাটি ব্যাপারেও মূল বক্তব্যটিকে যথাযথভাবে ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন আপনি। আমার যে মূল কল্পনাটি, আমার রচনারীতি ও বাক্যগুলির গঠন রূপায়িত করেছে, আপনি ঠিক ঠিক ধরতে পেরেছেন সেটি। সত্যি বলতে অনুবাদ করবার সময় আমার আন্তর চিন্তার পূর্ণ রূপটি আপনার মানসনেত্রে ধরা দিয়েছিল। তাই বিস্ময়কর হয়েছে এই কাজ, আরও এই জন্যে যে আমার নিজের রচনাবলী আপনাকে কোন প্রত্যক্ষ সহায়তা যোগায়নি।

ইংরেজী তর্জমার অত্যাবশ্যক দাবিগুলি পূরণ করার জন্যে আপনি কোন কোন জায়গায় মূল উর্দু বক্তব্যকে প্রসারিত করেছেন, কোথাও বা সংক্ষেপিত। এই সব পরিবর্তনগুলি আমি যত্নের সঙ্গে লক্ষ্য করেছি এবং আনন্দের সঙ্গে আবিষ্কার করেছি; তার ফলে কোথাও কোথাও রচনাটির উন্নতি সাধিত হয়েছে। রচনার ভাব বা প্রকাশ-

ভঙ্গীর এতটুকুও হানি হয়নি। ভাইসরয়ের ঘোষণা সম্পর্কে আমি লিখেছিলাম :

"সাফ্‌হোঁ পর সাফ্‌হাই পরজানে কে বাআদ ভী বা-মুশকিল ইসকাদার বাতানে পর মুসতা—যেদ হোতা হৈ ’

এখন এই অলংকারবহুল বাক্যটির মূল কথাটি হল বা মুশকিল’। রূপটি যথাযথভাবে রক্ষা করে এটি রূপান্তরিত করেছেন এই ভাবে :

"পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা পাঠ করবার পর অবশেষে একটু দ্বিধার সঙ্গে যবনিকা উত্তোলিত হল। আমরা দেখলাম

আমি বা-মুশকিল বলে যা বোঝাতে চেয়েছিলাম তা আরও জোরের সঙ্গে প্রকাশ পেয়েছে আপনার প্রসারিত বাক্যটির মাধ্যমে। আমি স্বীকার করছি, আপনার ভাষ্যটি অধিকতর সঙ্গত। আপনার করস্পর্শে অধিকতর সুন্দর ও শোভন হয়েছে আমরা রচনা। তারই একটি মাত্র দৃষ্টান্ত দিলাম।

৩০ তারিখ নাগাদ এলাহাবাদে পৌঁছবার আশা রাখি। আশা করি তখন পর্যন্ত আপনি এলাহাবাদেই থাকবেন।

আপনার

এ কে আজাদ

৩০১ আবুল কালাম আজাদ কর্তৃক লিখিত

কলিকাতা

এপ্রিল ২৪ ১৯৪০

প্রিয় জওহরলাল

আপনার ২১শে এপ্রিলের পত্রের জন্য ধন্যবাদ। আমি আপনার সঙ্গে একমত যে এই সময় কৃষ্ণ মেনন যদি নিজে থেকে আমেরিকা যান সেটা কিছুটা সময়োপযোগী হবে। ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকের আগে বিষয়টি জানা গেলে সেখানেই এটি নিয়ে আলোচনা হত। যাই হোক আমি [কংগ্রেসের] সাধারণ সম্পাদককে লিখছি তিনি যেন অবিলম্বে তাঁকে একশ পাউন্ড পাঠিয়ে দেন। আমি আশা করি আপনি বোম্বাই থেকে আরও অন্তত একশ পাউন্ড পাঠাবার ব্যবস্থা করবেন।

আপনি বলেছেন আমি যেন তাঁকে একটা চিঠিও দিই। কিন্তু আমি যদি [কংগ্রেস] সভাপতি হিসেবে তাঁকে চিঠি দিই তাহলে তার মানে দাড়ায় তিনি কংগ্রেসের পক্ষ থেকেই যাচ্ছেন। ব্যাপারটির উপর অতটা গুরুত্ব আরোপ করা ঠিক হবে না বলে আপনি নিজেই লিখেছেন। ভাল হয় আপনি যদি এই ধরনের একটি চিঠি তাঁকে দেন : 'আপনার আমেরিকা যাত্রার সংবাদ পেয়ে আমি আনন্দিত। আশা করি সেখানে আপনার উপস্থিতি ভারতের বর্তমান পরিস্থিতির তাৎপর্য অনুধাবনে সহায়তা করবে তাঁদের। বলা বাহুল্য আপনার চিঠি তাঁকে দায়িত্ব মর্যাদা দান করবে। আর সরাসরি সভাপতির পক্ষ থেকে লেখার অসুবিধাগুলিও এড়িয়ে যাওয়া যাবে।

মুসৌরিতে জানাশোনা বন্ধুদের তিনটি বাড়ি আছে আপাতত তার কোনটিই খালি নেই। আপনার পরিচিত ব্যক্তিদের মধ্যে কেউ মুসৌরিতে একটি বাড়ি ঠিক করে দিতে পারেন? প্রয়োজন হলে আমি ভাড়া নিতেও রাজী আছি। বাড়িটি ভাল আর বড় হওয়া চাই। জানাশোনা লোকজন থাকলে তার' করে একটা ব্যবস্থা করে দিন একটু। কলকাতার আবহাওয়া সহ্য হচ্ছে না আমার।

নৈনিতাল ও আলমোড়ার কথাও আমার মনে হয়েছে মুসৌরির পর। পন্থজীকে তার' করছি সেজন্যে।

আপনার

এ কে আজাদ

পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু
বোম্বাই

৩০২ জওহরলাল নেহরু কর্তৃক কৃষ্ণ কৃপালনিকে লিখিত

শ্রীকৃষ্ণ কৃপালনি
শান্তি নিকেতন, বাংলা

এলাহাবাদ
ফেব্রুয়ারি ২৬, ১৯৪০

প্রিয় কৃষ্ণ,

তোমার চিঠি। সুধীর সেনকে লেখা আমার চিঠিটি তুমি প্রকাশ করতে পার 'বিশ্বভারতী কোয়ার্টারলি'তে। তবে আমার মনে হয়, এলমহার্স্টের নাম উল্লেখ না করলেই বোধহয় ভাল হয়। তুমি বলতে পার জনৈক ইংরেজের জন্য পত্রটি লিখিত হয়েছিল। তার সঙ্গে এই মন্তব্যটি জুড়ে দিতে পার তুমি ঃ "এটা পরিষ্কার ভাবে বুঝতে হবে যে ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা একটি আবশ্যকীয় শর্ত। এ ব্যাপারে কোন রকম আপোস বা পরিবর্জন বা পবিবর্তন একেবারেই অসম্ভব। অবশ্য আমি যখন স্বাধীনতার কথা বলি তখন ব্রিটেনের সঙ্গে সর্বপ্রকার সম্পর্কছেদের কথা বলি না। আমি চাই ব্রিটেন তার সাম্রাজ্যবাদ ত্যাগ করুক। কিন্তু নিকট অথবা দূর ভবিষ্যতে তার কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। ব্রিটেন যা কিছু করছে তা থেকে প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে যে, সাম্রাজ্যবাদী শক্তি হিসাবেই সে কাজ করছে, সে চাইছে তার সাম্রাজ্যের সংরক্ষণ ও সাম্রাজ্যবাদের দৃঢ়ীকরণ। স্পষ্ট বোঝা যাবে ভবিষ্যতে যদি নববিধান প্রতিষ্ঠিত হয় (এবং বর্তমান অপবিধান চিরস্থায়ী না হয়) তাহলে জাতিগুলির মধ্যে নিশ্চয়ই পারস্পরিক সহযোগিতা স্থাপিত হবে। বিশ্ব যুক্তরাষ্ট্রের কথা প্রচুব শোনা যাচ্ছে। ওই রকম কিছু রূপায়িত যদি হয়ই তাহলে স্বভাবতই ভারত তাতে থাকবেই। কিন্তু যদি শুধু ইউরোপীয় যুক্তরাষ্ট্র হয়, কিংবা যদি ইওরোপ, যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটিশ ডোমিনিয়নগুলিকে একত্র করে কোন সংস্থা গঠিত হয় তাব অর্থ হবে এশিয়া ও আফ্রিকাকে শোষণ কবাব জন্যে সাম্রাজ্যবাদী সংঘবদ্ধপ্রয়াস। আমরা তাতে সম্মত হব না।

মূল কথাটি হল, কোন সাম্রাজ্যবাদী কাঠামোর মধ্যে আমরা ভবিষ্যত-ভারতবর্ষকে দেখতে চাই না। আমরা যে গণপরিষদের কথা বলি তার স্থান ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী ছকের মধ্যে নয়। ইংলণ্ড বা অন্য কোন দেশের সঙ্গে সহযোগিতার আপত্তি নেই আমাদের। আপত্তি সাম্রাজ্যবাদী অপপ্রয়াসের অংশীদার হতে।"

কয়েকদিন আগে নিউ ইয়র্কের ফেডারেল ইউনিয়নের সদস্যদের কাছে একটি দীর্ঘ পত্র লিখেছি। সেটি সম্পর্কে তোমার উৎসাহ থাকতে পারে ভেবে তার একটি প্রতিলিপি পাঠালাম তোমাকে। তুমি ইচ্ছে করলে তা থেকে অংশ বিশেষ ছাপতে পার।

কুটিরশিল্প সম্পর্কে পুস্তিকাকারে মুদ্রিত আমার প্রবন্ধের কয়েকটি কপি আমি পেয়েছি। প্রবন্ধটি তোমাদের পত্রেই প্রকাশিত হয়েছিল।

নন্দিতা যখন এখানে ছিল তখন তার কয়েকটি ছবি তুলে ছিলাম আমি। অনিল চন্দ কি সেগুলি দেখেছে বা সেগুলির কপি দিয়েছে তোমাকে।

তোমাদের
জওহরলাল নেহরু

৩০৩ এডওয়ার্ড টমসন কর্তৃক লিখিত

অ্যাল্‌সবেরী, বাক্‌স,
মার্চ ৭, ১৯৪০

প্রিয় জওহরলাল

আমার ধারণা এই চিঠিটা রঞ্জিতের কাছে পৌঁছন দরকার;—হ্যাঁ একজন ধীমান পাঠকের হাতেই এটা পড়া উচিত।

শোন ঃ ভারতবর্ষে একটি নদী আছে। বহির্বিশ্বে সেটি গ্যাঞ্জেস নামে পরিচিত। ভারতীয়রা বলেন গঙ্গা। টেমসকে বলা হয় 'তরল ইতিহাস' ঃ গঙ্গও তরল, (কমবেশী) তথা ইতিহাস। এই অক্টোবরে আমি ভারতে ফিরে যাচ্ছি, হয়ত অক্টোবরের আগেই আমি যেতে পারি গঙ্গার একটি ফিল্ম তুলতে। হ্যাঁ, গঙ্গোত্রী থুড়ি, শিবের জটা থেকে সাগরসঙ্গম পর্যন্ত। এখন বল দেখি, এই কর্মের জন্য কোন্ সময়টি সর্বোত্তম? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হলে বিবেচনা করে দেখতে হবে (১) নিসর্গ সৌন্দর্য ঃ এর পক্ষে সবসেরা সময়, আমার মনে হয় বর্ষাকাল, যখন এর দুটি কূল কানায় কানায় ভরা। (২) সুবিধা ঃ বর্ষাকাল এদিক দিয়ে দেখলে বোধহয় ভাল নয়। (৩) মেলা ঃ যেমন প্রয়াগের কুম্ভমেলা। তাহলে দেখা যাচ্ছে, চাই নিসর্গ সৌন্দর্য ও মহিমা, চাই কাছাকাছির জনপদ ও জনসমাগমের চিত্রাবলী। একটা মোটরগাড়ি যোগাড় করে নদীর তীর ধরে পাড়ি দিলে কেমন হয়?

তোমার একটি চিঠি এর মধ্যে আমি দেখার সুযোগ পেয়েছি। এলম্‌হার্স্ট দেখিয়েছেন আমাকে। তোমার সঙ্গে আমি একমত।

আমাদের বড় ছেলেটি সৈন্যবাহিনীতে। আপাতত সেকেণ্ড লেফ্‌টেনাণ্ট। শিগ্‌গিরই বাইরে যাচ্ছে। কোথায়—সে কথা বলতে পারি না চিঠিতে। ছোটটি পড়ছে স্কুলে। আমার ফ্লু হয়েছিল। সেরে উঠেছি। আমার স্ত্রী একই অসুখে শয্যা নিয়েছেন। এ ছাড়া আমরা ভালই আছি।

ইন্দিরার খবরে আশা করি তুমি সন্তুষ্ট।

আজ সকালে মনটা ভাল আছে। এটা খুব কমই হয়। ভাল লাগার হেতু প্যালেস্টাইন সম্পর্কে অস্মদ্দেশীয় গবনমেণ্ট দৃঢ় নীতি অবলম্বন করেছেন। ইদানীং আমাদের বামপন্থী দলবলের মধ্যে যে রকম অসৎ ও খেপা আরব-বিরোধী ও ইহুদী-পন্থী মতামত শুনছিলাম, তাতে সত্যি বলতে আমি টোরি বনে যাচ্ছিলাম।

ভারতবর্ষে যখন যাব তখন রবীন্দ্রনাথের শান্তি নিকেতন সম্পর্কেও একটা ফিল্ম তুলব।

সংবাদ ও তথ্য সম্পর্কে বন্ধুদের সহায়তার প্রয়োজন আছে আমার। পাটনার মত জায়গাগুলোতে বোধহয় হোটেল আছে। কিন্তু হরিদ্বারে? কিংবা আরও ছোটখাট জায়গায়? গঙ্গার ধার বরাবর গাড়ি নিয়ে না হয় ছুটলাম, কিন্তু থামতে তো হবে মাঝে মাঝে। সেসব জায়গার সংখ্যাও তো বড় কম হবে না। তার পর ইচ্ছে আছে রঞ্জিতের সঙ্গে উড়িষ্যার পথে-প্রান্তরে ঘুরে বেড়াবার। এ ইচ্ছে পূরণ হবে কিনা জানি না। আমার স্ত্রীকে যদি রাজী করাতে পারি তাহলে তাঁকেও সঙ্গে নেব।

তিনি বলছেন, এই চিঠি লিখে তোমাকে ব্যতিব্যস্ত না করতে। আমারও অভিমত তাইই। কাজেই তুমি কি এটি পাঠিয়ে দেবে রঞ্জিতকে? তাঁর ঠিকানা আমার জানা নেই। নানের আগের ঠিকানাটাই শুধু জানি আমি।

আপনার

এ. ট.

৩০৪ জওহরলাল নেহরু কর্তৃক এডওয়ার্ড টমসনকে লিখিত

এলাহাবাদ

এপ্রিল, ৭, ১৯৪০

প্রিয় এডওয়ার্ড,

তোমার ৭ই মার্চের চিঠি পেয়েছি। অক্টোবর বা তার কিছু আগেই তুমি ভারতে আসছ জেনে খুশী হলাম। সে সময়ে যে কোথায় দেখা পাবে আমার এবং আদৌ

আমার নাগাল পাবে কিনা তা বলা মুশকিল। কিন্তু সে যাই হোক—ভারতবর্ষ এখানে থাকবে আর নিশ্চিত যে গঙ্গাও থাকবেন ঠিকঠাক।

গঙ্গা সম্পর্কে ফিল্ম তোলবার পরিকল্পনাটি চিত্তাকর্ষক। তোমার পত্রটি অবশ্য আমি 'অধিকতর বুদ্ধিমান' রঞ্জিতকে দিয়ে দিলাম। তবে যেহেতু আমি একটু কল্পনাপ্রবণ, সেহেতু এ সম্পর্কে দুকথা না বলে থাকতে পারছি না। রঞ্জিত একটু অসুস্থ এবং শয্যাগত। আমি তাঁকে ব্যাপারটা বলতেই তিনি রীতিমত উৎসাহিত হয়ে উঠলেন। তৎক্ষণাৎ তিনি এসম্পর্কে অনেক কথাই বলে ফেললেন। আমি এখন যা লিখছি তাতে তাঁর কিছু কথাও মিশে আছে।

যেহেতু গঙ্গা ইতিহাস, তাই ঐতিহাসিক দিকটি ফুটিয়ে তুলতে হবে। ঐতিহ্য, পৌরাণিক কথা, শিল্প, সংস্কৃতি এবং ইতিহাস—এই সব কিছুর সঙ্গেই গঙ্গার যোগ নিবিড়। তুমি দেখবে গঙ্গা সব জায়গায় গজিয়ে উঠছে। কাজে বিষয়টি নিয়ে ঠিকঠিক কাজ করা খুব সহজ নয়। কিন্তু সে যাই হোক—ইতিহাস এবং ঐতিহ্য, এ দুটিকে উপেক্ষা করা যাবে না কিছুতেই। তবে কুসংস্কারগুলির উপর জোর দেওয়ার দরকার নেই। ভারতীয় পুরাণ ও শিল্প বুঝতে গেলে গঙ্গার উল্লেখ না করলেই নয়। গঙ্গার সেই পৌরাণিক জন্মকথার উল্লেখ করা যেতে পারে, যেমন, শিবজটার উপর গঙ্গাবতরণ। সেই জটা হিমালয় ছাড়া কিছু নয়। কয়েকটি বিখ্যাত ভাস্কর্যের চিত্রের সাহায্যে তা সুন্দরভাবে বোঝান যাবে। এই রকম ভাস্কর্য প্রচুর আছে।

এরপর কয়েকটি সুবিখ্যাত ঐতিহাসিক চিত্র দেখানো দরকার। যেমন, আর্যদের গঙ্গাতীরে প্রথম আগমন এবং এই পরম রমণীয় জলধারা দর্শনে তাঁদের আনন্দ। সার্ মহম্মদ ইকবালের 'সারে জাহাঁ সে আচ্ছা হিন্দুস্তাঁ হামারা" গানটিতে এ সম্পর্কে দুটি লাইন আছে। তাতে আর্যদের আগমনের কথা বলা হয়েছে। ছবিতে লাইন দুটি ব্যবহার করতে পারলে উৎকর্ষ বাড়বে। লাইন দুটি হল ঃ

অয় আব-এ রদ এ গঙ্গা উহ্ দিন হৈ ইয়াদ তুঝে কো
উতরা তেরে কিনারে যব কারাভান হামারা।

আজ কালকার পাকিস্তান নিয়ে আন্দোলনের দিনে, মুসলীম লীগেরই এক নেতা এ [গল্প] সম্পর্কে যা বলেছেন তা লক্ষ্য কর।

গঙ্গার তীরবর্তী স্থানসমূহে অনেক যুদ্ধ হয়ে গিয়েছে। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের রাজত্বকালে গ্রীক অভিযান গঙ্গারই কাছাকাছি বাধা পেয়েছিল। জায়গাটি সম্ভবত এলাহাবাদের কাছাকাছি কোথাও হবে। চন্দ্রগুপ্তের সমকালীন রূপটি চিত্রায়িত করতে পারলে চমৎকার হয়। কনৌজ ছিল সে সময়ের একটি সমৃদ্ধিশালী নগরী। নানা রকমের কারুকার্যসমন্বিত গাড়ি, তরবারি ও ইস্পাতের অস্ত্রশস্ত্র সেখানে প্রস্তুত হত। সোরাব-রুস্তমের কাহিনীতে এবং সম্ভবত শাহ্‌নামায় যেখানে সেকেন্দর শাহের (আলেকজান্ডার) অভিযানের কথা বলা হয়েছে, সেখানে কনৌজের তরবারির উল্লেখ আছে।

এরও আগে রামায়ণ ও মহাভারতের কথা বলা যায়। তারপর অশোকের সময়ের কথা। গঙ্গাতীরে তাঁর রাজধানী পাটলিপুত্রের কথা।

ভারতীয় সাহিত্যে কতবার কতভাবে বলা হয়েছে গঙ্গার কথা। ব্রহ্ম ও ইন্দো-চীনের এবং অন্যান্য দেশের সঙ্গীতে আছে গঙ্গার উল্লেখ। হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালে এসেছিলেন চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সান। প্রয়াগের কুম্ভমেলার বিবরণ দিয়েছেন তিনি। কুম্ভ তখনও বহু প্রাচীন উৎসব বলেই গণ্য হত। অসংখ্য ঐতিহাসিক উপাদান রয়েছে এর দুই তীরে ছড়িয়ে। সমগ্র গাঙ্গেয় উপত্যকা, বিশেষত গঙ্গা-যমুনার মধ্যবর্তী অঞ্চল ভরা আছে ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংগীতে। আর সেই

অপরূপা নদী যমুনাকে যদি আপনার চিত্রে আনেন তাহলে সেই সঙ্গে পেয়ে যাবেন অন্তহীন কৃষ্ণকথা। বৃন্দাবনের লীলা অভিরাম। মথুরা বৃন্দাবন। ব্রজভাষায় মধুর পদাবলী।

ঠিক কোন্ সময়ে একাজ করলে সুবিধে হয় বলা মুশকিল। শীতকালে গঙ্গা একটু শুকিয়ে যায় এবং অনেক স্থানে একে তখন ভাল দেখায় না। সে দিক থেকে ভাবলে বর্ষাকালই হল সেরা সময়। কিন্তু বড় বড় মেলাগুলি হয় শীতকালেই। সবচেয়ে বড় হল কুম্ভমেলা। প্রতি বারো বারো বছর অন্তর একবার করে এটি অনুষ্ঠিত হয়। তোমার ভাগ্য ভাল, আগামী বৎসর জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসে অনুষ্ঠিত হচ্ছে কুম্ভ।

গঙ্গার উৎস গঙ্গোত্রীতে কি পৌঁছতে পারবে তুমি? যাত্রাপথ সুগম নয়। রেল যেখানে শেষ হয়েছে সেখান থেকে আরও পনের দিনের পথ। বাহন একমাত্র অশ্ব। গাড়ি চলার রাস্তা নেই। অশ্বারোহনে বিশেষ পারদর্শী হলে অবশ্য দিন সাতেক কমিয়ে আনতে পারবে যাত্রাপথ। গাড়োয়াল পর্বত ধরে আমি গঙ্গাকে যথাসম্ভব অনুসরণ করবার পর প্লেনে করে গিয়েছিলাম বদ্রীনাথ। আকাশ থেকে গঙ্গাকে দেখেছিলাম সেখানে।

হরিদ্বারের কাছাকাছি এসে গঙ্গা সমতলে নেমেছে। সটিও উল্লেখযোগ্য স্থান।

থাকার ব্যাপারে বিশেষ কোন অসুবিধে নেই। সাধারণতঃ ইনস্পেকশন বা ডাক বাংলো আছে। পাটনাতে তৃতীয় শ্রেণীর হোটেল আছে কিছু। তবে বন্ধুদের সঙ্গে থাকবার ব্যবস্থা করে নেওয়া সহজ এবং শ্রেয়।

আমি সম্প্রতি যমুনার কাছাকাছি এক জায়গায় ক্যাম্প করে ছিলাম। সত্যি বলতে কি, আমি বেশ একটু ভালবেসে ফেলেছি নদীকে।

আমি আশা করি 'গ্যাঞ্জেস' নামটা তুমি ব্যবহার করবে না। আমার বিচ্ছিরি লাগে ওটা। 'গঙ্গা' শুনতে কত সুন্দর। তোমার পূর্বসূরীরা যে কীভাবে এমন সুন্দর নামকে বিকৃত করতে সক্ষম হয়েছিলেন তা বুঝি না। আমার এক বন্ধু, অবশ্য এর একটা ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তার মতে এটি গঙ্গাজীর বিকৃত রূপ।

নান, রঞ্জিত এবং আমি সবাই মিলে আনন্দ ভবনে আছি। কাজেই আমাদের ঠিকানাও এক। নান বোম্বাইতে গেছে আপাতত।

ইন্দিরা সেরে উঠছে। আর একটু তাড়াতাড়ি হলে আর একটু খুশী হতাম। বেচারী ভারতে ফিরে আসবার জন্যে খুবই উদগ্রীব। আমিও চাই সে মাস তিনেকের মধ্যে ফিরে আসুক। কিন্তু ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত, ডাক্তারদের হাতে।

তোমার
জওহরলাল

ডঃ এডওয়ার্ড টমসন
অ্যালসবেরী, বাক্‌স্ (ইংলণ্ড)

৩০৫ এডওয়ার্ড টমসন কর্তৃক লিখিত

অ্যালসবেরী
বাক্‌স
এপ্রিল ২৮, ১৯৪০

প্রিয় জওহরলাল,

তোমার প্রতীক্ষিত পত্রটিকে স্বাগত জানাই। হ্যাঁ—জানতাম বই কি যে রঞ্জিত সেই লোক যিনি পারবেন আমায় সাহায্য করতে। কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে কী জানো

বস্তু ভরাই আমি নান আর রঞ্জিতকে। তাই তোমাকে মধ্যস্থ রেখে আমার আবেদন-নিবেদন জানাই।

যা সেন্সারের বহর! মনের কথা মনেই রাখতে হয় অগত্যা। নরওয়ের লড়াই যে ভীষণ হয়েছিল তা তো জানই। আমি নরওয়ে যেতে চাইছি। কেন? কেন আবার, আমাদের উনিশ বছরের বাচ্চা ছেলেটাও যুদ্ধে যোগ দিয়েছে, শিগগিরই বাইরে যাচ্ছে—আর আমি নিষ্কর্মা হয়ে বসে থাকব এককোণে নির্বিঘ্ন অবকাশের মধ্যে, এ কি ছাই ভাল লাগে। প্রলয়ের লগ্ন যদি এসেই থাকে তো আমার স্থান হোক বজ্রঘোষিত বিদ্যুৎ কশায়িত আকাশের নীচে। যদি আমাদের সভ্যতা, আমাদের 'ইংরেজ' নাম (যার সঙ্গে তোমরা খিচুড়ি পাকিয়ে ফেল স্কচ আর আইরিশদের দুর্বৃত্তি) ডুবেই যায়, তো আমি চাই না ভেসে থাকতে। মুশকিল হচ্ছে আমার বয়সের লোকের পক্ষে ফ্রন্ট লাইনে যাওয়াও সহজ নয়।

ঠিক, গঙ্গার কথা মনে আছে আমার। কিন্তু আমি যা লিখেছিলাম তার চেয়ে বেশী উচ্চাশা রয়েছে ছবিটির। পরিচালক মহাশয় বর্তমানে কানাডায় আছেন। আসবেন শিগগিরই। পৃথিবীর একটা সত্যিকারের বড় ছবি তুলতে যাচ্ছি আমরা।... অবশ্য শেষ পর্যন্ত কী হয়ে উঠবে জানি না। যাই হোক, মৃত্যুর পরে আবার যদি আমি ভারতবর্ষের প্রবাল তীরে ভেসে যাই, তো নিশ্চয় আমি এই ব্যাপারের জন্য রঞ্জিতের কাছে লাইন করে দাঁড়াব।

নাঃ, ভারতে যাওয়া দেখছি আমার পক্ষে ক্রমে শক্ত হয়ে উঠছে। দক্ষিণ ভারতে আমি সর্বাধিক ঘৃণিত ইংরেজ হতে চলেছি কেন? আর কেন। শুনছি, আমার "অ্যান ইন্ডিয়ান ডে" বইটা মাদ্রাজ য়ুনিভারসিটি নাকি ১৯৪২ সনে বি. এ.-র পাঠ্যতালিকায় ঢুকিয়েছেন। ওই যে, যেটা আজকাল ছ-পেনী পেঙ্গুইনে পাওয়া যায়। এবার নিশ্চয়ই বইটার 'নোট' লিখবেন কেউ। কপাল আমার! আর ছাই পাঠ্যই যদি করতে হয় তাহলে ওই নিছক উপন্যাসটা ছেড়ে "দি রাইজ অ্যান্ড ফুলফিলমেণ্ট" বইটা দিলে হত। বইটা ভাল।

আমার কনিষ্ঠ পুত্র একটি পত্র লিখেছে তোমাকে। সেটি পাঠাচ্ছি এই সঙ্গে। তুমি কিঞ্চিৎ আমোদ পেতে পার সেটি থেকে।

আগাথা হ্যারিসনের কাছে শুনলাম ইন্দিরা ক্রমেই ভাল হয়ে উঠছে। কিন্তু বড় কষ্টে সময় কাটল বেচারীর। সে ইংলণ্ডে ফিরে এলে আমরা যেন একটা খবর পাই। আমরা যেখানে আছি সেখানে যদি একবার আসতে তুমি। কী চমৎকার যে জায়গাটি। সারা দক্ষিণ-পূর্ব ইংলণ্ডে 'এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি', এই রকম স্থান না দেখলে তুমি ইংলণ্ডকে চিনতেই পারবে না। চারদিকে ছড়িয়ে আছে চোখ ভোলানো বনফুলের অন্তহীন উৎসব, কত কিংবদন্তী, ইতিহাসের কথা।

ভারতের কথা ভাবলে বড় কষ্ট পাই। বলতে পারি না কিছু। ভাবি অনেক। জিন্না সাহেবের সঙ্গে গত নভেম্বরে একটা বোঝাপড়া করে নেওয়া যে যায়নি সেটা সত্যিই দুর্ভাগ্য। তাহলে সত্যি জোরদার হত তোমাদের পক্ষ, দৃঢ় হত তোমাদের দাবি। আমি জানি, আলোচনা মুলতুবী রেখে ন্যায়সঙ্গত কাজই করেছ তুমি। কিন্তু...যদি তা করা যেত!!! আর তা হতেও পারত...আমি তো আছিই তোমাদের কাজ করার জন্যে, হয়ত সময় আসবে, যখন পারব তোমাদের সহায়তা করতে। যাই হোক, দুএকটা কথা সবাই জেনেছে ও বুঝেছে। ভারতের সঙ্গে পরামর্শ না করে, বা তার মত না নিয়ে তাকে যুধ্যমান জাতি হিসেবে ঘোষণা করা যে ঠিক হয়নি একথা সবাই জানেন। তোমার সঙ্গে দেখা হলে বলার কথা কিছু ছিল। যাই

হোক, আমাদের শুভেচ্ছা সব সময় রয়েছে তোমার জন্যে। ইন্দিরা শিগগির সেরে উঠুক, এইটাই খুব আশা করি।

তোমার
এ. ট.

৩০৬ আবুল কালাম আজাদ কর্তৃক লিখিত

নৈনিতাল
মে ৯, ১৯৪০

প্রিয় জওহরলাল,

মুসৌরি সম্পর্কে আপনার টেলিগ্রাম পেয়েছি ও সেজন্য কৃতজ্ঞ আছি। নৈনিতালে একটা ব্যবস্থা হয়ে যাওয়ায়, মুসৌরি যাওয়া সম্পর্কে মত বদলাই।

৬ই এখানে এসে পৌঁছেছি। অবস্থা অনুকূল থাকলে জুলাই পর্যন্ত থাকব। মে মাসের শেষ পর্যন্ত আপনি বোম্বাইতেই থাকতে পারেন, তারপর, এলাহাবাদ চলে যাবেন। নৈনিতালে এসে আমাব সঙ্গে কয়েকটা দিন কাটিয়ে যান না কেন? প্ল্যানিং কমিটি সম্পর্কে রিপোর্ট লেখার কাজ তো এইখানে বসেও করতে পারেন। আর প্রদেশের কাজকর্ম করার জায়গা হিসেবে এলাহাবাদ আর নৈনিতালের মধ্যে কোন পার্থক্যই নেই। সে কাজের সঙ্গে, এলাহাবাদে থেকে যেমন, এখান থেকেও ঠিক তেমন যোগ রাখতে পাববেন। বরং আপনি এখানে থাকলে অনেক ব্যাপারে আপনার পরামর্শ নেওয়া সহজ হবে।

ওয়ার্ধার শ্রীপট্টবর্ধনের সঙ্গে আমার কিছু কথাবার্তা হয়েছিল। তিনি বলেছিলেন যে পরে আমাব সঙ্গে কথা বলবেন, কিন্তু বোধহয় তার সুযোগ পাননি। ওয়ার্কিং কমিটিব সভ্যপদ সম্পর্কে তার মতামত জেনে নেবেন। আপনাকে কষ্ট দিচ্ছি, কারণ, তাব ঠিকানা আমার জানা নেই। সমাজতন্ত্রী বন্ধুরা খুবই নিরাশ করছেন। কাজ করবার মতো সাহস নেই তাঁদের। বিপক্ষতাকে তাঁরা ভয় পান, নিজেব পায়ে ভর দিয়ে দৃঢ়ভাবে দাড়াতে তাঁরা সাহস করেন না। এই রকম সন্ধিক্ষণে তাদেব সহায়তা আমি প্রত্যাশা করেছিলাম। সে প্রত্যাশা ব্যর্থ হয়েছে।

যদি পট্টবর্ধন প্রস্তুত না থাকেন, অন্য কারও নাম তাড়াতাড়ি প্রস্তাবিত হওয়া প্রয়োজন। আপনি কোন নাম দেবেন?

দি ইম্পিরিয়াল টোবাকো কোম্পানি আমায় একটি পত্র দিয়েছেন। তা থেকে বোঝা যাচ্ছে সেখানকার শ্রমিকদেব ধর্মঘট ঘোষিত নীতি থেকে অন্যদিকে সরে যেতে পারে। যাই হোক, সম্মানজনক মীমাংসার একটা পথ খুঁজতে চেষ্টা করছি।

ভবদীয়
এ. কে. আজাদ

৩০৭ আবুল কালাম আজাদ কর্তৃক লিখিত

নৈনিতাল
মে ২৫, ১৯৪০

প্রিয় জওহরলাল,

আপনার ১৬ তারিখের চিঠির জন্য ধন্যবাদ।

সংবাদপত্রে রাজেন্দ্রবাবুর বিবৃতি পড়লাম এবং বিস্মিত হলাম। ইতিমধ্যে তাঁর একটি চিঠি পেয়েছি। সেটি থেকেও তাঁর বর্তমান চিন্তাধারার একটা পরিচয় পাওয়া গেল। উত্তরে তাঁকে আমি যে চিঠিটি লিখেছি তার একটি প্রতিলিপি আপনাকে পাঠাতে না পারার জন্যে আমি দুঃখিত। পাঠাতে না পারার কারণ,

চিঠিটি উর্দুতে লেখা হয়েছিল, আর জানেন তো যে, শুধু সরকারী [কংগ্রেসের কার্যসম্পর্কিত] পত্রাদি ছাড়া অন্য কোন চিঠির প্রতিলিপি রাখবার রেওয়াজ নেই। কংগ্রেসের বর্তমান মত সম্পর্কে চিঠিটিতে যা বলা হয়েছে তার সঙ্গে আপনার চিঠির বক্তব্যের খুব মিল আছে। আমাদের চিন্তাধারার মধ্যে এই মিলটি লক্ষ্য করে খুশী হয়েছি। আর সবচেয়ে আনন্দের কথা হল এই যে, গান্ধীজীর সম্পূর্ণ সায় আছে এ ব্যাপারে।

রাজেনবাবুর সঙ্গে তুলনায় আসফ আলির বিবৃতি আরও আপত্তিকর। সত্যি কথা বলতে কি, আমি সেটি পড়ে দুঃখ পেয়েছি। আমি তাঁকে তীব্র ভাষায় পর পর দুটি চিঠি দিয়েছি। তিনি আমায় প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে ভবিষ্যতে ওই ধরনের বিবৃতি তিনি আর দেবেন না।

আমাকে এবং রাজেনবাবুকে আপনি যেসব চিঠি লিখেছেন তাতে কংগ্রেসের মত ঠিক-ঠিক প্রকাশ পেয়েছে। বর্তমান অবস্থায় এই মত পরিবর্তনের কোন প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু সেই সঙ্গে আপনি আরও দুটি বিষয় উত্থাপন করেছেন, সেগুলির সম্পর্কে আমি একমত নই আপনার সঙ্গে। এবং আমি বুঝতে পারছি না যে, কংগ্রেসের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা সম্পর্কে সামগ্রিকভাবে আপনার মতামতের সঙ্গে ওই দুটি বিষয় ঠিক কেমন করে মিলতে পারে। রাজেনবাবুকে লেখা চিঠিতে আপনি বলেছেন "আমরা প্রস্তুত থাকলেও সত্যাগ্রহের নির্দেশ এখন দেওয়া চলতে পারে না। ঠিক এই সময়ে তা করা ভুল হবে। ব্রিটেন এখন দুর্দশাগ্রস্ত। তার দুর্দশার সুযোগ নিয়ে তার টুঁটি চেপে ধরা ঠিক হবে না। আপনার লখনউ-বক্তৃতাতেও এই ধরনের মত প্রকাশ পেয়েছে। 'পাইওনিয়র' আপনার মূল কথাগুলি উদ্ধৃত করে দেওয়া দরকার মনে করেছিল ইয়ে বাত হিন্দুস্তান কি শান কে খিলাফ হৈ কি উহ ইংলণ্ড কী কমজোরি সে ফায়েদা উঠা কর্ ইস বক্ত সত্যাগ্রহ শুরু কর দে। এই ধরনের চিন্তার তাৎপর্য অনুধাবনে আমি সম্পূর্ণ অক্ষম। রাজনৈতিক সংগ্রামের ব্যাপারে এই ধরনের ভিত্তির উপর সিদ্ধান্ত গড়ে তোলাটাই ভুল। ভারতের শান' কী বস্তু? আমি জানতে চাই কী সিদ্ধান্ত গৃহীত হল এবং তা কোথায় নিয়ে যাবে? অন্ধলোকের মত অন্ধকারে হাতড়ে চলতে আমরা চাই না। খোলা চোখে একটা রাস্তা বেছে নিতে চাই। আর একবার একটা পথ ঠিক করে নিয়ে তারপর তাতে চলতে অস্বীকার করার মতো খাপছাড়া কাজ আর কিছু হতে পারে না।

আমরা ব্রিটেনকে আমাদের স্বপক্ষে আসবার অনেক সুযোগ দিয়েছি। সে দৃঢ়ভাবে তা অস্বীকার করেছে। কাজেই এই সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ থেকে আমাদের সরে থাকতে হয়েছে। আমাদের বর্তমান মত যদি গান্ধীজীর ভাষায় ব্রিটেনের পক্ষে "অস্বস্তিকর" হয় বা আপনার ভাষায় তা যদি ভারতের শান-এর বিরোধী হয়,—তাহলেই বা কী করা যায়। এর জন্যে দায়ী আমরা নই। দায়ী ব্রিটিশ সরকারের অপরিণামদর্শী অহংকার।

আপনি বলছেন, এই সময়ে সত্যাগ্রহ শুরু করা উচিত নয় কংগ্রেসের। কিন্তু সত্যাগ্রহ বলতে কী বোঝাতে চাইছেন আপনি? এটা কি কংগ্রেসের পক্ষে নতুন করে কোন যুদ্ধ ঘোষণা করা? কংগ্রেসের লড়াই হচ্ছে বর্তমান যুদ্ধে কোন সহায়তা করার বিরুদ্ধে। বাস্তবক্ষেত্রে এই নীতি খুব বেশীদূর পর্যন্ত অনুসৃত হয়নি। ভবিষ্যতে তা করতে হবে। এবং বর্তমানে যুদ্ধকালীন অর্ডিনান্স ও গ্রেপ্তারের সঙ্গে মোকাবিলা করতে গিয়ে তা স্বাভাবিকভাবেই আইন-অমান্য-আন্দোলনের রূপ ধারণ করতে পারে।

এই চিঠিতেই আপনি আমাদের ভবিষ্যৎ মনোভাব সম্পর্কে কিছু বলেছেন। যে মনোভাব,—সরকারের সঙ্গে একটা সমঝোতা হলে উদ্ভূত করে পারে। আপনি বলেছেন : "যদি এইগুলি (অর্থাৎ, স্বাধীনতা, স্বাধিকার এবং প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচিত গণপরিষদ) মেনে নেওয়াও হয়, তাহলেই যে যুদ্ধের অনুকূলে আমরা পূর্ণ শক্তি নিয়োগ করব, এমন কোন কথা নেই।"

কিন্তু তা যদি না হয়, তাহলে, আমরাই বা আশা করি কী করে যে, আমরা যা এ ছাড়া মিঃ জিন্না এবং মওলানা সাহেবের সঙ্গে যে কথাবার্তা হয়েছে তা বিবেচনা পারে, যদি তা দিতে বাধা হয়। কিন্তু [আপনার যুক্তি অনুসারে] এখন তো শক্তিপ্রয়োগ করা চলে না, এমনকি সত্যাগ্রহের নৈতিক শক্তি পর্যন্ত নয়। তাতে ভারতের 'মর্যাদার' হানি হবে।

আপনার মনে এই ধরনের গোলমেলে ও যুক্তিবিরুদ্ধ ধারণা স্থান পেল কেমন করে তা ভেবে পাচ্ছি না। এই রকমের চিন্তা আপনার পক্ষে সঙ্গত নয়।

আশা করি আপনি লাহোরে থাকবেন এবং সেখানকার কাজকর্মে সহায়তা করবেন।

আমি আজ সিকান্দার হায়াৎ খানের কাছ থেকে একটি টেলিগ্রাম পেয়েছি। হয়ত তার একটি প্রতিলিপি আপনার কাছে পাঠানো হয়েছে। উত্তরে আমি তার করে জানিয়েছি, বর্তমান অবস্থার দায়িত্ব আমাদের নয়, ব্রিটিশ সরকারের।

ভবদীয়

এ. কে. আজাদ

পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু,
C/O. ডাঃ খান সাহেব
প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী, পেশওয়ার

৩০৮ খান আবদুল গফ্‌ফর খান কর্তৃক লিখিত

দুংগা গলি
হাজারা জেলা

অনুবাদ

জুলাই ১৩, ১৯৪০

প্রিয় পণ্ডিতজী,

গতকাল এইখানে, দুংগা গালীতে আপনার টেলিগ্রামটি আমার কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। শিবিরের তারিখ এখনও চূড়ান্তভাবে নির্ধারিত হয়নি, কারণ, আমার জন্যে অপেক্ষা করছেন অন্যান্য সকলে। আমি এসে পৌঁছেই তাঁদের চিঠি দিয়েছি। তারিখ ঠিক হলে আপনাকে জানানো হবে। রাজাজী ও মওলানা সাহেবের মত রেডিওতে যা প্রচারিত হয়েছে তা বোধহয় আপনি শুনে থাকবেন, এ ছাড়া মিঃ জিন্না এবং মওলানা সাহেবের সঙ্গে যে কথাবার্তা হয়েছে তা বিবেচনা করে দেখেছেন। মওলানা সাহেব যা বলেছেন তা আমি বুঝেছি, কিন্তু মিস্টার জিন্নার বক্তব্য বুঝলাম না।

শিবিরের সময়টা আমি এইখানেই থাকব। তারপর কাজ শুরু করব। জায়গাটির আবহাওয়া খুব চমৎকার, আর আমার স্বাস্থ্যেরও বেশ কিছুটা উন্নতি হয়েছে। ইউনুস সাহেবের পত্র পেয়েছি। তিনি বলেন যে, শ্রীনগরে এখন বেশ গরম, তবে অধিকাংশ সময় তিনি গ্রামাঞ্চলেই কাটান।

আমি পুনায় যেতে পারব না। তবে যদি রাষ্ট্রীয় সমিতি সেখানেও ওই একই

প্রস্তাব গ্রহণ করেন, তাহলে ওই সমিতি থেকেও পদত্যাগ করার পূর্ণ অধিকার আমার থাকল।

আশা করি আপনি ভাল আছেন। উপাধ্যায় ও অন্যান্যদের আমার কথা বলবেন।

আবদুল ওয়ালি, গনি, রোশন ও মেহেরতাজ আপনাকে খুব মনে রেখেছে, তারা তাদের সশ্রদ্ধ সালাম জানাচ্ছে আপনাকে।

আপনার

৩০৯ আবুল কালাম আজাদ কর্তৃক লিখিত

নৈনিতাল
জুলাই ১৯, ১৯৪০

প্রিয় জওহরলাল,

আপনার ১৬ তারিখের চিঠির জন্য ধন্যবাদ। অনুগ্রহ করে আমার বিবৃতিটি আর একবার পড়ে দেখবেন। প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়েছিল,—একথা আমি বলিনি। যে মনোভাব নিয়ে প্রস্তাবটি রচিত ও গৃহীত হয়, সেই মনোভাবটিই ব্যাখ্যা করার প্রয়াস পেয়েছিলাম আমি। বলেছিলাম, সকলেরই মনে একথাটা পরিষ্কারভাবে রয়েছে যে, যদি ভারতের দাবি স্বীকৃত হয়, তাহলে, সে (ভারত) যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করবে। 'স্টেটসম্যান' ও অন্যান্যরা বিবৃতিটির একই অর্থ গ্রহণ করেছেন।

পুনাতে আবার আমাদের সাক্ষাৎকার না হওয়া পর্যন্ত আপনি যদি এই বিষয়ে কোন বিবৃতি না দেন তাহলে আমি কৃতজ্ঞ থাকব। এ বিষয়ে আপনার সঙ্গে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করতে চাই। দিল্লীতে যে আমরা তেমন কোন আলোচনার সুযোগ পাইনি সেটা সত্যিই দুঃখের কথা। চীন থেকে যে পত্রটি এসেছে তার একটি প্রতিলিপি আমি পেয়েছি।

ভবদীয়
এ কে আজাদ

৩১০ জয়প্রকাশ নারায়ণ কর্তৃক লিখিত

[হাজারীবাগ সেণ্ট্রাল জেল থেকে জয়প্রকাশ নারায়ণ এই চিঠিটি পাঠিয়েছিলেন। তিনি তখন সেখানে অন্তরীণ ছিলেন।]

পত্রবাহক মারফত প্রেরিতব্য

জুলাই ২০, ১৯৪০

প্রিয় ভাই,

সাম্প্রতিক ঘটনাবলী আমাদের মনে কতটা আঘাত ও বেদনা দিয়েছে তা আপনি অনুমান করতে পারবেন। রাজাজী আমাদের পিছন থেকে ছুরি মেরেছেন। আপনি

ও খান সাহেব এই কুখ্যাত ব্যাপারটির বিরোধিতা করেছেন জেনে হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছি। কিন্তু তাই কি যথেষ্ট? আমরা যারা এখানে আছি তারা সকলেই আশা করি ও অনুরোধ করি যে, এ. আই সি সি-তে ও দেশে আপনি বিরোধী দলের নেতৃত্ব গ্রহণ করুন। সমিতি (এ. আই সি সি) থেকে আপনার পদত্যাগ করা উচিত। একটা বোঝাপড়ার পর (অবশ্য তা যদি আদৌ সম্ভবপর হয়) আপনার উচিত হবে কংগ্রেস ছেড়ে দেওয়া, একটি নতুন রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে তোলা এবং রাষ্ট্রীক কর্মসূচীর অবশিষ্টাংশ এবং ভারতীয় বিপ্লবের সামাজিক দিকটির রূপায়িত করে তোলা। আপনি কি তা করবেন? রাজাজীর প্রস্তাবই যে কংগ্রেসের মৃত্যুলগ্নের দ্যোতক তা, আশা করি আপনি বুঝছেন। কংগ্রেসকে বিভক্ত করার ভীতি এখন অবাস্তব। নিজের দিক থেকে গান্ধীজীর মহিমা প্রশ্নাতীত, কিন্তু তাঁর সমর্থন (এক্ষেত্রে) প্রত্যক্ষ না হোক, অপ্রত্যক্ষভাবে, বিশ্বাসঘাতকদের দিকেই। বল্লভভাই ও রাজাজী গান্ধীজীর কাছ থেকে সরে যেতে দ্বিধা বোধ করেননি। ইতিহাস যে কর্তব্য আজ আপনার সামনে এনে দিয়েছে, এবং যে কর্তব্য আপনারই, তা পালন করতে আপনি কি দ্বিধা করবেন? জানিনা আপনি কতটুকু পারবেন। কিন্তু উত্তরকালে যারা আসবে তাদের জন্যে একটি গৌরবময় পথের নিশানা আপনি রেখে যাবেন।

ক্রোধ বা আবেগের দ্বারা পরিচালিত হয়ে এই চিঠি লিখলাম না। ধীর ও স্থিরভাবে এবং চিন্তা করেই লিখলাম।

ভালবাসা রইল।

আপনার
জয়প্রকাশ

পুনশ্চ। অক্টোবরের মাঝামাঝি বেরোবার আশা রাখি।

৩১১ চেং ইন-ফান কর্তৃক লিখিত

চায়না ব্রাঞ্চ
ইণ্টারন্যাশানাল পীস ক্যাম্পেন
পোস্ট বক্স ১২৩, চুংকিং, চায়না
আগস্ট ২১ ১৯৪০

প্রিয় মিঃ নেহরু,

অনেক দিন পর আবার আপনাকে চিঠি লিখছি আমরা। শেষবার লিখেছিলাম এই বছরের ৯ই জানুয়ারি তারিখে। অবশ্য আমাদের দিক থেকে যে কোন ঔদাসীন্য ছিল তা নয়। প্রায়ই মনে হয়েছে আপনাকে লেখবার কথা। কিন্তু দিনের পর দিন নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম আমাদের কেমন যেন মৌনী করে দিয়েছে। কথায় চেয়ে ভাল লাগে সকলে মিলেমিশে কাজ করে যাওয়া আর সহ্য করে যাওয়া।

আমাদের হৃদয়ে যে অনুভূতি ও আবেগ সঞ্চিত হয়ে আছে তার কাছে আত্মসমর্পণ না করে পারি কই আমরা। ভারতবর্ষে ইতিহাসের এই কঠোর আবর্তনের মধ্যেও, একই কারণে যুদ্ধনিরত আপনাদেরই একটি প্রতিবেশী বন্ধু জাতির কথা ভোলেননি আপনারা। চীন সম্পর্কে আপনার আন্তরিক সহানুভূতির নবতম প্রমাণ পেলাম লখনউ-এর 'ন্যাশানাল হেরাল্ড' পত্রে প্রকাশিত "ভারত, চীন ও ইংলণ্ড" শীর্ষক আপনার সাম্প্রতিক প্রবন্ধটিতে। আমাদের প্রতি আপনার অব্যাহত সহানুভূতি ও সমর্থনের জন্যে আরও একবার আপনার প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা নিবেদন করি। আশা করি, আমাদের একথায় সমগ্র চৈনিক জাতির মনোভাব প্রকাশিত হয়েছে। আপনি হয়ত

জেনে খুশী হবেন যে, চুংকিংয়ে আপনার 'ভারতবর্ষ', চীন ও ইংলণ্ড' প্রবন্ধটি বহুলভাবে প্রচারিত হয়েছে। 'হ্যাংকাও হেরাল্ড'-এর চুংকিং সংস্করণ ও সবচেয়ে প্রভাবশালী চৈনিক পত্রিকা 'তা কুং পাও'-এ আপনার প্রবন্ধটি আংশিক পুনর্মুদ্রিত হয়েছিল। পত্রিকা দুটির কর্তিকা এই সঙ্গে আপনাকে পাঠানো হল।

ইংলণ্ডের ক্রমাগত তোষণনীতি অবলম্বন করার ফল সে নিজেই বুঝতে পারছে। এই মুহূর্তে তার প্রতিক্রিয়া শুরু হয়েছে। স্বরোপিত বিষবৃক্ষের ফল ভোগ করতেও হচ্ছে ইংলণ্ডকে। বার্মা রোড বন্ধ করলে ইংলণ্ডের কোন লাভ নেই; তার [সাম্রাজ্যের] পূর্ব-সীমান্ত এতে নিরাপদ হবে না। ইংলণ্ডের মনোভাব নিয়ে মাথা ঘামাবে না জাপানীরা, যে কোন দিন তারা দক্ষিণের দিকে চাপ দেবে। আর ইংলণ্ড হারাচ্ছে একটি বিরাট দেশের, ৪৫ কোটি মানুষের মৈত্রী। কিন্তু চীনের জনগণ এতে ভীত নয়। না। ঠিক যেমন পূর্ণ স্বাধীনতা ব্যতীত কিছুতেই তৃপ্ত হবে না ভারতের জনগণ, তেমনই, যত বাধাই সামনে আসুক, যে উদ্দেশ্যে একদিন আমরা অস্ত্র তুলে নিয়েছিলাম তার পূর্ণ সিদ্ধি লাভ না হওয়া পর্যন্ত চীন সংগ্রামে বিরত হবে না। চীনের লক্ষ লক্ষ সন্তানসন্ততির আত্মাহুতি এবং এত সম্পদ বৃথাই উৎসর্গ করা হচ্ছে না। আমাদের সম্পর্কে যাঁদের আশা আছে, তাঁদের নিরাশ করব না আমরা।

আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ব্রিটিশ রাজনীতিজ্ঞরা বারংবার কূটনৈতিক ব্যর্থতা সত্ত্বেও আক্রমণকারী সম্পর্কে তাঁদের পররাষ্ট্রনীতির যথোপযুক্ত পরিবর্তন ঘটাতে পারছেন না। কিন্তু যেসব দেশ আক্রান্ত হয়েছে তারা প্রতারিত হবে না। আক্রমণ-কারীদের ছলনা থেকে তারা অনেক শিক্ষা লাভ করেছে। ব্রিটেনের যুদ্ধে যোগদানের পিছনে যে মনোভাব, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস তা সঠিক ধরতে পেরেছিলেন, এবং এই বছরের গোড়ার দিকে তার প্রতিবাদও জানিয়েছিলেন। ব্রিটিশ সরকার নিজেদের সংকীর্ণ স্বার্থের দ্বারা প্রণোদিত হওয়াতে এটা আশা করা যায় না যে ব্রিটিশ সরকার বড় বড় বিপন্ন সমস্যাগুলি মনে রাখতে পারবে। কিন্তু ব্রিটিশ সরকারের আত্মবিরোধী নীতির প্রতি ওই দেশের চিন্তাশীল জনমতের সমর্থন আছে বলে আমরা মনে করি না। মনে করি না তার কারণ, বর্তমান য়ুরোপীয় মহাযুদ্ধ শুরু হওয়ার সময় ব্রিটিশ আই. পি. সি. জোরালো ভাষায় যে বিবৃতি দিয়েছিলেন তার কথা আমরা ভুলিনি। সেই বিবৃতিতে গণতান্ত্রিক নীতিসমূহের প্রতি আস্থার প্রমাণ দিতে বলা হয়েছিল ব্রিটিশ সরকারকে, আর ওই প্রসঙ্গে বলা হয়েছিল, সৎসাহসের পরিচয় দিয়ে তাঁরা যেন ভারতের অনুপেক্ষনীয় দাবি মেনে নেন। আর বার্মা রোডের ব্যাপারে লণ্ডনস্থ চৈনিক দূত অসংখ্য সহানুভূতিসূচক পত্র পেয়েছেন ব্রিটিশ জনগণের কাছ থেকে। কিন্তু এই সব দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি যতদিন যেখানে আছেন সেইখানেই থেকে যাবেন—অর্থাৎ এতটা দূরে, যেখান থেকে বর্তমান ব্রিটিশ সরকারের নীতির উপর তাঁদের কোন প্রভাব পড়বে না—ততদিন ব্রিটেন একটু একটু করে হারিয়ে ফেলবে তার প্রতি অন্যদের শুভেচ্ছা। এর নৈতিক এবং বাস্তব ফল খুবই বিপজ্জনক।

ভারতের জনগণের প্রতি আমাদের সহানুভূতি রয়েছে। ভারতের ঘটনাবলী এখান থেকে আগ্রহের সঙ্গে লক্ষ্য করা হয়। অবশ্য চীন নিজে এখন জীবনমরণ সংগ্রামে লিপ্ত, আপনাদের জন্যে বর্তমান অবস্থায় সে কি-ই বা করতে পারে। সে যাই হোক, আমাদের মনে হয় এই কঠোর পরীক্ষার অন্তে আমাদের সাফল্য পরোক্ষ-

ভাবে আপনাদের সহায়ক হবে। চৈনিক প্রজাতন্ত্রের জনক সান-ইয়াৎ-সেনের উপদেশাবলীর সঙ্গে আপনারা সুপরিচিত। আমাদের জাতীয় জীবন ওই উপদেশাবলীর দ্বারা প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত।

আপনাদের সংগ্রাম থেকে আমরা ক্রমাগত উৎসাহ ও প্রেরণা পাই। অতীতে যে স্বাধীনতা তাঁরা হারিয়েছিলেন তার পুনরুদ্ধারের জন্য ভারতীয় বন্ধুদের প্রয়াস দেখে আমরা ভালবাসতে শিখেছি নিজেদের স্বাধীনতাকে—যা আজ এখনও আমাদের হাতের মধ্যে আছে। আমরা বিশ্বাস করি, ভারতে মিঃ গান্ধীর ও চীনে জেনারেল চিয়াং কাই-শেকের নেতৃত্বে উভয় দেশই অর্জন করবে তাদের সাধারণ লক্ষ্য—জাতীয় মুক্তি। এই দুই জাতির মিলিত ইচ্ছার সামনে কোন বাধাই দাঁড়াতে পারবে না। আমাদের বিশ্বাসের মূলে আছে প্রতিরোধ-সংগ্রামের তিন বৎসরের অভিজ্ঞতা। এই সংগ্রামে দেখা গেল, দাসত্ব ও শোষণ মেনে নিতে নারাজ ৪৫ কোটি মানুষের ইচ্ছাশক্তি এক দুর্ভেদ্য প্রাচীরের মতো হয়ে উঠতে পারে শত্রুর কাছে। সে শত্রু, সম্পদ ও প্রস্তুতির দিক দিয়ে দেখলে আমাদের চেয়ে শক্তিশালী।

ভারত ও চীনের ইতিহাসে, এই দুই দেশের সীমান্ত নিয়ে কোন সশস্ত্র সংঘর্ষ উপস্থিত হয়নি। দুই দেশের মধ্যে শুভেচ্ছা বহনকারীরা আসা-যাওয়া করেছেন। একে অপরের সভ্যতার সুফলগুলি নিয়েছে। সেই কথাই রয়েছে ইতিহাসে। এই ঐতিহ্যই হবে দুই দেশের মধ্যে স্থায়ী মৈত্রীর ভিত্তি। আমরা বিশ্বাস করি, এই মৈত্রীবন্ধনকে দৃঢ়তর করবে আমাদের নিজেদের জাতীয় মুক্তিসংগ্রাম। আমরা সেই দিনের প্রতীক্ষায় আছি, যেদিন পৃথিবীতে শান্তি স্থাপনের জন্য ভারতীয় ও চৈনিক জনগণ হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করবেন।

ভারতবর্ষ সম্পর্কে যেটুকু সংবাদ এখানে পৌঁছয় তা পর্যাপ্ত নয়। আপনি যদি কোন সংবাদ পাঠানো দরকার বলে মনে করেন ও পাঠাবার ব্যবস্থা করেন তাহলে আমরা আনন্দিত হব। আমরা আশা করি, সেরকম কোন সংবাদ বা বার্তা এলে তা প্রচারের ব্যাপক ব্যবস্থা আমরা করতে পারব। আমাদের পরস্পরকে বোঝবার কাজও এতে হবে।

আপনাদের মহান প্রয়াসে আমাদের শুভেচ্ছা নিবেদন করি।

আপনাদের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন
চেং ইন-ফান, কর্মসচিব

পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু
এলাহাবাদ, ভারতবর্ষ

৩১২ মাদাম চিয়াং কাই-সেক কর্তৃক লিখিত

হেডকোয়ার্টার্স অব দি জেনারেলিসিমো
চুংকিং, চীন
সেপ্টেম্বর ১০, ১৯৪০

প্রিয় মিঃ নেহরু,

কতবার যে ভেবেছি আপনার চিঠিগুলির জন্যে ধন্যবাদ জানাব আপনাকে। শ্রীযুক্ত হু লিয়েন-চুং মারফত পেয়েছিলাম চিঠিগুলি, আর একটি চিঠি পেয়েছিলাম চৈনিক কনসাল-জেনারেলের মারফত।

সমস্যাসঙ্কুল এই দিনগুলির মধ্যেও জেনারেলিসিমো আর আমি আগ্রহ ও উদ্বেগ নিয়ে তাকিয়েছি ভারতের ঘটনাবলীর দিকে। আমরাও আশা করেছি আপনাদের সঙ্গে যে, ব্রিটিশ সরকার উদারনীতি অবলম্বন করবেন ভারতীয় জাতীয়

কংগ্রেস সম্পর্কে। আপনার চীন-ভ্রমণ ভারতের আশা ও সমস্যাগুলিকে আমাদের অন্তরে পৌঁছে দিয়েছে।

কয়েকমাস আগে আমি আপনার ভগ্নী শ্রীমতী পণ্ডিত ও ভারতের আরও কয়েকজন বিশিষ্ট মহিলাকে, অক্টোবর মাসে চীন দেখে যাওয়ার আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম। সেই চিঠিতে যা অনুমান করেছিলাম তাই হয়েছে। গত গ্রীষ্মে যে কটি দিন আকাশ পরিষ্কার ছিল, সুন্দর ছিল আবহাওয়া,—সেই রকম প্রত্যেকটি দিনেই জাপানী বিমান নিষ্ঠুরভাবে বোমাবর্ষণ করে গিয়েছে চুংকিংয়ে, এবং মুক্ত-চীনের সর্বত্র। এখন যদি আপনি চুংকিংয়ে আসতেন, চিনতেই পারতেন না তাকে। সমৃদ্ধিশালী অঞ্চলগুলি বীভৎস, বিকৃত ও রক্তাক্ত মূর্তি ধারণ করেছে। চতুর্দিকে চোখে পড়ে শুধু ধ্বংসস্তূপ। আমরা, যারা আজও অঙ্গহীন না হয়েও বেঁচে আছি— তারা, অক্লান্তভাবে কাজ করে যাচ্ছি হাজার হাজার গৃহহীন, আশ্রয়হীন, সম্বলহীন শরণার্থীদের সাহায্য করবার জন্য। মানুষের জীবন ও মানবিক সম্পদের উপর এত হিসেব করে এত ভেবে চিন্তে এমন নিষ্ঠুরতার সঙ্গে, এমন ব্যাপকভাবে, এমন অযৌক্তিক ধ্বংসকাণ্ড আর কখনও করেনি মানুষ।

কিন্তু আশ্চর্য, আমাদের জনগণের মনোবল একটুকু নষ্ট হয়নি। য়ুরোপের কোথাও কোথাও যা হয়েছে এখানে তা হয়নি। যত আঘাত এসে পড়ছে এদেশের মানুষের উপর ততই দৃঢ় এবং নিরাসক্ত ও নির্বিকার হয়ে উঠছে আমাদের সম্পর্কে। এত আঘাত, এত বেদনা আমরা সহ্য করেছি যে, বুঝেছি ধৈর্যপূর্ণ সহনশীলতা ও অনমনীয় সংকল্প নিয়ে প্রতিরোধ করতে হবে অনন্তকাল – তবেই চিরকালের জন্যে বেঁচে থাকবে চীন।

গত তিন সপ্তাহ ধরে ইনফ্লুয়েঞ্জায় ভুগছি। ফলে শয্যায় বন্দী থাকতে হয়েছে। আর যেসব কারণে এই বন্দিদশা সহ্য হয়েছিল তার একটি হল আপনার জীবনীপাঠ। আমার যা জীবন তাতে পড়াশোনার অবকাশ কোথায়। আমি চেয়েছিলাম আপনার বইটি একটু ধীরে সুস্থে পড়তে অর্থাৎ যেমনভাবে সেটি পড়া উচিত। কিন্তু এখন বলতে পারি যে আপনাকে জেনেছি কারণ আমি ধীরভাবে মন ও বুদ্ধি দিয়ে শুনলাম আপনার হৃদয়ের ভাষায় লেখা, আপনাদের দেশের মুক্তিসাধনায় আপনার গৌরবপূর্ণ সংগ্রামকাহিনী।

আপনার এই বই একটি মহান দলিল কারণ এ হচ্ছে দৈনন্দিন জীবনের দ্বন্দ্ব ও তুচ্ছতার ঊর্ধ্বে মানবাত্মার তীর্থযাত্রার কাহিনী। এটা হচ্ছে বুদ্ধিদীপ্ত এবং আবেগময় জগতে যাত্রা, ভাবালুতায় আবিল নয়, কিন্তু মানবিক আবেদনে গভীর। আর তাই এর স্থান সকল যুগের মহান দলিলগুলির মধ্যে।

আপনার এবং ভারতের উদ্দেশে, জেনারেলিসিমো ও আমার প্রীতিপূর্ণ অভিনন্দন জানাই, প্রার্থনা করি উজ্জ্বল ভবিষ্যতের।

আপনার বিশ্বস্ত
মেলিং সুং চিয়াং

৩১৩ জি. গেস্ট লেভো কর্তৃক লিখিত

লণ্ডন সেপ্টেম্বর ২৯ ১৯৪০

প্রিয় মহাশয়,

বয়সে আপনার চেয়ে বেশ কিছুটা বড়ই হব, আর শুধু সেই কারণেই কয়েকটা ভাষার বেশ কিছু বই যদি পড়ে থাকি, তবে সেটা অসাধারণ কিছু বলে মনে করার কোন কারণ নেই। কিন্তু আর কোন বই পড়ে তার লেখকের প্রতি এমন ব্যক্তিগত শ্রদ্ধার আবেগ অনুভব করিনি। আপনি যদি অনুমতি দেন, এবং অপরাধ না

নেন, তাহলে, শুধু ক্রিয়ার কালের একটু অদলবদল করে শেক্সপীয়র থেকে কয়েকটি পংক্তি উদ্ধার করতে চাই। প্রায় চল্লিশ বছর আগে পড়েছিলাম, তবুও স্মৃতিতে বোধহয় ঠিকই আছে তারা

"His life is noble, and the elements
So mixed in him that Nature may stand up
And say to all the world : This is a man."

ভবদীয়

(জি গেস্ট লেভো

এম এ ম্যাগডালেন অক্সফোর্ড)

৩১৪ খান আবদুল গফ্ফর খান কর্তৃক লিখিত

অনুবাদ

লখনউ

অক্টোবর ১৮, ১৯৪০

প্রিয় জওহরলালজী,

গতকাল নির্বিঘ্নে এসে পৌঁছেছি। নেহরু সাহেব স্টেশনে এসেছিলেন। তাঁর বাড়িতেই ছিলাম এবং বেশ আরামেই ছিলাম। আজ দুটোর ট্রেনে চলে যাচ্ছি। খাওয়ার ব্যবস্থা বেশ বিরাট রকমেই হয়েছিল—বোধহয় আমাকে উনি 'অতিথি' হিসেবেই ধরে নিয়েছিলেন। মেহেরতাজের সঙ্গে দেখা করেছিলাম। ওদের প্রিন্সিপালের সঙ্গেও অনেক কথা হল। ভদ্রমহিলা খুব প্রশংসা করলেন মেহেরতাজের। বললেন ভারি চমৎকার মেয়ে মেহেরতাজ। তবে একটু আবেগপ্রবণ আর অন্য মেয়েদের দ্বারা একটু সহজে প্রভাবিত হয়। তিনি বললেন যে মেহেতাজের পড়াশোনার দিকে নজর তো রাখবেনই অন্য বিষয়েও দেখাশোনা করবেন।

আপনি যদি মাঝে মাঝে মেহেরতাজকে চিঠি লেখেন তাহলে খুব ভাল হয়। আপনি বলবেন তাকে সে যেন একটু একটু বুঝতে চেষ্টা করে নিজেকে, আর এই পৃথিবীটাকেও। তার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য কী হওয়া উচিত? সে তো বড় হয়েছে এখন, ছেলেমানুষি যেন না করে। এ বিষয়ে আর কিছু বলব না, আপনি ভাল বুঝবেন আমার চেয়ে।

আসবার সময় আমি মওলানা সাহেবের সঙ্গেও দেখা করেছিলাম। তাঁকে যা বলেছি, তা তিনি আপনাকে ফোনে জানিয়ে দেবেন বললেন। হয়ত তিনি তা জানিয়ে দিয়েছেন ইতিমধ্যেই। সত্যি বলতে আমি ব্যাপারটি প্রথম শুনি মহাত্মাজীর কাছে, সেবাগ্রামে। জওহরলাল যে তাঁর মত মোটেই সমর্থন করেননি এতে যেন তিনি খুবই উদ্বেগ বোধ করছিলেন। বিনোবার সঙ্গে আলাপের পরের ঘটনা এটা। কেমন যেন মনে হচ্ছিল ভবিষ্যৎ কার্যক্রম সম্পর্কে তিনি মনঃস্থির করতে পারছেন না। আমি আশ্বাস দিয়েছিলাম তাকে যে স্টেশনে পণ্ডিতজীর সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছে এবং সে আলাপ বেশ সন্তোষজনক। কারো কারো মনে [সন্দেহ?] ছিল। তাই আমি এসেই মওলানা সাহেবকে আমার মতামত জানিয়েছিলাম, আর তাঁর সায় পেলাম। কথা হল তিনি ফোনে ব্যাপারটা জানিয়ে দেবেন আপনাকে। আমার অনুরোধ, আপনি চিঠি লিখে মহাত্মাজীকে আশ্বস্ত করবেন ব্যাপারটা যেন তাঁরই অভিপ্রায়ানুসারে হয়। আমি আর মওলানা সাহেবও তা-ই চাই।

এখানের খবর ভাল। আশা করি আপনি কুশলে আছেন।

আপনার

আবদুল গফ্ফর

৩১৫ জেনারেলিসিমো চিয়াং কাই-সেক কর্তৃক লিখিত

[অক্টোবর ১৮, ১৯৪০ তারিখের চিঠির অনুবাদ]

প্রিয় মিঃ নেহরু,

চুংকিংয়ে আমাদের মধ্যে যে চমৎকার আলাপ হয়েছিল তার মধুর স্মৃতি আমার মনে আজও অম্লান হয়ে আছে। প্রায়ই সে-কথা আমার মনে পড়ে। মনে পড়লেই একটি গভীর তৃপ্তি অনুভব করি। আপনার চীন পরিদর্শনের একটা ফল হল, আমাদের মধ্যে একটি আত্মিক মৈত্রীবন্ধন।

এই সুযোগে আপনাকে জানাই যে, আক্রমণকারী জাপানীদের প্রতিরোধ করবার শক্তি ও মনোবল—দুইই আমাদের ক্রমবর্ধমান। আমার দৃঢ় বিশ্বাস বিশৃঙ্খল এই ঘটনাবলী থেকে আগামী বিশ্ববিধান স্থিরীকৃত হবে কিনা তা নির্ভর করছে এশিয়ার জনগণের সম্মিলিত প্রয়াসের উপর। জাপানের দুরাকাঙ্খা নিত্যই বৃদ্ধি পাচ্ছে, বিশ্বের ঘটনাবলী দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে, তাই আমরা যারা শান্তি ও মুক্তি রক্ষা করতে চাই তাদের সবার আগে মোকাবিলা করতে হবে শান্তির প্রধান বিঘ্নকারীর সঙ্গে।

আমি আশা করি আপনার দেশের নেতারা—বিশ্বপরিস্থিতি সম্পর্কে যারা ওয়াকিফহাল, তারা নিশ্চয়ই এমন নীতি গ্রহণ করবেন বর্তমান পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে যা উপযুক্ত বলে বিবেচিত হয় এবং সেই নীতি যেন আমাদের আশা-আকাঙ্খা ও আক্রমণ প্রতিরোধে আমাদের সংকল্পের অনুকূল হয়।

মিঃ তাই চিতাও বন্ধুত্বপূর্ণ সফরে যাচ্ছেন আপনাদের দেশে। আমি তাঁকে অনুরোধ করেছি আমার শুভেচ্ছা ও সদিচ্ছা যেন তিনি ব্যক্তিগতভাবে আপনার সমীপে নিবেদন করেন।

ভবদীয়
চিয়াং কাই সেক

৩১৬ মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক লিখিত

ওয়ার্ধা
অক্টোবর ২১, ১৯৪০

প্রিয় জওহরলাল

তাহলে বিনোবাই নির্বাচিত হলেন। চারাদনব্যাপী তার নেতৃত্ব আমার তো মনে হয় সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে।

আজ একটি সংক্ষিপ্ত বিবৃতি দিচ্ছি। সেটি তুমি দেখতে পাবে। অধ্যাপক যেন করে জানিয়েছেন যে তুমি প্রস্তুত। তোমার বিবৃতিও আমি পড়েছি। আমি এখনও বলছি তোমায় যে আমি এখন যা কিছু করছি বা লিখছি তা তুমি অনুমোদনযোগ্য বলে মনে কর কিনা জানাবে আমায়। শৃঙ্খলার খাতিরে যাদের চুপ করে নির্দেশানুসারে কাজ করে যেতে হবে তুমি তাদের একজন নও। বর্তমানে আমি এমন লোকেদের চাই যারা আমার পরিকল্পনায় আস্থাশীল। আস্থা অবশ্য মূল বিষয়ে, খুঁটিনাটি ব্যাপারে নয়। কথাটার তাৎপর্য বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা অনাবশ্যক।

পারলে একটা 'তার' কোরো।

ভালবাসা
বাপু

৩১৭ মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক লিখিত

ওয়ার্ধা

অক্টোবর ২৪, ১৯৪০

প্রিয় জওহরলাল,

তোমার তার পেয়ে খুশী হয়েছি। আমার বিবৃতি যদি অনুমোদিত হয়ে থাকে তাহলে এই চিঠির আগেই সেটি তোমার চোখে পড়বে।

তুমি যদি প্রস্তুত থাক তাহলে তুমি আনুষ্ঠানিকভাবে আইন অমান্য ঘোষণা করতে পার। আমি প্রস্তাব করব, তুমি কোন একটি গ্রাম বেছে নাও এই কাজের জন্যে। ওরা তোমায় তোমার বক্তৃতা পুনরাবৃত্তি করতে দেবে বলে মনে হয় না। বিনোবার বেলায় ওদের কার্যক্রম সম্পর্কে ওরা মনঃস্থির করতে পারেনি। ওদের দিক থেকে বাধা না পেলে আমার মনে হয়, তুমি বিনোবার পদ্ধতি অনুসরণ করতে পার। অবশ্য যদি অন্য রকম মনে কর, নিজস্ব পদ্ধতি অনুসারেই কাজ করবে তুমি। আমি শুধু চাই যে, তুমি তোমার কার্যক্রম জানাবে আমায়। তুমি এমনভাবে তারিখ নির্বাচন করতে পার যাতে আমি কাল ও স্থান ঘোষণার সময় হাতে পাই। এমনও হতে পারে, ওরা তোমায় তোমার কর্মসূচীর প্রথমটিই অনুষ্ঠিত হতে দিল না। আমি সরকারের প্রতিটি সম্ভাব্য পদক্ষেপ সম্পর্কে প্রস্তুত। একদিকে যেমন আমি আমাদের কার্যক্রমের প্রচারের জন্যে আইনানুমোদিত প্রতিটি পন্থার সুযোগ নিতে চাই অন্যদিকে আমি নির্ভর করব সুনির্দিষ্ট চিন্তাশক্তির স্বতোৎসারিত ফলের দিকে। আমি জানি এতে বিশ্বাস করা তোমার পক্ষে শক্ত। আমি বলব, এখনকার মতো ওটা মুলতুবী রাখো। নজর দাও ফলের দিকে। আমি জানি, তুমি ধৈর্য ধারণ করবে এবং তোমার সহকর্মীদের তাই করতে বলবে। আমি জানি আমার প্রতি আনুগত্যের জন্য তোমাকে কী নিদারুণ মানসিক ভার বহন করতে হচ্ছে। তোমার আনুগত্য আমার কাছে অমূল্য। আমি আশা করি তা অস্থানে অর্পিত হয়নি বলেই প্রমাণিত হবে। আমাদের মন্ত্র 'করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে'। জীবনমৃত্যু পণ। ফেরবার পথ নেই। আমাদের দাবি ন্যায়ানুগ, যুক্তি অকাট্য। যে ভিত্তির উপর আমরা দাঁড়িয়েছি তাকে ধ্বংস করা অসম্ভব। নীতি স্বীকারের প্রশ্ন ওঠে না। শুধু শুদ্ধ অহিংসা-নীতির শক্তির প্রমাণ দেওয়ার সুযোগ আমায় দিতে হবে।

মওলানা সাহেব ফোন করে বলেছিলেন দ্বিতীয় সত্যাগ্রহের জন্যে কোন প্রার্থীকে নির্বাচন করে রাখতে। আমি বলেছি তাঁকে যে, তুমি যদি একাজে সম্মত হও তাহলে অন্য কোন নাম নির্বাচনের প্রশ্ন ওঠে না।

'হরিজন' সম্পর্কে যে ব্যবস্থা করেছি সে সম্বন্ধে তোমার মতামত জানতে পারলে সুখী হব।

ভালবাসা

বাপু

৩১৮ মাদাম চিয়াং কাই-সেক কর্তৃক লিখিত

হংকং

জানুয়ারি ১৬, ১৯৪১

প্রিয় মিঃ নেহরু,

শ্রীযুক্ত তাই চি-তাও মারফত আপনি আমায় যে চিঠিটি দিয়েছেন, সেটি আমার স্বামী পাঠিয়ে দিয়েছেন আমাকে। গত দু মাস যাবৎ আমি হংকংয়ে চিকিৎসাধীনে ছিলাম। যুদ্ধের গোড়ার দিকে সাংহাইয়ে আমি মোটর থেকে ছিটকে পড়ে গিয়েছিলাম। তার ফলে আমার পাঁজরের একটা হাড় ভেঙে যায়। সপ্তাহ খানেক

পরে যথারীতি কাজকর্ম করতে শুরু করি। তার পর থেকেই পিঠে একটা বেদনা অনুভব করতাম। কিন্তু এত ব্যস্ত থাকতে হয়েছিল যে ওদিকে নজর দিইনি। এই বছরের গ্রীষ্মকালে যন্ত্রণা অসহ্য হয়ে ওঠে। ইতিমধ্যে রোজ নিয়ম করে বোমাবর্ষণ চলছে। আর এই বোমাবর্ষণের পালা শেষ না হওয়া পর্যন্ত যে চুংকিং থেকে যাওয়ার সুযোগ পাব তা মনে হয়নি।

হংকংয়ে এলাম। এক্সরে নেওয়া হল। দেখা গেল আমার মেরুদণ্ডটি আকাবাঁকা রূপ ধারণ করেছে। সাধেই কি আর প্রায় পঙ্গু হয়ে পড়েছিলাম। যাই হোক, মেরুদণ্ডের মেরামতী চলছে। এখন অনেকটা ভাল আছি। আশা করছি আর কয়েক সপ্তাহের মধ্যে নিয়মিত কাজ শুরু করতে পারব। ফিরে গিয়ে আমি শ্রীযুক্ত তাই এর সঙ্গে দেখা করে আপনাদের সংবাদ সংগ্রহ করতে পারব।

আপনি কারারুদ্ধ হয়েছেন এই সংবাদে আমি যে কতটা বিমর্ষ ও দুঃখিত হয়েছিলাম তা আর কী বলব। তখন থেকে সব সময় আপনার কথা মনে হয়। মনে মনে হয়– কি তীব্রভাবেই না মনে হয় যদি কিছু করতে পারতাম আপনার জন্যে আর ভারতের জন্যে। আপনি লিখেছেন দিন দিয়ে সময়কে মাপা যায় না। আপনি যদিও খুব অল্প সময়ের জন্য এখানে এসেছিলেন তবু মনে হয় আপনি যেন আমাদের কত দিনের বন্ধু আর সত্যিই তো আপনি তাই। জেনারেলিসিমো এবং আমি দুজনেই অনুভব করেছি যে আপনার সঙ্গে একটা আত্মিক সঙ্গতি আছে আমাদের। আর একই লক্ষ্য ও অভীপ্সা আমাদের করে তুলেছে পরস্পরের বন্ধু ও সহকর্মী।

আপনার জন্যে এখন কাজ বা প্রার্থনা করতে পারি খুব সামান্য কিছু কিংবা কিছুই নয়। কিন্তু আপনার প্রতি আমাদের প্রীতি ও বিশ্বাসের কথা জানলে যদি আপনার দিনগুলি কিছুটা সহনীয় বলে মনে হয়– তাহলে জানাই যে আপনার মতো নিঃস্বার্থ ও সাহসী মানুষ যে আছে এতেই আমরা আনন্দিত। আমরা নিঃসংশয় যে ভারতের দাবি সগৌরবে বিজয় লাভ করবেই। আমাদের অন্তর ও প্রার্থনা সব সময় আপনাদের সঙ্গী।

যে বিশ্বস্ত বন্ধুটির হাতে এই পত্রটি পাঠাচ্ছি তিনি আর কয়েক মিনিটের মধ্যেই রওনা হবেন। আমাদের দেশের অধিবাসীদের মধ্যে আপনার কারারুদ্ধ হওয়ার সংবাদে যে কী প্রবল বিক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে তা আর দু-চার কথায় কী করে বলি? ব্রিটিশ গণতন্ত্রের প্রতি এতদিন যাঁরা আস্থা স্থাপন করেছিলেন তাঁরা ভাবছেন যে তবে কি তাঁরা উদারনৈতিক বলে যা ভেবেছিলেন তা আসলে সাম্রাজ্যবাদ ছাড়া অন্য কিছু নয়। আর কিছু বলবার দরকার নেই বোধহয়।

বন্ধু, আমার সব শুভেচ্ছা জানাই আপনার উদ্দেশে।

মেলিং সুং চিয়াং

৩১৯ জাঁ ফ্রস্ট কর্তৃক লিখিত

নিউ ইয়র্ক
মঙ্গলবার এপ্রিল ১৫ ১৯৪১

প্রিয় মিঃ নেহরু,

আমি আপনার কাছে একেবারেই অপরিচিত। অথচ সরাসরি চিঠি লিখতে বসেছি আপনাকে। আমার পক্ষে এটা নিশ্চয়ই ধৃষ্টতা। কিন্তু হয়েছে কি, আমার মনে আপনাকে চিঠি লেখার ইচ্ছেটা খুবই তীব্র হয়ে উঠেছে। আপনি না হয় ব্যাপারটা ক্ষমাই করে ফেলুন। আপনি আমায় অনেক ভাববার জিনিস দিয়েছেন।

আর তাইতো আমি এত কৃতজ্ঞ আপনার কাছে। কি ভাবে যে শুরু করি। ভাষার উপর আমার সামান্য অধিকারও নেই, অথচ আমি চাইছি আমার হৃদয়ের ভাষাহীন কৃতজ্ঞতা আপনাকে নিবেদন করতে। কিন্তু কিভাবে তা প্রকাশ করব? আমি যা-কিছু গভীরভাবে অনুভব করি তাকে প্রকাশ করতে গেলেই বড় মুশকিলে পড়ি। কিন্তু এখন ভীতির চেয়ে প্রয়োজনটা বড় বলে মনে হচ্ছে। অতএব, যথাসাধ্য চেষ্টা করি।

আপনার আত্মজীবনী পড়ছি। বইটা আমার খুব প্রিয় হয়ে উঠেছে। আর আমাকে যে কী ভীষণ লজ্জা দিয়েছে বইটা। আর নিজের সম্পর্কে ভীষণভাবে লজ্জিত হওয়ার ভীষণ দরকার ছিল আমার। বিগত জীবনের বেশীর ভাগ সময় নষ্ট করেছি নিজের হতাশ ও মোহপূর্ণ পাঁকে ভরা ডোবার চারিদিকে গড়াগড়ি দিয়ে। সারাজীবন ধরেই আমি বিদ্রোহ করে এসেছি প্রায় সব কিছুর বিরুদ্ধেই। নিজের মত সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা যদিও ছিল না তবু অভাব হয়নি অন্যদের বিরুদ্ধে শক্ত কথার। মানুষের কাছ থেকে দূরে সরে গিয়েছি আর ভেবেছি আমার এত নিরাশার কারণ কী। যে সমাজে জন্মেছি বড় হয়েছি তা ছেড়ে দূরে চলে যেতে চেয়েছি আর এই যাওয়ার [illegible] হচ্ছে আমার সংসার ত্যাগ। ফলে তপ্ত খোলা থেকে গিয়ে পড়লাম জ্বলন্ত আগুনে। এখন আমি যেখানে আছি তাও সংসারকে খেসারৎ দিয়ে। আমি ভেবেছিলাম [illegible] যে যেহেতু নিজের ভাব বা নিজের বিচিত্র মতামত থেকে কোন দিনই আমি সংসারকে রেহাই দেব না অতএব সংসার চিরকাল আমার ভার বইবে।

এখন মনে হয় এবার [illegible]। আমি চাইছি নিজের মাথা উঁচু করে তুলে ধরতে। আর বলতে যে আমি সৎ। অন্তত সেটুকু করবার প্রেরণা আমি অনুভব করছি। এখন বুঝতে পারছি জীবনে সবচেয়ে বড় জিনিস হচ্ছে আদর্শগুলি রক্ষা করে চলা। হ্যাঁ রক্ষা করতেই হবে তাদের নির্ভয়ে—তার জন্যে যত মূল্যই দিতে হোক না কেন। যা ঘটেছে তার উপর তো কোন হাত নেই তবু কিছুটা ক্ষতিপূরণ করা যায়। অন্তত ক্ষতিপূরণ করবার চেষ্টা করা যায় যদি আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হই যে আমি এতকাল যা ছিলাম এখন থেকে আর তা থাকব না। কিন্তু গুছিয়ে কি বলতে পারলাম আমার কথা!

সে যাই হোক আমার মনোভাবের পরিবর্তনের জন্যে আপনাকে আমার ধন্যবাদ জানানো দরকার। পৃথিবীটা বসবাসের পক্ষে যাতে সুন্দর হয় তার জন্যে আমার সামান্য কাজটুকু সুষ্ঠুভাবে করতে চাই। অন্ধকারে আলোর এতটুকু দিশা পেলে পথভ্রান্ত পথিক যেমন ধন্যবাদ বলে চিৎকার করে ওঠে তেমন করেই ধন্যবাদ জানাতে চাই আমি আপনাকে। মানুষের শঠতা, বঞ্চনার দারুণ দুর্যোগের মধ্যে দূরে ক্ষীণ কিন্তু অচঞ্চল মহিমায় উদ্ভাসিত মানবাত্মার আলোর ইশারা পেলাম বলে। আমার কথা হয়ত একটু অলংকৃত (যদিও যথেষ্ট প্রকাশক্ষম নয়) বলে মনে হতে পারে। তবু যা বললাম তা অন্তরের অন্তঃস্থল থেকেই উৎসারিত। (শুধু অন্তর থেকে নয় উপর থেকে মাঝ থেকে পাশ থেকে—হৃদয়ের সবটুকু থেকেই।)

আপনার

জাঁ ফ্রস্ট

৩২০ রফি আহমদ কিদোয়াই কর্তৃক লিখিত

গোরক্ষপুর
এপ্রিল ২৬, ১৯৪১

প্রিয় জওহরলালজী,

শ্রীমতী পণ্ডিতের প্রস্তাবিত চীন দর্শন সম্পর্কে আমার একটু উদ্বেগ আছে। উদ্বেগ যুদ্ধের গোলমালের জন্যে নয়, ভারতবর্ষের পরিস্থিতির জন্যে। আমার মনে হচ্ছে, আমরা যদি নিজেদের ব্যাপারে একনিষ্ঠ হই, এবং দুনিয়াকে দেখাতে চাই যে আমাদের আগ্রহ সত্যিই ঐকান্তিক, তাহলে, শ্রীমতী পণ্ডিতের মতো বিখ্যাত কারও পক্ষে এমন কোন কাজে লিপ্ত থাকা ঠিক নয়, যে-কাজ আমাদের আন্দোলনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত নয়। ঠিক যে কারণে আমি পছন্দ করি না যে, রাজেন্দ্র বাবুর মত লোক হরেকরকম অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার জন্যে দেশময় ঘুরে বেড়াবেন; তা সে দ্বারভাঙ্গায় 'সুত্র' অনুষ্ঠানই হোক বা দিল্লীতে তালিমী সঙ্ঘের বৈঠকই হোক।

আশা করি এই চিঠিটি লেখার জন্যে আপনি বা শ্রীমতী পণ্ডিত কিছু মনে করবেন না।

আমি ভাল আছি, আনন্দে আছি। লর্ড হ্যালিফাক্স বিশ বছর ধরে লড়াই চালাবার (যার মানে আমাদের কারাবাসের মেয়াদ বৃদ্ধি) যে হুমকি দেখিয়েছেন, তার জন্যে আমি কিছুমাত্র দুশ্চিন্তা বোধ করছি না।

আপনার
রফি

৩২১ পূর্ণিমা ব্যানার্জি কর্তৃক লিখিত

এলাহাবাদ
মে ৭ ১৯৪১

প্রিয় জওহরলালজী,

পুরো চারটি বছর আপনাকে দেখতে পাব না, এ যেন ভাবতেও পারি না। আপনি যখন লখনউয়ে ছিলেন তখন যে আপনার দিনগুলো কাজ দিয়ে ঠাসা থাকত, তা আমি জানি। দেরাদুনেও 'বাইরের লোকেদের' (আমিও তো তাদেরই দলে) দেবার মতো অবকাশ আপনার নেই। তবু একবার দেখা করতে চাই আপনার সঙ্গে। বিশেষ কোন কারণ নেই। ব্যক্তিগত একটা ইচ্ছে মাত্র।

পাপুর সঙ্গে মুসৌরি যাওয়ার জন্যে আমি নাছোড়বান্দা। তিনি আবার পাল্টা-সত্যাগ্রহের ভয় দেখাচ্ছেন যে বেশী জেদাজেদি করলে 'পাদমেকং ন গচ্ছামি'। সত্যি বলতে এর ফলে তাঁর ছুটিটা মাঠে মারা যেতে বসেছে দেখে শেষবেশ আমাকেই হাল ছাড়তে হবে। অবশ্য এর মধ্যে যদি আমি কারারুদ্ধ হই তাহলে কিন্তু চমৎকার একটা সমাধান পাওয়া যায় এই সমস্যার।

* * * *

খুব সাধারণ আর খুব সাদামাঠা জরুরী কাজের কথা ছাড়া আর কিছু লেখবার কথা আমার মগজে আসে না।

২৫শে সকাল সাড়ে সাতটায় দেরাদুনে থাকব। সেখানে আপনার সঙ্গে দেখা হলে খুব খুশী হব। আর অত ভাগ্য যদি আমার নাই থাকে, তাহলে ২৫শের পর যে-কোন দিন আপনার সঙ্গে একটি সাক্ষাৎকার চাইছি। মুসৌরী থেকে যেতে পারব সহজেই।

* * * * সেন্সর কর্তৃপক্ষ এই অংশ কেটে তুলে দিয়েছিলেন

সাক্ষাৎকারের জন্যে অনুমতি প্রার্থনা করে সুপারিনটেন্‌ডেন্‌ট-কে একটি পৃথক পত্র লিখলাম। আর যদি তার আগেই গ্রেপ্তার হই, তাহলেও আমি তাঁকে খবরটা জানাব যাতে সাক্ষাৎকারের দিনে অন্য সাক্ষাৎকামীরা আপনার দর্শন থেকে একেবারেই বঞ্চিত না হন।

এই চিঠিটাই আপনাকে দেওয়া হবে কিনা তাও আমি জানিনা।

ইন্দুর সঙ্গে অল্প সময়ের জন্যে দেখা হয়েছিলাম। আমার মনে হয় আমি এত বড় এবং বুড়ো একেবারে মাসী-পিসী-গোছের ত্রিকালোত্তীর্ণা হয়ে গিয়েছি যে সদ্য য়ুরোপ-ফেরতা তরুণ-তরুণীদের সঙ্গে আলাপ করার যোগ্যতাই আর নেই আমার। কৃষ্ণ মেননের কথা জিগ্যেস করেছিলাম ইন্দুকে। তিনি যথাপূর্বং আছেন।

এলাহাবাদে আর কেউই নেই আজকাল। সেদিক দিয়ে দেখলে জেলের বাইরে থাকা আর ভিতরে থাকার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।

এলাহাবাদ গোষ্ঠীর বন্দীরা চমৎকার রয়েছেন। মুজাফ্‌ফরকে তো চেনাই যায় না। গত শনিবার তাকে দেখেছিলাম। উন্নতি হয়েছে স্বাস্থ্যের।

যাওয়ার আগে একবার মওলানার সঙ্গে দেখা করতে চাই। আশা করি, জেলের উত্তাপে ক্ষণিকের জন্যেও তার শান্ত ভাবের বা তাঁর দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গীর কিছুমাত্র পরিবর্তন হয়নি। সত্যি বলতে জেলগুলো গড়াই নিরর্থক প্রতিপন্ন হয়েছে। ওরা না পারে মানুষকে শোধরাতে, না পারে তাকে দাবিয়ে দিতে।

কেমন আছেন আপনি? ইন্টারভিউগুলোও নিরর্থক। বেশ বুঝছি আপনার সঙ্গে দেখা করে আসবার পর একটুও ভাল লাগবে না, তবু তা কিছু তো বটে। আর কিছু ভাল না-লাগা জড়িয়ে আছে বলেই সব কিছুই এড়িয়ে চলাটাও ভাল বলে মনে হয় না আমার।

৮ই নাগাদ এলাহাবাদ-দলের মহিলা সত্যাগ্রহীর দল ছাড়া পাচ্ছেন। ফৈজাবাদে নেতৃত্ব গ্রহণের দণ্ডভোগ করছেন সুচেতা। তিনি, লক্ষ্মী দেবী আর উমা বৌদিদি এই তিন জনই শুধু এক বৎসর করে পেয়েছেন। ব্যারাক-বাসের যন্ত্রণাটুকু বাদ দিলে সময়টা মন্দ কাটেনি আমার। আমি আর শ্রীমতী পণ্ডিত কিছুকাল এলাহাবাদে ছিলাম একসঙ্গে।

প্রভাবতীর সঙ্গে দেখা করেছিলাম। শোনেন বোধহয় জয়প্রকাশ আছেন দেওলিতে। রামমনোহর ভালই আছেন। দাড়ি রেখেছেন তিনি আর মস্তকমুণ্ডন করেছেন। সে এক দৃশ্য। তবে কাছাকাছি আয়না না থাকায় সেই নয়নলোভন রূপ তিনি নিজে দেখতে পান না। পেলে নিশ্চয়ই পরিত্যক্ত পূর্বরূপ উদ্ধারে সচেষ্ট হতেন। গত মাসের ২৮শে তার সঙ্গে দেখা হয়েছিল।

দেরাদুনে সুন্দর সুন্দর পাখি আছে নানারকমের। তারা আসে নাকি আপনাদের এলাকায়? পক্ষীকুলের কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণে আমি পারঙ্গম। আপনি যদি চান তাহলে ভারতবর্ষে যতরকম পাখি আছে তাদের সম্পর্কিত একটি বই নিয়ে যেতে পারি আপনার জন্যে। তাদের নাম জানতে পারবেন আপনি। মুসৌরীতে অনেকখানি করে বেড়াতাম, ভারি ভাল লাগত সেই সময় পাখিদের দেখতে। চমৎকার কেটে যেত সময়টা।

শ্রদ্ধা জানবেন।

স্নেহের
নোরা

৩২২ রিচার্ড বিৎসনার কর্তৃক লিখিত

সুদেতান জার্মান সোস্যাল ডেমোক্রাটিক
পার্টির লণ্ডনস্থ প্রতিনিধি
লণ্ডন
আগস্ট ১৩, ১৯৪১

প্রিয় পণ্ডিত নেহরু,

অনেক দ্বিধার পর আমরা নির্বাসিত সুদেতান সোস্যালিস্টরা—আপনাকে এই চিঠিটি লিখতে উদ্যোগী হয়েছি আর সেই সঙ্গে আপনাকে আমাদের অভিনন্দন জানাতে চাই। ১৯৩৮এর সেই সংকটপূর্ণ গ্রীষ্মে বোডেনবাখ ও প্রাগে আমাদের সঙ্গে আপনার যে আলাপ হয়েছিল, তার কথা এখনও সুস্পষ্টভাবে রয়েছে আমাদের স্মৃতিতে। হিটলারবাদের বিরুদ্ধে আপোসহীন সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার জন্যে আপনি যে আমাদের উদ্বুদ্ধ করেছিলেন সে কথা আমরা আজও সকৃতজ্ঞভাবে স্মরণ করি। মিউনিক চুক্তির পর আমরা বাধ্য হই স্থান ত্যাগ করতে। থার্ড রাইখের কনসেনট্রেসন ক্যাম্পে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে আমাদের ২০,000 তাজা তরুণকে। তাদের অধিকাংশই আজ আর বেঁচে নেই তবুও আমরা গর্বের সঙ্গে বিশ্বাস করি যে আমাদের সংগ্রামের মধ্যে দিয়েই অম্লান রেখেছি আমাদের পার্টির সম্মান যে পার্টি নাৎসীবাদের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক পন্থায় শেষ লড়াইয়ের দুঃখপূর্ণ-গৌরব অর্জন করেছিল। ৩,000 বন্ধুকে আমরা নাৎসীদের কবল থেকে পলায়নে সহায়তা করেছি। আজ তারা নির্বাসিত জীবন যাপন করছেন সুইডেন ইংলণ্ড ও কানাডায় সুযোগের প্রতীক্ষায় আছেন আর ঘাতকের বর্শা হাতের নাগালের মধ্যে থাকলেও নিরুদ্যম হননি আশা হারাননি আমাদের সেই সব বন্ধুরা, যারা আজও স্বদেশে রয়েছেন। ডাচাও তে বছর দশেক থাকবার পরও যেসব বন্ধুরা আজও বেঁচে আছেন তারা পত্র ও শুভেচ্ছাবার্তা মারফত আমাদের নতুন করে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন পুরাতন আদর্শের জন্যে লড়াই করে যাওয়ার।

পণ্ডিত নেহরু আমরা আপনাকে আমাদের বক্তব্য নিবেদন করছি এমন একটি আন্দোলনের পক্ষ থেকে ঘটনাস্রোতে যার সদস্য সংখ্যা অনিবার্য কারণে কমে এসেছে, কিন্তু আজও যা য়ুরোপীয় সমাজতন্ত্রের দুর্মর শক্তির অঙ্গ।

আপনি আর আপনার বন্ধুরা যে কারাগারে রয়েছেন একথা জেনে আমরা দুঃখিত হয়েছি। জাতীয় কংগ্রেসের দুর্দান্ত প্রগতিশীল শক্তি যে আজকের এই মহাসংগ্রামের বাইরে থেকে গেল, একথা খুবই দুঃখের। জাতীয় কংগ্রেস এবং ব্রিটিশ সরকারের সম্পর্কের মধ্যে অচলাবস্থা উপস্থিত হওয়ায় বিশ্বের গণতান্ত্রিক-সমাজবাদীদের বাহিনীতে একটি শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে। যে-বাহিনী আজ ফাসিস্ত ও নাৎসী সৈন্যদলের সম্মুখীন। ভারতের সমস্যার ঐতিহাসিক ও সামাজিক সম্পর্কে আমাদের স্পষ্ট কিছু ধারণা নাই। ওই সমস্যার সঙ্গে জড়িত দুই শক্তিশালী পক্ষের কাউকেই কোন উপদেশ দেওয়ার অধিকারও নেই আমাদের। কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি রাশিয়ার যোগদানের পর থেকে যুদ্ধ মুক্তি-সংগ্রামের রূপ ধারণ করেছে। আমরা আরও বিশ্বাস করি যে হিটলার, মুসোলিনি ও ফ্রান্সের পরাজয়ের পর সারা বিশ্ব জুড়ে গণতন্ত্রের এক আন্দোলন উপস্থিত হবে এবং ভারতও তার দ্বারা লাভবান হবে।

সমাজবাদী হিসেবে আমরা চাই যে আজকের এই সংঘাত থেকে গড়ে উঠুক মুক্ত ও ঐক্যবদ্ধ য়ুরোপ। আর সেই উদ্দেশ্যেই আমরা কাজ করে যাব। আমাদের পথে কঠিন বাধা অনেক আছে। তবু একটা উৎসাহব্যঞ্জক লক্ষণ হল এই যে,

সব দেশের প্রগতিশীল শক্তিগুলি ক্রমেই স্পষ্ট করে অনুভব করছেন যে শান্তিকে স্থায়ী ও দৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে, স্বাধীন জাতি ও মহাদেশগুলির পারস্পরিক নির্ভরতা যথোপযুক্তভাবে স্বীকৃত হওয়া প্রয়োজন। মুক্ত ভারতের সহযোগিতা চাই য়ুরোপের; কিন্তু ভারতকেও, তার দিক থেকে, য়ুরোপকে সহযোগী বলে মেনে নিতে হবে।

এই লক্ষ্যের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে আপনাদের ও আমাদের—উভয়ের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে কয়েকটি কথা নিবেদন করতে পারি কি?

ইংলণ্ডের নীতিতে ভুল থাকতে পারে--(আমরাই তার প্রমাণ, মিউনিক চুক্তির প্রথম বলি তো আমরাই!)- তবু ফ্রান্সের পতন ও হিটলারের রাশিয়া অভিযানের অন্তর্বর্তী কালে বিশ্বের স্বাধীনতার পূর্ণ দায়িত্ব ইংলণ্ডের জনগণের উপরেই ন্যস্ত ছিল। ১৯৩৮এর শরৎকালে আমরাও তিক্ত হতাশার আস্বাদ পেয়েছিলাম, আর বোধহয় সেই জন্যেই অনুমান করতে পারি যে, আজ রুদ্ধকারার অন্তরালে আপনারা কী তিক্ততা অনুভব করছেন। কিন্তু এদেশে নির্বাসিত হয়ে এসে ইংরেজ জাতিকে যখন দেখলাম বেদনা সহ্য করতে, কঠোর সংগ্রাম করতে, তখন আমাদের পূর্বের তিক্ততা প্রশংসায় রূপায়িত হল। খুনীদের বোমাবর্ষণের বিরুদ্ধে যখন রুখে দাঁড়িয়ে কাজ চালিয়ে গেছে লণ্ডনের অধিবাসীরা, তখন তাদের মনে কোন সাম্রাজ্যবাদী লক্ষ্য ছিল না। পণ্ডিত নেহরু, আপনি বিশ্বাস করুন একথা। তারা তখন লড়াই করেছে স্বাধীনতারই জন্যে। যার জন্যে সংগ্রাম করছেন আপনি, করছি আমরা।

আমাদের মত হল এই যে,- স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও শান্তির নবযুগের উদ্বোধনের জন্যে আমাদের একত্র দাঁড়াতে হবে যুদ্ধের পর, খুঁজে নিতে হবে একটি সাধারণ পথ। আমরা আশা করি ভারতেও ঘটনাবলী ভালোর দিকে মোড় নেবে।

হিন্দু মুসলমান সহযোগিতার যে সমস্যা, আকারে ছোট হলেও তার সঙ্গে তুলনা করা চলে চেক সুদেতান জার্মান সমস্যার সঙ্গে। তবু আমরা সুখী হব যদি কোন একদিন স্বাধীন দেশের স্বাধীন মানুষ হিসেবে মধ্য ইউরোপের সংগঠনের ও পুনর্গঠনের সমস্যা নিয়ে আমরা আপনার সঙ্গে আলোচনা করার সুযোগ পাই। এই চিঠিটিকেই আপনি না হয় প্রাগ ও বোডেনবাখ আবার আমাদের আতিথ্য গ্রহণের আমন্ত্রণ-পত্র বলে মনে করবেন।

আর তখন আপনার সঙ্গে আমরা ইংরেজীতেই কথাবার্তা বলতে পারব। এই নির্বাসন কালে আমরা ইংলণ্ডের ভাষা সাহিত্য ও দর্শনের সঙ্গে পরিচয় করে নেওয়ার জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি।

আমাদের সহকর্মীদের সকলের পক্ষ থেকে আমাদের গভীরতম সহানুভূতি নিবেদন করি আপনার উদ্দেশে।

রাজনৈতিক বইপত্র পড়ার সুযোগ আপনার আছে কিনা জানিনা, এই সঙ্গে আমরা "ইংলণ্ড অ্যাণ্ড দি লাস্ট ফ্রি জার্মানস" নামক একটি পুস্তিকা ও সুদেতান সমস্যার ভবিষ্যৎ সমাধান সম্পর্কে আমাদের পার্টির ঘোষণাপত্রের একটি করে কপি পাঠালাম।

ভবদীয় বিশ্বস্ত
রিচার্ড রিংসনার
ওয়েঞ্জেল জাখ্

৩২৩ এলিনর্ এফ্ র‍্যাথবোন্ কর্তৃক লিখিত

[আমি তখন জেলে ছিলাম বলে এই চিঠি সরাসরি আমার কাছে না পাঠিয়ে যুক্ত প্রদেশের শাসনকর্তার নিকট পাঠানো হয়েছিল। পরে লাট সাহেব চিঠিখানা দেরাদুন জেলে আমার কাছে পাঠাবার ব্যবস্থা করেন।]

হাউস অফ কমন্স
লণ্ডন
২৮শে আগস্ট, ১৯৪১

প্রিয় পণ্ডিত নেহরু,

আপনার সুদীর্ঘ পত্রের জন্য ধন্যবাদ। চিঠিখানা পেয়েছি কয়েক সপ্তাহ হয়ে গেল। কিন্তু কাজের ভয়ানক চাপ ছিল পার্লামেণ্টের অধিবেশন শেষ হলে অবসর মতো লিখব এই ভেবে এতদিন জবাব দেওয়া হয়নি। অবশ্য ইতিমধ্যে সময়টা একেবারে বৃথা কাটেনি। আপনার চিঠি মিঃ এমারী পড়েছেন। পার্লামেণ্টের কয়েকজন সদস্যও পড়েছেন এ ছাড়া ভারতবর্ষ সম্পর্কে ঔৎসুক্য আছে এমন আরো কয়েক জনকেও পড়ানো হয়েছে।

আপনার সব কথার জবাব দেবার চেষ্টা করব না তবে এর মধ্যে যে কটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য এখানে তারই আলোচনা করব।

আপনার মতে ভারত-ব্রিটেন সম্পর্কিত আলোচনায় আমাদের দুজনের মধ্যে ঐক্যের কোন ক্ষেত্রই নেই শুনে আমি যথার্থই দুঃখিত হয়েছি। আমি তো মনে করি ঐক্যের খুব বিস্তৃত ক্ষেত্রই রয়েছে কেননা আমরা উভয়েই স্বাধীনতা গণতন্ত্র এবং সমাজ উন্নয়নে সমভাবে বিশ্বাসী ভারতবর্ষের জন্যে তো বটেই অন্যান্য সকল জাতির বেলাতেই এসব আমাদের কাম্য। অবশ্য স্বাধীনতা কিম্বা গণতন্ত্রের প্রকৃত সংজ্ঞা সম্পর্কে আমাদের দুই এর যথেষ্ট মতবিরোধ আছে বিশেষ করে স্বাধীনতা অর্জনের পন্থা এবং সেটা দ্রুত গতিতে হবে কি ক্রমগতিতে হবে তা নিয়ে তো বটেই।

বিলম্বে হবে কি অবিলম্বে হবে এই নিয়েই বোধহয় আমাদের সব চেয়ে বড় মতান্তর। গত কুড়ি বছর ধরে ভারতবর্ষ যে বিভিন্ন কিস্তিতে স্বায়ত্তশাসনের ক্ষমতা পেয়ে আসছে এবং ভবিষ্যতে যে সর্তাধীন ডমিনিয়ান ষ্ট্যাটাস-এর প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে—আপনার মতে এ সমস্তই অপমানজনক এবং মর্যাদা হানিকর। আমার কাছে—বলতে গেলে ইংরেজ মাত্রেরই কাছে এটা কিছুই অস্বাভাবিক নয় কারণ আমরা নিজেরাও স্বায়ত্তশাসনের ক্ষমতা এবং অন্যবিধ শাসন সংস্কার অল্পমাত্রায় দফায় দফায় পেয়েছি। আমাদের নিজের দেশে যে নীতি অবলম্বন করা হয়েছিল, ভারতবর্ষের বেলায় সেই নীতিরই অনুসরণ করা হচ্ছে। এই পন্থাতেই আমরা আমাদের স্বাধীনতা অর্জন করেছি এবং এই পন্থাই আমাদের শ্রীবৃদ্ধি হয়েছে। কাজেই 'ক্রমগতিকে আমরা এক রকম অবশ্যম্ভাবী বলেই মেনে নিয়েছি। অবশ্যম্ভাবী' কথাটা আমি দার্শনিক অর্থে বলছি না খুব বাস্তব অর্থেই বলছি। এই রীতিতে আমরাও মাঝে মাঝে অধৈর্য্য প্রকাশ করিনি এমন নয়। অনেক সময় এই ক্রমগতি নিতান্তই ধীরগতি বলে মনে হয়েছে। দীর্ঘদিন পরে যখন একটু শাসন ক্ষমতা হাতে এল তখন এই ভেবে মন বিষাক্ত হয়েছে যে এইটুকুও কত লোক দেখে যেতে পারল না। কিন্তু তবু সব মিলিয়ে বলব এই শনৈঃ শনৈঃ পন্থায় মোটের উপর সুফলই ফলেছে এবং অন্যান্য দেশ এবং জাতিকে যে সব দুর্ভোগ ভুগতে হয়েছে আমরা তার হাত থেকে বেঁচে গিয়েছি—কোথাও ঘটেছে রক্তক্ষয়ী বিপ্লব কোথাও মারাত্মক

অন্তর্দ্বন্দ্ব, কোথাও না-ভেবে-চিন্তে শাসনবিধির আমূল পরিবর্তন এবং পরে অচল অবস্থার সৃষ্টি, আবার কোথাও বা এত সহজে ক্ষমতা অর্জিত হয়েছে যে দেশবাসী উপকৃত বোধ করলেও তাকে প্রকৃত মর্যাদা দিতে শেখে না, ফলে সে ক্ষমতা তারা রক্ষা করতেও পারে না।

এই দ্রুতগতি কিম্বা ধীর গতি সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে যে কথাটি আমার কাছে খুব অদ্ভুত ঠেকছে সেটি এই যে, আপনার সমগোত্রীয় ভারতীয়েরা শাসন সংস্কারের বেলায় বলেন,—"হয় সবটুকু দাও, নয়তো কিছুই দিয়ো না, আর দেবে তো সব এক সঙ্গে, এক কিস্তিতে দাও", অথচ সেই পরিবর্তনে যে শুধু ভারতবর্ষ নয় অন্যান্য দেশেরও মঙ্গলামঙ্গল নির্ভর করছে সে কথা তাঁরা ভেবে দেখেন না। কিন্তু মজার ব্যাপার এই যে সমাজ-সংস্কারের বেলায়—সেটা খুব দ্রুত হলেও ক্ষতির আশঙ্কা যৎসামান্য—সেখানে ভারতীয়েরা দেখেছি গড়িমসিতে আমাদের চাইতে কিছু কম নয়। অন্ততঃ বাল্যবিবাহ এবং পর্দাপ্রথার ব্যাপারে কাজ করতে গিয়ে আমার সে অভিজ্ঞতাই হয়েছে। এই সমস্ত কুসংস্কার দূরীকরণে ইংরেজ শাসকবর্গ যে ভীরুতা এবং সাবধানতা অবলম্বন করেছেন ভারতীয়দের মধ্যে তেমন অগ্রগামী সমাজ সংস্কারককেও সেই নীতিই স্বীকার করে নিতে দেখেছি। কোন কোন ক্ষেত্রে বলতে শুনেছি যে ভারতবর্ষ স্বাধীন হ'লে নাকি এ ধরণের সমাজ সংস্কার একেবারে হুড়মুড় করে হয়ে যাবে, কিন্তু তেমন লক্ষণ তো কিছু দেখতে পাইনি। মিঃ গান্ধী অস্পৃশ্যতার ব্যাপারে যে দৃঢ়তা দেখিয়েছেন সেটা অবশ্যই একটা ব্যতিক্রম, আর সেটা স্ত্রীপুরুষ সকলকে জড়িয়ে। কিন্তু একথা নিশ্চয় স্বীকার করবেন যে উপরোক্ত সমাজব্যাধি দুটি স্বাস্থ্যে শান্তিতে শিক্ষায় ভারতের উন্নতিকে যতখানি ব্যাহত করেছে ব্রিটিশ শাসনের দোষ ত্রুটিতে তার চাইতে বেশি হয়নি।

এমন কি যে সব ইংরেজ বলতে গেলে আপনারই মতাবলম্বী তাদের সম্পর্কেও আপনি খুব অবজ্ঞার সুরে কথা বলেছেন। বলেছেন, "কোন কোন ব্যক্তি কিম্বা দল বিশেষ আমাদের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন হ'লেও শাসন পরিচালনা কিম্বা সাম্রাজ্যবাদী শোষন লিপ্সার উপরে এ'দের কোনই প্রভাব নেই।" এই ব্যাপারে বোধকরি আপনার চাইতে পার্লামেণ্টের একজন ইংরেজ সদস্য বেশি ধারনা করতে পারে। আর কিছু না হোক, এ বিষয়ে আপনার ধারণা ভ্রান্ত, এ আমি জোর করে বলতে পারি। অবশ্য ১৯২০ সাল থেকে আজ পর্যন্ত বিভিন্ন কিস্তিতে যে স্বায়ত্বশাসন ক্ষমতা আপনারা লাভ করেছেন তাকে শুধু অকিঞ্চিৎকর নয়, যদি "অপমানজনক এবং মর্যাদাহানিকর" বলে আপনি উড়িয়ে দেন তবে আমি নাচার। পার্লামেণ্টের ভেতরে এবং বাইরে যে সব ভারত-হিতৈষী রয়েছেন তাদের চেষ্টাতেই ওসব সম্ভব হয়েছিল: তাতেই প্রমাণ হচ্ছে শাসন নীতির উপরে প্রভাব বিস্তার করতে তাঁরা সক্ষম। এ'রা বোধ করি আরো বেশি কিছু আদায় করতে পারতেন যদি না ভারতীয় বন্ধুদের পরামর্শে এ'দের মধ্যে কেউ কেউ অসম্ভবের দাবী করতেন। আমার মনে আছে ১৯৩৫এর এ্যাক্ট পাশ হওয়ার পরে মিঃ যোশী আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে লেবর পার্টি শ্রমিকদের জন্যে তাঁকে যেটুকু সুবিধা আদায় করে দিয়েছে আমি মেয়েদের জন্যে (ভোটাধিকার এবং সংরক্ষিত আসন সম্পর্কে) মূল খসড়ায় যা ছিল তার চাইতে বেশি কি করে আদায় করলুম। আমি তাঁকে বলেছিলাম যে লেবর পার্টি যেসব সংশোধনী প্রস্তাব এনেছিলেন সেগুলো একটু মাত্রা-ছাড়ানো গোছের; আমার রীতি আলাদা—আমি আগে থেকেই ভেবেনি কতটা পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। ঠিক সেইটুকু আমি চাই, না হয়তো বড় জোর সিকি পরিমাণ বেশি দাবী করি যাতে দরকশাকশির সামান্য অবকাশ থাকে। "সর্বোচ্চ দাবী নয়, প্রাপ্তব্য দাবী"—এই হ'ল বরাবর আমার

মূলমন্ত্র। আপনি নিশ্চয় এ ধরণের সুবিধাবাদী মনোবৃত্তিকে ঘৃণার চক্ষে দেখেন। আমি শুধু বলতে চাই যে, এতে আর কিছু না হোক্, কাজ আদায় করা যায়।

আপনি মন্তব্য করেছেন যে "আমাদের বড়লাট, ছোটলাট আর হিটলারের চামুণ্ডাদের মধ্যে কার্যত কোনই প্রভেদ নেই।" আপনার মনোভাব এই মন্তব্য থেকেই প্রকাশ পাচ্ছে। অথচ আপনি অভিযোগ করেছেন আমার কথায় নাকি ক্রোধ এবং তিক্ততা প্রকাশ পেয়েছে এবং আমি যুদ্ধং দেহি মূর্তি ধারণ করেছি। এই সব শাসকবর্গের মধ্যে কারো কারো মূর্তি আমার মনশ্চক্ষে ভেসে উঠছে—লর্ড হ্যালিফ্যাক্স, উইলিংডন, লিংলিথগো, হেইলি, স্যার মণ্টেগু বাট্‌লার, স্যার হার্বার্ট এমার্সন (নতুনদের আমি জানিনে)। এঁরা সাধ্যমত নিরন্তর সকলের প্রতি ন্যায় বিচার এবং পক্ষপাতশূন্য ব্যবহার করেছেন, সকলের সঙ্গে মিত্রভাব রক্ষা করেছেন এবং বিভিন্ন মতবাদের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা করেছেন—হতে পারে সব সময়ে সফলকাম হননি—কিন্তু আপনি কিনা বলছেন এঁদের সঙ্গে হিটলারের চামুণ্ডাদের কোন তফাৎ নেই!

একথা অবশ্য আমি স্বীকার করতে বাধ্য যে আপনি যখন নীতিগত সাধারণ আলোচনা ছেড়ে ভারত সরকারের বিশেষ কোন গাফিলতি সম্পর্কে কথা বলেন তখন আমি ততখানি জোরের সঙ্গে কথা বলতে পারিনে। সমরোপকরণ প্রস্তুতের উদ্যোগ সম্পর্কে,—বিশেষ করে পরিকল্পিত এরোপ্লেন নির্মাণের কারখানা কিম্বা ভারতীয় নৌশিল্পের প্রতি সরকারের আচরণ সম্পর্কে আপনি যে কথা বলেছেন মিঃ এমারী পার্লামেণ্টে তার আংশিক জবাব দিয়েছেন; তাছাড়া ব্যক্তিগতভাবে আমাকে বলেছেন আপনার অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। (পার্লামেণ্টের কার্যবিবরণী আপনাকে পাঠাচ্ছি, তাতে ১লা আগস্টের বিতর্কে স্যার জর্জ সুস্টার এ বিষয়ে যে মন্তব্য করেছেন তাও লক্ষ্য করবেন)। সঠিক খবরের অভাবে কিম্বা কোন কোন ক্ষেত্রে পক্ষপাতদুষ্ট সংবাদের দোষে হয়তো এখানটাতে কিছু কিছু ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হয়ে থাকতে পারে কিন্তু আপনি যদি ভেবে থাকেন উপরওয়ালারা ব্রিটিশ ধনিকদের স্বার্থরক্ষাকল্পে কিম্বা ঈর্ষা-প্রণোদিত হয়ে ভারতবর্ষের সমরোদ্যোগে ইচ্ছা করে বাধা দিচ্ছে, তাহলে আমাদের প্রতি নিতান্তই অবিচার করা হবে। এর দ্বারা শুধু প্রমাণিত হচ্ছে যে আমাদের মানসিক অবস্থাটা আপনি একেবারেই বুঝে উঠতে পারছেন না। আমাদের সকল চিন্তা এখন যুদ্ধ জয়ের চেষ্টায় নিয়োজিত—ঐ আমাদের একমাত্র ধ্যান, একমাত্র জ্ঞান। আর এটা সহজেই অনুমেয় যে ভারতবর্ষে সমরোপকরণ নির্মাণ কতখানি সম্ভব, সেটা আপনার চাইতে হোয়াইট হল কিম্বা দিল্লীতে যাঁরা সরকারী মহলে রয়েছেন তাঁদেরই বেশি বোঝবার কথা, কারণ ওখানকার পরিবহন ব্যবস্থা কত অসম্পূর্ণ এবং উপকরণ, যন্ত্রপাতি এবং শিক্ষিত শ্রমিকের কত অভাব তা তাঁরা খুব ভাল করেই জানেন।

কিন্তু আপনি যখন অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে উল্লেখ করেন, এই যেমন কারাবন্দীদের প্রতি ব্যবহার, বিনা বিচারে বন্দীদের কথা, গোয়েন্দা বিভাগ ইত্যাদির কথা তখন আপনি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকেই কথা বলেন। আমাকে তখন একটু বেকায়দায় পড়তে হয়। দশ বছর আগে আমি যখন অল্প দিনের জন্যে ভারত ভ্রমণে গিয়েছিলাম তখন এবং তার পরেও ভারতীয়দের মুখে এবং ভারতবন্ধু ইংরেজদের মুখে অনেক কথা শুনেছি, তাতে মনে হয়েছে যুদ্ধবিগ্রহ ছাড়া নির্বিবাদ শান্তির সময়েও অযথা অনেক দুর্ব্যবহার হয়েছে। দূরে থেকে অতিমাত্রায় কেন্দ্রীভূত শাসন পরিচালনার এই দোষ, তাও আবার আনাড়ি কর্মচারীর হাত দিয়ে। উপযুক্ত তদারকেরও অভাব ছিল। সন্ত্রাসবাদীরা যে ক্রোধ এবং ভীতির সঞ্চার করেছিল তখন সেটাই

ছিল সরকারী গুজব। ১৯৩৫এর পর থেকে প্রাদেশিক সরকারের হাতে যে অতিরিক্ত ক্ষমতা এসেছিল, আমি আশা করেছিলাম তার ফলে এসব ত্রুটি দূর হয়ে যাবে। কিন্তু যুদ্ধের চাপে নৃশংসতা আরো বৃদ্ধি পায়। এর খানিকটা কারণ সন্ত্রাসবাদের ন্যায় যুদ্ধও ক্রোধ এবং ভীতির উদ্রেক করে। তাছাড়া উপরের দিকের সুযোগ্য কর্মচারীরা বেশির ভাগই যুদ্ধের কাজে নিয়োজিত হয়ে পড়েন। যা হোক, এসব বিষয়ে যাঁরা একটু বেশি ওয়াকিবহাল এবং যাঁদের পক্ষে এর প্রতিকার করা সম্ভব এমন কোন কোন ব্যক্তির সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করবার ইচ্ছা আছে।

এবারে আমাদের আসল কথায় ফিরে আসা যাক। আপনার সমস্ত চিঠির মূলে রয়েছে একটি ভ্রান্ত ধারণা— আপনি ধরে নিয়েছেন যে সমগ্র ভারত এবং ভারতীয়দের পক্ষ হয়ে কথা বলবার অধিকার আপনার আছে। ("আমরা যদি একমত হতে না পারি তবে বেশ তো, ইংরেজ আমাদের ছেড়ে দিয়ে চলে যাক্ না, তারপরে নিজেদের ব্যাপার আমরা যেমন পারি নিজেরাই সামলাব") আপনি ভুলে যাচ্ছেন যে ভারতবর্ষে নানা শ্রেণীর অগণিত লোক রয়েছে, দেশের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আপনার সঙ্গে যাদের বিন্দুমাত্র মতের মিল নেই। এদের আপনি বাতিল করে দিচ্ছেন; স্পঞ্জ দিয়ে শ্লেটের লেখার মতো এদের অস্তিত্ব কি ঘসে মুছে ফেলা যায়। আমরা যদি এখন রাগ করে বলি, "এই নাও, তোমাদের নিয়ে আমরা আর পেরে উঠছি না। এবার নিজেরা নিজেরা মারামারি খুনোখুনি কর", তাহলে ওরা বলবে ওদেরকে আমরা বিপদের মুখে ফেলে রেখে যাচ্ছি, ওদের প্রতি আমরা বিশ্বাসঘাতকতা করছি; এবং সেটা কিছু মিথ্যে বলা হবে না। আমাদের অবস্থায় পড়লে দায়িত্বসম্পন্ন ব্যক্তি হিসাবে আপনি এরূপ করতেন কিনা সে কথা নিজে একবার ভেবে দেখেছেন?

কংগ্রেসের দাবীটা ভাল কি মন্দ সে প্রশ্ন তুলছি না। আমার জিজ্ঞাস্য হ'ল, অন্যান্য যে সব দল কিম্বা ভিন্ন পন্থীরা আপনার সঙ্গে সহযোগিতা করছে, সর্বপ্রকারে আপনার সাহায্য করছে এবং যাদের আপনি নানা রকমের আশ্বাস দিয়ে রেখেছেন আমাদের অবস্থায় পড়লে এদেরকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করে আপনি কি একটি মাত্র দলের দাবীকে মেনে নিতে পারতেন? হতে পারে সে দলটা সব চাইতে বড় এবং সব চাইতে অগ্রসর। একটা যুদ্ধ যখন চলছে এবং সে যুদ্ধের উপর শুধু ইংলণ্ডের নয়, সমগ্র ইউরোপের এবং ভারতবর্ষেরও ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে—সেই যুদ্ধের মাঝখানে এদের সহযোগিতা যখন অত্যন্ত প্রয়োজন তখন আপনি এ কাজ করতেন বা আপনাকে করতে রাজি করা যেত? আপনি কি সত্যি সত্যি বিশ্বাস করেন যে কংগ্রেসের প্রতি মহানুভবতা দেখানোর ফলে দেশময় এমন একটা মানসিক পরিবর্তন ঘটে যাবে যে কংগ্রেসের সহযোগিতা লাভের ফলে এ যাবৎকাল যে সব ভারতীয় দল আমাদের মিত্র ছিল, তারা যদি শত্রু হয়ে ওঠে সেই ক্ষতিও আর ক্ষতি বলে মনে হবে না।

এইটুক অন্ততঃ বলতে পারি, আয়র্লণ্ড এবং সন্ধিচুক্তিবদ্ধ কয়েকটি বন্দরের বেলায় আমাদের যা অভিজ্ঞতা হয়েছে তাহাতে এ ধরণের বিশ্বাস স্থাপনে আর তেমন সাহস হচ্ছে না। সত্যি বলতে কি, আপনার চিঠির ভঙ্গি থেকে আপনার বই পড়ে এবং আপনার দলের অন্যান্যদের উক্তি থেকে কোন রকম ভরসা পাওয়া যাচ্ছে না। বরঞ্চ এগুলোর মধ্যে এমন একটা বিরোধের ভাব রয়েছে যার কোন পরিবর্তন হবে বলে আমি মনে করি না· কারণ এর মূলে রয়েছে অতীতের ঘটনাবলী। সেই অতীতকে পরিবর্তন করা কারোই সাধ্যায়ত্ত নয়।

হ্যাঁ, আপনি বলেছেন আমরা একে অন্যের আন্তরিকতায় বিশ্বাস করতে পারি· সেটা ঠিক কথা। কিন্তু আপনার আন্তরিকতা থেকে যেটুকু বুঝেছি তাতে মনে হচ্ছে

আমাদের দুইএর মধ্যে দুস্তর ব্যবধান। তবে আশা করছি আমার এ অনুমান ভুল।

আপনার একান্ত

এলিনর এফ্ রাথবোন্

পুনশ্চ—আপনাকে আলাদা খামে (১) ভারতবর্ষ সম্পর্কে পার্লামেন্টের সাম্প্রতিক বিতর্কের বিবরণী এবং (২) ভারত সম্পর্কে আমার ক্ষুদ্র একটি পুস্তিকা পাঠাচ্ছি। আপনি লিখেছেন আপনার নিজের বই আপনি এখনও দেখেননি। আপনার বইয়েরও এক কপি এই সঙ্গে পাঠাতে পারলে ভালো হত কিন্তু তাতে সরকারী অনুমতি আছে কিনা আমি ঠিক জানিনে।

৩২৪ স্যার জর্জ সুস্টার কর্তৃক লিখিত

মিডল বার্টন অক্সন

২৩শে সেপ্টেম্বর ১৯৪১

প্রিয় জহরলাল নেহেরু,

ভারতবর্ষ এবং গণতন্ত্র (India and Democracy) নামে একখানা গ্রন্থ সবে মাত্র প্রকাশিত হয়েছে। আমি এ বইএর যুগ্ম সম্পাদক। ম্যাকমিলানকে বলেছি বই ভারতবর্ষে পৌছনো মাত্র এক কপি আপনাকে যেন পাঠানো হয়। লেখাটা জুনের গোড়াতেই শেষ করেছিলাম তখনও রাশিয়া আক্রমণ শুরু হয়নি। তারপরে আরো অনেক পরিবর্তন ঘটে গিয়েছে আর অবস্থার পরিবর্তন তো প্রতি নিয়তই ঘটছে। কিন্তু আমি একটি দীর্ঘকালীন দৃষ্টি নিয়ে বিষয়টির পর্যালোচনা করেছি কাজেই এখন প্রাত্যহিক যে পরিবর্তন ঘটছে তাতে আমার বক্তব্যের বিশেষ কোন ক্ষতি বৃদ্ধি হবে না। বইখানা দু ভাগে বিভক্ত প্রথম অংশটি লিখেছেন উইন্ট। তিনি ঐতিহাসিক এবং সামাজিক পটভূমিকা অবলম্বন করে ভারতের অবস্থা পর্যালোচনা করেছেন। এই অংশে এমন অনেক জিনিস আছে যা আপনার মনঃপুত হবে না কিন্তু সদুদ্দেশ্য নিয়েই জিনিসটা লেখা হয়েছে এবং তিনি যা সত্য বলে ভেবেছেন তাই যথাযথ ব্যক্ত করেছেন। উইন্টের মতামতের উপরে আমার নিজের মতামত চাপাবার কোন রকম চেষ্টা আমি করিনি। সত্যি বলতে কি—এবং বইএর ভূমিকাতেও আমি একথা বলেছি যে—আমি লিখলে বিবরণটা কোন কোন বিষয়ে অন্য রকম হত। আমার লিখিত অংশে (দ্বিতীয় ভাগ) আমি তাঁর বিবরণটাকে ভিত্তি করে আমার নিজস্ব একটা ভাষ্য রচনা করেছি এবং সেই সঙ্গে এই প্রশ্ন উত্থাপন করেছি ভবিষ্যতে কি হবে এবং এখন আমাদের কর্তব্য বা কি আমি আশা করছি আমার লেখা অংশটি পাঠের যোগ্য বলে আপনার মনে হবে। আমি বেশি কিছু চাইনে আমি যা সত্য বলে জেনেছি তাই প্রকাশ করবার চেষ্টা করেছি এইটুকু বিশ্বাস করলেই আমি খুশি। আর বোধকরি আপনিও মনে মনে স্বীকার করবেন যে আমার বক্তব্যের পশ্চাতে যে দৃষ্টিভঙ্গীটি রয়েছে তার সঙ্গে আপনার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গির খুব বেশি গরমিল নেই। এমন যদি হয় যে আমি যা সত্য বলে ভেবেছি তা মূলতঃ সত্য নয় তাহলেও আমার লেখার দ্বারা যদি যথার্থ সত্য নিরূপণের কোন সহায়তা হয় তাহলেই আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে বলে মনে করব।

আমি বেশ ভালো করেই জানি এই যে বিদেশী হয়েও আমরা আপনাদের দেশ সম্বন্ধে লিখি বিশেষ করে কি করা উচিত বা অনুচিত সে বিষয়ে উপদেশ দিতে যাই তখন সেটাকে আপনি এক ধরণের ধৃষ্টতা বলেই মনে করেন। ব্যক্তিগতভাবে একথা আমার অনেক সময়ে মনে হয়েছে যে আমাদের দুজনের যখনই সাক্ষাৎ হয়েছে

তখনই এই ব্যাপার নিয়ে আমি আপনার মনে বিরক্তির উদ্রেক করেছি। দৃষ্টান্ত স্বরূপ চ্যাথামস্ হাউসে আপনি সেবারে যখন বক্তৃতা করেছিলেন সে কথার উল্লেখ করা যেতে পারে। ব্যাপারটা না ঘটলেই ভালো হ'ত। আপনার পিতার সঙ্গে আমার খুব একটা প্রীতি এবং শ্রদ্ধার সম্পর্ক ছিল। আর আপনার সম্পর্কে একটি অতি মধুর স্মৃতি আমার মনে আঁকা রয়েছে। সিমলায় পেটারহফ্‌এ আপনি একবার আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। আপিস ঘরে খানিকক্ষণ আমার সঙ্গে কথা বলে আপনি বসবার ঘরে এসে আমার স্ত্রী এবং আমার দুই ছেলের সঙ্গে একটি ঘরোয়া বৈঠকে যোগ দিলেন। আমার ছেলেরা তখন অক্সফোর্ডের দীর্ঘবিকাশে এখানে এসেছে। খুব অল্পক্ষণের জন্য হলেও একটি বন্ধুত্ব এবং আত্মীয়তার স্নিগ্ধ ভাব জমে উঠেছিল। সেটি আবার ফিরে পেতে বড় ইচ্ছা করছে। হয়তো এই যুদ্ধ শেষ হবার আগে একই বিপদের সম্মুখীন থেকে আমরা একে অন্যের আরেকটু কাছে এসে যাব, এমনও হতে পারে আমাদের পুরাতন যত বিরোধ যুদ্ধের অগ্নিতে [illegible] হয়ে [illegible]। নিজের কথা একটু বলছি। সেই যে দুই ছেলের সঙ্গে আপনার সাক্ষাৎ হয়েছিল তাদের একজন ইতিমধ্যে যুদ্ধে নিহত হয়েছে অপরটিও বিদেশে [illegible] ক্ষেত্রের অত্যন্ত বিপজ্জনক অঞ্চলে সে আছে। এসব কথা যখন ভাবি তখন ছোট ছোট তুচ্ছ ব্যাপার সব ধুয়ে মুছে যায়, একেবারে মূল প্রশ্নের মুখোমুখি এসে আমাদের দাঁড় করায়। এমন কি মৌলিক ব্যাপার নিয়েও যাঁদের মতবিরোধ—এই বোধকরি আমার এবং আপনার মধ্যে যেমন, অবশ্য আমি নিজে সেটা বিশ্বাস করি না—তারাও যদি একে অন্যের আন্তরিকতায় আস্থা রাখেন তাহলে দুদিকেই [illegible] সহানুভূতির সঞ্চার হতে পারে এবং উভয়ের মিলিত চেষ্টায় উন্নতির পথে অগ্রসর হওয়া সম্ভব হয়। আমার বিশ্বাস একথা আপনি স্বীকার করবেন যে ভারতের সমস্যা আমাদের উভয়ের সমস্যা কেননা ভারত এবং ব্রিটেন যদি হাত মিলিয়ে কাজ করতে থাকে এবং ধাপে ধাপে অগ্রসর হয়ে ভারতবর্ষে স্বায়ত্তশাসন [illegible] কথা। [illegible] করতে পারব তাই [illegible] অনেক দুঃখ যন্ত্রণা। [illegible] নিষ্পন্ন হবে [illegible] আমাদের একান্ত [illegible] আপনার যাতে বিশ্বাস রাখেন সে [illegible]। আমার [illegible] খানিকটা সাহায্য করতে পারবে [illegible]। আমি মনে করি।

[illegible] ব্যাপারটাকে একটু গুরুত্ব দেবেন এবং আমার প্রশ্নের [illegible] আপনার [illegible] আমাকে জানাবেন। সেটা যদি আমার অনুকূল নাও হয় তাহলেও জানাতে দ্বিধা করবেন না।

আপনার একান্ত

জর্জ সুস্টার

পুনশ্চ এই চিঠি লিখবার পরে মিস এলিনর রাথবোনকে আপনি যে চিঠি লিখেছেন সেটি তিনি আমাকে দেখালেন। আপনার চিঠি পড়ে মনে হ'ল আমার এই চিঠিতে যা লিখেছি কিম্বা আমার [illegible] যা বলেছি তাতে আপনার সব কথার ঠিক মনঃপূত জবাব পাবেন না। সব বিষয়ে না হলেও অনেক বিষয়ে আমরা বিপরীতমুখী। মিস রাথবোনের চিঠিতে আপনি যে সব প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন সে সব বিষয়ে আমি বেশ ভেবে চিন্তে আলোচনা করতে চাই। শীগগিরই যদি আবার আপনাকে চিঠি লিখি [illegible] কিছু মনে করবেন না।

৩২৫ পূর্ণিমা ব্যানার্জি কর্তৃক লিখিত

সেণ্ট্রাল জেল,
লখনউ
৮ই নবেম্বর, ১৯৪১

প্রিয় জওহরলালজী,

ঘটা করে কোন উৎসব করবার কথা ভাবিনি, তবু মনে হ'লে আপনাকে চিঠি লিখে 'জহর দিবস' পালন করি। আপনি আর কারো চিঠি আশা করছেন কিনা জানিনে; তার চিঠির সঙ্গে যদি আমার চিঠির সংঘাত ঘটে তবে বড় দুঃখের কারণ হবে।

ভাবছি আপনাকে হ্যাভেলক এলিসের আত্মচরিত একখণ্ড পাঠাব। পড়ে আপনার ভালো লাগবে। কিন্তু এই সম্পর্কে আপনি এত বেশি ওয়াকিবহাল, আর এত বেশি সজাগ যে একমাত্র ভালো লাগবে কি লাগবে না, এ ছাড়া আর কিছু অনুমান করতে যাওয়া বিপজ্জনক।

প্রায় মাসখানেক এলাহাবাদে থেকে এখানটায় এসেছি। সুচেতা আর উমা বৌদির মেয়াদ এ মাসেই শেষ হচ্ছে। জাস্টিস্ গঙ্গানাথের রায়ের ফলে সরকারী বজ্রআটুনি একটু যদি বা শিথিল হয় এঁরা তার কোন সুফল পাবেন না। এমন কি ডক্টর কাটজুও থাকতে থাকতে সুফলটুকু দেখে যাবেন না। আর আমি তো বন্ধ্যা জমিতে শিকড় গেড়ে বসে গাছি। কিন্তু আমার তাতে কিছু যায় আসে না। আমি লাভের আশাও রাখি না, ক্ষতির আশংকাও করি না, শিকলটা থাকলেই বা কি? জীবনটা হয়েছে যেন জবাব না-পাওয়া চিঠির মতো। অনেক দিন যদি জবাব না আসে তবে আপনা থেকেই একটা জবাব তৈরি হয়ে যায় কিংবা জবাব ছাড়াই জীবনটা যেমন চলছিল তেমনি চলতে থাকে।

সুচেতা চলে গেলে আমার একটু ফাঁকা ফাঁকা লাগবে; কিন্তু তাই বলে একলা থাকাটা আমার কিছু অপছন্দ নয়। এখানকার লোকসংখ্যা ক্রমেই কমে যাচ্ছে। ক'দিন পরে আমরা চারজন মাত্র থাকব দুজন মেয়াদভোগী আর আমরা দুজন বিনা বিচারে বন্দী।

আজকে সকালের কাগজে একসিকিউটিভ কাউন্সিলের কিছু কিছু খবর পাওয়া গেল।

এখানটায় দুবেলা খেতে বসে দেউলীতে যেসব ছেলেরা উপোস করছে তাদের কথা ভেবে মনটা একটু লবণাম্বুসিক্ত হয়ে ওঠে। আমি অবশ্য ওদের চাইতে ওদের স্ত্রীদের কথাই বেশি ভাবছি। জয়প্রকাশের কথা মনে হলে মনটা অমনিতেই উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে। স্টেটসম্যান পড়েছেন তো বেড়ানোর নিয়ম নিয়ে– এমন কি জেলখানার বারান্দায় বেড়ানো নিয়ে কি সব লিখেছে? ব্যাপারটা ঠাট্টা হিসাবে বেশ ভাল, একটু হাস্যরসের আভাস আছে। কিন্তু স্টেটসম্যানের সে রসবোধ নেই। ওরা এরই মধ্যে গুরুগম্ভীর পলিটিক্স টেনে এনেছে।

আপনিও ক'দিন পরেই একেবারে একা পড়ে যাবেন। শুনলাম মিঃ পণ্ডিত ডিসেম্বরে ছাড়া পাচ্ছেন। লোকজনের ভীড়ের মধ্যেও আপনাকে দেখলে মনে হয় আপনি একেবারে নিঃসঙ্গ, একাকী। যখন থাকেন তখন কতখানি নির্জন ভীড়ের মধ্যেও তার চাইতে কম নির্জন নন, আপনাকে দেখলে এই কথাটাই মনে হয়। এই জন্যেই আমার বিশ্বাস আপনি খুব নিঃসঙ্গ বোধ করবেন না।

মিঃ পণ্ডিতকে ডক্টর রামস্বরূপকে এবং আপনাদের জেলার ভদ্রলোকটিকে আমার কথা স্মরণ করিয়ে দিবেন।

শ্রদ্ধা এবং প্রীতি জানবেন।

আপনার স্নেহের
নোরা

(সেন্সর কর্তৃক অনুমোদিত)
এস আই ডি আই এস, লখনউ ৯-১১-৪১

৩২৬ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী কর্তৃক লিখিত

কলিকাতা
২৩শে নবেম্বর, ১৯৪১

প্রিয় পণ্ডিতজী,

তাড়াতাড়ি আমার চিঠির জবাব দিয়েছেন সে জন্যে ধন্যবাদ। আপনার চিঠি আমাকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছে। আপনার সঙ্গে তর্কে প্রবৃত্ত হবার ইচ্ছা নাই। যদি বলতে অনুমতি দেন আপনার মনের কথাটা আমি বেশ বুঝতে পেরেছি। আমরা যে অবস্থায় আছি তাতে ভারতবর্ষে জেলখানা শুধু তার বাহ্যিক সীমারেখার মধ্যেই আবদ্ধ নয়। এ বিশাল দেশের সমগ্রটাই একটা জেলখানা। আত্মকর্তৃত্ব লাভ না করা পর্যন্ত এ দেশকে আরো অনেক অগ্নিপরীক্ষার মধ্য দিয়ে যেতে হবে।

আমার একান্ত অনুরোধ আপনি অনুগ্রহ করে আপনার সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করে দেখুন। পৃথিবীর ইতিহাস তথা ভারতীয় সংগ্রামের ইতিহাসের যে সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ আপনি করেছেন তা আপনাকে রাজনৈতিক চিন্তাবিদদের পুরোভাগে স্থান দিয়েছে। আমরা এখন একটা বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে চলেছি। নানা মতবিরোধ এবং নিগ্রহের দরুণ আমরা অনেক সময় নিরুৎসাহ বোধ করি বটে তাই বলে বর্তমান পরিস্থিতিকে চূড়ান্ত বলে মেনে নিতে এবং নির্বিচারে তার কাছে পরাজয় স্বীকার করতে আমরা রাজী নই। একটা কিছু পরিবর্তন ঘটবেই। আর এ পরিবর্তন আসবে তখনই যখন মানুষ ক্ষমতা লোভ সম্পত্তি লোভ এবং প্রাধান্য লোভ—এ তিন বিধ্বংসকারী শক্তিদ্বারা আর পরিচালিত হবে না।

ভারতবর্ষের বর্তমান অবস্থা বিশেষত হিন্দুদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আপনার এবং আমার ন্যায় ভিন্ন মতাবলম্বী ব্যক্তির মধ্যে কোন কোন বিষয়ে সত্যিকার মতভেদ থাকতে পারে। কিন্তু ভারতবর্ষ যে যুগযুগান্ত ধরে মানবাত্মার মুক্তির এক শাশ্বত বাণী প্রচার করে আসছে সে বিষয়ে কারোই মতদ্বৈত নেই। একমাত্র ভারতবর্ষের এই বাণীই সভ্যতাকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে পারে তাকে আরো উন্নতির পথে নিয়ে যেতে পারে। আপনার যখন সুবিধা হয়—আমি এখনই বলছি না—আমার বিশেষ ইচ্ছা আপনি কমলা লেকচার দিতে সম্মত হবেন এবং ঐ লেকচারের মারফতে ভারতের বৈচিত্র্যময় ইতিহাসের রূপ কোথা থেকে ভারত শক্তি সংগ্রহ করল, কোথা থেকেই বা দুর্বলতা এল ভারত তার শাশ্বত সম্পদ—যা এত-কালের পরাধীনতাও ধ্বংস করতে পারেনি—কিভাবে তাকে রক্ষা করে এসেছে, স্বাধীনতা ও আত্মসম্মান বজায় রেখে টিকে থাকতে হলে তাকে কি করতে হবে, এ সব বিষয়ে আপনি নিরপেক্ষ আলোচনা করবেন আশা করছি। এই সংকটকালে যে অল্পসংখ্যক লোক প্রকৃতই ক্ষুদ্র দলীয় স্বার্থের ঊর্দ্ধে উঠতে পারেন বিভিন্ন মতবাদকে শ্রদ্ধা করতে পারেন আর আধুনিক সভ্যতার ধ্বংসস্তূপের মধ্যে ভবিষ্যৎ ভারতের একটা কল্যাণময় ছবি তুলে ধরতে পারেন আপনি তাঁদের মধ্যে একজন।

আমার এই অনুরোধ আপনাকে রক্ষা করতেই হবে। বক্তৃতার বিষয় আমাকে জানাবেন, আর আপনার নিয়োগের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা যাতে করতে পারি তার অনুমতি দেবেন।

আন্তরিক শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন।

আপনার একান্ত
শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী

৩২৭ জয়প্রকাশ নারায়ণ কর্তৃক লিখিত

দেউলী বন্দী নিবাস
দেউলী, রাজপুতানা
৭ই ডিসেম্বর, ১৯৪১

প্রিয় ভাই,

আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানবেন।

* * * আপনি জেল থেকে মুক্তি পেয়েছেন জেনে খুব খুশি হয়েছি। এই সময় দেশের পক্ষে আপনার নেতৃত্বের বিশেষ প্রয়োজন আছে।

* * * *

নরেন্দ্র দেবের শারীরিক অবস্থার কথা আপনি জেনে থাকবেন। নিজেকে তিনি সামলে নিতে পারেন না, এইটে তাঁর মস্ত দোষ। আমার ত ভয় হয়, ঠিক মতো যত্ন না নিলে তিনি চিরকালের মতো অচল হয়ে পড়বেন। ওষুধপত্রের চেয়েও ওঁর বিশেষ প্রয়োজন হল ওঁর স্বাস্থ্যের পক্ষে উপযোগী কোনো স্থানে বেশ কিছুদিন বিশ্রাম। আমি মনে করি, যুক্তপ্রদেশ কিংবা উত্তরাঞ্চলের কোনো জায়গা ওঁর স্বাস্থ্যের পক্ষে অনুকূল হবে না। মহারাষ্ট্রের কোনো কোনো জেলা যেমন, সাতারা কিংবা তারও দক্ষিণে বেলারি, অনন্তপুর প্রভৃতি স্থান ওঁর পক্ষে ভাল হতে পারে। এমন কি গুজরাটেও ভাল থাকবেন। ওঁর নিজের উপর ছেড়ে দিলে আমি নিশ্চয় জানি উনি উত্তর প্রদেশেরই কোথাও বসে দিন কাটিয়ে দিবেন, কিন্তু তাতে কোনো ফল হবে না। খুব বড় জোর শ্রীপ্রকাশ ওঁকে বেনারসে নিয়ে গিয়ে তাঁর সেবাশ্রমে রাখবেন। অথচ, সঙ্কোচবশত তাঁর অগণিত বন্ধুবান্ধবদের কাকেও তিনি নিজের জন্যে কিছু করতে বলবেন না। তাই আপনাকে লিখছি, আপনি নিজে উদ্যোগী হয়ে ওঁকে জোর করে কোনো একটা ভাল জায়গায় পাঠিয়ে দিন। তার ইচ্ছা অনিচ্ছার উপরে আপনি নির্ভর করবেন না। এই ব্যাপারে তাঁকে শিশুর মতো দেখবেন। বাপুর সঙ্গেও আপনি পরামর্শ করতে পারেন; তিনিও নরেন্দ্র দেবের স্বাস্থ্য সম্পর্কে উদ্বিগ্ন হয়ে খবরাখবর নিচ্ছেন।

আমি আজকাল ভাল আছি, ক্রমশঃ শরীরেও বল পাচ্ছি। শেঠজিও ভাল আছেন; আপনাকে তিনি অভিনন্দন জানাচ্ছেন। গৌতম ম্যালেরিয়ায় ভুগছে, সম্প্রতি হাসপাতালে। অন্যান্য বন্ধুদের খবর ভাল।

ভালবাসা নেবেন।

আপনার জয়প্রকাশ

দেউলী বন্দী নিবাস
সেন্সর কর্তৃক অনুমোদিত
সুপারিন্টেন্ডেন্ট

* * * চিহ্নিত অংশ সেন্সর কর্তৃক ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে।

৩২৮ আর, অচ্যুথন কর্তৃক লিখিত

সেণ্ট্রাল জেল
রাজমহেন্দ্রী
৮ই ডিসেম্বব ১৯৪১

আমাদেব প্রিয় পণ্ডিতজী

জেল থেকে আপনাব মুক্তিলাভেব শুভক্ষণে আমবা আপনাকে অভিনন্দন এবং ভালবাসা জানাচ্ছি। আমবা সকলেই এই প্রদেশেব ছাত্র বন্দী। আপনাব মধ্যে যৌবনেব আদর্শকে রূপায়িত দেখতে পেয়েছি তাই আপনাকে অভিনন্দন জানাবাব জন্যে আমবা বিশেষ আগ্রহান্বিত। পণ্ডিতজী আপনি আমাদেব প্রীতি ও শ্রদ্ধাপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ করুন। জেল থেকে কেবল মাত্র এই চিঠিই আপনাকে আমবা লিখতে পাবি।

মুক্তিলাভেব অব্যবহিত পবে আপনি যে বিবৃতি দিয়েছেন বিপুল আগ্রহেব সঙ্গে আমবা তা পড়েছি। দেশ তিমিবাচ্ছন্ন, ওদিকে জাতীয়তাবাদী দলে অপকৃষ্ট পার্লামেণ্টাবি মনোভাব গড়ে উঠেছে এই অবস্থায় আপনাব আহ্বানেই একমাত্র সুস্পষ্ট আহ্বান। একমাত্র আপনাব এবং বাপুজীব আহ্বানই আমাদেব মনে সাড়া জাগিয়েছে এবং ইটপাথবেব দেয়ালেব মধ্যে আবদ্ধ থাকলেও আমাদেব হৃদয় উদ্বেলিত হয়ে উঠছে।

আমাদেব দিন কেটে যাচ্ছে আমাদেব আদর্শই আমাদেব আনন্দে বেখেছে। আপনি শক্তি সাহস ও দৃঢ়তা দান করুন এই কামনা কবি দেশকে তাব অভীষ্ট লক্ষ্যে নিয়ে চলুন।

আমাদেব আন্তবিক অভিনন্দন জানাই।

আপনাব একান্ত
আব অচ্যুথন

পণ্ডিত জওহবলাল নেহরু,
এলাহাবাদ

দেওয়া সেন্সব কর্তৃপক্ষ খোলা কবাব এ বাজনীতিক চিঠি নয়। এ চিঠিতে আমাদেব প্রিয় শ্রদ্ধেয় নেতাব প্রতি আমবা আমাদেব আন্তবিক অভিনন্দন জানাচ্ছি মাত্র। আব অচ্যুথন
সেন্সাব কব হয়েছে ৮।১২

৩২৯ সরোজিনী নাইডু কর্তৃক লিখিত

হায়দবাবাদ - দাক্ষিণাত্য
১ই ডিসেম্বব ১৯৪১

প্রিয় জওহব

তুমি জেল থেকে যে সুন্দর চিঠিখানা লিখেছ এবং জেল থেকে বেব হয়ে যে চমৎকাব বিবৃতি দিয়েছ তা আমাব অশান্ত মনে সান্ত্বনা ও প্রেরণা এনে দিয়েছে। আমি তোমাকে আগে চিঠি দিতে পারিনি কিন্তু তোমাকে স্বাগত সম্ভাষণ জানিয়ে যে টেলিগ্রাম কবেছি আশা কবি তা পেয়েছ (এটা কি বড় দিনেব ছুটি উপলক্ষে?)। গত তিনটা মাস আমার জীবনে বড়ই দুঃসময় গেছে অবশ্য আমাব জীবনে ট্র্যাজেডিব অভাব হয়নি। তবে ব্যক্তিগত দুঃখ ও দুর্ভোগ নেহাৎই ব্যক্তিগত এবং নিজস্ব ব্যাপাব। আমো কত দিন ধবে বোগিনী ভুগে ভুগে ধীবে ধীরে মৃত্যুব দিকে এগিয়ে যাচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে আমবাও তিলে তিলে সেই মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ কবছি। ও তো

বস্তুত একটা মমি নামেমাত্র বেঁচে আছে। তবু মেয়ে তার মনের জোর হারায়নি; তার মৃত্যুশয্যায় আত্মীয় বন্ধুবান্ধব এবং পরিচিত অপরিচিত যারাই ওকে সামান্য ক্ষণের জন্যেও দেখেন, তাদের সকলের মনেই একটা আধ্যাত্মিক ভাব ও প্রেরণা জেগেছে। আজ আমি মনে করি আশা করি এমন কি প্রার্থনাও করি তার এই দুঃসহ যন্ত্রণার শেষ হোক। বিবি ওর ঠাণ্ডা হাত দুটো ধরে বসে আছে, আর বাবা ওর যন্ত্রণা চোখে দেখতে না পেরে বাইরে গিয়ে বসে আছেন। আমি দিনরাত ওর শুশ্রূষা নিয়েই আছি: তারই ফাকে সময় করে তোমাকে চিঠি লিখতে বসেছি, তার কারণ, তুমিও আমার একান্ত স্নেহের পাত্র এবং এই যে তোমাকে চিঠি লিখছি তাতেও মনে অনেকখানি সান্ত্বনা পাচ্ছি। শারীরিক দুঃখ যন্ত্রণাকে যে মনোবাঞ্ছা এইভাবে সগৌরবে জয় করতে পারে এ আমি কখনো দেখিনি, মৃত্যুপথে চলতে চলতেও যে এ ধরণের সম্ভ্রমবোধ, সৌজন্য সাহস ও সহাশক্তি কারো থাকতে পারে, এও আমি দেখিনি কখনো। তুমি যদি ইভাকে দেখতে! এমন কি শ্বাসকষ্টের মধ্যেও যখনই দুটো কথা বলতে পারে তখনই বলে 'জহরলালের সঙ্গে যদি আমার দেখা হত। উনি কেমন আছেন? তোমরা কি তাঁকে চিঠি লিখবে? তাহলে উনি যে আমার খোঁজখবর নিচ্ছেন সেজন্যে তাকে ধন্যবাদ জানিয়ো।"

আমি মনে করি কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট শীঘ্রই ওয়ার্কিং কমিটি এবং নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন আহ্বান করবেন। আশা করি, আমি তাতে উপস্থিত থাকতে পারব। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির চূড়ান্তভাবে নিষ্পত্তি করা দরকার। কিন্তু একটাই মাত্র মীমাংসা হতে পারে তা তুমিও জান, আমিও জানি। অন্য কোনো সিদ্ধান্ত আমাদের স্বদেশ ও দেশের পক্ষে মঙ্গলকর হবে না।

প্রীতিশালা
সরোজিনী

৩৩০ ফিল্ড মার্শাল এ. পি. ওয়াভেল কর্তৃক লিখিত

কমাণ্ডার-ইন-চীফ ইন ইন্ডিয়া
নিউ দিল্লী
২৮শে ডিসেম্বর ১৯৪১

প্রিয় মহাশয়,

সম্প্রতি আমি চুংকিঙ গিয়েছিলুম। মাদাম চিয়াং কাই-সেক আমাকে অনুরোধ করেছিলেন ভারতবর্ষে ফিরে যেন আপনাকে তার প্রীতি সম্ভাষণ জানাই। তিনি শারীরিক কুশলে আছেন, মনোবলও তার অক্ষুণ্ণ আছে। এর আগে আর কখনো ওঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়নি ওঁর সঙ্গে আলাপ করে মুগ্ধ হয়েছি।

আমি ব্যক্তিগতভাবে এ খবরটা পৌঁছে দেবার ভার নিয়েছিলুম, তাই এ চিঠি একজন সাধারণ বেসরকারী লোকের লেখা বলে মনে করবেন, ভারতের সর্বাধিনায়কের না।

আপনার একান্ত
এ পি ওয়াভেল

৩৩১ জেড্, এ, আমেদ কর্তৃক লিখিত

বন্দী নিবাস
দেউলী রাজপুতানা
১০ই জানুয়ারী ১৯৪২

প্রিয় পণ্ডিতজী,

জেল থেকে আপনার মুক্তিলাভের পর থেকেই আপনাকে চিঠি লিখব লিখব

ভাবছি। কিন্তু আপনি অনেক জরুরী ব্যাপারে ব্যস্ত থাকবেন, তা ছাড়া অসংখ্য অকেজো চিঠি ত পাবেনই; তাই ভাবলুম এর উপরে আবার আমি একটা চিঠি লিখতে যাই কেন? অবশ্য জানি, অদরকারী হ'লেও আপনি অধিকাংশ চিঠিরই জবাব দিয়ে থাকেন।

কিন্তু আজ বিছানায় শুয়ে শুয়ে পুরোনো দিনের কথা ভাবছিলুম। মনে হল, গত পাঁচ ছ বছর ধরে আমি যা কিছু করেছি, তার পেছনে রয়েছে একমাত্র আপনার ঘনিষ্ঠ সাহচর্য। আপনার কাছে কত যে অনুপ্রেরণা পেয়েছি ভেবে আশ্চর্য লাগল, এবং সে প্রেরণা কেবল যে রাজনৈতিক ব্যাপারেই এমন নয়, দৈনন্দিন ছোটখাটো ব্যাপারেও তার ছাপ পড়েছে। তাই এই মুহূর্তেই আপনাকে চিঠি লিখবার আগ্রহ হল। কিন্তু লিখবার কথা বেশি কিছু খুঁজে পাচ্ছি না; আর ক্যাম্পের কাঁটা তারের বেড়ার ভেতরে বাস করে বলবার কীই বা অবকাশ আছে? সব চাইতে নিকটবর্তী রেল স্টেশন থেকে সত্তর মাইল দূরে, রাজপুতানায় মরুভূমির মাঝখানে বাস করে আমরা এতটা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছি যে বাইরের নরনারী অধ্যুষিত চলমান জগৎটাকে একটা আধভোলা স্বপ্নের মতো মনে হয়। আমাদের নাকি এখান থেকে নিজ নিজ প্রদেশের জেলে নিয়ে যাওয়া হবে,—শুনে মনে আনন্দ হচ্ছে। সেখানে গেলে অন্তত গতিশীল জগতে আছি বলে মনে হবে। এখানে থাকলে 'লস্ট ট্রাইবে' পরিণত হতে দেরি হবে না।

হজরা কয়েক মাস পর পরই এখানে আসেন। কিন্তু এত দূরের পথ আসা বড় কষ্টসাধ্য, তাই তাকে ঘন ঘন আসতে বারণ করি। নিজের প্রদেশে গেলে ওঁর সঙ্গে দেখাসাক্ষাতের বেশি সুযোগ মিলবে।

কবে নাগাদ আমাদের স্থানান্তর করা হবে আজও জানানো হয়নি; কোথায় নিয়ে যাওয়া হবে তাও কিছুই জানিনে। আমার ধারণা, এ মাস শেষ হবার আগেই উত্তর প্রদেশের কোনো একটা জেলে আমাদের নিয়ে যাওয়া হবে।

আমার স্বাস্থ্য মোটামুটি ভাল. অনশন ধর্মঘটের ধাক্কা প্রায় সম্পূর্ণ সামলে উঠেছি।

শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী, মিঃ পণ্ডিত এবং ট্যাণ্ডনজীকে অনুগ্রহ করে আমার কথা স্মরণ করিয়ে দেবেন। অন্যান্য বন্ধু ও সহকর্মীদের—বিশেষ করে কেশব ও লালবাহাদুরকে শ্রদ্ধা জানাচ্ছি।

আন্তরিক শ্রদ্ধা জানবেন।

আপনার একান্ত
জইন

৩৩২ জওহরলাল নেহরু কর্তৃক সৈয়দ মামুদকে লিখিত

এলাহাবাদ
২রা ফেব্রুয়ারী, ১৯৪২

প্রিয় মামুদ,

আপনার ২৫শে জানুয়ারী তারিখের চিঠি পেলাম। হিন্দু মুসলমান সমস্যা নিয়ে আপনি যে ছোট বইখানি লিখেছেন তা পড়েছি। বইটি সুলিখিত, মোটামুটি ভালই হয়েছে। অবশ্য এর কোনো কোনো অংশ এবং সিদ্ধান্তের সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ একমত হতে পারি না, তবে মোটের উপর আপনার দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে বইখানি বেশ যুক্তিসহ হয়েছে। আমি হ'লে হয়ত অন্যভাবে লিখতুম। কেননা, কতকগুলো বিষয় আপনি উল্লেখই করেননি, অথচ আমি সেগুলোর উপরেই বেশি জোর দিতুম।

সাম্প্রতিক কয়েকটি ব্যাপার আপনার দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে, বিশেষ করে পৃথিবীর কয়েকটি ঘটনা, যার ফল ভোগ করতে হচ্ছে ভারতকেও। আমি মনে করি, জিন্না ও মুসলীম লীগের আসল ভাবখানা হ'ল, ভারতের শাসনতন্ত্রে মূলগত কোন পরিবর্তন কিংবা গণতন্ত্রের প্রবর্তন যেন না হয়, এটা কিন্তু সংখ্যাধিক্যের কারণে নয়; পাছে পরিবর্তনের ফলে আধা সামন্ততন্ত্রের সুযোগ সুবিধা লোপ পেয়ে যায় এই আশঙ্কায়। আপনার চিঠিতে এর একটু আভাস আছে। গণপরিষদের মূল উদ্দেশ্য হ'ল জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা, তাদের মনে নতুন উদ্দীপনার সৃষ্টি করা, যাতে সাম্প্রদায়িক কিংবা অন্য কোনো সমস্যাকে মধ্যবিত্ত সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচার করা না চলে; ঐ দৃষ্টিভঙ্গিই তো আজকের এই অচল অবস্থার সৃষ্টি করেছে। আমরা যতই চেষ্টা করি না কেন যতদিন না তৃতীয় পক্ষ (ইংরেজ) এ দেশ থেকে বিতাড়িত হচ্ছে, ততদিন এর কোন মীমাংসা হবে না, আমি নিজে অন্তত এর কোনো সমাধান খুঁজে পাচ্ছি না। অবস্থায় ফেরে পড়ে একদিন আমরা নিশ্চয়ই এর একটা সমাধান করতে বাধ্য হব, আর তা নয়ত বড় রকমের একটা সংঘাত বাধবে। তবে কিনা এটা তখনই সম্ভব হবে যখন আমরা বুঝতে পারব কোন পক্ষই সাহায্যের জন্যে বৃটিশ কিংবা অপর কোনো বিদেশী গবর্ণমেণ্টের কাছে ধর্ণা দিতে পারবে না।

কংগ্রেস এবং মুসলীম লীগের (অন্য সব দলগুলোরও) পক্ষে উচিত ছিল সব কিছু বিরোধ, এমন কি পাকিস্তানের প্রশ্নও আপাতত স্থগিত রেখে কেবল একটি বিষয়ে একমত হওয়া। সেই একটি বিষয় হল, এক যোগে বিদেশী কর্তৃত্ব এবং আমাদের আভ্যন্তরীন ব্যাপারে হস্তক্ষেপের বিরোধিতা করা। এই বিদেশী কর্তৃপক্ষকে যদি একবার বিতাড়িত করা যায় তাহলে আমরা হয় নিজেরা নিজেরা মিলেমিশে থাকব আর নয়ত মারামারি খুনোখুনি করব। খুব সম্ভব তখন আমাদের মতের মিল হবে, কারণ মারামারি কাটাকাটি করা তো এর কারো পক্ষেই সুখের হবে না।

জিন্না শেষের কাজটা আগে করতে চান। তিনি বলেন, আগে তাঁর সর্ত পূরণ করা না হলে কোন প্রকার রাজনৈতিক অগ্রগতি তিনি চান না। বর্তমান অবস্থায় এর অর্থ, অগ্রগতির পথ রুদ্ধ করা। তাঁর বরং এই কথা বলা উচিত ছিল: পাকিস্তান আমার চাই-ই এবং তার আনুষঙ্গিক অন্যান্য দাবীরও এতটুকু নড়চড় হবে না, এর কমে আমি কখনো সন্তুষ্টও হব না, কিন্তু বিদেশী শাসককে বিতাড়িত করবার জন্যে অন্যান্যের সঙ্গে যোগ দিতে আমি সম্পূর্ণ রাজী। তারপর দরকার হলে আমি আমার দাবী আদায়ের জন্যে লড়াই করব। স্পষ্টতই মনে হয়, তিনি চান বর্তমান অবস্থাটাই যেন বজায় থাকে। সুতরাং তাঁকে সমর্থন করা কোন মতেই সম্ভব নয়।

ভাগ্যের কথা এই যে পৃথিবীর পরিবর্তন হচ্ছে এবং নানা ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাতে আমাদের কঠিনতম সমস্যাগুলোও একরকম সমাধান হয়ে যাচ্ছে। সংস্কারের মধ্য দিয়েই অবশ্য সমস্যার সমাধান করা উচিত এবং বাঞ্ছনীয়; কিন্তু তা সময় সাপেক্ষ। অথচ আজকাল এত সব ঘটনা হুড়হুড় করে ঘটছে যে তার ফলে বিরাট পরিবর্তন এসে যাচ্ছে। শীঘ্রই এই সব পরিবর্তন আমাদের চোখে পরিস্ফুট হবে বলে আমি মনে করি।

জিন্না এবং লীগের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করার কথা আপনি বলছেন, কিন্তু কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য হয়ে ওরূপ প্রস্তাব করা আপনার পক্ষে কতটা সমীচীন হয়েছে, বুঝতে পারছি না। এতে নিশ্চয়ই একটা বিরোধ এবং গোলমালের সৃষ্টি হবে। মওলানা আজাদের সঙ্গে যদি পরামর্শ করেন, ভাল হয় না কি? তিনি

কাল এখানে আসছেন দিন তিনেক থাকবেন। যদি আপত্তি না থাকে আপনার টাইপস্ক্রীপ্ট আমি তাঁকে দিতে পারি।

প্রীতিশীল
জওহরলাল

৩৩৩ মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক লিখিত

ওয়ার্ধা
৪ই মার্চ ১৯৪২

(মূলে চিঠি হিন্দীতে লেখা)
প্রিয় জওহরলাল,

গতকাল তোমার চিঠি পেয়েছি। আশা করি আমার এই চিঠি পড়তে তোমাকে বেগ পেতে হবে না।

আমার দৃঢ় অভিমত এই যে ইন্দুর বিয়েতে বাইরে থেকে কাকেও আমন্ত্রণ করবার দরকার নেই। এলাহাবাদে এখন যাঁরা রয়েছেন এমনই কয়েকজন বিবাহ সভায় উপস্থিত থাকলেই চলবে। অবশ্য যত জনকে খুশি তুমি নিমন্ত্রণ পত্র (লগ্ন পত্রিকা) পাঠাতে পার। প্রত্যেকের কাছেই আশীর্বাদ চেয়ে পাঠাও কিন্তু স্পষ্ট উল্লেখ থাকা দরকার যে কষ্ট করে বিয়েতে কারো আসবার প্রয়োজন নেই। যদি একজনকেও আসতে বলা হয় তবে সবাইকেই বলতে হবে।

কিন্তু জাঁকজমকহীন সাদাসিধে ব্যাপারে ইন্দু রাজী আছেন কিনা তাও বিবেচ্য। আর যদি তুমি নিজেও এতটা পর্যন্ত পছন্দ না কর তাহলে আমার প্রস্তাব বাতিল করে দিও।

ইন্দুর সম্বন্ধে তোমার অভিমত আমি জেনেছি আমার ভালই লেগেছে। ওর বিয়ের সম্পর্কে আমার কাছে রোজ চিঠিপত্র আসছে। তার মধ্যে কয়েকখানা সাংঘাতিক ধরণের। সেগুলো আমি নষ্ট করে ফেলেছি। এই সব চিঠির একটা জবাব আমি হরিজন পত্রিকায় দিয়েছি তার এক কপি এই সঙ্গে তোমাকে পাঠালাম। সোমবার দিন ওটা লিখেছি আর গতকাল থেকে মুসলমানদের কাছ থেকে বহু চিঠি আসতে শুরু করেছে। তাদের মারমুখো। কিন্তু সে তো পুরনো কথা। ও চলতেই থাকবে।

ভারতীয় রাজ্যগুলোর জন্যে আমি যতটা পারি করব। আর্থিক সমস্যা সব সময়েই থাকবে। যমনালালজী নিজের ঘাড়ে সব দায়িত্ব নিয়েছেন কি করে পেরে উঠলেন তা বুঝতে পারছি না। কি করে টাকা যোগাড় করব, তাই ভাবনা। খবরের কাগজ সম্পর্কে পট্টভির সঙ্গে পরামর্শ করছি। বলবন্ত রায় আসতে পারবে না অবশ্য তাতে কিছু যায় আসবে না। এখানেই কিছু সাহায্য পাওয়া যাবে। তুমি এখানে এলে সাক্ষাৎ মত এই বিষয়ে আলোচনা হবে। বোম্বাই-এর কাজটা শেষ করবার জন্যে মেনন আজ সেখানে যাচ্ছেন।

চিয়াং কাই সেকের বিবৃতি আমি দেখেছি। ভালই লেগেছে। তোমার সম্মতি পেয়েছি বটে কিন্তু ভেবে দেখলাম ওটা আর এখন জনসাধারণের কাছে প্রচার করবার প্রয়োজন নেই। বিষয়টা পুরোনো হয়ে গেছে।

ভাগীরথী এসেছে। চন্দ্রসিংকে ঠেকিয়ে রাখা দায়। বুদ্ধিশুদ্ধি নাই বললেই হয়। সামান্য ব্যাপার নিয়ে ঝগড়া করে। সে যদি কাকেও মারধর করে তাতেও আশ্চর্য হব না। তবে দেখছি ও খুব খাটতে পারে। তোমার চিন্তার কারণ নেই। আমার চিঠি পড়তে তোমার অসুবিধা হলে আরো স্পষ্ট করে লিখতে চেষ্টা করব। তবে কি জানো আমাদের দুজনেরই পরস্পরের কাছে জাতীয় ভাষায় চিঠিপত্র লেখা

কর্তব্য। কিছুদিন বাদে কাজটা সহজ মনে হবে, আর এতে করে গরীবদের অনেক উপকার হবে।

আশীর্বাদ জেনো।

বাপু

৩৩৪ আবুল কালাম আজাদ কর্তৃক লিখিত

কলিকাতা
৮ই মার্চ ১৯৪২

প্রিয় জওহরলাল,

আপনার চিঠিখানার উত্তর দেবার পর আপনার দ্বিতীয় চিঠি পেলাম। ভেবেছিলুম দু-তিন দিনের জন্য ওয়ার্ধা যাব কিন্তু বাংলা দেশে যে দারুণ পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে তাতে যাওয়া হয়ে উঠল না। অসামরিক অধিবাসীদের নিরাপত্তার ব্যাপারে বহুগুলো জটিল সমস্যার সমাধান না করে যাওয়া সম্ভব নয়। এদিকে ১৭ তারিখে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন বসছে। ১১ কিংবা ১২ তারিখে আমার ওয়ার্ধা রওনা হবার ইচ্ছা আছে। আপনিও যদি অধিবেশনের দু'দিন আগে ওয়ার্ধা পৌঁছন ভাল হয়। আমি কবে যাচ্ছি টেলিগ্রাম করে আপনাকে জানাব।

ওয়ার্ধায় প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী একটা বিবৃতি প্রচারের জন্য তাগিদ দিয়ে বাদশা খান আমাকে কয়েকখানা চিঠি লিখেছেন। সব দিক বিবেচনা করে দেখলুম যে ওঁর ইচ্ছানুযায়ী বিবৃতি দেওয়া ভিন্ন অন্য উপায় নাই। তাই খবরের কাগজে একটা বিবৃতি দিয়েছি। আপনি তা দেখে থাকবেন। জানি না ইতোমধ্যে ওঁর সঙ্গে আপনার চিঠিপত্রের আদান প্রদান হয়েছে কি না।

চার পাঁচ দিন আগে বার্লিন থেকে সুভাষবাবুর একটা বিবৃতি বেতারে প্রচার করা হয়েছিল। পরদিন ঘোষণা করা হল ঐ বক্তৃতাটা রেকর্ড করা হয়েছে এবং তাতে সুভাষবাবুর নিজের কণ্ঠস্বর শোনা যাবে। আমি শুনেছি। সুভাষবাবুরই কণ্ঠস্বর। আমার কিন্তু মনে হয় ওটা রেকর্ড না, উনি নিজেই বলছিলেন। তবে তাঁকেও [illegible] যে বেতারে বক্তৃতা প্রচার করা [illegible]। সেটা নিশ্চয় [illegible]। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল রেকর্ডখানা বিদ্যুতে [illegible] হচ্ছে।

[illegible]বোর্ডের [illegible] এবং [illegible] আছেন তাঁরা [illegible]। সঙ্গে [illegible]

আপনার একান্ত
এ কে আজাদ

পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু
এলাহাবাদ

৩৩৫ মাদাম চিয়াং কাই-সেক কর্তৃক লিখিত

জেনারেলিসিমোর হেডকোয়ার্টার্স
চুংকিঙ চীন
১৩ই মার্চ ১৯৪২

প্রিয় মিঃ নেহরু,

ভারতবর্ষ থেকে কুংমিঙ হয়ে দেশে ফিরবার পর জেনারেলিসিমো পার্টির হেড-কোয়ার্টার্সে একটা বক্তৃতা দিয়েছিলেন। যতদূর মনে পড়ে, সঠিক তারিখটা ছিল ৯ মার্চ, এ সঙ্গে তার একটা রিপোর্ট পাঠাচ্ছি। বক্তৃতাটি পুস্তিকাকারে ছাপিয়ে প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্তাদের কাছে পাঠানো হবে কিন্তু

সংবাদপত্রের মাধ্যমে প্রচার করা হবে না। বক্তৃতার ইংরেজি অনুবাদ টেলিগ্রামে ওয়াশিংটন এবং লন্ডনে আমাদের দূতাবাসে পাঠানো হচ্ছে, রাষ্ট্রদূত সেটা রুজভেল্ট এবং চার্চিলের হাতে দেবেন। আপনাকে তারই এক কপি পাঠাচ্ছি। বৃটিশ গবর্ণমেন্ট জোর গলায় বলছে ভারতের অধিবাসীদের মধ্যে কোনো ঐক্য নেই, সুতরাং তাদের হাতে প্রকৃত ক্ষমতা দেওয়া যেতে পারে না। বৃটিশ গবর্ণমেন্টের অতিথিরূপে ভারতে গিয়েছিলুম বলে খোলাখুলিভাবে ঐ কথাগুলোর প্রতিবাদ করতে আমাদের সৌজন্যে বাধছে। মাদাম জেনারেলিসিমো আর আমি দুজনেই বুঝতে পারছি আমরা যা সত্য বলে মনে করি ভারতীয় বন্ধুদের কাছে তা খুলে বলা উচিত। আজই খবরের কাগজে দেখলাম বৃটিশ গবর্ণমেন্টের ঐ কথা সমর্থন করে লন্ডনের ক্রনিকল পত্রিকা জোর লিখেছে। আমার তো দস্তুরমতো রাগ হচ্ছে।

ক্রীপস কতকগুলো প্রস্তাব নিয়ে ভারতে আসছেন কাগজে দেখলাম। আরো দেখলাম ঐ সম্পর্কে রয়টারের প্রশ্নের জবাবে আপনি ভাল মন্দ স্পষ্ট কোনো মন্তব্য করেননি। বন্ধু কে বলে আপনি রাজনীতিক নন?

কুংমিঙ পৌঁছুবার পরদিনই ২২ ফেব্রুয়ারী তারিখে আমি আপনাকে একটা চিঠি লিখেছিলুম। তার কোনো উত্তর না পেয়ে আমি কলকাতায় আমাদের কনসাল জেনারেলকে তার করেছিলাম আপনাকে সেই চিঠিটা দেওয়া হয়েছে কিনা এ দিয়ে থাকলে কবে। এইমাত্র জানা গেল ঐ চিঠিখানা ৫ মার্চ তার হাতে পৌঁছেছে এবং ৬ই মার্চ বিশেষ সংবাদবাহক মারফৎ সেটা আপনাকে পাঠানো হয়। হা ভগবান পথে এত দেরি হল আমার ত কল্পনায় আসে না। জানি না এই চিঠি আপনি পাবেন কিনা এবং কবেই বা পাবেন। চৈনিক কমিশনের জেনারেল মাও এর মারফৎ এই চিঠি পাঠাচ্ছি তাঁকে বলা হল চিঠিখানা যেন তিনি নিজে কনসাল জেনারেলের হাতে দেন যাতে অবিলম্বে আপনার নিকট পৌঁছয়। মিনিট কয়েক আগে মাত্র জানলাম মাও কাল কলকাতা রওনা হচ্ছেন।

হুয়াঙসানে যে বাড়িটাতে আপনি আমাদের সঙ্গে দেখা করেছিলেন সে বাড়ি থেকেই এই চিঠি লিখছি। আপনার হয়ত মনে আছে বাড়িটা চুংকিঙ থেকে যাং সি নদীর দক্ষিণ পারে। কাল রাত্রে এখানে এসেছি একটু নির্জনে থাকতে চাই। দেশে ফেরার পর যেমন কাজের চাপ তেমনি লোকজনের ভীড। সহরে চারদিকেই ঘরে বাইরে রাস্তায় এমন কি নির্জন পাঠকক্ষেও সর্বত্র লোকের ভীড়। আমাদের মনে যে অদৃশ্য চিন্তাস্রোত আনাগোনা করছে ঢেউএর পরে ঢেউ তুলছে তা আমাদের মনের স্নিগ্ধতাকে অশান্ত করে তোলে নানা উৎপাত থেকে রেহাই নেই আমাদের। জনগণের উচ্ছ্বাস প্রকাশের একটা আধ্যাত্মিক মানে আছে মনে করি। যাই হোক লোকজনের ভীড়ে দম বন্ধ হবার উপক্রম হয়েছিল এই পাহাড়ে জায়গায় এসে সোয়াস্তি নিশ্বাস ফেলা গেল। ভারতবর্ষ দেশটা আমার ভাল লেগেছে কিন্তু দিল্লীর সেই সাদা সাদা বাড়িগুলোর জৌলুসে আমার চোখ ঝলসে গিয়েছিল। আর এই চুংকিঙ প্রায় সব সময়েই কুয়াশায় আচ্ছন্ন। পাহাড়ের চারিদিকে দিগন্ত অবধি ছেয়ে আছে মনোরম আবছা কুয়াশায়। উজ্জ্বল সূর্যালোকে যারা অভ্যস্ত নয় তাদের কাছে পাহাড়ে অঞ্চলের সবুজ গাছপালাছড়ায় আচ্ছন্ন সমতল ভূমির (আপনার মনে আছে কি?) দৃশ্য বড়ই রমনীয়। ভারতে ঘর থেকে বেরুলেই আমার মাথায় বিষম যন্ত্রণা হ'ত, বোধ করি আপনার মনে আছে। কিন্তু তা হোক ও দেশটা দেখে আমি আনন্দই পেয়েছি না দেখে কিছুতেই ছাড়তুম না।

ভেবেছিলুম জেনারেল মাও এর সঙ্গে নানের জন্যে কিছু উপহার পাঠাব কিন্তু তার একটা ব্যবস্থার জন্যে আমার সেক্রেটারিকে কিছুতেই টেলিফোনে ধরতে পারছি

না। যদি শেষ পর্যন্ত পাঠাতে পারি তো ভালই, আর নয়ত ওকে বলবেন যত শীঘ্র সম্ভব পরবর্তী লোক মারফৎ পাঠাব। মিস চাউ একটু আমোদ, আহ্লাদ করতে বেরিয়েছে (অবশ্য চুংকিঙের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে যতটা সম্ভব)।

এই সঙ্গে ক্রীপ্‌সের একখানি চিঠি আপনাকে পাঠাচ্ছি। ৫ মার্চ দেশে ফেরার পরেই আমার চিঠির বাক্সে এটা পেয়েছিলাম। এই চিঠি থেকে বুঝতে পারবেন আপনি যখন জেলে ছিলেন তখন আপনার জন্যে আমরা কিরকম উৎকণ্ঠিত ছিলাম। কিন্তু এ ছাড়াও আপনার বোঝা উচিত।

ভারতের ব্যাপার নিয়ে জেনারেলিসিমো ক্রমাগত রুজভেল্টকে তার করছেন। রুজভেল্টের কাছ থেকে শেষে যে তার পাওয়া গেছে তাতে তিনি বলছেন ঃ শান্তি সম্মেলনে ভারতের প্রতিনিধিরূপে যিনি যাবেন তিনি কংগ্রেসের মনোনীত হওয়া বাঞ্ছনীয় এবং তাকে প্রকৃত জাতীয়তাবাদী ভারতের প্রতিনিধিত্ব করতে হবে। ২। ভারতবর্ষকে হিন্দু আর মুসলমান এই দুই ভাগে ভাগ করলে সমস্যা মিটতে পারে। জেনারেলিসিমো আর আমি দুজনেই আমার ভাই টি ভিকে টেলি করে বলে দিয়েছি যে, রুজভেল্টের দ্বিতীয় মতটা সম্পূর্ণ ভুল এবং নিমেষের জন্যেও একথা মনে স্থান দেওয়া উচিত নয়। চীনকে যেমন ভাগ করা যায় না ভারতবর্ষের বেলাও তাই। অধিবাসীদের মধ্যে ধর্মীয় মতভেদ আছে বটে কিন্তু তাই বলে একথা বোঝায় না যে তৃতীয় পক্ষের হস্তক্ষেপ ও উসকানো ছাড়া নিজেদের মতবিরোধ মীমাংসা করার সুযোগ পেলে রাজনীতিতে তারা একমত হতে পারবে না।

জেনারেলিসিমো আমাকে ডেকে চিঠি লেখা এখন বন্ধ করতে বলছেন রুজভেল্টের কাছ থেকে খবর নিয়ে জেনারেল ম্যাগ্রুডার এসেছেন। আপনার কাছে একখানা চিঠির মতো চিঠি লিখবার সময় আর কিছুতেই যেন পাই না। বিরক্তিকর সব কাজের ঝঞ্ঝাট লেগেই আছে ফলে অর্থহীন ও অসংলগ্ন কতগুলো কথা লিখে যাই। যাহোক আমার উপর বিরক্ত হবেন না। গুছিয়ে চিন্তা করার মতো সময়ও যেন আমি পাই না। সেই ভাল কারণ গান্ধীজির মতো গভীর চিন্তার পর যথোচিত কোনো কাজের হদিস দেওয়া আমার পক্ষে সুদূর পরাহত।

আমার ভরঘুরে বন্ধুকে—সেলাম। বিদায়

এম এস সি

৩৩৬ স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রীপস কর্তৃক লিখিত

৩নং কুইন ভিক্টোরিয়া রোড
নিউ দিল্লী
এপ্রিল ১৯৪২

ব্যক্তিগত ও গোপনীয়

প্রিয় জওহরলাল,

আপনার কাছে এই আমার শেষ আবেদন। স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্বটা রয়েছে আপনার উপর। আর এই সিদ্ধান্তের উপরেই নির্ভর করছে আমাদের দুই দেশের ভবিষ্যৎ সম্পর্ক সুতরাং এর প্রভাব হবে অপরিসীম এবং সুদূরপ্রসারী।

আমরা এই দুই দেশের লোককে বন্ধুত্ব ও সহযোগিতার পথে নিয়ে যেতে পারি ও নিশ্চয় নিয়ে যাব এবং সেটা আমাদের দুজনকে করতেই হবে—আমি আমার কার্যক্ষেত্রে, আপনি আপনার কার্যক্ষেত্রে।

যে সুযোগ এখন এসেছে তা আর আসবে না। এ সুযোগ না নিলে হয়ত অন্য পন্থা অবলম্বন করা হবে কিন্তু একথা জানবেন, দু দেশের মধ্যে হৃদ্যতা বজায় রাখবার পক্ষে এর চেয়ে ভাল সুযোগ আর মিলবে না।

একমাত্র আপনার নেতৃত্বই পারে এই কাজটি সম্পাদন করতে। অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্যে প্রকৃত নেতার পক্ষে সকল রকম ঝুঁকি ও বাধাবিঘ্নের—ঐ সব তো যেন আছেই—সম্মুখীন হবার এই তো সময়।

আপনার যোগ্যতা ও সামর্থ আমার জানা আছে। এই সময়ে তার সদ্ব্যবহার করুন এই আমার একান্ত অনুরোধ।

প্রীতিশীল
স্ট্যাফোর্ড

৩৩৭ জওহরলাল নেহরু কর্তৃক ফ্রাঙ্কলিন ডি, রুজভেল্টকে লিখিত

১২ এপ্রিল, ১৯৪২
নিউ দিল্লী

প্রিয় মিঃ প্রেসিডেণ্ট,

ভারতবর্ষের বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থা এবং যুদ্ধের উপর তার প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে আপনি বিশেষ আগ্রহান্বিত জানি বলেই ভরসা করে আমি আপনাকে এই চিঠি লিখছি। শেষ পর্যন্ত বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট এবং ভারতবাসীদের মধ্যে একটা মীমাংসার ব্যাপারে স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রীপসের দৌত্য বিফল হয়েছে। এতে আমাদের মতো আপনিও নিশ্চয় দুঃখিত হয়েছেন। আপনি ত জানেন, আমরা অনেক বছর ধরে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্যে লড়াই করে আসছি। কিন্তু আজ এই সংকট-কালে আর সব কিছু ছেড়ে দিয়ে আমরা কেবল চেয়েছিলুম আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে একটা প্রকৃত জাতীয় প্রতিরোধবাহিনী গড়ে তোলার সুযোগ আমাদের দেওয়া হোক। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস এর সঠিক পন্থা হল, আমাদের স্বাধীনতা দিয়ে তা রক্ষার ভার আমাদের হাতেই দেওয়া। তাতে লক্ষ লক্ষ লোকের প্রাণমন উৎসাহে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠবে, যথাসময়ে তা আবার এমনি প্রতিরোধের প্রচণ্ড বহ্নি প্রজ্জ্বলিত করবে যে, কোনো আক্রমণকারীই তার সামনে দাড়াতে সাহস করবে না।

আমরা যা কিছু দাবী করেছি এবং যুদ্ধের প্রয়োজনে যা আবশ্যক মনে করেছি তা মেনে নেওয়া সম্ভব হয়নি বলে শেষ পর্যন্ত মাত্র আমরা দাবী করেছিলাম যে ক্ষমতা এবং দায়িত্ব দিয়ে আমাদের প্রকৃত জাতীয় গবর্ণমেণ্ট গঠন করতে দেওয়া হোক; আমরাই জনসাধারণকে নিয়ে প্রতিরোধের ব্যবস্থা করি। দুঃখের বিষয়, বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট তাও বিবেচনার যোগ্য বা কাম্য মনে করেননি। আলোচনা আপাতত ফেঁসে গিয়েছে। সবিস্তারে আলাপ আলোচনার সময় কি ঘটেছিল, তার বর্ণনা দিয়ে আপনাকে বিব্রত করতে চাই না। আপনার প্রতিনিধিদের কাছ থেকেই নিশ্চয় সব খবর পেয়েছেন। আমি শুধু এই কথাই বলতে চাই যে, আমাদের নিজ দেশ রক্ষার ব্যাপারে তো বটেই তাছাড়া পৃথিবীময় স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের রক্ষাকল্পে সহযোগিতা করতে আমরা খুবই ব্যগ্র এবং উৎসুক ছিলাম, এখনও আছি। অথচ আমাদের পক্ষে নিতান্ত দুঃখের বিষয় যে, আমাদের দেশ রক্ষার ব্যাপারে যেভাবে করতে চাই বা যে প্রণালী অবলম্বন করতে চাই, তা করতে পারি না। আমাদের দেশ রক্ষার জন্যে আমরা সর্বস্ব পণ করতে প্রস্তুত, যথাশক্তি যুদ্ধ করতে প্রস্তুত। আক্রমণকারীকে প্রতিরোধ করতে এবং দেশের স্বাধীনতা রক্ষাকল্পে কোনো ক্ষতি, কোনো ত্যাগই বড় বলে গণ্য করতুম না।

বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট এ যাবৎ যে নীতি অনুসরণ করে আসছিল তার ফলে আমাদের দেশে শিল্পোন্নতি বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে, তাই আমাদের সম্বল কম। আমরা নিরস্ত্র। কিন্তু যুদ্ধ করবার প্রচুর সম্ভাব্য বস্তু আমাদের আছে। চীন দেশের মতো আমাদের জনসংখ্যা বিপুল, দেশ বিশাল—এ সমস্তই আমাদের সময়, প্রচেষ্টার সহায়ক হত।

মূলধন ও শ্রমিকের সহাযতায় আমাদেব উৎপাদন শক্তি খুব বাড়িয়ে দেওযা যেতে পাবতো। কিন্তু দেশেব শাসন ক্ষমতা যদি জনগণেব হাতে থাকে তবেই এই সংগতি কাজে লাগানো যেতে পাবে। যে গবর্ণমেণ্ট জনগণ হতে একেবাবে বিচ্ছিন্ন, তা সর্বসাধাবণের সমর্থন পেতে পাবে না, অথচ ঐ সমর্থনই সর্বাপেক্ষা প্রযোজনীয়। বিদেশী গবর্ণমেণ্টকে লোকে ভাল চক্ষে দেখে না তাব উপব আস্থা বাখে না সমর্থন কবাতো দূবেব কথা।

আমবা নানা বিপদাশংকাব মধ্যে আছি বিদেশী আক্রমণের সম্ভাবনা আছে এবং তাব দরুণ বিভীষিকার সৃষ্টি হতে পাবে যেমন জাপানী আক্রমণেব ফলে চীনে হযেছে সুতবাং আমাদেব অদূব ভবিষ্যৎ অন্ধকাব। স্যাব স্ট্যাফোর্ড ক্রীপসের দৌত্য বিফল হওযাতে অবস্থাটা আবো ঘোরালো হযে দাঁড়িযেছে জনসাধাবণের উপরেও তাব প্রতিক্রিযা ভাল হযনি। [illegible] দূর্বিপাকই আসুক না কেন আমবা সাহসেব সঙ্গে তাব সম্মুখীন হব এবং বাধা দেব। অবশ্য আমাদেব ইচ্ছামতো চলবাব যো নেই ভাবতে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষেব কার্যকলাপও আমবা সমর্থন কবতে পাবি না তবু জাপানীদেব কিংবা আব কাবো আক্রমণেব কাছেই আমবা আমবা নতি স্বীকাব কবব না। [illegible] ধবে আমবা স্বাধীনতাব জন্যে সংগ্রাম কবে আসছি লড়াই কবছি পুবানো আক্রমণকাবীব বিরুদ্ধে [illegible] আজ কোনো নতুন আক্রমণকাবীব কাছে আত্মসমর্পণ কবাব চেযে [illegible] ধ্বংস হযে যাওযাই শ্রেয মনে কবি।

যে সকল দেশ [illegible] এবং স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রেব রক্ষাকল্পে লড়াই কবছে তাদেব [illegible] সহানুভূতি একথা অনেকবাব বলেছি। আমাদেব দেশ যদি স্বাধীন হতো [illegible] এ সহানুভূতি ও সমর্থন অনেক বেশি জোবালো হত এবং [illegible] প্রকাশ পেত।

আপনাব [illegible] দেশেব আপনাব [illegible] নেতা সফলতাব জন্য শুভেচ্ছা পাঠাচ্ছি। [illegible] আপনাব দিকে নেতৃত্বেব জন্য [illegible] আমাদেব গভীব শ্রদ্ধা ও ঐকান্তিক শুভেচ্ছা গ্রহণ কবন।

আপনাব একান্ত
[illegible] নেহরু

প্রেসিডেন্ট ফ্রাঙ্কলিন বুজভেল্ট
ওযাশিংটন
ইউ এস এ

৩৩৮ মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক লিখিত

ওযার্ধা
১৫ই এপ্রিল ১৯৪০

(মূল চিঠি হিন্দীতে লেখা)
প্রিয জওহবলাল,

[illegible] আমাকে সব কথা খুলে লিখেছেন। সাপ্তাহিক বৈঠকে [illegible] আমি শুনেছি। দেখতে পাচ্ছি আমাদেব দুজনেব মতেব যে অমিল ছিল তা এখন ক্রমশ বাইবেও প্রকাশ পাচ্ছে। এই অবস্থায বল্লভভাই ও অন্যান্যেব কী কবতে পাবেন যদি তোমাব নীতিই গ্রহণ কবা হয তবে বর্তমানে যে কমিটি আছে তা বহাল থাকা ঠিক হবে না।

এই বিষযে যতই ভাবছি আমাব মনে হচ্ছে [illegible] কিছু একটা ভুল কবছ।

আমেরিকান ও চীনা সৈন্য ভারতে প্রবেশ করলে তাদের সঙ্গে গেরিলা যুদ্ধ করে তেমন কিছু সুবিধা হবে বলে আমার মনে হচ্ছে না।

তোমাকে সতর্ক করা আমার কর্তব্য।

আশা করি, ইন্দু ও ফিরোজ ভাল আছে।

আশীর্বাদক
বাপু

গতকাল খবর পেলাম উৎকলের ফরোয়ার্ড ব্লকের সমর্থকরা নাকি অস্ত্র হাতে নিয়েছে, আর কম্যুনিস্টরাও গেরিলা যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত। জানি না এ খবর কতটা সত্য।

৩৩৯ তুয়ান-শেঙ চেন কর্তৃক লিখিত

পিকিঙ ইউনিভার্সিটি
কুংমিঙ, চীন
১৮ই এপ্রিল, ১৯৪২

প্রিয় পণ্ডিত,

আপনাকে এই চিঠি লিখবার ধৃষ্টতা মাফ করবেন। ১৯৩৯ সনের আগস্ট মাসে আপনি বংমিঙের বিশ্রি হোটেল-দু লাক্-এ এক রাত্রি কাটিয়েছিলেন। সে সময়ে আলোচনা প্রসঙ্গে যে লোকটি এক তরফা কথা বলে গিয়েছিল—অবশ্য আলোচনার ফলে সেই বেশি লাভবানও হয়েছিল, আশা করি, সেই লোকটিকে আপনার মনে আছে। সেই ব্যক্তিই আজ এই চিঠি লিখছে। বাস্তবিক যদি জানতুম যুদ্ধের কারণে আপনাকে তাড়াতাড়ি এই দেশ ভ্রমণ শেষ করতে হবে এবং চুংকিঙে আর আপনার সঙ্গে দেখা হবে না, তবে সে রাত্রে আমি আপনাকে আরো অনেক প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতুম। পিপলস্ পলিটিক্যাল কাউন্সিলের অধিবেশনে যোগ দিবার জন্যে আমিও ঐ সময়ে চুংকিঙে যাচ্ছিলাম। কিন্তু সেখানে পৌছে জানলুম আপনি ভারত অভিমুখে রওনা হয়ে গেছেন।

সেই শরৎকাল থেকে ভাবছি আপনাকে চিঠি লিখব। কিন্তু প্রধানত সেন্সরের ভয়ে তা আর লেখা হয়ে ওঠেনি। এখন অবস্থার কিছু পরিবর্তন হয়েছে এবং আশা করি আমাদের কনসাল জেনোরাল নির্বিঘ্নে এই চিঠি আপনার হাতে পৌঁছে দিতে পারবেন।

বর্তমান আলোচনা ভেঙে গেল, সেজন্যে অতিশয় দুঃখিত হয়েছি। শেষ খবর পাবার আগেই আমি প্রফেসর ল্যাস্কিকে এক চিঠিতে লিখেছিঃ—

স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রীপসের কর্মক্ষেত্র এবং ভারতের রাজনৈতিক অবস্থার ক্রমপরিণতি আমি অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে লক্ষ্য করে আসছি। বলতে গেলে ও দুটো পরস্পর সংশ্লিষ্ট। ভারতের সমস্যার একটা সুষ্ঠু সমাধান একান্ত প্রয়োজন। এই কাজে স্যার স্ট্যাফোর্ডের সমকক্ষ আর কেউ নাই। বৃটেন যদি ভাল ভাবে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে চায় তবে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের উচিত হবে স্যার স্ট্যাফোর্ডের হাতে বিশেষ ক্ষমতা দেওয়া। বৃটেনের শাসকগোষ্ঠী ওঁর প্রতি একটু বিরূপ, কিন্তু তিনি যদি ডারহামের ন্যায় ভাল কাজ দেখাতে পারেন তবে সে ভাব দূর হতে পারে। কংগ্রেসের দাবী হল পূর্ণ স্বাধীনতা। এ অবস্থায় স্যার স্ট্যাফোর্ড বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের পক্ষ থেকে প্রথমেই যে প্রস্তাব ঘোষণা করলেন তাতে আমি ভীত হয়ে পড়েছিলাম। মনে হল, কংগ্রেস এবং স্ট্যাফোর্ড দুজনের প্রতিই অবিচার করা হয়েছে। কংগ্রেসের পক্ষে, এই প্রস্তাব অখণ্ড স্বাধীন ভারত গঠনের অন্তরায় হবে; আর স্ট্যাফোর্ডের পক্ষে,

তাঁর ভবিষ্যৎ একেবারে নষ্ট না হলেও উন্নতি ব্যাহত হবে। অথচ ক্রীপসের সাফল্যের উপরে বৃটেনের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। পরবর্তী সংবাদে অবশ্য কিছুটা আশান্বিত হয়েছি, কিন্তু আশংকা দূর হয়নি। রয়টারের মন্তব্য বিশ্লেষণ করলেই বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের সরকারী মনোভাবটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে আমি তাতে সায় দিতে পারি না। আমেরিকান সংবাদপত্রের মন্তব্যও আমি সমর্থন করি না কেননা তাতে বৃটিশের প্ররোচনা আছে। আমার ত সন্দেহ হচ্ছে একযোগে প্রতিরোধ ব্যবস্থা করার আগ্রহে আমার দেশের গবর্ণমেণ্টও বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের হাতের ক্রীড়নক হয়ে দাঁড়িয়েছে। যদি তাই হয় তাতেও আমার সমর্থন নাই। আমি শুধু চাই স্যার স্ট্যাফোর্ড যেন মনে প্রাণে কংগ্রেসের দাবীর প্রতি পুরোপুরী সহানুভূতিশীল হন। বৃটিশ কেবিনেটের প্রস্তাব তিনি সমর্থন করেছেন বটে কিন্তু তা হয়ত করেছেন এই দৃঢ় ধারণার বশবর্তী হয়ে যে কংগ্রেস আরো বেশি দাবী করবে এবং তখন তিনিই উদ্যোগী হয়ে সম্পূর্ণ দাবী পূরণের ব্যবস্থা করবেন।

আলোচনা পণ্ড হবার পরে আপনি ও স্যার স্ট্যাফোর্ড যে সকল বিবৃতি দিয়েছেন তা আমি পড়েছি। স্যার স্ট্যাফোর্ডের বিতর্কের পেছনে এমন কয়েকটি যুক্তি আছে যাতে আমার অবাক লেগেছে। প্রথমত ভারতের বিপুল সংখ্যক অধিবাসীর ইচ্ছা পূরণের চেয়ে সংখ্যালঘুদের (মাইনরিটির) ইচ্ছা পূরণেই বৃটিশরা অধিকতর অগ্রহশীল ওটা নাকি তাদের লোভক দাসত্ব। দ্বিতীয়ত ওরা ধরে নিয়েছে মাইনরিটির ভালমন্দের ব্যাপারে নিখিল ভারত কংগ্রেসের চেয়ে তারাই বেশি উদ্বিগ্ন। আর তৃতীয়ত বৃটিশের ধারণা ভারতীয় প্রতিরক্ষা সচিব যুদ্ধ পরিচালনার ব্যাপারে অযথা হস্তক্ষেপ করবেন এবং তার দরুণ আসল কাজে বিঘ্ন হবে। এইটেই সম্ভবত আলোচনা ভেঙে যাবার সাক্ষাৎ কারণ। স্যার স্ট্যাফোর্ডকে আমি অতি সজ্জন এবং ভারতের স্বাধীনতা লাভের ব্যাপারে আগ্রহশীল বলে জানি এই জন্যেই আমার আরও অবাক লাগছে। তবে কি এখনও বৃটিশ গভর্নমেণ্ট নূতন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে অনেক দূরে আছে এই নূতন দৃষ্টিভঙ্গি না থাকলে ত বৃটেন কিছুতেই যুদ্ধে জিততে পারবে না শান্তিও না। আর স্যার স্ট্যাফোর্ডও কি গবর্ণমেণ্টকে না ডিঙিয়ে বেশি দূর এগোতে চান যাতে ১৯৩১ সনের জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী মাসের অভিজ্ঞতার পুনরাবৃত্তি না ঘটে এই প্রশ্নের কোনো সদুত্তর আমি খুঁজে পাচ্ছি না। তবে আশা করি এত সব ব্যাপার সত্ত্বেও কংগ্রেসের অভিমত তিনি মেনে নেবেন এবং তার সহকর্মীদেরও এই মতে রাজী করাবেন।

এই সমস্যার ব্যাপারে আমাদের গবর্ণমেণ্টের মনোভাব কি আমার জানা নেই। তবে সম্ভবত সমস্বার্থের ভিত্তিতে একযোগে রক্ষা ব্যবস্থার উপরেই তারা জোর দেবেন কংগ্রেসের নেতাদের মর্যাদা বোঝবার মতো যোগ্যতা সাধারণ চীনাদের নাই। তারা কেবল জানে গান্ধীজী একজন ঋষিতুল্য ব্যক্তি আর আপনি নিখুঁত দেশপ্রেমিক। কিন্তু আপনারা যে তারও চাইতে অনেক বড় এব্রাহাম লিংকলন যে দরের রাজনীতিবিদ আপনারা যে সেই দলের এবং তারই সমগোত্রীয় আপনারা যে জনগণের নেতা, চীনারা তা সম্যক ধারণা করতে পারে না কারণ তাদের রাজনৈতিক চেতনা ভারতীয়দের চেয়ে কম।

আমাদের দেশের বর্তমান রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থাটা আমার কাছে ভাল ঠেকছে না। যা হোক যখন বন্ধুর চিঠিপত্র আপনার হাতে ঠিক গিয়ে পৌঁছুবে, তখন এ সব বিষয়ে আপনাকে লিখব এখন নয়। সুতরাং উপদেশ বা পরামর্শ মত শোনায় এমন কিছু লেখা আমার পক্ষে নেহাৎ অসঙ্গত হবে। তবু এটুকু বোধ হয় আশা করতে পারি যে নিজেদের হাতেই শাসন ক্ষমতা আছে মনে করে ভারতীয়রা

অসামরিক প্রতিরোধের যথোচিত ব্যবস্থা করবে। এতে করে তারা যে কেবল দুর্দান্ত এক শত্রুকে পরাভূত করতে সাহায্য করবে তা নয় অদূর ভবিষ্যতে প্রদেশে এবং কেন্দ্রে সম্ভাব্য শাসন ক্ষমতা হাতে নেবার জন্যেও নিজেদের প্রস্তুত করে তুলবে।

গভীর শ্রদ্ধা জানবেন।

আপনার একান্ত
তুয়ান-শেঙ চেন

পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু,
এলাহাবাদ, ইণ্ডিয়া

৩৪০ মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক লিখিত

২৪শে এপ্রিল ১৯৪২
ওয়ার্ধা

(মূল চিঠি হিন্দীতে লেখা)

প্রিয় জওহরলাল,

আমার যে একটা কিছু করা নিতান্ত দরকার তা মীরা বেন্‌ও বুঝতে পেরেছেন এবং এজন্যে তিনি ত্যাগ স্বীকারেও রাজী। আমি না গেলেও তিনি এলাহাবাদে যেতে প্রস্তুত হয়েছেন তাই ওঁকে এখানে ডেকে এনেছি। আমার অভিমত একটি প্রস্তাবাকারে ওঁর মারফত পাঠাচ্ছি। মৌলানা সাহেবের খুব ইচ্ছা ছিল আমি এলাহাবাদে যাই। কিন্তু আমার অক্ষমতা আমি তাকে জানিয়ে দিয়েছি। আজকাল যাতায়াত আমার পক্ষে কষ্টকর হয়ে দাঁড়িয়েছে। তা ছাড়া ঐ সময়েই আমি তিনটি সভা আহ্বান করেছি। মৌলানাকে লিখছি তিনি যেন আমাকে মাপ করেন। তাঁকে জানিয়েছি যে আমার অভিমত আমি একটি প্রস্তাবাকারে পাঠাব। আমার প্রস্তাবের সমর্থনে কোনো যুক্তি প্রদর্শনের প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না। আমার প্রস্তাব যদি তোমাদের মনোমত না হয় আমি তা নিয়ে তোমাদের উপর জোর করতে পারব না। এখন আমাদের প্রত্যেকের নিজ নিজ কর্মপন্থা বেছে নেবার সময় এসেছে।

ফেনী এবং অন্যান্য স্থানে গভর্ণমেণ্টের আচরণ অসহ্য হয়ে উঠেছে। এই গবর্ণমেণ্ট যদি কোন রকমে টিকেও থাকে তা বলেই বা কী করতে পারবে? আর এখন তো কেবল টিঁকে থাকবার জন্যেই প্রাণপণ চেষ্টা করছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এই গবর্ণমেণ্ট চলে গেলে আমরা নিজেরাই জাপানীদের সঙ্গে সাধ্যমত বোঝাপড়া করতে পারব। এই গবর্ণমেণ্ট অপসারিত হবার পরে আমরা নিজেদের মধ্যে হয়তো মারামারি কাটাকাটিও করতে পারি কিন্তু সেটা আলাদা কথা। সে যাই হোক আভ্যন্তরীণ বিরোধের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যে এই গবর্ণমেণ্টের সাহায্য কি আমাদের না হলেই নয়

রাজেন্দ্র দেব আমার প্রস্তাব দেখেছেন তাঁর পছন্দ হয়েছে।

আশীর্বাদক
বাপু

৩৪১ লুই জনসন কর্তৃক লিখিত

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্টের
ব্যক্তিগত প্রতিনিধির অফিস
নিউ দিল্লী,
১২ই মে, ১৯৪২

প্রিয় জওহরলাল

আমি খুব আগ্রহের সঙ্গে ব্যাক গ্রাউণ্ড নামক বইখানা পড়ছি। গত সপ্তাহ-

অনেকের মধ্যে এই আমার প্রথম বই নিয়ে বসা। কালই মাত্র হাসপাতাল থেকে বেরিয়েছি। আগামী শুক্র শনিবার নাগাদ স্ট্রাটোলাইনারে রওনা দেবার ইচ্ছা আছে – কিংবা, যেটা আগে আসবে সেটাতেই।

আপনি বিশ্রামার্থে ছুটিতে যাবার আগে সময় করে আমার সঙ্গে দেখা করেছেন, এতে আমি খুশি হয়েছি। আপনার ছুটি শান্তিপূর্ণ ও আনন্দময় হোক আপনার স্বাস্থ্যেরও উন্নতি হোক, এই প্রার্থনা। ছুটি থেকে ফিরে দিন কয়েকের মধ্যেই কোচিন হাউসের মারফতে আপনি আমার চিঠি পাবেন, আশা করি।

আপনার সঙ্গে সংযোগ আমার ভারতযাত্রাকে সার্থক করেছে। আমার দিক থেকে বলতে পারি, আমরা একেবারে নিশীথ রাত্রের অর্ণবপোতের ন্যায় পাশ কাটিয়ে যাব না। আপনার সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব যাতে স্থায়ী হবে এই আশাই আমি করব।

আন্তরিক শুভেচ্ছা জানবেন।

আপনার একান্ত
লুই জে

পণ্ডিত জহরলাল নেহরু,
নাগার (কুলু)

পুনশ্চ – প্লেনে করে দেশে যাবার পথে আমি 'রিভার ... ...' বইখানা পড়ব। বইখানার জন্যে আপনাকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

জার্মানদের আক্রমণ আজ শুরু হল। যুদ্ধটা এবার একটা চূড়ান্ত অবস্থায় এসে যাচ্ছে এবারে বোঝা যাবে যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হবে কি অংশগ্রহণেই চুকে যাবে।

আপনার সুহৃদ
লুই

৩৪২ জি. অধিকারী কর্তৃক লিখিত

৩রা মে ১৯৪২

প্রিয় পণ্ডিতজী,

এ আই সি সি অধিবেশনে যে সব প্রস্তাব গৃহীত হয় সে সম্পর্কে আমার কিছু বক্তব্য আছে তাই আপনাকে এই চিঠি লিখছি। আপনার সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয় নেই এবং দিল্লীতে ক্রিপসের সঙ্গে আলোচনা চলার সময় ... ... এবং সহকর্মী আপনার সঙ্গে দেখা করেছিলেন তারেই আপনি বেশি চেনেন। অবশ্য তাতে কিছু যায় আসে না।

এ আই সি সি অধিবেশনের ফলে যে অবস্থার উদ্ভব হয়েছে তাতে আমরা গভীর বিচলিত হয়েছি। আমাদের মনে হয় আপনাদের এই সব সিদ্ধান্তের দরুণ দেশ এবং জনসাধারণ আগের চেয়ে আজ আরও খারাপ অবস্থায় এসে পৌঁছেছে। আমি মনে করি, এই সব সিদ্ধান্ত আপনার ও মনোমত হয়নি। আমার ভুল হতে পারে, তবে মূল সরকারী প্রস্তাবের উপর আপনি শেষ বক্তৃতা যে সুরে করেছেন তাই থেকে আমার এই ধারণাই হয়েছে। ... ... আপনার বাগ্মীয় ব্যাখ্যাগত এবং আত্ম বিশ্লেষণমূলক সুদীর্ঘ ভূমিকা থেকেই আমার মনে এ ধারণা জন্মেছে। দেখা যাচ্ছে মূল প্রস্তাবটির উপর আপনি কয়েকটি সংশোধন প্রস্তাবও এনেছিলেন তার কয়েকটি গৃহীত হয়েছে কয়েকটি হয়নি। যারা এই সঙ্কটে দুপক্ষকে একই শ্রেণীর বলে মনে করেন তাদের প্রতি আপনি যে বড় কথা বলেছেন তা বেশ সমীচীন হয়েছিল।

ওটাই আসল কথা। প্রস্তাবে দু পক্ষকেই অবশ্য সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে বিচার

করা হয়েছে, দু শত্রুপক্ষের মধ্যে কোন পার্থক্য রাখেনি। সংশোধনী প্রস্তাবের ফলে মূল প্রস্তাবের কোনই রকমফের হয়নি। কিন্তু ক্রীপ্‌স্‌ দৌত্য ফেঁসে যাবার পরেই সাংবাদিক বৈঠকে আপনি যে চমৎকার বিবৃতি দিয়েছিলেন তার সঙ্গে এই প্রস্তাবটির মূল বক্তব্যের অনেক প্রভেদ। এটাই আমাদের ক্ষোভের কারণ; আর, এই সংকটকালে প্রত্যেক দেশপ্রেমিকই এর জন্যে দারুণ উদ্বেগ বোধ করবে।

জিনিসটা সম্ভবত আপনার নিজেরও মনঃপূত হয়নি। কিন্তু তবু উল্টে হয়তো আমাদের বলবেন, আচ্ছা, এছাড়া আর কিই বা করা যেত? আপনারা জনসাধারণের ব্রিটিশ-বিরোধী মনোভাব ধরণা করতে পারছেন না। তা নয়, কমরেড, আমরাও বুঝতে পারছি। এই প্রস্তাব এবং এ. আই. সি. সি'র কার্যাবলীর দরুণ ব্রিটিশ-বিরোধী মনোভাব অনেক বেড়ে গিয়েছে। পরিণামটা কি দাঁড়াবে, ভেবে দেখেছেন? আপনি কি মনে করেন এর ফলে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধীর সংখ্যা বাড়বে, কিম্বা লোকের মনে স্বাধীনতা স্পৃহা অথবা আত্মপ্রত্যয় বাড়বে? আমার তো তা মনে হয় না। বরং শত্রু যখন আমাদের গ্রামাঞ্চলে ঢুকে পড়বে তখন একদিকে আমাদের নিরপেক্ষতা অপরদিকে অতীতের অহিংস অসহযোগ আন্দোলন-পুষ্ট আমাদের ব্রিটিশ-বিরোধী মনোভাব জাপানীদের অনুকূলে যাবে, এবং দেশবাসীর মনে পরাজিতের মনোবৃত্তি জাগিয়ে তুলবে।

এই সংকটকালে এ. আই. সি. সি. জনসাধারণের নেতৃত্বের ভার গ্রহণ করেনি; তাদের না শুনিয়েছে কোন আশা ভরসার কথা, না পেরেছে কোন পথ বাৎলে দিতে। আপাতত কেবল ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাবের মাত্রাটা চড়িয়ে দিয়েছে। এই মাত্রাটা একটু থিতিয়ে গেলে দেখা যাবে পরাজিত মনোবৃত্তি ও জাপানী-প্রীতি আরো বেড়ে গেছে। অনেকে গোপনে জাপানীদের সাদর আহ্বান জানাতেও প্রস্তুত; মওলানা তাদের কথা বলেছেন। কংগ্রেসের অনুগামী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকের মধ্যে এই ভাবটা খুব ছড়িয়ে পড়েছে। বর্তমানে কংগ্রেসের যেরূপ পরিস্থিতি তাতে এই মনোভাব ক্রমশ আরো ছড়িয়ে পড়বে; ফলে আর কিছু না হোক, জনসাধারণের মনের অবক্ষয় হবে এবং কোমলভাবে বলতে গেলে, শত্রুকে বাধাদানের ক্ষমতা তারা হারাবে।

আমরা এখনও জাতীয় সরকার গঠন করতে পারিনি। প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাটা ভদ্রোচিত এবং কার্যকরী করবার মতো অস্ত্রশস্ত্র আমাদের নেই। এটা ঠিক। ব্রিটিশরাই এর জন্য দায়ী। কিন্তু তাই বলে জনসাধারণকে যদি বলা হয় যে আর কিছু করার নেই, আমরা আর জাতীয় সরকার গঠন করতে পারব না, আমরা অস্ত্রশস্ত্র যোগাড় করতে পারব না, সময়ও আর নেই, অহিংস জহর ব্রত পালন করা ছাড়া আমাদের আর গত্যন্তর নেই—তবে তো সেই দারুণ পরাজিত মনোবৃত্তিই প্রকাশ পেল! ইংরেজরা আমাদের জাতীয় সরকার গঠন করতে দেয়নি, অস্ত্রশস্ত্র দেয়নি, সুতরাং আমরা জনসাধারণকে তাদের একমাত্র হাতিয়ারও রেখে দিতে বলছি। যেহেতু ইংরেজরা আমাদের দেশ আমাদের রক্ষা করতে দেবে না, সুতরাং তাদের উপর আর জোর জবরদস্তি করে দরকার নেই, নিষ্ক্রিয় ভাবেই আমরা নিজেদের 'রক্ষা' করব—এই হল আমাদের নিরপেক্ষতা, এই হল আক্রমণকারীর সঙ্গে আমাদের অহিংস অসহযোগ! আবার, দেশ আক্রান্ত হলে ব্রিটিশের সঙ্গে একযোগে শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করতেও আমরা রাজী হব না! মনে হয়, এ যেন নিজের নাক কেটে নিজেরই যাত্রাভঙ্গ করা।

জানি না আমার বক্তব্য পরিষ্কার করে বলতে পেরেছি কিনা। আমি বলতে চাই, সংবাদপত্রে আপনার বিবৃতি আর এ. আই. সি. সি'র প্রস্তাব এই দুয়ের মধ্যে দুস্তর ব্যবধান। কংগ্রেসের মাঝারি (প্রাদেশিক) নেতারা জনসাধারণের কাছে এই প্রস্তাবটির কি ব্যাখ্যা করবেন, অধিবেশনের বিভিন্ন বক্তৃতা থেকেই তার পূর্বাভাষ পাওয়া

গিয়েছে। একজন বক্তা তো বলেছেনই জাপান ব্রিটিশ সরকাবেব শত্রু (যেন আমাদেব নয়!)। আমি ভীত হচ্ছি এটা কেবলমাত্র ব্যক্তিবিশেষেব বেফাঁস মন্তব্য নয়। এ হচ্ছে নিরপেক্ষতাব উৎকট প্রকাশ। অনেক কংগ্রেসসেবী প্রস্তাবটিব এই ব্যাখ্যাই কবেছেন। এরাই কি লোকেব মনে সাহস আনবে দেহে শক্তি জোগাবে? না ববং পবাজিতেব মনোভাবই এনে দেবে। শত্রুকে আন্তবিক ভাবে ঘৃণা কবতে পাবলে তবেই তাব বিরুদ্ধে সত্যিকাবেব লড়াই চলতে পাবে। দুদিন আগে মে দিবস উপলক্ষে স্ট্যালিন তাব দেশবাসীকে এ কথাটাই বলেছেন।

স্টালিনেব কাছ থেকে এই শিক্ষা গ্রহণ কবলে আমাদেব ভালই হবে বিশেষ কবে এই সংকটকালে। বর্তমানে আমাদেব সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন হলো শত্রুব বিরুদ্ধে দেশেব সর্বত্র জোব প্রচাববায় চালানো। জাপানীদেব বিরুদ্ধে নাৎসীদেব বিরুদ্ধে লোকেব মনে ঘৃণাব সঞ্চাব কবতে হবে বলতে হবে আমাদেব দেশের ওপব ওদেব লোভ আছে ওবা আমাদেব পদানত কবে বাখতে চায়। আপনি হয়তো প্রশ্ন কববেন এতে কি লাভ হবে? আমি বলব এব ফলে লোকেব মনে প্রতিবোধ ইচ্ছা জাগবে। সঙ্গে সঙ্গে পি ডি বি এবং অন্যান্য কর্মসংস্থাগুলি একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পবিচালিত হবে। পি ডি বিতে যোগ দেবাব জন্য স্বদেশানুবাগী সমর্থ লোকদের আহ্বান কবা হচ্ছে। অসামবিক প্রতিবোধবূপে অথবা বিপদকালীন ব্যবস্থাব জন্য পি ডি বিকে সুগঠিত এবং সংবদ্ধ কবা হচ্ছে। এদেব মধ্যে জাপান বিবোধী মনোভাব জাগাতে হবে এদেব বোঝাতে হবে যুদ্ধ যদি আমাদেব ঘাড়ে এসে পড়ে অর্থাৎ আমাদেব দেশ যদি আক্রান্ত হয় তাহলে আমাদেব কি বিপদ হবে। ঠিকমত বোঝাতে পাবলে এবাই পবে প্রতিবোধ বাহিনী কিম্বা গেবিলা বাহিনীতে পবিণত হবে। আমাদেব দৃঢ় বিশ্বাস ইংবেজব না দিলেও লোকেব হাতে অস্ত্রশস্ত্র এসে যাবে। আসল কথা হলো লোকেব মনে দৃঢ়ভাবে জাপান বিবোধী মনোভাব গড়ে তোলা। ঠিক যেমন ১৯৩৭ সালের অগে চীনা জাববাসীবা কবেছিল। নিবপেক্ষতাব কথা বলে ওদেব মন বিষিয়ে দেবেন না। ওতে পবাজিত মনোভাব জাগিয়ে তোলে। আমাদের দলেব যুবকেবা পি ডি বিতে যোগ দিচ্ছে কিন্তু দেখতে পাচ্ছি যেহেতু তাবা জাপান বিবোধী আন্দোলন কবছে এ যুদ্ধকে এ ছে জনযুদ্ধ আমাদেব দেশেব স্বাধীনতা যুদ্ধ তাই তাদেব ওখান থেকে তাড়িয়ে দেবাব চেষ্টা হচ্ছে। এ আই সি সিব প্রস্তাবে সেটা আবো জোব পাবে।

এই অধিবেশনে আবো যেসব বাজনৈতিক প্রশ্ন আলোচিত হচ্ছে আমি ইচ্ছে কবেই সে সম্পর্ক কিছু বলিনি। প্রস্তাবটা সম্পর্কে লোকেব মনে ধাবণা হচ্ছে সেটাই আপনাব নজবে আনা আমাব একমাত্র উদ্দেশ্য। কেননা আমি মনে কবি কথাটি আপনাব মনে লাগতে পাবে এবং যাতে প্রস্তাবেব সম্ভাব্য ক্ষতিকব পবিণামগুলো এড়ানো যায় সেজন্যে আপনি হয়ত বা সংবাদ আদান প্রদান কবতে পাবেন। এ ছাড়া আমবা জানতে চাই যে সব কংগ্রেস সদস্য দেশেব ভালব জন্য জাপান বিবোধী প্রচাবকার্য চালাবে অথবা সবটাই জনসাধাবণকে বুঝিয়ে দেবে কংগ্রেস থেকে তাদেব তাড়িয়ে দেওয়া হবে কিনা। কিছু কর্মী কিষাণ এবং ছাত্র নিবপেক্ষতাব বিরুদ্ধে জোব প্রচাবকার্য চালাবে পবাজিত মনোভাবেব বিরুদ্ধে লড়বে। কিন্তু যে সকল কংগ্রেসী ওদের সঙ্গে যোগ দেবে তাদেব কি তাড়িয়ে দেওয়া হবে? এসব প্রশ্নই আমাব মনে জাগছে। সুতবাং উৎকট বকম নিবপেক্ষ মনোভাবেব দিক থেকে যাতে এই প্রস্তাবেব ব্যাখ্যা কবা না হয় সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া বিশেষ প্রয়োজন। জনসাধারণকে যাবা মনের দিক থেকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করতে চেষ্টা করছে আক্রমণ-কারীকে প্রতিবোধ কববার উদ্দেশ্যে লোক সংগ্রহ কবছে এই প্রস্তাব তাদেব কাছে

যেন বাধা না জন্মায়।

মতবিরোধ যতই থাকুক না কেন, একটা বিষয়ে আমাদের মতৈক্য থাকা দরকার। সেটা হচ্ছে, লোকের মনে জাপান-বিরোধী এবং যে কোন প্রকারে জাতীয় মনোভাব জাগিয়ে তোলা। দেশের জনসাধারণ হাতের কাছে যে অস্ত্র পাবে তা দিয়েই আক্রমণকারীকে বাধা দেবে এবং প্রতিরোধকারী বিভিন্ন দল ব্রিটিশ সৈন্যের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করবে। এইরূপ ভাবে যদি কাজ চলে সে তো কয়েকটা জায়গায় মাত্র হবে, এবং গুটিকতক দলই তা করবে। তা হলেও ঐ গুটিকতক লোকের সম্মানজনক মৃত্যুবরণই আমাদের এতকালের নিরস্ত্র অবস্থার— যার জন্যে আমরা অনেক কাল ধরে বিলাপ করে আসছি—সকল লজ্জা মুছে দেবে। কম্যুনিস্টরা যে যুদ্ধপ্রচেষ্টায় সহযোগিতা করার কথা কিম্বা সৈন্য সংগ্রহের কথা বলে আপনার তা পছন্দ না হতে পারে। কিন্তু এই যুদ্ধ প্রচেষ্টা আক্রমণকারীকে ঘায়েল করছে জনসাধারণকেও রক্ষা করছে, মনে রাখবেন কম্যুনিস্টরা জ্বলন্ত দেশপ্রেমের থেকেই এটা করছে। ব্রিটিশবিরোধী বক্তৃতা এবং নিরপেক্ষতা এই দুয়েরই মূলে হলো পরাজিত মনোবৃত্তি। কেবল তাই নয়, এর ফলে জনগণের মধ্যেও এই মনোভাব বিষের মতো ছড়িয়ে পড়বে। এতে আর যাই হোক, দেশের স্বদেশানুরাগীর জন্ম হবে না এবং নতুন শত্রু, নয়া সাম্রাজ্যবাদীই তার সর্বনেশে ফসল ফলাবে।

তাই আপনার কাছে নিবেদন দেখবেন ফ্যাসি পন্থীরা যেন এই প্রস্তাবের সুযোগ না নেয়।

সাংবাদিক বৈঠকে এবং পরবর্তী বিবৃতিতে আপনি যে মনোভাব প্রকাশ করেছেন সেই অনুযায়ী—অর্থাৎ গেরিলা যুদ্ধ এবং পোড়া মাটির কথা মনে রেখেই যেন এই প্রস্তাব কার্যে পরিণত করা হয়।

চিঠিটা বেজায় লম্বা এবং অসংলগ্ন হয়ে পড়ল, ক্ষমা করবেন। আমাদের মহৎ জাতীয় প্রতিষ্ঠানের শীর্ষস্থানীয় নেতা আপনি এবং ইচ্ছা করলে আপনিই এ আই সি সি-র প্রস্তাবের মারাত্মক পরিণামটার প্রতিকার করতে পারেন, তাই একজন দেশপ্রেমিক হিসাবে আমি আপনার কাছে এইটুকু অনুরোধ জানাচ্ছি।

আপনার

জি অধিকারী[১]

[১] জি অধিকারী ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টির অন্যতম নেতা।

৩৪৩ আবুল কালাম আজাদ কর্তৃক লিখিত

কলিকাতা,

১৩ই মে, ১৯৪২

প্রিয় জওহরলাল

দিল্লী থেকে আমাকে যে চিঠি ও টেলিগ্রাম পাঠিয়েছেন সে জন্যে আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। খেয়াল করবেন, আমি লিখছি—'আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি', শুধু 'ধন্যবাদ' কথাটা লিখিনি। এ দুটো কথার মধ্যে একটা সূক্ষ্ম প্রভেদ আছে, আপনি দিল্লীতে আমাকে বলেছিলেন, আমি সেই প্রভেদটুকু রক্ষা করেছি।

কিদোয়াইএর কাছ থেকে এক চিঠি পেয়েছি, পালিওয়ালও তার করে জানিয়েছেন শিশুদের অপসারণ ব্যাপারে তিনি প্রস্তুত আছেন। বাংলা সরকারের সঙ্গে এই সম্পর্কে একটা বন্দোবস্ত করছি। কথাবার্তা নির্দিষ্ট প্রান্তে এলেই আমি যুক্ত প্রদেশের বন্ধুদের জানাব।

কোন বিশেষ উপলক্ষে যদি আপনার এখানে আসার প্রয়োজন হয় তবে সে সুযোগ কোনমতেই ছাড়বেন না। আমার বিশ্বাস, ভারতবর্ষ, আমেরিকা এবং ইংলণ্ডে এমন জনকয়েক লোক আছেন যাদের একটা ঘরে একত্র করা গেলে তারা ভারতের সমস্যার একটা সমাধান—অন্তত কাছাকাছি সমাধানের উপায় বের করতে পারেন; তাতে আপনাদের পক্ষে, গ্রেট বৃটেনের পক্ষে এবং আমাদের পক্ষেও একত্রে বন্ধুভাবে বাস করা সহজ হয়, যাতে ভবিষ্যত মানবের জীবন সুন্দরতর এবং মসৃনতর হতে পারে। আমি যাদের কথা ভাবছি তাঁদের মধ্যে দুজন নিঃসন্দেহে পণ্ডিত নেহরু আর প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট। জানিনে, আপনারা একজন আর একজনকে পছন্দ করবেন কিনা। পছন্দটা নির্ভর করে জানাশোনার উপরে। আপনারা দুজন যে ভাষায় কথা বলবেন সেটা নিশ্চয়ই ঊনবিংশ শতাব্দীর ভাষা হবে না। আমাদের প্রেসিডেণ্ট অনেক সময় বড় রকমের ভুল করেছেন, (একথা বলা অবশ্য আমার পক্ষে বেআদপি)। কিন্তু তথাপি তিনি ঠিক রাস্তায় চলেছেন। যদি কখনো ভুল করেই থাকেন, তাও ঠিক পথেই করেছেন আর সেটাই হল আসল কথা। আমার বিশ্বাস আপনারা দুটি জনে পরস্পরকে মুগ্ধ করতে পারবেন। আর যেটা সবচেয়ে বেশি দরকার —মূল বিষয় থেকে আপনাদের দৃষ্টি বিস্মৃত হবে না। যাক, যথেষ্ট হয়েছে: আপনি যদি ভাল মনে না করেন আসবেন না, অন্যে যাই বলুক না কেন। আর অন্যে ভাল মনে না করলে আপনিও নিশ্চয় ভাল মনে করবেন না।

ভারতের আজ সকালের এবং এ সপ্তাহের খবর কি ভাল মনে করছেন? আমি বড় বড় কল ভাঙ্গেল কথা বলছি। অবশ্য এ সবের মানে কি বুঝতে পারছিনে, চট্টগ্রামে জাপানী আক্রমণ ভারতের ভিতরে ও বাইরে কি সূচনা করে তাও আন্দাজ করতে পারিনে।

কুশলে থাকুন। গায়ে পড়ে আপনাকে উপদেশ ও ইঙ্গিত দিলাম, মাফ করবেন। মন আবার অস্থির হয়ে আছে। ভাবছি, অস্ট্রেলিয়া যাব। নমস্কার।

ক্লেয়ার লুস

৩৪৫ এস, এইচ, শেন কর্তৃক লিখিত

নিউ দিল্লী
১৬ই, জুন, ১৯৪২

প্রিয় পণ্ডিত নেহরু,

জেনারেলিসিমোকে লেখা মহাত্মা গান্ধীর একখানি চিঠি তাকে পাঠিয়ে দেবার জন্যে আপনি আমাকে ১৪ জুন যে চিঠি দিয়েছেন ডাঃ মেননের কাছ থেকে আমি তা যথা সময়ে পেয়েছি।

গান্ধীজীর চিঠি এবং সেই সঙ্গে আপনার চিঠিটাও মাদাম চিয়াংএর নিকট পৌঁছে দেবার ভার দিয়েছি জেনারেল লোংসো ইনের উপর। ইনি ব্রহ্মদেশে আমাদের অভিযাত্রী সেনাদলের প্রধান সেনাপতি। জেনারেলিসিমোর সঙ্গে দেখা করবার জন্যে লোংসো ইন কাল দিল্লী থেকে চুংকিং যাবেন। তা ছাড়া, আমি খবরটা সাঙ্কেতিক ভাষায় টেলিগ্রাম করে দিয়েছি, জেনারেলিসিমো অবিলম্বে তা পেয়ে যাবেন আশা করি।

ইত্যবসরে মহাত্মা গান্ধীর চিঠিটা আমি পড়ে দেখেছি। অবশ্য, আমার পক্ষে অনধিকার চর্চা হয়েছে। যা হোক, ভারতবর্ষকে অবিলম্বে স্বাধীনতা দেওয়া যে ন্যায়সঙ্গত মহাত্মা গান্ধী এই চিঠিতে অকাট্য যুক্তি দ্বারা তা সপ্রমাণ করেছেন; তা ছাড়া, চীনের পক্ষে ক্ষতিকর হবে, কিংবা ভারতে ও চীনে জাপানী আক্রমণের সহায় হয়, এমন কিছুই না করার দৃঢ় সংকল্পও প্রকাশ করেছেন। আমি মনে করি যিনিই

খোলা মন নিযে এবং নিবপেক্ষভাবে এই চিঠি পড়বেন তিনিই এই দ্ বিষয নিঃসন্দেহ হবেন।

যে আন্দোলন শুবু কবাব কথা ভাবছেন তা যদি ঠিক ভাবে চালাতে পাবেন তা হলে সমগ্র চীন জাতিব সহানুভূতি ও নৈতিক সমর্থন নিশ্চযই পাবেন এবং আমাব দৃঢ় বিশ্বাস আন্দোলনও সফল হবে আপনাবা আপনাদেব ন্যায্য মুক্তি ও স্বাধীনতা লাভ কববেন।

আপনি কবে দিল্লী আসবেন সেই অপেক্ষায আছি। এই সংকটকালে বিভিন্ন জবুবী সমস্যাগুলোব কি হচ্ছে না হচ্ছে আপনাব কাছে তা জানবাব জন্যে উদ্গ্রীব হযে আছি।

আপনাব একান্ত
এস এইচ সেন

পণ্ডিত জহবলাল নেহব
বোম্বাই

৩৪৬ জওহরলাল নেহরু কর্তৃক ল্যাম্পটন বেরীকে লিখিত

২৩শে জুন ১৯৪২

প্রিয মিঃ বেবী,

কর্ণেল জনসনেব বার্তা [illegible] আপনি ২০শে জুন যে চিঠি লিখেছেন সে জন্যে ধন্যবাদ। তাব বক্তব্য জেনে খুশী হলাম। মিঃ [illegible] লিসেব বক্তৃতাটাও আমি আগ্রহের সঙ্গে পড়েছি। কর্ণেল জনসনেব শাবীবিক অবস্থা ক্রমশ ভালোব দিকে যাচ্ছে জেনে আশ্বস্ত হলাম। [illegible] আশা কবি তিনি [illegible] সম্পূর্ণ সুস্থ ও কর্মক্ষম হযে উঠবেন। [illegible] আমাব আন্তবিক শুভেচ্ছা জানাবেন আব [illegible] আমি তাব কথা প্রাযই ভাবি।

আমি [illegible] বুঝতে পাবি [illegible] প্রতিক্রিয়া [illegible] ভুল ধাবণাব সৃষ্টি হযেছে [illegible] আশা কবি তাব পববর্তী বিবৃতিগুলোতে সেই ভুল ধাবণা দূব হযেছে। এবটা [illegible] নিঃসংশয হতে পাবেন। জাপানীদেব ভাবত আক্রমণে ও [illegible] তাব সর্ববকমে প্রতিবোধ [illegible] ইচ্ছা নয ভাবতীয জাপানীদেব কাছে [illegible] এবং আক্রমণে বাধা দেবাব জন্যেই লোককে উদ্বুদ্ধ কবতে চান। [illegible] এখানে ইংবেজ [illegible] যে নীতি অনুসবণ কবছে [illegible] ফল হচ্ছে উল্টো। লোক এমন [illegible] গেছে যে তাবা বর্তমান অবস্থাব যেমন হোক একটা পবিবর্তন চায যদি খাবাপও হয তাও সই। মিঃ গান্ধী এতে ক্ষুব্ধ। লোকেব মনে এবকম বিরূপ ভাব থাকা ভাল নয এবং বিপজ্জনক, তিনি তাদেব মন থেকে এই ভাবটা দূব কবতে চেষ্টা কবছেন।

মালয এবং ব্রহ্মদেশে যা ঘটেছে [illegible] সাধেব মনে এই ধাবণা জন্মেছে যে এদেশে, বিশেষ কবে বাংলা দেশে জাপানী আক্রমণে বাধা দেবাব [illegible] বা ক্ষমতা ভাবতস্থ ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টেব নাই। বাংলাদেশেব শাসন কর্তৃপক্ষ [illegible] কর্মচাবীদেব মধ্যে গোপনীয সার্কুলাব জাবী কবেছে, তাতে কি ভাবে লোক অপসাবণেব ব্যবস্থা কবতে হবে কি ভাবেই বা উর্দ্ধতন কর্মচাবীবা অধস্তন কর্মচাবীদেব উপব ভাব দিযে সবে পড়বে তাব বিস্তৃত নির্দেশ দেওযা হযেছে। এমন কি, ঐ অধস্তন কর্মচাবীদেব বলা হযেছে শত্রুব আদেশানুযাযী নির্দ্দিষ্ট কাজ চালিযে যেতে। এটা বোধ কবি আন্তর্জাতিক আইন মাফিক ব্যবস্থা। এ ধবণেব নির্দেশ দিলে লোকেব মনে শত্রুকে বাধা দেবাব উৎসাহ জাগতে পাবে না, ববং পরাজিতের মনোভাব এসে যায়। মাস দুযেক আগে মাদ্রাজেব শাসন-কর্তৃপক্ষ যে কাণ্ডটা কবল তা

অদ্ভুত। জাপানীরা এসে পড়েছে শুনেই সব পালিয়ে গেল; পরে জানা গেল মিথ্যা গুজব।

বাংলাদেশের যদি পতন হয় তবে সমগ্র ভারতে তার একটা বিষম প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে। পরে কোন এক সময়ে শত্রুকে বাধা দেবার দৃঢ় ইচ্ছা থাকলেও তা কিছুমাত্র কাজ দেবে না। গ্রামাঞ্চলে অসামরিক শাসন ব্যবস্থাই হয়ত থাকবে না, সৈনিক সমাবেশ ত দূরের কথা। এবং তার ফলে নিশ্চয়ই যুদ্ধের অবস্থা খারাপ হতে বাধ্য।

আমেরিকা থেকে এরোপ্লেন এবং অন্যান্য সাহায্য পাওয়া গেছে বটে কিন্তু তাতে অবস্থার কতটা পরিবর্তন হয়েছে জানিনে। বস্তুত দু মাস আগে অবস্থা যা ছিল তার থেকে বিশেষ তফাৎ হয়েছে বলে মনে করি না। কোনো ভারতীয়ই এই অবস্থাটা সহজভাবে মেনে নিতে পারে না। এর অর্থ হচ্ছে, জাপানীরা ত প্রথমই প্রধান প্রধান কয়েকটি অঞ্চল দখল করে ফেলবে; আর তখন অন্যান্য স্থানে-ও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হবে। কিন্তু আমাদের মনে হয়, এটা বন্ধ করা যেতে পারে। অবশ্য, ঠিক সামরিক দিক থেকে দেখতে গেলে অদূর ভবিষ্যতে আমরা বিশেষ কিছু করতে পারব না; মিত্র শক্তির বলবিক্রমের উপরেই পুরোপুরি নির্ভর করতে হবে। কিন্তু আমি মনে করি, ভারতের স্বাধীনতা যদি স্বীকার করে নেওয়া হয় এবং একটা জাতীয় গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা করা হয়, তবে লোকের মনে বৈদ্যুতিক ক্রিয়া হবে, অবস্থারও বিলকুল পরিবর্তন হবে। দুর্ভাগ্যক্রমে জাপানীরা যদি দেশের কয়েকটি অঞ্চল দখলও করে, তাহলেও অন্যান্য অংশ তৎক্ষণাৎ ভেঙ্গে পড়বে না, বরং লোকে জোর বাধা দেবে, চীন দেশে যেমন হয়েছে। নিষ্ক্রিয় অবস্থায় নতি স্বীকার না করে তারা তখন উঠে পড়ে শত্রুর বিরোধিতা করবে।

সুতরাং ভারতের স্বাধীনতাই এখন একান্ত প্রয়োজন, যাতে মিত্রপক্ষের সঙ্গে একযোগে দেশরক্ষার ব্যবস্থা করা যায় এবং চীনকেও সাহায্য করা যায়। আজকের এই সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতেই বিষয়টা বিবেচনা করতে হবে।

আমরা যারা দায়িত্ব ঘাড়ে নিয়েছি, তারা অনেক সময় ব্যক্তিগত শক্তিতে যেটুকু কুলোচ্ছে ত করছি; কিন্তু কেবল মাত্র তাতেই চলে না। কাজ করবার জন্যে এবং জনমতকে ঠিক পথে চালানোর জন্যে আরো অনেক লোককে দলে টানা দরকার। আমি এই দিকে চেষ্টা করছি। কোনো শত্রুর আক্রমণের কাছে ভারত বশ্যতা স্বীকার করুক, এ আমি কোন মতেই চাইনে। আমি চাই অবিরাম ও স্বক্রিয় প্রতিরোধ। কিন্তু তাকে যদি সার্থক করতে হয় তবে ভারতে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের জায়গায় স্বাধীন জাতীয় গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা করতে হবে। বলা বাহুল্য, স্বাধীন সরকার দেশরক্ষার ব্যাপারে সামরিক বিলি-ব্যবস্থায় কোন প্রতিবন্ধক সৃষ্টি কখনো করবে না।

আমার আগের চিঠিতে আপনাকে লিখেছিলুম, জেনারেলিসিমোকে লিখিত মিঃ গান্ধীর চিঠি ২১শে' জুনের 'হরিজন' কাগজে প্রকাশ করা হবে। প্রায় শেষ মুহূর্তে খবর এল, জেনারেলিসিমোর ইচ্ছা ওটা যেন আপাতত প্রকাশ করা না হয়। কোন রকমে সেটা বন্ধ করা গেল বটে, কিন্তু কাগজের দশ হাজার কপি নষ্ট করতে হল।

আপনার একান্ত
জওহরলাল নেহরু

মিঃ ল্যাম্পটন বেরী
যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্টের ব্যক্তিগত
প্রতিনিধির অফিস; নিউ দিল্লী

৩৪৭ এস. এইচ. শেন কর্তৃক লিখিত

নিউ দিল্লী
২৫শে জুন, ১৯৪২

প্রিয় পণ্ডিত নেহরু,

আপনার ২৩শে জুন তারিখের চিঠি এই মাত্র পেলাম। মিঃ রঘুনন্দন শরণ লখনউ যাচ্ছেন, তাঁর মারফৎ আপনার চিঠির উত্তর পাঠাচ্ছি।

ইতঃপূর্বে ডাঃ মেননের মারফৎ যে চিঠি দিয়েছি তাতে লিখেছিলুম বটে, আপনি আবার কবে দিল্লী আসবেন এবং কবে আপনার কাছে সব জরুরী খবর শুনব, সেই অপেক্ষায় আছি, কিন্তু তাই বলে কখনো একথা বলতে চাইনি যে, অন্যত্র যেসব জরুরী আলোচনা হচ্ছে সেখানে না গিয়ে আপনি দিল্লী চলে আসুন। আপনাকে ঐ রকম বলা আমার পক্ষে নেহাৎ নির্বুদ্ধিতা এবং অবিবেচনার কাজ হত। আমার ত মনে হয়, মিসেস নেহরু আমার কথা ঠিক বুঝতে না পেরে আপনাকে এই খবর দিয়েছেন। যাহোক, যাতে আর এই ব্যাপার না ঘটে সে জন্যে ভাবছি ভবিষ্যতে আপনাকে নিজের নাম সই করে ব্যক্তিগত চিঠি পাঠাব। আশা করি, এই ব্যবস্থায় আপনি রাজী হবেন।

জেনে দুঃখিত হলাম, জেনারেলিসিমোর কাছে মহাত্মা গান্ধী যে চিঠি লিখেছিলেন শেষ পর্যন্ত "হরিজনে" সেটা প্রকাশ করতে না দেওয়ায় কাগজ বের করতে দেরি হয়েছে, অসুবিধাও হয়েছে। আমি কিন্তু ঐ চিঠির বয়ান টেলিগ্রামে জেনারেলিসিমোকে জানাতে কিছুমাত্র দেরি করিনি এবং আমি যতটা জানি, জেনারেলিসিমোও অবিলম্বেই চিঠি প্রকাশ বন্ধ রাখবার অনুরোধ জানিয়েছিলেন। যাহোক চিঠিখানার প্রকাশ বন্ধ করে দিয়ে আপনি জেনারেলিসিমোর অনুরোধ রক্ষায় সহায়তা করেছেন, সেজন্যে আপনাকে ধন্যবাদ। জেনারেলিসিমোও নিশ্চয় এর জন্যে কৃতজ্ঞ বোধ করছেন।

ওয়ার্ধায় কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির আগামী অধিবেশনে আপনার সাফল্য কামনা করি। এই গুরুত্বপূর্ণ অধিবেশনে যে সকল জরুরী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে, ফুরসৎ মতো চিঠি লিখে আমাকে তা জানাতে ভুলবেন না, আশা করি।

অপনার একান্ত
এস এইচ শেন

পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু,
লখনউ

৩৪৮ মাদাম চিয়াং কাই-সেক কর্তৃক লিখিত

জেনারেলিসিমোর হেড্ কোয়ার্টার্স, চীন
চুংকিঙ সেচুয়ান
২৬শে জুন, ১৯৪২

এই চিঠি আপনাকে গোপনীয় খবর দেবার জন্য লিখিত।

৮নং চিঠি

প্রিয় মিঃ নেহরু,

আপনার ৯নং চিঠি- প্রকৃতপক্ষে ১০নং পেয়েছি। যথাসময়ে চিঠি লিখতে পারিনি বলে আমি দুঃখিত। একে ত শরীরটা ভাল ছিল না, তার উপরে আবার কতকগুলো অত্যন্ত জরুরী ব্যাপারে এত ব্যস্ত থাকতে হয়েছিল যে মাথা খারাপ হয়ে যাবার দাখিল। কিছুদিন চুংকিঙও ছিলাম না; জেনারেলিসিমোর সঙ্গে চেংটু

যেতে হয়েছিল। সবে মাত্র ফিরে এসেছি। যাহোক, নানা সমস্যায় জড়িত থেকেও এবং নিজের অসুস্থতা সত্ত্বেও আপনার এবং ভারতের কথা আমি মুহূর্তের জন্যও ভুলিনি।

গান্ধীজীর চিঠি পেয়ে তৎক্ষণাৎ জেনারেলিসিমো ওয়াশিংটনে টেলিগ্রাম করে দিয়েছেন; বলেছেন, আমেরিকা ও চীনের একযোগে কাজ করতে হবে। জেনারেলিসিমো এখন গান্ধীর চিঠির জবাব দিচ্ছেন। ওঁর ইচ্ছা, আমি আপনাকে বুঝিয়ে বলি যে ওয়াশিংটনের সঙ্গে যে আলাপ আলোচনা চলছে তার ফলাফল না জানা পর্যন্ত আপনারা যেন গুরুতর কিছু না করে বসেন। অর্থাৎ, জেনারেলিসিমোর কাছ থেকে শেষ কথা না পেয়ে গান্ধী কিংবা কংগ্রেস যদি কোনো আন্দোলন শুরু করেন তবে সেটা নেহাৎ অবিবেচনার কাজ হবে।

অবশ্য এখনই তিনি শেষ কথা দিতে পারছেন না, তবে সঠিক খবর পেলেই তিনি আপনাদের জানাবেন। আন্দোলন একবার শুরু করলে তা আর থামানো যাবে না, এবং তার ফল বিষময় হতে বাধ্য। ভারতের জন্যে জেনারেলিসিমো তাঁর যথাসাধ্য করছেন। চীন থেকে ওয়াশিংটন এবং ওয়াশিংটন থেকে চীনে অনবরত টেলিগ্রাম আদান প্রদান হচ্ছে। মিঃ চার্চিল ওয়াশিংটনে যাচ্ছেন, ওখানে তাঁর উপস্থিতির সুযোগও নেওয়া যাবে আশা করছি।

ইতিমধ্যে এটা ঠিক জানবেন, ভারতের জন্যে যথাসাধ্য করবার আন্তরিক ইচ্ছা আমাদের দুজনেরই আছে। যদি কোন সুরাহা হবার সম্ভাবনা থাকে তবে সেটা যাতে অবিলম্বে হয় তার জন্যে চেষ্টার কোন ত্রুটি হবে না।

আন্তরিক শুভেচ্ছা জানবেন।

আপনার একান্ত
মেলিং সুঙ চিয়াং

পুনশ্চ ঃ গান্ধীজী যে চিঠি লিখেছেন তাতে দেখা যাচ্ছে তাঁর মতের কিছুটা পরিবর্তন হয়েছে, এতে যে আপনার কত বেশী প্রভাব আছে তা বুঝতে পারছি। আপনার মনে থাকতে পারে, সেবারে কলকাতায় যখন ওঁর সঙ্গে দেখা হয়েছিল, তখন সম্ভাব্য জাপানী আক্রমণের বিরুদ্ধে তিনি অহিংস অসহযোগ নীতি অবলম্বন করবার কথাই বলেছিলেন; আর, এখন তিনি বলছেন, জাপানীদের প্রতিরোধ করার প্রস্তাবে তার সায় আছে। তাঁর দিক থেকে এটা মস্ত বড় পরিবর্তন বলতে হবে।

কবে আমেরিকা যেতে পারব, জানি না। এখানে আমার অনেক কাজ রয়েছে। তাছাড়া পাকস্থলীর পুরোনো ঘাটাও আবার প্রায়ই চাড়া দিয়ে ওঠে; এ অবস্থায় ওখানকার গরম সহ্য করতে পারব বলে মনে হচ্ছে না। বলা যায় না, হয়ত শরৎকালের আগেই আমাদের চালু বিমান-পথ বন্ধ হয়ে যাবে, তোব্রাকের মতো মিশরের যদি পতন হয় তবে ত নিশ্চয়ই বন্ধ হবে। তখন হয়ত আমাকে রুশিয়া ঘুরে যেতে হবে। কিন্তু আপনি ত জানেন—হ্যাঁ জানেন নিশ্চয়ই, যদি সম্ভব হয় আমি ভারতবর্ষ হয়েই যাব যাতে আপনাকে এক পলক দেখে যেতে পারি।

শুভেচ্ছা রইল। বড্ড তাড়া—ইতি,

এম, এস, সি

মিঃ জওহরলাল নেহরু
ইণ্ডিয়া

৩৪৯ এস. এইচ. শেন কর্তৃক লিখিত

নিউ দিল্লী
৮ই জুলাই, ১৯৪২

প্রিয় পণ্ডিত নেহরু,

জেনারেলিসিমোর কাছ থেকে আমি নিম্নোক্ত টেলিগ্রামটি (চীনা ভাষায়) পেলাম:

"অনুগ্রহ করে পণ্ডিত নেহরুর মারফৎ মহাত্মা গান্ধীকে এই সংবাদ দিন যে লর্ড হ্যালিফাক্স (সম্প্রতি ইংলণ্ডে ছুটিতে আছেন) যুক্তরাষ্ট্র ত্যাগ করবার আগে ওয়াশিংটনে আমার প্রতিনিধিকে বলেছেন, ভারতের সমস্যা সমাধানের জন্য তিনি তাঁর গবর্ণমেণ্টর কাছে বিশেষ কয়েকটি প্রস্তাব পেশ করবেন, এবং যথাসময়ে তার ফলাফল আমার প্রতিনিধিকে জানাবেন। আমার ব্যক্তিগত পরামর্শ এই যে, সম্প্রতি লিবিয়াতে মিত্র শক্তি যেরূপ বিপর্যস্ত হয়েছে তাতে এখনই কোনো কঠোর পন্থা অবলম্বন করা কংগ্রেসের উচিত হবে না। যতটা সম্ভব ধৈর্য ধরে থাকতে হবে; কোনো সামরিক অভিযানে যেন বাধা সৃষ্টি করা না হয়, কেননা তার সঙ্গে সমগ্র মিত্র শক্তির মঙ্গলামঙ্গল জড়িত। তাহলে ভারতের প্রতি মিত্র শক্তি গোষ্ঠীর সকলের সহানুভূতি আরো বৃদ্ধি পাবে, ভারতের সমস্যার সমাধানও সহজ হবে।—চিয়াং কাই-সেক।"

অনুগ্রহ করে টেলিগ্রামটি মহাত্মা গান্ধীর কাছে পেশ করবেন। সেই সঙ্গে আমার শ্রদ্ধাও তাঁকে জানাবেন; ১৯৪০ সনের নবেম্বর মাসে ওঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার সৌভাগ্য হয়েছিল।

আপনাদের বর্তমান অধিবেশনের সাফল্য কামনা করি।

আপনার একান্ত
এস. এইচ. শেন

পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু
ওয়ার্ধা

৩৫০ ল্যাম্পটন বেরী কর্তৃক লিখিত

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্টের
ব্যক্তিগত প্রতিনিধির অফিস,
নিউ দিল্লী
৪ঠা আগস্ট, ১৯৪২

প্রিয় পণ্ডিত নেহরু,

এই মাত্র এয়ার মেলে কর্নেল জনসনের একখানি চিঠি পেলাম; বিশ্বস্ত লোকের মারফৎ চিঠিটা আপনাকে পাঠাচ্ছি।

আমার নিকট আমেরিকার সংবাদপত্রসমূহের যে সকল মন্তব্য আছে তা সবই এখানকার কাগজে বের হয়েছে, একথা আপনাকে আমি আগেই জানিয়েছি। আমি যতদূর জানি, স্থানীয় কাগজে আমেরিকার সংবাদপত্রাদির যে মতামত বের হয়েছে, সেটাই আমেরিকার প্রেসের সর্ববাদীসম্মত অভিমত।

আশা করি শেষ মুহূর্তে এমন একটা কিছু ঘটবে যার দরুণ কোন আন্দোলন শুরু করার প্রয়োজন হবে না, আর আমার বিশ্বাস, আপনারাও তার প্রয়োজন বোধ করবেন না।

আপনার একান্ত
ল্যাম্পটন বেরী

পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু
বোম্বাই

পুনশ্চ—পত্রবাহক এই পত্রে লিখিত বিষয় অবগত নয়।—এল. বি.

৩৫৯ ক্লেয়ার বুথ লুস কর্তৃক লিখিত

[এই চিঠিখানি প্রথমে মিঃ ওয়েন্ডেল উইল্কীর নিকট দেওয়া হয়েছিল। আমি তখন আমেদনগর ফোর্ট জেলে ছিলুম। অনেককাল পরে চিঠিখানা আমাকে পাঠানো হয়। সঙ্গের একটি চিরকুটে নিম্নলিখিত কথা ক'টি লেখা ছিল। ২রা নবেম্বর, ১৯৪২। চিঠিখানি এর মধ্যে একবার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে এসেছে। মিঃ উইল্কী আমেরিকা ছাড়বার সময় মিসেস লুস এই চিঠি তাঁর হাতে দিয়েছিলেন এখন মিঃ কুএর মারফৎ চিঠিটা আপনাকে পাঠানো হচ্ছে।]

গ্রীনউইচ
কনেকটিকাট,
২৫শে আগস্ট, ১৯৪২

প্রিয় জওহরলাল নেহরু,

মিঃ ওয়েন্ডেল উইল্কীর ন্যায় একজন মহামান্য দূতের মারফৎ এই চিঠি পাঠানো হচ্ছে, শেষ পর্যন্ত এই চিঠি যদি আপনার হাতে পৌঁছয় তবে মনে করব যুদ্ধে আমাদের জয়লাভ হবে। মিঃ ওয়েন্ডেল উইল্কী কর্তৃক এই চিঠি ভারতে বিলি হওয়ার বিশেষ গুরুত্ব আছে যেমন আমাদের জাতি সংঘের পক্ষে তেমনি আপনাদের ভারতীয়দের পক্ষে—কেননা তাহলে বোঝা যাবে যে অবশেষে আমাদের সমবোদ্যমের উদ্দেশ্য সম্পর্কে প্রকৃত সত্যানুসন্ধান শুরু হয়েছে। মিঃ উইল্কী কেবল যে একটি সংখ্যালঘু রাজনৈতিক দলের মুখপাত্র তা নয় পরন্তু তিনি মনে প্রাণে অধিকাংশ আমেরিকাবাসীর সাত্যকারের আদর্শ ও আশার প্রতীক।

অনেকের মুখে শুনেছি ভারতীয়রা আমেরিকা ও আমেরিকার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে খুব কমই জানবার সুযোগও নেই। ঠিক সেই রকম ভারতের সমস্যা সম্বন্ধেও সত্য কথাটা আমরা জানিনে। আমাদের এবং পৃথিবীর এক পঞ্চমাংশ অধিবাসীর মাঝখানে যে দুর্ভেদ্য ও সাংঘাতিক সেন্সরশিপের দেয়াল খাড়া করা হয়েছে তাতে দুপক্ষেই অজ্ঞতা বিদ্বেষ এবং ভুল বোঝাবুঝি থাকাটা স্বাভাবিক। মি. উইল্কীর আবির্ভাবে ঐ দেওয়ালে প্রথম বিরাট ভাঙ্গন দেখা দেবে এবং সেই ভাঙনের মধ্য দিয়ে হয়ত সত্যের স্রোত বইতে থাকবে। কিন্তু তিনি যদি নিরালায় আপনার সঙ্গে মুখোমুখি আলাপ করতে না পারেন তবে তাঁর ভারতে যাওয়া মিথ্যা হবে। এদেশে আমরা অনেকে আপনাকেই সমগ্র এশিয়ায় গণতন্ত্র ও জাতি সংঘের শ্রেষ্ঠ ও প্রকৃত সমর্থক বলে জানি। কিন্তু পাশ্চাত্য জগতে মিঃ উইল্কী যে সর্বশ্রেষ্ঠ ও বিশুদ্ধ সে কথা ভারতে ক'জন জানে। আপনাদের দুজনের সাক্ষাৎ গণতন্ত্র ও জাতি সংঘের পক্ষে নিশ্চয়ই ফলপ্রদ হবে। অবিশ্বাসীর মনেই কেবল এ বিষয়ে সন্দেহ জাগবে আমি কিন্তু নিঃসন্দেহ।

মিঃ উইল্কী বোমারু বিমানযোগে দীর্ঘ ভ্রমণে যাত্রা করছেন। এই চিঠি আপনার নিকট পৌঁছতে হয়তো কয়েকমাস লেগে যাবে অবশ্য আদৌ যদি পৌঁছয়। আমি মনে প্রাণে প্রার্থনা করছি এই চিঠি গিয়ে যেন আপনাকে সুস্থ ও নিরাপদ দেখে।

এই চিঠিতে যে আশা ব্যক্ত করা হয়েছে তা এত মহৎ যে তা ভাষায় প্রকাশ করতে আমি অক্ষম। প্রকাশের চেষ্টাও মূর্খতার নামান্তর।

আপনি জানেন সর্বত্রই কিছুসংখ্যক শুভবুদ্ধিসম্পন্ন নরনারী আছে। আমেরিকায় ভারতের এবং গ্রেট বৃটেনেও আছে। যুদ্ধ জয় এবং শান্তির উদ্দেশ্যে তারা একযোগে কাজ করতে ইচ্ছুক।

তাড়াহুড়া করে চিঠি লিখতে হল। গভীর শ্রদ্ধা জানবেন।

আপনার একান্ত
ক্লেয়ার বুথ লুস

৩৫২ আসফ আলী কর্তৃক লিখিত

[১৯৪২ সনের ৯ই আগস্ট কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি সদস্যগণকে গ্রেপ্তার করে ১৯৪৫ সনের ২৮শে মার্চ অবধি সবলকে এক সঙ্গে আমেদনগব ফোর্ট জেলে আটক রাখা হয়েছিল। পরে একে একে সকলকে যার যার প্রদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। ২৮শে মার্চ নরেন্দ্র দেব এবং আমাকেও ওখান থেকে নিয়ে পর-পর যুক্ত প্রদেশেরই কয়েকটি জেলে রাখা হয়। অন্যান্যেরা আমেদনগর ফোর্ট ত্যাগ করেন এপ্রিল মাসে। আসফ আলীকে স্থানান্তরিত করা হয় পাঞ্জাবের কোন এক জেলে। সেখান থেকে তিনি আমাকে নিম্নো চিঠি লিখেন। এতে তিনি আমার আমেদনগর ফোর্ট জেল থেকে চলে আসার কথা উল্লেখ করেছেন।]

সব জেল
গুরুদাসপুর (পাঞ্জাব)
৩০শে এপ্রিল ১৯৪৫

প্রিয় জওহর,

তোমার চলে যাওয়াটা আমার এবং মওলানার পক্ষে বড় মর্মান্তিক হয়েছিল। ভাল করে টের পেলাম পরের দিন সকালে। তারপর আমারও যখন চলে আসার সময় এল মওলানা স্পষ্ট মুষড়ে পড়লেন।

তোমাকে কত । যার দেবার আছে তার মত নেই। কিন্তু খবরের গুরুত্ব শূন্যের কোঠায় অবশ্য শূন্য বলতে বুঝি আধ্যাত্মিক শূন্য যে শূন্যতা থেকে সংসারের যাবতীয় জিনিসের এমন কি বিশ্বনিয়ন্তার উদ্ভব হয়েছে। এবার খবর-গুলো বলছি শোন ঃ

১। বোতলে রাখা তোমার লিখানা গাছটা তার শূন্যে বিলম্বিত শিকড় এবং শুকনো পাতাশুদ্ধ জেলের মালী পীরাকে দরাজ হস্তে দান করে এসেছি। লোকটা সত্যি শেষ দিন পর্যন্ত ভাল ব্যবহার করেছে। তুমি আমার উপরে কতকগুলো গোলাপ ফুলের ঝাড় দেখাশোনার ভার দিয়েছিলে মাচেণ্ড যখন আমাকে বিদায় সম্ভাষণ জানাতে এল আমি টব শুদ্ধ ওগুলো ওর হাতে তুলে দিয়ে দায় থেকে মুক্ত হলাম। পরে ছন্দর নিজে থেকেই গাছগুলো নিয়ে গিয়ে মর্চেণ্টের বাগানে পুঁতে দেবার ভার নেয়। কফি বুঝবটা আর চালু করা গেল না অস্থার অশাশত সভ্যতা অবশ্য একটু চেষ্টা করেছিল কিন্তু সেটা মুখে নয়। একে তো সংখ্যায় কম তাছাড়া আমাদেরও থাকা না থাকার কোন স্থির ছিল না সুতরাং নতুন কিছু করব কোন ভরসায়? তবে একটা কাজ আমি নিয়ম মতোই করে এসেছি শুষ্কপ্রায় ফল-গাছের কেয়ারিগুলোর তদারক করতে ভুলিনি। ব্যাডমিন্টন কোর্টটা ফাঁকা ফাঁকা ক্ষত-স্থানের মত হয়েছিল। বিক্ষত ভলিবল খেলাটা শেষ পর্যন্ত পুর্ণোদ্যমে চলেছে। ভাল কথা, আমার একপক্ষকালের পাওনা চিনি যাতে দিয়ে দেওয়া হয়েছিল, ঐ চিনিটা যাতে সবাইকে মুক্তহস্তে ভাগ করে দেওয়া হয়, আমার শেষ উইলে সেই কথাটা স্পষ্টতঃ বসিয়ে দিয়ে এসেছি। মওলানাকে করেছি সেই উইলের একমাত্র অছি। হাঁ বলতে ভুলেছি শেষদিকে কোথা থেকে একটা ছোট্ট নতুন বেরাল এসে জুটেছিল কচ্ছপের খোলার মত রং। ওটার জন্যে দ রেকাবি দুধের বরাদ্দ করতে যাব এমন সময়ে খেয়াল হল—আমার অবর্তমানে রেশনটা যদি না থাকে (বস্তুত থাকবার কথা নয়) তবে বেচারীর পক্ষে তিতে বিপরীত হবে তাই ইচ্ছা দমন করতে হল। 'পরলোক-গত'দের অংশ বাদ দিলে বাকী সব ব্যবস্থা যেমন ছিল তেমনি রয়েছে। 'ক্যারনের খেয়া নৌকো বেয়ে আমিও এখন পাতাল নদী বৈতরণীর অপর পারে এসে পৌঁচেছি।

২। কিন্তু আসবার পরে এমন ভোগান্তি হবে তা কখনো ভাবতেই পারিনি।

শরীরের উপর দিয়ে যথেষ্ট ধকল তো গেছেই, স্বাস্থ্যেরও অবনতি ঘটেছে। আমার কাজকর্ম, খাওয়াদাওয়া সব কিছুর একটা ধরাবাঁধা নিয়ম ছিল—সব একেবারে ওলট-পালট হয়ে গেল। দিল্লীতে গিয়ে যখন পে'ছিলাম তখন অনিদ্রায়, অনিয়মে শরীর মন ক্লান্তির চরম সীমায় এসে পেঁাচেছে। তারপর হঠাৎ দেখি কখন লৌহকারার অন্তরালে এসে গিয়েছি। সমস্ত ব্যাপারটা মনে একটা ক্ষতের মতো হয়ে আছে।

৩। সংবাদপত্রে যথারীতি বেমালুম সব ভুল খবর বেরিয়েছে; কয়েকজন আত্মীয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎকালে আমার 'অশ্রুসজল নীরবতা' বিবরণ নিতান্তই কবিত্ব বলে মনে হচ্ছে। বুলাভাইয়ের উদ্দেশ্যে 'রাজনীতি-বহির্ভূত' যে বাণীর উল্লেখ ছিল তাতে অবশ্যই কল্পনার একটু আতিশয্য আছে। সর্বশেষে 'হৃদরোগের চমকপ্রদ খবরটা' একটা আন্দাজে অনুমান, খাটি সত্য নয় বটে কিন্তু খবরটাতে আর কিছু না হোক, দরদ প্রকাশ পেয়েছে। যাক, সংবাদপত্রের সম্বন্ধে কীই বা করা যায়; ওরা তো খবরের জন্য পাগল। সপ্তাহ দেড়েক কিংবা তারও পরে সরকারী ভাবে এর প্রতিবাদ বের হয়। কিন্তু অদৃষ্টের চাকার ন্যায় মুদ্রাযন্ত্রের চাকাও ধীরে ঘোরে, তবে পূর্বোক্ত চাকাটির ন্যায় সব কিছুকে পিষে গুড়ো করে দেয় কিনা জানি না।

৪। (সাবেকী আমলের সরকারী সেরেস্তায় দলিলপত্র কিংবা আইনের স্মারক-লিপির ধরণে প্যারাগ্রাফের নম্বর দিয়ে যাচ্ছি, মনে কিছু করবেন না।) অবশেষে এখানে এসে যখন পেঁাছলাম দেখা গেল পথে আমার ৪।৫ পাউন্ড ওজন কমে গিয়ে ১০০ কি ১০১ পাউন্ডে দাঁড়িয়েছে। মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা; তাছাড়া ভিতরের নানা রোগ, যা এতকাল চাপা ছিল সব মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। যাহোক, এর পরে শুরু হল নানা প্রয়োজনাদির বিলি ব্যবস্থা ব্যক্তিগত সুবিধা অসুবিধা মিলিয়ে মুহুর্মুহু ব্যবস্থাদির পরিবর্তন এবং সম্পূর্ণ নতুন জায়গায় নতুন আইন কানুন অনুযায়ী নিজেকে খাপ খাইযে নেবার চেষ্টা। এইভাবে কেন রকমে থিতিয়ে বলতে এবং কাজ চলবার মতো ব্যবস্থা করে নিতে পুরোপুরি একপক্ষকাল কেটে গেল।

৫। এখন আমার মনকে বিশ্রাম দিচ্ছি—মস্তিষ্কের খাটুনি বলতে গেলে বিলকুল বন্ধ। ভাগ্যিস হাতের কাজটা শেষ করে ফেলেছিলাম; আপাতত কাব্য সরস্বতীর কৃপাদৃষ্টি থেকে আমি বঞ্চিত। তুমি ত জান একটু এদিক সেদিক হলেই লিখবার প্রেরণা লোপ পেয়ে যায়। খেলাচ্ছলে আরেকটা রচনায় হাত দিয়েছিলাম; এগোচ্ছিল বেশ। কিন্তু গৌরচন্দ্রিকা করতেই শতাধিক স্তবক লেখা হয়ে গেল। আর তারপরেই স্থান পরিবর্তন। অনেক চেষ্টা করে দেখলুম, কিন্তু ও কাজটা এখানে কিছুতেই আর এগোল না। কাজেই এটার আশা ছাড়তে হল। তবে কখনো যদি মনটা ধাতুস্থ হয় তবে আগের অন্য একটা অসম্পূর্ণ লেখায় হাত দেবার চেষ্টা করব। আপাতত নতুন ব্যবস্থায় নিজেকে খাপ খাইয়ে নেবার চেষ্টাতেই নাজেহাল।

৬। এটা পাহাড়ের অধঃস্থিত অঞ্চল। রোরিকের বাড়িটা কাছাকাছি কোথাও হবে, এখান থেকে বরফে ঢাকা পাহাড় দেখা যাচ্ছে, বোধকরি এরই তলায় কোথাও। অবশ্য এটা নেহাৎই আমার আন্দাজ। পাঠানকোট থেকে এ জায়গাটা মাত্র কয়েক মাইলের পথ। হিমালয়ের স্কন্ধদেশ—অবশ্য এদিককার অংশটুকু—এখান থেকে পুরোপুরি দেখা যায়। এটা বরফে ঢাকা। এ যেন ঠিক গুলমার্গের নীচে কোথাও আছি, সামনে খিলেনমার্গ। কিন্তু আবহাওয়া ক্ষণে ক্ষণে বদলায়, এক এক সময়ে এমন অসম্ভব গরম যে দম বন্ধ হয়ে আসে। শীগ্গিরই একটা পাখা পাব আশা করছি। থাকি হাসপাতালের একটা অংশে—আদতে ওটা ভাঁড়ার ঘর। আমি আসবার পরে ওটা আমার জন্যে খালি করা হয়েছে। ঘরটাতে আমি একদম একলা। সবদিক দিয়ে বিবেচনা করে দেখলে এ ব্যবস্থা আমার পক্ষে ভালই হয়েছে। জেলখানাটি ছোট,

আমেদনগরের এলডিজ কোষাকের মতো আয়তন হবে। না, তার চেয়ে একটু বড়ই, কিন্তু আয়োজনের ত্রুটি নেই, শেকল, তালা, লোহকপাট ইত্যাদি ইত্যাদি সব সরঞ্জামই আছে। রোগীদের পোশাক রাখার জন্য এ ঘরে একটা তাক ছিল; এখন ওটা একাধারে আমার ড্রেসিং টেবিল এবং ভাঁড়ারের কাজ করছে; খাবারদাবার বাসনপত্র, বাক্সডেস্ক ও টুকিটাকি বাজে জিনিস সব কিছু ওখানে রাখছি; আর বলা বাহুল্য, যত মশার আড্ডা ওখানে। এও একটা নতুনত্ব। হলপ করে বলতে পারি মশা তোমার ওখানেও কিছু কিছু কম নেই! তবে বোধকরি মাছি এবং নানা জাতের চেনা অচেনা ছারপোকা ইত্যাদির হিসেব ধরলে আমারই জিত হবে। এই জেলে জেল-কয়েদিরাই আম, জাম, কুল গাছের খবরদারি করে; ফল মূল্যটা সংগ্রহ করে। ফুল অজস্র—তবে বাহারে রকমের ফুল কিছু নেই। চার সপ্তাহ হল আমাদের ছাড়াছাড়ি হয়েছে, সেই ক্ষতি পূরণের পক্ষে বোধকরি এই যথেষ্ট।

তুমি ও নরেন্দ্র দেব প্রীতি জানবে।

তোমার প্রীতিশীল
আসফ

পুনশ্চ—বই সম্পর্কে আমাদের যে চুক্তি হয়েছিল তা ভুলো না যেন। দিল্লী থেকে সাময়িক পত্র, পত্রিকাদি আনাবার ব্যবস্থা করছি। এখনো পর্যন্ত সব কিছুই অনিশ্চিত, ঠিক হয়ে এখনও বসতে পারিনি। রুজভেল্টের জন্য দুঃখ হচ্ছে। সানফ্রান্সিসকোতে স্বরূপ কি করছে না করছে সব লক্ষ্য করে যাচ্ছি। কিন্তু এখানকার খবরের কাগজগুলো একেবারে বাজে। আমি তাকে চিঠি লিখেছি।

৩৫৩ তেজ বাহাদুর সাপ্রু কর্তৃক লিখিত

মুসৌরি
১৫ই জুন, ১৯৪৫

দু একদিনের মধ্যেই তুমি এলাহাবাদে পৌঁছোবে, এরূপ অনুমান করছি। গত রাত্রে আমার এক বন্ধুর কাছে শুনলাম তোমাকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে, উনি রেডিয়োতে ভাইসরয়ের বক্তৃতা শুনেছিলেন। তোমার মুক্তিতে অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি, এই কথাটি জানাবার জন্যেই এই চিঠি। তোমাকে আন্তরিক সম্বর্ধনা জানাচ্ছি। আশা করছি তুমি যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে, তা দেশের পক্ষে মঙ্গলকর হবে।

খবরের কাগজে দেখেছিলুম, জেলে তোমার অল্প অল্প জ্বর হত। আশা করি তা আর নেই। কোনো একটা নির্জন স্থানে কিছুদিন বিশ্রাম নেওয়া একান্ত দরকার। কিন্তু আগামী কয়েক সপ্তাহ তো তোমার প্রচণ্ড খাটুনি যাবে বলে মনে হচ্ছে।

১৩ই জুন এখানে এসেছি আনন্দকে দেখতে। ওর স্বাস্থ্যের ক্রমশ উন্নতি হচ্ছে; এক আধটু আস্তে হাঁটা চলাও করতে পারে। আমি ২৫শে জুন অবধি এখানে আছি, তারপরে এলাহাবাদ যাব।

শুভেচ্ছা জানবে

প্রীতিশীল
তেজ বাহাদুর সাপ্রু

পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু
এলাহাবাদ

৩৫৪ এম. এন. সাহা কর্তৃক লিখিত

য়ুনিভার্সিটি সায়েন্স কলেজ
ডিপার্টমেণ্ট অফ ফিজিক্স
কলিকাতা, ১২ই আগষ্ট, ১৯৪৫

প্রিয় পণ্ডিতজী,

শ্রীনগর থেকে লেখা আপনার ২৮শে জুলাই তারিখের চিঠি পেয়ে খুব খুশি হয়েছি। আশা করি কাশ্মীরের স্বাস্থ্যকর আবহাওয়ায় এই কয় সপ্তাহে আপনার স্বাস্থ্যের কিছু উন্নতি হয়েছে, যদিচ খবরের কাগজ পড়ে মনে হচ্ছে আপনি বিশ্রামের তেমন অবকাশ পাননি।

আমি যে কোন সময়ে এলাহাবাদ যেতে প্রস্তুত, তবে আপনি কখন এলাহাবাদে আসছেন সেটা পূর্বাহ্ণে জানতে পারলে আমি এদিকে প্যাসেজের ব্যবস্থা করতে পারি। আজকাল ওটা পাওয়া বড় দুষ্কর। অন্তত ৪৮ ঘণ্টা আগে খবর পেলে প্যাসেজ যোগাড় করতে পারব বলে মনে করি। বলা বাহুল্য যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েট রাশিয়া ভ্রমণ করে আমার যে অভিজ্ঞতা হয়েছে তা আপনাকে বলবার জন্যে আমি উৎসুক হয়ে আছি।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আপনাকে ও মওলানা আজাদকে কমলা লেকচারার নিযুক্ত করেছেন। মওলানা ইংরেজি বলতে পারেন না এই অজুহাতে মুস্লিম লীগ সদস্যদের পক্ষ থেকে তাঁর বিরোধিতা করা হয়েছিল। যাহোক আপনি যদি আগষ্ট মাসে ঐ লেকচার দিতে পারেন, আমরা খুশি হব। বক্তৃতার বিষয় আপনিই ঠিক করবেন। যদি ইতিমধ্যে কিছু স্থির না করে থাকেন তবে আমি বলি আপনি ন্যাশনাল প্ল্যানিং বা জাতীয় পরিকল্পনা সম্বন্ধে বলুন।

কংগ্রেসের হাতে যদি ক্ষমতা আসে তবে তার প্রোগ্রাম বা কার্যক্রম এখনই ঘোষণা করা উচিত বলে আমি মনে করি। এখনকার প্রোগ্রাম নিতান্তই পুরোনো চিন্তাধারার সঙ্গে জড়িত যেমন চরকা, তাঁত, মধ্যযুগীয় প্রথায় শ্রেণী বিভাগ ইত্যাদি ইত্যাদি। দেশকে নতুন আদর্শে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। সেই আদর্শ হবে ভারতের জনগণের জীবনযাত্রা মান উন্নয়ন। তা করতে হলে বিজ্ঞানকে পূর্ণমাত্রায় কাজে লাগাতে হবে। খনিজ কৃষিজ রাসায়নিক শিল্পের মাধ্যমে শক্তি সম্পদের পূর্ণ ব্যবহার জল এবং ভূমির যৌথ ও বহুমুখী ব্যবহার এবং শ্রমের নতুন ভিত্তিতে সমাজের পুনর্গঠন এই হবে আমাদের কার্য পদ্ধতি।

নেচরে ও হিন্দুস্থান ষ্টাণ্ডার্ড এ প্রকাশিত আমার দুটি প্রবন্ধ এই সঙ্গে আপনাকে পাঠাচ্ছি। এ থেকে আপনি আমার মতামত জানতে পারবেন।

শ্রদ্ধা জানবেন।

আপনার একান্ত
এম এন সাহা

পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু
এলাহাবাদ

৩৫৫ এস. এইচ. শেন কর্তৃক লিখিত

রিপাব্লিক অব্ চায়নার
কমিশনারের অফিস, নিউ দিল্লী
১৫ই আগস্ট, ১৯৪৫

প্রিয় পণ্ডিত নেহরু,

সম্ভবত আপনার মনে আছে ১৯৪০ সনের শরৎকালে একজামিনেশন উয়ানের প্রেসিডেণ্ট মাননীয় ডাঃ তাই চি-তাওএর নেতৃত্বে একটি শুভেচ্ছা মিশন ভারতে

এসেছিল। আমি ঐ মিশনের একজন সদস্য ছিলাম। তার আগের বছর আপনি চীনদেশে গিয়েছিলেন, আমরা আসলে তারই রিটার্ণ ভিজিট দিতে এসেছিলুম।

কিন্তু আমরা যখন ভারতে এসে পৌঁছলাম দুর্ভাগ্যবশত তখন আপনার সঙ্গে দেখা করা আমাদের সম্ভব হল না। আপনার সঙ্গে দেখা না হওয়াতে নিরাশ হয়ে ডাঃ তাই একটি কবিতা লিখেছিলেন; কবিতাটি আপনাকে পৌঁছে দেবার জন্যে তিনি সেটি মিসেস পণ্ডিতের হাতে দিয়েছিলেন। মিসেস পণ্ডিত ওঁকে এলাহাবাদে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন।

ভারতের অবস্থার সাম্প্রতিক পরিবর্তনে ডাঃ তাই আমার মারফৎ আপনাকে এবং মওলানা আজাদকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন। ঐ সঙ্গে তিনি তাঁর অতি সুন্দর হস্তাক্ষরে ঐ কবিতাটির এক কপি আমাদের পাঠিয়েছেন; সুন্দর হাতের লেখার জন্য তাঁর খ্যাতি আছে।

আমি কবিতাটির ইংরেজি অনুবাদ করতে চেষ্টা করেছি, কিন্তু আপনি ত জানেন, কোন কবিতা, বিশেষ চীনা ভাষার কবিতা বিদেশী ভাষায় অনুবাদ করতে গেলেই তার আসল সৌন্দর্য নষ্ট হয়ে যায়।

শুভেচ্ছা জানবেন।

আপনার একান্ত
এস এইচ শেন

পণ্ডিত জহরলাল নেহরু

পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর প্রতি

বহু দূর পথ অতিক্রম করে এসেছিলাম তোমার দর্শন আশায়
ফিরতে হ'ল ব্যর্থ মনোরথ,
নিঃসঙ্গ নির্জনে তোমাকেই স্মরণ করি
আর তার মানবকল্যাণের জন্য দুঃখসম
যিনি দুঃখকে বরণ করেছেন নির্ভীক মনে
তিনিই ধন্য জীবনে।

তাই চি হাও

৩৫৬ গোবিন্দবল্লভ পন্থ কর্তৃক লিখিত

নৈনিতাল,
১৫ই আগস্ট ১৯৪৫

প্রিয় জওহরলালজী,

গগনবিহারীর চিঠি এবং আমার জবাবটা এই সঙ্গে পাঠাচ্ছি। প্রস্তাবটা আমার পছন্দ হয়নি, তাই আগে আপনাকে কিছু জানাইনি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত খবরের কাগজে দেখলাম বিষয়টা আপনি বিবেচনা করে দেখছেন। সিভিল এণ্ড মিলিটারী গেজেটের সংবাদদাতা ত স্পষ্টতঃই ও কথার উল্লেখ করেছে। তাই গগনবিহারীর প্রস্তাব আমি আপনার কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছি। এ সম্পর্কে আমার মতামতটা তার চিঠির জবাবেই আমি খোলাখুলি লিখেছি, সুতরাং পুনরোল্লেখ করবার দরকার বোধ করি না। ইংলণ্ডের শ্রমিক দলের প্রতি আমার তেমন মোহ নেই। শ্রমিক গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে কোন কোন বন্ধু আশায় আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠেছেন, আমি কিন্তু ঐ দলের নেতাদের কাছ থেকে বেশি কিছু আশা করিনে। অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে তাতে আশা করা যায় স্বয়ং এট্‌লীরও একটু টনক নড়বে। আগের নির্বিকার মনোভাব বজায় রাখা চলবে না। অদূর ভবিষ্যতে ল্যাস্কি ও শ্রমিকদলের অন্যান্য মুরুব্বীদের কাছ থেকে আপনি একটা আমন্ত্রণ পাবেন আশা করছি।

ক্রীপসের ভাবগতিকও আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না। সিমলা কনফারেন্স ফেঁসে যাবার পর তিনি যে বিবৃতি দিয়েছেন তাতে তাঁর মতলব সম্বন্ধে সন্দেহ হচ্ছে, এমন কি আশঙ্কার উদ্রেক করছে। ১৯৪২ সনের সেই ব্যর্থ প্রস্তাবের আলোচনা প্রসঙ্গে এবং অন্যান্য ব্যাপারে তাঁর যে মতিগতি দেখা গেল তাতে তাঁর কৃতিত্ব বা সুনাম বাড়েনি। আপনাকে ও জিন্নাকে দুজনকেই সমানভাবে খুশি করবার জন্যে তিনি যে রকম প্রাণপণ চেষ্টা করেছিলেন, তাতে যে কেবল তাঁর হিসেবি মনের পরিচয় পাওয়া গিয়েছে তা নয়, তাঁর বোকামিও প্রকাশ পেয়েছে। জিন্নার তুষ্টিসাধনের পেছনে কতটা চার্চিল, আমেরী ও লিনলিথগোর প্রভৃতির ব্যগ্রতা ছিল, আর কতটাই বা ছিল ওঁর নিজের, তা বলা যায় না। অবশ্য আজ তা নিয়ে আর মাথা ঘামাবার প্রয়োজন নেই। তাঁর এখনকার মনোভাবটাই বিবেচ্য। ভারতের ব্যাপারে তিনি নিশ্চয়ই যথেষ্ট প্রভাব খাটাতে চেষ্টা করবেন। কমন্স সভায় এখন শ্রমিক গবর্ণমেণ্টের বিপুল সংখ্যাধিক্য, এমন বর্তমান অবস্থায় ক্রীপস পূর্বেকার রূপ ব্যক্তিগত বা দলগত সমতা রক্ষার অদ্ভুত মনোভাব দ্বারা প্রভাবিত হবেন না আশা করি। আমি কিন্তু নিঃসন্দেহ হতে পারছিনে। ক্রীপস খামখেয়ালি ধরণের না হলেও সম্ভবত দুর্বোধ্য প্রকৃতির লোক।

কাশ্মীরে প্রায় মাসখানেক আপনার থাকা হবে। ওখানকার দৃশ্যাদি মনোরম, আবহাওয়া স্বাস্থ্যকর; কিছুটা বিশ্রামও পেয়েছেন: এতে আপনার স্বাস্থ্য ভাল হয়েছে আশা করি। আমেদনগরে যখন এক সঙ্গে ছিলাম, শেষের দিকে আমার আশঙ্কা হ'ত আপনার স্বাস্থ্য যেন ক্রমশ ভাঙছে। ঐ সময়ে আপনার কোন কাজে লাগতে পারিনি বলে নিজের অক্ষমতা ও অসহায়তার দরুণ স্বভাবতঃই মনঃকষ্ট ভোগ করেছি। আশা করি, আপনার শরীর এতদিনে ভাল হয়েছে এবং আপনার স্বাভাবিক স্বাস্থ্য ফিরে পেয়েছেন।

আমি আজকেই আলমোড়া রওনা হচ্ছি। সেখানে দিন পনের থাকব ভেবেছি।

প্রীতিশীল
জি বি. পন্থ

৩৫০ সি. শিন. হেন্‌ফ কর্তৃক লিখিত

রিপাব্লিক অব্ চায়নার
কমিশনারের অফিস, নিউ দিল্লী
২২শে আগস্ট, ১৯৪৫

প্রিয় পণ্ডিত নেহরু,

কমিশনার সম্প্রতি এখানে নেই, চুংকিঙ গিয়েছেন। তাঁর অনুপস্থিতিতে আমি জেনারেলিসিমোর আদেশক্রমে নিম্নোক্ত টেলিগ্রাফ আপনাকে পাঠাচ্ছি।

"জাপান আত্মসমর্পণ করাতে আপনি অভিনন্দন পাঠিয়েছেন, সেজন্যে আপনাকে ধন্যবাদ। আজকের এই জয়োল্লাসের দিনে চীনবাসীরা জাতি সংঘের উচ্চ আদর্শের প্রতি তাদের আস্থা জ্ঞাপন করছে এবং ভবিষ্যতের শান্তিরক্ষার কাজে নিজেদের নিয়োগ করছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ভবিষ্যতে চীন ও ভারতের মধ্যে প্রীতির বন্ধন আরো দৃঢ় হবে, এবং একটা নতুন জগৎ গড়ে তোলার কাজে এই দুই দেশের অধিবাসীরা যথেষ্ট সহায়তা করবে।—চিয়াং কাই-সেক"

অনুগ্রহ পূর্বক এ বিষয়ে অবহিত হউন।

আপনার একান্ত
সি. শিন. হেনফ (?)

পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু

৩৫৮ অরুণা আসফ আলী কর্তৃক লিখিত

৯ই নবেম্বর, ১৯৪৫

প্রিয় জওহরলালজী,

আপনি আমার প্রশংসা করে অনেক কথা বলেছেন, কিন্তু তা ব্যক্তিগত প্রশংসা নয় জানি, তাই আপনাকে ধন্যবাদ জানাবার প্রয়োজন বোধ করছিনে। গত তিন বছর ধরে অপেক্ষাকৃত অজ্ঞাত কর্মীরা যে বিদ্রোহ করেছে, আমি জানি আপনি তাদের সকলের প্রতিই এভাবে সম্মান দেখিয়েছেন।

সেবার যখন আপনি বোম্বাই এসেছিলেন, আশা করেছিলাম আমাকে ডেকে পাঠাবেন। আপনি নানা কাজে খুব ব্যস্ত ছিলেন বলে আমি আপনার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে বিশেষ চেষ্টা করিনি।

কাল আপনার সঙ্গে আমার আলোচনা হবে, আগে থেকে তার একটা আভাষ কি করে আপনাকে দেওয়া যায় তাই ভাবছিলাম। দয়া করে সঙ্গের এই চিঠিগুলো পড়ে দেখবেন -এর থেকে হয়ত আমার রাজনীতি সম্পর্কে আপনার একটা ধারণা হবে।

স্নেহের অরুণা

৩৫৯ মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক লিখিত

পুনা,
১৩ই নবেম্বর, ১৯৪৫

(মূল চিঠি হিন্দীতে লেখা)

প্রিয় জওহরলাল,

গতকাল আমাদের মধ্যে যে আলাপ আলোচনা হয়েছে তাতে খুশি হয়েছি। আলোচনা আরেকটু দীর্ঘ হ'তে পারলে ভালো হ'ত। এক বৈঠকে আলোচনা শেষ হতে পারে না তা বুঝতে পারি, আমাদের দুজনের একটু ঘন ঘন দেখা সাক্ষৎ হওয়া দরকার। আমার স্বভাবটই এরকম যে দৌড়ঝাপ করার মতো শারীরিক ক্ষমতা যদি আমার থাকত তবে তুমি যেখানেই থাকতে না কেন দোড়ে গিয়ে তোমাকে ধরতাম এবং দিন দুই প্রাণ খুলে কথাবার্তা বলে ফিরে আসতাম। আগে এরকমটা আমি করেছি। আমাদের দুজনের মতামত দুজনেরই ভালভাবে জানা থাকা দরকার, এবং আমাদের মতামত সম্বন্ধে অন্যদেরও স্পষ্ট ধারণা থাকা বাঞ্ছনীয়। এখন ঠিক যেমনটা আছে সে রকম মনের মিল যদি আমাদের বজায় থাকে তবে শেষ পর্যন্ত যদি মতের অমিলও হয় তাতে কিছু যাবে আসবে না। গত কালকার আলোচনা থেকে আমার এই ধারণা হয়েছে যে, আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে তেমন কোন পার্থক্য নেই। সেটা পরখ করে দেখবার জন্যে কালকের কথাবার্তা থেকে আমি কি বুঝেছি, সংক্ষেপে তার উল্লেখ করছি, কোথাও অসঙ্গতি থকলে শুধরে দিও।

১) তোমার মতে আসল প্রশ্নটা হল, কি করে লোকের মানসিক, অর্থাৎ রাজনৈতিক ও নৈতিক উন্নতি সাধন করা যায়। আমি তোমার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত।

২) এ ব্যাপারে সকলেরই সমান অধিকার ও সুযোগ থাকবে।

৩) অর্থাৎ, খাদ্য, পানীয় পোশাক পরিচ্ছদ এবং জীবন ধারণোপযোগী অন্যান্য ব্যবস্থায় সহর ও গ্রামবাসীদের মধ্যে একই মান বজায় রাখতে হবে। এই সমতা বজায় রাখবার জন্যে জীবনধারণের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি—যথা পরিধেয় বস্ত্র, খাদ্যদ্রব্য, বাসগৃহ জল, আলো ইত্যাদি—উৎপাদনের দায়িত্ব জনসাধারণকে নিতে হ'বে।

৪) পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে বাস করবার জন্যে মানুষের জন্ম হয়নি। মানুষ সামাজিক জীব—একাধারে স্বাধীন এবং পরস্পর নির্ভরশীল। একেবারে পরনির্ভর

হয়ে কেউ চলতে পারে না, উচিতও নয়। এ ধরণের জীবনের উপযোগী ব্যবস্থা যদি করতে হয় তবে এক একটি গ্রামকে সমাজের একটি খণ্ডাংশ হিসাবে ধরে নিতে হবে; কিংবা চাও তো একে কিছু সংখ্যক লোকের একটা গোষ্ঠী বলতে পার। একান্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির ব্যাপারে এই গোষ্ঠী বা গ্রাম স্বয়ং সম্পূর্ণ হবে; আবার বিভিন্ন গ্রামের বাসিন্দারা পরস্পর সহযোগিতা করবে ও পরস্পর নির্ভরশীল হবে।

যদি দেখি এই সব বিষয়ে তোমাকে আমি ঠিক বুঝতে পেরেছি, তবে পরের চিঠিতে অন্যান্য বিষয়গুলি আলোচনা করব।

তোমাকে আমি প্রথম যে চিঠিখানা লিখেছিলুম রাজকুমারীকে দিয়ে ইংরেজিতে তার অনুবাদ করিয়েছি। সেটা এখনো আমার কাছে আছে। এই চিঠিরও একটা ইংরেজি অনুবাদ এই সঙ্গে পাঠাচ্ছি। এতে দুটো উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে। ইংরেজি অনুবাদের মারফতে আমার বক্তব্য হয়তো একটু ভাল এবং স্পষ্ট করে তোমাকে বোঝাতে পারব; তা ছাড়া, আমি তোমাকে ঠিকমতো এবং পুরোপুরি বুঝতে পেরেছি কিনা তাও স্পষ্ট করে বুঝতে পারব।

ইন্দুকে আশীর্বাদ জানিও।

আশীর্বাদক
বাপু

৩৬০ স্যার ফ্রান্সিস ওয়াইলী কর্তৃক লিখিত

গভর্ণরের ক্যাম্প,
যুক্ত প্রদেশ
২২শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৬

গভর্ণর, যুক্ত প্রদেশ

প্রিয় পণ্ডিতজী,

আমাদের দুজনের কখনো দেখাসাক্ষাৎ হয়নি; সেটা অবশ্য আমার পক্ষেই ক্ষতির কারণ হয়েছে। কিন্তু আমাদের এমন অনেক বন্ধু আছেন যাঁরা আপনারও বন্ধু আমারও। তাছাড়া বহুদিন যাবৎ আপনার বইএর মধ্য দিয়েই আপনার সঙ্গে আমার পরিচয়। গত মাসে যখন এলাহাবাদে যাই তখন আমার খুব ইচ্ছা ছিল, আমাদের দুজনের দেখাসাক্ষাৎ হওয়া সম্ভব কিনা, সে কথাটা আপনার কাছ থেকে জেনে নি। কিন্তু অত্যন্ত বাজে এক পার্লামেণ্টারি ডেলিগেশন এবং আরো কয়েকটা তুচ্ছ কারণে তা আর হয়ে ওঠেনি। পরে বেচারী আগাথা হ্যারিসন নিজে থেকে লখনউ পর্যন্ত ধাওয়া করে এসে আমাকে সঙ্গে দেখা করেন এবং বলেন, যত শীঘ্র সম্ভব আমি যেন আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। অবশ্য এজন্যে আমাকে তাড়া দেবার কোন দরকার ছিল না; কিন্তু এখনে নানা কাজের ভীড়ে আপনার সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছাটা ইতিমধ্যে চাপা পড়ে গিয়েছিল। কিন্তু আগাথা চলে যাবার পরেই মনে হল, এ সম্বন্ধে একটা কিছু করা নেহাৎ দরকার। তক্ষুনি এলাহাবাদে ভেঙ্কটাচারকে টেলিফোন করে বললাম; অবিলম্বে যেন আপনার কাছ থেকে জেনে নেয়, আপনি তাঁর বাড়িতে আমার সঙ্গে দেখা করবেন কিনা; দ্বিতীয়ত, আপনার সঙ্গে দেখা করার উদ্দেশ্যে এলাহাবাদে গেলে তাঁর বাড়িতে আমার ও আমার ছেলের থাকার ব্যবস্থা হবে কিনা। কিন্তু কয়েক ঘণ্টা বাদে তাঁর কাছ থেকে যে জবাব পেলাম তাতে বড় নিরাশ হলাম,—আপনি নাকি এলাহাবাদে নাই, ২৩ তারিখের আগে আর ফিরবেন না, এবং ফিরেই আবার এক নির্বাচনী সফরে বেরিয়ে যাবেন।

আমি বুঝতে পারছি আমাদের দুজনের দেখা হওয়া একান্ত দরকার। বাস্তবিক

আমার প্রবল ধারণা, আমাদের মধ্যে একটা আলাপ আলোচনা হলে অনেক বিষয়ের সুরাহা হত। ঢেকে ঢুকে গোপনে সাক্ষাৎ করবার আমি পক্ষপাতী নই। এমনিতেই ত ঢাকাঢাকির ব্যাপার ঢের চলছে। না হক কতকগুলো কথা ঘটনা হয়, এ আমি ইচ্ছা করিনে। আপনি যদি নির্বাচনী সফরকালে কয়েক ঘণ্টার জন্যে লখনউ আসতে পারেন, ভাল, না হয় তো আপনার যেখানে সুবিধা হবে আমি সেখানেই যেতে রাজী।

বিশেষ বার্তাবাহক মারফৎ এই চিঠি পাঠাচ্ছি আশা করি আপনি এর হাতেই আমার চিঠির জবাব দিয়ে দেবেন।

আপনার একান্ত
এফ ডি ওয়াইলী

৩৬১ মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক লিখিত

[গান্ধীজীর এই চিঠি হিন্দীতে লেখা নীচে তার ইংরেজি অনুবাদ দেওয়া হল। দিল্লীতে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার বিরুদ্ধে তাঁর মনের অসন্তোষ প্রকাশের উদ্দেশ্যে তিনি অনশন করেছিলেন এবং তা বেশ কিছু দিন ধরে চলেছিল। যেদিন অনশন ভঙ্গ করেন সেদিনই এই চিঠি লেখেন।

দিল্লীর ঘটনাবলী এবং গান্ধীজীর অনশন আমাকে বিচলিত করে তুলেছিল, দু একদিন আমিও না খেয়ে ছিলাম। এটাকে ঠিক অনশন বলা চলে না কেবলটা আমার ব্যক্তিগত প্রতিক্রিয়া মাত্র কেউ সে কথা জানতেও না। কিন্তু যে কারণেই হোক গান্ধীজী তা জানতে পেরেছিলেন এবং সেটা বন্ধ করবার পরামর্শ দিয়ে এই চিঠি লিখেছিলেন।

চিঠিতে ভারতের জওহর কথাটির উল্লেখ আছে। আমার নাম জওহর ঐ শব্দটার মানে রত্ন তাই এস্থলে কথাটা ঐ অর্থে প্রয়োগ করা হয়েছে।

আমার কাছে লেখা এই তাঁর শেষ চিঠি। এর ঠিক বারো দিন পরে ১৯৪৮ সনের ৩০শে জানুয়ারী তারিখে এক আততায়ীর হাতে তিনি নিহত হন।]

১৮ই জানুয়ারী ১৯৪৮

প্রিয় জওহরলাল,

অনশন ত্যাগ কর।

পাকিস্তান পাঞ্জাবের স্পীকারের কাছ থেকে একখানা টেলিগ্রাম পেয়েছি তার একটা কপি এই সঙ্গে পাঠাচ্ছি। আমি তোমাকে যে কথাগুলো বলেছিলাম সৈয়দ হারুণ (?) দেখছি ঠিক সেই কথাগুলোই বলেছেন।

দীর্ঘায়ু হও এবং ভারতের জওহর হয়ে থাক। বাপুর আশীর্বাদ জেন

বাপু

পশ্চিম পাঞ্জাব বিধানসভার স্পীকারের টেলিগ্রাম

গত ১৩ই জানুয়ারী পশ্চিম পাঞ্জাবের বিধান সভায় আপনার নিঃস্বার্থ ও মহৎ উদ্দেশ্য প্রণোদিত অনশন সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে বিভিন্ন সদস্য যে বক্তৃতা করেছিলেন আমি আনন্দের সঙ্গে ঐ বক্তৃতাবলীর প্রাসঙ্গিক অংশ আপনার অবগতির জন্য পাঠাচ্ছি। এখানে যে সব উক্তির উল্লেখ করা হয়েছে, আমি এবং বিধানসভার সদস্যগণ তার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত।

মালিক মহম্মদ ফিরোজ খাঁ নুন: বিভিন্ন ধর্মগুরুদের কথা ছেড়ে দিলে মহাত্মা গান্ধীর চেয়ে মহত্তর ব্যক্তি পৃথিবীর কোন দেশে জন্মগ্রহণ করেননি।

অনারেবল মিঞা মহম্মদ মমতাজ খান দৌলতানা, অর্থমন্ত্রী: অনশনের দ্বারা মহাত্মা গান্ধী মুসলমানদের প্রতি তাঁর যে মনোভাব প্রকাশ করেছেন সেটা হৃদয়ঙ্গম

করা আমাদের একান্ত কর্তব্য। এতে প্রমাণ হল যে ভারতে অন্তত একজন লোকও আছেন যিনি হিন্দু-মুসলমানের মিলনের জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত। সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি যেন দীর্ঘদিন এই অনশন করার প্রয়োজন না হয়। এই পরিষদ ভবন থেকে আমি মহাত্মা গান্ধীকে এই বিশ্বাস দিচ্ছি যে সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তার ব্যাপারে আমরাও তাঁরই মনোভাব পোষণ করি।

অনারেবল খান ইফতিকার হুসেন খান, প্রধান মন্ত্রী ঃ মহাত্মা গান্ধী একটি মহৎ উদ্দেশ্যে অনশন করেছেন, এতে আমার এবং আমার সহযোগীদের পক্ষ থেকে আমি তাঁকে একান্তিক শ্রদ্ধা এবং অভিনন্দন জানাচ্ছি। তাঁর জন্যে আমরা বিশেষ উদ্বেগও বোধ করছি। তাঁর মূল্যবান জীবন রক্ষার জন্যে এই প্রদেশের পক্ষে যা করা সম্ভব তার ত্রুটি হবে না।

স্পীকার, পশ্চিম পাঞ্জাব বিধানসভা

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

বাপুকে আশীর্বাদ

২২-১-'৪৮

৩৬২ জওহরলাল নেহরু কর্তৃক জর্জ বার্ণার্ড শ'কে লিখিত

৪ঠা সেপ্টেম্বর, ১৯৪৮
নিউ দিল্লী

প্রিয় মিঃ শ,

কেন যে আপনাকে চিঠি লিখছি তা আমি নিজেই জানি না, কেননা, আমরা দুজনেই ব্যস্তসমস্ত মানুষ; তার উপরে আবার আপনার কাজ বাড়াতে চাই না। কিন্তু দেবদাস গান্ধীকে আপনি ১৬ই জুলাই তারিখে যে চিঠি লিখেছেন তার এক কপি তিনি আমাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন, ঐ চিঠিটি পড়েই আপনাকে চিঠি লেখার আগ্রহ হল।

৪০ বৎসর আগে যখন আমার বয়স ১৮ বছর ছিল এবং আমি কেম্ব্রিজে আণ্ডার-গ্র্যাজুয়েট ছাত্র ছিলাম, তখন ওখানে এক সভায় আপনার একটি বক্তৃতা শুনেছিলাম। তারপর আর এতকাল আপনাকে দেখিনি, চিঠিও লিখিনি কখনো। তথাপি এ যুগের অনেকেরই মত, আপনার রচনাবলীর সাহচযে আমরা বর্দ্ধিত হয়েছি। আমার ত মনে হয় আজ আমি যা হয়েছি তার কতকটা সেই পড়ার গুণে। অবশ্য এতে আপনার গৌরব বাড়বে কিনা তা আমি জানিনে।

একদিক থেকে বলতে গেলে, আমি বরাবরই আপনার সান্নিধ্য পেয়ে এসেছি। আর কিছু না হোক চিন্তার দিক থেকে তো বটেই। অনেক সময় ইচ্ছা হয়েছে আপনার নিকট-সংস্পর্শে আসি আপনার সঙ্গে দেখা করি, কিন্তু সুযোগ সুবিধা হয়ে ওঠেনি। আর তাছাড়া এই ভেবেছি যে আপনার গ্রন্থাবলী পড়লেই সব চেয়ে সহজে আপনার সান্নিধ্যে আসা যাবে।

গান্ধীর হত্যাকারীর সম্পর্কে আমাদের কি করা উচিত দেবদাস আপনার কাছ থেকে তা জানতে চেয়েছেন। আমার তো মনে হয় তার ফাঁসি হবে। অন্তত আমি তাকে বাঁচাতে চেষ্টা করব না, যদিও ইতিপূর্বে মৃত্যুদণ্ড রহিত করার পক্ষেই আমি মত প্রকাশ করেছি। কিন্তু এই ক্ষেত্রে উপায়ন্তর নেই। এমনিতেও সাধারণ অবস্থায় একটা লোককে ফাঁসি দেওয়ার চেয়ে ১৫।২০ বছর জেলে আটক রাখা শ্রেয় কিনা এ বিষয়ে আজ আমার মনে সন্দেহ জাগছে।

মানুষের জীবন এত সস্তা হয়ে হয়ে দাঁড়িয়েছে যে গোটাকতক অপরাধীর ফাঁসি হল বা না হল তাতে কিছু আসে যায় না। কখনো কখনো এমনও মনে হয়, বেঁচে থাকাটাই বুঝি সবচেয়ে কঠোর শাস্তি।

আমার যেসব দেশবাসী ভারতবর্ষ সম্পর্কে অভিমত চেয়ে পাঠিয়ে আপনাকে সময় সময় উত্ত্যক্ত করে তাদের হয়ে আমি ক্ষমা চাইছি। আমরা অনেকেই অপরের কাছ থেকে সুপারিশ আদায়ের পুরানো অভ্যাসটা এখনও ছাড়তে পারিনি। আমাদের নিজেদের উপর পুরোপুরি বিশ্বাস নেই বলেই হয়ত এটা হয়েছে। নানা ঘটনায় আমরা বিপর্যস্ত, ভবিষ্যত যতটা উজ্জ্বল হবে কল্পনা করেছিলাম ততটা হবে বলে মনে হচ্ছে না।

আগামী অক্টোবর মাসে দু'তিন সপ্তাহের জন্য আমি ইংলণ্ডে যেতে পারি। আপনার সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছা আছে। কিন্তু তাতে যদি আপনার দৈনন্দিন কাজ-কর্মে ব্যাঘাত ঘটে তবে অবশ্য যাব না। কোন সমস্যার উল্লেখ করে আপনাকে বিরত করবার ইচ্ছা নেই। অবশ্য, নানান সমস্যায় মন ভারাক্রান্ত এবং তার যথোচিত উত্তরও নেই; যদি বা সমাধান থাকে তাও আবার কার্যে পরিণত করা যায় না। কেননা, যে মানুষদের দিয়ে কাজ করাতে হবে তারাই অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। যদি কিছুক্ষণের

জন্যও আপনার সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ পাই—তবে সেই ক্ষণিকের স্মৃতিটুকু আমার পরম সম্পদ হয়ে থাকবে।

আপনার একান্ত
জওহরলাল নেহরু

জর্জ বার্নার্ড শ
এয়ট সেন্ট লরেন্স
উইলিন, হার্টস, ইংলন্ড

৩৬৩ জর্জ বার্ণার্ড শ কর্তৃক লিখিত

লণ্ডন
১৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৮

প্রিয় মিঃ নেহরু,

আমার রাজনীতি বিষয়ক রচনাবলীর সঙ্গে আপনি পরিচিত আছেন জেনে খুব খুশি হলাম। বলা বাহুল্য, আপনি আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এলে নিজেকে সম্মানিত মনে করব। কিন্তু আপনার মূল্যবান সময় থেকে একটা অপরাহ্ণ ব্যয় করে এই সুদূর পল্লী-গ্রামে আসা পোষাবে বলে আমি মনে করি না। কেননা বার্ণার্ড শ বলতে জরাগ্রস্ত পুরনো একটা কঙ্কাল মূর্তি ছাড়া আর কিছু এখন এখানে পাবেন না অনেক আগেই তার ধরাধাম থেকে বিদায় নেওয়া উচিত ছিল।

আমি একবার বোম্বাইতে সপ্তাহ খানেক, আর সিংহলে এক সপ্তাহ কাটিয়ে-ছিলাম। ভারতবর্ষ সম্পর্কে আমার সাক্ষাৎ জ্ঞান ঐ পর্যন্ত। আমার স্থির প্রতীতি হয়েছিল যে সিংহল মানবজাতির আদি স্থান, কেননা সেখানে প্রত্যেকটি মানুষকে আদি এবং অকৃত্রিম বলে মনে হল। অপর সকল জাতির লোকগুলিকে প্রত্যক্ষতই কারখানা ঘরের উৎপন্ন দ্রব্যের ন্যায় একই ছাঁচে ঢালাই দেখতে পাওয়া যায়।

যদিও ভারতবর্ষ সম্পর্কে আমার যা কিছু জ্ঞান তা সংবাদপত্রের মারফৎ, তথাপি নিরপেক্ষভাবে আমি ভারতবর্ষ সম্পর্কে বিবেচনা করতে পারি, যেহেতু আমি আইরিশ ইংরেজ নই। ইংরেজ শাসন থেকে মুক্তিলাভের দীর্ঘ সংগ্রাম সম্পর্কে আমাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আছে। দেশটাকে আয়ার ও উত্তর আয়র্লন্ড এই দুই ভাগে বিভক্ত হতে দেখেছি। পাশ্চাত্য জগতের এটি হ'ল হিন্দুস্থান আর পাকিস্থান। কেম্ব্রিজে আপনি যেমন ছিলেন, বিদেশী ইংলণ্ডে আমিও তেমনই বিদেশী।

জিন্নার মৃত্যু হওয়াতে আপনার এখন ইংলণ্ডে আসা বন্ধ হবে কিনা ভাবছি। আর উপযুক্ত লোক না থাকলে হয়ত আপনাকেই সমগ্র ভারত উপমহাদেশের শাসনভার গ্রহণ করতে হবে।

বশংবদ
জি, বার্ণার্ড শ

মহামান্য প্রাইম মিনিষ্টার
নিউ দিল্লী, ভারতবর্ষ

AYOT ST LAWRENCE, WELWYN HERTS
STATION WHEATHAMPSTEAD LANE R 2 MILES
TELEGRAMS BERNARD SHAW GOD SOTE
TELEPHONE CODICOTE 218

From Bernard Shaw

4 WHITEHALL COURT (130) LONDON S W 1
PHONE WHITEHALL 3160
TELEGRAMS SOCIALIST PARL-LONDON

18th September 1948

Dear Mr Nehru,

I was greatly gratified to learn that you were acquainted with my political writings, and I need hardly add that I should be honored by a visit from you, though I cannot pretend that it will be worth your while to spend an afternoon of your precious time making the journey to this remote village, where there is nothing left of Bernard Shaw but a doddering old skeleton who should have died years ago.

I once spent a week in Bombay, another in Ceylon, and that is all I know at first hand about India. I was convinced that Ceylon is the cradle of the human race because everybody there looks an original. All other nations are obviously mass products

Though I know nothing about India except what is in the newspapers I can consider it objectively because I am not English but Irish, and have lived through the long struggle for liberation from English rule, and the partition of the country into Eire and Northern Ireland, the Western equivalent of Hindustan and Pakistan. I am as much a foreigner in England as you were in Cambridge.

I am wondering whether the death of Jinner will prevent you from coming to England. If he has no competent successor you will have to govern the whole Peninsula.

Faithfully

G. Bernard Shaw

H.E. The Prime Minister
New Delhi
India.

৩৬৪ জওহরলাল নেহর্ কর্তৃক জর্জ বার্ণার্ড শ'কে লিখিত

জর্জ হোটেল
প্যারিস
২৮এ অক্টোবর ১৯৪৮

প্রিয় মিঃ শ.

আপনি ১৮ই সেপ্টেম্বর নিউ দিল্লীতে যে চিঠি পাঠিয়েছিলেন তা আজ প্যারিসে আমার হস্তগত হ'ল। চিঠির জন্য আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ। প্রথমে দিল্লী পোঁছতে এবং সেখান থেকে এখানে ফেরৎ আসতে এত সময় লাগল কেন জানিনে। চিঠিখানা দিল্লী পোঁচেছিল ১৫ই অক্টোবর। যাহোক আরো আগে চিঠিখানি পাইনি বলে যারপরনাই দুঃখিত।

আগে আপনাকে যা লিখেছিলাম, ইংলণ্ড সফরকালে আপনার সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ পেলে খুবই খুশি হতাম। এটা সত্য যে, যাঁরা আমার কার্যক্রম প্রস্তুত করার

ভাব্ব নিযেছিলেন তাবা প্রোগ্রামকে এত বেশি ভবাট কবেছিলেন যে আমি বাস্তবিক যা যা করব ভেবেছিলাম তাব জন্যে সময কবে উঠতে পাবিনি। তথাপি আপনাব সঙ্গে দেখা কববাব সময আমি যেমন কবে হয কবে নিতুম, কিন্তু আমার চিঠিব জবাব না পাওযাতে ঠিক বুঝতে পাবিনি আমাব দেখা কবতে যাওযাটা আপনাব পক্ষে সুবিধাজনক হবে কিনা। তাই ইতস্তত কবে সাক্ষাতেব আব চেষ্টা করিনি।

আমি ভাবতবর্ষে ফিবে যাচ্ছি। বডই দুঃখেব বিষয আপনাকে শ্রদ্ধা জানাবাব সুযোগ থেকে বঞ্চিত হলাম। তবে আশা করছি, ভবিষ্যতে কোন সময এই সুযোগ আমি পাব।

শ্রদ্ধা জানবেন।

আপনাব একান্ত
জওহবলাল নেহবু

জর্জ বার্ণার্ড শ'
এ্যযট সেণ্ট লবেন্স
উইলিন হার্টস ইংলণ্ড

৩৬৫ জর্জ বার্ণাড শ' কর্তৃক লিখিত

৪ হোযাইটহল কোর্ট (১৩০)
লণ্ডন এস ডব্লিউ ১
১২ই নবেম্বব ১৯৪৮

প্রিয পণ্ডিত নেহবু

আমি নিবাশ হইনি। আপনাকে যখন চিঠি লিখি তখন ভাল কবেই জানতাম যে লণ্ডনে অবাস্থিতিকালে এত লোক এত যাযগায আপনাকে নিয়ে টানা টানি কববে যে একটা পুবো বিকেল নষ্ট কবে এ বকম একটা দুর্গম পাডাগাযে আসা আপনাব পক্ষে কিছুতেই সম্ভব হবে না। তবে সেই সঙ্গে এটাও স্পষ্টতঃ বলতে চেযেছিলাম যে যদি কোন প্রকাবে আপনাব পক্ষে আসা সম্ভব হয তবে আপনাকে অতিথি হিসাবে [illegible] পেলে [illegible] বোধ কবব।

কনফাবেন্সে আপনা[illegible] যোগদান ব্যক্তিগত হিসাবে অ[illegible]শয সাফল্যমণ্ডিত হযেছে অপবাপব বক্তাদেব সব বাধা গতেব তুলনায আপনাব বেতাব বক্তৃতা বিশেষবূপে মনো যোগ আকর্ষণ কবেছিল। আপনার শেষদিকেব বক্তৃতাগুলি এটা প্রমাণ কবেছে যে সমগ্র এশিযায [illegible] [illegible] থাকেন তো সে আপনি। এই মুহূর্তে যুদ্ধ বাঁধবাব কোন সম্ভাবনা নেই আপনাব এই আশ্বাসবাণী খুব সমযোপযোগী হযেছে। আমাদেব [illegible] [illegible] নির্বোধ এমন নয কিন্তু কি যে বলেছেন তা তাবা নিজেবাই জানেন না।

জি বার্ণাড শ

বাইট অনারেবল জওহবলাল নেহব
নিউ দিল্লী
ইণ্ডিযা।

৩৬৬ তেজ বাহাদুর সাপ্রু কর্তৃক লিখিত

এলাহাবাদ
২বা ডিসেম্বর ১৯৪৮

প্রিয জওহবলালজী

আপনি যা কিছু বলছেন আমি খবাবেব কাগজেব মাবফৎ তা লক্ষ্য কবে আসছি আপনাব প্রতি আমাব শ্রদ্ধা দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে। ভেবেছিলুম আপনার জন্মদিনে আপনাকে চিঠি লিখব কিন্তু তখন আমার শরীব অত্যন্ত অসুস্থ ছিল, তাই লেখা

আর প্রশ্ন ওঠেনি। সেই চিঠি এখন লিখছি এবং উর্দু কবি গালিবের অমর ভাষায় আপনাকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি—

'আপনার হাজার বছর পরমায়ু হোক আর তার এক এক বছরে যেন পঞ্চাশ হাজার দিন থাকে।'

ভাষা সম্পর্কে যুক্তপ্রদেশের কোনো কোনো কংগ্রেসের নেতা যে মনোভাব দেখাচ্ছেন তা আমার মোটেই ভাল লাগছে না। হিন্দী লোকে শিখবে বৈকি কিন্তু ভুললে চলবে না যে উর্দু মুসলমানদের ভাষা নয়। উর্দু ভাষার পুষ্টিসাধনে হিন্দুদের দান প্রচুর। তা ছাড়া এই প্রদেশের পূর্বাঞ্চলে যে হিন্দী ভাষা প্রচলিত তা রোহিলখণ্ড এর পশ্চিমাঞ্চলের লোকেরা বুঝতেই পারে না। আমি নিশ্চিত জানি অপরাপর অঞ্চলের অধিবাসীরাও এই ব্যাপারে বেশ উত্তেজিত হয়ে উঠেছে কেননা বিশুদ্ধ হিন্দী বুঝতে তাদের বেগ পেতে হয়। আমার বিশ্বাস কতকগুলো ইংরেজি শব্দের হিন্দী অনুবাদ আপনিও বুঝতে পারবেন না। আমি এ বিষয়ে যতই নিরপেক্ষভাবে ভাবছি মনে হচ্ছে এর ফলে একটা গোলযোগের সৃষ্টি হবে। অপরকে দিয়ে চিঠি লিখাচ্ছি দীর্ঘতর লেখবার মতো আমার শারীরিক অবস্থা নয়।

আমার স্বাস্থ্যের কোনো উন্নতি দেখা যাচ্ছে না। কেবল পক্ষাঘাতে রোগ এবং মূত্রাশয়ের পীড়াই নয় পাকস্থলীর পদাহেও দারুণ ভুগছি। দিনে ৫।৬ বার ক্যাথিটর ব্যবহার করতে হয়। এই সব কিছুর পরিণাম সুনিশ্চিত অর্থাৎ শেষ ঘনিয়ে এসেছে আমাকে তার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। ভারতের স্বাধীনতা দেখে গেলুম আর দেখলুম দেশের শাসনভার আপনার হাতে ন্যস্ত এ আমার পরম সৌভাগ্য।

আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাবেন।

প্রীতিশীল
তেজ বাহাদুর সাপ

অনারেবল পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু
প্রাইম মিনিস্টার অব ইণ্ডিয়া
নিউ দিল্লী

নাম সূচী

অচ্যুথন, আর, ৪১৪
অধিকারী জি ৪২৭ ৩০
আজাদ মৌলানা আবুল কালাম, ৩৩৪ ৩৫, ৩৪১, ৩৮১, ৩৮২, ৩৮৮ ৯০, ৩৯১, ৪১৯, ৪৩০-৩১
আনসারী, এম এ ৩৯ ৪০ ৬৭-৬৮, ৭৬, ১৪৯-৫০
মহাত্মা গান্ধী, ৭৬-৭৭
মোতিলাল নেহরু, ৭১ ৭৩, ৭৫ ৭৬
আসফ আলি, ৩৫৭-৫৮ ৪৩৯-৪১
আসফ আলি অরুণা, ৪৪৫
আহমদ, জেড, এ, ৪১৫ ১৬
অ্যাডাম্স, জি এফ, ৬ ৭
অ্যাস্টর, লেডি ৩৩৭ ৩৮
ইপি, ফকির সাহেব, ২৩১ ৩২
ইকবাল, স্যার মহম্মদ ১৬৮
উইলকিন্সন এলেন ১৫০ ৫১ ১৫৫ ৫৭
উ ওয়াই, টি ২৮৪
এন্ড্রুজ, সি, এফ, ১১১ ১২
ওকস্, এম, এল ৫, ৬-৭,
ওগিলভী স্যার ফ্রান্সিস ৪১৬
ওয়াজির হাসান, এস ২৪৫-৪৬
ওয়াভেল, ফিল্ড মার্শাল, এ পি ৪১৫
কিদোয়াই রফি আহমদ ১৪১ ৪২, ১৬০ ৪০১
কৃপালনি, কৃষ্ণ, ৩৪২-৪৬, ৩৩৮
কৃপালনি জে বি, ১৭৬ ৮০, ২৬১-৬৩
ক্রিপস, স্যার স্টাফোর্ড ১৯৮, ২৭৮, ৩৪৬-৪৮ ৪২১-২২
খানসাহেব, মেরী ৯০
খালিক-উজ-জামান, ৩৩৫-৩৭
গফফর খান, খান আবদুল, ৩০৪, ৩১৪, ৩৯০ ৯১ ৩৯৬
গান্ধী মহাত্মা ১৭ ২০ ৩৪-৩৭, ৩৮ ৩৯, ৪০-৪১ ৪৭-৫০, ৬০ ৬২, ৬৪-৬৬ ৬৮ ৭৩ ৭৫ ৮৭-৮৮, ৯৩, ৯৭ ১০৭ ১০৮, ১৫৩-৫৪, ১৬০-৬৪, ১৭২-৭৬ ১৮১-৮২ ১৮৪-৮৫, ১৯৭ ২০৪-০৫, ২১৪ ১৬ ২১৭-২০, ২২২, ২২৪ ২৫, ২২৬ ২৭, ২৩২-৩৪, ২৪২ ৪৩, ২৫০ ৫৩ ২৫৯ ৬০, ২৭০ ৭১ ২৭৪-৭৫ ২৭৮, ৩১১ ২১ ৩২১ ২২ ৩৩২-৩৪, ৩৩৫ ৩৭, ৩৩৯ ৪০ ৩৪২, ৩৫৪ ৫৫, ৩৫৬
আনসারি এম, এ ৭৬
বস সুভাষচন্দ্র, ৩১৯ ২১ ৩৩৫-৩৭
হ্যারিসন আগাথা, ১৬১
নেহরু মোতিলাল ১৫-১৭ ৩১, ৫৫
লোপেৎস, জুয়ান, নেগ্রিন ২৭৩
গিল অম[illegible], ২২৫
গেন্ট লেভা [illegible] ১৯৫ ৯৬
গোলাপ্পা, ভি ১৯৭
গ্রেগ রিচার্ড, বি ১৩৯ ৪১
চট্টোপাধ্যায় বীরেন্দ্র, ৬৯ ৭১
চন্দ অনিলকুমার ২৭১ ৭২
চাড্রিচী কামিল এল ২৭৬
চ চিয়া হ্যা ৩৫৫ ৫৬
চ[illegible] ২২৮ ৩১
চং ইন ফান ৩৯২ ৯৪
চিয়াং-কাই সেক জেনারেলিসিমো, ৩৯৬, ৩৯৮ ৯৯, ৪১৯ ২১, ৪৩৫-৩৬
চিয়াং কাই-সেক মাদাম ৩৯৪-৯৫
জনসন লুই, ৪২৬-২৭
জনসন হিউলেট, ২৫৭
জিন্না এম, এ, ২৪৬-৪৮ ৩৫১-৫৪, ৩৬০
নেহরু মোতিলাল ৫৯
ন্যান্স ওয়েনজেল, ৪০৩-৪০৫
টমসন এডওয়ার্ড ১৩৮ ৩৯ ১৮৫-৯৬,

২০৭-১৪, ২৪৪-৪৫, ২৫৭, ২৬৫-৬৮, ২৭৩-৭৪, ৩৫৮-৬২, ৩৬৯-৭০, ৩৮৩-৮৮
টলার, আর্ণষ্ট, ১৮২-৮৩, ২০২-০৪, ২২২-২৩
টলার, ক্রিশ্চিয়ান, ১৮৪
ট্রেভেলিয়ান, স্যার চার্লস্, ১৭৬
ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, ১০৭-০৮, ১০৯-১০, ১৫৭-৬০, ১৬৬, ১৯৬-৯৭, ২০২, ২২৩, ২২৪, ২৬৮, ২৭২
তুয়ান-শেঙ্, চেন, ৪২৪-২৬
দেব, এস, ডি, ১৬৮-৬৯
দেশাই, মহাদেব, ২১, ২২, ৭৭, ৯১-৯২, ২২০-২২, ২২৭-২৮, ২৩৮-৪০, ২৪৮, ৩৫৬, ৩৬২-৬৩, ৩৬৯, ৩৭২-৭৬, ৩৯৭, ৩৯৮, ৪১৮-১৯, ৪২৩-২৪, ৪২৬, ৪৪৫-৪৬, ৪৪৭-৪৮
দৌলতরাম, জয়রামদাস, ১৬৮-৬৯
নরেন্দ্র দেব, ৬০-৬২
নাইডু, সরোজিনী, ১, ২০, ৩৭, ৪১, ৬৩, ৬৮, ৮৮, ২২৬, ২৪৯, ৩৫৭, ৪১৪-১৫
নারায়ণ, জয়প্রকাশ, ২৬৮, ৩৯১-৯২, ৪১৩
নেহরু, কৃষ্ণা
মোতিলাল নেহরু, ৭৯
নেহরু, মোতিলাল, ২-৫, ৯-১০, ১২-১৫, ২৩, ৪৩-৪৯, ৭৯-৮২, ৮৩
আনসারি, এম, এ, ৭১-৭৩, ৭৫-৭৬
বেসাণ্ট অ্যানি, ৫৫-৫৯
বসু, সুভাষচন্দ্র, ৫২, ৫৩, ৮২-৮৩
বাটলার, স্যার হারকর্ট, ৭, ৯, ১০, ১১, ১১-১২।
গান্ধী, মহাত্মা, ১৫-১৭, ৫১, ৫৫
গুপ্ত শিবপ্রসাদ, ৭৮
জিন্না, এম, এ, ৫৯-৬০
নেহরু, কৃষ্ণা, ৭৯
সেনগুপ্ত, জে, এম, ৫১-৫২, ৫৩-৫৪
পন্থ, গোবিন্দবল্লভ, ২৩৪, ২৪৮, ২৫৩, ৪৪৩-৪৪
প্যাটেল, বল্লভভাই, ১৬৮, ২০০, ২১৬, ২৮৩
ফ্রুন্ট, জ্যাঁ, ৩৯৯-৪০০
বলডুইন, রজার, ৮৪, ৮৫, ৩৪৮
বসু, শরৎচন্দ্র, ২৮৫-৮৯, ৩২২-৩০
বসু, সুভাষচন্দ্র, ১০৯, ১৫১-৫২, ১৫৪-৫৫, ১৮০-১৮১, ২৬৫, ২৭৮-৮২, ২৮৪, ২৮৯-৩০৩, ৩০৬-১৮, ৩১৯-২২, ৩৩০-৩১, ৩৩৫, ৩৩৭
বাজাজ, যমুনালাল, ১৬৮
বাটলার, স্যার হারকর্ট
নেহরু, মোতিলাল, ৭-৯, ১০-১২
বেরী, ল্যাম্পটন, ৪৩৩-৩৪, ৪৩৭
বেসাণ্ট অ্যানি, ৬৯
ব্যানার্জি, পূর্ণিমা, ৪০২-০৩, ৪১১-১২
ব্রেলস্ফোর্ড, এইচ, এন, ১৫২
মহম্মদ আলি, ২৪-৩৪
মাও সে-তুং, ৩৩৮
মামুদ, সৈয়দ, ৪১৬-১৮
মুখার্জী, শ্যামাপ্রসাদ, ৪১২-১৩
মুস্তাফা এল-নাহাস, ২৫৮-৫৯, ২৬৪-৬৫, ২৭৫
মেনেল, রবার্ট, ও, ৮৩, ৮৪
মেয়ার্স, র‍্যাডলফ, ২৪০-৪২
মেইম্বি, টি, ২৬৪
রাধাকৃষ্ণণ, এস, ২৭৭
রাজাগোপালাচারী, সি, ১৮৬
রাজেন্দ্রপ্রসাদ, ১৪২-৪৫, ১৬৮, ২৪৩-৪৪
রাসেল, বারট্রাণ্ড, ১৪৯
রুজভেল্ট, ফ্রাঙ্কলিন ডি, ৪২২-২৩
রিংসনার, রিচার্ড, ৪০৩-০৫
রোবসন, মিসেস পল, ২৫৮
রাথবোন, এলিয়নর এফ, ৪০৫-০৯
লাজপত রায়, লালা, ২৪
লুস, ক্লেয়ার বুথ, ৪৩১-৩২, ৪৩৮
লেজার্নি, এফ, ১৪৫-৪৬,
লোথিয়ান, লর্ড, ১১৩-৩৮, ১৯৯-২০০, ২০৫-০৭, ২৫৪-৫৫
লোপেৎস্, জুয়ান নেগ্রিন, ২৭২

গান্ধী, মহাত্মা, ২৭৩
ল্যাস্কি, এইচ, জে, ১১১
শওকত আলি, ২৭
শ, জর্জ বার্ণার্ড, ৪৪৯-৫২
শরণ, রঘুনন্দন, ৩৪৯, ৩৫২
সুস্টার, স্যার জর্জ, ২৫৫, ৪০৯
শেন, এস, এইচ, ৪৩২-৩৩, ৪৩৫,
৪৩৭, ৪৪২-৪৩
সান ইয়াৎ-সেন, শ্রীমতী, ২৫৬, ৩৪১
সাপ্রু, তেজ বাহাদুর, ৪৪১, ৪৫২-৪৫৩
সাহা, মেঘনাদ, ৪৪২
সি, শিন হেনফ্, ৪৪৪
সুং চিং লিং, ২৫৬, ৩৪১
সুপারিনটেণ্ডেণ্ট, জেলা জেল, ডেরাডুন,
৯৩-৯৬
সেনগুপ্ত, জে, এম,
নেহরু, মোতিলাল, ৫১, ৫৩
স্মেডলী, এ্যাগনেস, ২২৮
স্টগডন, ই, ৮৬, ১১০
স্টারজিয়ন, ক্রিস্টেন, এইচ, ২৬৩
হর্ণিম্যান, বি, জি, ১
হোমস স্মিথ, জে, ৩৭০
হাজি, মির্জা আলি, ২৩১
হ্যারিসন, আগাথা,
গান্ধী মহাত্মা, ১৬১